হুমায়ূন আহমেদ

রিটার্ন টিকেট

৪

আমি আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওর দিকে তাকালাম। ভোরের আলো এরকম উজ্জ্বল। চোখের সামনে ঝড়ঝাম করছে। পৃথিবীর স্ত্রীবর্জিত সুন্দর হয়ে এমন ভুতুড়েপনা আমি বহু দেখি নাই। হয়ত এক মুহূর্ত কয়েক পর তা বদলাবে তুধু রেউ আকাশ থেকে নেমে পড়ে। গাড়ি নিয়ে আগাগোড়া ঝুলে পড়েছিল। রাস্তার ডান দিকে কাত হয়ে গেছে। গাড়ি ধুমাচ্ছে ক্লিক করছে। আমি আতঙ্কে একুচিত। হাইওয়েতে বড় বড় ট্রাক দ্রুত ছোটা ছোটা গাড়ি নেই। কাল কেমন হয় কি ওখানে মনটা কিছু সময় ছাড়া বিস্মৃতি। হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি চলাচল যাতে ওদের দূর দেখা যায়। হাইওয়ে কারো চোখে না। দশ বেশেও গত আমাদের কিছু দেখা যাচ্ছে না। গাড়ির ভাগ এইটে বাসিয়ে দিলাম তাতে উঠিয়া কিছু হচ্ছে না। হঠাৎ দেখলাম রাস্তার পাশে অনেকগুলি তুরে দাঁড়িয়ে ওদের দিকেই তাকাচ্ছে।

হুমায়ূন আহমেদ

রচনাবলী

৪

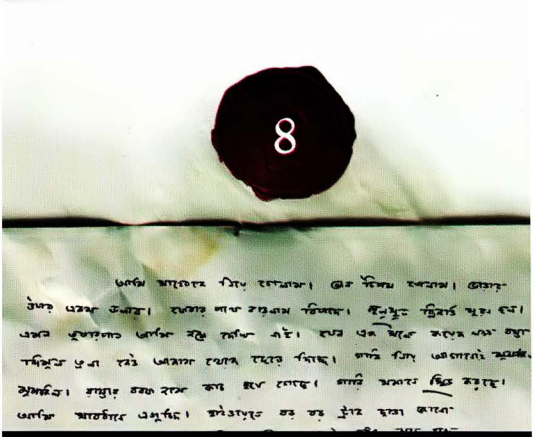

৪

যাদুকর এগিয়ে চলেছেন তাঁর সহজ পদচারণায়, আর তাঁর প্রতিটি পদপাতেই ছড়িয়ে পড়ছে অজস্র ফুলের হাসি। হাঁ, এমনি যাদুকরি মুগ্ধতা ছড়িয়ে হুমায়ূন আহমেদের এগিয়ে চলা। সাহিত্যের প্রতিটি অঙ্গনে তাঁর অবদান বিপুল অভিনন্দনে ধন্য। আর এভাবেই গড়ে উঠছে হুমায়ূন-সাহিত্যের বিশাল সম্ভার। কেবল বাংলাদেশের সীমায়ই নয়, বিদেশেও তার রচনাবলী আগ্রহ সৃষ্টি করতে শুরু করেছে, সমাদৃত হচ্ছে অনূদিত হয়ে। রচনাবলীর এই চতুর্থ খণ্ডে থাকছে—উপন্যাস, ভ্রমণোপাখ্যান, মিসির আলি আখ্যানমালা, কিশোর উপন্যাস, রম্য ও পরিশিষ্ট।

প্রচ্ছদ :: মাসুম রহমান

আমি হুমায়ূন আহমেদ, ১৩ নভেম্বর ১৯৪৮ সনে নানাবাড়ি মোহনগঞ্জে (নেত্রকোনা জেলা) জন্মগ্রহণ করেছি। পাসপোর্ট এবং সার্টিফিকেটে লেখা ১০ এপ্রিল ১৯৫০, কেন এই ভুল হয়েছে জানি না।

মা আয়েশা আক্তার। বাবা-মা দু'জনই লেখালেখি করতেন। কিছুদিন আগে মা'র আত্মজৈবনিক এএকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। তিনি মোটামুটি হৈচৈ ফেলে দিয়েছেন।

আমার সংসার শাওন এবং পুত্র নিষাদকে নিয়ে। গায়িকা শাওন প্রতি রাতে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে পুত্রকে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করে। পুত্র ঘুমায় না, আমিই ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমের মধ্যেই মনে হয়, জীবনটা খারাপ না তো !

আলোকচিত্র :: মাসুদ আখন্দ

হুমায়ূন আহমেদ

রচনাবলী

৪

সালেহ চৌধুরী
সম্পাদিত

অন্যপ্রকাশ

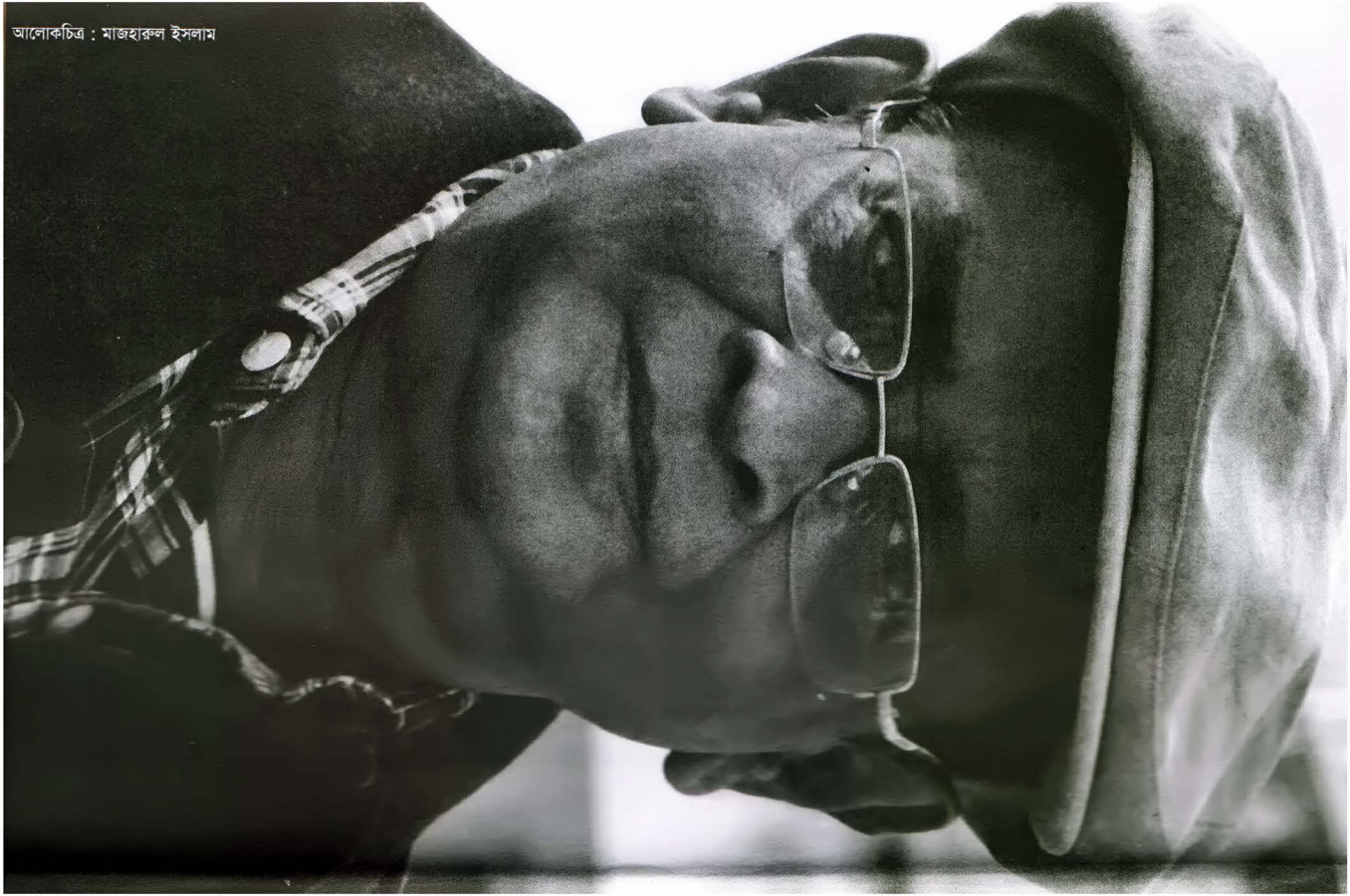

আলোকচিত্র : মাজহারুল ইসলাম

প্রথম প্রকাশ | ১৩ নভেম্বর ২০১০

© | লেখক

প্রচ্ছদ | মাসুম রহমান

প্রকাশক | মাজহারুল ইসলাম
অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১২৫৮০২
ইমেইল : anyaprokash38@gmail.com
ওয়েব সাইট : www.e-anyaprokash.com

মুদ্রণ | কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

মূল্য | ৮০০ টাকা

পরিবেশক | অন্যমেলা
বসুন্ধরা শপিং মল ৯১০২২৬৬
বনানী ৯৮৬০৭১৬
শুক্রাবাদ : ৮১৫৯৭৬৩
বেইলী রোড ৯৩৫১৪০৮

আমেরিকা পরিবেশক | মুক্তধারা
জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক

যুক্তরাজ্য পরিবেশক | সঙ্গীতা লিমিটেড
২২ ব্রিক লেন, লন্ডন

কানাডা পরিবেশক | এটিএন মেগা স্টোর
২৯৭৬ ড্যানফোর্থ এভিনিউ, টরেন্টো

Humayun Ahmed
Rachanabali Vol. 4

By Salah Choudhury
Published by Mazharul Islam
Anyaprokash
Cover Design : Masum Rahman
Price Tk. 800.00 only
ISBN 984 868 588 X

ভূমিকা

হুমায়ূন রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকদের কাছে আহামরি কোনো পরিচয়ের দাবি আমার নেই। এই রচনাবলী সম্পাদনার দায়িত্ব আমার ওপর বর্তেছে, সে-ও এ জন্য যে, আমি হুমায়ূন-সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক। রচনাবলীর ভূমিকাকে বিচার-বিশ্লেষণে ঋদ্ধ হতে হয়। গোড়াতেই জানিয়ে রাখা দরকার, তেমন দক্ষতা আমার নেই। রচনাবলীর প্রতি খণ্ডের শুরুতে যুক্ত ভূমিকায় প্রথা মানার পাশাপাশি আমি আমার ভালো লাগার কথাই বলে যাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি। আর সম্পাদনা মাত্রই যেহেতু এক ধরনের মূল্যায়ন, আমি আমার বোধ আর মেধার আলোকে এমন কিছু ইঙ্গিত রাখার চেষ্টা করছি যা রসজ্ঞ পাঠককে তার নিজের মূল্যায়ন তৈরি করে নিতে সাহায্য করতে পারে।

হুমায়ূন-সাহিত্য আকারে যেমন বিশাল, প্রকৃতিতেও তেমনি বিচিত্র। ভালো লাগার এত উপাদান এতে ছড়িয়ে আছে যে, একটি নিবন্ধে তা তুলে ধরা অসম্ভব। খণ্ডে খণ্ডে রচনাবলী বিন্যাসের সঙ্গে খণ্ড-আলোচনায় সেসব দিক সামনে আনাই আমার লক্ষ্য।

সমালোচকদের অনেকের মতে, আমাদের সাহিত্যে 'উইট' বা বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুকরসের তেমন চর্চা নেই। হালকা চালে যে কথাগুলো বলা যায়, সহজেই পৌঁছে দেওয়া যায় পাঠকদের মনে, তাকেও জটিল এবং গুরুগম্ভীর করে তোলাতেই আমরা অভ্যস্ত। পাঠক মাত্রই লক্ষ করে থাকার কথা, এ অভিযোগ হুমায়ূন আহমেদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাঁর সকল রচনাতেই কৌতুক বা রম্যরস ফল্গুধারার মতো প্রবাহমান থাকে। আর তা কখনো পাঠকের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে না। থাকে না বলেই একটা বিমল আনন্দ রচনার পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যায় অমোঘ আকর্ষণে। পরিণতি যদি বিয়োগান্ত হয়, তার অভিঘাত হয়ে ওঠে তীব্রতর। (হয়তো এ জন্যই দেখা যায়, নাটকের একটি চরিত্রের মৃত্যু কিংবা চরম দণ্ড বিক্ষোভের জন্ম দেয়—পত্রপত্রিকায় লেখা আর রাজপথের মিছিলে প্রতিবাদ ওঠে।)

ব্যক্তিজীবনে অসধারণ 'উইটি' হুমায়ূন কৌতুকরস সৃষ্টি আর উপভোগে সমান দক্ষ। সাহিত্যে এই দক্ষতার যথাযথ ব্যবহার তাঁর রচনায় নতুন মাত্রার সংযোগ ঘটিয়েছে। উদাহরণ টেনে এ দিকটি ব্যাখ্যার দরকার করে না। এ জন্যে যে-কোনো একটি রচনা পড়াই যথেষ্ট।

সাহিত্যে রম্য বা কৌতুকরসের সাধারণ ভূমিকা হচ্ছে বিনোদন। পাঠককে উৎফুল্ল রাখা। কিন্তু এর মূল তাৎপর্য অন্যত্র। সাধারণত বর্ণিত পরিস্থিতি বা চরিত্রের অসঙ্গতি কিংবা বাড়াবাড়ির দিকগুলো সুকৌশলে সামনে নিয়ে এসেই কৌতুক সৃষ্টি

করা হয়। জীবনেও তেমনি—যা একান্ত স্বাভাবিক তা তেমন নজর কাড়ে না, হাস্যরসের অবতারণা তো পরের কথা। তবে এভাবে রসসৃষ্টিতে মাত্রার ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। লবণ ছাড়া রান্নায় স্বাদ বর্তায় না। আবার লবণের আধিক্য ঘটলে সব আয়োজন পণ্ড হয়—খাবার মুখে তোলার রুচি থাকে না। কৌতুকরস ব্যবহারে এই মাত্রা বা পরিমিতি মেনে চলা আবশ্যক। অন্যথায় গোটা উপস্থাপনা ভাড়ামিতে পর্যবসিত হয়। হুমায়ূন এই পরিমিতি সম্পর্কে সচেতন বলেই তাঁর সৃষ্টি এমন সার্থক ও আকর্ষণীয়।

এই যে অসঙ্গতি তুলে ধরার কথা বললাম তার কিছু বাস্তব ফায়দাও আছে। আর সেটাই মুখ্য। অসঙ্গতিটা যেখানে নেতিবাচক, সচেতনতা সৃষ্টির ফলে তার কিছু একটা প্রতিকারের পথ তৈরি হয়। অসঙ্গতি বা চলতি ধারার সঙ্গে অমিল ক্ষেত্রবিশেষে অধিকতর কাম্যও হতে পারে। তেমন অবস্থায় কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার বা নেওয়ার প্রেরণাও সৃষ্টি করতে পারে এই উপস্থাপনা। আর এর সবকিছুই ঘটে এমন এক ফুল্ল পরিবেশে যা মনকে কখনো ভারাক্রান্ত করে না।

উইট বা বুদ্ধিদীপ্ত রসবোধের সর্বাধিক ব্যবহার ঘটে রম্য আর ব্যক্তিগত রচনায়। ব্যক্তিগত রচনার আওতায় আছে যাবতীয় আত্মজৈবনিক রচনা বা ভ্রমণোপাখ্যান ও স্মৃতিকথা। হুমায়ূন-সাহিত্যে এ জাতীয় রচনার সংখ্যাও কম নয়। রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে এ পর্যায়ের *এলেবেলে* (রম্যরচনা, প্রথমপর্ব) এবং *হোটেল গ্রেভার ইন* (ভ্রমণোপাখ্যান) গ্রন্থিত হতে যাচ্ছে বলেই এ প্রসঙ্গের অবতারণা।

রম্যরচনা

রম্যরচনার প্রধান লক্ষ্য কৌতুকরস সৃষ্টি। অন্য লক্ষ্য যদি কিছু থাকে তা গৌণ ভূমিকা নেয়। ফলে এ শ্রেণীর রচনায় কিছু বাড়াবাড়ি বা মাত্রা ছাড়ানোর অধিকার সব সাহিত্যেই স্বীকৃত। *এলেবেলে* তার ব্যতিক্রম না। আবার রম্যরচনায় প্রয়োজনমতো প্রচলিত গল্প ব্যবহারেও বাধা নাই। দেশ-বিদেশের সীমা না মেনেও হাত বাড়ানো যায়। প্রয়োজন কেবল আহৃত গল্পানুর যুৎসই প্রয়োগ। প্রয়োগ-দক্ষতাই তাতে নতুনত্বের আমদানি ঘটায়।

কার্টুন পত্রিকা *উন্মাদ*-এর জন্যে লিখতে গিয়ে হুমায়ূন আহমেদ এ সুযোগের পূর্ণ ফায়দা নিয়েছেন। নিজের অভিজ্ঞতা তথা চারপাশের উপাদান যেমন কাজে খাটিয়েছেন, তেমনি দেশি-বিদেশি চুটকি নিজের মতো করে ব্যবহার করেছেন অবলীলায়। দুই খণ্ড *এলেবেলে*র জনপ্রিয়তাই তার সাফল্যের প্রমাণ। ব্যাখ্যায় নামার বদলে আমি *এলেবেলে*র প্রতি বোদ্ধা পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণই যথেষ্ট মনে করি।

ভ্রমণোপাখ্যান

এ পর্যায়ে হুমায়ূন আহমেদের এখন পর্যন্ত প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা চার। প্রথম বই *হোটেল গ্রেভার ইন*। উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গিয়ে তাঁকে প্রথম এই

হোটেলে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। প্রথম দফায় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের অভিজ্ঞতা নিয়ে মোট তেরোটি স্বতন্ত্র অধ্যায় বা গল্প এতে ঠাঁই পেয়েছে। বিদেশে যাওয়া এবং তার পরিবেশ থেকে তুলে আনা রচনা অবশ্যই ভ্রমণসাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে। তবে যে ধারাবাহিক বর্ণনায় প্রথাসিদ্ধ ভ্রমণকাহিনী রচিত হয় হুমায়ূন তা অনুসরণ করেননি। তিনি মার্কিন পরিবেশে তাঁর অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন ঘটনা আর চরিত্রকে তার বাস্তবতা মেনে গল্পের আকারে হাজির করেছেন। আর এ জন্যেই এ রচনাগুলোকে ভ্রমণকাহিনী না বলে ভ্রমণোপাখ্যান বলাই সঙ্গত বোধ করছি।

হোটেল গ্রেভার ইন-এর চতুর্থ স্তবকে হুমায়ূন বলছেন :

> 'অনেকের পায়ের নিচে সর্ষে থাকে। তাঁরা বেড়াতে ভালোবাসেন। বিদেশের নামে তাদের রক্তে বাজনা বেজে ওঠে। আমার কাছে ভ্রমণের চেয়ে ভ্রমণকাহিনী ভালো লাগে। একটা বই হাতে, নিজের ঘরে নিজের চেনা জায়গায় বসে থাকব, পাশে থাকবে চায়ের পেয়ালা, অথচ আমি লেখকের সঙ্গে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। লেখক হয়তো সুন্দর একটা হ্রদের বর্ণনা দিচ্ছেন, আমি কল্পনায় সেই হ্রদ দেখছি। সেই হ্রদের জল নীল। জলে মেঘের ছায়া পড়েছে। আমার কল্পনাশক্তি ভালো। লেখক তার চোখে যা দেখছেন আমি আমার কল্পনার চোখে তার চেয়ে ভালো দেখতে পাচ্ছি। কাজেই কষ্ট করে যাযাবরের মতো দেশ-বিদেশ দেখার প্রয়োজন কী ?'

উদ্ধৃতিটির দুটি দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে ভ্রমণকাহিনী পড়ার সুবিধে বা আনন্দময় দিকের প্রতি ইঙ্গিত; অন্যটি হচ্ছে ভ্রমণের প্রতি তাঁর অনাগ্রহের কথা। এমন অনাগ্রহ এ পর্যায়ের লেখায় আরও অনেক জায়গায়ই দেখতে পাওয়া যাবে। তবে কি হুমায়ূন আহমদ ভ্রমণ অপছন্দ করেন ? হুমায়ূনকে যারা ঘনিষ্ঠভাবে জানেন তারা এই প্রশ্নে নেতিবাচক জবাব দিতে বাধ্য। কেননা সুযোগ পেলেই হুমায়ূন পরিবার-পরিজন এমনকি বন্ধুবান্ধবদের নিয়েও এদিক-ওদিক বেরিয়ে পড়তে ক্লান্তিহীন। আর তারই সুবাদে প্রকাশিত হয়েছে ভ্রমণোপাখ্যানমালার চারটি বই। এই তালিকা আরও দীর্ঘ হবে, এমনটা সহজেই আশা করা যায়। অর্থাৎ হুমায়ূন দেশে আর বিদেশে মেলা ভ্রমণ করেছেন। নিশ্চিতভাবেই বলা যায় আরও করবেন।

তবে কি ভাবতে হবে উদ্ধৃত স্তবকে হুমায়ূন অসত্য ভাষণ করেছেন ? তা-ও না। মানুষের জীবন একরৈখিক না। অন্যকথায় বলতে গেলে একজন মানুষের মধ্যে অনেকের বাস। সৃষ্টিশীল মানুষের ক্ষেত্রে এ উক্তি অধিকতর সত্য। এক হুমায়ূন যখন ঘরের নিরাপত্তায় বইয়ে মুখ গুঁজে থাকায় তৃপ্তি খোঁজেন, অন্য হুমায়ূন হয়তো তখনই পা বাড়ায় বাইরের পথে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পরিবার-পরিজন আর বন্ধুদের নিয়ে দেশের এখানে-ওখানে যখন-তখন বেরিয়ে পড়ায় সুবিধে হবে বলে একসময়

হুমায়ূন একটা মাইক্রোবাসও কিনে নিয়েছিলেন। পিতার বদলির চাকরি শেষবেই তাকে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় নিয়ে গেছে। তিনি সে দেখাতেই তৃপ্ত থাকেননি। এখনো নয়। এ যেন দেশ দেখা আর জানার এক অন্তহীন প্রক্রিয়া।

নিজের মতো করে দেখা আর তুলে ধরার দক্ষতাতেই হুমায়ূন-সাহিত্য এমন নন্দিত।

ভ্রমণোপাখ্যানেও আমরা এই খুঁটিয়ে দেখার পরিচয় পাই। *হোটেল গ্রেভার ইন*-এ মার্কিন এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের জীবনের নানাদিক উঠে এসেছে রসালো বর্ণনায়। অনেক ক্ষেত্রেই তা সমালোচনামূলকও বটে। তবে তা অবশ্যই তাঁর স্বভাব মতো পরোক্ষ তথা গল্পের মাধ্যমে বলা। নিন্দা আর প্রশংসা দুইই। এর কোথাও আন্তরিকতার অভাব নাই বলেই অধিকতর হৃদয়গ্রাহী। *হোটেল গ্রেভার ইন* উপাখ্যানটির শেষ তিনটি বাক্য 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে আজ আমরা বিভক্ত। কত দেশ, কত নাম, কিন্তু মানুষ একই আছে। আসছে লক্ষ বছরও তাই থাকবে।' এই অখণ্ড মানবসত্তার প্রতি বিশ্বাস আছে বলেই হুমায়ূন দেশ-বিদেশের প্রভেদ ভুলে সমালোচনার তীব্র কষাঘাত হানতে পারেন। এই দেখা আর দেখানোয় কোনো খাদ নেই বলেই খাঁটি সোনার মতো দুর্মূল্য। অমূল্য বলাই হয়তো সঙ্গত ছিল।

যোগাযোগ ব্যবস্থায় অগ্রগতির ফলে পৃথিবীময় ঘুরে বেড়ানো আজ আর কঠিন কিছু না। ফলে বিপুলসংখ্যক মানুষ প্রতিনিয়ত ভ্রমণে যাচ্ছেন, তাদের অনেকে বইও লিখছেন। প্রথার বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি ভ্রমণকাহিনীকে বিরক্তিকর করে তুলেছে। এই পটভূমিতে *হোটেল গ্রেভার ইন* এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ভ্রমণোপাখ্যান আমাদের সাহিত্যে এক নতুন পথের দিশা হয়ে উপস্থিত হয়েছে। অবশ্যি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের ওপর লেখা কবি জসীম উদ্‌দীনের বইটিতেও এ ধারার কিছু নজির আছে।

এই ভূমিকাটি যখন লিখিত হচ্ছে হুমায়ূন আহমেদের প্রকাশকেরা তাঁর বাষট্টিতম বছরপূর্তি উপলক্ষে জন্মোৎসবের আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত। প্রকাশকদের পক্ষ থেকে লেখকের জন্মদিন পালনের এমন নজির এ দেশে অন্তত নতুন অভিজ্ঞতা। এ উপলক্ষে আমিও অন্যপ্রকাশের কর্তৃপক্ষ-কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। আর প্রত্যাশা করি এ উপলক্ষের অনেক অনেক প্রত্যাবর্তন যা আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির অগ্রযাত্রায় অবদান রাখবে।

সালেহ চৌধুরী

সূচি

উপন্যাস
আগুনের পরশমণি ১১
দূরে কোথায় ৯৫
অরণ্য ২৭৫

ভ্রমণোপাখ্যান
হোটেল গ্রেভারইন ৩৪৯

আখ্যানমালা : মিসির আলি
নিশিথিনী ৪১১

কিশোর উপন্যাস
সূর্যের দিন ৫১৩

রম্য
এলেবেলে [প্রথম খণ্ড] ৫৬৯

পরিশিষ্ট ৬০৯

উপন্যাস

আগুনের পরশমণি

সারাটা সকাল উৎকণ্ঠার ভেতর কাটল। উৎকণ্ঠা এবং চাপা উদ্বেগ। মতিন সাহেব অস্থির হয়ে পড়লেন। গেটে সামান্য শব্দ হতেই কান খাড়া করে ফেলেন, সরু গলায় বলেন, বিন্তি, দেখ তো কেউ এসেছে কি না।

বিন্তি এ বাড়ির নতুন কাজের মেয়ে। তার কোনো ব্যাপারে কোনো উৎসাহ নেই, কিন্তু গেট খোলায় খুব আগ্রহ। সে বারবার যাচ্ছে এবং হাসিমুখে ফিরে আসছে। মজার সংবাদ দেওয়ার ভঙ্গিতে বলছে, বাতাসে গেইট লড়ে। মানুষজন নাই।

দুপুরের পর মতিন সাহেবের উদ্বেগ আরও বাড়ল। তিনি তলপেটে একটা চাপা ব্যথা অনুভব করতে লাগলেন। এই উপসর্গটি তাঁর নতুন। কোনোকিছু নিয়ে চিন্তিত হলেই তলপেটে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা হতে থাকে। ডাক্তার-টাক্তার দেখানো দরকার বোধহয়। আলসার হলে কি এরকম হয় ? আলসার হয়ে গেল নাকি ?

মতিন সাহেব পাঞ্জাবি গায়ে দিলেন। চুল আঁচড়ালেন। সুরমা অবাক হয়ে বললেন, কোথায় যাচ্ছ তুমি ?

এই একটু রাস্তায়।

রাস্তায় কী ?

কিছু না। একটু হাঁটব আর কী।

তিনি হাসতে চেষ্টা করলেন।

সুরমার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। গত রাতে তাঁদের বড় রকমের একটা ঝগড়া হয়েছে। সাধারণত ঝগড়ার পর তিনি কিছুদিন স্বামীর সঙ্গে কোনো কথা বলেন না। আজ তার ব্যতিক্রম হলো। তিনি কঠিন গলায় বললেন, তুমি সকাল থেকে এরকম করছ কেন ? কারও কি আসার কথা ?

মতিন সাহেব পাংশুমুখে বললেন, আরে না, কে আসবে ? এই দিনে কেউ আসে ?

মতিন সাহেব স্ত্রীর দৃষ্টি এড়াবার জন্যে নিচু হয়ে চটি খুঁজতে লাগলেন। সুরমা বললেন, রাস্তায় হাঁটাহাঁটির কোনো দরকার নেই। ঘরে বসে থাকো।

যাচ্ছি না কোথাও। এই গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব।

গেটের বাইরে শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থাকবে কেন ?

তিনি জবাব দিলেন না।

স্ত্রীর কথার অবাধ্য হওয়ার ক্ষমতা তাঁর কোনোকালেই ছিল না। কিন্তু আজ অবাধ্য হলেন। হলুদ রঙের একটা পাঞ্জাবি গায়ে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাস্তা ফাঁকা। তিনি পরপর দুটি সিগারেট শেষ করলেন। এর মধ্যে মাত্র একটা রিকশা গেল। সে রিকশাও ফাঁকা। অথচ কিছুদিন আগেও দুপুরবেলায় রিকশার যন্ত্রণায় হাঁটা যেত না। মতিন সাহেব রাস্তার মোড় পর্যন্ত গেলেন। ইদ্রিস মিয়ার পানের দোকানের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। ইদ্রিস মিয়া শুকনো গলায় বলল, স্যার, ভালো আছেন ?

তিনি মাথা নাড়লেন। যার অর্থ হ্যাঁ। কিন্তু মুখের ভাবে তা মনে হলো না। তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছে তিনি ভালো নেই।

বিক্রিবাটা কেমন ইদ্রিস ?

আর বিক্রি! কিনব কে কন ? কিনার মানুষ আছে ?

দেখি একটা পান দাও।

মতিন সাহেবের এখনো দুপুরের খাওয়া হয়নি। এক্ষুনি গিয়ে ভাত নিয়ে বসতে হবে। পান খাওয়ার কোনো মানে হয় না। কিন্তু একটা দোকানের সামনে শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। ব্যাপারটা সন্দেহজনক। এখন সময় খারাপ। আচার-আচরণে কোনোরকম সন্দেহের ছাপ থাকা ঠিক না।

জর্দা দিমু ?

দাও।

ইদ্রিস নিষ্প্রাণ ভঙ্গিতে পান সাজাতে লাগল। তার মাথায় ঝুঁটিবিহীন একটা লাল ফেজ টুপি। কোত্থেকে জোগাড় করেছে কে জানে। চিবুকের কাছে অল্প দাড়ি। মতিন সাহেব পান মুখে দিয়ে বললেন, দাড়ি রাখছ নাকি ইদ্রিস ?

ইদ্রিস জবাব দিল না।

দাড়ি রেখেই ভালো করেছ। যেদিকে বাতাস সেইদিকে পাল তুলতে হয়। পান কত ?

দেন যা ইচ্ছা।

ইদ্রিসের গলার স্বরে স্পষ্ট বৈরাগ্য। যেন পানের দাম না দিলেও তার কিছু আসে যায় না। মতিন সাহেব একটা সিকি ফেলে খানিকটা এগিয়ে গেলেন। নিউ পল্টন লাইনের এই গলিটায় বেশ কয়েকটি দোকান। কিন্তু মডার্ন সেলুন এবং পাশের ঘরটি ছাড়া সবই বন্ধ। তিনি মডার্ন সেলুনে ঢুকে পড়লেন। রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করবার চেয়ে সেলুনে চুল কাটা নিয়ে ব্যস্ত থাকা ভালো। সেলুনটা একসময় মস্তান ছেলেপুলেদের আড্ডাখানা ছিল। লম্বা চুলের চার-পাঁচটা ছেলে শার্টের বুকের বোতাম খুলে বেঞ্চির ওপর বসে থাকত। সেলুনে একটা এক ব্যান্ড ট্রানজিস্টার সারাক্ষণই বাজত। ট্রানজিস্টারের ব্যাটারির খরচ দিতে গিয়েই সেলুনের লাটে ওঠার কথা। কিন্তু তা ওঠেনি। রমরমা ব্যবসা করেছে। আজ অবশ্যি জনশূন্য। তবে ট্রানজিস্টার বাজছে। আগের মতো ফুল ভল্যুমে নয়। মৃদু শব্দে। দেশাত্মবোধক গান। কথা ও সুর নজিবুল হক। মতিন সাহেব বেশ মন দিয়েই গান শুনতে লাগলেন। তবে চোখ রাখলেন রাস্তার ওপর।

চুলটা একটু ছোট করো।

নাপিত ছেলেটি বিস্মিত হলো। সে ইনার চুল গত বুধবারেই কেটেছে। আজ আরেক বুধবার। এক সপ্তাহে চুল বাড়ে দুই সুতা। তার জন্যে কেউ চুল কাটাতে আসে না।

স্যার, চুল কাটাবেন ?

হুঁ। পিছনের দিকে একটু ছোট কোরো।

নাপিতের কাঁচি যন্ত্রের মতো খটখট করতে লাগল। মতিন সাহেব বললেন, দেশের হালচাল কী ?

ভালোই।

চুল কাটতে এলে এই ছোকরার কথার যন্ত্রণায় অস্থির হতে হয়। কথা শুনতে তাঁর খারাপ লাগে না। কিন্তু এই ছোকরা কথা বলার সময় থুথুর ছিটা এসে লাগে। আজ সে নিশ্চুপ। থুথু গায়ে লাগার কোনো আশঙ্কা নেই।

দাম দেওয়ার সময় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, রাতদিন ট্রানজিস্টার চালাও কীভাবে ? ব্যাটারির তো মেলা দাম।

নাপিত ছোকরা জবাব দিল না। গম্ভীর মুখে টাকা ফেরত দিয়ে বেঞ্চির ওপর পা তুলে বসে রইল। মতিন সাহেব বললেন, আজ কার্ফু ক'টা থেকে জানো নাকি ?

জানি, ছয়টায়।

এক ঘণ্টা পিছিয়ে দিল, ব্যাপারটা কী ?

ঝামেলা নাই। গণ্ডগোল নাই। কার্ফুও নাই।

তা তো ঠিকই। এখন হয়েছে ছ'টা, তারপর হবে সাতটা, আটটা; কী বলো ?

তিনি কোনো উত্তর পেলেন না। ছেলেটা ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে আছে। আজকাল কেউ বাড়তি কথা বলতে চায় না। চেনা মানুষদের কাছেও না।

রোদ উঠেছে কড়া এবং ঝাঁঝাল। কিন্তু এই কড়া রোদেও তাঁর কেমন শীত শীত করতে লাগল। তিনি ইদ্রিস মিয়ার দোকানের সামনে দ্বিতীয়বার এসে দাঁড়ালেন। মনে করতে চেষ্টা করলেন ঘরে যথেষ্ট সিগারেট আছে কি না। পাঁচটার পর কোথাও কিছু পাওয়া যাবে না। গত সোমবারে সিগারেটের অভাবে খুব কষ্ট করেছেন। রাত ন'টার সময় বিন্তি এসে বলল, সিগারেটের প্যাকেট খুঁইজ্যা পাই না। কী সর্বনাশ! বলে কী! তাঁর মাথায় রক্ত উঠে গেল। অমানিশি কাটবে কীভাবে ? এটা ফ্ল্যাটবাড়ি না। ফ্ল্যাটবাড়ি হলে অন্যদের কাছে খোঁজ করা যেত। তবু তিনি রাত দশটার সময় পাঁচিলের কাছে দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির উকিল সাহেবকে চিকন সুরে ডাকতে লাগলেন, ফরিদউদ্দিন সাহেব, সিগারেট আছে ? সুরমা এসে তাঁকে টেনে ভেতরে নিয়ে গেলেন। রেগে আগুন হয়ে বললেন, মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে ? একটা রাত সিগারেট না ফুঁকলে কী হয় ?

মতিন সাহেব মানিব্যাগ খুললেন। ইদ্রিস মিয়া তার দোকানে আগরবাতি জ্বালিয়েছে। সব দোকানদারের মধ্যে এই একটি নতুন অভ্যাস দেখা যাচ্ছে। আগরবাতি জ্বালানো। আগে কেউ কেউ সন্ধ্যাবেলা জ্বালাত। এখন প্রায় সারা দিনই জ্বলে। আগরবাতির গন্ধ মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয়। মতিনউদ্দিন সাহেব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

ইদ্রিস, দুই প্যাকেট ক্যাপস্টান দাও।

ইদ্রিস সিগারেট বের করল। দাম এক টাকা করে বেশি নিল। সিগারেটের দাম চড়ছে। ছেলে-ছোকরারা এখন সারা দিন ঘরে বসে থাকে এবং সিগারেট ফুঁকে। এছাড়া আর কী করবে!

দু'টা ম্যাচও দাও।

ইদ্রিস মিয়া ম্যাচ দিতে দিতে বলল, আফনে কাউরে খুঁজতেছেন ?

তিনি চমকে উঠলেন। বলে কী এই ব্যাটা! টের পেল কীভাবে ?

কারে খুঁজেন ?

আরে না, কাকে খুঁজব ? চুল কাটাতে গিয়েছিলাম। চুল একটু বড় হলেই আমার অসহ্য লাগে।

তিনি বাড়ির দিকে রওনা হলেন। গোরস্থান ঘেঁসে রাস্তা গিয়েছে। সেইজন্যেই কি গা ছম ছম করে ? না অন্যকোনো কারণ আছে ? একটা কটু গন্ধ আসছে। নিউ পল্টন লাইনের লোকজনদের ধারণা, বর্ষাকালে এই গন্ধ পাওয়া যায়। লাশ পচে গন্ধ ছড়ায়। এখন বর্ষাকাল। গোরস্থানের পাশে বাড়ি ভাড়া নেওয়াটা ভুল হয়েছে। বিরাট ভুল।

বিন্তি গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। মতিন সাহেবকে দেখে সে দাঁত বের করে হাসল। এই মেয়েটার হাসিরোগ আছে। যখন-তখন যার-তার দিকে তাকিয়ে হাসবে। অভদ্রের চূড়ান্ত। কড়া ধমক দিতে হয়। তিনি ধমক দিতে গিয়েও দিলেন না। সোজা ঘরে ঢুকে খেতে বসলেন।

সুরমাও বসেছেন। কিন্তু তিনি কিছু খাচ্ছেন না। ঝগড়া-টগড়ার পর তিনি খাওয়াদাওয়া আলাদা করেন। মাঝে মাঝে করেনও না। মতিন সাহেব ভাত মাখতে মাখতে বললেন, আজ কার্ফু ছয়টা থেকে। সুরমা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন, তাতে কী ?

না, কিছু না। এমনি বললাম। কথার কথা।

আজ অফিসে গেলে না কেন ?

শরীরটা ভালো না।

একটা সত্যি কথা বলো তো, কেউ কি আসবে ?

তিনি বিষম খেলেন। পানি-টানি খেয়ে ঠাণ্ডা হতে তাঁর সময় লাগল। সুরমা তাকিয়ে আছেন। তাঁর মুখ কঠিন। মতিন সাহেব ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। এক সময়ে সুরমার এই মুখ খুব কোমল ছিল। কথায় কথায় রাগ করে কেঁদে ভাসাত। একবার তাঁকে এক সপ্তাহের জন্যে রাজশাহী যেতে হবে। সুরমা গম্ভীর হয়ে আছে। কথাটথা বলছে না। রওনা হওয়ার আগে আগে এমন কান্না! মতিন সাহেব বড় লজ্জার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। বাড়িভর্তি লোকজন। এদের মধ্যে মেজো ভাবিও আছেন। মেজো ভাবির মুখ খুব আলগা। তিনি নিচুগলায় বাজে ধরনের একটা রসিকতা করলেন। কী অস্বস্তি। পঁচিশ বছর খুব কি দীর্ঘ সময় ? এই সময়ের মধ্যে একটি কোমল মুখ চিরদিনের জন্যে কঠিন হয়ে যায় ?

কী, কথা বলছ না কেন ?

কী বলব ?

কারও কি আসার কথা ?

আরে না, কে আসবে ?

সত্যি করে বলো।

মতিন সাহেব থেমে থেমে বললেন, ইয়ে... আমার এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়।

কে সে?

তুমি চিনবে না।

তোমার আত্মীয় আর আমি চিনব না—কী বলছ এসব?

দেখাসাক্ষাৎ নেই তো। আমি নিজেই ভালো করে চিনি না।

তুমি নিজেও চেনো না?

সুরমার কপালে ভাঁজ পড়ল। মতিন সাহেব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তিনি মৃদুস্বরে বললেন, দুই একদিন থাকবে। তারপর চলে যাবে। নাও আসতে পারে। ঠিক নাই কিছু। না আসারই সম্ভাবনা।

সে করে কী?

জানি না।

জানি না মানে?

বললাম তো আমি নিজেও চিনি না ভালো করে। যোগাযোগ নেই।

মতিন সাহেব উঠে পড়লেন। সাধারণত ছুটির দিনগুলিতে তিনি খাওয়াদাওয়ার পর গল্পের বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন। আজ ছুটির দিন নয়। কিন্তু তিনি অফিসে যাননি। কাজেই দিনটিকে ছুটির দিন হিসাবে ধরা যেতে পারে। তাঁর উচিত একটা বই নিয়ে বিছানায় চলে যাওয়া। তিনি তা করলেন না। বই হাতে বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসলেন। চোখ রাস্তার দিকে।

দিনের আলো আসছে। আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। পরপর কয়েকদিন খটখটে রোদ গিয়েছে। এখন আবার কয়েকদিনের ক্রমাগত বৃষ্টি হওয়ার কথা। বাড়ির ভেতরে সুরমা বসেছে তার সেলাই মেশিন নিয়ে। বিশ্রী ঘটাং ঘটাং শব্দ হচ্ছে। মতিন সাহেবের ঘুম পেয়ে গেল। হাতে ধরে থাকা বইটির লেখাগুলি ঝাপসা হয়ে উঠেছে। ঝাপসা এবং অস্পষ্ট। রোদ নেই একেবারেই। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। বৃষ্টি হবে, জোর বৃষ্টি হবে। তিনি বই বন্ধ করে আকাশের দিকে তাকালেন। 'বাদলা দিনে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান।' সুরমা ক্রমাগতই খটখট করে যাচ্ছে। কিসের তার এত সেলাই? আচ্ছা, ছেলেবেলায় সুরমা কেমন ছিল? প্রতিটি মানুষ একেক বয়সে একেক রকম। যৌবনে সুরমা কত মায়াবতী ছিল। বর্ষার রাতগুলি তাঁরা গল্প করে পার করে দিতেন। একবার খুব বর্ষা হলো। খোলা জানালায় বৃষ্টির ছাঁট এসে বিছানা ভিজিয়ে একাকার করেছে, তবু তাঁরা জানালা বন্ধ করলেন না। ভেজা বিছানায় শুয়ে রইলেন। হাওয়া এসে বারবার মশারিকে নৌকার পালের মতো ফুলিয়ে দিতে লাগল। কত গভীর আনন্দেই না কেটেছে তাঁদের যৌবন। মতিন সাহেব কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

যখন ঘুম ভাঙল তখন চারদিক অন্ধকার। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। দমকা বাতাস দিচ্ছে। তিনি খোঁজ নিলেন কেউ এসেছে কি না। কেউ আসেনি। কার্ফু শুরু হয়ে গেছে

নিশ্চয়ই। এখন আর আসার সময় নেই। কাল কি আসবে ? বোধহয় না। শুধু শুধুই অপেক্ষা করা হলো। তিনি শোবার ঘরে উঁকি দিলেন। সুরমা ঘুমুচ্ছে। একটা সাদা চাদরে তার শরীর ঢাকা। তাকে কেমন অসহায় দেখাচ্ছে। মতিন সাহেব কোমল গলায় ডাকলেন, সুরমা! সুরমা! সুরমা পাশ ফিরলেন।

ঘড়িতে সাড়ে পাঁচ বাজে। কার্ফু শুরু হতে এখনো আধঘণ্টা বাকি। কিন্তু এর মধ্যেই চারদিক জনশূন্য। লোকজন যার যার বাড়ি ফিরে গেছে। বাকি রাতটায় আর ঘর থেকে বেরুবে না। ইদ্রিস মিয়া তার দোকান বন্ধ করার জন্যে উঠে দাঁড়াল। রোজ শেষমুহূর্তে কিছু বিক্রিবাটা হয়। আজ হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না কে জানে! অন্ধকার দেখে সবাই ভাবছে বোধহয় কার্ফুর সময় হয়ে গেছে। সময় না হলেও কিছু যায় আসে না। আজকাল সবাই অন্ধকারকে ভয় পায়। ইদ্রিস মিয়া দোকানের তালা লাগাবার সময় লক্ষ করল—গলির ভেতরে লম্বা একটি ছেলে ঢুকছে। তার হাতে কয়েকটা পত্রিকা। হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে বাসার নম্বর পড়তে পড়তে আসছে। ইদ্রিস মিয়ার দোকানের সামনে এসে সে থমকে দাঁড়াল। ইদ্রিস মিয়া বলল, আপনে কি মতিন সাহেবের বাড়ি খুঁজছেন ?

ছেলেটি তাকাল বিস্মিত হয়ে। কিছু বলল না। ইদ্রিস বাড়ি দেখিয়ে দিল। নিচু গলায় বলল, লোহার গেইট আছে। গেইটের কাছে একটা নারকেল গাছ। তাড়াতাড়ি যান। ছ'টার সময় কার্ফু।

ইদ্রিস মিয়া হনহন করে হাঁটতে লাগল। একবারও পিছনে ফিরে তাকাল না। ছেলেটি তাকিয়ে রইল ইদ্রিস মিয়ার দিকে। লোকটি ছোটখাটো। প্রায় দৌড়াচ্ছে। সে নিশ্চয়ই অনেকখানি দূরে থাকে। ছ'টার আগে তাকে পৌঁছতে হবে।

ছেলেটি এগিয়ে গেল। লোহার গেইটের বাড়িটির সামনে দাঁড়াল। নারকেল গাছ দু'টি ঝুঁকে আছে রাস্তার দিকে। প্রচুর নারকেল হয়েছে। ফলের ভারে যেন গাছ হেলে আছে। দেখতে বড় ভালো লাগে। ছেলেটি গেটে টোকা দিয়ে ভারী গলায় ডাকল, মতিন সাহেব, মতিনউদ্দিন সাহেব। বয়সের তুলনায় তার গলা ভারী। ছেলেটির নাম বদিউল আলম। তিন মাস পর সে এই প্রথম ঢুকেছে ঢাকা শহরে।

জুলাই মাসের ছ'তারিখ। বুধবার। উনিশ শো একাত্তর সন। একটি ভয়াবহ বছর। পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর কঠিন মুঠির ভেতরে একটি অসহায় শহর। শহরের অসহায় মানুষ। চারদিকে সীমাহীন অন্ধকার। সীমাহীন ক্লান্তি। দীর্ঘ দিবস এবং দীর্ঘ রজনী।

বদিউল আলম গেট ধরে দাঁড়িয়েছে। সে শহরে ঢুকেছে সাতজনের একটি ছোট দল নিয়ে। শহরে গেরিলা অপারেশন চালানোর দায়িত্ব তার। ছেলেটি রোগা। চশমায় ঢাকা বড় বড় চোখ। গায়ে হালকা নীল রঙের হাওয়াই শার্ট। সে একটি রুমাল বের করে কপাল মুছে দ্বিতীয়বার ডাকল, মতিন সাহেব! মতিন সাহেব!

মতিন সাহেব দরজা খুলে বের হলেন। দীর্ঘ সময় অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ছেলেটির দিকে। এ তো নিতান্তই বাচ্চাছেলে। এরই কি আসার কথা ?

আমার নাম বদিউল আলম।

আসো বাবা, ভেতরে আসো।

এই সামান্য কথা বলতে গিয়ে মতিন সাহেবের গলা ধরে গেল। চোখ ভিজে উঠল। এত আনন্দ হচ্ছে! তিনি চাপাস্বরে বললেন, কেমন আছ তুমি ?

ভালো আছি।

সঙ্গে জিনিসপত্র কিছু নেই ?

না।

বলো কী!

সুরমা দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। পর্দা সরিয়ে তাকিয়ে আছেন। মতিন সাহেব বললেন, আসো, ভেতরে আসো। দাঁড়িয়ে আছ কেন ?

গেটটা বন্ধ। গেট খুলুন।

ও আচ্ছা আচ্ছা।

মতিন সাহেব সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। সাড়ে পাঁচটার দিকে গেটে তালা দিয়ে দেওয়া হয়। চাবি থাকে সুরমার কাছে। সুরমা আঁচল থেকে চাবি বের করলেন।

গেটে তালা দিয়ে রাখি। আগে দিতাম না। এখন দেই। অবশ্যি চুরি-ডাকাতির ভয়ে না। চুরি-ডাকাতি কমে গেছে। চোর-ডাকাতরা এখন কীভাবে বেঁচে আছে কে জানে! বোধহয় কষ্টে আছে।

বদিউল আলম বসবার ঘরে ঢুকল। মতিন সাহেবের মনে হলো, এই ছেলেটির কোনোদিকেই কোনো উৎসাহ নেই। সোফাতে বসে আছে কিন্তু কোনো কিছু দেখছে না। বসার ভঙ্গির মধ্যেই গা-ছেড়ে-দেওয়া ভাব আছে। মতিন সাহেব নিজের মনের কথা বলে যেতে লাগলেন।

কয়েকদিন ধরে আমরা স্বামী-স্ত্রী আছি এই বাড়িতে। আমাদের দুই মেয়ে আছে—রাত্রি আর অপালা। ওরা তাদের ফুফুর বাড়িতে। সোমবারে আসবে। ওদের ফুফু, মানে আমার বোনের কোনো ছেলেপুলে নেই। মাঝে-মধ্যে রাত্রি আর অপালাকে নিয়ে যায়। ওরাও তাদের ফুফুর খুব ভক্ত। খুবই ভক্ত।

বদিউল আলম কিছু বলল না। তাকিয়ে রইল। মতিন সাহেব খানিকটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। গলা পরিষ্কার করে বললেন, অবস্থা কী বলো শুনি।

কিসের অবস্থা ?

তোমরা যেখানে ছিলে সেখানকার অবস্থা।

ভালোই।

আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। বাঘের পেটের ভেতর আছি। কাজেই বাঘটা কী করছে না করছে বোঝার উপায় নেই। বাঘ মারা না পড়া পর্যন্ত কিছুই বুঝব না। মারা পড়ার পরই পেট থেকে বের হব।

মতিন সাহেবের এটা একটা প্রিয় ডায়ালগ। সুযোগ পেলেই এটা ব্যবহার করেন। শ্রোতারা তখন বেশ উৎসাহী হয়ে তাকায়। কয়েকজন বলেই ফেলে, ভালো বলেছেন। কিন্তু এবারে সেরকম কিছু হলো না। মতিন সাহেবের ভয় হলো ছেলেটা হয়তো শুনছেই না।

তুমি হাতমুখ ধুয়ে আসো। চায়ের ব্যবস্থা করছি।

চা খাব না। ভাতের ব্যবস্থা করুন, যদি অসুবিধা না হয়।

না না, অসুবিধা কিসের ? কোনো অসুবিধা নেই। খাবার-টাবার গরম করতে বলে দেই।

গরম করবার দরকার নেই। যেমন আছে দিন।

মতিন সাহেব অপ্রস্তুত হয়ে উঠে গেলেন। একজন ক্ষুধার্ত মানুষের সঙ্গে এতক্ষণ ধরে বকবক করছিলেন। খুব অন্যায়। খুবই অন্যায়।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, ছেলেটির প্রসঙ্গে সুরমা কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। যেন দেখবার পর তাঁর সব কৌতূহল মিটে গেছে। ভাত খাওয়ার সময় নিজেই দু'একটা কথা বললেন। যেমন একবার বললেন, তুমি মনে হচ্ছে ঝাল কম খাও। ছেলেটি তার জবাবে অন্য এক রকম ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। দ্বিতীয়বারে বললেন, ছোট মাছ তুমি খেতে পারছ না দেখি। আস্তে আস্তে খাও, আমি একটা ডিম ভেজে নিয়ে আসি।

ছেলেটি এই কথায় খাওয়া বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইল। ভাজা ডিমের জন্যে প্রতীক্ষা। ব্যাপারটা মতিন সাহেবের বেশ মজার মনে হলো। সাধারণত এই পরিস্থিতিতে সবাই বলে—না না, লাগবে না। লাগবে না।

খাওয়াদাওয়া শেষ হতেই বদিউল আলম বলল, আমাকে শোবার জায়গা দেখিয়ে দিন। মতিন সাহেব বললেন, এখনই শোবে কী ? বসো, কথাবার্তা বলি। স্বাধীন বাংলা বেতার শুনবে না ?

জি-না। স্বাধীন বাংলা বেতার শুনবার আমার কোনো আগ্রহ নেই।

বলো কী তুমি! কখনো শোনো না ?

শুনেছি মাঝে মাঝে।

তিনি খুবই ক্ষুণ্ন হলেন। ছেলেটি স্বাধীন বাংলা বেতার শোনে না সে-কারণে নয়। ক্ষুণ্ন হলেন কারণ খাওয়া শেষ করেই সে একটা সিগারেট ধরিয়েছে। বলতে গেলে এ তার ছেলের বয়েসী। একজন বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষের সামনে এরকম ফট করে সিগারেট ধরানো ঠিক না। তাছাড়া ছেলেটি দু'বার কথার মধ্যে তাঁকে বলেছে 'মতিন সাহেব'। এ কী কাণ্ড! 'চাচা' বলবে। যদি বলতে খারাপই লাগে কিছু বলবে না। কিন্তু মতিন সাহেব বলবে কেন ? তিনি কি তার ইয়ার দোস্তদের কেউ ? এ কেমন ব্যবহার ?

ঘর ঠিকঠাক করলেন সুরমা। রাত্রি ও অপালার পাশের ছোট ঘরটায় ব্যবস্থা হলো। বিন্তির ঘর। বিন্তি ঘুমুবে বারান্দায়। এ ঘরটা ভাঁড়ার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পরিষ্কার করতে সময় লাগল। তবু পুরোপুরি পরিষ্কার হলো না। চৌকির নিচে রসুন ও

পেঁয়াজ। বস্তাভর্তি চাল-ডাল। এসব থেকে কেমন একটা টকটক গন্ধ ছড়াচ্ছে। সুরমা বললেন, তুমি এ ঘরে ঘুমুতে পারবে তো ? না পারলে বলো আমি বসার ঘরে ব্যবস্থা করে দেই। একটা ক্যাম্প খাট আছে। পেতে দিব।

লাগবে না।

বাথরুম কোথায় দেখে যাও।

বদিউল আলম বাথরুম দেখে এল।

কোনো কিছুর দরকার হলে আমাকে ডাকবে।

আমার কোনো কিছুর দরকার হবে না।

সুরমা চৌকির একপ্রান্তে বসলেন। বসার ভঙ্গিটা কঠিন। বদিউল আলম কৌতূহলী হয়ে তাঁকে দেখল।

আপনি কি আমাকে কিছু বলতে চান ?

হ্যাঁ।

বলুন।

তুমি কে আমি জানি না। কোত্থেকে এসেছ তাও জানি না। কিন্তু কী জন্যে এসেছ তা আন্দাজ করতে পারি।

আন্দাজ করবার দরকার নেই। আমি বলছি কী জন্যে এসেছি। আপনাকে বলতে আমার কোনো অসুবিধা নেই।

তোমার কিছু বলার দরকার নেই। আমি তোমাকে কী বলছি সেটা মন দিয়ে শোনো।

বলুন।

তুমি সকালে উঠে এখান থেকে চলে যাবে।

ছেলেটি কিছু বলল না। তাঁর দিকে তাকালও না।

দুটি মেয়ে নিয়ে আমি এখানে থাকি। কোনোরকম ঝামেলার মধ্যে আমি জড়াতে চাই না। রাত্রির বাবা আমাকে না জিজ্ঞেস করে এসব করেছে। তুমি কি বুঝতে পারছ আমি কী বলতে চাচ্ছি ?

পারছি।

তুমি কাল সকালে চলে যাবে।

কাল সকালে যাওয়া সম্ভব না। সবকিছু আগে থেকে ঠিকঠাক করা। মাঝখান থেকে হুট করে কিছু বদলানো যাবে না। আমি এক সপ্তাহ এখানে থাকব। আমার সঙ্গে যারা যোগাযোগ করবে তারা এই ঠিকানাই জানে।

সুরমা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। কী রকম উদ্ধত ভঙ্গিতে সে কথা বলছে। এ কী কাণ্ড!

তোমার জন্যে আমি আমার মেয়েগুলিকে নিয়ে বিপদে পড়ব ? এসব তুমি কী বলছ ?

বিপদে পড়বেন কেন ? বিপদে পড়বেন না। এক সপ্তাহের মধ্যে আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে। এর পরেরবার আমি এখানে উঠব না। আর আপনার মেয়েরা তাদের ফুফুর বাড়িতে থাকুক। এক সপ্তাহ পর আসবে।

তুমি থাকবেই ?

হ্যাঁ। অবশ্যি আপনি যদি ভয় দেখান আমাকে ধরিয়ে দেবেন, সেটা অন্য কথা। তা দেবেন না সেটা বুঝতে পারছি।

সুরমা উঠে দাঁড়ালেন। যে ছেলেটিকে এতক্ষণ লাজুক এবং বিনীত মনে হচ্ছিল এখন তাকে দুর্বিনীত অভদ্র একটি ছেলের মতো লাগছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, ছেলেটির এই রূপটিই তার ভালো লাগল। কেন লাগল তিনি বুঝতে পারলেন না।

আলম।

বলুন।

ঢাকা শহরে কি তোমার বাবা-মা থাকেন ?

হ্যাঁ থাকেন।

কোথায় থাকেন ?

শহরেই থাকেন।

বলতে কি তোমার অসুবিধা আছে ?

হ্যাঁ আছে।

তুমি এক সপ্তাহ থাকবে ?

হ্যাঁ।

সুরমা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। ঘন অন্ধকারে নগরী ডুবে গেল। ঝুম বৃষ্টি নামল। সুরমা লক্ষ করলেন, ছেলেটি বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। লাল আগুনের ফুলকি ওঠানামা করছে।

মতিন সাহেব শোবার ঘরে ট্রানজিস্টার কানে লাগিয়ে বসে আছেন। 'চরমপত্র' শোনা হচ্ছে। এটি তাঁকে দেখে যে-কেউ বলে দিতে পারবে। তিনি তীব্রকণ্ঠে কিছুক্ষণ পরপরই বলছেন, 'মার লেংগী'। 'মার লেংগী' শব্দটি তার নিজের তৈরি করা। একমাত্র 'চরমপত্র' শোনার সময়ই তিনি এটা বলে থাকেন।

সুরমা মোমবাতি নিয়ে ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, কুমিল্লা সেক্টরে তো অবস্থা কেরোসিন করে দিয়েছে। লেংগী মেরে দিয়েছে। বলেই খেয়াল হলো এই জাতীয় কথাবার্তা সুরমা সহ্য করতে পারে না। তিনি আশঙ্কা করতে লাগলেন সুরমা কড়া কিছু বলবে। কিন্তু সে কিছু বলল না।

সুরমা যথেষ্ট সংযত আচরণ করছে বলে তাঁর ধারণা। এখনো ছেলেটিকে নিয়ে কোনো হৈচৈ করেনি। প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেছে। কাজেই আশা করা যায় বাকিগুলিও কাটবে। অবশ্যি ছেলের আসল পরিচয় জানলে কী হবে বলা যাচ্ছে না। প্রয়োজন না হলে পরিচয় দেওয়ারই বা দরকার কী। কোনো দরকার নেই।

স্বাধীন বাংলা থেকে দেশাত্মবোধক গান হচ্ছে। তিনি গানের তালে তালে পা ঠুকতে লাগলেন—'ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা। আমাদের এই বসুন্ধরা।' তার চোখ ভিজে উঠল। এইসব গান আগে কতবার শুনেছেন, কখনো এরকম হয়নি। এখন যতবার শোনেন চোখ ভিজে ওঠে। বুক হু-হু করে।

রেডিওটা কান থেকে নামাও।

মতিন সাহেব ট্রানজিস্টারটা বিছানার ওপর রাখলেন। নিজে থেকে কোনো প্রশ্ন করতে সাহসে কুলাচ্ছে না। সুরমা বললেন, কাল তুমি তোমার বোনের বাসায় গিয়ে বলে আসবে রাত্রি এবং অপালা যেন এক সপ্তাহ এখানে না আসে।

কেন ?

তোমাকে বলতে বলছি, তুমি বলবে। ব্যস। এই মাসটা ওরা সেখানেই থাকুক।

আচ্ছা বলব।

আরেকটা কথা।

বলো।

ভবিষ্যতে কখনো আমাকে জিজ্ঞেস না করে কিছু করবে না।

আচ্ছা। এক কাপ চা খাওয়াবে ?

এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে সুরমাকে সামনে থেকে সরিয়ে দেওয়া। সে বসে থাকা মানেই স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে বঞ্চিত হওয়া।

রাত দশটায় 'ভয়েস অব আমেরিকা' থেকেও একটা ভালো খবর পাওয়া গেল। পূর্ব রণাঙ্গনে বিদ্রোহী সৈন্য এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ভেতর খণ্ডযুদ্ধ হয়েছে বলে অসমর্থিত খবরে জানা গেছে। তবে পূর্ব পাকিস্তানের সকল ছোট-বড় শহর পাকিস্তানি বাহিনীর পূর্ণনিয়ন্ত্রণে আছে। আমেরিকান দু'জন সিনেটর ওই অঞ্চলে ব্যাপক প্রাণহানির খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সঙ্কট নিরসনের জন্যে আশু পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে তাঁরা মনে করেন।

ভালো খবর হচ্ছে পূর্ব রণাঙ্গনে খণ্ডযুদ্ধ। আমেরিকানদের খবর। এরা তো আর না জেনেশুনে কিছু বলছে না। জেনেশুনেই বলছে। রাত্রি নেই, সে থাকলে এসব খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারতেন। টেলিফোনটাও নষ্ট হয়ে আছে। ঠিক থাকলে ইশারা-ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করা যেত—সে ভয়েস অব আমেরিকা শুনেছে কি না।

মতিন সাহেব রেডিও পিকিং ধরতে চেষ্টা করতে লাগলেন। পাশাপাশি অনেকগুলি জায়গায় 'চ্যাং চ্যাং চিন মিন' শব্দ হচ্ছে। এর কোনো একটি রেডিও পিকিংয়ের এক্সটারনাল সার্ভিস। কোনটা কে জানে! রাত এগারোটায় রেডিও অস্ট্রেলিয়া। মাঝে মাঝে রেডিও অস্ট্রেলিয়া খুব পরিষ্কার ধরা যায়। তারা ভালো ভালো খবর দেয়।

তিনি নব ঘোরাতে লাগলেন খুব সাবধানে। তাঁর মন বেশ খারাপ। বিবিসির খবর শুনতে পারেননি। খুব ডিসটারবেন্স ছিল। একটা ভালো ট্রানজিস্টার কেনা খুবই দরকার।

রাত সাড়ে দশটায় ইলেকট্রিসিটি এল। সুরমা লক্ষ করলেন ছেলেটি বারান্দায় রাখা চেয়ারটায় বসে আছে। সারাটা সময় কি এখানেই বসে ছিল ? না ঘুমিয়ে পড়েছে বসে থাকতে থাকতে ? তিনি এগিয়ে গেলেন। না, ঘুমায়নি। জেগেই আছে। চোখে চশমা নেই বলে অন্যরকম লাগছে।

আলম, তোমার কি ঘুম আসছে না ?

জি-না।

গরম দুধ বানিয়ে দেব এক গ্লাস ? গরম দুধ খেলে ঘুম আসে।

দিন।

সুরমা দুধের গ্লাস নিয়ে এসে দেখেন ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে ডেকে তুলতে তাঁর মায়া লাগল। তিনি বারান্দায় বাতি নিভিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে।

আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। একটি দুটি করে তারা ফুটতে শুরু করেছে।

২

সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে একটি অচেনা বাড়িতে দু'দিন কেটে গেল। দু'দিন এবং তিনটি দীর্ঘ রাত। আজ হচ্ছে তৃতীয় দিনের সকাল। আলম পা ঝুলিয়ে খাটে বসে আছে। কাজের মেয়েটি এক কাপ চা দিয়ে গেছে। সে চায়ে চুমুক দেয়নি। ইচ্ছে করছে না। অস্থির লাগছে। পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধটা সহ্য হচ্ছে না। সূক্ষ্ম যন্ত্রণা হচ্ছে মাথায়। এই যন্ত্রণার উৎস নিশ্চয়ই পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ নয়। সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার জন্যেই এরকম হচ্ছে। দম আটকে আসছে।

কথা ছিল সাদেক তার সঙ্গে যোগাযোগ করবে যেদিন সে ঢাকা এসে পৌঁছেছে তার পরদিনই। যোগাযোগটা হওয়ার কথা কিন্তু এখনো সাদেকের কোনো খোঁজ নেই। ধরা পড়ে গেল নাকি ? দলের একজন ধরা পড়ার অর্থ হচ্ছে প্রায় সবারই ধরা পড়ে যাওয়া। এ কারণেই কেউ কারও ঠিকানা জানে না। কাজের সময়ই সবাই একত্র হবে, তারপর আবার ছড়িয়ে পড়বে। ঝিকাতলার একটি বাসায় কনটাক্ট পয়েন্ট। সেখানেও যাওয়ার হুকুম নেই। নিতান্ত জরুরি না হলে কেউ সেখানে যাবে না।

সবার দায়িত্ব ভাগাভাগি করা আছে। মালমশলা জায়গামতো পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব রহমানের। সেগুলি নিশ্চয় পৌঁছে গেছে। রহমান অসাধ্য সাধন করতে পারে। রহমানকে যদি বলা হয়—রহমান, তুমি যাও তো, সিংহের লেজটা দিয়ে কান চুলকে আসো। সে তা পারবে। সিংহ সেটা বুঝতেও পারবে না। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে—রহমান অসম্ভব ভীতু ধরনের ছেলে। এ জাতীয় দলে ভীতু ছেলেপুলে রাখাটা ঠিক না। কিন্তু রহমানকে রাখতে হয়েছে।

আলম খাট থেকে নামল। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে চায়ে চুমুক দিল। ঠান্ডা চা। সর পড়ে গিয়েছে। ঠান্ডার জন্যেই মিষ্টি বেশি লাগছে। বমি বমি ভাব এসে গেছে। সে আবার বিছানায় গিয়ে বসল। কিছু করবার নেই। এ বাড়ির ভদ্রমহিলা গতকাল বিশাল এক

উপন্যাস দিয়ে গেছেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'প্রথম কদম ফুল'। প্রেমের উপন্যাস। প্রেম নিয়ে কেউ এতবড় একটা উপন্যাস ফাঁদতে পারে ভাবাই যায় না। কাকলী নামের একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে একটি ছেলের। এরকমই গল্প। কোনো সমস্যা নেই, কোনো ঝামেলা নেই—সুখের গল্প। পড়তে ভালো লাগছে না। তবু ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়া হয়েছে। আবার বইটি নিয়ে বসবে কি না আলম মনস্থির করতে পারল না।

পাশের ঘর থেকে সেলাই মেশিনের খটাং খটাং শব্দ হচ্ছে। মেশিন চলছে তো চলছেই। রাতদিন এই মহিলা কী এত সেলাই করেন কে জানে! ক্লান্তি বলেও তো একটা জিনিস মানুষের আছে। খট খট খটাং, খট খট খটাং, চলছে তো চলছেই। গতকাল রাত এগারোটা পর্যন্ত এই কাণ্ড।

আলম হাত বাড়িয়ে 'প্রথম কদম ফুল' টেনে নিল। ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠা খুঁজে বের করতে ইচ্ছা করছে না। যে-কোনো একটা জায়গা থেকে পড়তে শুরু করলেই হয়। তার আগে একবার বাথরুমে যেতে পারলে ভালো হতো। এটা একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার। দুটি বাথরুম এ বাড়িতে। একটি অনেকটা দূরে, সার্ভেন্টস বাথরুম। অন্যটি এদের শোবার ঘরের পাশে। পুরোপুরি মেয়েলি ধরনের বাথরুম। ঝকঝক তকতক করছে। ঢুকলেই এয়ার ফ্রেশনারের মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায়। বিশাল একটি আয়না। আয়নার নিচেই মেয়েলি সাজসজ্জার জিনিস। চমৎকার করে গোছানো। আয়নার ঠিক উল্টোদিকে একটি জলরঙ ছবি ফ্রেমে বাঁধানো। গামছা পরা দুটি বালিকা নদীতে নামছে। চমৎকার ছবি। আয়নার ভেতর দিয়ে এই ছবিটি দেখতে বড় ভালো লাগে। এ জাতীয় একটি বাথরুম বাইরের অজানা-অচেনা এক মানুষের জন্যে নয়।

আলম বই নামিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আর ঠিক তখনই সেলাই মেশিনের শব্দ থেমে গেল। সে এই ব্যাপারটি আগেও লক্ষ করেছে। ঘর থেকে বেরুলেই ভদ্রমহিলা সেলাই থামিয়ে অপেক্ষা করেন। কীভাবে তিনি যেন টের পেয়ে যান। আলম বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই সুরমা বেরিয়ে এলেন। তাঁর চোখে বুড়োদের মতো একটা চশমা। মাথায় ঘোমটা দেওয়া। এটিও আলম লক্ষ করেছে—ভদ্রমহিলা মাথায় সবসময় কাপড় দিয়ে রাখেন। হেড মিসট্রেস হেড মিসট্রেস মনে হয় সে-কারণেই।

সুরমা বললেন, তোমার কিছু লাগবে ?

না, কিছু লাগবে না।

লাগলে বলবে। লজ্জা করবে না।

জি, আমি বলব।

আমাদের টেলিফোন ঠিক হয়েছে। তুমি যদি কাউকে ফোন করতে চাও বা তোমার বাসায় খবর দিতে চাও দিতে পার।

না, আমার কাউকে খবর দেওয়ার দরকার নেই।

সারাক্ষণ ওই ঘরটায় বসে থাকো কেন ? বসার ঘরে এসে বসতে পার। বারান্দায় যেতে পার।

আলম চুপ করে রইল। সুরমা বললেন, তুমি তো কোনো জামাকাপড় নিয়ে আসোনি। রাত্রির বাবাকে বলেছি তোমার জন্যে শার্ট নিয়ে আসবে। ও তোমার জন্যে কিছু টাকাও রেখে গেছে। বাইরে-টাইরে যদি যেতে চাও তাহলে রিকশা ভাড়া নেবে।

আমার কাছে টাকা আছে।

তুমি কি কোথাও বেরুবে ?

দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করব। দুপুরের মধ্যে যদি কেউ না আসে তাহলে বেরুব।

কারও কি আসার কথা ?

হ্যাঁ।

তুমি যখন না থাকো তখন যদি সে আসে তাহলে কি কিছু বলতে হবে ?

না, কিছু বলতে হবে না। সে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।

সুরমা ভেতরে চলে গেলেন। আবার সেলাই মেশিনের খট খট শব্দ হতে লাগল। ভদ্রমহিলার মাথা ঠিক নেই বোধহয়। কোনো সুস্থ মানুষ দিনরাত একটা মেশিন নিয়ে খট খট করতে পারে না। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। অবশ্যি এখন সময়টাই অস্বাভাবিক। সেজন্যেই বোধহয় চমৎকার এই সকালটাকে মানাচ্ছে না। দূর্বাঘাসের ওপর সুন্দর রোদ। বাতাসে সবুজ ঘাস কাঁপছে, রোদও কাঁপছে। অস্বাভাবিক এই বন্দি শহরে এটাকে কিছুতেই মানানো যাচ্ছে না। আলম সিগারেট ধরাল। বিন্তি মেয়েটি নারকেল গাছের নিচে পা ছড়িয়ে বসে আছে। তার মুখ হাসি হাসি। এই মেয়েটি কি সবসময়ই হাসে ? এত সুখী কেন সে ?

দুপুর তিনটায় আকাশ মেঘলা হয়ে গেল। বাতাস হলো আর্দ্র। দূরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে বোধহয়। আলম গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে। মেঘের গতিপ্রকৃতি বোঝার চেষ্টা হয়তো। কতক্ষণে বৃষ্টি নামবে আঁচ করা। বিন্তি বলল, কই যান ?

কাছেই।

পাঁচটার আগে আইবেন কিন্তু। 'কারপু' আছে।

আসব, পাঁচটার আগেই আসব।

পানওয়ালা ইদ্রিস মিয়াও দেখল ছেলেটি মাথা নিচু করে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছে। সেও তাকিয়ে রইল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। রাস্তাঘাটে লোক চলাচল কম। অল্প যে ক'জন দেখা যায় তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে, দু'একটা কথা বলবার জন্যে মন চায়। ইদ্রিস মিয়া কোনো কথা বলল না। সে আজ চোখে সুরমা দিয়েছে, সে জন্যে বোধহয় চোখ কড়কড় করছে। কিংবা হয়তো চোখ উঠবে। চোখ-ওঠা রোগ হয়েছে। চারদিকে সবার চোখ উঠছে।

আলম হাঁটতে হাঁটতে বলাকা সিনেমাহলের সামনে এসে দাঁড়াল। ঢাকা শহরে প্রচুর আর্মির চলাচল বলে যে কথাটা সে শুনেছিল, সেটা ঠিক নয়। আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে সে একটামাত্র ট্রাক যেতে দেখেছে। সেই ট্রাকে ছাইরঙা পোশাক পরা একদল মিলিশিয়া বসে আছে। সাধারণত ট্রাকে সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এরা বসে আছে কেন ? ক্লান্ত ?

চোখে পড়ার মতো পরিবর্তন কী কী হয়েছে এই শহরে ? আলম ঠিক বুঝতে পারল না। সে সম্ভবত আগে কখনো এ শহরকে ভালোভাবে লক্ষ করেনি। প্রয়োজন মনে করেনি। এখন কেন জানি ইচ্ছা করছে আগের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে। চারদিক কেমন যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মনে হচ্ছে। পুরনো বইপত্রের হকাররা যে জায়গাটা দখল করে থাকত সেটা খালি। একটি অন্ধ ভিখিরি টিনের মগ নিয়ে বসে আছে। একে ছাড়া অন্যকোনো ভিখিরি চোখে পড়ে না। সব ভিখিরিকে কি এরা মেরে শেষ করে দিয়েছে ? দিয়েছে হয়তো।

রিকশায় কিছু বোরকা পরা মহিলা দেখা গেল। মেয়েরা কি আজকাল বোরকা ছাড়া রাস্তায় নামছে না ? কিছু কিছু রিকশায় ছোট ছোট পাকিস্তানি ফ্ল্যাগ। চাঁদ-তারা আঁকা এই ফ্ল্যাগের বাজার এখন নিশ্চয়ই জমজমাট। যেখানে-সেখানে এই ফ্ল্যাগ উড়ছে। এর মধ্যে একটি প্রতিযোগিতার ভাবও আছে। কার পতাকাটি কত বড়। লাল রঙের তিনকোণা একধরনের পতাকাও দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে কী-সব আরবি লেখা। লেখাগুলি তুলে ফেললেই এটা হয়ে যাবে মে দিবসের পতাকা।

আলম একটা রিকশা নিল। বুড়ো রিকশাওয়ালা। ভারী রিকশা টানতে কষ্ট হচ্ছে, তবু প্যাডল করছে প্রাণপণে। সায়েন্স ল্যাবরেটরির মোড়ে একটা বরযাত্রীর দল দেখা গেল। নতুন বর বিয়ে করে ফিরছে। বিশাল একটা সাদা গাড়ি মালা দিয়ে সাজানো। ট্রাফিক সিগন্যালে আটকে পড়ায় গাড়ি থেমে আছে। আশেপাশের সবাই কৌতূহলী হয়ে দেখতে চেষ্টা করছে বর-বউকে। আলমের মনে হলো—দেশ যখন স্বাধীন হবে তখন কি এই ছেলেটি একটু লজ্জিত বোধ করবে না ? যখন তার যুদ্ধে যাওয়ার কথা তখন সে গিয়েছে বিয়ে করতে। আজ রাতে সে কি সত্যি সত্যি কোনো ভালোবাসার কথা এই মেয়েটিকে বলতে পারবে ?

সিগন্যাল পেরিয়ে বরের গাড়ি চলতে শুরু করেছে। বর একটা রুমালে মুখ ঢেকে রেখেছে। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর সাধারণত বররা রুমালে মুখ ঢাকে না। এই ছেলেটি ঢাকছে কেন ? সে কি নিজেকে লুকাতে চেষ্টা করছে ? দুঃসময়ে বিয়ে করে ফেলায় সে কি খানিকটা লজ্জিত ?

জুন মাসে ইয়াদনগরে নদী পার হওয়ার সময় এরকম একটা বরযাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। দশ-বারোজনের একটা দল। দু'টি নৌকায় বসে আছে। সবার চেহারাই কেমন অস্বাভাবিক। জবুথবু হয়ে বসে আছে। বর ছেলেটি শুটকো মতো। তাকে লাগছে উদ্‌ভ্রান্তের মতো। এরা লগিতে নৌকা বেঁধে বসে আছে চুপচাপ। আলমদের দলে ছিল রহমান। সে সবসময়ই বেশি কথা বলে। বরযাত্রী দেখে হাসিমুখে বলল, কি, বিয়ে করতে যান ? সাবধানে যাবেন। লঞ্চে করে মিলিটারি চলাচল করছে। ঘনঘন 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলবেন। নওশাকে পাগড়ি পরিয়ে নৌকার গলুইয়ে বসিয়ে রাখলে কেউ কিছু বলবে না। বরযাত্রী দল থেকে কেউ একটি কথাও বলল না। একজন বুড়ো শুধু বিড়বিড় করতে লাগল। বর ছেলেটি কর্কশ গলায় তাকে ধমক দিল—চুপ করেন! অত্যন্ত রহস্যময় ব্যাপার।

কিছুক্ষণের মধ্যে জানা গেল, এরা কনে নিয়ে ফিরছিল। বড় নদী ছেড়ে ছোট নদীতে ঢোকার সময় মিলিটারিদের একটা লঞ্চ এদের থামায়, কনে এবং কনের ছোটবোনকে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়। ছোট বোনটির বয়স এগারো।

আলম বলল, আপনারা কিছুই বললেন না ?

কেউ কোনো উত্তর দিল না। রহমান বলল, খামোকা এইখানে নৌকা থামিয়ে বসে আছেন কেন ? বাড়ি চলে যান। তারপর আবার ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। বাংলাদেশে কি মেয়ের অভাব আছে ? অভাব নাই।

লোকগুলি শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। যেন কারও কোনো কথাই তাদের মাথায় ঢুকছে না।

আলম ঝিকাতলায় পৌঁছল বিকেল চারটায়। বৃষ্টি পড়ছে টিপটিপ করে। আকাশ মেঘে মেঘে কালো। অন্ধকার হয়ে এসেছে। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাড়ি খুঁজতে হবে। খুঁজে পাওয়া যাবে কি না কে জানে। সময় অল্প, কার্ফুর আগেই ফিরতে হবে।

বাড়ি খুঁজে পাওয়া গেল সহজেই। ঝিকাতলা ট্যানারীর ঠিক সামনে ৩৩ নম্বর বাড়ি। দোতলা-দালানের উপরের তলায় থাকেন নজিবুল ইসলাম আখন্দ। কনট্যাক্ট পয়েন্ট।

দোতলায় উঠে আলমের বিস্ময়ের সীমা রইল না। বিশাল এক তালা ঝুলছে বাড়িতে। দরজা-জানালা সবই বন্ধ। তালার সাইজ দেখেই মনে হচ্ছে এ বাড়ির বাসিন্দারা দীর্ঘদিনের জন্যে বাইরে গেছে এবং সম্ভবত আর ফিরবে না।

একতলায় অনেক ধাক্কাধাক্কি করবার পর দরজা একটুখানি খুলল। ভয়ে সাদা হয়ে যাওয়া একটি মেয়ে বলল, কাকে চান ?

আখন্দ সাহেবকে। নজিবুল ইসলাম আখন্দ।

উনি দোতলায় থাকেন। এখন নাই।

কোথায় গেছেন ?

দেশের বাড়িতে।

ছেলেমেয়ে সবাইকে নিয়ে গেছেন।

হ্যাঁ।

কবে গেছেন ?

তিনদিন আগে। উনার ছোট ভাই মারা গেছে দেশের বাড়িতে।

ও আচ্ছা।

মেয়েটি দরজা বন্ধ করে দিল। এ তো একটা সমস্যায় পড়া গেল। আলম শুকনো মুখে বের হয়ে এল। বাসায় ফিরল হেঁটে হেঁটে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি। এর মধ্যে হাঁটতে ভালোই লাগছে। তার সারাক্ষণই মনে হতে লাগল বাসায় পৌঁছে দেখবে সাদেক বিরক্তমুখে অপেক্ষা করছে। পরদিনই কাজে নেমে পড়া যাবে। কাজকর্ম ছাড়া চুপচাপ বসে থাকাটা আর সহ্য হচ্ছে না।

বারান্দায় উদ্বিগ্ন মুখে মতিন সাহেব দাঁড়িয়ে ছিলেন। আলমকে দেখেই বললেন, কাউকে কিছু না বলে কোথায় গিয়েছিলে ? আমি চিন্তায় অস্থির। একটু পরই কার্ফু শুরু হয়ে যাবে।

আলম সহজ স্বরে বলল, আমার কাছে কেউ এসেছিল ?

না, কেউ আসে নাই। ভিজতে ভিজতে এলে কোত্থেকে ? গিয়েছিলে কোথায় ?

আলম কোনো জবাব না দিয়ে বসার ঘরে ঢুকে পড়ল। বসার ঘরের সাজসজ্জার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। সোফা একপাশে সরিয়ে একটা ক্যাম্প খাট পাতা হয়েছে। ক্যাম্প খাটে অচিন্ত্যকুমারের 'প্রথম কদম ফুল'। তার মানে শোবার জায়গার বদল হয়েছে। মতিন সাহেব ইতস্তত করে বললেন, আমার মেয়েরা চলে এসেছে। কাজেই তোমাকে বসার ঘরে নিয়ে এলাম। তোমার অসুবিধা হবে না তো ?

না, অসুবিধা কিসের ?

আমার বড় মেয়ে একটু ইয়ে ধরনের, মানে...।

মতিন সাহেব কথা শেষ করলেন না, মাঝপথে থেমে গেলেন।

আলম বলল, আমার কোনো অসুবিধা নেই। আপনি চিন্তা করবেন না।

মতিন সাহেব নিচুগলায় বললেন, আলম, আরেকটা কথা—ইয়ে—মানে আমাদের আরেকটা বাথরুম যে আছে ওইটাতে তুমি যাবে। ওইটা আমি পরিষ্কার করেছি। মানে প্রবলেমটা তোমাকে বলি...প্রবলেমটা হলো...

আপনাকে প্রবলেম বলতে হবে না। আমার কোনো অসুবিধা নেই।

আলম সিগারেট ধরিয়ে ক্যাম্প খাটে বসল। মতিন সাহেব হা হা করে উঠলেন, ভেজা কাপড়ে বিছানায় বসছ কেন ? কাপড়-জামা ছাড়ো। আমি তোমার জন্যে শার্ট আর লুঙ্গি কিনেছি।

থ্যাংক য়্যু।

বারো-তেরো বছরের শান্ত চেহারার একটি মেয়ে উঁকি দিল। এর নামই বোধহয় অপালা। মতিন সাহেব বললেন, তোর আপাকে ডেকে আন, পরিচয় করিয়ে দেই।

মেয়েটি ভেতরে চলে গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এসে বলল, আপা আসবে না।

মতিন সাহেব খুব লজ্জায় পড়ে গেলেন।

আলম বলল, তোমার নাম অপালা ?

হ্যাঁ।

কেমন আছ অপালা ?

ভালো।

বসো।

না, আমি বসব না।

মেয়েটি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এরকম বাচ্চামেয়ের চোখ এত তীক্ষ্ণ কেন ? এদের চোখ হবে কোমল। আলম সিগারেট ধরাল। মেয়েটি এখনো তাকে মন দিয়ে লক্ষ করছে। কেন করছে কে জানে।

অপালা চোখ ফিরিয়ে নিল। শীতল গলায় বলল, আপনি 'প্রথম কদম ফুল' বইটার একটা পাতা ছিঁড়ে ফেলেছেন। বই ছিঁড়লে আমি খুব রাগ করি।

আর ছিঁড়ব না।

পাতাও মুড়বেন না। এটা আমার খুব প্রিয় বই।

আলম হেসে ফেলল।

৩

রাত্রি সারা দিন খুব গম্ভীর ছিল। সন্ধ্যার পর আরও গম্ভীর হয়ে পড়ল। পৌনে আটটা থেকে আটটা পর্যন্ত বিবিসি বাংলা খবর দেয়। সে খবর শুনবার জন্যেও তার কোনো আগ্রহ দেখা গেল না। সবাইকে বলল তার মাথা ধরেছে।

সুরমা অপালাকে জিজ্ঞেস করলেন, ওর কী হয়েছে ? অপালা গম্ভীর হয়ে বলল, ফুফুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। সুরমা খুবই অবাক হলেন। রাত্রি কারও সঙ্গে ঝগড়া করার মেয়ে নয়। সে সবকিছুই নিজের মনে চেপে রাখে। সুরমা বললেন, কী নিয়ে ঝগড়া হলো ?

জানি না কী নিয়ে। ফুফু ওকে আলাদা ডেকে নিল।

এতক্ষণ এই কথা বলিসনি কেন ?

মনে ছিল না।

মনে ছিল না মানে ?

আপা আমাকে কিছু বলতে মানা করেছে।

অপালা গল্পের বইয়ে মাথা ডুবিয়ে ফেলল। মার কোনো কথাই আসলে তার মাথায় ঢুকছে না। তার বিরক্ত লাগছে। কোনো একটা গল্পের বই শুরু করলে অন্য কিছু তার আর ভালো লাগে না। যে গল্পের বইটি সে নিয়ে বসেছে তার নাম 'আলোর পিপাসা'। এই বইটি সে আগেও বেশ কয়েকবার পড়েছে। প্রতিটি লাইন তার মনে আছে, তবু পড়তে ভালো লাগছে। অপালার বয়স তেরো। রোগা বলে তাকে বয়সের তুলনায় ছোট মনে হয়। এটা তার খুব খারাপ লাগে। তেরো বছর বয়সটা তার পছন্দ নয়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে তাদের যে প্রাইভেট মাস্টার ছিল তাকে একদিন সে বলেছে—স্যার, আমার বয়স পনের। বেশি বয়সে পড়ালেখা শুরু করেছি তো এইজন্যে ক্লাস এইটে পড়ি। ছোটরেলায় খুব অসুখবিসুখে ভুগতাম। পড়াশোনা শুরু করতে এইজন্যেই দেরি হয়ে গেল।

অপালার এ জাতীয় কথাবার্তা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় খুব ঝামেলা হয়েছিল। সুরমা শুধু বকাবকি করেই চুপ করে থাকেননি, চড় বসিয়ে দিয়েছিলেন। প্রাইভেট মাস্টারটিকে বদলে দিয়ে বুড়ো ধরনের একজন টিচার রাখলেন। এ জাতীয় ঝামেলা

অপালা প্রায়ই তৈরি করে। কয়েকদিন আগেই একটা হলো। কী-এক উপন্যাস পড়ে তার খুব ভালো লেগেছে। উপন্যাসের নায়িকার নাম মনিকা। সে মনিকা নাম কেটে সমস্ত বইতে নিজের নাম বসিয়েছে। এ নিয়েও মা ঝামেলা করেছেন। তিনি সাধারণত বই-টই পড়েন না। অপালা কেন নায়িকার নামের জায়গায় নিজের নাম বসিয়েছে সেটা জানবার জন্যেই বইটি পড়লেন এবং রাগে তাঁর গা জ্বলে গেল। কারণ উপন্যাসের নায়িকা মনিকা তিনটি ছেলেকে একসঙ্গে ভালোবাসে। ছেলেগুলি সুযোগ পেলেই তাকে জড়িয়ে ধরে। মনিকা কোনো বাধা দেয় না। এর মধ্যে একটি ছেলে বেশিরকম সাহসী। সে শুধু গায়ে হাত দিতে চায়। মনিকা তার এই স্বভাব সহ্যই করতে পারে না, তবু তাকেই সে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। ভয়াবহ ব্যাপার।

অপালাকে নিয়ে সুরমার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। তাকে তিনি চোখে চোখে রাখতে চান। নিজে স্কুলে দিয়ে আসেন এবং নিয়ে আসেন। এখন স্কুল বন্ধ বলে এই ঝামেলাটা করতে হচ্ছে না। কিন্তু ওর কোনো টেলিফোন এলে তিনি আড়াল থেকে কথাবার্তা শুনতে চেষ্টা করেন।

রাত্রিকে নিয়ে এরকম কোনো ঝামেলা হয়নি। রাত্রি যে বড় হয়েছে এটা সে কখনো কাউকেই বুঝতে দেয়নি। একবার শুধু খানিকটা অস্বাভাবিক আচরণ করেছিল। ইউনিভার্সিটিতে সেকেন্ড ইয়ারে যখন পড়ে তখনকার ঘটনা। গরমের ছুটি চলছে। সেসময় সকাল দশটায় এক ছেলে এসে উপস্থিত। সে নাকি রাত্রির সঙ্গে পড়ে। সেলিম নাম। সুরমা অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, রাত্রি কেমন অতিরিক্ত রকমের ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কথাবার্তা বলতে লাগল উঁচুগলায়। শব্দ করে হাসতে লাগল। এবং একসময় মাকে এসে বলল, মা, ওকে আজ দুপুরে খেতে বলি ? হলে থাকে, হলের খাবার খুব খারাপ। সুরমা ঠান্ডা গলায় বললেন, অজানা-অচেনা ছেলে দুপুরবেলায় এখানে খাবে কেন ? ওকে যেতে বল। রাত্রি ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, অচেনা ছেলে নয় তো মা। আমার সঙ্গে পড়ে।

সুরমা শক্ত গলায় বললেন, ক্লাসের ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার জন্যে দুপুরবেলায় বাসায় আসবে—এটা আমার পছন্দ নয়। ওকে যেতে বল।

এটা আমি কী করে বলব মা ?

যেভাবে বলার সেভাবে বলবি।

রাত্রি চোখমুখ লাল করে কথাটা বলতে গেল। এবং বলে এসে সমস্ত দিন কাঁদল। সুরমা কিছুই বললেন না। কারণ তিনি জানেন এই সাময়িক আবেগ কেটে যাবে। এখানে তাঁকে শক্ত হতেই হবে। ছেলেটিকে তিনি যদি খেতে বলতেন সে বারবার ঘুরে ঘুরে এ বাড়িতে আসত। রাত্রির মতো একটি মেয়ের সঙ্গে গল্প করার লোভ সামলানো কঠিন ব্যাপার। মেয়ে হয়েও সুরমা তা বুঝতে পারেন। বারবার আসা-যাওয়া থেকে একটা ঘনিষ্ঠতা হতো। এই বয়সের কাঁচা আবেগের ফল কখনো শুভ হয় না।

সুরমা ভেবে পেলেন না রাত্রি তার ফুফুর সঙ্গে কী নিয়ে ঝগড়া করবে! তার ফুফুকে সে খুবই পছন্দ করে। তাদের যে সম্পর্ক সেখানে ঝগড়া হওয়ার সুযোগ কোথায় ?

নাসিমাকে একটা টেলিফোন করা যেতে পারে, কিন্তু তার আগে রাত্রির সঙ্গে কথা বলা দরকার। কিন্তু রাত্রি কি কিছু বলবে ? সুরমা অস্বস্তি নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

রাত্রি চুল আঁচড়াচ্ছিল। মাকে দেখে অল্প হাসল। সুরমা মনে মনে ভাবলেন—এই মেয়েটি কি সত্যি আমার ? এমন মায়াবতী একটা মেয়ের জন্ম দেওয়ার মতো ভাগ্য আমার কী করে হয় ? সুরমা বললেন, আয় চুল বেঁধে দি।

আস্তে করে বাঁধবে মা। তুমি এত শক্ত করে বাঁধো যে মাথা ব্যথা করে।

রাত্রি মাথা পেতে দিল। তিনি চিরুনি টানতে টানতে বললেন, নাসিমার সঙ্গে তোর নাকি ঝগড়া হয়েছে ?

ঝগড়া হবে কেন ?

অপালা বলছিল।

অপালা কত কিছুই বলে।

ঝগড়া হয়নি তাহলে ?

না। কী যে তুমি বলো মা। আমি কি ঝগড়া করবার মেয়ে ?

সুরমা শান্তগলায় বললেন, তার মানে কি এই যে অন্য কোনো মেয়ে হলে ঝগড়া করত ?

রাত্রি হেসে ফেলল, কোনো উত্তর দিল না। সুরমা বললেন, নাসিমা তোকে কী বলছিল ?

তেমন কিছু না।

সুরমা আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। কারণ তিনি জানেন জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। কোনো জবাব পাওয়া যাবে না। রাত্রি বসে আছে মাথা নিচু করে। মেয়েটি প্রতিদিনই কি সুন্দর হচ্ছে ? সুরমার সূক্ষ্ম একটা ব্যথা বোধ হলো। রাত্রি মৃদুস্বরে বলল, ওই ছেলেটি কে মা ?

কোন ছেলে ?

আমাদের বসার ঘরে যে ছেলেটি আছে ?

তোর বাবার দূরসম্পর্কের ভাগ্নে হয়। আমি ঠিক জানি না।

কথাটা তো মা তুমি মিথ্যা বললে। আমি শুনেছি সে বাবাকে 'মতিন সাহেব, মতিন সাহেব' বলছিল।

সুরমা ঝাঁঝাল স্বরে বললেন, আমি জানি না সে কে।

এটাও তো মা ঠিক না। তুমি কিছু না জেনেশুনে একটা ছেলেকে থাকতে দেবে না। তোমার স্বভাবের মধ্যে এটা নেই।

সুরমা কিছু বললেন না। রাত্রি বলল, আমি কারও সঙ্গে মিথ্যা কথা বলি না। কেউ যখন আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলে আমার ভালো লাগে না।

সুরমা থেমে বললেন, ছেলেটি ঢাকায় গেরিলা অপারেশন চালানোর জন্যে এসেছে। তোর বাবা জুটিয়েছে। বুধবার পর্যন্ত থাকবে। এর বেশি আমি কিছু জানি না।

রাত্রি কিছু বলল না। এটা একটা বড় ধরনের খবর। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একটা ব্যাপার। কিন্তু রাত্রির কোনো ভাবান্তর হলো না। সে যেভাবে বসে ছিল সেভাবেই বসে রইল.।

নাসিমাদের বাসার টেলিফোন লাইনে কোনো-একটা গণ্ডগোল আছে। টেলিফোন করলেই অন্য এক বাড়িতে চলে যায়। বুড়োমতো এক ভদ্রলোক বলেন, ড. খয়ের সাহেবের বাড়ি। কাকে চান ? আজ ভাগ্য ভালো। টেলিফোনে নাসিমাকে পাওয়া গেল। সুরমা বললেন, রাত্রির সঙ্গে তোমার নাকি ঝগড়া হয়েছে ? অপালা বলছিল।

ঝগড়া হয়নি ভাবি। যা বলার আমিই বলেছি। ও শুধু শুনেছে।

কী নিয়ে কথা ?

রাত্রির বিয়ের ব্যাপারে। ছেলের মা এসেছিলেন রাত্রির সঙ্গে কথা বলতে। রাত্রি পাথরের মতো মুখ করে বসে রইল।

আমাকে তো এসব কিছু বলোনি।

বলার মতো কিছু হয়নি।

আমার মেয়ের বিয়ে নিয়ে কথাবার্তা বলছ, আর আমি কিছু জানব না ?

সময় হলেই জানবে। সময় হোক। ভাবি, রাত্রির জন্যে আমি যে ছেলে আনব সে ছেলে তোমরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবে না। রাত্রির ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। তোমার তো আরও একটি মেয়ে আছে। ওর বিয়ে তুমি দিয়ো।

নাসিমা।

বলো।

এসময়ে মেয়ের বিয়ে-টিয়ে নিয়ে কথা হোক এটা আমি চাই না। মেয়ের আমি বিয়ে দেব সুসময়ে।

সুসময়ের দেরি আছে ভাবি। ছ'সাত বৎসরের ধাক্কা। তাছাড়া...

তাছাড়া কী ?

এরকম সুন্দরী অবিবাহিতা একটি মেয়ে এসময় কেউ ঘরে রাখছে না। গণ্ডায় গণ্ডায় বিয়ে হচ্ছে রোজ। এইট নাইনে পড়া মেয়েদেরও বাবা-মা পার করে দিচ্ছে। আমাদের নিচের তলার রকিব সাহেব কী করেছেন শোনো...

সুরমা থমথমে গলায় বললেন, রকিব সাহেবের কথা অন্য একদিন শুনব। আজ না। আমার মাথা ধরেছে।

রাত এগারোটা প্রায় বাজে। মতিন সাহেব জেগে আছেন এখনো। রেডিও অস্ট্রেলিয়া শোনা হয়নি। রাত্রিও জেগে আছে। রেডিও অস্ট্রেলিয়া ধরে দেওয়ার দায়িত্ব তার। ফাইন টিউনিং সে খুব ভালো পারে। দেশের বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ে গভীর রাতে মতিন সাহেব মেয়ের সঙ্গে মৃদুস্বরে কথা বলতে পছন্দ করেন। কথা একনাগাড়ে তিনিই বলেন। অবিশ্বাস্য আজগুবি গল্প। রাত্রি কোনোটিতেই প্রতিবাদ করে না। হাসিমুখে শুনে যায়।

আজ মতিন সাহেব এক পীর সাহেবের গল্প ফাঁদলেন। পীর সাহেবের বাড়ি যশোহর। তিনি এখন কিছুদিনের জন্যে আছেন ঢাকায়। টিক্কা খানের মিলিটারি অ্যাডজুটেন্ট নাকি তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন ক্যান্টনমেন্টে। টিক্কা খান খুব বিনীতভাবে পীর সাহেবকে বললেন দোয়া করতে। উত্তরে পীর সাহেব বললেন, তোমাদের সামনে মহা বিপদ। তোমাদের একজনও এই দেশ থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না। এক লাখ কবর উঠবে বাংলাদেশে।

রাত্রি বলল, তুমি এই গল্প শুনলে কোত্থেকে ? মতিন সাহেব বললেন, আমাদের ক্যাশিয়ার সাহেবের কাছে শুনলাম। উনি ওই পীর সাহেবের মুরিদ। নিজেও খুব সুফী মানুষ। বানানো গল্প বলার লোক না।

মিলিটারি কি আর পীর-ফকিরের কাছে যাবে বাবা ?

এমনিতে কি আর যাচ্ছে ? ঠেলায় পড়ে যাচ্ছে। ঠেলায় পড়লে বাঘেও ধান খায়! কী রকম লেংগী যে খাচ্ছে তুই এখানে বসে কী বুঝবি। বুঝতে হলে ফ্রন্টে যেতে হবে। তবে দু'একটা দিন অপেক্ষা কর, দেখ কী হয়।

কী হবে ?

আজদহা নেমে গেছে ঢাকা শহরে। কাঁকড়া বিছার দল। মিলিটারি কাঁচা খাওয়া শুরু করবে।

গেরিলারা ঢাকায় এসেছে নাকি বাবা ?

আসবে না তো কী করবে ? মার কোলে বসে থাকবে ? ঢাকা ছেয়ে ফেলেছে। দু'একদিনের মধ্যে অপারেশন শুরু হবে। একবার অপারেশন শুরু হলে দেখবি সবক'টা জেনারেলের আমাশা হয়ে গেছে। বদনা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে সবাই।

রাত্রি হেসে ফেলল। বাবা এমন ছেলেমানুষি বিশ্বাস নিয়ে কথা বলেন যে বড় মায়া লাগে। মাঝে মাঝে রাত্রি ভাবতে চেষ্টা করে—এ দেশে এমন কেউ কি আছে যে এই দেশকে তার বাবার চেয়ে ভালোবাসে ?

বাবা।

কী ?

শুয়ে পড়ো বাবা। ঘুমাও।

ঘুম ভালো হয় না রে মা। সবসময় একটা আতঙ্কের মধ্যে থাকি।

একদিন এই আতঙ্ক কেটে যাবে। আমরা সবাই নিশ্চিন্তে ঘুমুব।

মতিন সাহেবের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি গলার স্বর অনেকখানি নিচে নামিয়ে বললেন, আমাদের বাসায় যে ছেলেটা আছে সে কে বল তো মা ? দেখি তোর কেমন বুদ্ধি।

রাত্রি চুপ করে রইল। মতিন সাহেব ফিসফিস করে বললেন, বলতে পারলি না ? জানি পারবি না। ও হচ্ছে সাক্ষাৎ আজদাহা, আবাবিল পক্ষী। ছারখার করে দিবে। কিছু বুঝতে পারলি ?

পারছি।

দেখে মনে হয় ?

আমার সঙ্গে এখনো দেখা হয়নি।

কথা বলে দেখ, মনে হবে সাধারণ বাঙালি ঘরের ছেলে।

উনি তো বাঙালি ঘরের ছেলেই বাবা।

আরে না। ছেলেতে ছেলেতে ডিফারেন্স আছে না ? এরা হচ্ছে সাক্ষাৎ আজদাহা।

আজদাহাটা কী ?

মতিন সাহেব জবাব দিতে পারলেন না। আজদাহা কী সে সম্পর্কে তাঁর ধারণা স্পষ্ট নয়। কথাটা তিনি অফিসে শুনেছেন। গেরিলা প্রসঙ্গে কে যেন বলেছিল। তাঁর খুব মনে ধরেছে।

রাত্রি বলল, বাবা, তুমি কি ইনার কথা কাউকে বলেছ ?

আরে না। কী সর্বনাশ! কাউকে বলা যায় নাকি ?

তুমি তো পেটে কথা রাখতে পার না বাবা। এই তো আমাকে বলে ফেললে।

তিনি চুপ করে গেলেন। রাত্রি বলল, ভালো করে মনে করে দেখো, কাউকে বলোনি ?

না।

তোমাদের ক্যাশিয়ার সাহেব, তাঁকেও না ?

না।

বাবা, ভালো করে ভেবে দেখো। জানাজানি হলে বিরাট বিপদ হবে।

আরে না। তুই পাগল হলি নাকি ?

দুধ খাবে বাবা ? শোবার আগে এক গ্লাস গরম দুধ খেয়ে শোও। ভালো ঘুম হবে।

দুধ না, চা খেতে ইচ্ছা করছে। তোর মাকে না জাগিয়ে এক কাপ চা বানিয়ে দে।

রাত্রি উঠে দাঁড়াল।

আলম হকচকিয়ে গেল।

প্রায় মাঝরাতে এমন একটি রূপবতী মেয়ে অসঙ্কোচে তার সামনে চায়ের কাপ নামিয়ে রাখবে এটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই মেয়েটিই রাত্রি, এটা বোঝা যাচ্ছে; কিন্তু তার কাণ্ডকারখানা বোঝা যাচ্ছে না। রাত্রি মৃদুস্বরে বলল, বাবার জন্যে চা বানাতে হলো। আপনি জেগে আছেন, তাই আপনার জন্যেও বানালাম।

ঠিক কী বললে ভালো হয় আলম বুঝতে পারল না। মেয়েটি চলেও যাচ্ছে না। তাকে কি বসতে বলা উচিত ? কিন্তু এটা তারই বাড়ি। তার বাড়িতে তাকে বসতে বলার মানে হয় না।

আমি এ বাড়ির বড় মেয়ে। আমার নাম রাত্রি।

আপনি কেমন আছেন ?

'আপনি কেমন আছেন' বলে আলম আরও অস্বস্তিতে পড়ল। বোকার মতো একটি প্রশ্ন করা হয়েছে। এবং মেয়েটি তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে। কারণ সে এই প্রশ্নের কোনো জবাব দেয়নি। আলমের মনে হলো মেয়েটি যেন একটু হাসল।

রাত্রি বলল, আপনি কি আমার ওপর রাগ করেছিলেন ?

রাগ করব কেন ?

বিকেলে বাবা আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিল, তখন আসিনি—সেজন্যে।

আরে না। ওইসব নিয়ে আমি ভাবিইনি।

আমার মন খারাপ ছিল তখন, তাই আসিনি। আমার ফুফুর ওপর রাগ করেছিলাম।

ও আচ্ছা।

আপনি বোধহয় চা-টা খাবেন না। দিন নিয়ে যাই।

না, আমি খাব।

আলম চায়ে চুমুক দিল। রাত্রি বলল, কিছু বলবেন না ?

কী বলব ?

ভদ্রতা করে কিছু বলা। যেমন চা-টা খুব ভালো হয়েছে এই জাতীয়।

রাত্রি হাসছে। আলম ধাঁধায় পড়ে গেল। এই বয়েসী মেয়েদের সঙ্গে তার কথা বলার অভ্যেস নেই। খুবই অস্বস্তি লাগছে। সে বুঝতে পারছে তার গাল এবং কান লাল হতে শুরু করেছে। ইচ্ছে করছে এ জায়গা থেকে কোনোমতে ছুটে পালিয়ে যেতে এবং একই সঙ্গে মনে হচ্ছে এই মেয়েটি এক্ষুনি যেন চলে না যায়। যেন সে থাকে আরও কিছুক্ষণ। আলমের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল।

রাত্রি বলল, যাই। আপনি শুয়ে পড়ুন।

আলম অনেক রাত পর্যন্ত চুপচাপ বসে রইল। অদ্ভুত একধরনের কষ্ট হতে লাগল তার। এই কষ্টের জন্ম কোথায় তা তার জানা নেই।

রাত বাড়ছে। চারদিক চুপচাপ। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আবারো হয়তো ঝড়বৃষ্টি হবে। হোক, খুব হোক। সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাক।

আলম বাতি নিভিয়ে দিল। আজ রাতেও ঘুম আসবে না। জেগে কাটাতে হবে। ঢাকায় আসার পর থেকে এমন হচ্ছে। কেন হচ্ছে ? আগে তো কখনো হয়নি। সে কি ভয় পাচ্ছে ? ভালোবাসা, ভয়, ঘৃণা—এসব জিনিসের জন্ম কোথায় ?

তার পানির পিপাসা হলো। কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছে না।

৪

শরীফ সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। নিজের চোখকে তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। আলম বলল, কথা বলছ না কেন মামা ? কেমন আছ ?

ভালো আছি। তুই কোত্থেকে ? বেঁচে আছিস এখনো ?

আছি। বাসা অন্ধকার কেন ? মামি কোথায় ?

দেশের বাড়িতে। তুই এখন কোনো প্রশ্ন করবি না। কিছুক্ষণ সময় দে নিজেকে সামলাই।

শরীফ সাহেব সোফায় বসে সত্যি সত্যি বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন। আলম বলল, বাসার খবর বলো। সবাই আছে কেমন ?

তুই বাসায় যাস নি ?

না।

সরাসরি আমার এখানে এসেছিস ?

তাও না। ঢাকাতেই আছি কয়েকদিন ধরে।

তোর কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

ঢাকায় আমি একটা কাজ নিয়ে এসেছি মামা।

আই সি।

এখন বলো বাসার খবর।

বাসার খবর তোকে কেন বলব ? তোর কি কোনো আগ্রহ আছে না কোনো দায়িত্বজ্ঞান আছে ? বোন আর মাকে ফেলে চলে গেলি দেশ উদ্ধারে। ওদের কথা ভাবলি না!

তোমরা আছ, তোমরা ভাববে।

প্রথম রেসপনসিবিলিটি হচ্ছে নিজের পরিবারের জন্যে। এই সাধারণ কথাটা তোরা কবে বুঝবি ?

আলম হেসে ফেলল। শরীফ সাহেব রেগে গেলেন। মানুষটি ছোটখাটো। ফাইন্যান্সের জয়েন্ট সেক্রেটারি। যতটা না বয়েস তার চেয়েও বুড়ো দেখাচ্ছে। মাথার সমস্ত চুল পেকে গেছে। মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে। আলম বলল, মামা, বাসার খবর তো এখনো দিলে না। ওরা আছে কেমন ?

ভালোই।

মা'র শরীর কেমন ?

শরীর ঠিকই আছে। শরীর একটা আশ্চর্য জিনিস, এটা ঠিকই থাকে।

তোমার তো তাও ঠিক নেই মামা, বুড়ো হয়ে গেছ।

তা হয়েছি। একা থাকি। রাতে ঘুম-টুম হয় না।

আমাদের বাড়িতে গিয়ে থাকলেই পার।

পাগল হয়েছিস! ওই বাড়ির ওপর নজর রাখছে না! তুই যুদ্ধে গেছিস সবাই জানে। তোর মাকে থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।

আর কোনো ঝামেলা করেনি ?

করত। তোর বাবার জন্যে বেঁচে গেলি। ভাগ্যিস সে মরবার আগে 'তমঘায়ে খিদমত'টা পেয়েছিল।

শরীফ সাহেব শার্ট গায়ে দিলেন। জুতো পরলেন।

যাচ্ছ কোথায় মামা ?

অফিসে। আর কোথায় যাব ? তুই কি ভেবেছিলি—যুদ্ধে যাচ্ছি ?

অফিস-টফিস করছ ঠিকমতোই ?

করব না ? তোর মতো কয়েকজন চেংড়া ছোড়া দু'একটা গুলি-টুলি করবে আর এতেই দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে ? দিল্লি হনুজ দূরঅস্ত। তাছাড়া পলিটিক্যাল সল্যুশন হয়ে যাচ্ছে। খুব হাই লেভেলে কথাবার্তা হচ্ছে। আমেরিকা চাপ দিচ্ছে। আমেরিকার চাপ কী জিনিস তোরা বুঝবি না। স্যাকরার ঠুকঠাক কামারের এক ঘা।

আলম হাসতে লাগল। এই মামার সঙ্গে তার খুবই ভাব। একজন সৎ এবং সত্যিকার অর্থে ভালো মানুষ। তাঁর একটিমাত্র দোষ—উল্টো তর্ক করা। আলমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু এই তিনিই আবার পাকিস্তানি ভাব আছে এমন কারও সঙ্গে কথা বলবার সময় এমন যুক্তি দেবেন যাতে মনে হবে সপ্তাহখানেকের মধ্যে দেশ স্বাধীন হচ্ছে।

আলম।

জি।

তোর মার সঙ্গে দেখা করবি না ?

না।

ভালো। লায়েক ছেলে তুই। যা ভালো মনে করিস তাই করবি। আমার এখানে থাকতে চাস ?

না।

তোর কি ধারণা আমার এখানে উঠলেই তোকে আমি মিলিটারির হাতে ধরিয়ে দেব ?

তোমাদের কোনো ঝামেলায় ফেলতে চাই না।

এসেছিস কী জন্যে আমার কাছে ?

দেখতে এলাম।

যা দেখার ভালো করে দেখে নে। দশ মিনিট সময়। দশ মিনিটের মধ্যেই বেরুব।

আলম উঠে দাঁড়াল। শরীফ সাহেব বললেন, তুই কোথায় আছিস ঠিকানাটা রেখে যা।

ঠিকানা দেওয়া যাবে না মামা। মাকে বলবে আমি ভালো আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকব।

আমি বললে বিশ্বাস করবে না। তুই মরে গেছিস এটা বললে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করবে, কিন্তু বেঁচে আছিস বললে করবে না। তুই একটা কাজ কর, একটা কাগজে লেখ—আমি ভালো আছি। তারপর নাম সই করে দে। আজকের তারিখ দিবি।

আলম লিখল—'ভালো আছি মা।' তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে লিখল, 'শিগগিরই তোমাকে দেখতে আসব।' দ্বিতীয় লাইনটি লিখে তার একটু খারাপ লাগতে লাগল। 'শিগগিরই তোমাকে দেখতে আসব' এই লাইনটিতে কোথায় যেন একটু বিষাদের ভাব আছে। দেখতে আসা হবে না এই কথাটি যেন এর মধ্যে লুকানো।

শরীফ সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, একটা লাইন লিখতে গিয়ে বুড়ো হয়ে যাচ্ছিস দেখি। তাড়াতাড়ি কর।

আলম কাগজটা মামার হাতে ধরিয়ে নিউ পল্টনে চলে এল। বসবার ঘরে সাদেক তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

সাদেককে কেমন অচেনা লাগছে।

ফর্সা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একজন মানুষ। সে গোঁফ ফেলে দিয়েছে। লম্বা চুল ছিল। সেগুলি কেটেছে। জুতো জোড়াও চকচক করছে। আলম বলল, খোলশ পাল্টে ফেলেছিস মনে হচ্ছে। চেনা যাচ্ছে না।

ঢাকা শহরে ঢুকলাম এতদিন পর। সেজেগুজে ঢুকব না? তুই ছিলি কোথায়? দেড় ঘণ্টা ধরে এক জায়গায় বসে আছি।

আজ আসবি বুঝব কী করে? আমি তো ভাবলাম প্রোগ্রাম ক্যানসেল। সব বাতিল।

ক্যানসেল হওয়ার মতোই।

কী বললি?

রহমানের খোঁজ নেই। নো ট্রেস।

নো ট্রেস মানে?

নো ট্রেস মানে নো ট্রেস। সে আমার সঙ্গেই ঢাকায় ঢুকেছে। তারপর যেখানে যাওয়ার কথা সেখানে যায়নি। কোথায় আছে তাও কেউ জানে না। একগাদা এক্সপ্লোসিভ তার সাথে।

বলিস কী?

আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছিল। ডুব মারলাম। তিনদিন ডুব দিয়ে থাকার পর গেলাম ঝিকাতলা। কনটাক্ট পয়েন্টে। সেখানেও ভোঁ ভোঁ। কেউ নেই।

এখন ব্যাপারটা কোন পর্যায়ে আছে?

বলছি। তার আগে বাথরুমে যাওয়া দরকার। কিডনি ফেটে যাওয়ার মতো অবস্থা। হেভি প্রেসার।

আলম ইতস্তত করে বলল, এখানে বাথরুমের একটু অসুবিধা আছে। বাইরে চলে যা, রাস্তার পাশে কোথাও বসে পড়।

সাদেক বেরিয়ে গেল। এ বাড়িতে এসে সে খানিকটা ধাঁধায় পড়ে গেছে। দেড় ঘণ্টা একা একাই বসে ছিল। এর মধ্যে ঘোমটা দেওয়া এক মহিলা এসে বললেন, আলম

বাইরে গেছে। এসে পড়বে। তুমি বসো। এরকম শীতল কণ্ঠ সাদেক এর আগে শোনেনি। যেন একজন মরা মানুষ কথা বলছে।

প্রায় আধ ঘণ্টা পর বাইশ-তেইশ বছর বয়েসী চকলেট রঙা শাড়ি পরা একটি মেয়ে এসে ঢুকল এবং সরু চোখে তাকিয়ে রইল। এরকম রূপবতী মেয়েদের সাধারণত সিনেমা পত্রিকার কভারে দেখা যায়। বাড়িতে তাদের দেখতে পাওয়ার কথা নয়। সাদেক ঘাবড়ে গিয়ে বলল, কিছু বলবেন আমাকে ? মেয়েটি তার মার মতো শীতল গলায় বলল, আপনি কি দুপুরে এখানে খাবেন ?

কী অদ্ভুত কথা! অচেনা, অজানা একটা মানুষকে কেউ এভাবে বলে নাকি ? সাদেক অবশ্যি নিজেকে চট করে সামলে নিয়ে বলল, জি খাব। দুপুরে কী রান্না হচ্ছে ?

মেয়েটি এই কথার জবাব দেয়নি। ভেতরে চলে গেছে। তারপর খটাং খটাং শব্দ। সেলাই মেশিন চলতে শুরু করেছে। মেয়েটি চায়ের কাপ নিয়ে এসেছে কিছুক্ষণ পর। কাপ নামিয়ে বলেছে—চিনি লাগবে কি না বলুন।

না, লাগবে না।

চুমুক দিয়ে বলুন। চুমুক না দিয়েই কীভাবে বললেন ?

সাদেক চুমুক দিয়েছে। তার বাথরুমে যাওয়া দরকার ছিল। কিন্তু এরকম রূপবতী একটি মেয়েকে নিশ্চয়ই বলা যায় না—আমি একটু ইয়েতে যাব। সাদেক বসে বসে তেতাল্লিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 'প্রথম কদম ফুল' পড়ে ফেলল। বইটা থাকায় রক্ষা। নয়তো সময় কাটানো মুশকিল হতো। ফেরার সময় বইটা সঙ্গে করে নিতে হবে। কোনো কাজ আধাআধি করে রাখা ঠিক না। মরে গেলে একটা আফসোস থাকবে।

সাদেক অল্প কথায় কিছু বলতে পারে না। কিংবা বলার চেষ্টাও করে না। রহমানের খোঁজ পাওয়া গেছে। সে ভালোই আছে।—এই খবরটা বের করতে আলমের এক ঘণ্টা লাগল। তাও পুরোপুরি বের করা গেল না। কেন রহমান যেখানে উঠার কথা ছিল সেখানে উঠেনি সেটা জানা গেল না।

জিনিসপত্র সব এসেছে ?

এসেছে কিছু কিছু।

কিছু কিছু মানে কী ?

কিছু কিছু মানে হচ্ছে কিছু কিছু।

আলম বিরক্ত হয়ে বলল, যা বলার পরিষ্কার করে বল। অর্ধেক কথা পেটে রেখে দিচ্ছিস কেন ? কী কী জিনিসপত্র এসেছে ?

যা যা দরকার সবই এসেছে। শুধু এলএমজি আসেনি।

আসেনি কেন ?

আমাকে বলছিস কেন ? আর এরকম ধমক দিয়ে কথা বলছিস কেন ? জিনিসপত্র আনার দায়িত্ব আমার ছিল না। এক্সপ্লোসিভ আনার কথা ছিল, নিয়ে এসেছি।

কোথায় সেগুলি ?

জায়গামতোই আছে।

প্রোগ্রামটা কী ?

সাদেক সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, সেটা তুই ঠিক কর। তুই হচ্ছিস লিডার। তুই যা বলবি, তাই।

সবার সঙ্গে কথা বলা দরকার।

কারও সঙ্গে কথা বলার দরকার নেই। ফাইন্যাল প্রোগ্রামটা শুধু ওদের জানাব। সেইভাবে কাজ হবে। প্রথম দানেই ছক্কা ফেলতে হবে।

ছক্কা ফেলতে হবে মানে ?

সাদেক বিরক্ত হয়ে বলল, তুই কি বাংলাও ভুলে গেছিস ? ছক্কা-পাঞ্জাও তোর কাছে এক্সপ্লেইন করতে হবে ? প্রথম দানে ছক্কা মানে প্রথম অপারেশন হবে ক্লাস ওয়ান। ওয়ান হানড্রেড পারসেন্ট সাকসেস। বুঝতে পারছিস ?

আলম চুপ করে রইল। সাদেক সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, তুই কেমন অন্যরকম হয়ে গেছিস!

কী রকম ?

কেমন যেন সুখী সুখী চেহারা হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে তুই এ বাড়ির জামাই।

সাদেক গলা ফাটিয়ে হাসতে লাগল। অস্বস্তিকর অবস্থা। আলম বিরক্তমুখে বলল, এত হাসছিস কেন ? হাসির কী হয়েছে ?

তুই কেমন পুতুপুতু হয়ে গেছিস তাই দেখে হাসি আসছে। মোনালিসার প্রেমে পড়ে গেছিস নাকি ?

চুপ কর।

ভাবভঙ্গি তো সেরকমই। মজনু মজনু ভাব। অবশ্যি যে জিনিস দেখলাম প্রেমে পড়াই উচিত।

সাদেককে আটকানো মুশকিল। যা মনে আসবে বলবে। আলম চিন্তায় পড়ে গেল। সে গম্ভীর গলায় বলল, আজেবাজে কথা বন্ধ কর। কাজের কথা বল। মোটামুটি একটা প্ল্যান দাঁড় করানো যাক। আমরা বেরুব কখন ?

কার্ফুর আগে আগে বের হওয়াই ভালো। রাস্তাঘাটে লোক চলাচল সে সময়টায় বেশি থাকে। গাড়ি-টারি চলে। সময়টা ধর সাড়ে তিন থেকে চার।

কথাবার্তার এই পর্যায়ে বিন্তি এসে বলল, আপনেরে খাইতে ডাকে। আহেন।

খাবার টেবিল বারান্দায়। খাবার দেওয়া হয়েছে দুজনকেই। এ বাড়ির কেউ বসেনি। সুরমা দাঁড়িয়ে রইলেন। ঠান্ডা গলায় বললেন, নিজেরা নিয়ে খাও। সাদেক সঙ্গে সঙ্গে বলল, কোনো অসুবিধা নেই খালাম্মা। আপনার থাকতে হবে না। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আমার কোনো লজ্জা নেই।

লজ্জা না থাকাই ভালো।

আমার কোনো কিছুতেই লজ্জা নাই। আলমের সঙ্গে আমার বনে না এইজন্যেই। কয়েকটা শুকনো মরিচ ভেজে আনতে বলুন তো খালাম্মা। ঝাল কম হয়েছে।

সুরমা নিজেই গেলেন। সাদেক মাথা ঘুরিয়ে চারদিক দেখতে লাগল। মৃদুস্বরে বলল, বেশি পরিষ্কার। ভাগ্যিস এ বাড়িতে আমি উঠিনি। আমার এখানে ওঠার কথা ছিল। বাড়ির মালিক কী করেন ?

জানি না কী করেন।

বলিস কী, ভদ্রলোক কী করেন জানিস না ?

না।

মেয়েটার নাম কী ? না তাও জানিস না ?

ওর নাম রাত্রি।

রাত্রি ? বাহ, চমৎকার তো! জোছনারাত্রি নিশ্চয়ই। হা হা হা।

আস্তে হাস।

সুরমা কাচের প্লেটে ভাজা শুকনামরিচ নিয়ে ঢুকতেই সাদেক বলল, রাত্রি খাবে না ? হোস্টদের তরফ থেকে কারও বসা উচিত।

সুরমা শান্তস্বরে বললেন, তোমরা খাও, ওরা পরে খাবে।

পরে খাবে কেন ? ডাকুন, গল্প করতে করতে খাই।

সুরমা অনেকক্ষণ সাদেকের দিকে তাকিয়ে থেকে সত্যি সত্যি রাত্রিকে ডাকলেন। এবং আশ্চর্য! রাত্রি একটি কথা না বলে খেতে বসল। সাদেক হাত-টাত নেড়ে একটা হাসির গল্প শুরু করল। ছোটবেলায় দৈ মনে করে এক খাবলা চুন খেয়ে তার কী দশা হয়েছিল। দশ দিন মুখ বন্ধ করতে পারেনি। হা করে থাকতে হতো। সেই থেকে তার নাম হয়ে গেল ভেটকি মাছ। ভেটকি মাছ মুখ বন্ধ করে না, হা করে থাকে। গল্প শুনে কেউ হাসল না। সাদেক একাই বারান্দা কাঁপিয়ে হাসতে লাগল।

ফার্স্ট ক্লাস রান্না হয়েছে খালাম্মা। খাওয়ার পর আমি পান খাব। পান আছে ঘরে ? না থাকলে বিন্তিকে পাঠিয়ে দিন, নিয়ে আসবে।

সুরমা বিন্তিকে পান আনতে পাঠালেন। সাদেক রাত্রির দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, আপনি এত গম্ভীর হয়ে আছেন কেন ?

রাত্রি কিছু বলল না।

আপনি ইউনিভার্সিটিতে পড়েন নিশ্চয়ই। চেহারা দেখেই মনে হচ্ছে। ইউনিভার্সিটিতে পড়া মেয়েগুলি গম্ভীর হয় খুব।

আমি ইউনিভার্সিটিতেই পড়ি।

কোন সাবজেক্ট ?

কেমিস্ট্রি।

সর্বনাশ! মেয়েরা এত কঠিন কঠিন সাবজেক্ট কেন পড়ে বুঝতে পারি না। মেয়েরা পড়বে বাংলা।

রাত্রি উঠে পড়ল। আলম একটা মজার ব্যাপার লক্ষ করল। রাত্রি মেয়েটি বিরক্ত হয়নি। সাদেকের কথাবার্তার ধরনে যে-কেউ বিরক্ত হতো। হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই মেয়েটি হয়নি। হাত ধুয়ে এসে সে আবার চেয়ারে বসল এবং চামচে করে ভাত তুলে দিল সাদেকের প্লেটে। তুলে দেওয়ার ভঙ্গিটা সহজ ও স্বাভাবিক।

সাদেক দুপুর তিনটা পর্যন্ত থাকল। মৃদুগলায় প্ল্যান নিয়ে কথা বলল। প্রথম দিনের অপারেশনের জায়গাগুলি ঠিক করল। 'রেকি' করবার কী ব্যবস্থা করা যায় সে নিয়ে কথা বলল। অপারেশন চালাতে হবে অচেনা গাড়ি দিয়ে। সেই গাড়ির যোগাড় কীভাবে করা যায় সেই নিয়েও কথা হলো। আগামীকাল ভোরে আবার বসতে হবে। এ বাড়িতে নয়। পাক মটরস-এর কাছের একটি বাড়িতে। সেখানে রহমানও থাকবে। প্রোগ্রাম ফাইন্যাল করা হবে সেখানেই।

সাদেক যাওয়ার আগে সুরমাকে পা ছুঁয়ে সালাম করল। সুরমা হকচকিয়ে গেলেন।

দোয়া করবেন খালাম্মা।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দোয়া করব।

রাত্রিকে ডাকুন। ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাই।

রাত্রি এল। খুব সহজ এবং স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সাদেক বলল, রাত্রি চলি। আবার দেখা হবে। যেন এ বাড়ির সঙ্গে তার দীর্ঘ দিনের চেনাজানা। রোজই আসছে, যাচ্ছে। রাত্রি হেসে ফেলে বলল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেখা হবে। ভালো থাকবেন।

সাদেক ঘর থেকে বেরুবামাত্র রাত্রি বলল, আপনার বন্ধুর সঙ্গে আপনার কোনো মিল নেই। দুজন সম্পূর্ণ দু'রকম। ও কি আপনার খুব ভালো বন্ধু ?

হ্যাঁ, ভালো বন্ধু। ও কিন্তু একটি অসম্ভব ভালো ছেলে।

তা জানি।

কীভাবে জানেন ?

কিছু কিছু জিনিস টের পাওয়া যায়। আপনার হয়তো ধারণা হয়েছে আমি উনার ওপর বিরক্ত হয়েছি। এটা ঠিক না। আমি বিরক্ত হইনি।

অনেকদিন পর আলম দুপুরবেলা ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল সন্ধ্যা মিলাবার পর। বিন্তি চায়ের পেয়ালা হাতে তাকে ডাকছে। বাইরে প্রবল বর্ষণ। ঘোর বর্ষা যাকে বলে। মতিন সাহেব বসে আছেন সোফায়। তাঁকে কেমন যেন চিন্তিত মনে হচ্ছে। আলম উঠে বসতেই তিনি বললেন, শরীর খারাপ করেছে নাকি ?

জি-না।

হাতমুখ ধুয়ে আসো। একটা খারাপ খবর আছে।

কী সেটা ?

আমেরিকানরা সেভেনথ ফ্লিট নিয়ে বঙ্গোপসাগরের দিকে রওনা হয়েছে।

আলম এই খবরে তেমন কোনো উৎসাহ দেখাল না। তার কাজকর্মের সঙ্গে আমেরিকান সেভেনথ ফ্লিটের কোনো সম্পর্ক নেই। মতিন সাহেব নিচুগলায় বললেন, এরচেয়েও একটা খারাপ সংবাদ আছে।

বলুন শুনি।

ঢাকা শহরে চাইনিজ সোলজার দেখা গেছে।

আপনি নিজে দেখেছেন ?

না, আমি নিজে দেখিনি। কিন্তু দেখেছেন অনেকেই। নাক চেঁপা বাঁটু সোলজার। দেখলেই চেনা যায়।

আলম বাসিমুখে চায়ে চুমুক দিতে লাগল। গুজবে ভর্তি হয়ে গেছে ঢাকা শহর। মানুষের মরাল ভেঙে পড়ছে। ঢাকা শহরের গেরিলাদের প্রথম কাজই হবে এই মরাল ঠিক করা। নতুন ধরনের গুজবের জন্ম দেওয়া। যা শুনে একেকজনের বুকের ছাতি ফুলে উঠবে। এরা রাতে আশা নিয়ে ঘুমুতে যাবে। মতিন সাহেবের মতো প্রাণহীন মুখ করে সোফায় বসে থাকবে না।

আলম।

বলুন।

শুনলাম তোমার এক বন্ধু নাকি এসেছিল ?

জি।

কাজ তাহলে শুরু হচ্ছে ?

হচ্ছে।

অবস্থা কাহিল হয়ে যাবে ওদের, কী বলো ?

তা হবে।

এক লাখ নতুন কবর হবে, কী বলো ?

হওয়ার তো কথা।

যশোহরের এক পীর সাহেব কী বলেছেন শুনবে কি ?

বলুন।

খুবই কামেল আদমি। সুফী মানুষ।

মতিন সাহেব অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে যশোহরের পীর সাহেবের কথা বলতে লাগলেন। আলম কোনো কথা না বলে গল্প শুনে গেল। ডুবন্ত মানুষরাই খড়কুটো আঁকড়ে ধরে। ঢাকার মানুষ কি ডুবন্ত মানুষ ? তারা কেন এরকম করবে ? আলম একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস চাপতে চেষ্টা করল।

রাত্রির ঘর অন্ধকার। সে বাতি নিভিয়ে চুপচাপ শুয়ে ছিল। অপালা এসে বলল, ফুফু টেলিফোন করেছে। তোমাকে ডাকে। রাত্রি একবার ভাবল টেলিফোন ধরবে না। বলে পাঠাবে—শরীর ভালো না, জ্বরজ্বর লাগছে। কিন্তু তাতে লাভ হবে না। ফুফু বলবেন রিসিভার এ ঘরে নিয়ে আসতে। তারচেয়ে টেলিফোন ধরাই ভালো।

কেমন আছিস রাত্রি ?

ভালো।

তোদের ইউনিভার্সিটি নাকি খুলেছে ? ক্লাস-ট্রাস হচ্ছে ?

হ্যাঁ হচ্ছে।

তুই যাচ্ছিস না ?

না।

পরীক্ষা নাকি ঠিকমতো হবে শুনলাম ?

হলে হবে।

তোর গলাটা এত ভারী ভারী লাগছে কেন ? জ্বর নাকি ?

না, জ্বর না।

কাল গাড়ি পাঠাব। চলে আসবি আমার এখানে।

আচ্ছা।

আরেকটা কথা শোন, ওই ভদ্রমহিলা আসবেন তোকে দেখতে। দেখলেই যে বিয়ে হবে এমন তো কোনো কথা না। তোর মতো মেয়েকে কি কেউ জোর করে বিয়ে দিতে পারে ? তোর অনিচ্ছায় কিছু হবে না। বুঝতে পারছিস ?

পারছি।

কাজেই ভদ্রমহিলা এলে স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলবি।

ঠিক আছে, বলব।

রাত্রি, আরেকটা কথা শোন—আমাদের ড্রাইভার বলল, সে দেখেছে কে একজন লোক তোদের বসার ঘরের ক্যাম্প খাটে শুয়ে আছে। কে সে ?

আব্বার এক বন্ধুর ছেলে।

এখানে সে কী করছে ?

কী একটা কাজে ঢাকায় এসেছে। থাকার জায়গা নেই। বুধবারে চলে যাবে।

নাসিমা বিরক্ত স্বরে বললেন, থাকার জায়গা নেই মানে ? হোটেল আছে কী জন্যে ? বাড়িতে সেয়ানা মেয়ে। এর মধ্যে ছেলে-ছোকরা এনে ঢুকানোর মানেটা কী ? দেখি তোর বাবাকে টেলিফোনটা দে তো।

মতিন সাহেব টেলিফোনটা ধরতে রাজি হলেন না। কারণ তিনি বিবিসি শুনছেন। এই অবস্থায় তাঁকে হাতি দিয়ে টেনেও কোথাও নেওয়া যাবে না। বিবিসি একটা বেশ মজার খবর দিল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আমেরিকান টিভি এনবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন—'আলোচনার দ্বার রুদ্ধ নয়।' এর মানে কী ? কী আলোচনা ? কার সঙ্গে আলোচনা ? হাতি কি কাদায় পড়ে গেছে নাকি ? এঁটেল মাটির কাদা। মতিন সাহেব অনেকদিন পর ঢাকা রেডিও খুললেন। মাঝে-মধ্যে এদের কথাও শোনা দরকার। তেমন কোনো খবর নেই। দেশের সার্বিক পরিস্থিতির উন্নয়নের কারণে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন

শান্তি ও কল্যাণ কমিটির সভাপতি ফরিদ আহমেদ। মুসলিম লীগের সভাপতি হাশিমউদ্দীনের বিবৃতিও খুব ফলাও করে প্রচার করা হলো—ছাত্রছাত্রীরা যেন দেশদ্রোহীদের দূরভিসন্ধিমূলক ও মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত না হয়। তারা যেন একটি মূল্যবান শিক্ষাবছর নষ্ট না করে। শান্তিপূর্ণভাবে মেট্রিক পরীক্ষা পরিচালনার জন্যে সরকার যা করণীয় সবই করবেন।

পনেরই জুলাই থেকে মেট্রিক পরীক্ষা। ওইদিন একটা শো-ডাউন হবে বলে মতিন সাহেবের ধারণা। মুক্তিবাহিনীর আজদাহারা নিশ্চয়ই পরীক্ষা বানচাল করবার কাজে নামবে। ওইদিন একটা উলটপালট হয়ে যাবে। এটা চোখ বন্ধ করে বলে দেওয়া যায়। মতিন সাহেব তাঁর রক্তের ভেতরে একধরনের উত্তেজনা অনুভব করলেন।

সুরমা রাতের খাবারের আয়োজন করছিলেন। তাঁর মুখ বিষণ্ন। কোনো কারণে তিনি খুবই বিচলিত। কারণটি কী নিজেও স্পষ্ট জানেন না। মাঝে মাঝে তাঁর এরকম হয়। রাত্রি এসে মার পাশে দাঁড়াল। সুরমা বললেন, কিছু বলবি ?

হ্যাঁ মা, উনাকে ভেতরের ঘরে থাকতে দেওয়া উচিত।

আলমের কথা বলছিস ?

হ্যাঁ। বসার ঘরে থাকলেই সবার চোখে পড়বে। ফুফু টেলিফোনে জিজ্ঞেস করছিলেন। তাঁদের ড্রাইভার দেখে গেছে।

এখন আবার ভেতরের ঘরে নিয়ে গেলে সেটা কি আরও বেশি করে চোখে পড়বে না ?

রাত্রি কিছু বলতে পারল না। বেশির ভাগ সময়ই সুরমা চমৎকার যুক্তি দিয়ে কথা বলেন।

রাত্রি।

বলো মা।

ভেতরে নেওয়ার আরেকটি সমস্যা কী জানিস ? ছেলেটি অস্বস্তি বোধ করবে। একবার ভেতরে নেওয়া হচ্ছে, একবার বাইরে। আবার ভেতরে। আমি কি ঠিক বলছি রাত্রি ?

ঠিকই বলছ।

সুরমা অস্পষ্টভাবে হাসলেন। মৃদুস্বরে বললেন, তোর যখন ইচ্ছা তাকে ভেতরেই নিয়ে আয়। বিন্তিকে বল ঘর পরিষ্কার করতে। অপালা কী করছে ? তাকে তো কোনো কাজেই পাওয়া যায় না। মুখের সামনে গল্পের বই ধরে বসে আছে। ওকেও লাগিয়ে দে।

রাত্রি কাউকে লাগাল না, নিজেই পরিষ্কার করতে লাগল। সুরমা একসময় উঁকি দিলেন। চমৎকার সাজানো হয়েছে। জানালায় পর্দা দেওয়া হয়েছে। একটা ছোট্ট বুক সেলফ আনা হয়েছে। বুক সেলফ ভর্তি বই। অপালার পড়ার টেবিলটিও আনা হয়েছে ঘরে। টেবিলে চমৎকার টেবিলক্লথ। পিরিচ দিয়ে ঢাকা পানির জগ এবং গ্লাস। সুরমা বিস্মিত হয়ে বললেন, ব্যাপার কী রাত্রি ?

রাত্রি লজ্জা পেয়ে গেল। তার গাল ঈষৎ লাল হয়ে গেল। এই ক্ষুদ্র পরিবর্তনও সুরমার চোখ এড়িয়ে গেল না। তিনি হালকা স্বরে বললেন, ছেলেটা হঠাৎ এই পরিবর্তন দেখে কী ভাববে বল তো ?

কিছুই ভাববেন না। উনি অন্য ব্যাপারে ডুবে আছেন। কিছুই তাঁর চোখে পড়বে না। উনি আছেন একটা ঘোরের মধ্যে।

তুই যা করেছিস চোখে না পড়ে উপায় আছে ?

আলমের কিছু চোখে পড়ল বলে মনে হলো না। সে সহজভাবেই ভেতরের ঘরে চলে এল। 'প্রথম কদম ফুল'-এর পাতা উল্টাতে লাগল। রাত্রি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে হাসিমুখে বলল, বইটা কেমন লাগছে ?

ভালো।

ছেলেটার ওপর আপনার রাগ লাগছে না ?

কোন ছেলেটার ওপর ?

কাকলীর হাজবেন্ড।

না, রাগ লাগবে কেন ?

আপনার কি আর কিছু লাগবে ?

না, কিছু লাগবে না।

ড্রয়ারে মোমবাতি আছে। যদি বাতি নিভে যায় মোমবাতি জ্বালাবেন।

ঠিক আছে, জ্বালাব।

রাত দশটায় মতিন সাহেব আলমকে ডাকতে এলেন ভয়েস অব আমেরিকা শুনবার জন্যে। আলম বলল, তার মাথা ধরেছে, সে শুয়ে থাকবে। মতিন সাহেব তবু খানিকক্ষণ ঝুলাঝুলি করলেন। একা একা তার কিছু শুনতে ইচ্ছা করে না। আজ রাত্রিও নেই। দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে।

মতিন সাহেব শোবার ঘরে ঢুকলেন। সুরমা জেগে আছে এখনো। আলনায় কাপড় রাখছে। মতিন সাহেব ভয়ে ভয়ে বললেন, সুরমা, ভয়েস অব আমেরিকা শুনবে ? সুরমা শীতল গলায় বললেন, না।

আজ কিছু ইন্টারেস্টিং ডেভলপমেন্ট শোনা যাবে বলে আমার ধারণা।

সুরমা জবাব দিলেন না।

৫

আলমের ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। আঁধার তখনো কাটেনি। চারদিকে ভোর হওয়ার আগের অদ্ভুত নীরবতা। কিছুক্ষণের ভেতরই সূর্য উঠার মতো বিরাট একটা ঘটনা ঘটবে। প্রকৃতি যেন তার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। আলম নিঃশব্দে বিছানা থেকে নামল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক থেকে আজানের শব্দ হতে লাগল। ঢাকা শহরে এত মসজিদ আছে ? আলম হকচকিয়ে গেল। ভোরবেলায় অদ্ভুত অন্ধকারে চারদিক থেকে ভেসে আসা আজানের

শব্দে অন্যরকম কিছু আছে। কেমন যেন ভয়ভয় লাগে। আলমের প্রায় সারা জীবন এই শহরেই কেটেছে কিন্তু সকালবেলার এই ছবির সঙ্গে তার দেখা হয়নি। সব মানুষই বোধহয় অনেক কিছু না জেনে বড় হয়।

সুরমা বারান্দায় বসে অজু করছিলেন। আলমকে বেরুতে দেখে বেশ অবাক হলেন। মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে পরিষ্কার গলায় বললেন, রাতে ঘুম হয়নি ? তাঁর গলায় খানিকটা উদ্বেগ ছিল। আলমকে তা স্পর্শ করল। সে হাসিমুখে বলল, ভালো ঘুম হয়েছে। খুব ভালো। আপনি কি রোজ এ সময়ে জাগেন ?

হ্যাঁ। নামাজ পড়ি। নামাজ শেষ করে আবার ঘুমিয়ে পড়ি। তারপর সাতটা সাড়ে সাতটার দিকে রাত্রি ডেকে তুলে।

সুরমা হাসতে লাগলেন। যেন খুব একটা হাসির কথা বলেছেন। ভোরবেলার বাতাসে কিছু একটা বোধহয় থাকে। মানুষকে তরল করে ফেলে। আলম বলল, আজ আমাদের একটা বিশেষ দিন।

বুঝতে পারছি। তোমার কি ভয় লাগছে ?

ভয় না। অন্যরকম লাগছে। আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব না। মেট্রিক পরীক্ষায় প্রথম ঘণ্টা পড়বার সময় যেরকম লাগে সেরকম।

কিন্তু এ ধরনের কাজ তো তুমি এর আগেও করেছ।

তা করেছি। অবশ্যি এখানকার অবস্থাটা অন্যরকম।

তুমি কি আল্লাহ বিশ্বাস করো ? তোমার বয়েসী যুবকরা খানিকটা নাস্তিক ধরনের হয়, সেইজন্যে বলছি।

আলম কিছু বলল না। সুরমা তার প্রশ্নের জবাবের জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। জবাব পেলেন না। তিনি হালকা গলায় বললেন, নামাজ শেষ করে এসে আমি একটা দোয়া পড়ে তোমার মাথায় ফুঁ দিতে চাই। তোমার কোনো আপত্তি আছে ?

না, আপত্তি থাকবে কেন ?

ঠিক আছে, আমি নামাজ শেষ করে আসছি। রাত্রিকে ডেকে দিচ্ছি সে তোমাকে চা বানিয়ে দেবে।

ডাকতে হবে না। আমার এত ঘনঘন চা খাবার অভ্যেস নেই।

সুরমা রাত্রিকে ডেকে তুললেন। সাধারণত ফজরের নামাজ তিনি চট করে সেরে ফেলেন কিন্তু আজ অনেক সময় নিলেন। কোথায় যেন পড়েছিলেন নামাজের শেষে পার্থিব কিছু চাইতে নেই। তাতে নামাজ নষ্ট হয়। কিন্তু আজ তিনি পার্থিব জিনিসই চাইলেন। অসংখ্যবার বললেন, এই ছেলেটিকে নিরাপদে রাখো। ভালো রাখো। সে যেন সন্ধ্যাবেলা আবার ঘরে ফিরে আসে। হারিয়ে না যায়।

বলতে বলতে একসময় তাঁর চোখে পানি এসে গেল। একবার পানি এসে গেলে খুব মুশকিল। তখন যাবতীয় দুঃখের কথা মনে পড়ে যায়। কিছুতেই আর কান্না থামানো যায় না। সুরমার তাঁর বাবার কথা মনে পড়ল। ক্যানসার হয়ে যিনি অমানুষিক যন্ত্রণা

ভোগ করে মারা গেছেন। মৃত্যুর ঠিক আগে আগে পানি খেতে চেয়েছিলেন। চামচে করে পানি খাওয়াতে হয়। কী আশ্চর্য! একটা চামচ সেই সময় খুঁজে পাওয়া গেল না। শেষপর্যন্ত হাতে আঁজলা করে পানি নিয়ে গেলেন সুরমা। সেই পানি মুখ পর্যন্ত নিতে নিতে আঙুল গলে নিচে পড়ে গেল। অতি কষ্টের মধ্যেও এই দৃশ্য দেখে তাঁর বাবা হেসে ফেললেন। তাঁর পানি খাওয়া হলো না। কত অদ্ভুত মানুষের জীবন!

রাত্রি ঘরে ঢুকে দেখল, তার মা জায়নামাজে এলোমেলো হয়ে শুয়ে আছেন। কান্নার জন্যেই শরীর বারবার কেঁপে উঠছে। সে নিঃশব্দে বের হয়ে গেল। আলমকে চা দিয়ে আসা হয়েছে। আবার সেখানে যাওয়াটা ভালো দেখায় না। কিন্তু যেতে ইচ্ছা করছে। মাঝে মাঝে অর্থহীন গল্পগুজব করতে ইচ্ছা করে। রাত্রি আলমের ঘরে উঁকি দিল।

আবার এলাম আপনার ঘরে।

আসুন।

চিনি হয়েছে কি না জানতে এসেছি।

হয়েছে। থ্যাংকস।

রাত্রি খাটে গিয়ে বসল। আলমের কেমন লজ্জা করতে লাগল। রাত্রির গায়ে আলখাল্লা জাতীয় লম্বা পোশাক, সাধারণ নাইটির মতো বাহারি কোনো জিনিস নয়। এই পোশাকে তাকে অন্যরকম লাগছে। সে পা দোলাতে দোলাতে বলল, আপনি আজ এত ভোরে উঠেছেন কেন?

জানি না কেন। ঘুম ভেঙে গেল।

টেনশন থাকলে ঘুম ভেঙে যায়।

তা যায়।

আমার উল্টোটা হয়। টেনশনের সময়ে শুধু ঘুম পায়।

একেকজন মানুষ একেক রকম।

তা ঠিক। আমরা সবাই আলাদা।

আলম সিগারেট ধরাল। তার সিগারেটের কোনো তৃষ্ণা হয়নি। অস্বস্তি কাটানোর জন্যে ধরানো। তার অস্বস্তির ব্যাপারটা কি মেয়েটি টের পাচ্ছে? পাচ্ছে নিশ্চয়ই। এসব সূক্ষ্ম ব্যাপার মেয়েরা সহজেই টের পায়। আলম বলল, আপনি খুব ভোরে উঠেন?

হ্যাঁ উঠি। অন্ধকার থাকতে আমার ঘুম ভাঙে। খুব খারাপ লাগে তখন।

খারাপ লাগে কেন?

সবাই ঘুমুচ্ছে আমি জেগে আছি এইজন্যে। যখন ছোট ছিলাম তখন গেট খুলে বাইরে যেতাম। একা একা হাঁটতাম। ছোটবেলায় আমি খুব সাহসী ছিলাম।

এখন সাহসী না?

না। ছোটবেলায় আমি একটি কুৎসিত ঘটনা দেখি। তারপর আমার সব সাহস চলে যায়। আমি এখন একটি ভীরু ধরনের মেয়ে।

রাত্রি তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে। পা দোলাচ্ছে না, কাঠিন্য চলে এসেছে তার চোখে-মুখে। আলম অবাক হয়ে এই সূক্ষ্ম কিন্তু তীক্ষ্ণ পরিবর্তনটি লক্ষ করল। রাত্রি বলল, আমি কী দেখেছিলাম তা তো জিজ্ঞেস করলেন না ?

জিজ্ঞেস করলে আপনি বলবেন না, তাই জিজ্ঞেস করিনি।

ঠিক করেছেন। আমি বলতাম না, কাউকেই বলিনি। মাকেও বলিনি। যাই কেমন ?

রাত্রি উঠে দাঁড়াল। এবং দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেল।

রাত্রির ফুফু নাসিমার বয়স চল্লিশের উপরে। কিন্তু তাঁকে দেখে সেটা বোঝার কোনো উপায় নেই। এখনো তাকে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের তরুণীর মতো লাগে। ভিড়ের মধ্যে লোকজন তাঁর গায়ে হাত দিতে চেষ্টা করে। একবার এরকম একটা ছোকরাকে তিনি হাতেনাতে ধরে ফেললেন এবং হাসিমুখে বললেন, তোমার বয়স কত খোকা ? ছেলেটি এ জাতীয় দৃশ্যের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। সে ঘেমে নেয়ে উঠল। নাসিমা ধারাল গলায় বললেন, আমার বড় মেয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। বুঝতে পারছ ?

তাঁর বড় মেয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে এটা ঠিক না। নাসিমার কোনো ছেলেপুলে নেই। বড় মেয়ে বলতে তিনি বুঝিয়েছেন রাত্রিকে। বাইরের কেউ যদি জিজ্ঞেস করে—আপনার ছেলেমেয়ে ক'টি ? তিনি সহজভাবেই বলেন, আমার কোনো ছেলে নেই। দুটি মেয়ে—রাত্রি এবং অপালা। এটা তিনি যে শুধু বলেন তাই না, মনেপ্রাণে বিশ্বাসও করেন। তাঁর বাড়িতে এদের দুজনের জন্যে দুটি ঘর আছে। সেই ঘর দুটি ওদের ইচ্ছামতো সাজানো। সপ্তাহে খুব কম হলেও তিন দিন এই ঘর দুটিতে দুবোনকে থাকতে হয়। নয়তো নাসিমা অস্থির হয়ে যান। তাঁর কিছু বিচিত্র অসুখ দেখা দেয়। হিস্টিরিয়ার সঙ্গে যার কিছু মিল আছে।

নাসিমার স্বামী ইয়াদ সাহেব লোকটি রসকষহীন। চেহারা চালচলন সবই নির্বোধের মতো, কিন্তু তিনি নির্বোধ নন। কোনো নির্বোধ লোক একা একা একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম শুরু করে বারো বছরের মাথায় কোটিপতি হতে পারে না। ইয়াদ সাহেব হয়েছেন। যদিও এই বিত্ত তাঁর জীবনযাপন পদ্ধতির ওপর কোনো রকম ছাপ ফেলেনি। তিনি এখনো গায়ে তেল মেখে গোসল করেন। এবং স্ত্রীকে ভয় করেন। অসম্ভব রকম বিত্তবান লোকজন স্ত্রীদের ঠিক পরোয়া করে না।

ভোর আটটায় নাসিমা ইয়াদ সাহেবকে ডেকে তুললেন। তাঁর ডাকার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল যে ইয়াদ সাহেবের বুক ধড়ফড় করতে লাগল। তিনি ভয়-পাওয়া গলায় বললেন, কী হয়েছে ?

তোমার গাড়ি পাঠালাম রাত্রিদের আনবার জন্যে।

ও আচ্ছা।

ইয়াদ সাহেব আবার ঘুমুবার আয়োজন করলেন।

তুমি কিন্তু আজ অফিসে-টফিসে যাবে না।

কেন ?

আজ রাত্রিকে দেখতে আসবে। তোমার থাকা দরকার।

আমি থেকে কী করব ?

কিছু করবে না। থাকবে আর কী। এসব কাজে ব্যাকগ্রাউন্ডে একজন পুরুষমানুষ থাকা দরকার।

দরকার হলে থাকব। এখন একটু ঘুমাই, কী বলো ?

আচ্ছা ঘুমাও।

ইয়াদ সাহেব চোখ বন্ধ করে পাশ ফিরলেন। ছুটে যাওয়া ঘুম ফিরে এল না। কিছুদিন থেকেই তাঁর দিন কাটছে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায়। মোহাম্মদপুরের তাঁদের মূল বাড়িটি বিহারীদের দখলে। দেশ স্বাধীন না হলে এ বাড়ি ফিরে পাওয়া যাবে না। অসম্ভব। দেশ চট করে স্বাধীন হয়ে যাবে এরকম কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। চট করে পৃথিবীর কোনো দেশই স্বাধীন হয়নি। ইংরেজ তাড়াতে কত দিন লেগেছে ? এখানেও তাই হবে। বছরের পর বছর লাগবে। তারপর একসময় বাঙালিরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে। এই একটা অদ্ভুত জাতি। নিমিষের মধ্যে উৎসাহে পাগল হয়ে ওঠে, আবার সে উৎসাহ নিভেও যায়।

ইয়াদ সাহেব উঠে বসলেন। কাজের ছেলেটিকে বেড টি-র কথা বলে চুরুট ধরালেন। তাঁর বমি বমি ভাব হলো। তিনি বিছানা থেকে নেমে হেঁটে হেঁটে বারান্দায় গেলেন। বারান্দার সামনে ঘুপসি মতো গলি। তিনি বেঁচে থাকতে থাকতে কি দেশ স্বাধীন হবে ? ফিরে পাওয়া যাবে নিজের বাড়ি ? ইয়াদ সাহেব খানিকটা লজ্জিত বোধ করলেন। তিনি দেশের স্বাধীনতা চাইছেন ব্যক্তিগত স্বার্থে—এটা ঠিক হচ্ছে না।

চায়ের পেয়ালা নিয়ে তিনি বাসিমুখে নিজের স্টাডিরুমে ঢুকলেন। তাঁর অফিসের যাবতীয় কাগজপত্র এই ছোট্ট ঘরটিতে আছে। এখানে তিনি দীর্ঘ সময় কাটান। নিজের তৈরি ব্লুপ্রিন্টগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতে তাঁর ভালো লাগে। কিন্তু আজ কিছুই ভালো লাগছে না। আলস্য অনুভব করছেন। ব্যবসা-বাণিজ্য এখন কিছুই নেই। সব রকম কনস্ট্রাকশনের কাজ বন্ধ হয়ে আছে। সরকারের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা পাওনা। সেটা পাওয়া যাচ্ছে না। যাবেও না সম্ভবত। সব জলে যাবে। তাঁর মতে বাঙালিদের এই যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কনস্ট্রাকশন ফার্মগুলি। এদের কোমর ভেঙে গেছে। এই কোমর আর ঠিক হবে না। দেশ স্বাধীন হলেও না। তিনি একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। কলিংবেল বাজছে। মেয়ে দুটি এসেছে নিশ্চয়ই। এদের তাঁর ভালো লাগে না। কিন্তু তবু তিনি হাসিমুখে দরজা খুলে বের হলেন। এবং অমায়িক ভঙ্গিতে বললেন—রাত্রি মা, কেমন আছ ?

ভালো আছি ফুফা।

অপালা মা, মুখটা এমন কালো কেন ?

অপালা জবাব দিল না। সে তার ফুফাকে পছন্দ করে না। একেবারেই না। ইয়াদ সাহেব বললেন, কী গো মা, কথা বলছ না কেন ?

কথা বলতে ভালো লাগছে না, তাই বলছি না।

ইয়াদ সাহেব চুপ করে গেলেন।

আলম দোকানটির সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল। এটিই কি সেই দোকান ? নাম অবশ্যি সেরকমই—'মডার্ন নিয়ন সাইনস'। এখানেই সবার জড়ো হওয়ার কথা। কিন্তু দোকানটি সদর রাস্তার উপরে। তাছাড়া ভেতরে যে লোকটি বসে আছে তার চেহারা কেমন বিহারি বিহারি। কার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে বলতে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। কোনো বাঙালি ছেলে এই সময়ে এমনভাবে হাসবে না। এটা হাসির সময় না। আলম দোকানে ঢুকে পড়ল।

চেক হাওয়াই শার্ট পরা ছেলেটির ঠোঁটের ওপর সুঁচালো গোঁফ। গলায় সোনার চেইন বের হয়ে আছে। রোগা টিঙটিঙে কিন্তু কথা বলার ভঙ্গি কেমন উদ্ধত। ছেলেটি টেলিফোন নামিয়ে রাগী গলায় বলল, কাকে চান ?

এটা কি মডার্ন নিয়ন সাইন ?

হ্যাঁ।

আমি আশফাক সাহেবকে খুঁজছি।

আমিই আশফাক। আপনার কী দরকার ?

আমার নাম আলম।

ছেলেটির তীক্ষ্ণদৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ হলো, কিন্তু কথা বলল নরম গলায়—আপনি ভেতরে ঢুকে যান। সিঁড়ি আছে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় চলে যান।

আর কেউ এসেছে ?

রহমান ভাই এসেছে। যান, আপনি ভেতরে চলে যান।

ভেতরটা অন্ধকার। অসংখ্য নিয়ন টিউব চারদিকে ছড়ানো। একজন বুড়োমতো লোক এই অন্ধকারেই বসে কী সব নকশা করছে। সে একবার চোখ তুলে আলমকে দেখল। তার কোনোরকম ভাবান্তর হলো না। চোখ নামিয়ে নিজের মতো কাজ করতে লাগল।

দোতলায় দুটি ঘর। একটিতে প্রকাণ্ড একটি তালা ঝুলছে। অন্যটি খোলা। রঙিন পর্দা ঝুলছে। রেলিং-এ মেয়েদের কিছু কাপড়। ঘরের ভেতর থেকে ক্যাসেটে গানের শব্দ আসছে—'হাওয়ামে উড়তা যায়ে মেরা লাল দুপাট্টা মলমল।' আলম ধাঁধায় পড়ে গেল। সে মৃদুস্বরে ডাকল, রহমান! রহমান!

রহমান বেরিয়ে এল। তার গায়ে একটা ভারী জ্যাকেট। মুখ শুকনো। এমনিতেই সে ছোটখাট মানুষ। এখন তাকে আরও ছোট দেখাচ্ছে। রহমান হাসতে চেষ্টা করল।

আসুন আলম ভাই।

তোমার এই অবস্থা কেন ? কী হয়েছে ?

শরীর খারাপ করে ফেলেছে। জ্বর, সর্দি, কাশি। বুড়োদের অসুখ-বিসুখ। একশ দুই। অসুবিধা হবে না। চারটা অ্যাসপিরিন খেয়েছি। জ্বর নেমে যাবে। সকালে একশ তিন ছিল। ভেতরে আসুন আলম ভাই।

ভেতরে কে কে আছে ?

কেউ এখনো এসে পৌঁছেনি। আমি ফার্স্ট, আপনি সেকেন্ড। এসে পড়বে।

আলম ঘরে ঢুকল। ছোট্ট ঘর। আসবাবপত্রে ঠাসা। বেমানান একটা কারুকার্য করা বিশাল খাট। খাটের সঙ্গে লাগোয়া একটা স্টিলের আলমারি। তার একটু দূরে ড্রেসার। জানালার কাছে খাটের মতোই বিশাল টেবিল। এত ছোট্ট একটা ঘরে এতগুলি আসবাবের জায়গা হলো কীভাবে কে জানে।

আলম নিচু গলায় বলল, জিনিসপত্র সব কি এখানেই ?

সব না। কিছু আছে। বাকিগুলি সাদেকের কাছে। যাত্রাবাড়িতে।

আশফাক ছেলেটি কেমন ?

ওয়ান হানড্রেড পারসেন্ট গোল্ড। আপনার কাছে বিহারি বিহারি লাগছিল, তাই না ? চুল ছোট করে কাটায় এরকম লাগছে। গলায় আবার চেইন-টেইন আছে। উর্দু বলে ফ্লুয়েন্ট।

বাড়ি কোথায় ?

খুলনার সাতক্ষীরায়।

ফ্লুয়েন্ট উর্দু শিখল কার কাছে ?

সিনেমা দেখে নাকি শিখেছে। 'নাচে নাগিন বাজে বীণ' নামের একটা ছবি নাকি সে ন'বার দেখেছে। আলম ভাই, পা তুলে বসেন।

আলম ঠিক স্বস্তি বোধ করছিল না। সে থেমে থেমে বলল, জায়গাটা কেমন যেন সেফ মনে হচ্ছে না।

প্রথম কিছুক্ষণ এরকম মনে হয়। আমারও মনে হচ্ছিল। আশফাকের সঙ্গে কথাবার্তা বললে বুঝবেন এটা অত্যন্ত সেফ জায়গা।

ছেলেটা একটু বেশি স্মার্ট। বেশি স্মার্ট ছেলেপুলে কেয়ারলেস হয়। আর জায়গাটা খুব এক্সপোজড। মেইন রোডের পাশে।

রহমান শান্তস্বরে বলল, মেইন রোডের পাশে বলেই সন্দেহটা কম। আইসোলেটেড জায়গাগুলি বেশি সন্দেহজনক।

আমার কেন জানি ভালো লাগছে না।

আপনার আসলে আশফাকের ওপর কনফিডেন্স আসছে না। ও যাচ্ছে আমাদের সাথে।

ও যাচ্ছে মানে ?

গাড়ি চালাবে। ওর একটা পিকআপ আছে। সাদেককে তো আপনিই বলেছেন দুটি গাড়ি থাকবে। পেছনেরটা কভার দেবে। অবশ্যি আপনি নিতে না চাইলে ওকে বাদ দেবেন।

নিচে বসে থাকা বুড়ো লোকটি চা আর ডালপুরি নিয়ে এল। রহমান শুয়ে পড়ল চোখ বন্ধ করে। তার বেশ ঘাম হচ্ছে। জ্বর ছেড়ে দিচ্ছে বোধহয়। সে ক্ষীণস্বরে বলল, চা খান আলম ভাই।

আলম চা বা ডালপুরিতে কোনোরকম আগ্রহ দেখাল না। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখতে লাগল। নায়িকাদের ছবি কেটে কেটে দেয়ালে লাগানো। এর মধ্যে বেশিরভাগ ছবিই অত্যন্ত আপত্তিকর। আলম বলল, মেয়েমানুষ কেউ কি থাকে এখানে?

জি-না।

রেলিং-এ মেয়েদের কিছু জামাকাপড় দেখলাম।

আমি লক্ষ করিনি। আপনার মনের মধ্যে কিছু-একটা ঢুকে গেছে আলম ভাই।

আলম জবাব দিল না। গুনগুন করতে করতে আশফাক এসে ঢুকল। ফুর্তিবাজের গলায় বলল, চা-ডালপুরি কেউ খাচ্ছে না, ব্যাপারটা কী? ডালপুরি ফ্রেশ। আলম ভাই, খেয়ে দেখেন একটা। আপনার সঙ্গে পরিচয় করবার জন্যে এলাম।

বসুন।

ড্রাইভার হিসেবে আমাকে দলে নেন। দেখেন কী খেল দেখাই। আমার একটা পঙ্খীরাজ আছে। দেখলে মনে হবে ঘণ্টায় দশ মাইলও যাবে না, কিন্তু আমি আশি মাইল তুলে আপনাকে দেখাব।

আলম শীতল গলায় বলল, আশফাক সাহেব, কিছু মনে করবেন না। এ জায়গাটা আমার সেফ মনে হচ্ছে না।

আশফাক হকচকিয়ে গেল। বিস্মিত গলায় বলল, সেফ মনে হচ্ছে না কেন?

জানি না কেন। ইনট্যুশন বলতে পারেন।

ঢাকা শহরে যে কয়টা সেফ বাড়ি আছে তার মধ্যে এটা একটা। আশেপাশের সবাই আমাকে কড়া পাকিস্তানি বলে জানে। মাবুদ খাঁ বলে ইনফেনট্রির এক মেজরের সঙ্গে আমার খুব খাতির। সে সপ্তাহে অন্তত একদিন আমার ঘরে আসে আড্ডা দেওয়ার জন্যে।

আলম কিছু না বলে সিগারেট ধরাল। আশফাক বলল, এখনো কি আপনার এ বাড়ি আনসেফ মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ হচ্ছে।

তাহলে সবাই আসুক, তারপর আমরা অন্য কোথাও চলে যাব।

সবাই চুপ করে গেল। আশফাককে দেখে মনে হচ্ছে সে আহত হয়েছে। হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে সে সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় সিগারেট ধরাল। নিষ্প্রাণ গলায় বলল, রহমান ভাই, আপনার জ্বর কি কমেছে?

বুঝতে পারছি না। ঘরে থার্মোমিটার আছে ?

আছে।

থার্মোমিটার দিয়ে দেখা গেল জ্বর একশ'র অল্প কিছু উপরে, কিন্তু রহমানের বেশ খারাপ লাগছে। বমির বেগ হচ্ছে। বমি করতে পারলে হয়তো একটু আরাম হবে। সে বিছানা থেকে নেমে বাথরুমের দিকে এগুলো। বাথরুমের দরজা খুলেই হড়হড় করে বমি করল। নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসছে বলে মনে হচ্ছে। পৃথিবী দুলছে। রহমান ক্লান্তস্বরে বলল, মাথাটা ধুইয়ে দিন তো আশফাক সাহেব। অবস্থা কাহিল।

আলম চিন্তিত মুখে বলল, তোমার শরীর তো বেশ খারাপ। কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমার চলবেও না। ডেটটা কি পিছিয়ে দেব ?

আরে না। আজই সেই দিন। আমাকে নিয়ে চিন্তা করবেন না। বমি করবার পর ভালোই লাগছে। ঘণ্টাখানিক থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে।

রহমান চাদর গায়ে বিছানায় এসে শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ল। নিচে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। সাদেকের উঁচুগলায় ফুর্তির ছোঁয়া। যেন তারা সবাই মিলে পিকনিকে যাওয়ার মতো কোনো ব্যাপার নিয়ে আলাপ করবে। রঙ্গতামাশা করবে।

মতিন সাহেব আজ অফিসে যাননি। যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়েছিলেন। জামা জুতো পরেছিলেন। দশবার 'ইয়া মুকাদ্দেমু' বলে ঘর থেকেও বেরিয়েছিলেন। পিলখানার তিন নম্বর গেটের কাছে এসে একটি অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখে পাথর হয়ে গেলেন। খোলা ট্রাকে করে দুটি অল্পবয়েসী ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলে দুটির হাত পেছন দিকে বাঁধা। ভাবশূন্য মুখ। একজনের চোখে আঘাত লেগেছে। চোখ এবং মুখের এক অংশ বীভৎসভাবে ফুলে উঠেছে। কালো পোশাক পরা একদল মিলিশিয়া ওদের ঘিরে আছে। তাদের একজনের হাতে একটি রুমাল। সে রুমাল দিয়ে খেলার ছলে ছেলে দুটির মাথায় ঝাপটা দিচ্ছে, বাকিরা সবাই হেসে উঠছে। ট্রাক চলছিল। কাজেই দৃশ্যটির স্থায়িত্ব খুব বেশি হলে দেড় মিনিট। এই দেড় মিনিট মতিন সাহেবের কাছে অনন্তকাল বলে মনে হলো। সমস্ত ব্যাপারটাতে প্রচণ্ড হৃদয়হীন কিছু আছে। মতিন সাহেবের পা কাঁপতে লাগল। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। ব্যাপারটা যে শুধু তাঁর ক্ষেত্রেই ঘটল তা না। তাঁর আশেপাশে যারা ছিল সবাই যেন কেমন হয়ে গেল। মতিন সাহেবের মনে হলো ছেলে দুটিকে ওরা যদি মারতে মারতে নিয়ে যেত তাহলে তাঁর এমন লাগত না। রুমাল দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে তামাশা করছে বলেই এমন লাগছে। তিনি বাসায় ফিরে চললেন।

পানওয়ালা ইদ্রিস বলল, অফিসে যাবেন না ?

না। শরীরটা ভালো না। দেখি একটা পান দাও।

পান খাওয়ার তাঁর দরকার ছিল না। এ সময়ে সবাই অদরকারি কাজগুলি করে, অপ্রয়োজনীয় কথা বলে। ভয় কাটানোর জন্যেই করে। ভয় তবু কাটে না। যত দিন যায় ততই তা বাড়তে থাকে।

দুটা ছেলেকে ধরে নিয়ে গেল। দেখলে ইদ্রিস মিয়া ?

জি দেখলাম। নেন পান নেন।

মতিন সাহেব পান মুখে দিয়ে নিচু গলায় বললেন, এই অবস্থা বেশি দিন থাকবে না। আজদাহা নেমে গেছে।

বলেই তিনি হকচকিয়ে গেলেন। একজন পানওয়ালার সঙ্গে এসব কী বলছেন? ইদ্রিস মিয়া হয়তো তাঁর কথা পরিষ্কার শোনেনি। কিংবা শুনলেও অর্থ বুঝতে পারেনি। সে একটি আগরবাতি জ্বালাল। আগেরটি শেষ হয়ে গেছে।

সুরমা একবার জিজ্ঞেসও করলেন না—অফিসে যাওনি কেন। তিনি নিজের মনে কাজ করে যেতে লাগলেন। সাবানপানি দিয়ে ঘরের মেঝে নিজের হাতে মুছলেন। কার্পেট শুকাতে দিলেন। বাথরুমে ঢুকলেন প্রচুর কাপড় নিয়ে। আজ অনেকদিন পর কড়া রোদ উঠেছে। রোদটা ব্যবহার করা উচিত।

মতিন সাহেব কী করবেন ভেবে পেলেন না। কিছুক্ষণ বারান্দায় বসে রইলেন। তারপরই তাঁর মনে হলো অফিসে না গিয়ে তিনি বারান্দায় বসে আছেন এটা লোকজনের চোখে পড়বে। তিনি ভেতরের ঘরে গেলেন। ঝকঝকে মেঝে মাড়িয়ে যেতে খারাপ লাগে। সুরমা কিছু বলছেন না কিন্তু তাকিয়ে আছেন কড়া চোখে। মতিন সাহেব বাগানে গেলেন। বাগান মানে বারান্দার কাছ ঘেঁসে এক চিলতে উঠোন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি এখানে শাকসবজি ফলাবার চেষ্টা করছেন। ফলাতে পারেননি। মরা মরা ধরনের কিছু গাছপালা হয়ে কিছুদিন পর আপনাআপনি শুকিয়ে যায়। সার-টার সব দিয়েও একই অবস্থা। নিজেই একবার মাটি নিয়ে জয়দেবপুর গিয়েছিলেন সয়েল টেস্টিং-এর জন্যে। তারা এক সপ্তাহ পর যেতে বলল। তিনি গেলেন এক সপ্তাহ পর। তিন ঘণ্টা বসে থাকার পর কামিজ পরা অত্যন্ত স্মার্ট একটি মেয়ে এসে বলল, আপনার স্যাম্পল তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি কি কষ্ট করে আরেকবার খানিকটা স্যাম্পল দিয়ে যেতে পারবেন? দু'একদিনের মধ্যে নিয়ে আসুন। তিনি নিয়ে যাননি।

কয়েকদিনের ক্রমাগত বৃষ্টির জন্যে বাগানে কাদা হয়েছে। জুতোসুদ্ধ পা অনেকখানি কাদায় ডেবে গেল। তিনি অবশ্যি তা লক্ষ করলেন না। কারণ তাঁর চোখ গিয়েছে কাঁকরুল গাছের দিকে। কাঁকরুল গাছ যে লাগানো হয়েছে তা তাঁর মনে ছিল না। আজ হঠাৎ দেখলেন একটা সতেজ গাছ। চড়া সবুজ রঙের পাতা চকচক করছে। তারচেয়েও বড় কথা—পাতার ফাঁকে বড় বড় কাঁকরুল ঝুলছে। কেউ লক্ষই করেনি। একটি আবার পেকে হলুদ বর্ণ হয়েছে। মতিন সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, রাত্রি, রাত্রি। রাত্রি বাসায় নেই। ভোরবেলায় তাঁর চোখের সামনে গাড়ি এসে নিয়ে গিয়েছে তা তাঁর মনে রইল না। উত্তেজিত স্বরে তিনি দ্বিতীয়বার ডাকলেন, রাত্রি, রাত্রি।

সুরমা ঘর মোছা বন্ধ করে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ বিষণ্ন। খানিকটা উদ্বেগ মিশে আছে সেখানে। তিনি বললেন, কী হয়েছে?

সুরমা, কাঁকরুল দেখে যাও। গাছ ভর্তি হয়ে আছে। কেউ এটা লক্ষই করে নাই। কী কাণ্ড!

সুরমা সত্যি সত্যি নেমে এলেন। তাঁর যা স্বভাব তাতে নেমে আসার কথা নয়। নোংরা কাদা থিকথিক বাগানে পা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

সুরমা, দেখো দেখো, পুঁইগাছটার দিকে দেখ। কেন এসব এতদিন কেউ দেখল না?

মতিন সাহেব গভীর মমতায় গাছের পাতায় হাত বুলাতে লাগলেন।

শুধু পুঁইগাছ নয়। রান্নাঘরের পাশের খানিকটা জায়গায় ডাঁটা দিয়েছিলেন। লাল লাল পুরুষ্টু ডাঁটা সেখানে। নিষ্ফলা মাটিতে হঠাৎ করে প্রাণ সঞ্চার হলো নাকি? আনন্দে মতিন সাহেবের দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো হলো। রাত্রিকে খবর দিতে হবে। ওরা এলে একসঙ্গে সবজি তোলা হবে। তাছাড়া বাগান পরিষ্কার করতে হবে। বড় বড় ঘাস জন্মেছে। এদের টেনে তুলতে হবে। মাটি কুপাতে হবে। ডাঁটা ক্ষেতে পানি জমেছে, নালা কেটে পানি সরাতে হবে। অনেক কাজ। অফিসে না গিয়ে ভালো হয়েছে। রাত্রিকে খবর দেওয়া দরকার। মতিন সাহেব কাদামাখা জুতো নিয়েই শোবার ঘরে ঢুকে পড়লেন। রাত্রিকে টেলিফোন করলেন। সুরমা দেখলেন তাঁর ধোয়া-মোছা মেঝের কী হাল হলো। কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না।

রাত্রিকে টেলিফোনে পাওয়া গেল না। নাসিমা বলল, ওর সঙ্গে এখন কথা বলা যাবে না। তুমি ঘণ্টাখানিক পরে রিং করবে।

মতিন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, এখন সে কী করছে?

একজন ভদ্রমহিলা তাকে দেখতে এসেছেন। সে কথা বলছে তাঁর সঙ্গে।

কেন দেখতে এসেছে রাত্রিকে?

কেন তুমি জানো না? তোমাকে তো বলা হয়েছে।

নাসিমা, ব্যাপারটা কী খুলে বল তো।

এখন বকবক করতে পারব না। রান্নাবান্না করছি। উনি খাবেন এখানে।

কে এখানে খাবেন?

দাদা, পরে তোমাকে সব গুছিয়ে বলব। এখন রেখে দেই। তুমি বরং অপালার সঙ্গে কথা বলো। ওকে ডেকে দিচ্ছি।

মতিন সাহেব রিসিভার কানে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অপালা আসছেই না। কোনো একটা গল্পের বই পড়ছে নিশ্চয়ই। গল্পের বই থেকে তাকে উঠিয়ে আনা যাবে না। তিনি যখন টেলিফোন রেখে দেবেন বলে মন ঠিক করে ফেলেছেন তখন অপালার চিকন গলা শোনা গেল।

হ্যালো বাবা।

হুঁ।

কী বলবে তাড়াতাড়ি বলো।

মতিন সাহেব উৎকণ্ঠিত স্বরে বললেন, তোদের ওখানে কী হচ্ছে?

আপার বিয়ে হচ্ছে।

কী বললি?

আপার বিয়ে হচ্ছে। বিবাহ। শুভ বিবাহ।

কী বলছিস এসব, কিছু বুঝতে পারছি না।

অপালা বিরক্ত স্বরে বলল, বাবা, আমি এখন রেখে দিচ্ছি। সে সত্যি সত্যি টেলিফোন রেখে দিল।

রাত্রি পা ঝুলিয়ে খাটে বসে আছে। তার সামনে বসে আছেন মিসেস রাবেয়া করিম। রাত্রির ধারণা ছিল একজন বুড়োমতো মহিলা আসবেন। তাঁর পরনে থাকবে সাদা শাড়ি। তিনি আড়চোখে রাত্রিকে কয়েকবার দেখে ভাসা ভাসা ধরনের কিছু প্রশ্ন করবেন—বাড়ি কোথায় ? ক' ভাইবোন ? কী পড়ো ? কিন্তু তার সামনে যিনি বসে আছেন তিনি সম্পূর্ণ অন্যরকম মহিলা। রেডক্রস লাগানো কালো একটি মরিস মাইনর গাড়ি নিজে চালিয়ে নিয়ে এসেছেন। মহিলাদের গাড়ি চালানো এমন কিছু অদ্ভুত ব্যাপার নয়। অনেকেই চালাচ্ছে। নাসিমাও চালায়। কিন্তু এই সময়ে একজন একা একা গাড়ি করে যাওয়া-আসা করে না।

ভদ্রমহিলা বেশ লম্বা। মাথার চুল কাঁচাপাকা। মুখটি কঠিন হলেও চোখ দু'টি হাসি হাসি। অসম্ভব আত্মবিশ্বাসী একজন মহিলা। রাত্রিকে দেখে প্রথম যে কথাটি বললেন তা হচ্ছে—তোমার ইন্টারভ্যু নিতে এলাম মা। রাত্রি হকচকিয়ে গেল।

প্রথমে নিজের পরিচয় দিয়ে নেই। আমি একজন ডাক্তার। মেডিকেল কলেজে গাইনির এসোসিয়েট প্রফেসর। আমার নাম রাবেয়া। তোমার ভালো নামটি কী ?

ফারজানা।

তুমি বসো এবং বলো, এত সুন্দর তুমি কীভাবে হলে ? এটা আমার প্রথম প্রশ্ন। খুব কঠিন প্রশ্ন।

ভদ্রমহিলা হাসতে লাগলেন। রাত্রি কী বলবে ভেবে পেল না।

হঠাৎ করে কেউ সুন্দর হয় না। এর পেছনে জেনেটিক কারণ থাকে। মনের সৌন্দর্য একজন নিজে নিজে ডেভেলপ করাতে পারে, কিন্তু দেহের সৌন্দর্য উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে হয়। বলো, তোমার মা এবং বাবা এদের দুজনের মধ্যে কে সুন্দর ?

মা।

শোনো রাত্রি, তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। তা কিছুই মিন করে না। তোমার পছন্দ-অপছন্দ আছে। এবং আমার মনে হচ্ছে তুমি খুব খুঁতখুঁতে ধরনের মেয়ে। আমি কি ঠিক বলেছি ?

ঠিকই বলেছেন।

ভদ্রমহিলা চা খেলেন। অপালার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করলেন এবং এক পর্যায়ে একটি হাসির গল্প বললেন। হাসির গল্পটি একটি ব্যাঙ নিয়ে। পরপর কয়েকদিন বৃষ্টি হওয়ায় ব্যাঙটির সর্দি হয়ে গেছে। ব্যাঙ সমাজে ছিঃ ছিঃ পড়ে গেছে। বেশ লম্বা গল্প। অপালা মুগ্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরপর হাসিতে ভেঙে পড়তে লাগল।

ভদ্রমহিলা এসেই বলেছিলেন আধঘণ্টা থাকবেন। কিন্তু তিনি পুরোপুরি তিন ঘণ্টা থাকলেন। দুপুরের খাবার খেলেন। খাবার শেষ করে রাত্রিকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে গেলেন। অস্বাভাবিক নরম গলায় বললেন, মা, তোমাকে কি আমি আমার ছেলের সম্পর্কে দু'একটি কথা বলতে পারি ?

রাত্রি লজ্জিত স্বরে বলল, বলুন।

তার সবচেয়ে দুর্বল দিকটির কথা আগে বলি। ওর থিংকিং প্রসেসটা একটু স্লো বলে আমার মনে হয়। যখন কেউ কোনো হাসির কথা বলে তখন সে প্রায়ই বুঝতে পারে না। বোকা মানুষদের মতো বলে—ঠিক বুঝতে পারলাম না।

রাত্রি অবাক হয়ে ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে রইল। তিনি এই কথাটি বলবেন তা বোধহয় সে ভাবেনি।

এখন বলি ওর সবচেয়ে সবল দিকটির কথা। পুরনো দিনের গল্প-উপন্যাসে এক ধরনের নায়ক আছে যারা জীবনে কোনো পরীক্ষাতে সেকেন্ড হয় না। ও সেরকম একটি ছেলে। মা, আমি খুব খুশি হব তুমি যদি খানিকক্ষণ ওর সঙ্গে কথা বলো। আমার ধারণা, কিছুক্ষণ কথা বললেই তোমার ওকে পছন্দ হবে। অবশ্যি ও কথা বলবে কি না জানি না। যা লাজুক ছেলে!

ছেলেটিকে না দেখেই রাত্রির কেমন যেন পছন্দ হলো। কথা বলতে ইচ্ছা হলো। তার একটু লজ্জা লজ্জাও লাগল। ভদ্রমহিলা বললেন, মা, তুমি কি ওর সঙ্গে কথা বলবে ?

হ্যাঁ বলব।

থ্যাংক য়্যু। যাই, কেমন ?

যাই বলার পরও তিনি আরও কিছুক্ষণ থাকলেন। নাসিমার সঙ্গে গল্প করলেন। অপালাকে আরও একটি হাসির গল্প বললেন। সেই গল্পটি তেমন জমল না। অপালা গম্ভীর হয়ে রইল।

ওরা 'মডার্ন নিয়ন সাইন' থেকে বেরুল দুপুর দুটায়। রহমানকে রেখে যেতে হলো। কারণ তার উঠে দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই। আলম চেয়েছিল রহমানকে তার জায়গায় রেখে আসতে। দলের সবাই আপত্তি করল। নাড়াচাড়া করার কোনো দরকার নেই। এখানে বিশ্রাম করুক। আশফাক বলল, জহুর মিয়া আছে, সে দেখাশোনা করবে। দরকার হলে চেনা একজন ডাক্তার আছে তাকে নিয়ে আসবে। কোনোই অসুবিধা নেই।

আলম গম্ভীর হয়ে রইল। রহমানকে বাদ দিয়ে আজকের অপারেশন শুরু করতে তার মন চাইছে না। এবং কেন যেন জায়গাটাকে তার নিরাপদ মনে হচ্ছে না। সারাক্ষণই মনে হচ্ছে কিছু-একটা হবে।

এরকম মনে হওয়ার তেমন কোনো কারণ নেই। এই শহরে মিলিটারিরা নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করছে। এরা এখানে শঙ্কিত নয়। আলাদাভাবে কোনো বাড়িঘরের দিকে নজর দেবে না। নজর দেওয়ার কথাও নয়। সাদেক বলল, আলম, তুই এত গম্ভীর কেন ? ভয় পাচ্ছিস নাকি ? আলম বলল, বেরিয়ে পড়া যাক।

তারা উঠে দাঁড়াল। আশফাককে নিয়ে ছ'জনের একটি দল। আলম বলল, রহমান, চললাম। রহমান উত্তর দিল না। তাকিয়ে রইল। তার জ্বর নিশ্চয়ই বেড়েছে। চোখ ঘোলাটে। জ্বরের জন্যে মুখ লাল হয়ে আছে।

তারা রাস্তায় বেরুতেই একটি মিলিশিয়াদের ট্রাক চলে গেল। মিলিশিয়ারা ভাবলেশহীন মুখে তাকিয়ে আছে। মনে হয়, অল্প কিছুদিন হলো এ দেশে এসেছে। নতুন পরিবেশে নতুন ধরনের জীবনযাত্রায় এখনো অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি।

সাদেক বলল, রওনা হওয়ার আগে পান খেলে কেমন হয় ? কেউ পান খাবে ?

জবাব পাওয়া গেল না। সাদেক লম্বা লম্বা পা ফেলে পান কিনতে গেল। নুরু বলল, সাদেক ভাইয়ের খুব ফুর্তি লাগছে মনে হয়। হাসতে হাসতে কেমন গল্প জমিয়েছে দেখেন।

সাদেক সত্যি সত্যি হাত-পা নেড়ে কী সব বলছে। সিগারেট কিনে শিস দিতে দিতে আসছে। এই ফুর্তির ভাবটা কতটুকু আন্তরিক বোঝার উপায় নেই। ফুর্তির ব্যাপারটা কারও কারও চরিত্রের মধ্যেই থাকে। হয়তো সাদেকেরও আছে।

আলম আকাশের দিকে তাকাল। নির্মেঘ আকাশ। ঘন নীলবর্ণ। বর্ষাকালের আকাশ এত নীল হয় না। আজ এত নীল কেন ?

৬

ভদ্রলোকের পরনে হাফ হাওয়াই শার্ট। বয়স খুব বেশি হলে পঁয়ত্রিশ হবে। কালো ফ্রেমের ভারী চশমার জন্যে বয়স কিছু বেশি মনে হচ্ছে। বেশ লম্বা, হাঁটছেন মাথা নিচু করে। তাঁর ডান হাতে একটি প্যাকেট। বাঁ হাত ধরে একটি মেয়ে হাঁটছে, তার বয়স পাঁচ-ছ'বছর। ভারি মিষ্টি চেহারা। তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। ছোট মেয়েটি ক্রমাগত কথা বলছে। ভদ্রলোক তার কোনো কথার জবাব দিচ্ছেন না। ভদ্রলোকের কম কথা বলার স্বভাবের সঙ্গে মেয়েটি পরিচিত। তাদের গাড়িটি বেশ খানিকটা দূরে পার্ক করা। তারা ছোট ছোট পা ফেলে গাড়ির দিকে যাচ্ছে। জায়গাটা বায়তুল মোকাররম। সময় তিনটা পাঁচ।

ভদ্রলোকের গাড়িটি নতুন। সাদা রঙের টয়োটা করোলা। ফোর ডোর। রাস্তার বাঁয়ে *দৈনিক বাংলা*-র দিকে মুখ ফিরিয়ে প্যারালাল পার্ক করা। গাড়িটির কাছে পৌঁছতে হলে রাস্তা পার হতে হয়।

তিনি সাবধানে রাস্তা পার হলেন। লক্ষ করলেন তাঁর সঙ্গে দুটি ছেলেও রাস্তা পার হলো। এরা বারবার তাকাচ্ছে তাঁর দিকে। ভদ্রলোক একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। এই ছেলে দুটি অনেকক্ষণ ধরেই আছে তাঁর সঙ্গে। ব্যাপার কী ? তিনি গাড়ির হাতলে হাত রাখামাত্র চশমা পরা লম্বা ছেলেটি এগিয়ে এল।

আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

আমার সঙ্গে কী কথা ? আমি আপনাকে চিনি না।

ভদ্রলোক গাড়ির দরজা খুললেন। ছেলেটি শীতল কণ্ঠে বলল, গাড়িতে উঠবেন না। আপনার গাড়িটি দরকার। চিৎকার-চেঁচামেচি কিচ্ছু করবেন না। যেভাবে দাঁড়িয়ে আছেন সেভাবে দাঁড়িয়ে থাকুন।

ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রইলেন। ছোট মেয়েটি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। লম্বা ছেলেটি বলল, আমরা মুক্তিযোদ্ধার একটি গেরিলা ইউনিট, কিছুক্ষণের ভেতর ঢাকা শহরে অপারেশন চালাব। আপনার গাড়িটা দরকার। চাবি দিয়ে দিন।

ভদ্রলোক চাবি তুলে দিলেন।

গাড়িতে কোনো সমস্যা নেই তো ? ভালো চলে ?

নতুন গাড়ি, খুবই ভালো চলে। তেল নেই। আপনাদের তেল নিতে হবে।

নিয়ে নেব।

তেল কিনবার টাকা আছে তো ? টাকা না থাকলে আমার কাছ থেকে নিতে পারেন।

টাকা আছে।

ভদ্রলোক হাসছেন। তিনি তাঁর মেয়ের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে মেয়েকে আশ্বস্ত করলেন। নরমস্বরে বললেন, মা, এঁদের স্লামালিকুম দাও।

মেয়েটি চুপ করে রইল। তার চোখে স্পষ্ট ভয়। সে অল্প অল্প কাঁপছে।

আপনি এখন থেকে ঠিক দুঘণ্টা পর থানায় ডায়েরি করবেন যে আপনার গাড়িটি চুরি হয়েছে। এর আগে কিছুই করবেন না।

ভদ্রলোক মাথা ঝাঁকালেন এবং হাত বাড়িয়ে দিলেন। ভদ্রলোকের হাত মেয়েদের হাতের মতো কোমল।

আমার নাম ফারুক চৌধুরী। আমি একজন ডাক্তার। এ তৃণা, আমার বড় মেয়ে। আজ ওর জন্মদিন। আমরা কেক কিনতে এসেছিলাম।

লম্বা ছেলেটি বলল, আমার নাম আলম। বদিউল আলম। শুভ জন্মদিন তৃণা।

আলম গাড়িতে উঠে দরজা লাগিয়ে দিল। গাড়ি চালাবে গৌরাঙ্গ। আলম বসেছে গৌরাঙ্গের পাশে। পেছনের সিটে সাদেক এবং নূরু।

আশফাকের গাড়িতে থাকবে শুধু নাজমুল। বেশি মানুষের সেখানে থাকার দরকার নেই। এটি হচ্ছে কভার দেওয়ার গাড়ি। একটি সেলফ লোডিং রাইফেল হাতে নাজমুল একাই যথেষ্ট। সে মহাওস্তাদ ছেলে। উৎসাহ একটু বেশি। তবে সেই বাড়তি উৎসাহের জন্যে এখন পর্যন্ত কাউকে বিপদে পড়তে হয়নি। আজও বিপদে পড়তে হবে না।

দুটি গাড়ি মগবাজার এলাকার দিকে চলল। আশফাকের গাড়িটিতে অস্ত্রশস্ত্র আছে। তার কিছু কিছু সামনের টয়োটায় তুলতে হবে।

আলম ও সাদেকের হাতে থাকবে স্টেইনগান। ক্লোজ রেঞ্জ উইপন। ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারলে এটি একটি চমৎকার অস্ত্র। গেরিলাদের জন্যে আদর্শ। ছোট এবং হালকা। নুরুর দায়িত্বে এক বাক্স গ্রেনেড। নুরু হচ্ছে গ্রেনেড জাদুকর। নিশানা, ছুড়বার কায়দা, টাইমিং কোথাও কোনো খুঁত নেই। অথচ এই ছেলে মহা বিপদ ঘটাতে যাচ্ছিল।

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সার্জেন্ট মেজর ময়না মিয়া গ্রেনেড ছুড়বার ট্রেনিং দিচ্ছেন। পরিষ্কার করে সব বুঝিয়ে দিলেন—

পিন খুলবার পর হাতে সময় হচ্ছে সাত সেকেন্ড। খেয়াল রাখবেন সাত সেকেন্ড। মনে হচ্ছে খুব কম সময়। আসলে অনেক বেশি সময়। সাত সেকেন্ডে অনেক কিছু করা যায়। ব্রাদারস, খেয়াল রাখবেন সাত সেকেন্ড অনেক সময়। পিন খুলে নেওয়ার পর যদি শুধু চিন্তা করতে থাকেন—'এই বুঝি ফাটল', 'এই বুঝি ফাটল' তাহলে মুশকিল। মনের ভয়ে তাড়াহুড়া করবেন, নিশানা ঠিক হবে না। খেয়াল রাখবেন, সাত সেকেন্ড অনেক সময়। অনেক সময়।

নুরুকে গ্রেনেড দিয়ে পাঠানো হলো। ছুড়বার ট্রেনিং হবে। নুরু ঠিকমতোই গ্রেনেডের পিন দাঁত দিয়ে খুলল। তারপর সে আর ছুড়ে মারছে না। হাতে নিয়ে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। ময়না মিয়া চেঁচাল, ছুড়ে মারেন, ছুড়ে মারেন। দাঁড়িয়ে আছেন কেন ? নুরু কাঁপা গলায় বলল, আমার হাত শক্ত হয়ে গেছে, ছুড়তে পারছি না। নুরুর মুখ রক্তশূন্য।

বিদ্যুতের গতিতে ছুটে গেলেন ময়না মিয়া। গ্রেনেড কেড়ে নিয়ে ছুড়ে মারবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হলো। ময়না মিয়া নুরুকে নিয়ে মাটিতে শোবারও সময় পেলেন না। সৌভাগ্যক্রমে কারও কিছু হলো না। ময়না মিয়া ঠান্ডা গলায় বললেন, নুরু ভাই, আরেকটা গ্রেনেড ছুড়েন। এখন আমি আছি আপনার কাছে। নুরু বলল, আমি পারব না। ময়না মিয়া প্রচণ্ড একটা চড় কষালেন। তারপর বললেন, যা বলছি করেন।

নুরু গ্রেনেড ছুড়ল। সার্জেন্ট মেজর ময়না মিয়া বললেন, নুরু ভাই হবেন গ্রেনেড মারায় এক নম্বর।

ময়না মিয়ার কথা সত্যি হয়েছে। ময়না মিয়া তা দেখে যেতে পারেননি। মান্দার অপারেশনে মারা গেছেন।

আলম ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। ময়না মিয়ার কথা মনে হলেই মন দ্রবীভূত হয়ে যায়, বুক হু-হু করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে কি দেশের বীরপুত্রদের সবাই শেষ হয়ে যাবে ?

আলম।

বল।

গাড়ি কোথাও রাখতে হবে, আমার পেচ্ছাব করতে হবে। কিডনি প্রেসার দিচ্ছে। একটা নর্দমার কাছে গাড়িটা থামা তো গৌরাঙ্গ।

গৌরাঙ্গ গাড়ি থামাল।

গাড়ি এগুচ্ছে খুব ধীরে। যেন কোনোরকম তাড়া নেই। গৌরাঙ্গ পেছনের পিকআপটির দিকে লক্ষ রাখতে চেষ্টা করছে। ব্যাক মিররটা ভালো না। বাঁকা হয়ে আছে। পেছনে কে আসছে দেখার জন্যে ঘাড় বাঁকা করতে হয়। আলমের মনে হলো গৌরাঙ্গ বেশ নার্ভাস।

গৌরাঙ্গ।

বলেন।

পেছনের দিকে লক্ষ রাখার তোমার কোনো দরকার নেই। তুমি চালিয়ে যাও।

জি আচ্ছা।

এত আস্তে না। আরেকটু স্পিডে চালাও। রিকশা তোমাকে ওভারটেক করছে।

গৌরাঙ্গ মুহূর্তে স্পিড বাড়িয়ে দিল। তার এতটা নার্ভাস হওয়ার কারণ কী? আলম পরিবেশ হালকা করার জন্যে বলল, সেন্ট মেখেছ নাকি গৌরাঙ্গ? গন্ধ আসছে। কড়া গন্ধ।

গৌরাঙ্গ লজ্জিত স্বরে বলল, সেন্ট না। আফটার সেভ দিয়েছি।

দাড়ি-গোঁফ গজাচ্ছে না। আফটার সেভ কেন?

সবাই হেসে উঠল। গৌরাঙ্গও হাসল। পরিবেশ হালকা করার একটা সচেতন প্রচেষ্টা। সবার ভাবভঙ্গি এরকম যেন বেড়াতে যাচ্ছে। আলগা একটা ফুর্তির ভাব। কিন্তু বাতাসে উত্তেজনা। রক্তে কিছু একটা নাচছে। প্রচুর পরিমাণে এড্রোলিন চলে এসেছে পিটুইটারী গ্ল্যান্ড থেকে। সবার নিঃশ্বাস ভারী। চোখের মণি তীক্ষ্ণ। গৌরাঙ্গের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সে সিগারেট ধরাল। স্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে সিগারেট ধরানোর কৌশলটা চমৎকার। আলম তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। তামাকের গন্ধ ভালো লাগছে না। গা গুলাচ্ছে। আলম একবার ভাবল, বলে—সিগারেট ফেলে দাও গৌরাঙ্গ বলা হলো না।

সাদেক পেছনের সিটে গা এলিয়ে দিয়েছে। তার চোখ বন্ধ। সে বলল, আমি একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছি। সময় হলে জাগিয়ে দিয়ো। রসিকতার একটা চেষ্টা। স্থূল ধরনের চেষ্টা। কিন্তু কাজ দিয়েছে। নুরু এবং গৌরাঙ্গ দাঁত বের করে হাসছে। সাদেক এই হাসিতে আরও উৎসাহিত হলো। নাক ডাকার মতো শব্দ করতে লাগল।

গাড়ি নিউ মার্কেটের সামনে দিয়ে সোজা ঢুকল মিরপুর রোডে। লালমাটিয়ার কাছাকাছি এসে ডানদিকে টার্ন নিয়ে চলে যাবে ফার্মগেট। সেখান থেকে হোটেল ইন্টারকন। কাগজে-কলমে কত সহজ। বাস্তব অন্য জিনিস। বাস্তবে অদ্ভুত অদ্ভুত সব সমস্যা হয়। মিশাখালিতে যেরকম হলো। খবর পাওয়া গেল দশজন রাজাকার নিয়ে তিনজন মিলিটারির একটা দল সুলেমান মিয়ার ঘরে এসে বসে আছে, ডাব খাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে সাদেক দলবল নিয়ে রওনা হয়ে গেল। দুতিনটা গুলি ছুড়লেই রাজাকাররা তাদের পাকিস্তানি বন্ধুদের ফেলে পালিয়ে যাবে। অতীতে সবসময়ই এরকম হয়েছে কিন্তু সেবার হয়নি। সুলেমান মিয়ার ঘরে যারা বসে ছিল তারা সবাই পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একটি কমান্ডো ইউনিট। গ্রামে ঢুকেছে গানবোট নিয়ে। সাদেক মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছে। যাদের নিয়ে গিয়েছিল তাদের সবাইকে প্রায় রেখে আসতে হয়েছিল। ভয়াবহ অবস্থা।

নাজমুল বলল, আপনার ভয় লাগছে নাকি আশফাক সাহেব?

আশফাক ঠান্ডা গলায় বলল, আমার এত ভয় নাই।

অ্যাকশন কখনো দেখেননি এইজন্যে ভয় নেই। একবার দেখলে বুকের রক্ত পানি হয়ে যায়। খুব খারাপ জিনিস।

আশফাক ব্রেকে পা দিল। সামনে একটা ঝামেলা হয়েছে। অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে বোধহয়। একটা ঠেলাগাড়ি উল্টে পড়ে আছে। তার পাশে হেডলাইট ভাঙা একটা সবুজ রঙের জিপ। প্রচুর লোকজন এদের ঘিরে আছে। আশফাক ভিড় কমাবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। ভিড় কমছে না। একজন ট্রাফিক পুলিশ মেয়েদের মতো মিনমিনে গলায় কী সব বলছে, কেউ তার কথা শুনছে না। নাজমুল বিরক্ত স্বরে বলল, ঝামেলা হয়ে গেল দেখি।

আশফাক নির্বিকার। যেন কিছুই হয়নি। সে জানালা দিয়ে মাথা বের করে ব্যাপারটা দেখবার চেষ্টা করছে। মনে হচ্ছে সে এই ঝামেলাটায় বেশ মজা পাচ্ছে। কত অদ্ভুত মানুষ থাকে!

ভিড় চট করে কেটে যেতে শুরু করেছে। কারণ হচ্ছে ইপিআর এক নম্বর গেট থেকে একটি সাদা রঙের জিপ বাঁশি বাজাতে বাজাতে আসছে।

গৌরাঙ্গ একসিলেটরে পা দিল। নুরু বলল, যাত্রা শুভ না আলম ভাই। যাত্রা খারাপ।

এ ধরনের কথাবার্তা খুবই আপত্তিজনক। মনের ওপর বাড়তি চাপ পড়ে। এই মুহূর্তে আর কোনো বাড়তি চাপের প্রয়োজন নেই। আলম ঠান্ডা গলায় বলল, শুভ কাজের জন্যে যে যাত্রা তা সবসময়ই শুভ।

গৌরাঙ্গ স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছে। হু-হু করে হাওয়া আসছে জানালা দিয়ে। লালমাটিয়ার কাছাকাছি আসতেই আবার ব্রেকে পা দিতে হলো। গৌরাঙ্গ শুকনো গলায় বলল, আলম ভাই কী করব বলেন? ছুটে বেরিয়ে যাব?

না, গাড়ি থামাও।

ভালো করে ভেবে বলেন।

গাড়ি থামাও। সবাই তৈরি থাক।

গাড়ি রাস্তার পাশে এসে থামল। আশফাকও তার পিকআপ থামিয়েছে।

তাদের সামনে দুটি গাড়ি থেমে আছে। একটি ত্রিপল ঢাকা ট্রাক, অন্যটি ভোক্সওয়াগন। মুখ কালো করে কয়েকজন লোক গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এরা ভয়ে অস্থির।

যারা গাড়ি থামাচ্ছে তারা মিলিটারি পুলিশ। একেকটা গাড়ি আসছে, হুইসেল দিয়ে হাত ইশারা করছে। গাড়ি থামামাত্র এগিয়ে যাচ্ছে, কাগজপত্র নিয়ে আসছে।

সংখ্যায় তারা চারজন। ভালো ব্যাপার হচ্ছে এই চারজনই দাঁড়িয়ে আছে কাছাকাছি। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নেই। এদের একজনের সঙ্গে রিভলবার ছাড়া অন্যকিছু নেই। বাকি তিনজনের সঙ্গে আছে চাইনিজ রাইফেল।

আলম বলল, সাদেক, তুই একা আমার সঙ্গে নামবি। অন্য কেউ না।

গৌরাঙ্গ।

বলুন।

সিগারেট এখন ফেলে দাও।

গৌরাঙ্গ সিগারেট ফেলে দিল। আলম জানালা দিয়ে মুখ বের করে হাত ইশারা করে ওদের ডাকল। মিলিটারি পুলিশের দলটি ক্রুদ্ধ ও অবাক হয়ে দৃশ্যটি দেখল। হাত ইশারা করে ওদের ডাকার স্পর্ধা এখনো কারও আছে তা তাদের কল্পনাতেও নেই। একজন এগিয়ে আসছে, অন্য তিনজন দাঁড়িয়ে আছে।

আলম নামল খুব সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। তার পেছনে নামল সাদেক। সাদেকের মুখভর্তি হাসি।

এরা বুঝতে পারল না এই ছেলে দুটি ভয়াবহ অস্ত্র নিয়ে নেমেছে। এদের স্নায়ু ইস্পাতের মতো।

প্রচণ্ড শব্দ হলো গুলির। একটি গুলি নয়। একঝাঁক গুলি। ফাঁকা জায়গায় এত শব্দ হওয়ার কথা নয়, কিন্তু হলো। চারজনই গড়িয়ে পড়েছে। এখনো রক্ত বেরুতে শুরু করেনি। ওদের মুখে আতঙ্ক ও বিস্ময়।

নাজমুল নেমে পড়েছে, তার হাতে এসএলআর। আলম বলল, গাড়িতে উঠ নাজমুল। নেমেছ কেন ?

দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলি একটা ঘোরের মধ্যে আছে। কী হয়ে গেল তারা এখনো বুঝতে পারছে না। সাদেক বলল, আপনারা দাঁড়িয়ে থাকবেন না। তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যান। লোকগুলির একজন শব্দ করে কাঁদছে। কী জন্যে কাঁদছে কে জানে। এখানে তার কাঁদবার কী হলো ?

এখানকার ঘটনা প্রচার হতে সময় লাগবে। তারা ফার্মগেটে পৌঁছে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। অবশ্যি গুলির শব্দ ওরা হয়তো পেয়েছে। এতে তেমন কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এই শহরে গেরিলারা এসেছে এটা ওদের কল্পনাতেও নেই।

গাড়ি চলা শুরু করতেই সাদেক বলল, আমার বাথরুম পেয়ে গেছে। কেউ কোনো উত্তর দিল না। সাদেক আবার বলল, ডায়াবেটিস হয়ে গেল নাকি ? এই কথারও কোনো জবাব পাওয়া গেল না।

গৌরাঙ্গ আবার একটি সিগারেট ধরিয়েছে। তার ফর্সা আঙুল অল্প অল্প কাঁপছে। আলম বলল, ভয় লাগছে গৌরাঙ্গ ?

গৌরাঙ্গ সত্যি কথা বলল।

হ্যাঁ, লাগছে। বেশ ভয় লাগছে।

আলম তাকাল পেছনে। সাদেক চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে। স্টেইনগানটি তার কোলে। কেমন খেলনার মতো লাগছে। নুরু বসে আছে শক্ত মুখে। আলমের দিকে চোখ পড়তেই সে বলল, কিছু বলবেন আলম ভাই ?

না, কিছু বলব না।

সিগারেট ধরাবেন একটা ?

না।

ঠিক এই মুহূর্তে কিছুই বলার নেই। কিছুই করার নেই। এটা হচ্ছে প্রতীক্ষার সময়। আলম লক্ষ করল বারবার তার মুখে থুথু জমা হচ্ছে। কেন এরকম হচ্ছে ? তার কি ভয় লাগছে ? তার সঙ্গে আছে চমৎকার একটি দল। এরা প্রথম শ্রেণীর কমান্ডো ট্রেনিং পাওয়া দল। এদের সঙ্গে নিয়ে যে-কোনো পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায়। কোনোরকম ভয় তার থাকা উচিত নয়। কিন্তু আছে। ভালোই আছে। নয়তো বারবার মুখে থুথু জমত না। সেই আদিম ভয় যা যুক্তি মানে না। মনের কোনো এক গহীন অন্ধকার থেকে বিড়ালের মতো নিঃশব্দে বের হয়ে আসে এবং দেখতে দেখতে ফুলে-ফেঁপে বিশাল হয়ে ওঠে। গাড়ির বেগ কমে আসছে। গৌরাঙ্গের চোখমুখ শক্ত। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আলম ডাকল, সাদেক সাদেক। সাদেক ভারী গলায় বলল, আমি আছি। গৌরাঙ্গ বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। আলমের কেমন বমি-বমি ভাব হচ্ছে। তার জানতে ইচ্ছা করছে অন্যদেরও তার মতো হচ্ছে কি না। কিন্তু জানার সময় নেই। গাড়ি থেমে আছে। মিলিটারিদের তাঁবু দশ-পনেরো গজ দূরে।

দরজা খুলে তিনজনই লাফিয়ে নামল। নাজমুল তখনো নামেনি।

পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কুড়িজনের একটি ইউনিট ছিল ফার্মগেটে। তাদের দলপতি সুবেদার মেজর মাবুদ খাঁ। এই দলটিকে এখানে রাখার উদ্দেশ্য মাবুদ খাঁর কাছে পরিষ্কার নয়। এদের ওপর তেমন কোনো ডিউটি নেই। মাঝে মাঝে রোড ব্লক করে যে চেকিং হয় তা করে এমপি'রা। ওদের সঙ্গে ইদানীং যোগ দিয়েছে মিলিশিয়া।

তাঁবুর ভেতরটা বেশ গরম কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশিরভাগ সৈন্যই ঘুমুচ্ছিল। বা ঘুমের ভঙ্গিতে শুয়ে ছিল। যদিও এটা ঘুমুবার সময় নয়। কিছুক্ষণের ভেতরই বৈকালিক চা আসবে। চা আসতে আজ দেরি হচ্ছে। কেন দেরি হচ্ছে কে জানে।

মাবুদ খাঁ তাঁবুর বাইরে চেয়ারে বসে ছিল। শুধু শুধু বসে থাকা যায় না। কিন্তু তাকিয়ে থাকা ছাড়া তার কোনো কাজ নেই। তাঁবুর ভেতর হৈচৈ হচ্ছে। তাস খেলা হচ্ছে সম্ভবত। এই খেলাটি তার অপছন্দ। সে মুখ বিকৃত করল এবং ঠিক তখনই সে লক্ষ করল তিনটি ছেলে দৌড়ে আসছে। দীর্ঘদিনের সামরিক ট্রেনিং তার পেছনে। তার বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হলো না যে ছেলে তিনটি কেন ছুটে আসছে। সে মুগ্ধ হলো এদের অর্বাচিন সাহসে। কিছু একটা বলল চিৎকার করে। সেটা শোনা গেল না। কারণ আকাশ কাঁপিয়ে একটা বিস্ফোরণ হয়েছে।

চিৎকার, হৈচৈ, আতঙ্কগ্রস্ত মানুষদের ছুটাছুটি। সবকিছু ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে গুলির শব্দ। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে পড়ছে।

নুরু শান্ত। সে দুটি গ্রেনেড পরপর ছুড়েছে। এখন তার করবার কিছু নেই। সে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তির মতো। চোখের সামনে যা ঘটছে তা ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। আলম ভাই দ্বিতীয় ম্যাগাজিনটি ফিট করছেন। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। এখন উচিত দ্রুত পালিয়ে যাওয়া। যে বিকট বিস্ফোরণ হয়েছে অর্ধেক শহর নিশ্চয়ই কেঁপে উঠেছে। এয়ারপোর্ট থেকে টহলদারী জিপ নিশ্চয়ই বেরিয়ে পড়েছে।

গৌরাঙ্গ ক্রমাগত হর্ন দিচ্ছে। তার মুখ রক্তশূন্য।

নুরু চেঁচিয়ে বলল, আলম ভাই, গাড়িতে উঠেন।

একটি সরকারি বাস যাত্রী নিয়ে হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে। ড্রাইভার বাস থামিয়ে হতভম্ভ হয়ে সিটে বসে আছে। বাসটি এমনভাবে সে রেখেছে যে গৌরাঙ্গ তার গাড়ি বের করতে পারছে না। সাদেক এগিয়ে গেল। তার হাতে স্টেইনগান। বাস ড্রাইভারকে আশ্চর্যরকম নরম গলায় বলল, ড্রাইভার সাহেব, গাড়িটা সরিয়ে নিন। আমাদের আরও কাজ আছে।

হতভম্ভ ড্রাইভার মুহূর্তে তার গাড়ি নিয়ে গেল থার্ড গিয়ারে।

ঘণ্টার শব্দ আসছে। দমকল নাকি ?

ওরা গাড়িতে উঠে বসল। গৌরাঙ্গ গাড়িটিকে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আলম বলল, আস্তে যাও। আস্তে। কোনো ভয় নেই।

গাড়ি যাচ্ছে ইন্টারকনের দিকে। এই প্রগ্রামটিতে কোনো ঝামেলা নেই। কেউ গাড়ি থেকে নামবে না। ছুটে যেতে যেতে কয়েকটি গ্রেনেড ছোড়া হবে। হোটেলের বিদেশী সাংবাদিকরা জানবে ঢাকার অবস্থা স্বাভাবিক নয়। আলমের মনে হলো বড় রকমের ঝামেলা হয়তো ইন্টারকনের সামনেই অপেক্ষা করছে। যেখানে কোনো ঝামেলা হবে না মনে করা হয় সেখানেই ঝামেলা দেখা দেয়। আলম বলল, স্পিড কমাও গৌরাঙ্গ। করছ কী তুমি ? মরবে নাকি ?

গৌরাঙ্গ স্পিড কমাল। সাদেক বলল, প্রচণ্ড বাথরুম পেয়ে গেছে, কী করা যায় বল তো আলম ?

আলম জবাব দিল না। ইন্টারকন এসে পড়েছে। আলমের নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এল। আবার মুখে থুথু জমছে। গা গুলাচ্ছে।

ছ'টায় কার্ফু শুরু হবে।

রাত্রি সাড়ে পাঁচটায় উদ্বিগ্ন হয়ে ফোন করল। ফোন ধরলেন সুরমা। তিনি বুঝতে পারছেন রাত্রির গলা কাঁপছে। অনেক চেষ্টা করেও সে তার উদ্বেগ চেপে রাখতে পারছে না।

তিনি নরম গলায় বললেন, কী হয়েছে রাত্রি ?

কিছু হয়নি মা। তুমি কি খবর শুনেছ ?

না। কী খবর ?

টেলিফোনে বলা যাবে না। দারুণ সব কাণ্ড হয়েছে মীরপুর রোডে। ফার্মগেটে। কিছু জানো না ?

না। জানি না।

আমরা বাড়ি আসবার জন্যে গাড়ি বের করেছিলাম। ওরা আসতে দেয়নি। রোড ব্লক করেছে। মা শোনো—

শুনছি।

উনি কি এসেছেন ?

না।

বলো কী মা ?

সুরমা চুপ করে রইলেন। রাত্রি টেলিফোন ধরে রেখেছে। যেন সে আরও কিছু শুনতে চায়। সুরমা বললেন, তোর বাবার সঙ্গে কথা বলবি ?

না। মা শোনো, উনি এলেই তুমি টেলিফোন করবে।

সুরমা জবাব দিলেন না।

মা।

বল শুনছি।

উনি এলেই টেলিফোন করবে। আমার খুব খারাপ লাগছে মা। আমার কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে।

সুরমার মনে হলো উনি কান্নার শব্দ শুনলেন। তাঁর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এল। কেন রাত্রি কাঁদছে ? এই বয়েসী একটি মেয়ে যদি কোনো পুরুষের কথা ভেবে কাঁদে তার ফল শুভ হয় না। বিয়ের আগে তিনি নিজেও একটি ছেলের জন্যে কাঁদতেন। তার ফল শুভ হয়নি। যদিও সেই ছেলেটির কথা তিনি একবারও ভাবেন না। তবু কোথাও যেন একটা শূন্যতা অনুভব করেন। ছেলেটি তাঁর হৃদয়ের একটি অংশ খালি করে গেছে। সেখানে কোনো স্মৃতি নেই, স্বপ্ন নেই, প্রগাঢ় শূন্যতা।

সুরমা টেলিফোন নামিয়ে বসার ঘরে ঢুকবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আলম এল। তার চোখ লাল। দৃষ্টি এলোমেলো। সে সুরমার দিকে তাকিয়ে অল্প হাসল। সুরমা বললেন, তুমি ভালো আছ তো ?

জি।

সবাই ভালো আছে ?

হ্যাঁ, আপনি কি আমাকে একটু গরম পানি করে দিতে পারবেন ? গরম পানি দিয়ে গোসল করব।

আলম ক্লান্ত পায়ে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। থমকে দাঁড়াল বারান্দায়। মতিন সাহেব বাগানে কাজ করছেন। আগাছা পরিষ্কার করে বাগানটিকে এত সুন্দর করে ফেলেছেন—শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

সুরমা গরম পানি বাথরুমে দিয়ে আলমকে খবর দিতে গেলেন। আলম হাত-পা ছড়িয়ে গভীর ঘুমে অচেতন। কাপড় ছাড়েনি। পা থেকে জুতো পর্যন্ত খোলেনি।

ঘুমের মধ্যেই আলম একটি অস্ফুট শব্দ করছে। প্রচণ্ড জ্বর হলে মানুষ এমন করে। ওর কি জ্বর ? ঘরে ঢুকবার সময় দেখেছেন চোখ টকটকে লাল। সুরমা আলমের কপালে হাত রাখতেই আলম উঠে বসল।

তোমার পানি গরম হয়েছে।

থ্যাংক য়্যু।

কিন্তু তোমার গা তো পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে।

আমার এরকম হয়। হট শাওয়ার নিয়ে শুয়ে থাকলে জ্বর নেমে যাবে।

আলম তোয়ালে টেনে নিয়ে মাতালের ভঙ্গিতে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল।

রাত্রি সন্ধ্যা সাতটায় আবার টেলিফোন করল। কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, মা, উনি আসেননি। তাই না ?

এসেছে।

এসেছেন তাহলে আমাকে টেলিফোন করোনি কেন ? আমি তখন থেকে টেলিফোনের সামনে বসে আছি।

রাত্রি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। সুরমা টেলিফোনে সেই কান্না শুনলেন। তাঁর নিজেরও চোখ ভিজে উঠতে শুরু করল। তিনি নিজেও কিশোরী বয়সে এভাবে কেঁদেছেন। কেউ তার কান্না শোনেনি। তিনি টেলিফোন নামিয়ে রেখে আলমের ঘরে এলেন। আলম খাটে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। তার মুখে সিগারেট। সে সুরমাকে দেখে সিগারেট নামাল না। সুরমা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার দিকে।

আলম বলল, আপনি কি কিছু বলবেন ?

সুরমা থেমে থেমে বললেন, তুমি বলেছিলে এ বাড়িতে সাতদিন থাকবে। আজ সাতদিন শেষ হয়েছে।

আমি আগামীকাল চলে যাব। আগামীকাল সন্ধ্যায়।

তোমাকে কি এক কাপ চা বানিয়ে দেব ?

দিন। আপনার কাছে অ্যাসপিরিন আছে ?

আছে। দিচ্ছি।

বলেও সুরমা গেলেন না। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। আলম বলল, আপনি কি আরও কিছু বলবেন ?

না।

মতিন সাহেবের নাক ফুলে উঠছে বারবার। হাত মুঠিবদ্ধ হচ্ছে। কারণ বিবিসি ঢাকায় গেরিলা অপারেশনের খবর ফলাও করে বলেছে। এত তাড়াতাড়ি খবর পৌঁছল কীভাবে ? সাহেবদের কর্মদক্ষতার ওপর তাঁর আস্থা সবসময়ই ছিল। এখন সেটা বহুগুণে বেড়ে গেছে।

সুরমাকে ঢুকতে দেখেই তিনি বললেন, ব্রিটিশদের মতো একটা জাত আর হবে না।

সুরমা তাঁর কথা বুঝতে পারলেন না। হঠাৎ ব্রিটিশ প্রসঙ্গ এল কেন কে জানে।

সুরমা, আজদাহারা ছারখার করে দিয়েছে। অর্ধেক ঢাকা শহর বার্ন করে দিয়েছে। একেবারে ছাতু। হ্যাভক।

সুরমা কিছুই বললেন না। মতিন সাহেব ট্রানজিস্টার নিয়ে শোবার ঘরে চলে গেলেন। রাত্রিকে টেলিফোন করে জানতে হবে বিবিসি শুনছে কি না।

টেলিফোন ধরল অপালা। সে হাই তুলে বলল, বাবা, আপাকে টেলিফোন দেওয়া যাবে না। তার কী জানি হয়েছে, দরজা বন্ধ করে কাঁদছে।

মতিন সাহেব অবাক হয়ে বললেন, এরকম খুশির দিনে কাঁদছে কেন ?

৭

রাত্রি ভোরবেলাতেই চলে এসেছে।

সুরমা রান্নাঘরে ছিলেন। সে চলে গেল রান্নাঘরে। সুরমা মেয়েকে দেখে বিস্মিত হলেন। এ কী চেহারা হয়েছে মেয়ের! মুখ শুকিয়ে কেমন অন্যরকম দেখাচ্ছে। চোখ লাল।

তোর কী হয়েছে ?

কিছু হয়নি।

ঠিক করে বল কী হয়েছে ?

রাতে ঘুম হয়নি মা। সারা রাত জেগে ছিলাম।

সুরমা আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। রুটি বেলতে লাগলেন। বিন্তি রুটি সেঁকছে এবং নিজের মনেই হাসছে। রাত্রি হালকা গলায় বলল, আজ কী নাশতা মা ?

সুরমা কঠিন গলায় বললেন, দেখতেই পাচ্ছিস কী! জিজ্ঞেস করছিস কেন ?

রাত্রি মৃদুস্বরে বলল, আমার ওপর কেন তুমি রেগে যাচ্ছ মা ? আমি কি কখনো তোমাকে রাগানোর জন্যে কিছু করেছি ?

সুরমা উত্তর দিলেন না। রাত্রি আবার বলল, চুপ করে থাকবে না। বলো তুমি, কখনো কি তোমাকে রাগানোর মতো কোনো কারণ ঘটিয়েছি ?

সুরমা দেখলেন রাত্রির চোখে জল টলমল করছে। যেন এক্ষুনি সে কেঁদে ফেলবে। তাঁর নিজেরও কান্না পেয়ে গেল। তিনি মনে মনে বললেন, কেউ যেন আমার এই মেয়েটির মনে কষ্ট না দেয়। বড় ভালো মেয়ে। বড় ভালো।

রাত্রি।

কী মা!

আলমের ঘুম ভেঙেছে কি না দেখে আয়।

বলেই সুরমা পাংশুবর্ণ হয়ে গেলেন। কেন রাত্রিকে এই কথা বললেন ? তিনি ভালোই জানেন আলম জেগে আছে। কিছুক্ষণ আগেই তিনি তাকে চা দিয়ে এসেছেন। রাত্রিকে এ কথা বলার উদ্দেশ্য কি এই যে, তিনি তাকে খুশি করতে চেয়েছেন ? কী ভয়ানক কথা! রাত্রি কি তার এই উদ্দেশ্য ধরতে পেরেছে ? নিশ্চয় পেরেছে। সে বোকা মেয়ে নয়। নিজেকে সামলানোর জন্যে তিনি থেমে থেমে বললেন, আজ চলে যাবে। একটু যত্ন-টত্ন করা দরকার।

আজ চলে যাবেন নাকি ?

হ্যাঁ। এক সপ্তাহ থাকার জন্যে এসেছিল। এক সপ্তাহ তো হয়ে গেল।

তিনি কি বলেছেন আজ চলে যাবেন ?

হ্যাঁ বলেছে।

রাত্রি হালকা পায়ে ঘর ছেড়ে গেল। তার গায়ে একটা ধবধবে সাদা সিল্কের শাড়ি। শাড়িতে বেগুনি ফুল। কী চমৎকার লাগছে রাত্রিকে। তাঁর মনে হলো শুধুমাত্র মেয়েরাই সৌন্দর্য বুঝতে পারে। পুরুষরা না। ওদের নজর থাকে শরীরের দিকে। সৌন্দর্য দেখবার সময় কোথায় ওদের।

আলম পা ঝুলিয়ে খাটে বসে আছে। তার কোলের ওপর একটি বই। সে পা দোলাচ্ছে। রাত্রিকে ঢুকতে দেখে সে অল্প হাসল।

কখন এসেছেন ?

এই তো কিছুক্ষণ আগে। কী বই পড়ছেন এত মন দিয়ে ?

আলম একটু উঁচু করে দেখাল 'দত্তা'। রাত্রি হাসিমুখে বলল, অপালা এই বইটা মুখস্থ বলতে পারে। পাঁচ ছ'দিন পরপর এই বইটা সে একবার পড়ে ফেলে।

আলম বলল, আপনি কি অসুস্থ ? কেমন যেন অন্যরকম লাগছে।

না, অসুস্থ না। আমি বেশ ভালো। দেখতে এসেছি আপনি কেমন আছেন। কাল সন্ধ্যাবেলা যা ভয় পেয়েছিলাম। কেন জানি মনে হচ্ছিল কিছু একটা হয়েছে আপনার। কী যে কষ্ট হচ্ছিল আপনি কোনোদিন কল্পনাও করতে পারবেন না।

আলমের অস্বস্তি লাগছে। এসব কী বলছে এই মেয়ে ? কিন্তু এত সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলছে। আলম কথা ঘোরাবার জন্যে বলল, কাল কী হয়েছে শুনতে চান ?

না, শুনতে চাই না। যুদ্ধ-টুদ্ধ আমার ভালো লাগে না।

কারোই ভালো লাগে না।

রাত্রি খাটে আলমের মতো পা ঝুলিয়ে বসল। মিষ্টি একটা গন্ধ বাতাসে ভাসছে। সৌরভ কি মানুষের মনে বিষাদ জাগিয়ে তোলে ? তোলে বোধহয়। আলমের কেমন জানি মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

রাত্রি বলল, আপনি নাকি আজ চলে যাচ্ছেন ?

হ্যাঁ।

কখন যাবেন ?

বিকালে।

আপনি কি ঢাকাতেই থাকবেন, না চলে যাবেন অন্য কোথাও ?

ঢাকাতেই থাকব।

আর আসবেন না আমাদের এখানে ?

আসব না কেন, আসব।

আমার মনে হচ্ছে আপনি আর আসবেন না।

এরকম মনে হচ্ছে কেন ?

কেউ কথা রাখে না।

রাত্রি হঠাৎ উঠে চলে গেল। কারণ তার চোখ জলে ভরে আসছে। এই জল একান্তই নিজের, লুকিয়ে রাখার জিনিস। সে চলে গেল তার নিজের ঘরে।

অপালা সেখানে বসে আছে। তার হাতে একটা গল্পের বই। সে বই নামিয়ে বলল, কাঁদছ কেন আপা ?

মাথা ধরেছে।

অপালা চোখ নামিয়ে নিল বইয়ে। সে নিজেও কাঁদছে, কারণ এই মুহূর্তে সে খুবই দুঃখের একটা ব্যাপার পড়ছে। নায়িকা সিঁড়ি থেকে পিছলে পড়েছে এবং চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সে আর্তস্বরে চিৎকার করছে, অরুণ! অরুণ! সে ডাক শুনেও নির্বিকার ভঙ্গিতে নেমে যাচ্ছে।

সুরমা নাশতা টেবিলে দিয়ে আলমকে ডাকতে এলেন। আলম জুতো পরছে।

কোথাও বেরুচ্ছ ?

জি।

কখন ফিরবে ?

বিকেলে এসে বিদেয় নিয়ে যাব।

সুরমা একবার ভাবলেন বলেন, মাঝে মাঝে এসো। কিন্তু বলতে পারলেন না। যেসব কথা আমরা বলতে চাই তার বেশির ভাগই আমরা বলতে পারি না।

নাশতা খেতে আস বাবা।

আসছি।

মতিন সাহেব ঢাকা রেডিও খুলে বসেছিলেন। বাচ্চাদের একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে। কিচিরমিচির করছে একদল বাচ্চা।

আপা, আমি একটা ছড়া বলব। আমার নাম রুমানা।—ময়না ময়না কোনো কথা কয় না...

বাহ বাহ বেশ হয়েছে। এবার তুমি আসো। পরিষ্কার করে নাম বলো।

আপা, আমার নাম সুমন, আমি একটা গান গাইব। রচনা বিদ্রোহী কবি নজরুল।—কাবেরী নদীজলে কে গো বালিকা...

চমৎকার হয়েছে। এবার তুমি আসো।

মতিন সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, এদের ধরে চাবকানো উচিত। এ সময়ে গান গাচ্ছে, ছড়া বলছে, কত বড় স্পর্ধা!

সুরমা এসে বললেন, নাশতা দেওয়া হয়েছে। খেতে আসো।

মতিন সাহেব শিশুর মতো রেগে গেলেন।

যাও, আমি খাব না কিছু। যত ইডিয়টের দল। গান গাইছে, ছড়া বলছে। চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দিতে হয়।

শরীফ সাহেব আলমকে দেখে মোটেই অবাক হলেন না। তাঁর ভঙ্গি দেখে মনে হলো তিনি যেন মনে মনে তার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

মামা, কী খবর তোমার ?

ভালো। তুই এখনো বেঁচে আছিস ?

আছি।

কাল রাতে স্বপ্নে দেখলাম গুলি খেয়েছিস। তখনি বুঝলাম তুই ভালো আছিস। আমার স্বপ্ন সব সময় উল্টো হয়।

শরীফ সাহেব কোমরের লুঙ্গি আঁট করতে করতে উঠে দাঁড়ালেন। ন'টা বাজে। অফিসে যাওয়ার জন্যে তৈরি হতে হয়। কিন্তু কেন যেন অফিসে যেতে ইচ্ছা করছে না। লুঙ্গি বদলে প্যান্ট পরতে হবে ভাবতেই খারাপ লাগছে।

চা খাবি ?

না।

কফি। কফি খাবি ? একটা ইনসটেন্ট কফি কিনেছি। চা বানানোর মহা হাঙ্গামা। কাজের ছেলেটা আমার একটা স্যুটকেস নিয়ে পালিয়ে গেছে।

বলতে বলতে তাঁর হাসি পেয়ে গেল। কারণ স্যুটকেসটিতে কিছু পুরনো ম্যাগাজিন ছাড়া কিছু ছিল না। ছাত্রজীবনে কিছু গল্প কবিতা লিখতেন। তার কয়েকটি ছাপাও হয়েছিল। স্যুটকেস বোঝাই সেইসব ম্যাগাজিনে।

হাসছ কেন ?

ব্যাটা খুব ঠক খেয়েছে। স্যুটকেস খুলে হাউমাউ করে কাঁদবে।

আলমের মনে হলো, তার মামার হাসির ভঙ্গিটি কেমন যেন অস্বাভাবিক। সুস্থ মানুষের হাসি নয়। অসুস্থ মানুষের হাসি।

আলম।

বলো।

তোর চিঠি তোর মাকে পৌঁছে দিয়েছি।

মা ভালো আছেন ?

জানি না।

জানি না মানে ?

দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

ভালো করেছ।

ভাবছি নিজেও চলে যাব। রাতে ঘুম হয় না।

যাও, চলে যাও।

কিন্তু ওরা খুঁজে বের করে ফেলবে। ফখরুদ্দীন সাহেব পালিয়ে গিয়েছিলেন। মানিকগঞ্জ তাঁর শ্বশুরবাড়ি থেকে ধরে নিয়ে এসেছে। এখন বোধহয় মেরেই ফেলেছে। খাবি তুই কফি ?

দাও।

ফার্মগেটের অপারেশনে তুই ছিলি ?

হুঁ।

ভালোই দেখিয়েছিস।

আলম হাসল। হাসিমুখে বলল, তোমার সামনে সিগারেট খেলে তুমি রাগ করবে ?

খেতে ইচ্ছা হলে খা। লায়েক হয়ে গেছিস, এখন তো খাবিই।

কফি ভালো হলো না। অতিরিক্ত কড়া হয়ে গেল। হালকা করার জন্যে দুধ ও গরম পানি মেশানোর পর তার স্বাদ হলো আরও কুৎসিত। শরীফ সাহেব মুখ বিকৃত করে বললেন, পেচ্ছাবের মতো লাগছে। ফেলে দে। আবার বানাব।

আর বানাতে হবে না। মামা, একটা কথা শোনো।

বল, শুনছি।

আমি যদি তোমার এখানে থাকি কয়েকদিন তোমার অসুবিধা হবে ?

না। আগে যেখানে ছিলি সেখানে কী অবস্থা ? জানাজানি হয়ে গেছে ?

তা না। ভদ্রমহিলা একটু ভয় পাচ্ছেন। তাছাড়া আমি বলেছিলাম এক সপ্তাহ থাকব। এক সপ্তাহ হয়ে গেছে।

কখন আসবি ?

বিকেলে। আমাকে একটা চাবি দাও।

শরীফ সাহেব চাবি বের করে দিলেন। এবং দ্রুত কাপড় পরতে শুরু করলেন। আলম এখানে থাকলে অফিস মিস করা উচিত হবে না।

আলম।

বলো মামা।

একটা সাকসেসফুল অপারেশনের পর ওভার কনফিডেন্ট হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। খুব সাবধান। এরা এখন পাগলা কুত্তার মতো। দারুণ সতর্ক। পাগলা কুত্তারা খুব সতর্ক হয় জানিস তো ?

আমরাও সতর্ক।

স্বপ্ন দেখে মনটা একটু ইয়ে হয়ে গেল। যদিও জানি আমার স্বপ্ন সবসময় উল্টো হয়। প্রমোশন পাওয়ার একটা স্বপ্ন দেখলাম একবার, হয়ে গেল ডিমোশন। অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি বানিয়ে বেইজ্জত করল।

শরীফ সাহেব আবার হাসতে শুরু করলেন। অন্যরকম হাসি। অসুস্থ মানুষের হাসি।

বুঝলি আলম, এই যুদ্ধ দীর্ঘদিন চলবে। মে বি ফর ইয়ারস। চায়না কেমন চুপ মেরে আছে দেখছিস না ? অন্য দেশগুলি চুপ করে আছে—আমি মাইন্ড করছি না, কিন্তু চায়না পাকিস্তান সমর্থন করবে কেন ? হোয়াই ? মানুষের জন্যে মমতা নেই চায়নার, এটা ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। হোয়াই চায়না ? হোয়াই ?

অফিসে যাবে না মামা ?

না, ইচ্ছা করছে না। শুয়ে থাকব। সিক রিপোর্ট করব। আসলেই সিক সিক লাগছে। দেখ তো কপালে হাত দিয়ে জ্বর আছে কি না।

জ্বর নেই।

না থাকলেও হবে। জ্বর হবে, সর্দি হবে, কাশি হবে। ডাইরিয়া হবে।

শরীফ সাহেব শব্দ করে হাসতে লাগলেন। গা দুলিয়ে হাসি।

ঝিকাতলার একটি বাসায় সবাই একত্র হয়েছে। রহমানও আছে। সে এখন মোটামুটি সুস্থ। জ্বর নেমে গেছে। দাড়ি-গোঁফ কামানোয় তাকে বালক-বালক লাগছে। পরবর্তী অপারেশন নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। নতুন মানুষের ভেতর মিনহাজ উদ্দিনকে দেখা যাচ্ছে। তার কাছ থেকেই জানা গেল আরও কিছু ছোট ছোট গ্রুপ শহরে ঢুকেছে। এরা পাওয়ার স্টেশন নষ্ট করতে চেষ্টা করবে। ট্রান্সফরমার উড়িয়ে দেওয়ার কাজটা বাইরে থেকে বোমা মেরে করা যাবে না। সাহায্য করতে হবে ভেতর থেকে। প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে।

সাহায্য করতে সবাই আগ্রহী কিন্তু সবাইকে দিয়ে এ কাজ হবে না। ঠিক লোকটিকে বেছে নিতে হবে। সাহসী এবং বুদ্ধিমান একজন মানুষ। মুশকিল হচ্ছে—এই দুটি জিনিস খুব কম সময়ই একত্রে পাওয়া যায়। সাধারণত সাহসী লোকদের বুদ্ধি কম থাকে। মিনহাজ সাহেব বললেন, আলম সাহেব, আপনারা যা করছেন এটা হচ্ছে হিরোইজম। ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের বীরত্বের দরকার নেই। আমরা এখন চাই ওদের বিরক্ত করতে। বোমা ফাটিয়ে, গ্রেনেড ফাটিয়ে নার্ভাস করে ফেলতে। বুঝতে পারছেন ?

পারছি।

কথাগুলি কিন্তু আমার না। কমান্ড কাউন্সিলের।

তাও জানি।

এমন সব জায়গায় যান যেখানে মিলিটারি নেই। সরাসরি সংঘর্ষের সম্ভাবনা নেই। যেমন ধরুন, পেট্রোল পাম্প। পেট্রোল পাম্প উড়িয়ে দিন। দর্শনীয় ব্যাপার হবে।

আলম হাই তুলল। মিনহাজ সাহেব একজন বিরক্তিকর মানুষ। কথা বলে মাথার পোকা নড়িয়ে দেয়। একই কথা একশবার বলে।

আলম সাহেব।

বলুন শুনছি।

আজ আপনাদের কী প্রোগ্রাম ?

আছে কিছু।

বলুন শুনি।

বলার মতো কিছু না।

মিনহাজ সাহেব মুখ কালো করে ফেললেন। এত অল্পতে মানুষ এমন আহত হয় কেন আলম ভেবে পেল না। মিনহাজ সাহেবের অন্য দল। তাদের সঙ্গে এ দলের কাজকর্মের আলোচনার কি তেমন কোনো দরকার আছে ? কোনো দরকার নেই।

আশফাক তার পিকআপ নিয়ে উপস্থিত হলো দুটার সময়। তার সঙ্গে সাদেক।

আশফাক দাঁত বের করে বলল, নিজের গাড়িই আনলাম। নিজের জিনিস ছাড়া কনফিডেন্স পাওয়া যায় না।

আলম বিরক্ত হয়ে বলল, একই গাড়ি নিয়ে দ্বিতীয়বার বের হতে চাই না।

সাদেক নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, ঢাকা শহরে এরকম পিকআপ পাঁচ হাজার আছে। তুই ভ্যাজর ভ্যাজর করিস না, উঠে আয়। রোজ একটা করে নতুন গাড়ি পাব কোথায় ? ছোট কাজ চট করে সেরে চলে আসব। সবার যাওয়ার দরকার নেই।

গাড়িতে উঠল তিনজন। ড্রাইভারের পাশে আলম। পেছনের সিটে নুরু এবং সাদেক। তারা চলে গেল মগবাজারের একটা পেট্রোল পাম্পে। জায়গাটা খারাপ না। ওয়ারলেস স্টেশনের কাছে। ঠিকমতো বিস্ফোরণ ঘটাতে পারলে পাকিস্তানিদের বড় ধরনের একটা চমক দেওয়া যাবে।

সবাই বসে রইল পিকআপে। লম্বা লম্বা পা ফেলে নেমে গেল সাদেক। যেতে যেতে শিস দিচ্ছে।

কাচের ঘরের ভেতর যে গোলগাল লোকটি বসে ছিল, তাকে হাসিমুখে বলল, মন দিয়ে শোনেন কী বলছি। আমরা আপনার এই পেট্রোল পাম্পটা উড়িয়ে দেব। আপনি লোকজন নিয়ে সরে পড়ুন। কুইক।

লোকটি চোখের পাতা পর্যন্ত ফেলতে ভুলে গেল। তাকিয়ে রইল মাছের মতো। সাদেক বলল, আমার কথা বুঝতে পারছেন তো ?

জি পারছি।

তাহলে দেরি করছেন কেন ?

আপনারা মুক্তিবাহিনী ?

হ্যাঁ।

লোকটি হাঁসের মতো ফ্যাসফ্যাস গলায় ডাকতে লাগল—হিসামুদ্দিন, হিসামুদ্দিন, ও হিসামুদ্দিন!

বিস্ফোরণ হলো ভয়াবহ। বিশাল আগুন দাউদাউ করে আকাশ স্পর্শ করল। বিকট শব্দ হতে থাকল। কুণ্ডুলী পাকিয়ে উঠছে কালো ধোঁয়া। অসংখ্য লোকজন ছুটাছুটি করছে। চিৎকার। হৈচৈ। হিসহিস শব্দ হচ্ছে। ভয়াবহ ব্যাপার!

আশফাকের পিকআপ ছুটে চলছে। নুরু ফিসফিস করে বলল, পেট্রোল পাম্পে গ্রেনেড না ছোড়াই ভালো। এই অবস্থা হবে কে জানত।

ঘণ্টা বাজিয়ে চারদিক থেকে ফায়ার ব্রিগেড আসছে। বিস্ফোরণে যারা ভয় পায়নি তারা এবার ভয় পাবে। ফায়ার ব্রিগেডের ঘণ্টা অতি সাহসী মানুষের মনেও আতঙ্ক ধরিয়ে দেয়।

আলম হঠাৎ করে লক্ষ করল পেছন থেকে দৈত্যাকৃতি একটি ট্রাক ছুটে আসছে। অনুসন্ধানী ট্রাক। বিস্ফোরণের রহস্যের সন্ধান করছে নিশ্চয়ই। ট্রাকের মাথায় দুটি মেশিনগান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুজন গানার। এরা কি তাদের পিকআপ থামাবে এবং বলবে—তোমরা কারা ? কোথায় যাচ্ছ ? বের হয়ে আস। হাত মাথার ওপর তোল।

আলমের মাথা ঝিমঝিম করছে। পেটের ভেতর কী জানি পাক খাচ্ছে। এই ট্রাক ওদের থামাবে। নিশ্চয়ই থামাবে। বোঝা যায়। কিছু কিছু জিনিস টের পাওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ সময়ে সিক্সথ সেন্স কাজ করে। আলম ফিসফিস করে বলল, আশফাক, সাইড দাও। মাথা ঠান্ডা রাখ সবাই।

আশফাক গাড়ি প্রায় ফুটপাতের ওপর তুলে ফেলল। ট্রাক থামল না। গানার দুজন পলকের জন্যে তাকাল তাদের দিকে। ওদের চোখ কাচের মতো ঠান্ডা।

সাদেক কপালের ঘাম মুছে বলল, একটা বড় ফাঁড়া কাটা গেছে। আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল এরা আমাদের জন্যেই এসেছে। আলম, তোর কি এরকম মনে হয়েছে ?

আলম জবাব দিল না। সাদেক বলল, কেন জানি দারুণ একটা ভয় লেগে গেল। আমার কখনো এরকম হয় না। মরার ভয় আমার নেই।

আশফাক সিগারেট ধরিয়েছে। সে বেশ সহজ স্বাভাবিক। সিগারেটে টান দিয়ে একসিলেটরে চাপ দিয়ে হালকা গলায় বলল, চলেন ঘরে ফিরে যাই।

নিউ ইস্কাটনের কাছে এসে তাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। সেই ট্রাকটি দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে তাদের দিকে মুখ করে। গানার দুজন মেশিনগান তাক করে আছে। কিছু সৈন্য নেমে এসেছে রাস্তায়। তাদের একজন মাঝরাস্তায় চলে এসেছে। বাঁশি বাজাচ্ছে এবং গাড়ি থামাতে বলছে। এর মানে কী ?

আলম ফিসফিস করে বলল, আশফাক, কেটে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা কর। নুরু, দেখো কিছু করতে পার কি না।

ওরা বন্দুক তাক করছে। বুঝে ফেলেছে এ গাড়ি থামবে না। সাদেক স্টেইনগানের মুখ গাড়ির জানালায় রাখল। নুরু দুটি গ্রেনেডের পিন খুলে হাতে নিয়ে বসে আছে। সাত সেকেন্ড সময় আছে। সাত সেকেন্ড অনেক সময়। কিছুক্ষণ হাতে নিয়ে বসে থাকা যায়।

আশফাকের গাড়ি লাফিয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে উড়ে চলে যাবে। নুরু দুটি গ্রেনেডই ছুড়েছে। বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়ার আগেই ওদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে পড়ল। আলম নিজের স্টেইনগানের ওপর ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলল, মাথা ঠান্ডা রাখ, মাথা ঠান্ডা।

শরীফ সাহেব বাড়ি ফিরবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। তখন খবরটা পেলেন। মিলিটারিদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ হয়েছে গেরিলাদের। গেরিলাদের কিছুই হয়নি, কিন্তু মিলিটারিদের একটা ট্রাক উড়ে গেছে। এ জাতীয় খবর কখনো পুরোপুরি সত্যি হয় না। উইসফুল থিংকিংয়ের একটা ব্যাপার আছে। বাস্তবে নিশ্চয়ই অন্যরকম কিছু হয়েছে। গেরিলাদের গায়ে আঁচড়ও পড়বে না তা কি হয়!

শরীফ সাহেব খুব আশা করতে লাগলেন যেন সংঘর্ষের খবরটা সত্যি না হয়। সত্যি না হওয়ার কথা। দিনেদুপুরে ওরা কি আর মিলিটারিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে? অবশ্যি পড়তেও পারে। রোমান্টিসিজম! ওদের যা বয়স তাতে রোমান্টিসিজমই প্রাধান্য পাবে। এ জাতীয় অপারেশনে আসা উচিত মধ্যবয়স্কদের। যারা সাবধানী।

তিনি বাড়ি ফিরে কাপড় না ছেড়েই বারান্দার ইজি চেয়ারে বসে রইলেন। আলমের জন্যে অপেক্ষা। সে আসছে না। দেরি করছে কেন? খোঁজখবর নেবারও কোনো উপায় নেই। সে কোথায় থাকে তাঁর জানা নেই। সাবধানতা! যেখানে ওদের সাবধানী হওয়া উচিত সেখানে না হয়ে অন্য জায়গায়। কোনো মানে হয়?

দুপুর তিনটায় নিয়ামত সাহেব টেলিফোন করলেন।

খবর শুনছেন? ভেরি অথেনটিক।

কী খবর?

গেরিলাদের একটা পিকআপ ধরা পড়েছে। দুজনের ডেড বডি পাওয়া গেছে।

কে বলেছে আপনাকে? যত উড়ো খবর। এইসব খবরে কান দেবেন না। এবং টেলিফোনে এসব ডিসকাসও করবেন না।

শরীফ সাহেব টেলিফোন নামিয়ে আবার বারান্দায় এসে বসলেন।

মতিন সাহেব অবাক হয়ে দেখলেন একটা বেবি টেক্সি এসে তাঁর বাড়ির সামনে থেমেছে। বেবিটেক্সি ড্রাইভার এবং একটি অচেনা লোক আলমকে ধরাধরি করে নামাচ্ছে। তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন, কী হয়েছে? অপরিচিত লম্বা ছেলেটি বলল, গুলি লেগেছে। আপনারা রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করুন। আমি ডাক্তার নিয়ে আসব। আমার নাম আশফাক। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। এসে ধরুন।

তারা বসার ঘরে ঢুকল। আলমের জ্ঞান আছে। সে হাত দিয়ে বাঁ কাঁধ চেপে ধরে আছে। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে সেখান থেকে।

রাত্রি এসে দাঁড়িয়েছে দরজার পাশে। তার মুখ রক্তশূন্য। সে একটি কথাও বলছে না। মতিন সাহেব ভাঙা গলায় বললেন, মা, একে ধর। রাত্রি নড়ল না। যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিল সেভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

ভেতর থেকে সেলাই মেশিনের শব্দ হচ্ছে। আশফাক শান্তস্বরে বলল, আল-া ভাই, আপনি কোনোরকম চিন্তা করবেন না। কারফিউয়ের আগেই আমি ডাক্তারের ব্যবস্থা করব। যেভাবেই হোক।

বেবিটেক্সির বুড়ো ড্রাইভারটির মুখ ভাবলেশহীন। যেন এ জাতীয় ঘটনা সে জীবনে বহু দেখেছে।

আশফাক তার ঘরে পৌঁছল পাঁচটায়। এখান থেকে সে যাবে ঝিকাতলা। ওদের খবর দিয়ে ডাক্তারের ব্যবস্থা করতে হবে। কার্ফু শুরু হবে সাড়ে ছ'টায়। হাতে অনেকখানি সময়।

সে গেঞ্জি বদলে একটা শার্ট পরল। অভ্যাসবসে চুল আঁচড়াল, নিচে নামল। গালে ক্রিম দিল। মুখের চামড়া টানছে। এসব শীতকালে হয়। চামড়া শুকিয়ে যায়। কিন্তু তার এমন হচ্ছে কেন ? বড্ড ক্লান্ত লাগছে। নিচে নামতে গিয়ে পা কাঁপছে। কেন এরকম হচ্ছে ? সে এখনো বেঁচে আছে। বিরাট ঘটনা। আনন্দে চিৎকার করা উচিত। কিন্তু আনন্দ হচ্ছে না। কেমন যেন ঘুম পাচ্ছে।

তার জন্যে কালো রঙের জিপ নিয়ে আর্মি ইন্টেলিজেন্সের লোকজন অপেক্ষা করছে।

আশফাক তোমার নাম ?

হ্যাঁ।

চলো আমাদের সঙ্গে। তোমার জন্যে গত এক ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি।

৮

রাত্রি পাথরের মূর্তির মতো একা একা বসার ঘরে বসে আছে। দুপুর থেকেই আকাশ মেঘে মেঘে কালো হয়েছিল। এখন বৃষ্টি নামল। প্রবল বর্ষণ। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঘনঘন বাজ পড়ছে।

রাস্তায় লোক চলাচল একেবারেই নেই। দু'একটা রিকশা বা বেবিটেক্সির শব্দ শোনামাত্র রাত্রি বের হয়ে আসছে। বোধহয় ডাক্তার নিয়ে কেউ এসেছে। না কেউ না। কার্ফুর সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণ পর হয়তো একটি রিকশা বা বেবিটেক্সির শব্দ কানে আসবে না। দ্রুতগামী জিপ কিংবা ভারী ট্রাকের শব্দ কানে আসবে। রাত্রি ঘড়ি দেখে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সামনের পুকুরে এই অবেলায় একজন লোক গোসল করছে। কোথাও কেউ নেই। এমন ঘোর বর্ষণের ভেতর নিজের মনে লোকটা সাঁতার কাটছে। দেখে মনে হচ্ছে এই লোকটির মনে কত আনন্দ।

জামগাছওয়ালা বাড়ির উকিল সাহেব বাজার নিয়ে ফিরছিলেন। তাঁর এক হাতে ছাতি, তবু তিনি পুরোপুরি ভিজে গেছেন। তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে রাত্রিকে দেখলেন। অবাক হয়ে বললেন, একা একা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছ কেন মা ? ভেতরে যাও। কখনো বারান্দায় থাকবে না। যাও যাও, ভেতরে যাও। দরজা বন্ধ করে দাও।

রাত্রি বলল, কার্ফু কি শুরু হয়েছে চাচা ?

না, এখনো ঘণ্টাখানিক আছে। যাও মা, ভেতরে যাও।

উকিল সাহেব লম্বা লম্বা পা ফেলে এগুলেন। তাঁর এক মেয়ে যূথী রাত্রির সঙ্গে পড়ত। মেট্রিক পাস করবার পরই তার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের এক বছরের মাথায় বাচ্চা হতে গিয়ে যূথী মারা গেল। বিয়ে না হলে মেয়েটা বেঁচে থাকত। মেয়েদের জীবন বড় কষ্টের।

লোকটা পুকুরে এখনো সাঁতার কাটছে। চিৎ হয়ে, কাত হয়ে নানান রকম ভঙ্গি করছে। পাগল নাকি ?

ভেতর থেকে সুরমা ডাকলেন, রাত্রি!

রাত্রি জবাব দিল না। সুরমা বারান্দায় এসে তাঁর মেয়ের মতোই অবাক হয়ে সাঁতার কাটা লোকটিকে দেখতে লাগলেন। রাত্রি মৃদুস্বরে বলল, কেউ তো এখনো এল না মা। সুরমা শান্ত গলায় বললেন, এসে পড়বে। এখনই এসে পড়বে। তুই ভেতরে আয়। আলমের কাছে গিয়ে বস।

রাত্রি বসার ঘরে এসে সোফায় বসল। ভেতরে গেল না। ভেতরে যেতে তার ইচ্ছা করছে না।

মতিন সাহেব একটা পরিষ্কার পুরনো শাড়ি ভাঁজ করে আলমের কাঁধে দিয়েছেন। তিনি দু'হাতে সেই শাড়ি চেপে ধরে আছেন। একটু পরপর ফিসফিস করে বলছেন, তোমার কোনো ভয় নাই। এক্ষুনি ডাক্তার চলে আসবে। তাছাড়া রক্ত বন্ধ হওয়াটাই বড় কথা। রক্ত বন্ধ হয়েছে।

মতিন সাহেবের কথা সত্যি নয়। কাঁধের শাড়ি ভিজে উঠছে। রক্ত জমাট বাঁধছে না। আলম নিঃশ্বাস নিচ্ছে হা করে। মাঝে মাঝে খুব অস্পষ্টভাবে আহ-উহ করছে। কিন্তু জ্ঞান আছে পরিষ্কার। কেউ কিছু বললে জবাব দিচ্ছে। সে একটু পরপর পানি খেতে চাইছে। চামচে করে মুখে পানি দিয়ে দিচ্ছে বিন্তি। এই প্রথম বিন্তির মুখে কোনো হাসি দেখা যাচ্ছে না। সে পানির গ্লাস এবং চামচ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাশে। তার সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অপালা। সে দারুণ ভয় পেয়েছে। একটু পরপর কেঁপে কেঁপে উঠছে। একসময় আলম গোঙাতে শুরু করল। অপালা চমকে উঠল। তারপরই কেঁদে উঠে ছুটে বের হয়ে গেল।

রাত্রি এসে দাঁড়িয়েছে দরজার ওপাশে। তার মুখ ভাবলেশহীন। সে তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে।

আলম কাৎরাতে কাৎরাতে বলল, ব্যথাটা সহ্য করতে পারছি না। একেবারেই সহ্য করতে পারছি না।

মতিন সাহেব তাকিয়ে আছেন। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, ডাক্তার এসে পড়বে। একটু ধৈর্য ধরো। একটু। রাত্রি, তুই দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? কিছু একটা কর।

কী করব বলো ?

মতিন সাহেব কিছু বলতে পারলেন না।

বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। খোলা জানালা দিয়ে প্রচুর হাওয়া আসছে। বৃষ্টিভেজা হাওয়া।

জানালা বন্ধ করে দে।

রাত্রি জানালা বন্ধ করবার জন্যে এগিয়ে যেতেই আলম বলল, বন্ধ করবেন না। প্লিজ, বন্ধ করবেন না। সে পাশ ফিরতে চেষ্টা করতেই তীব্র ব্যথায় সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে গেল। মাকে ডাকতে ইচ্ছা করছে। ব্যথার সময় মা মা বলে চিৎকার করলেই ব্যথা কমে যায়। এটা কি সত্যি, না এটা সুন্দর একটা কল্পনা ?

খোলা জানালার পাশে রাত্রি দাঁড়িয়ে আছে। হাওয়ায় তার চুল উড়ছে। আহ্, কী সুন্দর দেখাচ্ছে মেয়েটাকে! বেঁচে থাকার মতো আনন্দ আর কিছুই নেই। কত অপূর্ব সব দৃশ্য চারদিকে। মন দিয়ে আমরা কখনো তা দেখি না। যখন সময় শেষ হয়ে যায় তখনই শুধু হাহাকারে হৃদয় পূর্ণ হয়। রাত্রি কী যেন বলছে। কী বলছে সে ? আলম তার ইন্দ্রিয়গুলি সজাগ করতে চেষ্টা করল।

আপনি বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছেন। জানালা বন্ধ করে দি ?

না না। খোলা থাকুক। প্লিজ।

এই জানালা বন্ধ করা নিয়ে কত কাণ্ড হতো বাড়িতে। শীতের সময়ও জানালা খোলা না রেখে সে ঘুমুতে পারত না। মা গভীর রাতে চুপিচুপি এসে জানালা বন্ধ করে দিতেন। এই নিয়ে তার কত ঝগড়া।

নিউমোনিয়া হয়ে মরে থাকবি একদিন।

জানালা বন্ধ থাকলে নিউমোনিয়া ছাড়াই মরে যাব মা। অক্সিজেনের অভাবে মরে যাব।

অন্য কারও তো অক্সিজেনের অভাব হচ্ছে না।

আমার হয়। আমি খুব স্পেশাল মানুষ তো তাই।

সেই খোলা জানালা দিয়ে চোর এল এক রাতে। আলমের টেবিলের ওপর থেকে মানিব্যাগ, ঘড়ি এবং একটা ক্যামেরা নিয়ে পাইপ বেয়ে নেমে গেল। সকালবেলা দেখা গেল—চোর তার স্পঞ্জের স্যান্ডেল বাগানে ফেলে গেছে। আলম সেই স্যান্ডেল জোড়া নিয়ে এল। হাসিমুখে মাকে বলল, শোধ-বোধ হয়ে গেল মা। চোর নিয়েছে আমার জিনিস, আমি নিলাম চোরের। এখন থেকে এই স্যান্ডেল আমি ব্যবহার করব।

এই নিয়ে মা বড় ঝামেলা করতে লাগলেন। চিৎকার চেঁচামেচি। চোরের স্যান্ডেল ঘরে থাকবে কেন ? এসব কী কাণ্ড! আলম হেসে হেসে বলত, বড় সফট স্যান্ডেল মা। পরতে খুব আরাম।

স্যান্ডেল জোড়া কি আছে এখনো ? মানুষের মন এত অদ্ভুত কেন ? এত জিনিস থাকতে আজ মনে পড়ছে চোরের স্যান্ডেল জোড়ার কথা ?

মতিন সাহেব ঘড়ি দেখলেন। কারফিউয়ের সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। ছেলেটি কি ডাক্তার নিয়ে আসবে না ? তাঁর নিজেরই কি যাওয়া উচিত ? আশেপাশে ডাক্তার কে আছেন ? একজন লেডি ডাক্তার এই পাড়াতেই থাকেন। তার বাড়ি তিনি চেনেন না। কিন্তু খুঁজে বের করা যাবে। সেটা কি ঠিক হবে ? গুলি খেয়ে একটি ছেলে পড়ে আছে। এটা জানাজানি করার বিষয় নয়। কিন্তু ছেলেটার যদি কিছু হয় ? বৃষ্টিবাদলার জন্যেই অসময়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। ইলেকট্রিসিটি নেই। এ অঞ্চলে অল্প হাওয়া দিলেই ইলেকট্রিসিটি চলে যায়। মতিন সাহেব বললেন, একটা হারিকেন নিয়ে আয় তো মা।

রাত্রি ঘর থেকে বেরুবামাত্র আলম দুইবার ফিসফিস করে তার মাকে ডাকল— আম্মি আম্মি। শিশুদের ডাক। যেন একটি নয়-দশ বছরের শিশু অন্ধকারে ভয় পেয়ে তার মাকে ডাকছে। রাত্রি নিঃশব্দে এগুচ্ছে রান্নাঘরের দিকে। শোবার ঘর থেকে অপালা ডাকল, আপা, একটু শুনে যাও।

অপালা বিছানার চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে। অসম্ভব ভয় লাগছে তার। সে চাদরের নিচে বারবার কেঁপে কেঁপে উঠছে। রাত্রি ঘরে ঢোকামাত্রই সে উঠে বসল।

কী হয়েছে অপালা ?

খুব ভয় লাগছে।

মার কাছে গিয়ে বসে থাক।

না।

অপালা আবার চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। রাত্রি এসে হাত রাখল তার মাথায়। গা গরম। জ্বর এসেছে।

অপালা ফিসফিস করে বলল, আপা, উনি কি মারা গেছেন ?

না, মারা যাবেন কেন ? ভালো আছেন।

তাহলে কোনো কথাবার্তা শুনছি না কেন ?

রাত্রি কোনো জবাব দিল না। অপালা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, তুমি একটু আমার পাশে বসে থাকো আপা। রাত্রি বসল। ঠিক তখনই শুনতে পেল আলম আবার তার মাকে ডাকছে। আম্মি। আম্মি।

রাত্রি উঠে দাঁড়াল।

সুরমা হারিকেন জ্বালিয়ে রান্নাঘরেই বসে আছেন। রাত্রি ছায়ার মতো রান্নাঘরে এসে ঢুকল। কাঁপা গলায় বলল, মা, তুমি উনার হাত ধরে একটু বসে থাকো। উনি বারবার তাঁর মাকে ডাকছেন।

সুরমা নড়লেন না। হারিকেনের দিকে তাকিয়ে বসেই রইলেন। রাত্রি বলল, মা, এখন আমরা কী করব ?

সুরমা ফিসফিস করে বললেন, কিছু বুঝতে পারছি না।

হাওয়ার ঝাপটায় হারিকেনের আলো কাঁপছে। বিচিত্র সব নকশা তৈরি হচ্ছে দেয়ালে। প্রচণ্ড শব্দে কাছেই কোথাও যেন বাজ পড়ল। মতিন সাহেব ও-ঘর থেকে চেঁচাচ্ছেন, আলো দিয়ে যাচ্ছ না কেন ? হয়েছে কী সবার ? ভয় পেয়ে অপালা তার ঘরে কাঁদতে শুরু করেছে। কী ভয়ঙ্কর একটি রাত। কী ভয়ঙ্কর।

গত দেড় ঘণ্টা যাবত আশফাক একটা চেয়ারে জড়সড় হয়ে বসে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার কোনো বোধশক্তি নেই। চারপাশে কোথায় কী ঘটছে সে সম্পর্কেও কোনো আগ্রহ নেই। তার সামনে একজন মিলিটারি অফিসার বসে আছে। অফিসারটির গায়ে কোনো ইউনিফর্ম নেই। লম্বা কোর্তার মতো একটা পোশাক। ইউনিফর্ম না থাকায় তার র‍্যাঙ্ক বোঝা যাচ্ছে না। বয়স দেখে মনে হয় মেজর কিংবা লেফটেনেন্ট কর্নেল। জুলপির কাছে কিছু চুল পাকা।

চেহারা রাজপুত্রের মতো। কথা বলে নিচুগলায়। খুব কফি খাওয়ার অভ্যাস। আশফাক লক্ষ করেছে এই এক ঘণ্টায় সে ছয় কাপের মতো কফি খেয়েছে। কফি খাওয়ার ধরনটিও বিচিত্র। কয়েক চুমুক দিয়ে রেখে দিচ্ছে। এবং নতুন আরেক কাপ দিতে বলছে। এখন পর্যন্ত আশফাকের সাথে তার কোনো কথা হয়নি। আশফাক বসে আছে। অফিসারটি কফিতে চুমুক দিচ্ছে এবং নিজের মনে কী সব লেখালেখি করছে। মনে হচ্ছে আশফাক সম্পর্কে তার কোনো উৎসাহ নেই।

ঘরটি খুবই ছোট। তবে মেঝেতে কার্পেট আছে। দরজায় ফুলতোলা পর্দা। অফিসঘরের জন্যে পর্দাগুলি মানাচ্ছে না। কার্পেটের রঙের সঙ্গেও মিশ খাচ্ছে না। কার্পেট লাল রঙের, পর্দা দুটি নীল। আশফাক বসে বসে পর্দায় কতগুলি ফুল আছে তা গোনার চেষ্টা করছে। তার প্রচণ্ড সিগারেটের তৃষ্ণা হচ্ছে। সিগারেট আছে সঙ্গে, তবে ধরাবার সাহস হচ্ছে না।

মিলিটারি অফিসারটির কাজ মনে হয় শেষ হয়েছে। সে ফাইলপত্র একপাশে সরিয়ে রেখে আশফাকের দিকে তাকিয়ে চমৎকার ইংরেজিতে বলল, কফি খাবে ? ঝড়বৃষ্টিতে কফি ভালোই লাগবে।

আশফাক কোনো উত্তর দিল না

আশফাক তোমার নাম ?

হ্যাঁ।

তোমার গাড়িতে যে দুটি ডেডবডি পাওয়া গেছে ওদের নাম কী ?

আশফাক নাম বলল। অফিসারটির মনে হলো নামের প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই। সে হাই তুলে উঁচুগলায় দু'কাপ কফি দিতে বলল। কফি চলে এল সঙ্গে সঙ্গেই।

খাও, কফি খাও। আমার নাম রাকিব। মেজর রাকিব। আমি কফিতে দুধ-চিনি খাই না। তোমারটাতেও দুধ-চিনি নেই। লাগলে বলবে। তুমি সিগারেট খাও ?

হ্যাঁ।

তাহলে সিগারেট ধরাও। স্মোকাররা সিগারেট ছাড়া কফি খেতে পারে না।

আশফাক কফিতে চুমুক দিল। চমৎকার কফি। সিগারেট ধরাল। ভালো লাগছে সিগারেট টানতে। মেজর রাকিব তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে। তার চোখ দুটি হাসি হাসি।

আশফাক।

বলুন।

আমরা দুজন পনের মিনিটের মধ্যে এখান থেকে বেরুব। ঝড়টা কমার জন্যে অপেক্ষা করছি। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে এবং তোমার সহকর্মীরা যেসব জায়গায় থাকে সেসব আমাদের দেখিয়ে দেবে। আমরা আজ রাতের মধ্যেই সবাইকে ধরে ফেলব।

আশফাক তাকিয়ে রইল।

তোমার সাহায্য আমি মনে রাখব এইটুকু শুধু তোমাকে বলছি।

আশফাক নিচুগলায় বলল, ওরা কোথায় থাকে আমি জানি না।

মেজর রাকিব এমন ভাব করল যে সে এই কথাটি শুনতে পায়নি। হাসি হাসি মুখে বলল, কেউ কথা না বলতে চাইলে আমাদের বেশ কিছু পদ্ধতি আছে। কিছু কিছু পদ্ধতি বেশ মজার। একটা তোমাকে বলি। এক বুড়োকে আমরা ধরলাম গত সপ্তাহে। আমার ধারণা হলো সে কিছু খবরাখবর জানে। ভাব দেখে মনে হলো কিছু বলবে না। আমি তখন ওর মেয়েটিকে ধরে আনলাম এবং বললাম, মুখ না খুললে আমার একজন জোয়ান তোমার সামনে মেয়েটিকে রেপ করবে। পাঁচ মিনিট সময়। এর মধ্যে ঠিক করো বলবে কি বলবে না। বুড়ো এক মিনিটের মাথায় বলতে শুরু করল।

আশফাক বলল, স্যার, আমি এদের কারোই ঠিকানা জানি না।

এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ?

এরা আমার কাছে এসেছে, আমি ওদের গাড়ি করে নিয়ে গিয়েছি। আমি নিজেও মুক্তিযোদ্ধা না।

ওরা তোমাকে জোর করে নিয়ে গেছে, তাই না ? গানপয়েন্টে না গেলে তোমাকে ওরা গুলি করে মেরে ফেলত ?

জি।

নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তুমি এই কাজটি করেছ।

জি স্যার।

তা তো করবেই। গান পয়েন্টে কেউ কিছু বললে না শুনে উপায় নেই। শুনতেই হয়।

মেজর রাকিব আরেক কাপ কফির কথা বলল। কফি নিয়ে যে লোকটি ঢুকল তাকে বলল, তুমি একে নিয়ে যাও। ওর দুটি আঙুল ভেঙে আবার আমার কাছে নিয়ে আস। বেশি ব্যথা দিও না।

রাকিব হাসিমুখে তাকাল আশফাকের দিকে এবং নরম গলায় বলল, তুমি ওর সঙ্গে যাও। এবং শুনে রাখ, এখন বাজে ন'টা কুড়ি, তুমি ন'টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে প্রচুর কথা বলবে। সবার বাড়ি দেখিয়ে দেবে। ধরিয়ে দেবে। আমি এই নিয়ে তোমার সঙ্গে দশ হাজার টাকা বাজি রাখতে পারি।

যে লোকটি আশফাকের ডান হাত নিজের মুঠোয় ধরে রেখেছে তার মুখ গোলাকার। এরকম গোল মানুষের মুখ হয়? যেন কম্পাস দিয়ে মুখটি আঁকা। তার হাতটিও মেয়েদের হাতের মতো তুলতুলে নরম। লোকটি পেনসিলের মতো সাইজের একটি কাঠি আশফাকের দু'আঙুলের ফাঁকে রাখল। আশফাকের মনে হচ্ছে এটা একটা স্বপ্নদৃশ্য। বাস্তবে এরকম কিছু ঘটছে না। গোলাকার মুখের এই লোকটি তার হাত নিয়ে খেলা করছে। আশফাক নিজেই বুঝতে পারল না যে সে পশুর মতো আঁ আঁ করে চিৎকার করে উঠেছে। কেউ কি টেনে তার হাতটি ছিঁড়ে ফেলেছে? কী করছে এরা? কী করছে? তীব্র তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা। দ্বিতীয়বারের মতো চিৎকার করেই সে জ্ঞান হারাল।

মেজর রাকিব তাকিয়ে আছে তার দিকে। কী সুন্দর চেহারা এই লোকটির! নাদিমের সঙ্গে মিল আছে। নাকটা লম্বা।

আশফাক, তোমার জ্ঞান ফিরেছে মনে হচ্ছে। ভালোই হয়েছে। গাড়ি এসে গেছে। চল, যাওয়া যাক। নাকি যাওয়ার আগে আরেক কাপ কফি খাবে?

আশফাক তাকিয়ে আছে। লোকটি নাদিমের মতো লম্বা নয়। একটু খাটো। বড়জোর পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি।

আশফাক, তুমি ওদের ঠিকানা জানো নিশ্চয়ই। জানো না?

কয়েকজনের জানি। সবার জানি না।

ওতেই হবে। ব্যাপারটা হচ্ছে মাকড়সার জালের মতো। একটা সুতার সন্ধান পাওয়া গেলে গোটা জালটা খুঁজে পাওয়া যায়। আশফাক।

বলুন।

চল, রওনা হওয়া যাক।

আমি আপনাকে কিছুই বলব না।

কিছুই বলবে না?

না।

মাত্র দুটি আঙুল তোমার ভাঙা হয়েছে। তোমার হাতে আরও আটটি আঙুল আছে।

আমি কিছুই বলব না।

তোমার মাথা গরম হয়ে গেছে। অনেক সময় ব্যথার পরিমাণ বেশি হলে মাথা গরম হয়ে যায়। তুমি মাথা ঠান্ডা করো। কফি খাও, সিগারেট খাও। তারপর আমরা কথা বলব। নাকি সুলিড কিছু খাবে? গোশত-পরোটা?

আশফাক কিছু বলল না। সে তাকিয়ে আছে তার বাঁ-হাতের দিকে। মুহূর্তের মধ্যে কেমন ফুলে উঠেছে। এটি কি সত্যি তার হাত ?

আশফাক গোশত-পরোটা খুব আগ্রহ করে খেল। তার এতটা ক্ষিধে পেয়েছিল সে নিজেও বুঝতে পারেনি। ঝাল দিয়ে রান্না করা গোশত। চমৎকার লাগছে। পশ্চিমারা এতটা ঝাল খায় তার জানা ছিল না।

আশফাক!

জি।

আরও লাগবে ?

জি-না।

কফি চলবে ?

একটা পান খাব।

পান পাওয়া যাবে না। দোকানপাট বন্ধ। এখন কার্ফু চলছে। সিগারেট আছে তো ? না থাকলে বলো।

জি আছে।

চলো, তাহলে রওনা দেওয়া যাক।

কোথায় ?

তুমি তোমার বন্ধুদের দেখিয়ে দিবে। বাড়ি চিনিয়ে দেবে।

আশফাক অনেক কষ্টে এক হাতে দেয়াশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাল। অনেকখানি সময় নিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। বেশ লাগছে সিগারেট।

মেজর সাহেব।

বলো।

আমি কিছুই বলব না।

কিছুই বলবে না ?

জি-না। আপনি তো আমাকে মেরেই ফেলবেন। মারেন। কষ্ট দেবেন না। কষ্ট দেওয়া ঠিক না।

মরতে ভয় পাও না ?

জি পাই। কিন্তু কী করব বলেন। উপায় কী ?

উপায় আছে। ধরিয়ে দাও ওদের। আমি তোমাকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই গ্যারান্টি তোমাকে দিচ্ছি।

মেজর সাহেব, এটা সম্ভব না।

সম্ভব না ?

জি-না। আমি তো মানুষের বাচ্চা। কুকুর বিড়ালের বাচ্চা তো না।

তুমি মানুষের বাচ্চা ?

জি, আমাকে কষ্ট দিবেন না মেজর সাহেব। মেরে ফেলতে বলেন। কষ্ট সহ্য করতে পারি না।

মেজর রাকিব দীর্ঘ সময় তাকিয়ে রইল। এই ছেলেটির যাবতীয় যন্ত্রণার অবসান করবার জন্যে তার ইচ্ছা করছে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। খবর বের করতেই হবে। এটা একটা মাকড়সার জাল। একটা সুতা পাওয়া গেছে। জালটিও পাওয়া যাবে। যেতেই হবে। মানুষ আসলে একটি দুর্বল প্রাণী। মেজর রাকিব আশফাকের আরও দুটি আঙুল ভেঙে ফেলার হুকুম দিয়ে নিজের ঘরে এসে বসল।

বাইরে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে।

রাত এগারোটায় টেলিফোন। নাসিমা ভয়ে ভয়ে টেলিফোন ধরলেন।

কে ?

ফুফু আমি।

কী ব্যাপার রাত্রি ? গলা এরকম শোনাচ্ছে কেন ? কী হয়েছে ?

কিছু হয় নি। ফুফু, তোমার কাছে যে একজন ভদ্রমহিলা এসেছিলেন, মেডিকেল কলেজের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর মিসেস রাবেয়া করিম, উনার টেলিফোন নম্বরটা দাও।

কেন ?

খুব দরকার ফুফু। তুমি দাও।

কী হয়েছে বল ?

বলছি। নম্বরটা দাও আগে। তোমার পায়ে পড়ি ফুফু।

নাসিমা অবাক হয়ে শুনলেন রাত্রি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তিনি নম্বর এনে দিলেন।

সেই নম্বরে বারবার টেলিফোন করেও কাউকে পাওয়া গেল না। রিং হচ্ছে, কেউ ধরছে না।

মতিন সাহেব ঠিক একই ভঙ্গিতে কাঁধ চেপে ধরে আছেন। তাঁর ধারণা রক্ত বন্ধ হয়েছে। তিনি মনে মনে সারাক্ষণ সূরা এখলাস পড়ছেন।

আলম এখন আর পানি খেতে চাচ্ছে না। খানিকটা আচ্ছন্নের মতো হয়ে পড়েছে। সুরমা এক কাপ গরম দুধ খাওয়াতে চেষ্টা করলেন। এটা সে খেতে পারল বলে মনে হলো।

তার জ্ঞান আছে। ডাকলে সাড়া দেয়। চোখ মেলে তাকায়। সেই চোখ টকটকে লাল।

মতিন সাহেব বললেন, মাথায় জলপট্টি দেওয়া দরকার। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। সুরমা, ভেজা তোয়ালে নিয়ে এসো।

ভেজা তোয়ালে দিয়ে কপাল স্পর্শ করতেই আলম কেঁপে উঠল। সুরমা মৃদুস্বরে বললেন, বাবা, এখন রাত দুটো বাজে। ভোর হতে বেশি বাকি নেই। ভোর হলেই যেভাবেই হোক তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। তুমি শক্ত থাক।

আশফাক তাকিয়ে আছে শূন্যদৃষ্টিতে। মেজর রাকিবের মুখ এমন গোলাকার লাগছে কেন ? তার মুখ তো এমন ছিল না। গোল মুখ ছিল ওই লোকটির যে আঙুল ভাঙে। ভাঙার সময় কেমন টুক করে শব্দ হয়।

আশফাক।

জি।

চিনতে পারছ আমাকে ?

জি। আপনি মেজর রাকিব।

তুমি কি এখন বলবে ?

জি-না। মেজর সাহেব, আপনি আমাকে মেরে ফেলেন, কষ্ট দেবেন না।

মেজর রাকিব তাকিয়ে রইল। এই ছেলেটি কোনো কথা বলবে না এ বিষয়ে সে এখন নিঃসন্দেহ। তার প্রচণ্ড রাগ হওয়া উচিত। কিন্তু কেন জানি হতে পারছে না। সে ঠান্ডা গলায় বলল, তুমি কি কিছু খেতে চাও ? কফি কিংবা সিগারেট ? খেতে চাইলে খেতে পার। চাও কিছু ?

জি-না। ধন্যবাদ মেজর সাহেব। বহুত শুকরিয়া।

আশফাক।

জি।

তুমি কি বিবাহিত ?

জি স্যার।

ছেলেমেয়ে আছে ?

জি-না।

নতুন বিয়ে ?

জি।

স্ত্রীকে ভালোবাস ?

আশফাক জবাব দিল না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। মেজর রাকিব সহজ ভঙ্গিতে বলল, জবাব দাও। ভালোবাস ?

জি স্যার।

তাহলে তো ওর জন্যেই বেঁচে থাকা উচিত। উচিত নয় কি ?

জি, উচিত।

তাহলে বোকামি করছ কেন ? তোমার কি ধারণা কয়েকটি ছেলে ধরা পড়লে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে ? তা তো না। নতুন নতুন ছেলে আসবে। এবং কে জানে একসময় যুদ্ধে তোমরা জিতেও যেতে পার। পার না ?

জি স্যার, পারি।

নিজের জীবনের চেয়ে মূল্যবান আর কিছুই নেই। এটা একটা সহজ সত্য। তুমি নেই তার মানে তোমার কাছে পৃথিবীর কোনো অস্তিত্ব নেই—দেশ তো অনেক দূরের কথা। আমি কি ঠিক বলছি ?

জি স্যার, ঠিক।

বেশ, এখন তুমি কথা বলো। চল আমার সঙ্গে। শুধুমাত্র একজনকে ধরিয়ে দাও। আমি কথা দিচ্ছি, ভোরবেলায় তোমাকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করব।

আশফাক অনেকক্ষণ মেজর রাকিবের দিকে তাকিয়ে রইল। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তাকাল তার ফুলে উঠা হাতের দিকে। আহ্ কী অসম্ভব যন্ত্রণা! যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে ইচ্ছা করে। খুবই ইচ্ছা করে।

চল, আশফাক। চল। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

স্যার, আমি কিছু বলব না।

বলবে না ?

জি-না।

দুজন দীর্ঘ সময় দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল। মেজর রাকিব বেল টিপে কাকে যেন ডাকল। শীতল গলায় আশফাককে মেরে ফেলবার নির্দেশ দিল। আশফাক বিড়বিড় করে বলল, স্যার যাই। স্লামালিকুম।

আলম কোনো সাড়াশব্দ করছে না। তার পা আগুনের মতো গরম। কিছুক্ষণ আগেও ছটফট করছিল। এখন সে ছটফটানি নেই। একবার শুধু বলল, পানি খাব। পানি দিন।

মতিন সাহেব চামচে করে পানি দিলেন। সে পানি সে খেল না। মুখ ফিরিয়ে নিল।

পানি চেয়েছিলে তুমি। একটু হা করো।

না।

ব্যথা কি খুব বেশি ?

না, বেশি না।

মতিন সাহেব চিন্তিত বোধ করলেন। হঠাৎ করে ব্যথা কমে যাবে কেন ? এর মানে কী ?

আলম! আলম!

জি।

ভোর হতে খুব দেরি নেই। তোমার আত্মীয়স্বজন কাকে খবর দেব বলো তো।

আলম জবাব দিল না। মতিন সাহেব এই প্রশ্নটি দ্বিতীয়বার করলেন। আলম বলল, কাউকে বলতে হবে না।

কেন বলতে হবে না। নিশ্চয়ই বলতে হবে।

কেন বিরক্ত করছেন ?

মতিন সাহেব চুপ করে গেলেন।

আলম বিড়বিড় করে বলল, আমার মাথার নিচে আরেকটা বালিশ দিন।

তার কাছে মনে হচ্ছে তার মাথা ক্রমেই নিচে নেমে যাচ্ছে। টেনে কেউ তাকে নিয়ে যাচ্ছে অতলান্তিক জলে। কিছুতেই ভাসিয়ে রাখা যাচ্ছে না। ঘরবাড়ি অচেনা হয়ে যাচ্ছে। সে কি মারা যাচ্ছে! মরবার আগে সমস্ত অতীত স্মৃতি নাকি ঝলসে উঠে। কই সে রকম তো কিছু হচ্ছে না। চোখের সামনে কিছুই ভাসছে না। কোনো স্মৃতি নেই। চেষ্টা করেও কোনো কিছু মনে করা যাচ্ছে না। যতবার সে কিছু মনে করবার চেষ্টা করছে ততবারই সাদেকের মুখ ভেসে উঠছে। নুরুর মুখের ছবি আসছে না। অথচ গাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় সে এই দু'জনের দিকেই তাকিয়ে ছিল। তার চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে নুরুকে সে অনেক বেশি পছন্দ করে। অনেক বেশি। কী ঠান্ডা একটা ছেলে। বয়স কত হবে ? কুড়ি একুশ ? তার চেয়েও কম হতে পারে। কোনোদিন জিজ্ঞেস করা হয়নি। জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল।

মতিন সাহেব।

কী বাবা ?

আমাদের সঙ্গে দুটি ছেলে ছিল। ওরা মারা গেছে।

বাবা, তুমি চুপ করে থাক। কথা বলবে না। কোনো কথা বলবে না।

পানি খাব।

বিন্তি এক চামচ পানি দিল মুখে। রাত্রি এসে দাঁড়িয়েছে দরজার পাশে। সেখান থেকেই সে বলল, আপনার কি এখন একটু ভালো লাগছে ? রাত সাড়ে তিনটা, সকাল হতে বেশি বাকি নেই।

আলমের মাথা আবার কেমন ভারী হয়ে যাচ্ছে। সে কি আবার তলিয়ে যেতে শুরু করেছে ? কিন্তু সে তলিয়ে যেতে চায় না। জেগে থাকতে হবে। মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে।

পাশা ভাইও এরকম গুলি খেয়েছিল। গুলি লেগেছিল পেটে। ভয়াবহ অবস্থা। কিন্তু পাশা ভাই ছিলেন ইস্পাতের মতো। মৃত্যুর আগ মুহূর্তেও বললেন—আমাকে মেরে ফেলা এত সহজ না। সামান্য একটা সিসার গুলি আমাকে মেরে ফেলবে। পাগল হয়েছিস তোরা ? 'বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সুচ্যাগ্র মেদিনী'। কথায় কথায় কবিতা বলতেন। ছড়া বলতেন। দেশের সেরা সন্তানদের আমরা হারাচ্ছি। এরা দেশের শ্রেষ্ঠতম ফসল। এই দেশ বীর প্রসবিনী।

রাত্রির পাশে তার মা এসে দাঁড়িয়েছেন। কী করুণ লাগছে ভদ্রমহিলার মুখ। আলম একবার ভাবল বলবে, আপনাদের অনেক ঝামেলায় ফেললাম। কিন্তু বলা গেল না। বললে নাটকীয় শোনাবে। বাড়তি নাটকের এখন কোনো দরকার নেই। আলম বলল, কটা বাজে ?

তিনটা পঁয়ত্রিশ।

মাত্র পাঁচ মিনিট গিয়াছে ? সময় কি থেমে গেছে ? কে একজন ছিল না যে সময়কে থামিয়ে দিয়েছিল ? কী নাম যেন ? মহাবীর থর ? না অন্য কেউ ? সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আবার সাদেকের মুখটা ভাসছে। মৃত মানুষদের কথা এখন আমি ভাবতেই চাই না। কিছুতেই না। আমি ভাবতে চাই জীবিত মানুষদের কথা। মার কথা ভাবতে চাই। বোনের কথা ভাবতে চাই। এবং এই মেয়েটির কথাও ভাবতে চাই। রাত্রি! কী অদ্ভুত না।

আলম পাশ ফিরতে চেষ্টা করল। সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল তীব্র তীক্ষ্ণ ব্যথা। আবার সে ডুবে যেতে শুরু করেছে। সে বিড়বিড় করে বলল, মতিন সাহেব, মাথাটা একটু উঁচু করে দিন।

রাত্রি একা একা বারান্দায় বসে আছে। সে তাকিয়ে আছে নারকেল গাছের দিকে। সেখানে বেশ কিছু জোনাকি ঝিকমিক করছে। শহরেও জোনাকি আছে তার জানা ছিল না।

ভালো লাগছে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে।

পাশের বাড়িতে দোতলা ফ্ল্যাটে একটি ছোট বাচ্চা কাঁদছে। তার মা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না।

আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। একটি দুটি করে তারা ফুটতে শুরু করেছে। রাত্রি লক্ষ করল, আকাশের তারার সঙ্গে জোনাকিদের চমৎকার মিল আছে।

বাচ্চাটা কান্না থামিয়েছে। হয়তো দুধ বানিয়ে দিয়েছে তার মা। নিশ্চিত হয়ে ঘুমুচ্ছে। আহ্, শিশুরা কত সুখী!

সুরমা বারান্দায় এসে তাকালেন মেয়ের দিকে। তাঁর বুকে ধক করে একটা ধাক্কা লাগল।

রাত্রি!

কী মা ?

একা একা বসে আছিস কেন ?

রাত্রি জবাব দিল না। তাকিয়ে রইল জোনাকির দিকে। সুরমা ক্লান্তস্বরে বললেন, ভোর হতে দেরি নেই।

রাত্রি ঠিক আগের মতোই বসে রইল। সুরমা বললেন, তুই চিন্তা করিস না। আমার মনে হয় ও সুস্থ হয়ে উঠবে। তোর মনে হয় না ?

আমার কিছু মনে-টনে হয় না।

বলতে গিয়ে রাত্রির গলা ধরে গেল। ইচ্ছা করল চেঁচিয়ে কেঁদে উঠতে।

সুরমা বসলেন মেয়ের পাশে। একটি হাত রাখলেন তার পিঠে। অস্বাভাবিক কোমল স্বরে বললেন, দেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর আমি আলমের মা'র কাছে গিয়ে বলব— চরম দুঃসময়ে আমরা আপনার ছেলের কাছে ছিলাম। তার ওপর আমাদের দাবি আছে। এই ছেলেটিকে আপনি আমায় দিয়ে দিন।

দুজনে অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। রাত্রির চোখ দিয়ে ক্রমাগত জল পড়তে লাগল। সুরমা মেয়েকে কাছে টানলেন। চুমু খেলেন তার ভেজা গালে।

রাত্রি ফিসফিস করে বলল, জোনাকিগুলিকে আর দেখা যাচ্ছে না কেন মা?

জোনাকি দেখা যাচ্ছে না, কারণ ভোর হচ্ছে। আকাশ ফর্সা হতে শুরু করছে। গাছে গাছে পাখপাখালি ডানা ঝাপ্টাচ্ছে। জোনাকিদের এখন আর প্রয়োজন নেই।

দূরে কোথায়

আকাশে মেঘ করেছে।

ঘন কালো মেঘ। ক্রমেই ফুলে ফেঁপে উঠছে।

ওসমান সাহেব আকাশের দিকে তাকালেন। তাঁর কেন জানি মনে হলো এই মেঘে বৃষ্টি হবে না। প্রিকগনিশন নাকি ? ভবিষ্যতের কথা আগেভাগে বলে ফেলা। তিনি হাঁটছেন অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে। উদ্দেশ্যহীন মানুষের হাঁটা। গন্তব্যহীন যাত্রা। অথচ তাঁর একটি গন্তব্য আছে। বিডিআর-এর তিননম্বর গেট পার হয়ে তিনি ঢুকে যাবেন নিউ পল্টন লাইনের গলিতে। গোরস্থানের দেয়াল ঘেঁসে এগুতে থাকবেন।

স্লামালিকুম।

ওসমান সাহেব চমকে তাকালেন। সালামটা কি তাঁকেই দেওয়া হয়েছে ? দু-একজন কি চিনতে শুরু করেছে ? চেনার কথা নয়। তিনি মাসে দু'বারের বেশি আসেন না এদিকে। সালাম দেওয়া ছেলেটির বয়স অল্প। চোখে চশমা। সে তাকাচ্ছে কৌতূহলী হয়ে। ওসমান সাহেব প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন। এবং মৃদুস্বরে বললেন, ভালো তো ?

আপনি কি এই পাড়াতে থাকেন ?

না। তবে মাঝে মাঝে আসি।

আমি আগেও একবার দেখেছি। তখন চিনতে পারিনি।

তিনি মৃদু হেসে হাঁটতে শুরু করলেন। পেছন না ফিরেও বুঝতে পারছেন ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে। তার হয়তো আরও কিছু কথা বলবার ছিল।

ওসমান সাহেব ঘড়ি দেখলেন—পাঁচটা দশ। তিনি সবসময় চারটার মধ্যে এসে পড়েন। আজ অনেকখানি দেরি করলেন। তাঁর চরিত্রের সঙ্গে এটা খাপ খায় না। রানুকে পাওয়া যাবে কি ? দেরি দেখে কোথাও চলে যায়নি তো ?

রানুরা থাকে তিনতলার শেষমাথায়। ছোট্ট এক চিলতে বারান্দা আছে তাদের। সে সেখানে দু'টি টবে মরিচগাছ লাগিয়েছে। গোলাপ-টোলাপ না লাগিয়ে মরিচগাছ লাগানোটা উদ্দেশ্যমূলক। উদ্দেশ্যটা কী ?

তিনি বারান্দায় কাউকে দেখলেন না। সাধারণত টগর রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। ওরা কি নেই আজ ? টগরের জন্যে এক প্যাকেট মিমি এনেছেন। তিনি মিমির প্যাকেট হাতে নিয়ে নিলেন। আজ যেন গতবারের মতো না হয়। গতবার পেয়ারা নিয়ে গিয়েছিলেন, মনের ভুলে দেওয়া হয়নি।

ওরা কি সত্যি সত্যি নেই ? সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে তাঁর মনে আশাভঙ্গের বেদনা জাগতে লাগল। সিঁড়ি অন্ধকার। কে যেন জায়গায় জায়গায় পানি ফেলে রেখেছে। রানুকে বলতে হবে এ বাড়ি ছেড়ে দিয়ে ভালো একটা জায়গায় বাড়ি নিতে।

কলিং বেলে হাত রাখতেই দরজা খুলে গেল। যেন দরজার পাশেই রানু অপেক্ষা করছিল। ওসমান সাহেব মৃদুগলায় বললেন, একটু দেরি করে ফেললাম। রানু কিছু বলল না।

টগর কি বাসায় নেই ?

না।

কোথায় গিয়েছে ?

খালার বাসায় গেছে। এসে পড়বে।

তিনি ইতস্তত করে বললেন, আমি কি ওর জন্যে অপেক্ষা করব ?

ইচ্ছা করলে করো।

তিনি বসতে বসতে বললেন, তুমি ভালো আছ তো ? রানু জবাব দিল না। ওসমান সাহেব বললেন, ঘরে কি মাথাধরার ট্যাবলেট আছে ? রানু হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। পাশের ঘরে চলে গেল। তাঁর মনে হলো রানু অনেক রোগা হয়ে গেছে। অসুখবিসুখ হয়েছে কি ? রোগা হওয়ার জন্যেই বোধহয় তাকে উনিশ-কুড়ি বছরের তরুণীর মতো লাগছে। তিনি মনে মনে রানুর বয়স হিসেব করতে চেষ্টা করলেন। বিয়ে হয়েছিল ষোল বছর বয়সে। সেও তো পাঁচ বছর হলো। তার মানে রানুর বয়স এখন একুশ। এত অল্প!

পাশের ঘরে খুট খুট শব্দ হচ্ছে। ওটা কি রান্নাঘর ? এখানে সব মিলিয়ে ক'টি রুম কে জানে! কিছুই তিনি জানেন না। রানুর শোবার ঘরটি কেমন ? খুব গোছানো নিশ্চয়ই। এমনিতেই রানুর খুব গুছিয়ে রাখার স্বভাব। টুথপেস্টের মুখ খুলে রাখলে সে রাগ করত। মাথা আঁচড়ে চিরুনি ড্রেসিং টেবিলের ওপর না রেখে অন্য কোথাও রাখলে গম্ভীর হয়ে যেত।

দুলাভাই, আপনার ওষুধ নিন।

কামিজ পরা লম্বা বেণির মেয়েটি প্রায় নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি মেয়েটিকে চিনতে পারলেন না। 'দুলাভাই' সম্বোধনে বিব্রত বোধ করতে লাগলেন।

আমাকে বোধহয় চিনতে পারেননি, তাই না ?

চেনা চেনা লাগছে অবশ্যি।

মোটেই চেনা চেনা লাগছে না। আপনি আমাকে দেখেছেন মাত্র একবার। আপনার বিয়ের সময়। তখন আমার চেহারা অন্যরকম ছিল।

এখন চেহারা বদলে গেছে ?

হ্যাঁ।

তুমি কে ?

আমার নাম অপলা। আমি রানু আপার দূরসম্পর্কের বোন হই।

তিনি দু'টি ট্যাবলেটের একটি গিলে ফেলে অন্যটি পকেটে রাখলেন, শান্তস্বরে বললেন, আমি একসঙ্গে দু'টি ট্যাবলেট গিলতে পারি না, বমি হয়ে যায়, কাজেই বাকিটা খাব দু'ঘণ্টা পর।

এর মধ্যেই হয়তো আপনার মাথাব্যথা সেরে যাবে।

না, সারবে না। আমার এত সহজে কিছু সারবে না।

ওসমান সাহেব লক্ষ করলেন অপলা মেয়েটি বেশ সহজভাবেই আলাপ করছে, মেয়েটা রানুর অন্য আত্মীয়দের মতো নয়।

দুলাভাই, আপনি কি বারান্দায় বসবেন ? এখানে ফ্যান নেই। আপনার গরম লাগছে নিশ্চয়ই।

না, থাক।

চলুন আমি চেয়ার নিয়ে দিচ্ছি।

আমি বারান্দায় বসলে তোমার আপা সেটা পছন্দ করবে না। সে চায় না লোকজন দেখুক আমি তার এখানে আসি।

অপলা অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে চুপ করে রইল। ওসমান সাহেবের মনে হলো, এটা না বললেই পারতেন। কেন এটা বললেন ? তিনি কি অবচেতন মনে মেয়েটির সহানুভূতি চাচ্ছিলেন ?

অপলা বলল, বসুন চা নিয়ে আসি।

তিনি দীর্ঘ সময় বসে রইলেন একা একা। বসে থাকতে তার কখনো খারাপ লাগে না, আজ লাগছে। চলে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে। এতক্ষণ তাঁর গরম লাগেনি। এখন লাগছে। রানুর শোবার ঘরে ফ্যান আছে কি ? তিনি ঠিক করে রাখলেন রানু এলেই জিজ্ঞেস করবেন। শুধু এটিই নয়, তাঁর আরও কিছু জানবার আছে। যেমন, পুরুষমানুষ কেউ কি থাকে রানুদের সঙ্গে ? তিনি যতবার এসেছেন কোনোবারই পুরুষ কাউকে দেখেননি। একবার এসে অ্যাশট্রেতে ছ'টা সিগারেটের টুকরো দেখেছেন। যে এসেছিল সে নিশ্চয়ই নার্ভাসপ্রকৃতির লোক। কারণ, কোনো সিগারেটই পুরোপুরি শেষ করেনি। একটি তো প্রায় আস্তই ছিল।

দুলাভাই, চা দেওয়া যাবে না, চিনি নেই।

চা লাগবে না।

আপনি খবরের কাগজটা পড়ুন। টগর এসে পড়বে।

অপলা কাগজটা টেবিলে রেখে ভেতরে চলে গেল। রানু চায় না কেউ তার সামনে থাকুক। মানুষকে অপদস্ত করার ও কষ্ট দেওয়ার সব ক'টি মেয়েলি অস্ত্রই সে প্রয়োগ করতে চায়।

খবরের কাগজে কোনো খবর নেই। তেরো বছরের একটি কিশোরীকে ঝিগাতলা থেকে দিনেদুপুরে অপহরণ করা হয়েছে। দু'টি ছেলে বেবিট্যাক্সিতে করে মেয়েটিকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ? হাজার হাজার মানুষ গিজগিজ করছে চারদিকে। একটি মেয়ের চিৎকারে লোক জমে যাওয়ার কথা। নিশ্চয়ই কোনো প্রেমের ব্যাপার। মেয়েটি পালিয়েছে। বাবা অপহরণের মামলা করছেন।

পাশের ঘর থেকে রানুর হাসির শব্দ পাওয়া গেল। অপলাও হাসছে। ওসমান সাহেব সিগারেট ধরালেন। ঘড়ি দেখলেন। খবরের কাগজে বাড়িভাড়ার বিজ্ঞাপনগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। অবসর সময়ে বাড়িভাড়ার বিজ্ঞাপন পড়তে তাঁর বেশ ভালো লাগে। এর পেছনের মনস্তাত্ত্বিক কারণটি কী ? কারণ কিছু নিশ্চয়ই আছে। এই যে রানু

খিলখিল করে হাসছে তার পেছনে যেমন কারণ আছে, বাড়িভাড়ার বিজ্ঞাপন পড়ার পেছনেও কারণ আছে।

চার রুম। গ্রিল দেওয়া বারান্দা।
সার্ভেন্টস রুম ও গ্যারাজ।
ভাড়া আলোচনাসাপেক্ষ।

ড্রয়িং কাম ডাইনিং, দুই বেডরুম, দুই বাথরুম।
ভাড়া বাইশশো টাকা। অগ্রিম আবশ্যক।

দুলাভাই, আপনার চা।

ওসমান সাহেব চায়ের পেয়ালার দিকে তাকালেন। দুধ-চা। তিনি দুধ-চা খান না। দুধ ছাড়া হালকা চা খান। রানু তা জানে। ওসমান সাহেব হাসিমুখে বললেন, চিনি ছিল না বলেছিলে।

টগরের চিনি থেকে বানানো হয়েছে।

টগরের জন্যে আলাদা চিনি কেনা হয়?

হ্যাঁ।

অবাক হতে গিয়েও তিনি অবাক হলেন না। সবকিছু আলাদা আলাদা করার একটা প্রবণতা রানুর আছে। বিয়ের কিছুদিন পরই রানু বলেছিল, তুমি আমার সাবান ব্যবহার করছ কেন? ওসমান সাহেব অবাক হয়ে বলেছিলেন, তোমার আলাদা সাবান নাকি?

হ্যাঁ। নীল সাবানদানিতে যে সাবান সেটা আমার।

ও, আচ্ছা।

তবু তার মনে থাকত না। রানুর সাবান মেখে ফেলতেন। ভুল ধরা পড়া মাত্র লজ্জা বোধ করতেন।

চা খাচ্ছেন না কেন? চা খান।

তিনি চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, অপলা, চা'টা ভালোই বানিয়েছ।

আমি বানিয়েছি বুঝলেন কী করে?

আমি অনেক কিছু বুঝতে পারি।

আবার অনেক কিছু বুঝতেও পারেন না।

তা ঠিক, আমি অনেক কিছুই বুঝতে পারি না।

অপলা একটু অবাক হলো। সে ধারণা করেছিল ওসমান সাহেব তার কথায় আপত্তি করবেন। কিছু কিছু মানুষকে দেখলেই মনে হয় এরা কারও কথাই মেনে নেয় না। সবসময় কঠিন কিছু যুক্তিতর্ক বের করে বিপক্ষের মানুষটিকে ধরাশায়ী করে দেয়। যুক্তিগুলি দেওয়া হয় খুব ঠান্ডামাথায়। গলার স্বর থাকে খাদে। মুখ থাকে হাসি হাসি। কিন্তু প্রতিটি বাক্যই কেটে কেটে বসে যায়। ওসমান সাহেব কি এরকম একজন মানুষ?

অপলা, এমন মন দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন? কী দেখছ?

অপলা লজ্জা পেয়ে উঠে দাঁড়াল। বিব্রতস্বরে বলল, আপনি বসুন, আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসব। কাপড় বদলাব।

আমাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্যে তোমাকে তাড়াতাড়ি আসার দরকার নেই। আমার একা বসে থাকার অভ্যাস আছে। ইউ টেক ইওর টাইম।

মাথাধরাটা এখনো যায়নি। ওসমান সাহেব দ্বিতীয় ট্যাবলেটটি গিলে ফেললেন। একা সময় কাটানোর তার নিজস্ব কিছু পদ্ধতি আছে। সেগুলো কাজে লাগাতে শুরু করলেন। ঘরের প্রতিটি জিনিসের দিকে তিনি তাকাবেন। এবং বেশ কিছু সময় এগুলি নিয়ে ভাববেন। এই ছোট্ট ঘরে তিনি তাঁর পদ্ধতি আগেও অনেকবার খাটিয়েছেন। প্রতিটি জিনিসই তাঁর চেনা, তবু প্রতিবারই নতুন নতুন ডিটেইল চোখে পড়ে। যেমন আজ চোখে পড়ল শোকেসে কিছু নতুন বই এনে রাখা হয়েছে। সবই কবিতার বই। রানু কবিতা পড়ে না। এখন কি পড়তে শুরু করেছে, না উপহার পাওয়া ? শোকেসে একটা তালাও লাগানো হয়েছে। খুব সম্ভব টগরের জন্যে। শোকেস ঘাঁটাঘাঁটির বয়স এখন। দেয়ালে যে ক্যালেন্ডার ঝুলছে তার পাতা ওল্টানো হয়নি। এখনো দেখা যাচ্ছে জুলাই মাস। এই ভুল রানু করবে না। সে এসব ব্যাপারে খুব সাবধান। কিন্তু ভুলটা করেছে। এটাকে কি সূক্ষ্ম কোনো মানসিক পরিবর্তনের লক্ষণ বলা যাবে ? ওসমান সাহেব ক্যালেন্ডারের ছবিটির দিকে মন দিলেন, রানু এসে ঢুকল তখন।

সে নিশ্চয়ই কোথাও বেরুবে। যত্ন করে সেজেছে। কালো জমিনের ওপর লাল পাতা আঁকা জামদানি শাড়ি। শাড়িটার জন্যেই কি তার চেহারা বদলে গেছে, না রোগা হওয়ার জন্যে এমন লাগছে ? ওসমান সাহেব মুগ্ধ হয়ে তাকালেন। এবং মনে মনে বললেন, কিছু মেয়ে আছে যাদের রূপ সবসময় টের পাওয়া যায়।

তোমরা কোথাও যাচ্ছ নাকি ?

হ্যাঁ, বিয়েতে যাচ্ছি।

আমি তাহলে যাই ?

না বসো। টগর আসবে। টগরকে তুমি আজ রাতে তোমার সঙ্গে রাখবে। সকালবেলা আমি ওকে নিয়ে আসব। অসুবিধা হবে ?

না। কার বিয়ে ?

আমাদের এক আত্মীয়।

রানু বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই সামনে বসল। শীতল স্বরে বলল, সামনে তো অ্যাশট্রে আছে, চায়ের কাপে ছাই ফেলছ কেন ?

অ্যাশট্রেটা এত সুন্দর যে ছাই ফেলতে ইচ্ছা করে না। সুন্দরের মধ্যে অসুন্দর ঠিক মানায় না।

আমার সঙ্গে বড় বড় কথা বলে লাভ নেই। তোমার বড় বড় কথা অনেক শুনেছি। আর শুনতে ইচ্ছা করছে না।

তিনি দ্বিতীয় সিগারেটটি ধরালেন এবং খুব সাবধানে ছাই ফেললেন অ্যাশট্রেতে। রানু বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। ওসমান সাহেবও এগিয়ে গেলেন, হালকা গলায় বললেন, এ বাড়িতে তোমার সঙ্গে পুরুষমানুষ কেউ থাকে না ?

না।

একা একা থাকো, ভয় লাগে না।

ভয় লাগবে কেন ? এটা আমার বড়খালার বাড়ি। রাতে আমি বড়খালার সঙ্গে ঘুমাই।

এটা তোমার খালার বাড়ি জানতাম না তো। আপন খালা ?

রানু জবাব দিল না। আগ্রহ নিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল। ওসমান সাহেব দেখলেন ক্রিম কালারের একটা গাড়ি এসে থেমেছে। প্রায় ছ'ফুটের মতো স্বাস্থ্যবান একটি তরুণ হাসিমুখে নামছে গাড়ি থেকে। খুব সম্ভব এই ছেলেটির সঙ্গে রানু বিয়েতে যাবে। রানুর দিকে তাকালেন। ছেলেটিকে ওসমান সাহেব আগে দেখেছেন কি না মনে করতে পারলেন না। দেখেছেন হয়তো, মানুষের চেহারা তাঁর মনে থাকে না।

রানু, ঐ ছেলেটা কে ?

আমাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয়—আলম। কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার।

ওর সঙ্গে কি যাচ্ছ ?

হ্যাঁ। এত প্রশ্ন করছ কেন ?

তিনি অপ্রস্তুত হয়ে নিজ জায়গায় ফিরে গেলেন। আলমকে দেখে মনে হলো সে ওসমান সাহেবকে দেখে খুব অবাক হয়েছে। সে তার বিস্ময় গোপন করল না। হাসিমুখে বলল, কেমন আছেন আপনি ?

ভালো। ভালো আছি।

আপনি কি আমাকে চিনেছেন ? আমি রানুর মামাতো ভাই। আমার নাম আলম। রানু কি আপনাকে আমার কথা বলেছে ?

তিনি হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না। অস্পষ্টভাবে হাসলেন। যার মানে হ্যাঁও হতে পারে আবার নাও হতে পারে। আলম বলল, আমি আপনার একটা মাত্র বই পড়েছি। নাম হলো গিয়ে 'চৈত্রের রাতে'। বইটা আমার একটুও ভালো লাগেনি। আপনি রাগ করলেন না তো ?

না, রাগ করিনি।

রানুকে বলেছিলাম—আমি তো বই পড়ি না। পড়তে ভালোও লাগে না। উনার সবচেয়ে ভালো বইটা দাও, পড়ি। রানু ঐটা দিল।

আলম সিগারেট ধরাল। নড়েচড়ে বসল। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সে একটা আলোচনায় নামতে চায়। ওসমান সাহেব শঙ্কিত বোধ করলেন। যে তার বই পছন্দ করে না তার সঙ্গে আলোচনা জমে না। কথা বলতে গেলেই মনের ওপর চাপ পড়ে।

আচ্ছা ওসমান ভাই, 'চৈত্রের রাতে' বইটিতে নীলু মেয়েটি শেষমুহূর্তে এই কাণ্ডটি কেন করল ?

ওসমান সাহেব জবাব দিলেন না। আলম উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলতে লাগল—নীলু যা করেছে তাকে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। আমি তো তাকে ক্ষমা করব না।

ইন ফ্যাক্ট...। তিনি হেসে ফেললেন। আলম কথা বন্ধ করে অবাক হয়ে বলল, হাসছেন কেন ? ওসমান সাহেব বললেন, উপন্যাসটি আপনার পছন্দ হয়নি, তবুও নীলুর ব্যাপারে যথেষ্ট উত্তেজিত হয়েছেন। তাই হাসছি।

আলম আধখাওয়া সিগারেট অ্যাশট্রেতে গুজে নতুন সিগারেট ধরাল। অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, অনেক লেট করে ফেললাম আমরা। রানু বলল, টগরকে নিয়ে আসতে এত দেরি করছে কেন বুঝছি না। সে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। তার চোখে চিন্তার ছাপ। কপালে দু'টি সূক্ষ্ম ভাঁজ।

টগরকে তার কিছুক্ষণ পরই আসতে দেখা গেল। সে তার খালার কোলে ঘুমুচ্ছে। রানু বলল, যাক, টগরকে সঙ্গেই নিয়ে যাব। ওসমান সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। আলম বলল, চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

দরকার নেই কোনো।

চলুন না। এমনিতেও আমাকে সিগারেট কিনতে হবে।

আলম বড় রাস্তার মোড় পর্যন্ত এল এবং একসময় বলল, আপনি আপনার নাম লিখে একটা বই আমাকে দেবেন। আমি আমার বন্ধুদের দেখাব।

ঠিক আছে দেব। রানুর কাছে রেখে যাব।

আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে।

না। আমি বিয়ে-টিয়েতে বিশেষ যাই না। আপনারা যান।

আপনার বাসায় আপনাকে নামিয়ে দেব ?

দরকার নেই কোনো।

তিনি হাঁটতে শুরু করলেন। অল্প কয়েক পা হাঁটার পরই মনে হলো মিমির প্যাকেটটা টগরকে দেওয়া হয়নি। আলম এখনো দাঁড়িয়ে আছে। ইচ্ছা করলেই ফিরে গিয়ে তার হাতে দেওয়া যায়। কিন্তু ফিরলেন না। লম্বা লম্বা পা ফেলতে লাগলেন।

আকাশে মেঘ। ঘন কালো মেঘ।

বৃষ্টি কি হবে ? ভাদ্র মাসে এত মেঘ হয় আকাশে ?

২

ওসমান সাহেব বাড়ি ফিরলেন রাত আটটায়। রিকশা থেকে নেমে ভাড়া মেটাবার সময় বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। তাঁর ধারণা বৃষ্টির ফোঁটা যদি ছোট হয় এবং যদি খুব কাছাকাছি হয় তাহলে বৃষ্টি থামতে দীর্ঘ সময় লাগে। ফোঁটার ধরন দেখে তাঁর মনে হলো সারা রাত বৃষ্টি হবে। এবারে খুব শুকনো ধরনের বর্ষা গেছে। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে বৃষ্টির শব্দ শোনা হয়নি। আজ হয়তো শোনা যাবে।

চার টাকা ভাড়া ঠিক করা ছিল। ওসমান সাহেব চকচকে একটা পাঁচ টাকার নোট দিয়ে মনে মনে বললেন, বৃষ্টি আসার আনন্দে তোমাকে এক টাকা বকশিশ দেওয়া গেল।

বসার ঘরে টিভি চলছে। আকবরের মা এবং তার ছেলে জিতু মিয়া পা ছড়িয়ে টিভি দেখছে। তারা দেখল ওসমান সাহেব ঢুকছেন, কিন্তু কেউ গা করল না। দু'জনই ভান

করল—দেখতে পায়নি। ওসমান সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, সদর দরজা খোলা কেন আকবরের মা ? আকবরের মা জবাবই দিল না। তাকিয়ে রইল।

অন্য কোনো ঘরে বাতি জ্বালাওনি কেন ? যাও শোবার ঘরের বাতি জ্বালাও। টিভির সাউন্ড কমিয়ে দাও।

আকবরের মা বিরক্ত মুখে উঠে গিয়ে বাতি জ্বালাল। ওসমান সাহেব ঘরে ঢুকে দেখলেন বেশ পরিষ্কার করে বিছানা করা। লেখার টেবিলে নতুন টেবিলক্লথ। কাচের জগে পানি। পিরিচ দিয়ে ঢাকা একটা গ্লাস। লেখার কাগজ। একটা লাল এবং একটা কালো বলপয়েন্ট পেন। হাতের বাঁপাশের বুকশেলফের বইগুলি চমৎকার করে গোছানো। শুধু তাই নয়, খাটের পাশে ছোট্ট টেবিলটায় একটা স্টেনলেস স্টিলের বাটিতে কিছু টাটকা বেলি ফুল। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, কেউ এসেছিল আকবরের মা ?

মিলি আফা আসছিল।

কিছু বলে গেছে ?

বলছে কাইল আবার আসব।

এসেছিল কখন ?

দুপুরের পরে, সইন্ধ্যা পর্যন্ত ছিল। কাইল সইন্ধ্যার সময় আপনারে থাকতে কইছে।

মিলি ওসমান সাহেবের ছোটবোন। তার স্বামী সিভিল সাপ্লাইয়ে কাজ করে এবং বেশ ভালোই মাইনে পায়। ঢাকা শহরে তাদের একটি বাড়ি আছে যার দোতলাটা ভাড়া দেওয়া হয়। কিন্তু মিলির মাঝে মাঝে টাকার দরকার পড়ে। ওসমান সাহেব সেই দরকারটা মেটান। আবার হয়তো এরকম কোনো প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

আকবরের মা।

জি।

চা দাও তো। লেবু-চা।

আকবরের মা অপ্রসন্ন মুখে চা বানতে গেল। ওসমান সাহেব বাথরুমে ঢুকলেন। রানুর অভাবটা বোঝা যাচ্ছে। মেঝেতে সাবান গলে পড়ে আছে। বেসিনটা নোংরা। আয়নায় সাবানের ফেনা পড়ে জালের মতো নকশা তৈরি হয়েছে। আকবরের মা এবং তার ছেলের কোনোদিকেই কোনো নজর নেই। অবিশ্যি বাজার করা হচ্ছে। রোজ দু'বেলা রান্না হচ্ছে। এইবা কম কী।

গোসল সেরে বেরুতে তাঁর অনেক সময় লাগল। টেবিলে ঢেকে রাখা চা ততক্ষণে জুড়িয়ে পানি হয়ে গেছে। ওসমান সাহেব মুখ বিকৃত না করে সেই ঠান্ডা চা খেলেন। ঠিক এই মুহূর্তে কোনো লেখালেখি করতে ইচ্ছা হচ্ছে না, তবু বসলেন লিখতে। অনেকদিন ধরে একটা লেখা ঘুরছে মাথায়। সারাক্ষণই ভোতা একটা যন্ত্রণা দিচ্ছে লেখাটা। দশ-বারো পৃষ্ঠা লিখে ফেলতে পারলে যন্ত্রণা একটু কমবে। এক বছর হয়ে গেল যন্ত্রণাটা পুষছেন।

কিছু কিছু লেখা বড় কষ্ট দেয়। এই কষ্ট দেওয়া গল্পটির জন্য গত বর্ষায়। ময়মনসিংহ থেকে বাসে করে ঢাকায় আসছেন। ঝাঁকুনিতে চমৎকার ঘুম এসে গেল। ঘুম

ভাঙল ভাওয়ালের জঙ্গলে। সন্ধ্যা হব হব করছে। বনের মাথায় চাঁদ উঠেছে। বাস চলার শব্দ ছাড়া কোথাও কোনো শব্দ নেই। সেই শব্দও একসময় থেমে গেল। কারবুরেটরে গোলমাল। ড্রাইভার রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে খুটখাট শুরু করেছে। যাত্রীরা সব নেমে গেছে বাস ছেড়ে। ওসমান সাহেব জানালা দিয়ে মুখ বের করে বসে আছেন। বিশাল অরণ্যে বৃষ্টির মতো চাঁদের আলো ঝরছে। শুনশান নীরবতা। মাথায় ঠিক তখন গল্পটা এল। তিনি কল্পনা করলেন—এই অরণ্য ক্রমেই বড় হচ্ছে। একটির পর একটি শহর এবং নগর গ্রাস করতে শুরু করেছে। ছোট্ট একটি শহর শুধু বাকি। অল্পকিছু লোক থাকে সেই শহরে। প্রতি রাতেই তারা শুনতে পায় অরণ্য এগিয়ে আসছে।

গল্পটি অনেকবার লিখতে চেষ্টা করেছেন। লিখতে পারেননি। সমস্ত ব্যাপারটা মাথায় সাজানো আছে, কিন্তু কলমে আসছে না। একটি লাইনও নয়। তিনি রাতের পর রাত কাগজ-কলম নিয়ে বসে কাটিয়েছেন। দু'বার এ নিয়ে রানুর সঙ্গে ঝগড়া হলো। রানু বলল, এই গল্পটিই যে লিখতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই। অন্য গল্প লেখো। তিনি গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন, এটা শেষ না করে অন্য কোনো লেখায় আমি হাত দেব না।

যদি এটা লিখতে না পার তাহলে আর অন্যকিছু লিখবে না?

না।

তুমি বড় অহঙ্কারী।

এখানে অহঙ্কারের কী দেখলে?

অনেক কিছুই দেখলাম। অক্ষমতা স্বীকার না করাটাও অহঙ্কার।

ওসমান সাহেব চুপ করে রইলেন। রানু মশারি ফেলতে ফেলতে বলল, কোনো মানুষই তার প্রতিভার বাইরে যেতে পারে না।

প্রকারান্তরে বলা, তাঁর তেমন কোনো প্রতিভা নেই। থাকলে অরণ্যের সেই গল্প লিখে ফেলতে পারতেন। পুরুষদের আহত করার কৌশল মেয়েরা খুব তাড়াতাড়ি শিখে ফেলে এবং তা ব্যবহারও করে চমৎকারভাবে। 'কোনো মানুষই তার প্রতিভার বাইরে যেতে পারে না।' বইয়ের ভাষায় কয়েকটা কথা বলে রানু ঘুমুতে গেল। ঘুমিয়েও পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যে। ওসমান সাহেব রাত তিনটা পর্যন্ত জেগে রইলেন। খাতার পাতায় শুধু কয়েকবার লেখা হলো—অরণ্য। এ পর্যন্তই। টগর যখন জেগে উঠে কাঁদতে শুরু করেছে তখনো তিনি ঘুমুতে যাননি। রানু টগরকে নিয়ে বাথরুম করাল। মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়াল এবং খুব সহজভাবে বলল, শোবার সময় ফ্যানটা এক ঘর কমিয়ে দিয়ো তো। যেন কিছুই হয়নি।

ওসমান সাহেব ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। বাইরে ভালোই বৃষ্টি হচ্ছে। তার থিওরি সত্যি করবার জন্যেই বোধহয় আজ সারা রাত বৃষ্টি পড়বে।

আপনার টেলিফোন।

তিনি চমকে তাকালেন। আকবরের মা নিঃশব্দে চলাফেরা করে। মাঝে মধ্যেই তাকে চমকে দেয়। তিনি বিরক্ত স্বরে বললেন, কার টেলিফোন?

মিলি আফার।

তার চেয়ার ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছিল না। আকবরের মাকে বললেই সে হাতের কাছে রিসিভার এনে দেবে। কিন্তু শোবার ঘরে টেলিফোন রাখা তাঁর পছন্দ নয়। টেলিফোন আসা মানেই হচ্ছে অপরিচিত একজন লোকের ঘরে ঢুকে পড়া। একজন অপরিচিত মানুষ রাতদুপুরে শোবার ঘরে ঢুকুক এটা তার পছন্দ নয়। কিন্তু মিলি অপরিচিত কেউ নয়।

টেলিফোন এই ঘরে আনুম ?

না, আমি যাচ্ছি।

ওসমান সাহেব টেলিফোনে দীর্ঘ সময় কথা বলতে পারেন না। মিলি ঠিক তার উল্টো, ঘণ্টাখানিকের আগে টেলিফোন ছাড়তে চায় না।

হ্যালো ভাইয়া, কী করছ ? লিখছিলে নাকি ?

না।

তোমার অপেক্ষায় থেকে সারাটা দুপুর, সারাটা বিকাল এবং সারাটা সন্ধ্যা নষ্ট হলো। আমি যে গিয়েছিলাম তোমাকে বলেনি ?

বলেছে।

গিয়ে কী দেখি জানো ? তোমাদের জিতু মিয়া সোফায় পা তুলে লাটসাহেবের মতো বসে আছে। এমন এক চড় দিয়েছি। চড়ের কথা তোমাকে বলেছে ?

না।

আচ্ছা ভাইয়া, শোনো, যে জন্যে তোমাকে টেলিফোন করলাম—ভাবিকে গতকাল দেখলাম একটা ছেলের সঙ্গে রিকশায় করে যাচ্ছে। সুন্দরমতো ছেলে। চেক চেক একটা সার্ট গায়ে। দু'জনে খুব হাত নেড়ে নেড়ে গল্প করছিল। ভাইয়া, তুমি শুনতে পাচ্ছ ?

পাচ্ছি।

কিছু বলছ না কেন ?

দেখ মিলি, রানুর সঙ্গে আমার বনিবনা হয়নি। আমরা আলাদা থাকছি। এখন সে যদি কোনো ছেলের সঙ্গে পরিচিত হয় তাহলে হবে। আমি এখানে কী বলব ?

কিছুই বলবে না ? ভাবির সঙ্গে তোমার সেপারেশন তো এখনো হয়নি।

এখনো হয়নি কিন্তু হবে। রানু কাগজপত্র জমা দিয়েছে। আচ্ছা মিলি, আমি রাখলাম, ঘর গুছিয়ে দিয়ে যাওয়ার জন্যে ধন্যবাদ।

শোনো ভাইয়া, আমার কথা এখনো শেষ হয়নি।

বল কী বলবি।

তুমি নাকি বাড়ি বিক্রি করে দিচ্ছ ?

বাড়ি বিক্রি করব কেন ?

কেন করবে তা আমি কী করে জানব। আমি যা শুনলাম তোমাকে বললাম।

ভুল শুনেছিস।

কার কাছে শুনলাম সেটা জিজ্ঞেস করলে না ?

না, গুজব শোনায় আমার আগ্রহ নেই। মিলি আমি রাখলাম।

এত রাখি রাখি করছ কেন ?

খিদে লেগেছে। ভাত খাব।

ঠিক আছে তাহলে ভাত খাবার পর আমাকে টেলিফোন করবে।

কেন কথা এখনো শেষ হয়নি ?

খুব একটা ইন্টারেস্টিং গল্প তোমাকে বলব ভাইয়া। আমার এক বান্ধবীর জীবনের সত্যি ঘটনা। তুমি এটা নিয়ে একটা গল্প লিখতে পার। তবে বান্ধবীর নাম ব্যবহার করতে পারবে না। হ্যালো ভাইয়া, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ ?

পাচ্ছি।

একটু ধরে রাখো। বাবু কী জন্যে ডাকছে শুনে আসি। আচ্ছা ভাইয়া শোনো, হ্যালো ? বাবুর ভালো নাম রেখে দিলে না তো। খুব সুন্দর দেখে তিন অক্ষরে একটা নাম দাও তো। শুরু হবে ম দিয়ে। আমার সঙ্গে মিলিয়ে রাখতে চাই।

মৌসুমী রাখ।

না, মৌসুমী না। মৌসুমী সিনেমার নায়িকার নাম।

মিতুল।

ওটা তো ছেলেদের নাম।

আজকাল ছেলেদের এবং মেয়েদের একই নাম হয়।

মিতুল শব্দের মানে কী ?

আমি জানি না।

বলো কী, তুমি এতবড় লেখক হয়ে মিতুল শব্দের মানে জানো না ?

আমি বড় লেখক তোকে বলল কে ? আচ্ছা এখন রাখলাম।

তিনি টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। আকবরের মা এবং জিতু মিয়া গভীর আগ্রহে টিভি দেখছে। জীবনের সমস্ত সুখ ও আনন্দ যেন এই যন্ত্রটিতে। রানু চলে যাওয়ায় এরাই বোধহয় সবচেয়ে খুশি।

তিনি নিজেও কি খুশি হননি ? সম্পূর্ণ নিজের মতো করে থাকার একটা আলাদা আনন্দ আছে। স্বাধীনতার আনন্দ। রানুর অভাব তিনি যতটা বোধ করবেন ভেবেছিলেন ততটা করছেন না, তেমন কোনো শূন্যতা তার মধ্যে তৈরি হয়নি। কিন্তু হওয়া উচিত ছিল। শুধু রানু কেন, টগরের জন্যেও কি তিনি তেমন কোনো আকর্ষণ অনুভব করেন ? মনে হয় না। কাউকে ভালোবাসার ক্ষমতাই বোধহয় তার নেই।

আকবরের মা বলল, ভাইজান ভাত দিব ?

দাও। কী রান্না আজকে ?

কই মাছ।

ওসমান সাহেব তৃপ্তি করে ভাত খেলেন। খাওয়ার শেষে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখতে দেখতে দু'টি সিগারেট শেষ করলেন। তাঁর পান খেতে ইচ্ছা হলো। ঘরে পান

ছিল না। জিতু মিয়া ছাতা মাথায় দিয়ে পান কিনতে গেল। ওসমান সাহেবের মনে হলো এই জীবনটাই বা নেহায়েত খারাপ কী। নিঃসঙ্গতারও তো একধরনের আনন্দ আছে। শূন্যতার মধ্যেও আছে পরিপূর্ণতা। নৈঃশব্দের গান।

ভাইজান, আপনার টেলিফোন।

তিনি রিং শুনতে পেলেন। বেশ জোরেই শব্দ হচ্ছে। কিন্তু তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন না কেন? যা আমরা শুনতে চাই না আমাদের মস্তিষ্ক সবসময় চেষ্টা করে তা যেন শুনতে না হয়।

ওসমান সাহেব বললেন, আকবরের মা, তুমি বারান্দায় একটা মোড়া এনে দাও। আর যে টেলিফোন করেছে তাকে বলে দাও আমি এখন ব্যস্ত, সকালবেলা টেলিফোন করতে।

মিলি আফা ফোন করছে।

যা বলতে বললাম—বলো।

আমি কইছি, আপনে বারান্দায়।

অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে তিনি টেলিফোন ধরলেন, কী ব্যাপার মিলি?

ভাইয়া, আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই তুমি খট করে টেলিফোন রেখে দিলে কেন?

কী বলতে চাস বল।

তুমি আমার সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার করো কেন?

ওসমান সাহেব একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। মিলি বলল, বাবার শরীর এত খারাপ তুমি একবারও তাঁকে দেখতে যাওনি। পরশুদিন তিনি দুঃখ করছিলেন। আগামীকাল আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাব।

ঠিক আছে।

শোনো ভাইয়া, তুমি বাবার সঙ্গে কয়েকদিন থাকবে। একা একা এই বাড়িতে পড়ে থাকার কোনো মানে আছে?

আচ্ছা, সেটা দেখা যাবে।

মিলি আরও মিনিট দশেক কথা বলে টেলিফোন রাখল। ওসমান সাহেব নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ঘুম ঘুম লাগছে, আবার শুয়ে পড়তেও ইচ্ছা হচ্ছে না। রানু যখন ছিল দু'টো পর্যন্ত জেগে থাকতেন। এখন এগারোটা বাজতেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। এর অন্তর্নিহিত রহস্যটি কী?

বৃষ্টির জন্যে শীত করছে। পাতলা কোনো একটা জামা গায়ে দিয়ে ঘুমুতে হবে। আলনায় তেমন কিছু নেই। কোথায় থাকতে পারে? কাবার্ডে নিশ্চয়ই নেই। কাবার্ডে থাকত রানুর কাপড় এবং কোনো কারণে তিনি কাবার্ড খুললে রানু বিরক্ত হতো। কঠিন স্বরে বলত, আমার জিনিসে হাত দিচ্ছ কেন?

মজার ব্যাপার হচ্ছে, রানু তার জিনিসের কিছুই সঙ্গে নিয়ে যায়নি। আসার সময় যেমন চটের একটা হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে এসেছিল, যাওয়ার সময়ও ঠিক সেভাবেই গিয়েছে।

তিনি মনে মনে ভাবলেন, আমাদের সবার মধ্যেই নাটক করবার প্রবণতা আছে। রানুর মধ্যে সেটা হয়তো ছিল বেশিমাত্রায়, নয়তো বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সময় নীল রঙের শাড়ি পরার দরকার ছিল না। ওসমান সাহেবের ধারণা সে এই শাড়ি পরেছে কারণ প্রথম যখন সে এ বাড়িতে আসে তার পরনে ছিল নীল শাড়ি। কিংবা সমস্ত ব্যাপারটা কাকতালীয়ও হতে পারে। রানু হয়তো সচেতনভাবে কিছু করেনি। তিনি অন্যরকম ব্যাখ্যা করছেন। যাওয়ার সময় গায়ে নীল শাড়ি ছিল বলে সেই শাড়ি পরেই গিয়েছে।

জিতু মিয়া পান নিয়ে এসে দরজায় ধাক্কা দিল। ওসমান সাহেব বললেন, এখন আর লাগবে না, সকালে খাব। জিতু বেচারি বৃষ্টি মাথায় হেঁটে হেঁটে পান আনতে গেছে—একটা নিয়ে খেলেই হতো। কিন্তু তার উঠতে ইচ্ছা করছে না। শরীরজুড়ে আরামদায়ক একটা আলস্য।

বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। কী মাস এটা ? ভাদ্র মাস না ? বাংলা মাসের নামের মধ্যে ভাদ্র মাস নামটাই সবচেয়ে খারাপ। সবচেয়ে সুন্দর হলো শ্রাবণ। চৈত্র নামটাও ভালো। ওসমান সাহেব হাত বাড়িয়ে শেলফ থেকে একটা বই নামালেন। পড়তে ইচ্ছে করছে না। চোখ বুলানোর জন্যে নেওয়া। একসময় প্রচুর পড়তেন। রাতের পর রাত বই পড়ে কাটিয়েছেন। একবার 'জাম্প ইন্টু নাথিংনেস' নামে একটা বই রাত তিনটায় পড়ে শেষ করলেন। তারপর নিজে চা বানিয়ে খেলেন এবং সেই বই-ই আবার গোড়া থেকে পড়তে শুরু করলেন। চমৎকার সময় ছিল সেটা। আনন্দ ও উল্লাসের সময়। মনে আছে একটি জাপানি ছোটগল্প একরাতে চারবার পড়ার পর অনুবাদ করতে বসলেন। তার সমগ্র জীবনে এই একটিই অনুবাদ কর্ম। সেই অনুবাদটি তিনি কখনো প্রকাশ করেননি। প্রকাশ না করার পেছনের যুক্তিটি ছিল ছেলেমানুষী যুক্তি—'আমি ঐ জাপানি লেখকের চেয়েও অনেক বড় লেখক হব। ওর গল্পের অনুবাদ আমি কেন করব ?'

তিনি বড় লেখক হতে পেরেছেন ? অনেক গল্প-উপন্যাস লিখেছেন ঠিকই, কিন্তু বড় লেখক হতে পেরেছেন কি ? 'কেউ তার নিজের প্রতিভার বাইরে যেতে পারে না।'—খুব সত্যি কথা। বাতি নিভিয়ে ওসমান সাহেব জাপানি গল্পের কথা ভাবতে শুরু করলেন।

> একটা ছোট্ট শহর। সেই শহরের নিয়ম হচ্ছে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের শহরের রাস্তার পাশে পুঁতে রাখা। কোমর পর্যন্ত ঢুকানো থাকে গর্তে। শরীরটা বেরিয়ে থাকে। দিন যায়। ধীরে ধীরে এরা বদলে যেতে থাকে। এবং একসময় এরা গাছ হয়ে যায়। এইরকম একজন অপরাধী পুরুষ ধীরে ধীরে গাছ হচ্ছে আর রোজ রাতে তার স্ত্রী আসে তার কাছে। জানতে চায়, তোমার কেমন লাগছে ? পুরুষটি ক্লান্তস্বরে তার অভিজ্ঞতার কথা বলে। মেয়েটি জানতে চায়, তুমি কি এখনো আমাকে ভালোবাস ? পুরুষটি থেমে থেমে বলে, আমি জানি না। আমি গাছ হয়ে যাচ্ছি, আমি বুঝতে পারছি না।
>
> যখন মানুষ ছিলে তখন কি আমাকে ভালোবাসতে ?

একটি অসাধারণ গল্প। কিন্তু আজ এই বর্ষার রাতে তিনি এই গল্পটির কথা ভাবছেন কেন? নিজেকে কি তিনি 'গাছ' হিসেবে ভাবছেন? রানু হচ্ছে সেই গাছের পাশে আসা মেয়েটি?

ওসমান সাহেব লক্ষ করলেন, তার চোখ ভিজে উঠতে শুরু করেছে। গল্পটির প্রভাব। অন্যকিছু নয়। প্রতিভাবান জাপানি গল্পকার তার মধ্যে একটি বিশুদ্ধ আবেগ সৃষ্টি করেছেন। চোখ ভিজে ওঠার পেছনে রানুর কোনো ভূমিকা নেই।

৩

মিলির বয়স তেইশ।

রূপসী মেয়েদের যা যা থাকতে হয়, সবই মিলির আছে। গায়ের রঙ ফর্সা। গড়পড়তা মেয়েদের তুলনায় অনেকখানি লম্বা। কাটা কাটা চোখমুখ। বাঁ-চোখের নিচে চোখে পড়ার মতো কালো তিল। তবু মিলির ধারণা তার চেহারাটা খুবই সাধারণ। সাধারণ এবং বাজে। তা না হলে বিয়ে নিয়ে কোনো মেয়ের এত ঝামেলা হয়? কথাবার্তা অনেকদূর এগুবার পর পাত্রপক্ষ হঠাৎ সময় চায়। 'খালার অসুখ', 'ছেলের এক ভাই বিদেশে থাকে—তিনি বিয়েতে আসার ছুটি পাচ্ছেন না'... ইত্যাদি। বিয়ে ঠিকঠাক হওয়ার পর সময় চাওয়ার একটাই মানে—বিয়ে হবে না।

যার সঙ্গে শেষপর্যন্ত বিয়ে হলো তার নাম মতিয়ুর রহমান। মোটাসোটা বেঁটেখাটো মানুষ। নাকের নিচে হিটলারি গোঁফ। সিভিল সাপ্লাইয়ে কাজ করে। মিলির জন্যে খুব যে আকর্ষণীয় পাত্র তা নয়। তবু এই বিয়ে নিয়েও কত ঝামেলা। কথাবার্তা পাকা হয়ে যাওয়ার পরদিনই ছেলের বড় ফুপা টেলিফোন করে জানালেন, ছেলে ঠিক করেছে তার ছোটবোনের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত সে বিয়ে করবে না।

সে-সময়টা মিলির খুব খারাপ কেটেছে। এমনিতেই সে রোগা। এইসব ঝামেলায় আরও রোগা হয়ে গেল। গালের হাড় বের হয়ে এল। তারচেয়েও বড় কথা, মাথার চুল পড়ে যেতে শুরু করল। চিরুনি দিয়ে একটা টান দিলেই একগাদা চুল উঠে আসে। মাথাভর্তি চুল মিলির। কিন্তু এভাবে উঠতে থাকলে মাথা ফাঁকা হয়ে যেতে বেশিদিন লাগার কথা নয়। তার দুশ্চিন্তায় রাতে ঘুম হতো না। এই অবস্থায় এক সপ্তাহের মধ্যে হুট করে মিলির বিয়ে হয়ে গেল, মতিয়ুর রহমানের সঙ্গেই। এবং তখনো তার ছোট বোনের বিয়ে হয়নি। মিলির ধারণা শ্বশুরবাড়ির কেউ তাকে পছন্দ করেনি, নেহায়েত ছেলের জন্যে কোথাও কিছু পায়নি তাই আবার তার কাছে এসেছে। কথাটা আংশিক সত্য। শ্বশুরবড়ির অন্যকেউ তাকে পছন্দ করেনি। কিন্তু মতিয়ুর রহমান করেছিল এবং বিয়েটা হয়েছে তার আগ্রহেই। এরকম আজগুবি কথা মিলি বিশ্বাস করে না। সে নিজেকে সুন্দর দেখানোর যত রকম প্রক্রিয়া আছে সব চালিয়ে যায়। তার ধারণা কোনোটিই তার বেলায় কোনো কাজ করে না। কাজ করলে তার বরের চোখেই পড়ত। কিন্তু পড়ে না।

সে গত পরশু সামনের দিকের একগাদা চুল কেটে ফেলেছে। এত বড় একটা ব্যাপারও মতিয়ুরের চোখে পড়েনি। মিলি যখন বলেছে, কোনো চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছ? সে নির্লিপ্ত গলায় বলেছে, কী চেঞ্জ?

কিছুই চোখে পড়ছে না ?

না তো। কোনো কিছু চোখে পড়ার ব্যাপার আছে নাকি ?

মিলি বহু কষ্টে নিজেকে সামলেছে। তার ধারণা তার বরের তার প্রতি কোনো উৎসাহ নেই। এটা একটা ভয়াবহ ব্যাপার। বিয়ের দু'বছরের মধ্যে কোনো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এরকম হয় নাকি ? ব্যাপারটা নিয়ে কারও সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তার তেমন কোনো ভালো বন্ধু নেই।

বিকেলে মিলি তার শাড়ির ট্রাংক খুলল। কোনোটাই তার পছন্দ হলো না। আচ্ছা সে কেন বেছে বেছে সব জংলি কালারগুলি পছন্দ করে ? কেনার সময় মনে হয় কী অপূর্ব রঙ, কী অদ্ভুত ডিজাইন! কিন্তু কেনার পর আর তাকাতে ইচ্ছে করে না।

কোথাও যাচ্ছ নাকি ?

হ্যাঁ।

কোথায় ?

ভাইয়ের কাছে যাব।

মতিয়ুর হালকা সুরে বলল, আমি একটা লিফট দিতে পারি। এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। মিলি গম্ভীর গলায় বলল, আমার লিফট-টিফট লাগবে না। বলেই মনে হলো—এটা সে বলল কেন ? তাদের তো কোনো ঝগড়া হয়নি। মিলি গলার স্বর বদলে বলল, দেখো তো কোন শাড়ি পরব।

একটা পরলেই হয়। ভাইয়ের কাছে যেতে আবার এত সাজগোজ লাগে নাকি ?

তাই বলে ফকিরনির মতো যাব ?

পরো, এই সবুজটা পরো।

এমন কড়া রোদে ডার্ক কালার পরব ?

বিকেলে রোদ থাকবে না।

না থাকুক। ডার্ক কালার আমাকে মানায় না। বিহারি মেয়েদের মতো লাগে।

মতিয়ুর কিছু বলল না। তার মানে সে স্বীকার করে নিল যে ডার্ক কালার তাকে মানায় না। যেটা তাকে মানায় না সেটা পরতে বলার অর্থ কী ? মিলির গলা ভার ভার হয়ে গেল। সে ঠিক করল কোথাও যাবে না। ঘরেই থাকবে। মিলির কোনো সিদ্ধান্তই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এটাও হলো না। সে সবুজ রঙের শাড়িটা পরল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে বদলে হলুদ ফুটি দেওয়া একটা সাদা শাড়ি পরল।

ওসমান সাহেব ঘরে ছিলেন না। কোথায় গিয়েছেন কখন ফিরবেন আকবরের মা বলতে পারল না। মিলি বিরক্তস্বরে বলল, কাল টেলিফোন করে বলে রেখেছি আমি আসব। আকবরের মা ভীতস্বরে বলল, আফা চা দিমু ?

আমি চা খাই নাকি ? কখন ফিরবে কিছু বলে গেছে ?

জি-না।

কিছুই বলেনি ?

বলছে টেলিফোন বাজলে আমরা কেউ যেন না ধরি।

কেন ?

আমি কই ক্যামনে ?

মিলি আধঘণ্টার মতো বসল। এই সময়ের মধ্যেই শোবারঘর এবং বসারঘর পরিষ্কার করল। আকবরের মাকে দিয়ে বাথরুম পরিষ্কার করাল। শোবার ঘরের বুক শেলফের সমস্ত বই নামিয়ে আবার নতুন করে রাখল।

লেখার টেবিল কাল যেমন গোছানো ছিল আজও তেমনই আছে। তার মানে ভাইয়া লিখতে বসেনি। সাদা কাগজে অবশ্যি কিছু কাটাকুটি আছে। মিলি পড়তে চেষ্টা করল। হলুদ পাখি সবুজ বন—এইটিই আট-দশ বার লেখা। কোনো নতুন গল্প বা উপন্যাসের নাম। মিলি তার ভাইয়ের কোনো লেখা ছাপা হয়ে যাওয়ার পর আর পড়ে না। গল্পের বই তার ভালো লাগে না। কয়েক পাতা পড়বার পরই তার মাথা ধরে। শুধু 'চৈত্রের রাতে' বইটা ছয়ত্রিশ পাতা পর্যন্ত পড়েছে। কারণ সেখানে একটা চরিত্র আছে, নাম মিলি। সবাই বলে এটা নাকি তাকে নিয়েই লেখা। কিন্তু মিলির তা মনে হয় না। কারণ বইয়ের মিলি খুব সুন্দর। একটু বোকা। সেই মিলি অল্পতেই রাগ করে।

আকবরের মা, আমি যাচ্ছি।

বইতেন না ?

খালি বাড়িতে বসে থেকে করব কী ?

যাইবেন কই ?

সেটা দিয়ে তুমি কী করবে ? যত বাড়তি কথা। তুমি কথা কম বলবে। এত বেশি কথা বলো কেন ?

গাড়ির ড্রাইভারও জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবেন ? রেগে যেতে গিয়েও মিলি রাগ সামলাল। কারণ এটা নিজেদের গাড়ি নয়। মতিয়ুরের মামাতো বোনের গাড়ি। মাঝে মাঝে নিয়ে আসা হয়। আজ রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত মিলি গাড়িটা নিজের কাছে রাখতে পারবে। কিন্তু তার যাওয়ার কোনো জায়গা নেই।

বেগম সাহেব, কোন দিকে যাবেন ?

নিউমার্কেটে চলো।

আজ সোমবার, নিউমার্কেট বন্ধ।

তোমাকে যেতে বলছি তুমি যাও। সোমবার নিউমার্কেট বন্ধ এটা তুমি জানো, আমি জানি না ?

মিলি গেটের সামনে গাড়ি রেখে বন্ধ নিউমার্কেটে ঢুকল। কিছু মাস্তান ধরনের ছেলে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এদের দিকে তাকালেই বুকের মধ্যে ধুক করে শব্দ হয়। মিলি তবু তাকাল, সব ক'টি ছেলে তাকিয়ে আছে তার দিকে। এর মধ্যে একটি প্রায় ছ'ফুটের মতো লম্বা। নিউমার্কেট বন্ধ হলেও দু'টি ওষুধের দোকান খোলা। সে গট গট করে ঢুকল ওষুধের দোকানে। চারটি প্যারাসিটামল, দু'টি ঘুমের ট্যাবলেট 'ফোনোবরবিটন' কিনল। দু'টি কিনল যাতে দোকানির মনে কোনো সন্দেহ না হয়। দু'টি

করে কিনে কিনে সে একটা ক্রিমের কৌটা ভর্তি করে ফেলেছে। কৌটাটির দিকে তাকালে তার ভয় লাগে। আবার ভালোও লাগে।

বেগম সাহেব এখন কোনদিকে যাবেন ?

নিউ পল্টন লাইন। গোরস্থানের পাশ দিয়ে যাও। ইরাকি গোরস্থান চেনো ঐ দিকে।

মিলির সমস্ত সিদ্ধান্তের মতো এই সিদ্ধান্তও আকস্মিক। এখন সে যাচ্ছে রানুদের বাসায়। সে নিশ্চিত জানে রানুকে বাসায় পাওয়া যাবে না। আজ একটা খারাপ দিন। কাউকে আজ পাওয়া যাবে না। টেলিফোন করলে সেটা হবে রঙ নাম্বার। টিভির সামনে বসলে কারেন্ট চলে যাবে।

রানু ঘরেই ছিল। মিলিকে দেখে তার যতটা অবাক হওয়ার কথা ততটা হলো না। যেন মিলির এখানে আসাটা খুব স্বাভাবিক। সে রোজই আসে। কিন্তু তা তো নয়। মিলি বলল, ভাবি, আমি আরও একদিন এসেছিলাম। তুমি ছিলে না।

জানি, তোমার নোট পেয়েছিলাম।

আজ কিন্তু ভাবি বেশিক্ষণ থাকব না। পাঁচ মিনিট বসব।

এত তাড়া কিসের ?

ওর এক মামাতো বোনের গাড়ি নিয়ে এসেছি, সাড়ে আটটার মধ্যে ফেরত দিতে হবে।

সাড়ে আটটা বাজতে দেরি আছে। তুমি আরাম করে বসো। নতুন হেয়ারস্টাইল দেখছি।

কেমন লাগছে ভাবি ?

রানু হাসিমুখে বলল, একটু ছেলে ছেলে লাগছে। মিলির মুখ কালো হয়ে গেল। তাকে ছেলে ছেলে লাগছে—এটা সে নিজেও লক্ষ করেছে। রানু বলল, মেয়েদের চেহারা একটু ছেলে ছেলে দেখালে খারাপ লাগে না। ছেলেদের যেমন মেয়ে মেয়ে চেহারাতে ভালোই লাগে, অনেকটা সেরকম। মিলির মুখের অন্ধকার কাটল না। সে করুণ মুখ করে বসে রইল। রানু বলল, শোবার ঘরে চলো। আমার সংসার দেখো।

তার শোবার ঘরটি চমৎকার করে সাজানো! দু'টি খাট পাশাপাশি। একটিতে টগর ঘুমিয়ে আছে। ওর গায়ে পাতলা একটা চাদর।

ও এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছে কেন ভাবি ?

টগরের শরীরটা ভালো না, জ্বর।

মিলি উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে টগরের কপালে হাত রাখল, বেশ জ্বর তো ভাবি! হাত পুড়ে যাচ্ছে।

খুব বেশি না। একশ এক।

একশ এক, কম দেখলে ? ভাইয়াকে খবর দিয়েছ ?

না, ওকে খবর দেইনি। সামান্য ব্যাপার নিয়ে আমি হইচই করি না। ঠান্ডা লেগেছে, গা গরম হয়েছে। সেরে যাবে। তুমি কিছু খাবে মিলি ?

না।

এক কাপ চা খাবে ?

আমি চা খাই না ভাবি। চা খেলে রাতে আমার ঘুম হয় না।

রানু সহজস্বরে বলল, চায়ের সঙ্গে ঘুমের কোনো সম্পর্ক নেই। আমার সাথে এক কাপ খাও, কিছু হবে না। এসো রান্নাঘরে, মোড়া পেতে দিচ্ছি। রানু চায়ের কেতলি বসাল। মিলি তার পাশেই চুপচাপ বসে রইল। রানু বলল, গল্পটল্প করো। চুপচাপ বসে আছ কেন ?

কী গল্প করব ?

তোমরা যে গাড়ি কিনবে শুনেছিলাম তার কী হলো ?

জানি না কিছু। ও রিকন্ডিশন্ড গাড়ি কিনতে চায় না। নতুন গাড়ি কেনার মতো টাকাও বোধহয় নেই।

বোধহয় বলছ কেন ? তুমি জানো না ?

না। টাকাপয়সার ব্যাপারে আমি ওর সঙ্গে কথা বলি না। ও নিজেও বলে না।

নাও, দেখ চায়ে চিনি হয়েছে কি না।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে মিলি রানুকে দেখতে লাগল। স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে, কিন্তু তাতে যেন তাকে আরও সুন্দর লাগছে। কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়া একটি বাচ্চামেয়ের মতো লাগছে। রানু বলল, তুমি কি কিছু বলতে চাও নাকি ?

না, কী বলব!

মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে কী একটা বলতে গিয়েও বলছ না।

মিলি ইতস্তত করে বলল, ভাইয়ার মতো এমন একজন ভালো মানুষকে তোমার পছন্দ হলো না কেন ? এটা আমার খুব জানার ইচ্ছা। নাকি সে ভালো মানুষ না ?

রানু সহজভাবেই বলল, তোমার ভাই দূর থেকে খুব ভালো মানুষ। শুধু ভালো মানুষ না, খুবই ভালো মানুষ। কিন্তু কাছ থেকে না। তোমরা কেউ ওকে কাছ থেকে দেখোনি।

আমার ভাই—আর আমি কাছ থেকে দেখিনি ?

রানু হালকা গলায় বলল, পাশাপাশি থাকলেই কাছ থেকে দেখা হয় না মিলি।

দু'জনই বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। একসময় রানু বলল, আটটা বেজে গেছে, তোমার না সাড়ে আটটায় গাড়ি ফেরত দিতে হবে ?

মিলি উঠে দাঁড়াল। শোবার ঘরে গিয়ে টগরের মাথায় হাত রাখল। ঘাম দিচ্ছে। জ্বর কমে যাচ্ছে বোধহয়। রানু তাকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল। মিলির মনে হলো আবহাওয়াটা কেমন অন্যরকম হয়ে গেছে। কেউ সহজ হতে পারছে না। মিলি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্যে জিজ্ঞেস করল, শাড়িটাতে আমাকে কেমন লাগছে ভাবি ?

খুব একটা ভালো লাগছে না। সাদার ব্যাকগ্রাউন্ড হলুদ ফোঁটা গুটিবসন্তের মতো দেখাচ্ছে। রাগ করলে না তো ?

না, রাগ করব কেন ? তোমার কাছে যা সত্যি মনে হয়েছে তাই বলেছ। মিলি সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল। রানু বলল, খুব সাবধানে নামবে, সিঁড়িটা ভালো না। মিলি কোনো জবাব দিল না। তার চোখ ঝাপসা। অল্পতেই তার চোখে পানি আসে।

মিলিরা থাকে কলাবাগান, লেকসার্কাসে। নিজেদের বাড়ি নয়, ভাড়া বাড়ি। বাড়িটি কেনার কথা হচ্ছে। কথাবার্তা কোন পর্যায়ে আছে মিলি জানে না। মতিয়ুর এসব ব্যাপারে তার সঙ্গে কখনো কোনো কথা বলে না। মিলির শ্বশুর একবার তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বাড়ি কেনার কী হয়েছে ? তখনই শুধু মিলি জানল বাড়ি কেনার একটা কথাবার্তা চলছে। একদিন সত্যি সত্যি কেনা হয়ে যাবে এবং তারও অনেক দিন পর হয়তো মিলি জানবে। কিংবা জানবেই না।

মতিয়ুর বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর সঙ্গে খুব রোগা, চশমা পরা একজন লোক। সে ছেলেটির সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। মিলিকে গাড়ি থেকে নামতে দেখেও সে না দেখার ভান করল এবং আগের মতোই হেসে হেসে কথা বলতে লাগল। কিন্তু লোকটি তাকিয়ে আছে মিলির দিকে। বেশ ভদ্রভাবেই তাকিয়ে আছে। চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে না। মিলির কি উচিত কাছে এগিয়ে যাওয়া ? না। মতিয়ুর পছন্দ করবে না, সে তার কোনো বন্ধুর সঙ্গে মিলিকে আলাপ করিয়ে দেয় না।

ওদের বাড়িতে বাইরের পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের কথা বলার রেওয়াজ নেই। মতিয়ুরের একটি বোন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। ফিজিক্সে অনার্স। সেও বোরকা পরে ক্লাসে যায়।

মিলি তার নিজের ঘরে ঢুকে গেল। ভাইয়াকে টেলিফোন করল কয়েকবার। রিং হচ্ছে, কিন্তু ধরছে না। তার মানে ভাইয়া ফেরেনি এবং আকবরের মা টেলিফোন ধরছে না। মিলির রোখ চেপে গেল। কতক্ষণ সে না ধরে থাকবে ? রিং হতে থাকুক। পাঁচবার, ছ'বার, সাতবার, আটবার ন'বার।

হ্যালো।

কে ভাইয়া ? টেলিফোন ধরছিলে না কেন ?

এইমাত্র এলাম।

ওদের টেলিফোন ধরতে নিষেধ করে গেছ কেন ?

কী বলতে চাস সেটা বল। আমি গোসল করব।

ভাইয়া শোনো, আমি ভাবির বাসায় গিয়েছিলাম।

ভালো।

সুন্দর বাসা।

সুন্দর হলে তা ভালোই।

টগরের জ্বর। খুব জ্বর।

ওসমান সাহেব কিছু বললেন না। মিলি বলল, হ্যালো, ভাইয়া আমার কথা শুনছ ?

শুনছি।

কিছু তো বলছ না।

কী বলব ?

মিলি খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, তোমাকে একটা ছেলের কথা বলেছিলাম না, কালোমতো, ভাবির সঙ্গে এক রিকশায় যাচ্ছিল ?

হ্যাঁ, বলেছিলি।

ঐ ছেলেটা ভাবির বসার ঘরে বসেছিল।

তিনি একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ঐ ছেলেটার নাম আলম। ও এসেছিল আমার এখানে একটা বই নিতে। আমার সঙ্গেই ছিল এতক্ষণ। তুই ওকে দেখিসনি। শুধু শুধু কেন এত মিথ্যা বলিস ?

মিলি কোনো কথা বলল না। ওসমান সাহেব শান্তস্বরে বললেন, রেখে দেই কেমন ?

আচ্ছা।

আর কিছু বলবি ?

না।

ওসমান সাহেব টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন।

৪

ওসমান সাহেবের বাবা ফয়সল সাহেবের বয়স তিয়াত্তর। এই বয়সেও তিনি বেশ শক্ত। রোজ ভোরে দু'মাইল হাঁটেন। বিকেলে ঘড়ি ধরে পনেরো মিনিট ফ্রিহ্যান্ড একসারসাইজ করেন। চোখের দৃষ্টি ঠিক আছে। কিছুদিন আগেও চশমা ছাড়া পড়তে পারতেন। এখন অবশ্যি প্লাস ওয়ান পাওয়ারের চশমা লাগে। লোকটি ছোটখাটো এবং রোগাপাতলা। রোগা লোকেরা যেমন হয়—দারুণ রগচটা। দু'মাস আগে তাঁর ছোটখাটো একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। ডাক্তার রাগারাগি না করার জন্যে কঠিন নিষেধ জারি করেছেন। বাড়ির লোকজনদেরও বলা হয়েছে যেন কিছুতেই তাঁকে রাগানো না হয়। যা বলেন তাই যেন সবাই মেনে চলে। সবাই করছেও তাই। এতে ফয়সল সাহেব আরও রেগে যাচ্ছেন। আজও মিলিকে ঢুকতে দেখে তিনি রেগে গেলেন। রাগের যদিও কোনো কারণ ছিল না।

তিনি বসেছিলেন বারান্দায় ইজিচেয়ারে। নিচু একটা কফি টেবিলে পা তুলে দিয়েছেন। কোলের ওপর খবরের কাগজ। তিনি কাগজ পড়ছিলেন না। মিলিকে ঢুকতে দেখে কাগজের ওপর চোখ রাখলেন। মিলি ক্ষীণস্বরে বলল, কেমন আছেন বাবা ?

ভালোই আছি, খারাপ থাকব কেন ?

না, মানে শরীর ঠিক আছে তো ?

ঠিক না থাকলে তুই কী করবি, ঠিক করে দিবি ?

মিলি কী বলবে বুঝতে পারল না। বাবার সামনে একটি চেয়ার আছে। সেখানে কি বসবে খানিকক্ষণ ? কিন্তু বাবা নিশ্চয়ই তা পছন্দ করবেন না। মিলি সংকুচিত হয়ে বসেই পড়ল। ভয়ে ভয়ে বলল, নানান ঝামেলায় থাকি, আসাই হয় না।

আসতে বলি নাকি ?

না, বলবেন কেন ? নিজে থেকেই তো আসা উচিত।

আমি সুখেই আছি। আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না। নিজেদের কথা ভাব। নিজেদের চরকায় তেল দে। আই থিংক ইয়োর চরকা নিডস ওয়েলিং।

ফয়সল সাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন এবং অতিদ্রুত পা নাচাতে শুরু করলেন। এটা তাঁর একটা সিগন্যাল। যার মানে হচ্ছে, আমি আর একটি কথারও জবাব দেব না, এখন বিদেয় হও। মিলি তবু আরেকবার চেষ্টা করল। বেশ উৎসাহের ভঙ্গি করে বলল, রানু ভাবির বাসায় গিয়েছিলাম। ওরা ভালোই আছে। তবে টগরের গা গরম।

ফয়সল সাহেব পত্রিকাটি চোখের আরও কাছে নিয়ে এলেন। যেন হঠাৎ দারুণ একটা খবর চোখে পড়েছে।

আপনি যদি রানু ভাবিকে একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলেন তাহলে মনে হয় সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি বুঝিয়ে বলব কেন ? হু অ্যাম আই ? এখানে আমার কথা আসছে কেন ? যাদের ঝামেলা তারা মিটাবে।

ভাবি আপনাকে খুব রেসপেক্ট করে।

সে রেসপেক্ট করতে চাইলে করবে। তার মানে এই না...

ফয়সল সাহেব কথা শেষ করলেন না। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। আগে দিনে এক প্যাকেট করে খেতেন। স্ট্রোক হওয়ার পরপর ডাক্তার সিগারেট নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। ফয়সল সাহেব কারও কোনো কথা কানে নেন না, কিন্তু এই কথাটি মেনে চলেন। সিগারেট খান না, কিন্তু মুখে দিয়ে বসে থাকেন।

মিলি দেখল তার বাবা আগুন না ধরিয়ে সিগারেট টানছেন এবং নাকে ধোঁয়া ছাড়ার ভঙ্গি করছেন। মিলি কিছু বলতে গিয়েও বলল না। তার খানিকটা ভয় ভয় করতে লাগল। ফয়সল সাহেব বললেন, দেখা তো হয়েছে এখন চলে যা। নাকি আরও কিছু বলবি ? মিলি ইতস্তত করে বলল, মেয়ের একটা নাম দেন না বাবা। তিন অক্ষরের। ম দিয়ে শুরু হবে।

তোর মেয়ের কি স্বাস্থ্য ভালো ?

জি।

তাহলে নাম রাখ মুটকি। তিন অক্ষর ম দিয়ে শুরু। যা যা চেয়েছিলি সবই আছে।

ফয়সল সাহেব দুলে দুলে হাসতে লাগলেন। চোখে পানি এসে গেল মিলির। সে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। এ বাড়িতে এসে তার নিজের ঘর না দেখে সে যেতে পারে না। দোতলায় তার ঘরটি তালা দেওয়া। তালাচাবি তার কাছেই আছে। সে যখনি আসে তার ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ বসে থাকে। তার খুব কান্না পায়। আজও সে তার ঘরে ঢুকল। সবকিছু আগের মতো আছে। একটি জিনিসও উলটপালট হয়নি। মিলি ছোট্ট খাটটাতে শুয়ে পড়ল। সে যেদিন তার ঘুমের ওষুধ খাবে—এই খাটে শুয়েই খাবে। মিলি বালিশ জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদল। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে নিচে নেমে এল।

বাবা এখনো বারান্দায় বসে আছেন। তাঁর সামনে বসে আছে বীথি নামের ঐ কম বয়েসি মেয়েটি। বাবার সেক্রেটারি। তাঁকে খবরের কাগজ পড়ে শোনায়। ডিকটেশন নেয়। মিলি লক্ষ করল, মেয়েটি বসে আছে খালি পায়ে। তার মানে কি এই যে সে এখন এ বাড়িতে থাকে? কেন থাকে?

বাবা যাই?

ফয়সল সাহেব জবাব দিলেন না। মাথা নাড়লেন। বীথি বলল—তুমি কখন এসেছ আমি জানি না তো? চা-টা খেয়েছ?

মেয়েটি এভাবে কথা বলছে যেন সে এ বাড়ির একজন অতিথি আপ্যায়ন করছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, তাকে তুমি তুমি করে বলছে। তাকে সে তুমি করে কেন বলবে? মিলি ঠান্ডা গলায় বলল, আপনি ভালো আছেন?

হ্যাঁ, আমি ভালো। স্যারের শরীর ভালো না। দেখাশোনারও লোকজন নেই। আমি তাই কিছুদিন ধরে এ বাড়িতে থাকি। তুমি জানো বোধহয়।

না, আমি জানতাম না। এখন জানলাম। আচ্ছা যাই।

ফয়সল সাহেব মাথা এলিয়ে চোখ বন্ধ করেছেন। ঘুমিয়ে পড়েছেন বোধহয়। এই বয়সে লোকজন আচমকা ঘুমিয়ে পড়ে। বীথি বলল, তুমি আসবে ঘনঘন। খোঁজখবর নেবে।

মিলি বলল, আপনি আমাকে তুমি তুমি বলছেন কেন?

ফয়সল সাহেব চোখ মেললেন। মিলি ভাবল বাবার কাছে থেকে সে প্রচণ্ড একটা ধমক খাবে। কিন্তু ফয়সল সাহেব কিছু বললেন না। আবার চোখ বন্ধ করে ফেললেন। খুব দ্রুত তাঁর পা দুলতে লাগল।

৫

শেষরাতের দিকে ওসমান সাহেব একটা দুঃস্বপ্ন দেখলেন, যেন ক্লাস নিতে গিয়েছেন। তিনি পড়াবেন আর্যদের আগমনের ইতিহাস। কিন্তু ক্লাসে ঢুকেই টের পেলেন তাঁকে পড়াতে হবে জ্যামিতি। দু'টি ত্রিভুজকে সর্বসম প্রমাণ করতে হবে। ত্রিভুজ দু'টির দুই বাহু ও অন্তঃস্থ কোণ সমান। ম্যাট্রিকে পড়ে এসেছেন, তবু বোর্ডের সামনে দাঁড়ানো মাত্র সব গুলিয়ে গেল। তিনি হকচকিয়ে তাকালেন ছাত্রদের দিকে। সবাই হাসছে। মেয়েগুলি হেসে একজন অন্যজনের গায়ে গড়িয়ে পড়ছে। এত হাসির কী আছে? তিনি বিড়বিড় করে বললেন, এই হাসছ কেন? তারা আরও জোরে হেসে উঠল। তিনি কপালের ঘাম মুছবার জন্যে পকেটে হাত দিতে দিয়ে টের পেলেন, তার গায়ে কোনো কাপড় নেই। কী ভয়াবহ ব্যাপার! ওসমান সাহেব গোঙানির মতো শব্দ করতে করতে জেগে উঠলেন। তাঁর সারা গা ঘামে ভিজে গেছে। তিনি ক্ষীণস্বরে ডাকলেন, রানু! রানু! তিনি জানেন রানু এখানে নেই। তবুও প্রতিদিনই আধো-ঘুম আধো-জাগরণে মনে হয় সে পাশেই আছে, ডাকলেই সাড়া দেবে।

তিনি ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। পানির তৃষ্ণা হচ্ছে। হাতের কাছে কাচের জগ, কিন্তু পানি নেই। তিনি উঠে গিয়ে বাতি জ্বালালেন। গায়ে-মুখে পানি ঢাললেন। রাত শেষ হয়ে এসেছে। চারটা দশ বাজে। আবার ঘুমুতে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। চা খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। বানাবে কে ? বিয়ের পরপর ফ্লাস্ক ভর্তি করে চা বানিয়ে রাখত রানু। কোনোভাবে যদি লেখক স্বামীকে সাহায্য করা যায়। ডিকশনারি দেখে বানান ঠিক করা। লেখা কপি করে দেওয়া। কত উৎসাহ। জীবনটাই অন্যরকম ছিল।

বিয়ের পরপর একবার এরকম ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলেন। ভয়ে অস্থির হয়ে ডাকলেন, রানু! রানু! রানু হকচকিয়ে গেল। ভয় পাওয়া গলায় বলল, কী হয়েছে ?

ভয় পেয়েছি। দুঃস্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম একটা পাগল আমাকে তাড়া করেছে।

বলতে বলতে তিনি শিউরে উঠলেন। ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। রানু অবাক হয়ে বলল, এত ভয় পাওয়ার মতো কী দেখলে! এরচেয়ে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন তো আমি রোজই দেখি। ওসমান সাহেব নিচুগলায় বললেন, না, এরকম তুমি দেখো না। এটা একটা ভয়াবহ স্বপ্ন! তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না। সম্পূর্ণ অন্যরকম ব্যাপার।

রানু তার হাত ধরে অনেকক্ষণ পাশে বসে রইল। তারপর চা বানিয়ে আনল।

ওসমান সাহেব শিশুর মতো তাকে জড়িয়ে ধরে বাকি রাতটা জেগে কাটালেন। রানু নিজেও ঘুমাল না। একজন বয়স্ক মানুষ সামান্য একটা স্বপ্ন দেখে এতটা ভয় পেতে পারে তা তার ধারণার বাইরে ছিল। সে নিচুস্বরে বলল, তুমি কি প্রায়ই এরকম দুঃস্বপ্ন দেখো ?

প্রায়ই না, মাঝে মাঝে দেখি।

সবসময় এরকম ভয় পাও ?

হ্যাঁ।

বেশ কিছু সময় চুপচাপ থেকে রানু বলল, তোমার এক গল্পের নায়ক এরকম দুঃস্বপ্ন দেখত। ওসমান সাহেব কিছু বললেন না। রানু বলল, বেচারা অবশ্যি শেষপর্যন্ত পাগল হয়ে যায়।

তিনি রাগী গলায় বললেন, ওর পাগল হওয়ার অন্য কারণ ছিল।

রাগ করছ কেন ?

রাগ করছি না। লেখার সঙ্গে সবাই লেখককে মিশিয়ে ফেলে। এটা ঠিক না। লেখা এবং লেখক এক নয়।

আহ্, আমি ঠাট্টা করছিলাম।

ওসমান সাহেব থমথমে গলায় বললেন, এই ব্যাপারটা নিয়ে ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।

তুমি এত রেগে যাচ্ছ কেন ? রাগ করার মতো কিছু তো আমি বলিনি। দাও মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। নাকি অন্যকিছু চাই ?

ওসমান সাহেব জবাব দেননি। পাশ ফিরে ঘুমুতে চেষ্টা করেছেন। ঘুম আসেনি। দুঃস্বপ্ন দেখার পর সাধারণত তাঁর ঘুম হয় না। আজও হবে না। অবশ্যি রাতও খুব বাকি নেই। আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। কাক ডাকতে শুরু করবে। লেখক হয়ে

অলেখকসুলভ চিন্তা করলেন। কাক ডাকতে শুরু করবে না বলে বলা উচিত ছিল পাখি ডাকতে শুরু করবে।

তিনি চটি পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁর পাগল গল্পের নায়কের সঙ্গে একটা মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। সেও দুঃস্বপ্ন দেখার পর বাকি রাতটা ঘুমুতে পারত না। বারান্দায় এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করত। সূর্য ওঠার পর ঘুমুতে যেত। একজন নিঃসঙ্গ মানুষের গল্প। শেষপর্যায়ে যে স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবকে গুলিয়ে ফেলে। চমৎকার একটি গল্প। শুধু চমৎকার নয়, একটি অসাধারণ গল্প। আশ্চর্যের ব্যাপার, সমালোচকরা এই গল্পটিকে গুরুত্ব দেননি। কেন দেননি ? ওসমান সাহেব ঠিক করে ফেললেন, আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো এই গল্পটি পড়বেন। স্বপ্নদৃশ্যের বর্ণনাগুলি ভালো করে দেখা দরকার। এই গল্পে অতিপ্রাকৃত আবহ তৈরির জন্যে প্রচুর তৎসম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে কি গল্পের গাঁথুনি আলগা হয়ে গেছে ?

সাদামাটা একটা সূর্য উঠল। ভোর হওয়া নিয়ে কবি-সাহিত্যিকরা এত হইচই করে কী জন্যে কে জানে! সূর্য ওঠার মধ্যে রহস্যময় কিছু নেই। জ্যোৎস্নায় কিছু রহস্য আছে। কাজেই চাঁদ নিয়ে কিছুটা মাতামাতি করা যেতে পারে। সূর্য নিয়ে নয়।

আকবরের মা উঠে পড়েছে। গ্যাসের চুলায় আগুন জ্বলছে, চায়ের কেতলি বসানো হয়েছে। ভোরবেলার এই আয়োজনটি চমৎকার। দেখলেই মন ভালো হয়ে উঠতে শুরু করে।

আজ আমি লেখা নিয়ে বসব।

জি আইচ্ছা।

যে-ই আসুক বলবে আমি বাসায় নেই। কখন ফিরব তার ঠিক নেই। টেলিফোনেও একই কথা বলবে।

জি আইচ্ছা। ফেলাস্কে চা বানাইয়া দিমু ?

না, চা-টা লাগবে না।

অনেকদিন পর লেখার টেলিলের কাছে এসেছেন। সাদা খাতা খোলা। দেখলেই কিছু একটা লিখতে ইচ্ছা করে। 'অরণ্য এগিয়ে আসছে' এই গল্পটি লিখে ফেললে কেমন হয় ?

'অরণ্য এগিয়ে আসছে। ছোট শহরের সবাই বুঝতে পারছে—পালানোর পথ নেই।' প্রথম কয়েক পৃষ্ঠায় এই বর্ণনাটিই থাকবে। কিন্তু লেখাটা আসছে না।

টেবিলের একপাশে মিমির প্যাকেট। লাল লাল পিঁপড়া প্যাকেটটি ছেঁকে ধরেছে। টগরকে দেওয়া হয়নি। কেন দেওয়া হয়নি ? হাতেই তো ছিল। তবু শেষমুহূর্তে দেওয়া হলো না কেন ? তিনি কি টগরকে ভালোবাসেন না ? কিন্তু তা কী করে হয়!

ওসমান সাহেব মিমির প্যাকেটটি তাঁর লেখার কাগজের ওপর এনে রাখলেন। পিঁপড়াদের মধ্যে একটি সাড়া পড়ে গেল। হঠাৎ বস্তুর অবস্থাগত পরিবর্তন কেন হলো তারা বুঝতে পারছে না। ছোটাছুটি করছে পাগলের মতো। ওসমান সাহেব মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলেন।

রানুর ঘুম ভাঙল খুব ভোরে।

অভ্যাসমতো টগরের গায়ে হাত রাখল। গা গরম। টেম্পারেচার কত হবে? রাত দু'টোর দিকে একবার টেম্পারেচার নেওয়া হয়েছিল, নিরানব্বই। এখন বোধহয় তারচেয়েও বেশি। রানু টগরকে নিজের কাছে নিয়ে এল। গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে উত্তাপ যদি কিছু কমিয়ে দেওয়া যায়। এত ভুগে কেন সে? দু'দিন পরপর অসুখ। হাম থেকে উঠবার পরই একনাগাড়ে সাতদিন সর্দিজ্বর। সেই জ্বর সারল, সঙ্গে সঙ্গে হলো আমাশা। একটা কিছু লেগেই আছে। শরীর শুকিয়ে কাঠির মতো হয়েছে, শুধু মুখটা শুকায়নি। বড়সড় একটি মুখে দু'টি বিশাল চোখ। ওর বাবার চোখ পেয়েছে। শুধু চোখ নয়, বাবার স্বভাবচরিত্রও বোধহয় কিছু পেয়েছে। কোনো ব্যাপারেই কোনো অভিযোগ নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক জায়গায় বসে থাকতে পারে।

টগর ঘুমের মধ্যেই নড়ে উঠল। রানু ডাকল, এই টগর!

সে তার ছোট হাত দু'টি দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল। কেমন তাকাচ্ছে পিট পিট করে।

টগর, এই পাজি!

কী।

শরীর খারাপ লাগছে?

টগর মাথা নাড়ল। তার খারাপ লাগছে। কিন্তু মুখ হাসি হাসি। রানু বলল, দুধ খাবি?

বোতলে করে খাব।

এত বড় ছেলে, বোতলে করে খাবি কী? মালটোভা দিয়ে বানিয়ে দেব। এক চুমুকে খেয়ে ফেলবি, ঠিক আছে?

টগর ঘাড় কাত করল, সে গ্লাসে করে দুধ খেতে রাজি আছে।

বেশি করে চিনি দিয়ো।

দেব।

দুধ বানিয়ে এনে রানু দেখল, টগর বালিশটা দু'পায়ের ফাঁকে নিয়ে এসে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, জ্বর কি কমে আসছে? রানু অনেকক্ষণ ছেলের পাশে বসে রইল।

রান্নাঘরে খুটখাট শব্দ হচ্ছে। অপলা জেগেছে নিশ্চয়ই। সেও খুব ভোরে ওঠে। হাতমুখ ধুয়ে পড়তে বসে। মেডিকেলে টেস্ট দেবে। এলাউ হওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। রোজ ঘুমুতে যায় দেড়টা-দু'টোর দিকে। রানু রান্নাঘরে এসে দেখল অপলা চায়ের কেতলি বসিয়েছে। সে হাসিমুখে বলল, তুমি আজ এত ভোরে উঠলে যে? ব্যাপার কী?

ব্যাপার কিছু না।

টগরের জ্বর আছে এখনো?

কম, গা ঘামছে।

রাতে বেশ কয়েকবার কাঁদল। তখনি বুঝেছি শরীর খারাপ। ওকে আজ একবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও।

রাতে কেঁদেছে নাকি ?

হ্যাঁ, তুমি টের পাওনি ?

না।

রানুর কিছুটা মন খারাপ হলো। টগর কেঁদেছে সে টেরও পায়নি। ও অবশ্যি কেঁদেকেটে পাড়া মাথায় করবে না। নিজে নিজেই শান্ত হয়ে ঘুমুতে চেষ্টা করবে।

আপা, চা খাবে ?

খালিপেটে চা খাই না।

খালিপেটে হবে কেন। নোনতা বিস্কুট আছে, দেব ?

দে।

অপলা চা ঢালতে ঢালতে বলল, আপা, তুমি এত চিন্তিত কেন ? রাতে ভালো ঘুম হয়নি ?

হয়েছে।

তাহলে ? মুখ এমন শুকনো কেন ?

টগরের আবার জ্বর এল, এইজন্যেই খারাপ লাগছে।

আপা, তুমি একটা কাজ করো—দুলাভাইকে খবর দাও। সে কয়েকদিন ঘনঘন আসুক। ছেলেকে নিয়ে ছোটাছুটি করুক, দেখবে জ্বর কমে যাবে।

রানু গম্ভীর হয়ে গেল। অপলা বলল, কথা বলছ না কেন আপা ? চুপ করে আছ কেন ?

তুই সবসময় দুলাভাই দুলাভাই বলিস। সব জেনেশুনেও কেন বলিস ?

তাহলে কী বলব ? টগরের বাবা ? না ওসমান সাহেব ?

রানু কিছু বলল না। নিঃশব্দে চায়ে চুমকে দিতে লাগল। অপলা বলল, ঠিক আছে আর বলব না। কিন্তু তুমি তাকে আসতে বলো। এক মাস ধরে আসছেন না।

আসতে না চাইলে আসবে না। ধরে নিয়ে আসতে হবে ?

ঠিক তা-ও না আপা। তুমিই আসতে নিষেধ করেছ।

নিষেধ করিনি। বলেছি, এত ঘনঘন যেন না আসে। আমি জীবনটাকে বদলাতে চেষ্টা করছি। তুই কেন বুঝতে চেষ্টা করছিস না ?

তোমার ধারণা উনি ঘনঘন এলে জীবন বদলানো যাবে না ?

এই নিয়ে তোর সঙ্গে কথা বলতে চাই না।

রানু উঠে পড়ল। টগরের ঘুম ভেঙেছে। সে গম্ভীর মুখে রওনা হয়েছে বাথরুমের দিকে। বয়সের তুলনায় সে কি একটু বেশি গম্ভীর ? রানু ডাকল, দেখি টগর, এদিকে আয় তো। জ্বর আছে কি না দেখি। টগর গুটি গুটি এগিয়ে এল।

এই তো জ্বর নেই। গুড বয়। যাও দাঁত মেজে আসো। নিজে নিজে মাজতে পারবে না?

পারব।

ভেরি গুড।

রানু শুনল টগর অপলার সঙ্গে কথা বলছে। ওর সঙ্গে তার বেশ ভাব। কথাবার্তা হচ্ছে বন্ধুর মতো।

কেমন আছিস রে টগর?

ভালো।

তোর মা'র মতো মুখটা এমন অন্ধকার করে আছিস কেন? কেমন করে হাসতে হয় মনে আছে?

আছে।

তাহলে বিরাট বড় একটা হাসি দে তো দেখি। বাহ্ চমৎকার! দেখি তোর নড়বড়ে দাঁতটার কী অবস্থা? কাছে আয়।

না।

না কেন?

তুমি ফেলে দেবে।

ফেলব না, হাত দিয়ে দেখব নড়ছে কি না। আয় কাছে আয়।

রানু টগরের ছোট্ট একটি চিৎকার শুনল। তারপর আবার চুপ। অপলা বলছে—এই তো ফেলে দিলাম, ব্যথা পেয়েছিস?

না।

যা, হাতমুখ ধুয়ে আয়।

বাথরুমের কল দিয়ে পানি পড়ছে। টগর হাতমুখ ধুচ্ছে নিশ্চয়ই। রানু অবাক হয়ে লক্ষ করল, দাঁত পড়ার মতো একটা বড় ঘটনা সে তার মাকে বলতে এল না। যেন এটা বলার মতো কিছু নয়। নাশ্‌তার টেবিলে খুব সহজভাবেই রানু জিজ্ঞেস করে, তোমার দাঁত পড়ে গেছে নাকি?

হ্যাঁ।

কই আমাকে তো কিছু বলোনি। দেখি এখন তোমাকে কেমন দেখাচ্ছে। বাহ্ সুন্দর লাগছে তো।

টগর ছোট্ট করে হাসল। রানু বলল, আজ আমি বাইরে যাব। তুমি অপলার সঙ্গে থাকতে পারবে না?

পারব।

বিকেলে তোমার বাবা আসবেন তোমাকে দেখতে।

আজ কি বুধবার?

রানুর বুকে ছোট একটা ধাক্কা লাগল। টগর কি মনে মনে তার বাবার জন্যে অপেক্ষা করে ? নয়তো বুধবার তার মনে থাকার কথা নয়।

হ্যাঁ, আজ বুধবার। নাও, এই রুটিটা খাও।

আদ্দেকটা খাই ?

ঠিক আছে খাও।

বাবা যখন আসবে তুমি তখন থাকবে না ?

থাকব। আমি পাঁচটার মধ্যে আসব।

রানু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তুমি কি তোমার বাবার সঙ্গে ঐ বাড়িতে দু'একদিন থাকতে চাও ?

টগর ঘাড় কাত করল। সে থাকতে চায়।

আমার জন্যে তোমার খারাপ লাগবে না ?

টগর কিছু বলল না।

রাতে ঘুম ভাঙলেই কাঁদবে—আম্মা কোথায়! আম্মা কোথায়! কাঁদবে না ?

হ্যাঁ কাঁদব।

তাহলে যাবে কেন ?

টগর জবাব দিল না। মায়ের দিকে সরাসরি তাকালও না।

রানু অনেকক্ষণ বসে থাকার পর তার ডাক পড়ল। সিদ্দিক সাহেব নিজে এসে ডেকে নিয়ে গেলেন। সহজ স্বরে বললেন, একটা বোর্ড মিটিং ছিল। তাই দেরি হলো। কিছু মনে করবেন না। আপনাকে চা-টা দিয়েছে তো ?

হ্যাঁ দিয়েছে।

বসুন এখানে। আরাম করে বসুন।

এই ঘরটি এয়ারকন্ডিশন্ড। হুম হুম একটা শব্দ হচ্ছে, যন্ত্রটা হয়তো ভালো না। কিন্তু ঘর খুব সুন্দর করে সাজানো। অফিস মনে হয় না। মনে হয় অফিস নয়, কারও ড্রয়িংরুম।

বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিল। কিন্তু কোনো কাগজ বা ফাইলপত্র নেই। টেবিলের মাঝখানে ধবধবে সাদা একটা ফুলদানিভর্তি ফুল। ঘরের এক কোনায় ছোট্ট একটা আলনা, সেখানে টাওয়েল ঝুলছে। অফিসঘরে আলনা কেন কে জানে!

আপনি কেমন আছেন বলুন ?

আমি ভালোই আছি।

চা খাবেন ?

চা-কফি কোনোটাই খাব না।

সিদ্দিক সাহেব সিগারেট ধরিয়ে চিন্তিত মুখে টানতে লাগলেন। এখানে সম্ভবত কিছু হবে না। রানুর ধারণা ছিল হবে। গত সপ্তাহের কথাবার্তা এরকমই ছিল। সিদ্দিক সাহেব

হাসিমুখে বলেছিলেন, পোস্ট না থাকলেও অনেক সময় পোস্ট তৈরি করা হয়। আপনি আগে মন ঠিক করুন। রানু বলেছিল, আমার মন ঠিক করাই আছে।

বেশ তাহলে আগামী সপ্তাহে আসুন। দশটার আগে আসতে পারবেন ?

পারব।

সেদিন সিদ্দিক সাহেবের যে হাসিখুশি ভাব ছিল আজ তা নেই। গম্ভীর মুখে সিগারেট টানছেন। যেন কোনো একটি অস্বস্তিকর কথা বলতে দ্বিধা করছেন।

সিদ্দিক সাহেব একটি মুখবন্ধ খাম এগিয়ে দিলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, এখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আছে। শর্তগুলি আপনার যদি পছন্দ হয়, তাহলে আপনি আগামী মাসের এক তারিখ থেকে জয়েন করতে পারেন।

কী পোস্ট, কী কাজ, কিছুই তো বললেন না।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে সব বলা আছে। তিন মাস আপনি থাকবেন ট্রেইনি হিসেবে। বিভিন্ন সেকশনে যাবেন এবং কাজ শিখবেন। তিন মাস পর আমরা যদি মনে করি আপনার ট্রেনিং ভালো হয়নি তাহলে সেটি এক্সটেণ্ড করে ছ' মাস করা হবে। ট্রেনিং পিরিয়ডে আপনার ভাতা হবে মূল বেতনের অর্ধেক। অন্য কোনো ফেসিলিটিও থাকবে না।

খামটা এখানে খোলা উচিত হবে কি না রানু বুঝতে পারছে না। সিদ্দিক সাহেব বললেন, আপনি কি কিছু বলবেন ?

জি-না। থ্যাংক ইউ।

এখন নিশ্চয়ই বাড়ি যাবেন ?

জি।

একটু বসুন।

রানু বসে রইল। সিদ্দিক সাহেব বেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে বললেন, ড্রাইভার সাহেবকে বলো ইনাকে বাসায় পৌঁছে দিতে।

জুনিয়র অফিসার্স গ্রেড। বেতন সব মিলিয়ে দু'হাজার টাকার মতো। এই চাকরি নেওয়াটা কি ঠিক হবে ? ড্রাইভার বলল, আপা, কোনদিকে যাব ?

আমি যাব নিউ পল্টন। নিউমার্কেটে নামিয়ে দিলেই হবে। কিছু কেনাকাটা করব।

রানু কথাটা বলেই একটু অস্বস্তি বোধ করল। নিউমার্কেটে কেনাকাটা করব, এটা বলার দরকার ছিল না। সাফাই গাইবার কোনো ব্যাপার নয়।

ওসমান সাহেব রানুর বসার ঘরে একা একা বসেছিলেন। রানুকে ঢুকতে দেখে তিনি তাকালেন। রানুর হাতে একগাদা জিনিসপত্র। দু'হাতে সেগুলি ঠিক সামলানোও যাচ্ছিল না। ওসমান সাহেব সহজস্বরে বললেন, অনেক কিছু কিনলে দেখি। রানু কিছু বলল না। জিনিসপত্র নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

অপলা টগরের পাশে শুকনো মুখে বসে আছে। সে রানুকে দেখেই বলল, ওর তো বেশ জ্বর আপা। একশ দুইয়ের উপরে। তিন-চারবার বমি করেছে। রানু বলল, ও কখন এসেছে ?

বেশিক্ষণ হয়নি। দশ-পনেরো মিনিট। আমি বলেছিলাম ভেতরে এসে বসতে। উনি আসেননি।

রানু টগরের কপালে হাত দিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে জ্বর দেখল। শুকনো মুখে বলল, থার্মোমিটারটা আবার দে তো দেখি।

অপলা বলল, চলো ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। দুলাভাই আছেন, তাঁকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

তাকে সঙ্গে করে নিতে হবে কেন?

অপলা চুপ করে গেল। থার্মোটিমটার দেখল। রানু বলল, কত?

একশ এক। একটু কমেছে। জ্বর ছেড়ে যাবে বোধহয়। ঘাম হচ্ছে।

রানু কিছু বলল না। অপলা বলল, তুমি বাইরের ঘরে গিয়ে বসো। অনেকক্ষণ উনি একা একা বসে আছেন।

রানু মনে হলো শুনতেই পেল না।

অপলা বলল, তুমি চা খাবে, চা দেব? পানি গরম আছে।

না, চা-টা কিছু খাব না।

রানু বসার গরে ঢুকল। ওসমান সাহেব বললেন, জ্বর কি খুব বেশি? বেশি হলে একজন ডাক্তার নিয়ে আসি। কাছেই আমার একজন চেনা ডাক্তার আছেন।

ডাক্তার আনতে হবে না। আমি নিয়ে যাব।

জ্বর কবে থেকে?

দু'-তিনদিন থেকে।

আমাকে তো খবর দাওনি।

খবর দেওয়ার মতো কিছু হয়নি। তা ছাড়া আমার খবর দেওয়ার লোক নেই, তুমি ভালো করেই জানো।

তোমার খালার বাসায় টেলিফোন নাই?

আছে। তাঁদের টেলিফোন আমি আমার নিজের কাজের জন্যে ব্যবহার করব কেন?

ওসমান সাহেব বিস্মিত হয়ে বলল, তোমার খালার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ভালো না নাকি?

সম্পর্ক খারাপ হবে কেন?

অপলা চা নিয়ে ঢুকল, লজ্জিত মুখে বলল, চা ছাড়া আর কিছুই নেই। শুধু চা দিলাম।

আর কিছু লাগবে না।

রানু বলল, অপলা তুই ঘরে যা আমি একটু কথা বলছি।

অপলা বিব্রত ভঙ্গিতে ঘরে গেল। ওসমান সাহেব তাকালেন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। রানু বলল, আমি একটি চাকরি পেয়েছি। কাজেই তুমি মাসে মাসে যে টাকাটা আমাকে দিতে সেটা আর দিতে হবে না।

চাকরিটা কী ?

সেটা দিয়ে তোমার তো কোনো দরকার নেই। তোমার স্ত্রী হিসেবে আমি যদি নিচুধরনের কাজ করতাম তাহলে হয়তো তোমার অহঙ্কারে লাগত। এখন তো অহঙ্কারে লাগার কোনো প্রশ্ন নেই।

তুমি ভুল করছ রানু, আমি অহঙ্কারী না।

বাজে কথা বলবে না।

তিনি চুপ করে গেলেন। রানু থমথমে গলায় বলল, কেন তুমি আমাকে তোমার বাবার কাছে এরকম একটা কায়দা করে পাঠালে ?

কী কায়দা ?

মিলি এসে বলল উনি খুব অসুস্থ। মৃত্যুশয্যায়। আমাকে এবং টগরকে দেখতে চান। আমি ঠিক সেইদিনই গেলাম দেখা করতে। গিয়ে দেখি দিব্যি সুস্থ মানুষ। বাগানে ফুলগাছ লাগাচ্ছেন। আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে লাগলেন যেন আমাকে চেনেন না, এই প্রথম দেখলেন। টগর ফুলগাছে হাত দিয়েছিল বলে ধমক দিলেন। বিশ্রী গলায় ধমক।

উনি বুড়ো মানুষ। তুমি নিজেও জানো তার মাথা পুরোপুরি ঠিক না। তাছাড়া যা ঘটেছে আমাকে বাদ দিয়েই ঘটেছে। মিলি প্রচুর মিথ্যা কথা বলে। তুমি তো মিলির স্বভাবও জানো। জানো না ?

না, আমি তোমাদের কারও স্বভাবই জানি না। তোমার নিজের স্বভাব বুঝতে আমার ছ' বছর লেগেছে।

বুঝতে পারলে কিছু ?

হ্যাঁ, তোমারটা বুঝেছি।

ভালো। বুঝতে পারাই উচিত। তুমি বুদ্ধিমান মেয়ে।

ওসমান সাহেব উঠে দাঁড়ালেন, আজ যাই। রানু তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, খুব তাড়া মনে হয়, কোথায় যাচ্ছ, মনিকার কাছে ?

হ্যাঁ, ওর কাছে যাব একবার।

সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হবে ? আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু কী ? সতীনাথ ভাদুড়ি না মানিক বাবু ?

তিনি ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আজ তুমি নানা কারণে উত্তেজিত। কাজেই বেশিক্ষণ থাকতে চাই না।

মনিকা কখনো উত্তেজিত হয় না, তাই না ?

হবে না কেন, সেও হয়। আমরা সবাই নানা কারণে উত্তেজিত হই।

ওসমান সাহেব অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, রানু তার সঙ্গে সিঁড়ি পর্যন্ত এসেছে। তিনি শান্তস্বরে বললেন, টগরকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও। রানু তার জবাব দিল না।

টগরের ঘুম ভাঙল ছ'টার দিকে। ভালো মানুষের মতো কাপে করে মালটোভা খেল। তার কিছুক্ষণ পরই ঘর ভাসিয়ে বমি করল। অপলা বলল, খারাপ লাগছে নাকি টগর ?

না।

চল আমরা ডাক্তারের কাছে যাব। আয় শার্টটা বদলে দিই। তার আগে চল মুখ ধুইয়ে দিই।

টগর বাধ্য ছেলের মতো অপলার সঙ্গে সঙ্গে গেল। বাথরুমে ঢুকেই গলার স্বর নিচু করে বলল, আজ কি বুধবার খালামণি ?

হ্যাঁ। কেন ?

টগর আর কোনো কথা না বলে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে আয়নায় তার দাঁত দেখতে লাগল। উপরের পাটির একটি দাঁত নেই। কেমন অচেনা দেখাচ্ছে তাকে। অপলা বলল, দাঁত তোলার সময় ব্যথা লেগেছিল ? টগর তার জবাব না দিয়ে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করল, আজ কী বার খালামণি ? বুধবার ?

মনিকার ওখানে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা ওসমান সাহেবের ছিল না। তবু ওদিকেই রওনা হলেন। ঘরে ফিরে কিছু করবার নেই। ফিরতেও ইচ্ছা করছে না।

মনিকাদের বাড়ির সামনে নবীর লাল গাড়িটি দাঁড়িয়ে আছে। কোথায় যেন পড়েছিলেন অন্ধকারে বস্তুর কোনো রঙ থাকে না। সব হয়ে যায় ধূসর বর্ণ। কিন্তু তিনি অন্ধকারেও গাড়ির লাল রঙ দেখতে পেলেন। কিংবা এই গাঢ় লাল রঙ তাঁর স্মৃতিতে ছিল। এখন যা দেখছেন তার কিছুটা আসছে স্মৃতি থেকে, কিছুটা সত্যি সত্যি দেখছেন।

গাড়ি গেটের বাইরে কেন ? ওসমান সাহেব একধরনের অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। চিত্রটি ঠিক মিলছে না। নবী তার গাড়ি গেটের বাইরে রেখে মনিকার সঙ্গে দেখা করতে আসবে না। এই জিনিস ওর চরিত্রে নেই। বুড়ো দারোয়ান উঠে দাঁড়িয়ে বিনীত ভঙ্গিতে সালাম করল। ওসমান সাহেব বললেন, রহমত ভালো আছ ? রহমতের মাথা অনেকখানি নিচু হয়ে গেল।

মেম সাহেব আছেন ?

জি আছেন।

তোমার শরীর এখন সেরেছে তো ?

জি স্যার।

ব্যথা হয় না আর ?

আগের মতো হয় না।

রহমত তাঁর সঙ্গে হেঁটে হেঁটে বাড়ির সিঁড়ি পর্যন্ত এল। এই লোকটিও তাঁকে খুবই পছন্দ করে। কেন করে কে জানে। ওসমান সাহেব এসব ছোটখাটো ব্যাপার লক্ষ করেন। আজও লক্ষ করলেন রহমত এগিয়ে গিয়ে অসহিষ্ণুভাবে পরপর তিনবার কলিংবেল টিপল। তিনি ভালোই জানেন ফেরার সময়ও সে হেঁটে হেঁটে তাঁর সঙ্গে বড় রাস্তা পর্যন্ত যাবে। কথাবার্তা বিশেষ কিছু বলবে না।

মানুষের ভালোবাসা কখনো নিঃস্বার্থ নয়। রহমতের ভালোবাসা কি নিঃস্বার্থ ? তিনি কখনো এ ব্যাপারটি নিয়ে গভীরভাবে ভাবেননি। ভাবতে হবে।

মনিকা দরজা খুলে ছোট করে হাসল। যেন সে তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। মনিকার গায়ে হালকা নীল রঙের সুতির শাড়ি। গলায় লাল একটা মাফলার। আবার ঠান্ডা লেগেছে বোধহয়। মনিকার ঘনঘন ঠান্ডা লাগে।

ভালো আছ মনিকা ?

ভালোই ছিলাম। ঘণ্টাখানেক আগে থেকে আর ভালো নেই। নবী এসেছে, বড্ড পাগলামি করছে।

তিনি কিছুই বললেন না। মনিকা বলল, আজ আমি ওকে স্ট্রেইট বলেছি, আমার বাড়িতে আর আসবে না।

সে তো আগেও বলেছ।

আজ যেভাবে বলেছি সেভাবে আগে কখনো বলিনি। আজ সত্যি সত্যি বিরক্ত হয়েছি।

ওসমান সাহেব বসার ঘরে কাউকে দেখলেন না। একবার ভাবলেন জিজ্ঞেস করবেন, নবী কোথায় ? তাও করলেন না। মনিকা গম্ভীর গলায় বলল, তুমি খানিকক্ষণ একা একা বসো। আমি চুল বেঁধে আসি।

তিনি প্রায় দু'মাস পর এলেন। মনিকা একবারও জিজ্ঞেস করল না, এত দিন আসা হয়নি কেন ? মনিকার কিছু বিচিত্র ব্যাপার আছে।

এই বসার ঘরটিতে ওসমান সাহেব ঠিক সহজ বোধ করেন না। সবকিছু বড় বেশি গোছানো। কার্পেটের রঙ টকটকে লাল। এই রঙ রক্তের কথা মনে করিয়ে দেয়। রক্তের ওপর পা রাখতে তাঁর ভালো লাগে না।

ওসমান সাহেব সিগারেট ধরাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই কাজের মেয়েটি ট্রে-তে করে এক গ্লাস পানি রেখে গেল। রুপোর গ্লাস। খুবই ঠান্ডা পানি। গ্লাসের চারদিকে বিন্দু বিন্দু পানি জমেছে, যা দেখা মাত্র তৃষ্ণা পায়। ওসমান সাহেব তৃষ্ণার্তের মতো পানি খেলেন। কাজের মেয়েটি বলল, আর এক গ্লাস পানি আনি ?

না, আর লাগবে না।

চা আনব ?

না, চা আনতে হবে না।

ওসমান সাহেব লক্ষ করলেন, মেয়েটি হাসি চাপতে চেষ্টা করছে। তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। মেয়েটির মুখে হাসি দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল। শঙ্কার ছাপ পড়ল। সে গ্লাস নিয়ে দ্রুত সরে পড়ল।

প্রথম যেদিন এ বাড়িতে এসেছিলেন সেদিন ওসমান সাহেব সোফায় বসে পানি খেতে চেয়েছিলেন।

দ্বিতীয়বারেও তাই। এরপর থেকে আর চাইতে হয় না। পানি আসে। তিনি ঘড়ি দেখলেন। সাড়ে ন'টা। আর মনে হচ্ছিল রাত অনেক। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। কোনো কোনো বাড়িতে পা দেওয়া মাত্র মনে হয় ঘড়ির কাঁটা অনেকদূর এগিয়ে গেছে।

মনিকা আসতে খুব দেরি করছে। তিনি বসে আছেন একা একা। এটি নতুন কোনো অভিজ্ঞতা নয়। মনিকার ব্যবহারে কোথায় যেন একটি অবহেলার ভাব আছে। প্রথম যখন এ বাড়িতে এলেন সেদিনই ব্যাপারটা চোখে পড়েছিল। যদিও সেদিন মনিকা এগিয়ে এসে সবাইকে হতচকিত করে পা ছুঁয়ে সালাম করল। নবী ছিল সঙ্গে। সে অবাক হয়ে বলল, এ-কী কাণ্ড, সে কি রবি ঠাকুর নাকি ? আমি তো জানি একমাত্র রবি ঠাকুরকেই লোকজন পা ছুঁয়ে প্রণাম করত। মনিকা বলেছিল, আমি স্কুল পড়ার সময় ভেবে রেখেছিলাম যদি কোনোদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয় আমি সালাম করব। ওসমান সাহেব অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। মনিকা সহজ স্বরে বলল, ক্লাস টেনে যখন পড়ি ঠিক করলাম যদি উনি অবিবাহিত হন তাহলে তাঁকে গিয়ে বলব—আমাকে বিয়ে করুন। নবী ঘর ফাটিয়ে হাসতে লাগল। ওসমান সাহেবের মনে হলো হাসি স্বতঃস্ফূর্ত নয়। কষ্ট করে হাসা। নবীকে তিনি কখনো এভাবে হাসতে দেখেননি।

সে-রাতে মনিকার সঙ্গে গল্প-উপন্যাস নিয়ে কোনোই আলাপ হয়নি। মনিকার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল তার সমস্ত উৎসাহ মিইয়ে গেছে। সে পাকা আমের আচার বানানোর কী একটি পদ্ধতি নিয়ে গল্প করতে শুরু করল। এবং একসময় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমার প্রচণ্ড মাথাব্যথা হচ্ছে। কিছু মনে করবেন না, আমি কিছুক্ষণ শুয়ে থাকব। ওসমান সাহেব অপমানিত বোধ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও আবার একদিন এলেন নবীর সঙ্গে। সেদিনই মনিকার এরকম আলগা আলগা ভাব। তার পরেও তিনি এলেন। কেন এলেন ? কেন বারবার আসেন ?

ওসমান সাহেব দ্বিতীয় সিগারেটটি ধরাবারও অনেকক্ষণ পর মনিকা এল। অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম ? কাজের মেয়েটি চুল টেনে দিচ্ছিল, আরাম লাগছিল খুব। তোমায় পানি দিয়ে গেছে ?

হ্যাঁ

আরও লাগবে ?

না, লাগবে না। নবী কোথায় ?

গেস্টরুমে ঘুমুচ্ছে। বমি-টমি করে বিশ্রী কাণ্ড। যে জিনিস সহ্য হয় না সে জিনিস কেন খায় ?

মনিকা বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকাল। ওসমান সাহেব বললেন, তোমার হাসবেন্ডের কোনো খবর পেয়েছ ?

না।

তিনি আছেন কেমন ?

আগের মতোই আছে। লাংস টলারেন্স, ইসিজি সবকিছুই হয়েছে। শরীরে কোনো অসুখ নেই। ডাক্তাররা বলছেন সাইকো সিমেটিক। মনের রোগ। কিন্তু সে সেটা বিশ্বাস করছে না। আরও বড় ডাক্তার দেখাতে চায়।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, মানসিক রোগীদের এই প্রবলেম। তারা কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না রোগটা মনে, শরীরে নয়। তুমি চা খাবে ?

না।

খাও এক কাপ। সিলোনিজ টি। খুব চমৎকার ফ্লেভার।

তিনি হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না। মনিকা কাজের মেয়েটিকে চায়ের কথা বলে তাঁর সামনে এসে বসল। তার বসে থাকার ভঙ্গিতে কোনো আড়ষ্টতা নেই। সে কোনো কথা বলছে না। কথা না বলে কোনো মেয়ে চুপচাপ বসে থাকলে সমস্ত পরিবেশ আড়ষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মনিকার বেলায় হয় না।

কাজের মেয়েটি বলল, উনার ঘুম ভাঙছে। আপনারে ডাকে।

মনিকা কঠিনস্বরে বলল, তাকে এ ঘরে আসতে বলো। বলো তার বন্ধু এসেছে—ওসমান সাহেব।

নবী লম্বায় প্রায় ছ'ফুট। গায়ের রঙ শ্যামলা। মেয়েলি ধরনের মুখ। চেহারায় কাঠিন্য আনবার জন্যে সে নানান সময় নানান কায়দাকানুন করেছে। একবার জুলফি রেখেছে, একবার গোঁফ রেখেছে। কিছুদিন ফ্রেঞ্চকাট দাড়িও ছিল। লাভ হয়নি। কোনো এক বিচিত্র কারণে তার চেহারা থেকে ছেলেমানুষি দূর হয়নি।

যৌবনে দুর্দান্ত কিছু কবিতা লিখেছিল। হঠাৎ এক রাতে ঠিক করল কবিতা মেয়েদের ভাষা, কবিতায় কাঠিন্য নেই। প্রতীক, উপমা এইসব ছেলেমানুষি ব্যাপার। কাজেই সে চলে এল গদ্যে। লিখল 'দুপুর' নামের উপমা ও প্রতীক বিবর্জিত উপন্যাস। প্রচুর লেখালেখি হলো দুপুর নিয়ে। সমালোচকদের কেউ কেউ উল্লসিত হলেন। কেউ কেউ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কোন বিদেশি ঔপন্যাসিকের ছাপ পড়েছে সেটা বের করবার জন্যে। কবিখ্যাতি তেমন না জুটলেও কথাশিল্পীর স্বীকৃতি পাওয়া গেল। পুরোপুরি সাহিত্যে নিবেদিত না হলে কিছু লেখা যাবে না এই ভেবে নবী চাকরি ছেড়ে দিল। পরবর্তী তিনবছর একটি লাইনও লিখল না। ইদানীং সে বলছে, নাটক হচ্ছে সাহিত্যের সবচেয়ে পরিশীলিত রূপ। যে-কোনো এক শুভদিনে নাটক লেখা শুরু হবে—এই ধরনের কথা শোনা যাচ্ছে গত ছ'মাস ধরে। এখনো কিছু লেখা হয়নি। শুভদিন এখনো আসেনি। নবী ঘরে ঢুকল অপ্রসন্ন মুখে, মনিকার আজকের ব্যবহারে সে খুবই বিরক্ত হয়েছে। মনিকা বলেছিল, তুমি হুট করে ভিতরের ঘরে ঢুকবে না। এটা ভালো দেখায় না। এ কেমন কথা! মনিকা তার ফুফাতো বোন, এবাড়িতে সে আসছে ছেলেবেলা থেকে। মনিকার স্বামী তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন। নবী অবাক হয়ে বলল, তুমি চাও না আমি এ বাড়িতে আসি ?

আসতে ইচ্ছা হলে আসবে। তবে হুট করে শোবার ঘরে ঢুকবে না এবং মাতাল অবস্থায় আসবে না।

নবী অবাক হয়ে বলল, মাতাল বলছ কাকে ? মাতাল কাকে বলে জানো ?

মনিকা ঠান্ডা গলায় বলল, মাতালের ডেফিনেশন নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। তবে মাতাল আমার চেয়ে ভালো কেউ চেনে না। তোমার চাউনি দেখেই বুঝতে পারছি তুমি এক্ষুনি বমি করবে।

বমি করব ?

হ্যাঁ।

তোমার ধারণা বমি করব ?

একমাত্র মাতালরাই প্রতিটি কথা দু'বার করে বলে। তুমি দয়া করে বাথরুমে যাও।

আমি আরও দশ পেগ খেতে পারি, তা জানো ?

খেতে পারলে তো ভালোই।

মনিকা তীক্ষ্ণকণ্ঠে হেসে উঠল। এবং আশ্চর্য, নবীকে কিছুক্ষণের মধ্যে সত্যি সত্যি বাথরুমে ছুটে যেতে হলো। মনিকা মাতাল চেনে।

ওসমান সাহেব নবীর দিকে তাকালেন। নবী সে চাউনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মনিকাকে বলল, খিদে লেগেছে। কিছু খাব!

কিছুক্ষণের মধ্যেই টেবিলে ডিনার দেওয়া হবে। এখন একটু ভালো লাগছে ?

নবী তার জবাব না দিয়ে ওসমান সাহেবের পাশে গম্ভীর মুখে বসল। ওসমান সাহেব বললেন, কেমন আছেন ?

ভালো।

নাটকের কাজ কেমন এগুচ্ছে ?

ধরিনি এখনো। আমি তো আপনার মতো না যে এক সপ্তাহে দু'টা উপন্যাস নামিয়ে দেব। আমি কম লিখব, কিন্তু যা লিখব ভালো লিখব।

মনিকা হালকা গলায় বলল, তোমার ধারণা উনি ভালো লিখছেন না ?

পাঠযোগ্য লেখা মানেই ভালো লেখা না। ডিটেকটিভ উপন্যাস তরতর করে পড়া যায়।

তুমি এটা বলছ ঈর্ষা থেকে।

ঈর্ষা ? কিসের ঈর্ষা ? আমি ঈর্ষা করি মানিক বাবুকে, ওসমান সাহেবকে ঈর্ষা করব কেন ? তা ছাড়া ঈর্ষা একটা মেয়েলি ব্যাপার। পুরুষমানুষের ঈর্ষা থাকে না।

ওসমান সাহেব ঘড়ি দেখে বললেন, আমি আজ উঠি।

নবীর মুখ গম্ভীর। মনিকা খানিকটা অপ্রস্তুত বোধ করছে। সে কিছু বলল না। নবী বলল, আমিও উঠব।

মনিকা বলল, খিদে লেগেছে বলেছিলে।

এখন খিদে নাই।

ভাত খেয়ে বিশ্রাম নাও। ড্রাইভার তোমাকে পৌঁছে দেবে। তুমি নিজে নিজে ড্রাইভ করে যেতে পারবে না।

আমি ঠিকই পারব। তুমি সব ব্যাপারে আমাকে আন্ডার এস্টিমেট করো।

সব ব্যাপারে করি না। কিছু কিছু ব্যাপারে করি।

নবীর মুখ আরও গম্ভীর হলো। সে ওসমান সাহেবের দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা গলায় বলল, আমার ওপর যদি ভরসা থাকে তাহলে আমি আপনাকে একটা লিফট দিতে পারি। মাতালের গাড়িতে চড়বেন ?

ওসমান সাহেব হাসলেন। তিনি রাজি আছেন।

নেশাগ্রস্ত ড্রাইভারদের প্রবণতা হচ্ছে স্পিড বাড়ানো। সবাইকে দেখানো যে ঠিক আছে। গাড়ি চালানোয় কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু নবীর গাড়ি চলছে খুব ধীরে। সে বড় রাস্তায় না ওঠা পর্যন্ত কোনো কথা বলল না। তাকে দেখে মনে হলো সে খুবই চিন্তিত। ওসমান সাহেব বসে আছেন চুপচাপ। একবার শুধু বললেন, আমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার দরকার নেই। রাস্তার মোড়ে নামিয়ে দিলেই চলবে। নবী তার জবাব না দিয়ে হঠাৎ গাড়ির গতি অনেকখানি বাড়িয়ে দিল।

নবীকে তিনি পছন্দ করেন ? এই প্রশ্নটি অনেকবার নিজেকে করেছেন। কখনো ঠিক জবাব পাননি। আজও পেলেন না। ওসমান সাহেব 'দুপুর' উপন্যাসটি পড়েছেন। এটি একটি প্রথমশ্রেণীর রচনা। এক মসজিদের পেশইমাম, জোনাব আলী, এক দুপুরে ঠিক করল একটি খুন করবে। সে সিন্দুকের ভেতর থেকে গরু কোরবানির প্রকাণ্ড ছুরিটি বের করে ধার দিতে বসল। কাকে সে খুন করবে উপন্যাসের কোথাও তা বলা হলো না।

নানান চরিত্রকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো একে একে এবং মনে হলো এদের সবাইকে খুন করা যেতে পারে। যে লোক এমন একটি জটিল বিষয়কে এত চমৎকার ভঙ্গিতে উপস্থিত করতে পারে তাকে পছন্দ করতেই হয়। ওসমান সাহেব হঠাৎ করে বললেন, নবী সাহেব, আপনি কি আমার কোনো লেখা পড়েছেন ?

সেন্টিমেন্টাল লেখা আমি পড়ি না। আপনার একটা লেখা পড়তে চেষ্টা করেছিলাম, মেয়েলি জিনিসে এমন ঠাসা যে গা ঘিনঘিন করে। মেয়েদের গায়ের গন্ধ পাওয়া যায়।

মেয়েদের গায়ের গন্ধ খুব কি খারাপ ?

না, খারাপ না। ভালো। কিন্তু উপন্যাসে উঠে এলেই খারাপ। আধুনিক কালের সাহিত্যে সেন্টিমেন্টের কোনো ব্যবহার থাকা উচিত নয়। একালের লেখা হবে জার্নালিস্টিক।

ওসমান সাহেব তর্কে গেলেন না। নবী বলল, আপনি রাগ করলেন নাকি ?

না।

আমি যা বললাম তা কি স্বীকার করেন ?

পুরোপুরি না করলেও কিছু করি।

আপনার জীবদ্দশাতেই যখন আপনার লেখা কেউ পড়তে চাইবে না, তখন পুরোপুরি স্বীকার করবেন।

নবী গাড়ি বাড়ির সামনে এনে রাখল। ওসমান সাহেব বললেন, নামবেন ? খিদের কথা বলেছিলেন। আমার সঙ্গে খেতে পারেন। নবী থেমে থেমে বলল, আমি আপনার এখানে খাব না। আমি এখন আবার মনিকার ওখানে যাব।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। আমি বের হয়ে এসেছি আপনাকে বের করে আনার জন্যে।

ওসমান সাহেব তাকিয়ে রইলেন। নবী বলল, ওকে আজ আমি একটা কথা বলব। সুস্থ অবস্থায় কথাটা বলার চেষ্টা করেছি। বলতে পারিনি। সেজন্যেই পাঁচ পেগ হুইস্কি খেয়ে গিয়েছিলাম। বুঝতে পারছেন ?

পারছি।

জানতে চান ?

না, আমি জানতে চাই না।

জানতে না চাইলেও আমি আপনাকে শোনাতে চাই। লিসেন কেয়ারফুলি। আমি মনিকাকে বিয়ে করতে চাই। এই কথাটি আজ তাকে বলব। তার হাসবেন্ড থাকুক না-থাকুক তাতে কিছু আসে যায় না। বুঝতে পারছেন ?

বুঝতে চেষ্টা করছি।

আপনার ধারণা মদের ঝোঁকে এসব বলছি ?

বলতেও পারেন। অনেকে বলে। এ নিয়ে আমি ভাবছি না।

নবী হিসহিস করে বলল, আমি ষাট মাইল স্পিডে গাড়ি চালিয়ে যাব এবং মরব না। এতেই প্রমাণ হবে আমি মাতাল নই। কী বলেন ?

সে একসিলেটারে চাপ দিল। গাড়ি লাফিয়ে উঠল।

৬

মিলি চুপি চুপি তার স্টিলের আলমারি খুলল। তার ভাবভঙ্গি অনেকটা চোরের মতো। দরজা ভেজিয়ে দিয়েছে। সব ক'টা পর্দা টেনেছে এবং এমনভাবে আলমারির সামনে আছে যাতে চট করে আড়াল করা যায়। তবু তার হাত কাঁপছে। সে ঘনঘন তাকাচ্ছে ভেজানো দরজার দিকে।

মিলি ভয়ে ভয়ে তার টিনের কৌটা খুলল। ঘুমের ওষুধগুলি সে গুনবে। মাঝে মাঝেই সে গুনে দেখে ক'টা হলো। এর আগেরবার ছিল তেত্রিশটি, এরপরও সে ছ'টি কিনেছে। তার মানে উনচল্লিশটি হওয়া উচিত, কিন্তু একচল্লিশটি হচ্ছে। সে আবার গুনতে শুরু করল, ঠিক তখন ঢুকল মতিয়ুর রহমান।

বিদ্যুৎগতিতে আলমারি বন্ধ করে মিলি হাসল। ফ্যাকাশে হাসি। তার মুখও শুকনো। মতিয়ুর রহমান কিছু লক্ষ করল না। ঘরে একটি ইজিচেয়ার আছে। সে সেখানে বসে সিগারেট ধরাল। ঠান্ডা গলায় বলল, ফ্যানটা বাড়িয়ে দাও তো মিলি।

মিলি ফ্যান বাড়িয়ে দিল।

খাওয়াদাওয়া হয়েছে ?

মিলি মাথা নাড়ল। সে খেয়েছে। এ বাড়িতে অনেক মানুষজন। দু'তিনবারে খাওয়া হয়। সে বাচ্চাদের সঙ্গে প্রথমবারে খেয়ে নেয়। তার শাশুড়ি পছন্দ করেন না।

ননদরা হাসাহাসি করে। কিন্তু সে না খেয়ে পারে না। সন্ধ্যা মিলাতেই তার ভাতের খিদে পেয়ে যায়।

শুয়ে পড়া যাক তাহলে, কী বলো ?

মিলি কিছু বলল না। তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইল। মতিয়ুর অন্যরকমভাবে তার দিকে তাকাচ্ছে। যার অর্থ পরিষ্কার। সে ঘুমুতেও এসেছে সকাল সকাল। সে এখন বেশ কিছুক্ষণ হালকা গলায় কথাবার্তা বলবে। মিলি কিছু বলার থাকলে শুনবে। মিলি বলল, ভাইয়ার ছেলেটার জ্বর।

তাই নাকি ?

হুঁ। বেশ জ্বর।

জ্বর-টর হচ্ছে চারদিকে। বর্ষার শুরুতে হয় এসব। ডাক্তার দেখাচ্ছে ?

দেখাচ্ছে। হয়তো হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। তাহলে অবশ্যি ভালোই হয়।

ভালো হয় কেন ?

ছেলের অসুখের কারণে বাবা-মা কাছে আসবে। সমস্যা মিটে যাবে।

মতিয়ুর কিছু না বলে আরেকটি সিগারেট ধরাল। মিলি টেনে টেনে বলল, বাচ্চাদের অসুখবিসুখে বাবা-মা মাথা ঠিক রাখতে পারে না। তাই না ?

জানি না। ওদের তো লিগাল সেপারেশন হয়ে গেছে। হয়নি ?

হুঁ। তাতে কী ?

মতিয়ুর বলল, বাতিটা নিভিয়ে ব্লু বাতিটা জ্বেলে দাও।

মিলি অস্পষ্টভাবে একটি নিঃশ্বাস ফেলল। কড়া আলো নিভিয়ে নীল আলো জ্বালাল। দরজা বন্ধ করল এবং মুদুস্বরে বলল, কাপড় খুলে ফেলব ?

মতিয়ুর জবাব দিল না। রাগী চোখে তাকাল। মিলির প্রায় কান্না এসে যাচ্ছিল। সে কান্না থামিয়ে শাড়ি খুলতে শুরু করল। ঘরভর্তি আলো। সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কী লজ্জার ব্যাপার। মিলি ক্ষীণস্বরে বলল, এই বাতিটাও নিভিয়ে দেই ?

দরকারটা কী, থাক না।

মিলি বড় একটি নিঃশ্বাস গোপন করল। সব বিবাহিত মেয়ের জীবনই কি এরকম ? বিশেষ বিশেষ দিনে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে তারাও কি বসে থাকে স্বামীর সঙ্গে ? তাদের স্বামীরাও কি সিগারেট টানতে টানতে লজ্জায় জড়সড় হয়ে যাওয়া স্ত্রীর দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ? এসব কি কাউকে জিজ্ঞেস করা যায় ? ছিঃ। তার নিজের মেয়েটির কথা ভেবে সে এই কারণেই কষ্ট পায়। তার জীবনও কি এরকম হবে ? যদি হয় সেটা খুব দুঃখের ব্যাপার হবে। মিলি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। মতিয়ুর আরেকটি সিগারেট ধরিয়েছে। এটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার করণীয় কিছু নেই।

বাবু কি কেঁদে উঠল নাকি ? মিলি কয়েক মুহূর্ত উৎকর্ণ হয়ে রইল। না, বাবুর কান্না নয়। অবশ্যি সে কাঁদলেও মিলির কিছু করার নেই। তার শাশুড়ি বাবুর দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়েছেন। মিলির নাকি শিশুপালনের ক্ষমতা নেই। কবে নাকি বাবু কেঁদে কেঁদে

সারা হয়েছে, তার ঘুম ভাঙেনি। হবে হয়তো। মাঝে মাঝে তার খুব ঘুম পায়। এখন অবশ্যি রাতগুলি জেগেই কাটে সারাক্ষণ, মনে হয় এই বুঝি বাবু কাঁদছে। এই বুঝি বিছানা থেকে গড়িয়ে পড়ল।

মিলি।

উঁ।

পানি দাও তো এক গ্লাস।

পানির জগ ও গ্লাস আরেক মাথায়। মিলির কি এই অবস্থায় হেঁটে হেঁটে পানির গ্লাস আনতে যেতে হবে ? গায়ে কোনো কাপড় জড়াতে পারবে না। কারণ তাতে মতিয়ুর রাগ করবে। মিলি উঠে দাঁড়াল। আয়নায় তার শরীরের ছায়া পড়ছে। সেই ছায়াটি কি সুন্দর ? ওর কাছে কি সুন্দর লাগছে ? মিলি জানে না। তার জানতেও ইচ্ছা করে না। সে এগিয়ে যায় পানির গ্লাস আনতে। মতিয়ুর রহমান সিগারেট ফেলে উঠে দাঁড়ায়।

৭

ফয়সল সাহেব ডেনটিস্টের কাছে গিয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছে উপরের পাটির একটি দাঁত তুলে ফেলতে হবে। মাঝে মাঝেই ব্যথা হচ্ছে। অসহ্য ব্যথা নয়, চিনচিনে ব্যথা। ঠান্ডা পানি খেতে পারেন না। দাঁত শিরশির করে।

অল্পবয়স্ক ডেনটিস্ট তাঁকে অবাক করল। সে গম্ভীর হয়ে বলল, আপনার দাঁত তো ঠিক আছে। শুধু শুধু তুলতে চান কেন ? চমৎকার দাঁত, হেসেখেলে আরও দশ বছর যাবে। এনামেল নষ্ট হয়েছে, সেজন্যেই ঠান্ডা পানি খেতে পারেন না, এটা কিছুই না।

ফয়সল সাহেব হৃষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরলেন। রিকশা নিলেন না। দেড় মাইল রাস্তা হাঁটলেন। এই বয়সে হাঁটা ভালো। ব্লাড সার্কুলেশন ভালো হয়। হার্ট ঠিক থাকে। ভাদ্র মাসের কড়া রোদে তাঁর খানিক কষ্ট হলো। কিন্তু মনে আনন্দ। আনন্দ থাকলে কোনো কষ্টকেই কষ্ট মনে হয় না। তাঁর ধারণা হলো তিনি দীর্ঘদিন বাঁচবেন। আরও দশ বছর তো বটেই। দশ বছর খুব কম সময় নয়। দীর্ঘ সময়। তাঁর খুব বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে। মৃত্যুর মতো একটা ভয়াবহ ব্যাপারকে যত ঠেকিয়ে রাখা যায় ততই ভালো।

কাবুল মিয়া ফয়সল সাহেবকে দেখেই ছুটে গিয়ে গেট খুলে দিল। কাবুল মিয়া ফয়সল সাহেবের বুইক গাড়ির ড্রাইভার। এই গাড়ি গত দু'বছর ধরে নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। ফয়সল সাহেব সারাচ্ছেন না। অবশ্যি কাবুল মিয়ার চাকরি ঠিকই আছে। খাওয়াদাওয়া এবং বেতন ঠিকমতোই পাচ্ছে। তার বর্তমান চাকরি হচ্ছে বারান্দায় পা ছড়িয়ে ঘুমানো এবং হঠাৎ কোনো কোনোদিন ছুটে গিয়ে গেট খুলে দেওয়া। অবশ্যি এই বিশেষ কাজটি সে শুধু ফয়সল সাহেবের জন্যেই করে। তার নিজের পদমর্যাদা সম্পর্কে সে অত্যন্ত সচেতন।

ফয়সল সাহেব হাসি মুখে বললেন, কী খবর কাবুল মিয়া ? কাবুল মিয়ার বিস্ময়ের সীমা রইল না। বড় সাহেব এই সুরে কখনো কথা বলেন না।

ভালো তো কাবুল মিয়া ?

জি স্যার।

তোমায় গাড়িটা তো ঠিকঠাক করতে হয়।

কাবুল মিয়া হাত কচলাতে লাগল।

বাগানের এই অবস্থা কেন ?

কাবুল মিয়া কী বলবে ভেবে পেল না। মালিকে ফয়সল সাহেব নিজেই গত মাসে বিদায় করেছেন। এমনিতেই বাগানের অবস্থা কাহিল ছিল। মালি চলে যাওয়ার পর মরুভূমি হয়ে গেছে।

বাগান সাজাতে হবে—বুঝলে কাবুল মিয়া। শীত এসে যাচ্ছে। ফ্লাওয়ার বেড তৈরি করতে হবে। ঝামেলা আছে। আছে না ?

জি স্যার, আছে।

তিনি উৎফুল্ল মনে দোতলায় উঠে শিশুদের গলায় ডাকলেন, বীথি! বীথি!

বাড়ির সবাই ফয়সল সাহেবের এই পরিবর্তন লক্ষ করল। এ বাড়িতে অনেক লোকজন। বেশিরভাগই আশ্রিত। আশ্রিত লোকজন গৃহকর্তার মেজাজের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখে। তাদের মেজাজও গৃহকর্তার মেজাজের সঙ্গে ওঠানামা করে। কাজেই এ বাড়ির সবার মনেই সুবাতাস বইল। যদিও সবাই জানে এ সুবাতাস ক্ষণস্থায়ী। ফয়সল সাহেবের মেজাজ খুব বেশি সময় ঠিক থাকে না। কে জানে হয়তো আজ সন্ধ্যার মধ্যেই তিনি উলটে যাবেন।

কিন্তু তিনি উল্টালেন না। সন্ধ্যাবেলায় তাঁকে দেখা গেল বীথির সঙ্গে। ইজিচেয়ারে কাত হয়ে শুয়ে আছেন। বীথি কিছু বলছে না। তিনি একাই কথা বলছেন।

বুঝলে বীথি, ব্রিটিশ আমলে নাইনটিন ফর্টিসিক্স কিংবা ফর্টিফাইভে একটা স্ট্রেঞ্জ মামলা হয়। দুই ভদ্রলোক একই সময়ে একটা ছেলের পিতৃত্ব দাবি করে মামলা করেন। এদের একজনের নাম রমেশ হালদার। আমি ছিলাম এই রমেশ হালদারের ল'ইয়ার। মামলায় আমরা জিতে যাই। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, রমেশ হালদার ঐ ছেলের বাবা ছিল না বলে আমার ধারণা।

বলেন কী ?

এই যুগে অবশ্যি পিতৃত্ব এস্টাবলিশ করা খুব সোজা। ডিএনএ টেস্ট করলেই হয়। তখন তো এসব ছিল না। বুঝলে বীথি, মামলাটা ছিল দারুণ ইন্টারেস্টিং।

এইসব লিখে ফেলেন না কেন ?

কথাটা খারাপ বলোনি তো, লেখা যায়।

ফয়সল সাহেব সোজা হয়ে বসলেন। হাসিমুখে বললেন, এইটা আর কি মামলা, একটা মামলা ছিল মেয়েঘটিত। ফিকসান তার কাছে কিছু না।

আপনি স্যার লিখে ফেলেন।

এই বয়সে কি আর লেখা সম্ভব হবে ? কিছু পড়তে গেলেই চোখে স্টেইন পড়ে।

আপনি বলবেন, আমি লিখব।

ফয়সল সাহেবের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি নিজেই বের হলেন খাতা কিনতে।

রাতে টেলিফোন করলেন ছেলেকে। একটি অস্বাভাবিক ঘটনা। ওসমানের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই। পুত্রকন্যাদের খোঁজখবর রাখাকে তিনি চারিত্রিক দুর্বলতা মনে করেন।

ওসমান নাকি ?

জি, কী ব্যাপার।

ব্যাপার কিছু না। তুই আছিস কেমন ?

ভালো। আপনার শরীর কেমন ?

শরীর ভালোই।

কোনো দরকারে টেলিফোন করছেন, না এমনি ?

তোর কাছে আবার আমার কী দরকার ? এমনি করলাম। আচ্ছা শোন, বীথি মেয়েটাকে তোর কেমন লাগে ? আমার সেক্রেটারি। দেখেছিস তাকে ?

না, দেখিনি। শুনেছি মিলির কাছে।

এই বাড়িতেই সে এখন থাকে। নিডি মেয়ে, বিয়ে হয়েছিল। হাসবেন্ডের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

ও, তাই নাকি!

আমার এখানে থাকে বলে তোরা আবার কিছু মনে করিস না তো ?

না, কী মনে করব ?

আচ্ছা রাখলাম।

ফয়সল সাহেব হৃষ্টচিত্তে ঘুমুতে গেলেন। এবং তার কিছুক্ষণ পরই খবর পেলেন টগরের ডিপথেরিয়া হয়েছে বলে ডাক্তাররা সন্দেহ করছেন। তাকে একটা ক্লিনিকে ভর্তি করার জন্যে নেওয়া হচ্ছে।

ফয়সল সাহেবকে দেখে মনে হলো না খবরটি তাঁকে বিচলিত করেছে। তিনি ক্লিনিকে যাওয়ার জন্যে বেশ উৎসাহের সঙ্গে কাপড় বদলাতে লাগলেন। বীথিকে বললেন, গাড়িটা ঠিক করা দরকার। কখন কী দরকার হয়। কালকে আমাকে মনে করিয়ে দিয়ো তো ?

৮

টগরকে ভর্তি করা হয়েছে একটা ক্লিনিকে।

ঝকঝকে তকতকে একটা বাড়ি। হাসপাতাল মনেই হয় না। রোগীটোগীও নেই। তিন নম্বর রুমে একটি মাত্র পেশেন্ট। সেও খুব হাসিখুশি। অল্পবয়সী একজন তরুণী। প্রথম মা হবে। সকালবেলা ব্যথা উঠেছিল, সবাই ব্যস্ত হয়ে নিয়ে এসেছে। ডাক্তার বললেন ফলস্ পেইন। স্বামী ভদ্রলোক নার্ভাসপ্রকৃতির। সে স্ত্রীকে বাড়ি ফিরিয়ে নিতে

রাজি নয়। রাতটা এখানেই কাটাতে চায়। সে পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সিগারেট দিচ্ছে এবং স্ত্রীর ব্যথা ওঠার ব্যাপারটি বলছে। তার মূল বক্তব্য হচ্ছে, দরকারের সময় কাউকে পাওয়া যায় না। তাঁর নিজের গাড়ি আছে। আত্মীয়স্বজনদেরও গাড়ি আছে, কিন্তু তার স্ত্রীকে আনতে হলো রিকশায়। এর নাম ভাগ্য।

ওসমান সাহেব পৌঁছলেন রাত এগারোটায়। ওয়েটিং রুমে অপলা বসে আছে। আর কাউকে দেখা গেল না। বারান্দার সোফায় এক বুড়ো ভদ্রলোক গা এলিয়ে পড়ে আছেন। অপলা বলল, দুলাভাই, আপনার এত দেরি হলো কেন ? ওসমান সাহেব সহজস্বরে বললেন, পিজিতে গিয়েছিলাম। তোমরা কোথায় আছ কেউ বলতে পারল না।

বুঝলেন কী করে আমরা এখানে ?

তোমাদের বাসায় গিয়েছিলাম। রানুর খালার কাছ থেকে ঠিকানা আনলাম। টগর কেমন আছে ?

ভালো আছে। ভয়ের কিছু নেই। ঘুমুচ্ছে। আপনি ভেতরে চলে যান। আপা সেখানে আছে। দু'নম্বর রুম।

আর—সঙ্গে আর কে আছে ?

আর কেউ নেই। যান আপনি ছেলেকে দেখে আসুন।

তিনি সিগারেট ধরালেন এবং বেশ অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, অসুস্থ ছেলের জন্যে যে রকম আবেগ অনুভব করার কথা সে রকম তিনি করছেন না। কিংবা এই ক্লিনিকটি মনের ওপর চাপ ফেলতে পারছে না। হাসপাতাল যে রকম ফেলে।

ওসমান সাহেবের পানির তৃষ্ণা হচ্ছিল। এখানে পানি কোথায় পাওয়া যাবে কে জানে। অপলা বিরক্তস্বরে বলল, দাঁড়িয়ে আছেন কেন ? যান, আপা একা আছে।

তুমি এখানে বসে আছ কেন ?

এমনি, আমার ভালো লাগছে না।

অপলা অন্যদিকে মুখ ফেরাল। ঝগড়া-টগড়া কিছু হয়েছে। মেয়েরা অদ্ভুত অদ্ভুত সময়ে ঝগড়া করতে পারে।

এই ক্লিনিক বিত্তবানদের জন্যে। বেশ বড় বড় রুম। জানালায় সুন্দর পর্দা। প্রশস্ত বেডে ফোমের তোষক। ওসমান সাহেব দেখলেন টগর কাত হয়ে ঘুমুচ্ছে। তার মুখ অস্বাভাবিক বিবর্ণ। গায়ে ধবধবে সাদা একটা চাদর। সাদা চাদর সব সময় মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয়। ওসমান সাহেব মনে মনে ঠিক করলেন, রানুকে বলবেন চাদরটা বদলে দিতে।

রানু খুব ভয় পেয়েছে। সে বসে আছে টগরের মাথার পাশে। কিছুক্ষণ পরপরই টগরকে ছুঁয়ে দেখছে। টগর বেঁচে আছে এ ব্যাপারে সে যেন নিশ্চিত হতে চায়। রানুর চোখের নিচে কালি পড়েছে। সে কাঁপছে অল্প অল্প। এতটা ভয় পাওয়ার মতো সত্যি কি কিছু হয়েছে ? টগর তো ঘুমুচ্ছে বেশ স্বাভাবিকভাবে। ওর ঘুমন্ত মুখে তেমন কোনো যন্ত্রণার ছাপ নেই। কোথায় যেন পড়েছিলেন, শিশুদের মুখে শারীরিক কোনো কষ্টের ছাপ পড়ে না। ওসমান সাহেব মৃদুস্বরে বললেন, ও কেমন আছে ?

ভালো। ঘণ্টাখানেক আগে ঘুমিয়েছে।

গায়ে জ্বর আছে ?

আছে।

তিনি টগরের কপালে হাত রাখতেই সে কেঁপে উঠল। যেন সে বুঝতে পারছে অপরিচিত কারও স্পর্শ। এ হাত মায়ের হাত নয়।

বেশ জ্বর তো গায়ে।

হ্যাঁ। বারোটার সময় আরেক ডোজ ওষুধ পড়বে।

ওসমান সাহেব ইতস্তত করে বললেন, ক্লিনিকের কাউকে বলো সাদা চাদর বদলে একটা রঙিন চাদর দিতে।

কেন ?

এমনি বলছি। কারণ নেই।

রানু কাঁপাগলায় বলল, কারণ নিশ্চয়ই কিছু আছে। তুমি বলো।

সাদা চাদর মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয়।

রানু কয়েক মুহূর্ত স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে টগরের গায়ের চাদর তুলে ফেলল। ওসমান সাহেব শান্তস্বরে বললেন, এত ভয় পাচ্ছ কেন রানু ? ভয়ের কিছু নেই।

তুমি বুঝলে কী করে ভয়ের কিছু নেই ?

তিনি এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। কিন্তু রানু তাকিয়ে আছে আগ্রহ নিয়ে। সে একটা জবাব চায়।

বলো, কী করে বুঝলে ভয়ের কিছু নেই ?

আমার মন বলছে। দেখবে ও সকালের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠবে।

রানু বলল, বারোটা বাজতে কত দেরি বলো তো ?

পনেরো মিনিট।

হলঘরে একজন নার্স আছে, তাকে খবর দাও। বারোটার সময় ওষুধ দিতে হবে। আর শোনো, তুমি কি আত্মীয়স্বজন সবাইকে খবর দিয়েছ ?

না। কাউকেই কিছু বলিনি।

সবাইকে বলো।

দরকার আছে কোনো ?

আছে। নয়তো পরে সবাই রাগ করবে।

কথাটা মিথ্যা নয়। এদেশে অসুখবিসুখ সামাজিক ব্যাপার। যথাসময়ে সবাইকে জানাতে হবে। কেউ যেন বাদ না পড়ে। কাউকে খবর না দেওয়ার মানে হচ্ছে তাকে দাম দেওয়া হয়নি। তুচ্ছ করা হয়েছে।

ওসমান সাহেব ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। নার্সকে দেখা গেল ট্রেতে করে ওষুধপত্র সাজিয়ে আনছে। ক্লিনিকটি মনে হচ্ছে ভালোই। ঘড়ি ধরে সব হচ্ছে। বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি আছে এখনো।

নার্স মেয়েটি মধ্যবয়সী। গায়ের রঙ শ্যামলা। কিন্তু ধবধবে সাদা শাড়ির জন্যে তাকে কালো দেখাচ্ছে। ভালোই লাগছে। মেয়েটির মধ্যে মা মা ভাব আছে।

ওসমান সাহেব হাসিমুখে তাকালেন। মেয়েটি বিরক্ত গলায় বলল, এত মানুষ কেন এখানে ? শুধু একজন থাকবেন। ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করেন। ক্লিনিকের নিয়মকানুন মানতে হবে তো।

মেয়েটির গলার স্বর পুরুষালি। কথা বলার ভঙ্গিটিও বাজে। ওসমান সাহেব ওয়েটিং রুমে চলে এলেন।

অপলা বেঁটেমতো একটি লোকের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। লোকটির হাতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট। সে হাত মুঠো করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে সিগারেট টানছে। ওসমান সাহেব এগিয়ে আসতেই সে হাসিমুখে বলল, স্লামালিকুম স্যার, আবদুল মজিদ আমার নাম। পিডিপিতে কাজ করি।

ভদ্রলোকের গলার স্বর এমন যেন দীর্ঘদিনের পরিচয় তাদের। ওসমান সাহেব অস্পষ্টভাবে হাসলেন।

আপনার কথা শুনলাম স্যার উনার কাছে। বিখ্যাত সাহিত্যিক। আপনাদের সাথে দেখা হওয়া ভাগ্যের কথা। সিগারেট নেন স্যার।

ওসমান সাহেব সিগারেট নিলেন। মজিদ দামি একটা লাইটার বিদ্যুৎগতিতে বের করল। হাসিমুখে বলল, আপনার নাম শুনেছি। লেখা পড়ি নাই। আউট বই পড়ার আমার অভ্যাস নাই। আমি খুবই লজ্জিত।

লজ্জিত হওয়ার কিছু নাই। পড়ার অভ্যাস অনেকের নেই। অনেকে সময়ও পায় না।

আমার স্ত্রী অবশ্যি খুব পড়ে। রাতদিন গল্পের বই নিয়ে আছে। আমাকে রাতে পড়ে শোনাতে চায়। যা মুসিবত। সারা দিন পরিশ্রম করে রাতে একটু ঘুমাব। তা না গল্প শোনো। অন্য মানুষের জীবনের বানানো গল্প শুনে কোনো লাভ আছে স্যার, বলেন ?

না। লাভ আর কী!

এই তো আপনি স্বীকার করলেন। অনেস্টলি এডমিট করলেন। নিজে সাহিত্যিক হয়েও করলেন। আপনি স্যার গ্রেটম্যান।

অপলা হাসছে মুখ টিপে। ওসমান সাহেব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। মজিদ ক্রমাগত কথা বলে যেতে লাগল। তার স্ত্রীর ব্যথা কীভাবে উঠল, কত ঝামেলা করে আসতে হলো এখানে। এসে দেখা গেল ফলস পেইন। আসার সময় আত্মীয়স্বজন কাউকেই খবর দেওয়া হয়নি। এখান থেকে টেলিফোন করারও উপায় নেই। কারণ তার সবকিছু মনে থাকে কিন্তু টেলিফোন নাম্বার মনে থাকে না। একটা কালো ডায়রিতে সব নাম্বার লেখা আছে, কিন্তু তাড়াহুড়ার জন্যে সে ডায়েরিটাই আনা হয়নি। অপলা বলল, আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করুন। তাঁর নিশ্চয়ই মনে আছে। মেয়েদের এসব জিনিস খুব মনে থাকে।

মজিদ প্রায় লাফিয়ে উঠল, দ্যাটস রাইট। এক্ষুনি যাচ্ছি।

অপলা বলল, ভদ্রলোক মাথা ধরিয়ে দিয়েছেন। অবশ্যি খুবই সরলটাইপের মানুষ। তার জীবনের পুরা হিস্ট্রি আমাকে বলেছেন। আপনার উপন্যাসের জন্যে একটা চমৎকার ক্যারেকটার। ঠিক না দুলাভাই ?

ওসমান সাহেব সহজস্বরে বললেন, খুব কমন ক্যারেকটার। এ জাতীয় মানুষ প্রচুর আছে আমাদের চারপাশে। তাছাড়া এদের তুমি যতটা সরল মনে করছ ততটা না। এদের অনেকেই বোকার একটা মুখোশ পরে থাকে। এই মুখোশ দিয়ে প্রচুর মিথ্যা কথা বলে। সেগুলিকে তখন আর মিথ্যা বলে মনে হয় না।

অপলা তাকিয়ে রইল। ওসমান সাহেব বললেন, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না, তাই না ?

বিশ্বাস করব না কেন ? করছি।

না, করছ না। এই লোকটির কথাই ধরো, সে যে মিথ্যা বলছে তা কি টের পেয়েছ ?

সে আবার কী মিথ্যা বলল ?

ঐ যে বলল আত্মীয়স্বজনদের খবর দিতে পারিনি। এটা মিথ্যা। আমি এসে দেখি, এখানে একগাদা লোকজন। সে সবাইকে সিগারেট দিচ্ছে।

ঔপন্যাসিকরা খুব ভালো ডিটেকটিভ হতে পারে বোধহয়। এরা সবকিছু খুব তলিয়ে দেখে। ঠিক না দুলাভাই ?

ওসমান সাহেব একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। তাঁর নিজের কাছেই মনে হলো, অপলাকে এত কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকে ইমপ্রেস করা। এই বালিকাটিকে মুগ্ধ করবার একটি গোপন ইচ্ছা কি তার অবচেতন মনে বাসা বেঁধে আছে ? কেন আছে ?

অপলা!

জি।

এখানে টেলিফোন আছে ?

অফিসে আছে। দু'টাকা করে দিতে হয়। এরা ভালো বিজনেস শুরু করেছে। আমি কি আসব আপনার সঙ্গে ?

এসো।

আপার সঙ্গে থাকতে চেয়েছিলাম। নার্সটা একগাদা কথা শুনিয়ে দিল। ইচ্ছা হচ্ছিল একটা চড় দেই।

দিলে না কেন ?

অপলা অবাক হয়ে তাকাল। ওসমান সাহেবের গলার স্বরে কোনো রসিকতা নেই। তিনি সত্যি সত্যি জানতে চান। অপলা মৃদুস্বরে বলল, আপনি লোকটি খুব অদ্ভুত।

তাই কি ?

হ্যাঁ।

রাত দেড়টায় টেলিফোন করা বিরক্তিকর ব্যাপার। বারবার রিং হবে কেউ ধরবে না। তারপর যখন ধরবে তখন ভয়ার্ত স্বর বের করবে, কী হয়েছে কী হয়েছে ? কী হয়েছে ব্যাখ্যা করার পরও বুঝতে চাইবে না। আবার বলতে হবে। মধ্যরাতে সুসংবাদ দিয়ে কেউ ফোন করে না।

কিন্তু আশ্চর্য, রিং করা মাত্রই মিলি ধরল এবং সহজস্বরে বলল, কাকে চাই ?

মিলি নাকি ?

হুঁ। কী ব্যাপার, ভাইয়া ?

তুই এখনো ঘুমুসনি !

না, রাতে তো আমার ঘুম হয় না।

ঘুম হয় না মানে ?

হয় না মানে হয় না। মাঝে মাঝে ঘুমের ওষুধ খাই। তুমি এত রাতে কী জন্যে ফোন করেছ ?

টগরের শরীরটা খারাপ। ডিপথেরিয়া। ওকে একটা ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে।

মিলি তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, এই কথাটা তুমি এত পরে বলছ কেন ? ঠিকানা কী বলো, আমি এক্ষুনি আসছি।

আসার দরকার নেই, ও ভালোই আছে।

তোমাকে ঠিকানা দিতে বলছি তুমি ঠিকানা দাও।

ওসমান সাহেব ঠিকানা দিলেন। তিনি নিশ্চিত জানেন মিলি আধাঘণ্টার মধ্যে আসবে। এবং আসার আগে ঢাকা শহরে যত পরিচিত লোকজন আছে সবাইকে টেলিফোন করবে। টেলিফোনের ভাষাটা হবে এরকম—সর্বনাশ হয়ে গেছে! টগরের শরীর খুব খারাপ। এখন-তখন অবস্থা। হাসপাতালে নিয়ে গেছে। এক্ষুনি আসুন।

অপলা বলল, মিলি আপা আসছে নাকি ?

হ্যাঁ আসছে। মনে হচ্ছে বিরাট একটা দল নিয়ে আসবে। ও ঝামেলা ছাড়া কিছু করতে পারে না।

অপলা অল্প হাসল। ওসমান সাহেব বললেন, খিদে পেয়েছে, রাতের খাওয়া হয়নি। তোমরা কিছু খেয়েছ ?

না।

মিলিকে বলে দেই কিছু খাবারদাবার নিয়ে আসতে।

বলুন।

যা ভাবা গেছে, টেলিফোন এনগেজড। মিলি নিশ্চয়ই পাগলের মতো চারদিকে টেলিফোন করছে। ওসমান সাহেব বেশ শব্দ করেই হাসলেন। অপলা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, আপনাকে একটা কথা বলব দুলাভাই ?

বলো।

আগে কথা দিন রাগ করতে পারবেন না।

না, রাগ করব না।

এই যে টগর এরকম অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে, এটা আপনাকে এফেক্ট করেনি। ঠিক না ?

ওসমান সাহেব জবাব দিলেন না। অপলা বলল, আপনি কি আমার ওপর রাগ করেছেন ?

না, রাগ করিনি।

আমার ধারণা ছিল কবি-সাহিত্যিকদের অনুভূতি অনেক তীক্ষ্ণ। ধারণাটা বোধহয় সত্যি না।

একজনকে দিয়েই সবার বিচার করা ঠিক ?

অপলা চুপ করে রইল। সে একটু লজ্জিত বোধ করছে। মজিদ সাহেবকে সিগারেট হাতে হাসতে হাসতে আসতে দেখা গেল।

স্যার, আমার স্ত্রী আপনাকে চিনেছে। আপনার তিনটা বই সে পড়েছে। এর মধ্যে দু'টা খুব ভালো লেগেছে। নাম বলেছিল। এখন মনে নাই।

ওসমান সাহেব জবাব দিলেন না। পানির তৃষ্ণা অনেক বেড়েছে। কোথায় পানি পাওয়া যাবে কে জানে।

রাত দু'টার দিকে রানু এসে বলল, টগরের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ডাক্তার বলেছে অক্সিজেন দিতে হবে। রানু কাঁপছে থরথর করে। ওসমান এগিয়ে এসে তার হাত ধরলেন।

রানু কাঁদতে শুরু করল। এত ভয় পেয়েছে সে ? ওসমান সাহেব বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। আশপাশে কেউ নেই। বারান্দার শেষপ্রান্তে মজিদ সাহেব দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি আড়ালে সরে গেলেন। এই ছোট্ট ভদ্রতাটি ওসমান সাহেবের বড় ভালো লাগল।

রানুর হাত থরথর করে কাঁপছে। ওসমান সাহেব মৃদুস্বরে বললেন, কোনো ভয় নেই রানু। এরকম অভয়বাণী দেওয়ার যোগ্যতা কি তাঁর আছে ? তিনি ডাক্তার নন। মহাপুরুষও নন। রানু যেমন ভয় পেয়েছে, তিনিও পেয়েছেন। তবু অভয় দেওয়ার দায়িত্বটি তিনি নিলেন কেন ? পুরুষ হিসেবে এই দায়িত্ব কি আপনাতেই এসেছে তাঁর কাছে ?

রানু, চলো টগরের কাছে যাই। মিলিরা এসে পড়বে।

টগর জেগে আছে কি ঘুমিয়ে আছে তা টের পাওয়া যাচ্ছে না। অক্সিজেনের নল তার নাকে স্কচটেপ দিয়ে আটকানো। অল্পবয়সী ডাক্তারটি তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। টগরের যে খুব একটা কষ্ট হচ্ছে তা মনে হলো না। সে বেশ স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

ওসমান সাহেব বললেন, কেমন দেখছেন ? ডাক্তার ছেলেটি হাসিমুখে বলল, ভালো। ভয়ের কিছু নেই। ব্রিদিংয়ের কষ্ট হচ্ছিল মনে করে অক্সিজেন দিয়েছি। আসলে অক্সিজেনের নল দেখলেই লোকজন ভয় পায়।

রানু শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছল। ডাক্তার ছেলেটি তার দিকে তাকিয়ে সহজস্বরে বলল, তেমনি কিছু অসুবিধা হলে তো আমি স্যারকে ডেকে আনতাম। আনতাম না ?

রানু কাঁপাগলায় বলল, আপনি আপনার স্যারকে ডেকে আনুন।

কোনোই প্রয়োজন নেই।

প্রয়োজন আছে, ডেকে আনুন।

বিশ্বাস করুন দরকার হলেই আমি তাঁকে ডাকব।

রানু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, আপনি বুঝতে পারছেন না, এই ছেলেটি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। ওসমান সাহেব তাকালেন রানুর দিকে। তার চোখ ভেজা। দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটি কঠিন। শিশুটিকে রক্ষার জন্যে সে যেন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। চমৎকার একটি ছবি তো। তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর কোনো উপন্যাসে এরকম কোনো ছবি আছে কি ? তিনি মনে করতে পারলেন না। বাইরে গাড়ির হর্ন দিচ্ছে। মিলিরা কি এসে পড়েছে ? তিনি ঘর ছেড়ে বারান্দায় এলেন।

দু'টি গাড়ি ভর্তি করে একগাদা মানুষ এসেছে। মিলি যাকে যেখানে পেয়েছে ধরে বেঁধে নিয়ে এসেছে। বাবা এসেছেন। বাবার সেক্রেটারি সুন্দরী মেয়েটি পর্যন্ত এসেছে। ওসমান সাহেব বিরক্ত হওয়ার বদলে খুশি হলেন। তিনি লক্ষ করলেন, এতগুলি মানুষ হঠাৎ চলে আসায় একটা উৎসবের ভাব চলে এসেছে।

তাঁর মায়ের মৃত্যুর সময়ও এরকম হলো। নানান জায়গা থেকে এত মানুষজন এল যে বাড়িটি হয়ে গেল বিয়ে বাড়ির মতো। সবাই মায়ের ঘরে গিয়ে খানিকক্ষণ চোখ মুছে তারপর ছড়িয়ে পড়ে সারা বাড়িতে। সবাই চেষ্টা করে মুখের ভাব যথাসম্ভব করুণ রাখতে। সেটা বেশিক্ষণ সম্ভব হয় না। পুরনো দিনের মজার মজার সব ঘটনা মনে পড়ে যায় একেকজনের। খানিকক্ষণ হাসির পর আবার দারুণ গম্ভীর হয়ে যায় সবাই।

পরিষ্কার মনে আছে, পানি আনবার জন্যে রান্নাঘরে ঢুকে ওসমান সাহেব অবাক হয়ে লক্ষ করেছিলেন তিন-চারজন মাঝবয়সী মহিলা সুখী সুখী মুখে জমিয়ে গল্প করছেন। চুলায় এক বিশাল কেতলিতে চায়ের পানি ফুটছে। টেবিলে সারি সারি চায়ের কাপ। ওসমান সাহেবকে দেখেই একজন মহিলা বললেন, চায়ের দেরি হবে। দুধ আনতে গেছে। দুধ নাই।

ওসমান সাহেব লক্ষ করলেন, মিলির মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। সে বোধহয় রাস্তায় আসতে আসতে কেঁদেছে। তার চোখ লাল। নাক ফুলে আছে। মিলি তাঁকে দেখে এগিয়ে এসে বলল, টগরের খবর কী ?

ভালোই।

কে যেন বলল অক্সিজেন দিচ্ছে।

তা দিচ্ছে।

তাহলে ভালো হয় কীভাবে ? এসব কী বলছ তুমি ?

ওসমান সাহেব সিগারেট ধরালেন। মিলি বলল, আরে, তুমি কেমন মানুষ? এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

কোথায় যাব?

টগরের কাছে গিয়ে বসো।

বসলে কী হবে?

বসলে কী হবে মানে? নিজের ছেলের এত বড় অসুখ আর তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে আরাম করে বিড়ি-সিগারেট খাবে?

বলতে বলতে মিলি কেঁদে ফেলল। মেয়েরা এত সহজে কাঁদতে পারে? মনিশ রায় বলে তার এক বন্ধু একবার বলেছিল, মেয়েদের সব কিছুর মধ্যে একটা লোক দেখানোর ব্যাপার আছে। কোনো মেয়ের যদি স্বামী মরে যায় সে কাঁদবে, কিন্তু এমনভাবে কাঁদবে যেন তাঁকে খারাপ না দেখা যায়। কাঁদার মধ্যেও সে একটু আর্ট খুঁজবে।

মিলি অবশ্যি আর্ট-ফার্ট খুঁজছে না। সে বিশ্রী একটা ভঙ্গি করেই কাঁদছে। ওসমান সাহেব বললেন, এত কাঁদছিস কেন?

কাঁদব না?

কাঁদার মতো তো কিছু হয়নি।

মিলি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, সবকিছুর মূলে হচ্ছ তুমি। তোমার মধ্যে মায়া বলে কিছু নেই।

মায়ার সঙ্গে ডিপথেরিয়ার কী সম্পর্ক? ডিপথেরিয়া একটা জীবাণুঘটিত অসুখ। খুব মায়া আছে এমন একজন বাবার ছেলেরও ডিপথেরিয়া হতে পারে। তুই যা, তোর ভাবির কাছে যা। তবে এমন হাউমাউ করে কাঁদিস না।

মিলি তীব্রকণ্ঠে বলল, কেমন করে কাঁদতে হবে? তোমার উপন্যাসের নায়িকাদের মতো? ফিচ ফিচ করে?

তিনি হেসে ফেললেন। স্বল্পবুদ্ধি মানুষেরা মাঝে মাঝে বেশ মজার কথা বলে।

মিলি ঘরের দিকে গেল। তার মুখ থমথম করছে। রানুর কাছে গিয়ে সে দ্বিতীয় দফায় কেঁদেকেঁটে একটা ঝামেলা করবে। ওসমান সাহেব হাঁটতে হাঁটতে বারান্দার শেষ মাথায় চলে গেলেন। সিগারেটটা ড্যাম্প। টানতে কষ্ট হচ্ছে।

ওসমান সাহেব লক্ষ করলেন, তাঁর বাবা খুবই উৎসাহী ভঙ্গিতে হাঁটাহাঁটি করছেন। কোনোরকম ঝামেলা উপস্থিত হলে বুড়োরাই বোধহয় সবচেয়ে উৎসাহী হয়। তাঁদের উত্তেজনাহীন জীবনে সাময়িক উত্তেজনার বিষয়গুলি তাঁরা উপভোগ করেন।

বাবাকে দেখা গেল গম্ভীর হয়ে কাকে হাত নেড়ে নেড়ে কী যেন বলছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েকজন ধরাধরি করে ওয়েটিং রুম থেকে একটা সোফা বাইরে নিয়ে এল। তিনি রাজা-বাদশাদের মতো মুখ করে বসলেন। এই লোকটি যে বাড়িতে যান সে বাড়িকেই মনে করেন নিজের বাড়ি। ওয়েটিং রুম থেকে সোফা টেনে বারান্দায় আনার কোনো দরকার ছিল না। ওয়েটিং রুমে দিব্যি বসা যেত। আর এমন যদি হয় যে

তাঁকে বারান্দাতেই বসতে হবে তিনি বেতের চেয়ারে বসতে পারতেন। বেশ কয়েকটি বেতের চেয়ার আছে বারান্দায়। ওসমান সাহেব সিগারেট ফেলে দিয়ে বাবার কাছে এগিয়ে গেলেন। তিনি ধমকের স্বরে বললেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলি ?

এখানেই ছিলাম।

ক্লিনিকে আনার বুদ্ধি দিল কে ? ক্লিনিকে কোনো চিকিৎসা হয় ? টাকার শ্রাদ্ধ ছাড়া কিছুই হয় না। যত বেকুবি কাণ্ডকারখানা। আসল যে ডাক্তার সে ঘুমাচ্ছে। এক চেংড়া ছেলেকে দিয়ে রেখেছে। সে এ বি সি ডি জানে না, ডাক্তারি জানবে কী ?

ওসমান সাহেব মৃদুস্বরে বললেন, ডাক্তারি জানবে না কেন ? মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করে এসেছে।

পাশ করলেই ডাক্তার হয় ? হাজার হাজার ছেলেপুলে তো ল'পাস করছে। ওরা পারে ওকালতি করতে ? কোর্টে দাঁড়িয়ে একটা আর্গুমেন্ট করতে গেলেই তো প্যান্ট নষ্ট করে ফেলবে।

ওসমান সাহেব কিছু বললেন না। বাবার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। হইচই শুরু করবেন।

অপলা এসে বলল, চাচাজান আপনাকে ভেতরে ডাকে।

কে ডাকে ?

রানু আপা। বড় ডাক্তার এসেছে।

ঘুম ভেঙেছে তাহলে। আমি ভেবেছিলাম ভোর দশটার আগে তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ হবে না। ওসমান তুইও আয়।

না, ঠিক আছে। আপনি একাই যান। একসঙ্গে এতগুলি মানুষের ভিড় করা ঠিক হবে না।

ওসমান সাহেব বাবার খালি করা সোফায় বসলেন। পানির তৃষ্ণা হচ্ছে। এখানে পানি কোথায় পাওয়া যায় কে জানে! মোটা নার্সটাকে একটি ট্রে নিয়ে যেতে দেখা গেল। ওসমান সাহেব একবার ভাবলেন তাকে জিজ্ঞেস করবেন। শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করতে পারলেন না। বাবা হলে কড়াগলায় বলতেন, 'এই যে মেয়ে, ঠান্ডা দেখে এক গ্লাস পানি আনো। গ্লাস ধুয়ে আনবে।' এই বলায় কোনোরকম জড়তা থাকত না। যেন নিজের বাড়িতেই কাউকে কিছু বলছেন। একটি মানুষের সঙ্গে অন্য একটি মানুষের এত তফাত।

ওসমান সাহেব দেখলেন বাবার সেক্রেটারি মেয়েটি ছোট ছোট পায়ে এগিয়ে আসছে। মিলির কাছে এর কথা শুনেছেন। কিন্তু দেখা হলো এই প্রথম। কী যেন নাম মেয়েটির ? অত্যন্ত পরিচিত চেহারা। আগে কি দেখেছেন ? কোথায় দেখেছেন ? টিভি বা সিনেমায় অভিনয়-টবিনয় করে নাকি ? করলেও তাঁর দেখার কথা নয়। টিভি-সিনেমা তিনি দেখেন না। মেয়েটির নাম কি রেবা ? না রেখা ? প্রথম অক্ষরটি কি 'র', না অন্যকিছু ?

স্লামালিকুম।

ওয়ালাইকুম সালাম।

ডাক্তার সাহেব এসে দেখেছেন। টগর ভালো আছে। অক্সিজেনের নল সব খুলে ফেলা হয়েছে।

তাই নাকি ?

জি।

ক্রেস্টাপেন পেনসিলিন দেওয়া হচ্ছে, দশ লাখ ইউনিট করে। এটিএসও দেওয়া হয়েছে। ভয়ের কিছুই নেই। সকালের মধ্যে সে মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠবে।

আপনি এতসব জানলেন কোত্থেকে ?

মেয়েটি লজ্জিতস্বরে বলল, জিজ্ঞেস করে জেনেছি। আচ্ছা আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন ?

পারব না কেন ? আপনি আমার বাবার সেক্রেটারি। মিলি আমাকে বলেছে।

মিলি আমাকে ঠিক পছন্দ করে না।

ওসমান সাহেব কিছু বললেন না। মিলিকে ব্যস্তভাবে আসতে দেখা গেল। বীথি সরে গেল। মিলি বিরক্তস্বরে বলল, এ মেয়েটি এতক্ষণ ধরে কী গুজগুজ করছিল ?

তেমন কিছু না। কথা বলছিল।

অসুখবিসুখের মধ্যে তার এত কী কথা ?

প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে ওসমান সাহেব বললেন, টগর কেমন আছে ?

ভালো, ঘুমাচ্ছে। তোমাদের জন্যে খাবার নিয়ে এসেছি। এসো।

কী এনেছিস ?

স্যান্ডউইচ বানিয়ে এনেছি। চট করে আর কী পাব ?

তোর বর তোর সঙ্গে আসেনি ?

ও ঘুমাচ্ছিল। জাগাইনি। টগরের সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক বলো ? টগরের অসুখ হলেই কী আর না হলেই বা কী ?

তাই বলে কাউকে কিছু না বলে চলে আসবি ?

হুঁ আসব। এসো, খেতে এসো।

রানু সহজভাবেই স্যান্ডউইচ মুখে দিচ্ছে। মিলি ফ্লাস্ক ভর্তি করে চা নিয়ে এসেছে। সেই চা ঢালা হচ্ছে, উৎসবের আমেজ চারদিকে। ওসমান সাহেব চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে অপলাকে বললেন, মজিদ সাহেবকে ডেকে নিয়ে আসো। বেচারা একা ঘুরঘুর করছে।

রানুর চেহারা থেকে ভয়ের ভাবটা কেটে গেছে। সে হাসতে হাসতে পাশে বসে থাকা মোটা ভদ্রমহিলাকে কী যেন বলল। তিনিও হাসতে শুরু করলেন। এখানে যারা এসেছে এদের অনেককেই ওসমান সাহেব চেনেন না। যেমন মোটা ভদ্রমহিলা। মুখ চেনা চেনা। পারিবারিক উৎসবে ইনি নিশ্চয়ই আসেন। চৌদ্দ-পনেরো বছরের চশমাপরা একটু ভাবুক ভাবুক ধরনের ছেলেকেও দেখা যাচ্ছে। একে এর আগে কোনোদিন দেখেননি, আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কেউ না নিশ্চয়ই।

অপলা এসে বলল, দুলাভাই, মজিদ সাহেব আপনাকে একটু বাইরে ডাকেন।

কেন ?

জানি না কেন। আপনি একটু আসেন। ভদ্রলোক খুব আফসেট।

মজিদ সাহেব শুকনো মুখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। ওসমান সাহেবকে দেখেই বললেন, কাণ্ড দেখেছেন ? এখন বলছে সিজারিয়ান করতে হবে। এতক্ষণ কিছু বলে নাই। হঠাৎ সিজারিয়ান।

তাই নাকি ?

স্যার, ওদের ওপর আমার ফেইথ চলে গেছে। ওর যদি সিরাজিয়ান লাগেও আমি এখানে করাব না। মরে গেলেও না। আমি পিজিতে নিয়ে যাব। আপনি স্যার আমাকে একটু সাহায্য করেন।

ওসমান সাহেব অবাক হয়ে বললেন, কী সাহায্য ?

আপনাকে স্যার একটু আসতে হবে আমার সাথে। আপনি সঙ্গে থাকলে বুকে হাতির বল হয় স্যার।

তাঁকে অবাক করে দিয়ে মজিদ সাহেব চোখ মুছতে লাগলেন। ওসমান সাহেব বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, এত নার্ভাস হচ্ছেন কেন।

নার্ভাস হচ্ছি কারণ ও বাঁচবে না।

কেমন করে বুঝলেন ?

আমি বুঝতে পারছি।

মজিদ সাহেব শিশুদের মতো ফুঁপিয়ে উঠলেন।

আমি যাব আপনার সঙ্গে। ভয়ের কিছু নেই। আমি স্ত্রীকে বলে এক্ষুনি আসছি।

টগরের পাশে রানু বসে আছে। বুড়ো মতো একজন ডাক্তার টগরের কপালে হাত দিয়ে তাপ পরীক্ষা করছেন। ওসমান সাহেব ভেতরে ঢুকতেই রানু বলল, ইনি ছেলের বাবা। খুব সম্ভব ছেলের বাবা প্রসঙ্গেই কথা হচ্ছিল। ডাক্তার সাহেব বললেন, আপনারা শুধু শুধুই ব্যস্ত হয়েছেন। ছেলে ভালো আছে। তাছাড়া আপনারা বারবার ডিপথেরিয়া ডিপথেরিয়াই বা করছেন কেন ? ডিপথেরিয়া রোগী আমি আমার ক্লিনিকে কেন রাখব ?

ওর কী হয়েছে ?

ডিপথেরিয়ার মতোই একটা মেমব্রেন। ফলস মেমব্রেন। কোনোরকম টক্সিসিটি এখানে হয় না। আর আপনারা রাত তিনটায় ঢাকা শহরের সমস্ত লোক নিয়ে এসেছেন!

বুড়ো ডাক্তার অসম্ভব বিরক্ত হলেন। ওসমান সাহেব বললেন, পাশের রুমের মহিলার নাকি সিজারিয়ানের প্রয়োজন হয়েছে ?

হ্যাঁ হয়েছে। বাচ্চার হার্টবিট বেড়ে একশ পঞ্চাশ হয়েছে। বাচ্চা বের না করলে দারুণ মুশকিল। এখন আপনি দয়া করে লোকজন নিয়ে বাড়ি যান, শান্তিতে ঘুমুতে চেষ্টা করুন। আমাদের খানিকটা রিলিজ দিন, কবি-সাহিত্যিক মানুষ আপনারা, বেশি কিছু বলাও মুশকিল।

ডাক্তার সাহেব বিরক্ত মুখেই ঘর ছেড়ে গেলেন। ওসমান সাহেবের মনে হলো, রানু নিশ্চয়ই বেশ ফলাও করে টগরের বাবার পরিচয় ডাক্তার সাহেবকে দিয়েছে। নয়তো ডাক্তার সাহেব 'কবি-সাহিত্যিক' এই শব্দ ব্যবহার করতেন না। চেহারায় তাঁকে চেনে এমন লোকের সংখ্যা খুব বেশি না।

ওসমান সাহেব রানুর দিকে তাকালেন। সে এখন বেশ স্বাভাবিক। পান চিবাচ্ছে। মিলি কি পানও নিয়ে এসেছিল নাকি ? ওসমান সাহেব বললেন, রানু পাশের ঘরে যে মহিলা আছে তার সঙ্গে আমি হাসপতালে যাচ্ছি। পৌঁছে দিয়েই ফিরে আসব।

তুমি যাচ্ছ কেন ?

তার হাসবেন্ড খুব নার্ভাস ফিল করছে। তার ধারণা আমি থাকলে ভর্তির ব্যাপার খুব সহজ হবে।

নিজের ছেলের এত বড় অসুখে তুমি ওর কপালে হাত দিয়ে একবার টেম্পারেচার পর্যন্ত দেখোনি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকেছ। আর অজানা অচেনা এক রোগীর জন্যে দরদ উথলে উঠছে ?

দরদ-টরদের কোনো ব্যাপার না। একজন লোক একা একা হাসপাতালে যেতে ভয় পাচ্ছে।

সে ভয় পাচ্ছে তাতে তোমার কী ?

আমার কিছুই না ?

না, তোমার কিছুই না। মহাপুরুষ সাজতে যেয়ো না। তুমি মহাপুরুষ না। সাধারণ মানুষ। লেখকরা মহাপুরুষ না।

রানুর চেঁচামেচিতে দরজার কাছে একটা ভিড় জমে গেল। তিনি ভেবে পেলেন না হঠাৎ রানুর কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেল কেন ? টগর পর্যন্ত জেগে উঠেছে। ওসমান সাহেব ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। মজিদ সাহেব বারান্দায় অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিকস্বরে বললেন, চলুন যাই।

৯

হাতে একটা কমলালেবু নিয়ে টগর বসে আছে। টগরের গায়ে লাল একটা সোয়েটার। কত দ্রুতই না বড় হয়ে যাচ্ছে ছেলেটি। শিশুরা বোধহয় সময়কে পেছনে ফেলে এগুতে থাকে।

রোদ এসে পড়েছে তার চোখেমুখে। সে তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। গভীর মনোযোগে কী যেন দেখছে সে।

দরজার আড়াল থেকে রানু দৃশ্যটি দেখল। এত মন দিয়ে সে কী দেখছে! রাস্তার ওপাশে পা ছড়িয়ে একটা কুকুর রোদ পোহাচ্ছে। এছাড়া দেখার মতো কোথাও কিছু নেই।

এমন অদ্ভুত হচ্ছে কেন ছেলেটা ? ঘুম থেকে উঠেছে ছ'টায়, এখন বাজে দশটা। কমলা হাতে বসে আছে, একবারও বলেনি, খুলে দাও। যেন হাতে নিয়ে বসে থাকতেই আনন্দ। রানু ডাকল, টগর। সে ফিরে তাকাল এবং ফিক করে হেসে ফেলল।

কমলা খুলে দেব ?

দাও।

রোদে বসে আছ কেন ? একটু সরে ছায়াতে বসো।

টগর বাধ্য ছেলের মতো সরে বসল। রানু কমলার খোসা ছড়াতে ছড়াতে বলল, এখন তোমার শরীর ভালো, তাই না টগর ?

হ্যাঁ।

নাও কমলা নাও। দেখি কাছে আসো তো, গা গরম কি না দেখি। না জ্বর নেই। টগর খোসা ছড়ানো কমলা হাতে ঠিক আগের জায়গায় গিয়ে বসল। ঠিক আগের মতোই তাকিয়ে রইল রাস্তার দিকে। রানু বলল, হাতে নিয়ে বসে আছ কেন ? খাও। খেয়ে আমাকে বলো মিষ্টি না টক।

মিষ্টি।

রাস্তায় কী দেখছ তুমি ?

টগর লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল। সব শিশুরাই কি এমন চমৎকার করে হাসে ? না টগর একাই এমন হাসতে পারে ? কী সুন্দর টোল পড়ছে চিবুকে।

রানু ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। টগর বলল, পানি খাব।

শোবার ঘরে অপলা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ছে। তার পড়ার ভঙ্গিও অদ্ভুত। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে এবং হেঁটে হেঁটে না পড়লে তার নাকি পড়া মুখস্থ হয় না। কেউ যে পড়াশোনা এত সিরিয়াসলি নেয় তা রানুর জানা ছিল না। অপলার মেট্রিক বা ইন্টারমিডিয়েট রেজাল্ট এমন কিছু আহামরি নয়। কিন্তু মেডিকেলের ভর্তি পরীক্ষায় সে প্রথম হয়েছে। ক্লাসের পড়াশোনা এখনো শুরু হয়নি। কিন্তু অপলার ভাবে মনে হচ্ছে সামনেই ফাইনাল। রানু বলল, টগরকে এক গ্লাস পানি এনে দে তো অপলা। দরজার পাশ থেকে রানুর নড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না। টগর রাস্তা থেকে কখন চোখ ফিরিয়ে নেয় তাই তার দেখার ইচ্ছা।

টগর এক চুমুক পানি খেয়েই গ্লাস সরিয়ে দিল। অপলা বলল, টগর আমাকে একটা কোয়া দে তো দেখি। মিষ্টি আছে ?

হ্যাঁ।

খুব মিষ্টি ?

হুঁ, খুব মিষ্টি।

ওয়াক থু। তেঁতুলের মতো টক। তুই এটাকে বলছিস মিষ্টি। একটা চড় খাবি।

টগর খিলখিল করে হেসে উঠল। যেন এরকম মজার কথা সে আর শোনেনি। হাসি থামিয়ে সে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, খালামণি, আমাকে কোলে নাও।

পড়া বন্ধ করে আমি এখন বাবু সাহেবকে কোলে নেই। শখ কত!

একটু নাও।

এখন না, পড়া শেষ হোক।

অপলা ভেতরে ঢুকে গেল। রানু তাকিয়ে আছে টগরের দিকে। টগরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে আছে। অপলার সঙ্গে তার সম্পর্ক বেশ আন্তরিক। কিন্তু রানুর সঙ্গে নয়। রানুকে সে কি একটু ভয় করে ? মার সঙ্গে তার কি কোনো দূরত্ব তৈরি হয়েছে ? রানু বলল, আমার কোলে উঠতে চাও ? টগর লজ্জিত ভঙ্গিতে মাথা নিচু করল। সে কি চায় নাকি ? মা'র চেয়ে সে কি বাবাকেই বেশি পছন্দ করে ?

টগর!

উঁ।

বেড়াতে যাবে আমার সাথে ?

হুঁ।

কোথায় যেতে চাও বলো। তুমি যেখানে যেতে চাও সেখানেই নিয়ে যাব। বলো কোথায় যাবে ?

এই প্রশ্নটি উদ্দেশ্যমূলক। রানু দেখতে চায় টগর তার বাবার কাছে যাওয়ার কথাটি কীভাবে বলে। কিন্তু শিশুরা খুব সাবধানী। জীবনের কিছু কিছু জটিলতা তারা ভালোই বুঝতে পারে। টগর তার বাবার কাছে যাওয়ার কথা কিছুই বলল না। চোখ মিটমিট করতে লাগল।

বলো কোথায় যাবে ?

তোমার ইচ্ছা।

আমার ইচ্ছা মানে ? তোমার নিজের কোনো ইচ্ছা নেই ?

টগর কোনো কথা বলল না। রানু বলল, বাবার কাছে যাবে ? টগর তাকিয়ে আছে তার দিকে। যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। ঠাট্টা ভাবছে হয়তো।

যাবে ?

সে মাথা নাড়াল। রানু বলল, মাথা নাড়ানাড়ি নয়। পরিষ্কার করে বলো। যাবে ?

হুঁ।

ঠিক আছে নিয়ে যাব। তোমাকে ও বাড়িতে রেখে চলে আসব। যতক্ষণ ইচ্ছা তুমি থাকবে। তারপর তোমার বাবা তোমাকে দিয়ে যাবে।

টগর তাকিয়ে আছে উজ্জ্বল চোখে। শিশুরা মনের মধ্যে অনেক কিছু পুষে রাখে। বাবার কাছে যাওয়াটা যে টগরের কাছে এত বড় একটা ব্যাপার তা সে কখনো বুঝতে দেয়নি।

রানু এ বাড়িতে প্রায় ছ'মাস পরে এসেছে। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে তার মন খারাপ হলো। সবকিছু অবিকল আগের মতো আছে। কিছুই বদলায়নি। সে কি আশা করছিল এই ছ'মাসে সব বদলে যাবে ?

আকবরের মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওদের রিকশা থেকে নামতে দেখছে। রানুকে দেখে সে ঠিক বিশ্বাস করতে পারেনি। কিংবা বিশ্বাস করলেও এতই হকচকিয়ে গিয়েছে কী

করবে বুঝে উঠতে পারছে না। এমন সময় সে সংবিত ফিরে পেল। প্রায় পাগলের মতো সিঁড়ি ভেঙে নামতে লাগল। রানুর প্রতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছিল—সে সিঁড়িতে একটি পতনের শব্দ শুনবে এবং আকবরের মা বালির বস্তার মতো গড়িয়ে পড়বে। রানু টগরের হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। টগর হাত ছাড়িয়ে ছুটে গেল সিঁড়ির দিকে। যেন এই মুহূর্তে তার মাকে প্রয়োজন নেই।

ওসমান সাহেব বাসায় নেই। রানু খানিকটা স্বস্তি বোধ করল। কী অবস্থা হয়ে আছে বাড়ির! মশারি তোলা হয়নি, ঘরময় সিগারেটের ছাই। একগাদা বই বিছানায় ছড়ানো। টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। এখনো নেভানো হয়নি।

ঘরের এ অবস্থা কেন আকবরের মা ?

আকবরের মা প্রশ্নটা না শোনার ভান করল।

এ ঘর কতদিন ধরে এরকম ?

কালকেই পরিষ্কার করছি। একদিনে এই অবস্থা।

ও গিয়েছে কখন ?

খুব ভোরে। নাস্তাও খায় নাই।

এতক্ষণ তুমি কী করছিলে ? কোনো ভদ্রলোকের বাড়ি সকালবেলা এরকম থাকে ? কী আশ্চর্য!

রানুর বিরক্তির সীমা রইল না। যদিও এ বাড়ি অপরিষ্কার থাকলে তার কিছুই যায় আসে না। তবু এরকম একটা অবস্থা সহ্য করা মুশকিল। বাথরুমে ভেজা কাপড় ছড়ানো। বেসিন নোংরা হয়ে আছে। রানু বলল, ও আসবে কখন ?

আফা, কিছুই কইয়া যায় নাই।

ঘরদুয়ার যে এরকম করে রাখো সে কিছু বলে না ?

আকবরের মা চুপ করে রইল।

জিতু মিয়া কোথায় ?

বাজারে গেছে।

সমস্ত ঘর আজ পরিষ্কার করবে। পানি দিয়ে মুছবে। কার্পেট রোদে দিবে, বাথরুম পরিষ্কার করবে।

জি আইচ্ছা।

আকবরের মা হেসে ফেলল এবং সঙ্গে সঙ্গেই হাসি গোপন করার জন্যে অন্যদিকে মুখ ফেরাল। সে কি ভাবছে রানু ফিরে এসেছে ? বসার ঘরে টেলিফোন বাজছে। আকবরের মা টগরকে কোলে নিয়ে ঘুরছে। রানু বিরক্ত মুখে বলল, টেলিফোন ধরছ না কেন ?

টেলিফোন ধরতে আমাকে নিষেধ করছে।

কেন ? নিষেধ করছে কেন ?

মিলা আফা রোজ টেলিফোন করে। ভাইজান রাগ হইছে।

ছোটবোন টেলিফোন করলে রাগ করবে কেন ? এসব কী ধরনের কথা ?

রানু এগিয়ে গিয়ে ফোন ধরল। মিলিই করেছে। মিলি অবাক হয়ে বলল, কে ভাবি ?

হ্যাঁ।

তুমি এখানে কেন ?

টগরকে নিয়ে এসেছি। কাঁদছিল।

তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে ভাবি, তুমি থাকো কিছুক্ষণ। আমি আসছি।

আমি বেশিক্ষণ থাকব না মিলি। আমি এক্ষুনি রওনা হচ্ছি।

ঠিক আছে ভাইয়াকে দাও। তার সঙ্গে আমার খুব দরকারি কথা।

ও তো বাসায় নেই।

ভাবি শোনো, ভাইয়া আমার সঙ্গে এত খারাপ ব্যবহার করে কেন ? টেলিফোন করলেই সে রিসিভার নামিয়ে রাখে। বাসায় বলে দিয়েছে আমি টেলিফোন করলে বলতে সে বাসায় নেই। সে এরকম করছে কেন ?

তোমার ভাই, তুমি ভালো বলতে পারবে।

বাবুর জন্যে একটা নাম চাচ্ছি দু'মাস ধরে। প্রথম অক্ষর হবে ম, এটা দিচ্ছে না। শুধু ঘোরাচ্ছে।

তার কাছ থেকে নাম নিতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই। তোমরা একটা নাম দিয়ে দাও।

তুমি বুঝতে পারছ না ভাবি—আমি সবাইকে বলেছি আমার ভাই নাম রাখছে। এখন তার আকিকা হচ্ছে সামনের মাসে তিন তারিখ, এগারো দিন মোটে আছে।

মিলি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তার পরপরই রানু শুনল মিলি কাঁদছে। রানু বিরক্তস্বরে বলল, কাঁদছ কেন তুমি ? এখানে কাঁদার মতো কী হলো ? মিলি ধরা গলায় বলল, গতকাল সকালবেলায় টেলিফোন করেছিলাম, ভাইয়া বলল—নাম রাখ মাকাল। ম দিয়ে শুরু। রানু বেশ অবাক হলো। এরকম নিচ ধরনের রসিকতা করবার লোক সে নয়। এবং মিলিকে সে যথেষ্টই পছন্দ করে। তাহলে এরকম কথা বলার মানে!

রানু বলল, মিলি, তুমি নিজে একটা সুন্দর নাম রাখো, তারপর সবাইকে বোলো তোমার ভাই এই নাম রেখেছে। ঠিক আছে ?

আচ্ছা।

এখন তাহলে রাখি ?

তুমি নিজেও আমাকে দশ-বারোটা নাম দিবে ভাবি। ম দিয়ে শুরু হবে এবং তিন অক্ষরে হবে।

এত বাধ্যবাধকতা কেন ? নামের মতো সামান্য ব্যাপার নিয়ে এতরকম কন্ডিশন দেওয়া ঠিক না।

নামে কিছু না আসলে গেলে তুমি তোমার ছেলের জন্যে এত সুন্দর নাম রাখলে কেন ?

আমি রাখিনি। তোমার ভাইয়ের দেওয়া নাম।

সে তার নিজের ছেলের জন্যে রাখবে আর আমার বাবুর জন্যে রাখবে না কেন ?

রানু একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। মিলি বড় ঝামেলা করে। তার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলা মানেই হচ্ছে সমস্তটা দিন মাটি। তাও একবারে তার কথা শেষ হবে না। টেলিফোন নামিয়ে রাখার কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার রিং করবে।

আফা, আপনার চা।

শুধু চা নয়, সঙ্গে বিস্কিট চানাচুর। একটা ট্রেতে করে বেশ সাজিয়েগুছিয়ে এনেছে। রুপোর ট্রে। রানু তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, কতবার বলেছি এই ট্রেটা কখনো বের করবে না। বলিনি ?

আকবরের মা জবাব দিল না।

টগর কোথায় ?

ঘুমাইতাছে।

এখন ঘুমাচ্ছে কী ? এখন ঘুমাবার সময় ?

নিজে নিজে গিয়া বিছানায় শুইছে। এখন গিয়া দেখি ঘুমাইতাছে। আবার ঘুমের মইধ্যে হাসে।

টগর শুয়েছে তার ছোট খাটে। আরাম করে ঘুমুচ্ছে। নিজের বাড়িতে ফিরে আসার আনন্দেই ঘুম এসে গেছে বোধহয়। রানু টগরের কপালে হাত রেখে উত্তাপ দেখল—গা ঠান্ডা। সে মৃদুস্বরে ডাকল—টগর, বাড়ি যাবে না ? টগর জবাব দিল না। সত্যি সত্যি ঘুমুচ্ছে, ভান নয়।

আফা, বাজার আসছে।

বাজার আসছে ভালো কথা, আমাকে ডাকছ কেন ?

কী রানমু কন।

রোজ দিন যা রাঁধো তা-ই রাঁধবে। আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন ? ঘর পরিষ্কার করেছ ?

জি-না।

আগে ঘর ঠিকঠাক করো। এরকম নোংরা বাড়িতে আমি দাঁড়িয়েই থাকতে পারছি না। গা ঘিনঘিন করছে।

আকবরের মা ভয়ে ভয়ে বলল, আফা আপনে দুপুরে খাইতেন না ?

না, আমি দুপুরে খাব না। টগরের ঘুম ভাঙলেই চলে যাব।

বাজার দেখতেন না ?

জিতু মিয়া পর্দা আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছিল। রানু বলল, কেমন আছিস তুই ? দেখি এদিকে আয় তো। জিতু মিয়া এগিয়ে এসে টিপ করে পা ছুঁয়ে সালাম করল।

টগর নির্বিঘ্নে ঘুমুচ্ছে। নিশ্চিন্ত আরামের ঘুম। রানু তার পাশে কিছুক্ষণ বসল। তারপর বারান্দায় গিয়ে বসল খানিক্ষণ। এখানে কিছু ফুলের টব ছিল। দুটি রজনীগন্ধার ঝাড় শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। পানি-টানি দেওয়া হয় না।

ওসমান সাহেব বারোটার দিকে এলেন। কিছু কিছু মানুষ কখনো অবাক হয় না। তিনিও কি সেরকম ? রানুকে চেয়ার পেতে বারান্দায় বসে থাকতে দেখে একটুও অবাক না হয়ে বললেন, কেমন আছ ?

ভালো।

টগরকে নিয়ে এসেছ ?

হ্যাঁ। ঘুমুচ্ছে।

শরীর ঠিক আছে তো ?

ঠিকই আছে ?

তিনি লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন, তুমি আসবে জানলে ঘরদুয়ার ঠিকঠাক করে রাখতে বলতাম। আঁস্তাকুড় বানিয়ে রেখেছে।

এদের কিছু বলো না কেন ?

প্রথম প্রথম বলতাম। এখন বলি না। মানুষের একসময় সবকিছুই অভ্যেস হয়ে যায়।

কিছু কিছু জিনিস অভ্যাস হওয়া ঠিক না। নোংরামি হচ্ছে তার মধ্যে একটা।

তিনি অল্প হাসলেন। হাসিমুখেই বললেন, তুমি না এলে আজ তোমার ওখানে যেতাম। যদিও আজ বুধবার না। তবে আজকের দিনটা ইম্পর্টেন্ট। আমার একটা বই রুশ ভাষায় অনুবাদ হবে বলে খবর পাওয়া গেছে। ফাইনাল কিছু না অবশ্যি।

কোন বইটা ?

আন্দাজ করো তো কোনটা ?

রানু কিছু বলল না। ওসমান সাহেব বললেন, চা-টা কিছু খেয়েছ ?

হ্যাঁ।

আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকলে কেমন হয় রানু ? রাতে কোনো একটি ভালো রেস্টুরেন্টে...

রানু সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বিরক্তস্বরে বলল, মিলি টেলিফোন করেছিল। সে তার বাবুর জন্যে একটা নাম চেয়েছে আর তুমি বলেছ মাকাল নাম রাখার জন্যে, এর মানে কী ?

ওসমান সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, এরকম ক্রুয়েল রসিকতা কারও সঙ্গেই করি না। মিলি বানিয়ে বানিয়ে অনেক কিছু বলে। ওর কথা বাদ দাও। আমার প্রশ্নের জবাব দাও। থাকবে আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত ?

মিলি চুপ করে রইল। ওসমান সাহেব বললেন, আমি কখনো তোমার কাছে বেশি কিছু চাইনি, চেয়েছি ?

এত প্যাঁচালো প্রশ্নের দরকার নেই। যা বলতে চাও সরাসরি বলো।

তিনি নরম করে বললেন, তুমি থাকবে আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত ?

না। এখানে এসেছি বলেই তুমি অন্যরকম ভাবতে শুরু করেছ। অন্যরকম ভাবার কোনো কারণ নেই। আমি যা করেছি খুব ভেবেচিন্তে করেছি। আমি কোনো খুকি না। হুট করে কিছু করার বয়স আমার না।

ওসমান সাহেব অল্প হাসলেন। রানু ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, হাসছ কেন ?

তোমার রাগ দেখে হাসছি। অনেকদিন রাগতে দেখি না তোমাকে।

রানু বলল, আমি এখন উঠব। তুমি যদি তোমার ছেলেকে রাখতে চাও রাখতে পার।

না, রাখতে চাই না। মাঝরাতে তোমার জন্যে কাঁদতে শুরু করবে।

ভুলেই গিয়েছিলাম বাচ্চাদের কান্না তো তুমি আবার সহ্য করতে পার না। তোমার সূক্ষ্ম অনুভূতি আহত হয়। লেখা আটকে যায়।

লেখা আমার এমনিতেই আটকে গেছে। একটি লাইনও লিখতে পারছি না।

সাহিত্যের তো তাহলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে।

ওসমান সাহেব ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, এখন তো আমরা দু'জন দু'প্রান্তের মানুষ। তুমি এসেছ বেড়াতে। কাজেই আমরা কি এখন সহজভাবে গল্পটল্প করতে পারি না ?

রানু চুপ করে রইল।

তোমার অফিস কেমন চলছে রানু ?

ভালোই

চাকরি মনে ধরেছে ?

মনে ধরাধরির কী আছে! চাকরি কি স্বামী নাকি যে মনে ধরতে হবে ?

ওসমান সাহেব প্রায় নিশ্চিত মনে ছিলেন রাতের খাবার পর্যন্ত রানু থাকবে। কিন্তু সে থাকল না।

১০

মিলি সেজেগুজে বেরুচ্ছিল। তার শাশুড়ি সুরমা তাকে ডাকলেন। সুরমার বয়স প্রায় পঞ্চাশ, কিন্তু এখনো তাঁর মাথার চুল পাকেনি। চামড়ায় ভাঁজ পড়েনি। ভদ্রমহিলা ছোটখাটো। কথা বলেন নিচুগলায়, কিন্তু যা বলেন খুব স্পষ্ট করে বলেন। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেই এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তিনি এ সংসারের সর্বময় কর্ত্রী। এবং আরও দীর্ঘদিন তাঁর কর্তৃত্ব থাকবে।

মিলি শাশুড়িকে দেখেই থমকে দাঁড়াল। সে সুরমাকে বেশ ভয় করে। সুরমা ঠান্ডা গলায় বলল, কোথায় যাচ্ছ মা ?

এই একটু বাইরে যাচ্ছি, এসে পড়ব।

যখনতখন হুটহাট করে বাইরে যাওয়া ঠিক না।

মিলি কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। সুরমার মনের ভাব ঠিক ধরা যাচ্ছে না। তিনি কথা বলছেন মিষ্টি গলায়। আদর করার ভঙ্গিতে।

তুমি মা একা একা বেড়াও। এই শহর কি একা একা ঘুরে বেড়ানোর শহর ? এখন যাচ্ছ কোথায় ?

বাবার কাছে যাব। তার শরীরটা ভালো না। খুব জ্বর।

সুরমা তাকিয়ে রইলেন, কিছু বললেন না। মিলি হড়বড় করে বলল, একশ চার পর্যন্ত উঠেছিল। মাথায় পানি-টানি ঢেলে রক্ষা। এই বয়সে এত জ্বর ওঠা খুব খারাপ।

কিন্তু কাল তো কিছু বলোনি। কাল গিয়েছিলে না তার ওখানে ?

মিলি আমতা আমতা করে বলল, কাল বলতে মনে ছিল না।

সুরমা শীতল কণ্ঠ বের করলেন। কিন্তু শীতল হলেও গলার স্বরের আদুরে ভঙ্গিটি নষ্ট হলো না।

ঠিক আছে মা, যাও বাবাকে দেখে আসো। ছেলেমেয়ে বাবাকে না দেখলে কে দেখবে ?

তা তো ঠিকই। তাছাড়া বাবা একা মানুষ। সবসময় চিন্তাভাবনা করেন। আমাদের নিয়ে তাঁর খুব চিন্তা।

সুরমা গভীর স্বরে বললেন, এটা তো মা ঠিক বললে না। বেয়াই সাহেব চিন্তাভাবনা নিশ্চয়ই করে, কিন্তু তোমাকে নিয়ে না। যত দিন বিয়ে হয়েছে একদিন এসেছেন তোমাকে দেখতে ? নাতনি হওয়ার খবর পেয়েও তো আসেননি।

বাবার গাড়িটা মা নষ্ট। তিনি একেবারে অচল।

যাদের গাড়ি নেই তারা বুঝি চলাফেরা করে না ?

মিলি এর কী উত্তর দেবে বুঝতে পারল না। সুরমা হাসিমুখে বললেন, তোমার বাবা যেমন তোমার লেখক ভাইও সেরকম। সেও তো আসে না। তারও বুঝি গাড়ি নষ্ট ?

ভাইয়ার তো গাড়ি নেই মা। ও রিকশাতেই ঘোরাফেরা করে। খুব অসামাজিক তো, তাই কোথাও যায় না। লেখক মানুষ, নিজের চিন্তাভাবনা নিয়ে থাকে। ভাইয়ার কোনো দোষ ধরা ঠিক না মা। সে তো আর আমাদের মতো সাধারণ মানুষ না।

তা তো ঠিকই। সাধারণ কেন হবে! ঠিক আছে মা, যাও ঘুরে আসো। তোমার দেরি করিয়ে দিলাম।

মিলির মনটাই খারাপ হয়ে গেল। একবার ভাবল যাবে না কোথাও। ঘরে শুয়ে থাকবে। কিন্তু দুপুরে সে ঘুমুতে পারে না। বিছানায় গড়াগড়ি করতে খুব খারাপ লাগে। কারও সঙ্গে গল্প করে সময় কাটানোরও উপায় নেই। ননদ গিয়েছে ইউনিভার্সিটিতে। আগে সে দুপুর নাগাদ ফিরে আসত। এখন ফিরছে না। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় আসছে। তার হাবভাবে কিছু একটা গোপন করার চেষ্টা। মিলির ধারণা, এই বোরকাওয়ালির কোনো একটা ছেলের সঙ্গে ভাব-টাব হয়েছে। হয়তো লাইব্রেরির বারান্দায় বসে আড্ডা দেয়। তখনো বোরকা থাকে কি না এটা মিলির দেখার শখ। কিন্তু ভর দুপুরে ইউনিভার্সিটি এলাকায় যেতে ভয় ভয় লাগে বলে যাওয়া হয় না।

আজ সে রিকশা নিয়ে শাহবাগ চলে গেল। একটা স্ন্যাকবারে ঢুকে ঠান্ডা পেপসি খেল, যদিও তার মোটেও তৃষ্ণা হয়নি। সেখান থেকেই দেখল ছেলেমেয়ে নিয়ে দুটা ফ্যামিলি ঢুকছে মিউজিয়ামে। মিলি এখনো এই মিউজিয়াম দেখেনি, কাজেই সে মিউজিয়াম দেখতে গেল। দোতলায় রাজা-মহারাজাদের পালঙ্ক দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। দীর্ঘ সময় সে ঘুরঘুর করল পালঙ্কের আশপাশে। এক বিদেশিনী পালঙ্কের ছবি তুলছিল। মিলির ইচ্ছা হলো বলে—"দয়া করে আমারও একটা ছবি তুলে দেন না।" ইংরেজিতে এটা কীভাবে বলতে হবে বুঝতে না পারার জন্যে শেষ পর্যন্ত বলতে পারল না। তবে সে ঘুরতে লাগল বিদেশিনীর সঙ্গে সঙ্গে।

মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে আসার মুখে রিসিপশনের মেয়েটিকে বলল, আমার একটা টেলিফোন করা খুব জরুরি কোত্থেকে করতে পারি বলতে পারেন ? এখন একটা টেলিফোন করতে না পারলে বিরাট বিপদ হয়ে যাবে।

মিলি তার মুখ এতই করুণ করে ফেলল যে তার নিজেরই কান্না পেয়ে যেতে লাগল এবং এক সময় সত্যি সত্যি চোখে পানি এসে গেল। রিসিপশনিস্ট মেয়েটি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে তাকে টেলিফোন জোগাড় করে দিল। সে ডায়াল ঘুরিয়ে হাসি মুখে বলল, কেমন আছ ভাইয়া ? ঘুমুচ্ছিলে নাকি ? না ? তাহলে কী লিখছিলে ? বলো তো কোত্থেকে ফোন করছি ? একশ টাকা বাজি, বলতে পারবে না। যে জায়গা থেকে করছি তার প্রথম অক্ষর হচ্ছে 'ম'। কি আন্দাজ করতে পারছ ?

রিসিপশনিস্ট মেয়েটি অবাক হয়ে মিলির কথাবার্তা শুনতে লাগল।

১১

রাত এগারোটার সময় নবী এসে উপস্থিত। তার চোখ রক্তবর্ণ। কথাবার্তা অসংলগ্ন। ঠিকমতো দাঁড়াতেও পারছে না। জিতু মিয়া বলল, সায়েব ঘুমাইতেছে।

নবী ধমকে উঠল, ডেকে তোল! বল গিয়ে নবী এসেছে।

জিতু মিয়া ডেকে বলবে সেরকম ভরসা বোধহয় তার হলো না। নবী গলা উঁচিয়ে ডাকল, ওসমান!

ওসমান সাহেব বাতিটাতি নিভিয়ে সত্যি সত্যি শুয়ে পড়েছিলেন। হাঁকডাকে বেরিয়ে এলেন।

ওসমান, হাউ আর ইউ ?

ভালো। আপনার অবস্থা ?

অবস্থা তো দেখতেই পারছেন। খুব ভালো না। বসতে পারি ?

হ্যাঁ পারেন।

বেশিক্ষণ বিরক্ত করব না। ঘুমুচ্ছিলেন শুনলাম। কোনো লেখক রাত এগারোটায় ঘুমোয় বলে জানতাম না। রাত হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটির সময়। রাতে ঘুমুবে ননক্রিয়েটিভ লোক।

নবী সোফায় বসল। পরক্ষণেই সোফা বদলে বেতের চেয়ারে বসল। সেটিও পছন্দ হচ্ছিল না বোধহয়। বিরক্ত ভঙ্গিতে শরীর নাড়াচ্ছে। ওসমান সাহেব বললেন, চায়ের কথা বলব ? কিংবা কোনো খাবারদাবার ?

না। কফি থাকলে দিতে পারেন। নেশাটা কমানো দরকার। সুস্থ মাথায় আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। আপনি বসুন।

ওসমান সাহেব বসলেন। ঘরে কফি নেই। কফির কথা বলা হলো না। নবী ঠিক কী বলতে এসেছে বুঝতে পারছেন না। অনুমান করতেও চেষ্টা করলেন না। নবীর ব্যাপারে আগেভাগে কিছু অনুমান করা মুশকিল।

নবী সিগারেট ধরাল। গম্ভীর হয়ে বলল, একটা সায়েন্স ফিকশন লেখার কথা ভাবছি। আইডিয়াটা নিয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি।

সায়েন্স ফিকশনের আইডিয়া নিয়ে আলাপ করবার জন্যে কেউ দুপুররাতে অন্যের বাড়ি যায় না। ওসমান সাহেবের মনে হলো এটা হচ্ছে প্রস্তাবনা। এরপর আসল কথা আসবে।

আইডিয়াটা এরকম—একটি গ্রহের কথা আমি বলব। সেই গ্রহে প্রাণের বিকাশ হয়েছে অদ্ভুতভাবে। সেখানে পুরুষ এবং নারী বলে কিছুই নেই। যৌনতার ব্যাপারটি নেই। সবাই জীবনের এক পর্যায়ে গর্ভধারণ করে। ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র এদের মৃত্যু হয়। কাজেই সে গ্রহে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোনো ব্যাপার নেই।

গর্ভধারণের ব্যাপারটি হয় কীভাবে ?

সেটা নিয়ে এখনো ভাবিনি। তবে যৌনমিলনের কোনো ব্যাপার নেই। আইডিয়া হিসেবে আপনার কাছে কেমন লাগছে ?

ভালোই।

শুধু ভালোই বলাটা ঠিক হলো না। এই গল্পে নতুন ধরনের জীবনযাত্রা, নতুন ধরনের সমাজ ব্যবস্থা আমি আনব। এ ধরনের একটি আইডিয়াকে শুধু ভালোই বলে চালানো ঠিক নয়। আপনি বলুন—খুব চমৎকার আইডিয়া।

খুব চমৎকার আইডিয়া।

নবী উঠে দাঁড়াল—আপনার বাথরুমটা ব্যবহার করতে চাই।

আসুন দেখিয়ে দিচ্ছি।

হুইস্কি আমার সহ্য হয় না। বমি করতে হবে। দামি একটা নেশা বমি করে নষ্ট করাটা ক্রাইম। কিন্তু উপায় নেই।

নবী বাথরুম থেকে বের হতে অনেক দেরি করল। ওসমান সাহেব আকবরের মাকে দিয়ে লেবু চা বানালেন। নেশা উগরে দেওয়ার পর চা খেতে হয়তো ভালো লাগবে। নবী চা খেল না। কোট কাঁধে ফেলে বলল, আমি এখন যাব।

চা খাবেন না ?

না, আগেই তো বলেছি খাব না।

ওসমান সাহেব নবীকে এগিয়ে দেওয়ার জন্যে রাস্তা পর্যন্ত এলেন। নবীর লাল রঙের ওপেল গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। যে ঠিকমতো পা ফেলতে পারছে না সে গাড়ি চালিয়ে যাবে—ভাবতেই অস্বস্তি বোধ হয়।

নবী ড্রাইভিং সিটে বসে, সে হঠাৎ বলল, মনিকার সঙ্গে কি আজ সারা দিন আপনার কোনো যোগাযোগ হয়েছে ?

না।

টেলিফোনেও কোনো কথা হয়নি ?

না। কেন ?

নবী গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। নিচুগলায় বলল, মনিকার স্বামী মারা গেছে। আমার ধারণা ছিল সে আপনাকে জানিয়েছে।

কবে মারা গেছে ?

কবে মারা গেছে জানি না। মনিকা খবর পেয়েছে আজ ভোরে। আমি দেখতে গিয়েছিলাম। খুব কান্নাকাটি করছিল।

ওসমান সাহেব কিছু বললেন না। মনিকা খুব কান্নাকাটি করছে—এই দৃশ্যটি তিনি কল্পনা করতে চেষ্টা করলেন। সে চেঁচিয়ে নিশ্চয়ই কাঁদবে না, কিংবা কে জানে হয়তো চেঁচিয়েই কাঁদবে। একটি অত্যন্ত রূপসী মেয়ে কাঁদছে দৃশ্যটি কল্পনায় চমৎকার কিন্তু বাস্তবে কুৎসিত। বেশ কিছু সুন্দরী মেয়েকে তিনি কাঁদতে দেখেছেন। তার কাছে কখনো ভালো লাগেনি।

নবী বলল, আমি ঠিক স্টেডি ফিল করছি না। গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। আজ রাতটা আপনার ঘরে কাটিয়ে দেওয়া যাবে ?

যাবে। আসুন।

নবী গাড়ি লক করে দোতালায় উঠে এল—খুব সহজভাবেই বলল, কাউকে বলুন গরম পানি করে দিতে, আমি একটা হট সাওয়ার নেব। একটা স্যান্ডুইচ বা এই জাতীয় কিছু দিতে বলুন। ভালো কথা, আমার শোবার ঘরে কিছু কাগজ রাখবেন। মাঝেমধ্যে শেষ রাতের দিকে আমার লিখতে ইচ্ছা করে।

ওসমান সাহেব মৃদু হাসলেন। উপহাসের হাসি কিনা ঠিক ধরা গেল না।

ওসমান সাহেব।

বলুন।

আসুন একটা কাজ করা যাক, সায়েন্স ফিকশনের যে আইডিয়াটা আপনাকে বললাম তার উপর আপনি একটি লেখা তৈরি করুন, আমিও একটি করি।

কেন ?

কে আইডিয়া কেমন খেলাতে পারে তাই দেখা, এর বেশি কিছু নয়। আপনি যা ভাবছেন তা না।

আমি কী ভাবছি ?

আপনি ভাবছেন এটা একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপার। তা নয়। এদেশে আমি কাউকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করি না।

ওসমান সাহেব মৃদুস্বরে বললেন, আপনার বিছানা তৈরি আছে, আসুন ঘর দেখিয়ে দিই।

নবী রুক্ষস্বরে বলল, আপনি কি আমার ওপর বিরক্ত ?

না, আমি সহজে বিরক্ত হই না।

তাহলে আমার আইডিয়া নিয়ে আপনি লিখতে চান না ?

না।

ওসমান সাহেব ঘুমুতে গেলেন অনেক রাতে। নবী প্রচুর ঝামেলা করল। গরম পানি দিয়ে গোসল করল। চা খেল। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে হো হো করে হাসল—নিউজ কীভাবে দেয় দেখেছেন ? চাচার হাতে ভাতিজা খুন। চাচার হাতে খুন লিখলেই তো বোঝা যায় ভাতিজা খুন হয়েছে। কী দরকার ভাতিজা খুন লেখা।

খবরের কাগজ পড়া শেষ হওয়ার পর সে টেলিফোন নিয়ে বসল। রাত তখন দেড়টা। এই গভীর রাতে কাকে যেন ঘুম থেকে তুলে ধমকাতে শুরু করল। পরক্ষণেই অন্য কাউকে টেলিফোন করে মজার মজার সব কথা বলে খুব হাসতে লাগল।

ওসমান সাহেব জেগে রইলেন অনেক রাত পর্যন্ত। ঘুমের অনিয়ম হয়েছে, সারা রাত হয়তো জেগে থাকতে হবে। একা একা জেগে থাকা একটা যন্ত্রণার ব্যাপার। পাশের কামরায় নবী অবশ্যি এখনো জেগে। কী সব খুটখাট করছে। তবু একা একাই লাগছে নিজেকে।

তিনি মশারির ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেট নিলেন। মশারির ভেতর সিগারেট খাওয়া রানু খুব অপছন্দ করত। কিন্তু এর মধ্যে একটি মজার ব্যাপার আছে, ধোঁয়া আটকে থাকে মশারির ভেতর। যেন সাদা মেঘ চারপাশে জমতে শুরু করেছে। বিশাল মেঘের টুকরো নয়, ছোট্ট একটি নিজস্ব মেঘ এবং এটিকে তৈরি করেছেন নিজেই।

ওসমান সাহেব সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলেন ঠিক এই মুহূর্তে এ শহরে কতজন মানুষ জেগে আছে। জেগে আছে না বলে বলা যাক—ঘুমুতে পারছে না। চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। একদল জেগে আছে ক্ষুধার যন্ত্রণায়। অন্য আরেক দল রোগ যন্ত্রণায়। বাকিরা সবাই সৌখিন নিশি যাপনকারী। তিনি, নবী সাহেব এবং মনিকা।

মনিকা নিশ্চয়ই জেগে আছে। এবং নবীর কথা অনুযায়ী ধরে নিতে হয় খুব কান্নাকাটি করছে। এখনো কি কাঁদছে ? মেয়েদের কান্নার ব্যাপারে তাঁর একটা মজার অবজারভেশন আছে। কিশোরীরা কাঁদে লুকিয়ে। যুবতীরা কাঁদে প্রকাশ্যে। প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধরা আশপাশে বেশ কিছু মানুষজন না থাকলে কাঁদতেই পারে না।

রানু তাঁর এ কথায় খুব রেগে গিয়েছিল। থমথমে মুখে বলেছিল, কী ভাব তুমি, মেয়েদের ছোট করে দেখবার একটা প্রবণতা আছে তোমার মধ্যে। এর মধ্যে ছোট করে দেখবার কী আছে তিনি বুঝতে পারেননি। রানুর হঠাৎ রেগে যাওয়া দেখে দুঃখিত ও লজ্জিত হয়েছেন।

রানু কখন থেকে তাঁকে অপছন্দ করতে শুরু করেছে ? বিয়ের পরপরই কি ? দীর্ঘদিন পাশাপাশি থাকলে দু'জনের ভেতরে ক্রমে ক্রমে ভালোবাসা জন্মাতে থাকে। তাদের মধ্যে সেরকম হয়নি। রানু তাঁর প্রতিটি ব্যাপারে বিরক্ত হতে শুরু করল গোড়া থেকেই।

মশারির ভেতরে মেঘ তৈরি করছ ? এইসব হালকা ধরনের কথা বলে আমাকে ভোলাতে চাও কেন ? বলো, তোমার আলসি লাগছে।

ওসমান সাহেব বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। রাত প্রায় শেষ হয়ে আসছে, চারটা দশ বাজে। কিছুক্ষণের ভেতর আকাশ ফর্সা হতে শুরু করবে। তিনি বসার ঘরে এলেন। নবীর দরজা হাট খরে খোলা। সে এই শীতেও খালি গায়ে চেয়ারে বসে দ্রুত লিখছে। চমৎকার একটি দৃশ্য। তিনি দীর্ঘদিন কিছু লিখতে পারছেন না।

নবী চোখ তুলে একবার দেখল। অত্যন্ত সহজ গলায় বলল, সায়েন্স ফিকশনটা নামিয়ে দিচ্ছি।

ভালো।

আজ সারা দিন চালাব। ননস্টপ, ফ্লো এসে গেছে। কাইন্ডলি কফির ব্যবস্থা করুন।

কফি নেই, চা খেতে পারেন।

হোক। চা-ই হোক।

তিনি নিজেই চা বানাতে গেলেন। হাতের কাছে কিছুই পাওয়া গেল না, চিনির পট, দুধের কৌটা কিছুই নেই। সংসার অগোছাল হয়ে গেছে। অগোছাল এবং অপরিচ্ছন্ন। রান্নাঘরের বেসিনের ওপর রাতের থালাবাটি পড়ে আছে। টকটক একটা গন্ধ ছাড়ছে। আকবরের মাকে আজ কিছু কড়া কড়া কথা বলতে হবে।

কি ওসমান সাহেব। আপনার চা কোথায় ?

একটু দেরি হবে। আকবরের মা উঠুক ঘুম থেকে।

ডেকে তুলুন না। ডেকে তুললেই হয়।

নবী উঠে এসে উঁচু গলায় ডাকতে লাগল, এ্যাই এ্যাই।

আকবরের মা ঘুম থেকে উঠে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

জলদি চা বানাও। তুরন্ত। চা বানানো হয়ে গেলে গরম পানি করবে। আই উইল টেক এনাদার হট বাথ।

ওসমান সাহেব দেখলেন নবীর চোখ-মুখ উজ্জ্বল। লেখার কাজ নিশ্চয়ই ভালো হচ্ছে। নবী বলল, প্রথম কয়েক পাতা শুনবেন নাকি ? পড়ে শোনাতে পারি।

আপনি শেষ করুন। তারপর শুনব।

সন্ধ্যা নাগাদ শেষ হবে। আমি কি সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকতে পারি ? এখন জায়গা বদল করতে চাই না।

নিশ্চয়ই থাকতে পারেন।

আপনি কফির ব্যবস্থা করবেন ?

হ্যাঁ, করব।

সকাল আটটার দিকে ওসমান সাহেব বের হলেন। নবীকে কিছু বলে গেলেন না। কোথায় যাবেন কিছু ঠিক নেই। একবার কলেজে যাওয়ার দরকার। শারীরিক কারণে তিনমাসের ছুটি নেওয়া আছে। সেই ছুটি বাড়িয়ে ছ'মাস করতে চান।

রাস্তায় নেমেই ভাবলেন, চাকরিটা ছেড়ে দিলে কেমন হয়? মন বসছে না। একদল ছাত্র তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে, তিনি কথা বলবেন। তারা নোট নেবে। হাই তুলবে। তাদের চোখে-মুখে থাকবে অপরিসীম ক্লান্তি। ভালো লাগে না। এতটুকুও ভালো লাগে না।

রাস্তায় একটা মিছিল বের হয়েছে। নির্জীব মিছিল। একদল রোগা ও ক্লান্ত মানুষ চিকন গলায় চেঁচাচ্ছে, 'দিতে হবে দিতে হবে'। ঢাকা শহরের মিছিলগুলি সহজেই জমে যায়। ছোট একটি মিছিল দেখতে দেখতে ফুলেফেঁপে ওঠে। সমুদ্র গর্জনের মতো শব্দ উঠতে থাকে। কিন্তু এই মিছিলটি ক্রমেই যেন প্রাণ হারিয়ে ফেলছে। প্রথম দিকের একজন নেতা গোছের কেউ মিছিল ভেঙে পান কিনতে এল।

ওসমান সাহেব মিছিলের পেছনে হাঁটতে লাগলেন। রোদ ভালোই লাগছে। শীতের সকালের রোদের মতো ভালো জিনিস আর কী হতে পারে? তাঁর প্রথমদিকের একটি উপন্যাসে শীতের রোদকে তুলনা করেছিলেন শিশুর আলিঙ্গনের সঙ্গে। শিশুর দেহের ওম ওম ভাবটি আসে শীতের রোদ থেকে। অতি বাজে ধরনের তুলনা।

আরে, আপনি এখানে?

তিনি তাকিয়ে দেখলেন চশমা পরা একটি রোগা ছেলে। মাথাভর্তি লম্বা চুল। কোনো তরুণ কবি বা গল্পকার হবে।

আমাকে চিনতে পারছেন তো?

তিনি একটি পরিচিতের হাসি দিলেন।

আপনি এখানে কী করছেন?

এই হাঁটছি আর কী।

কিসের মিছিল এটা জানেন?

না। কিসের?

ট্রাক ড্রাইভার এসোসিয়েশনের। এক ট্রাক ড্রাইভার একটি ছেলেকে চাপা দিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। পুলিশ হেভি পিটুনি দিয়েছে। পাবলিকও দিয়েছে। তার প্রতিবাদে মিছিল। চলে আসেন।

ওসমান সাহেব চলে এলেন না। হাঁটতে লাগলেন নিজের মনে। ছেলেটি বলল, লেখালেখি কেমন হচ্ছে স্যার?

হচ্ছে না।

কিছু মনে করবেন না স্যার। আপনার ইদানীংকালের লেখাগুলি আগেরগুলির মতো হচ্ছে না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। ইদানীংকলের লেখাগুলি মনে হয় পপুলার ডিমান্ডে লেখা। তেমন ডেপথ নেই।

তুমি কি আমার ইদানীংকালের লেখাগুলি পড়েছ ?

কিছু কিছু পড়েছি।

দু'একটার নাম বলতে পারবে ?

ছেলেটি চুপ করে গেল। ছেলেটি তাঁর নতুন লেখাগুলি পড়েনি। আগের গুলিও হয়তো পড়েনি। ওসমান সাহেব মৃদু হেসে বললেন, না পড়ে কোনো মন্তব্য করা ঠিক না। তুমি কি সিগারেট খাবে ? ভালো সিগারেট আছে, খাওয়াতে পারি।

জি-না। আমার একটা কাজ আছে, আমি মতিঝিল যাব।

ঠিক আছে, দেখা হবে পরে।

তিনি উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে লাগলেন। মিছিল গুলিস্তানের কাছে এসে ভেঙে গেল। ক্লান্তি লাগছিল। তিনি একটা রিকশা নিলেন। কোথায় যাওয়া যায় ? মনিকার কাছে যাবেন কি ? তার মনে হলো মনিকার কাছে যাওয়ার ইচ্ছাই এতক্ষণ পুষে রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি ওর কাছে যাবেন না। শোকের ব্যাপারগুলি থেকে তিনি দূরে থাকতে চান। এখন মনিকাকে ঘিরে অনেকেই বসে আছে। এ সময় উপস্থিত হওয়ার কোনো মানে হয় না। কিন্তু তবু মনিকার বাড়ির সামনে রিকশা থেকে নামলেন।

অনেকগুলি গাড়ি পার্ক করা। তাঁর চোখের সামনেই বিরাট একটা নীল রঙের গাড়ি থামল। কাঁদতে কাঁদতে চোখ লাল হয়ে গেছে এমন একজন মহিলা নামলেন। মহিলাটির পরনে ধবধবে সাদা সিল্কের শাড়ি। কাশ্মিরি একটি শাল কাঁধে। শালটির রঙ টকটকে লাল। সাদার সঙ্গে লালের কম্বিনেশন কী চমৎকার লাগছে!

ওসমান সাহেব বাড়িতে ঢুকলেন না। কিন্তু এখন কোথায় যাওয়া যায় ? তাঁর যাওয়ার জায়গা দ্রুত কমে আসছে। হয়তো এমন একটি সময় আসবে যখন কোথাও যাওয়ার জায়গা থাকবে না। নিজের ঘরেই থাকতে হবে দিনরাত। কিছুক্ষণের জন্যে রাস্তায় হাঁটবেন, তারপর আবার ফিরে যাবেন নিজের জায়গায়।

রানুদের বাসায় গেলে কেমন হয় ? আজ বুধবার না। তাতে কী ? দেখা যাক না হঠাৎ উপস্থিত হলে কী হয়। টগর নিশ্চয়ই খুব অবাক হবে।

রানুরা বাসায় ছিল না। দরজা তালাবন্ধ। কয়েকটি দিন খুব খারাপভাবে শুরু হয়। আজও কি সেরকম একটি দিন ? মিলিদের বাসায় গেলে কেমন হয় ? মিলি কি আছে ? না সেও ঘরে তালা দিয়ে উধাও হয়ে গেছে কোথাও।

অবশ্যি মিলিদের বাসা কোথায় তাঁর পরিষ্কার ধারণা নেই। ইচ্ছা থাকলেও যাওয়া যাবে না। তিনি বাড়ি ফিরে এসে শুনলেন তাঁর বাবার আরেকটি স্ট্রোক হয়েছে। ওসমান সাহেবের ক্লান্তি লাগছিল। বাবার কাছে যেতে ইচ্ছা করছিল না।

১২

ফয়সল সাহেব পিঠের নিচে দুটি বালিশ দিয়ে আধশোয়া হয়ে আছেন। তাঁর মুখ দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই যে ভোরবেলাতে তাঁর ওপর দিয়ে বড় রকমের একটা ঝড় গিয়েছে। লোকজন তাঁকে দেখতে আসতে শুরু করেছে। সবাই একই কথা বিভিন্নভাবে বলছে।

কী করে ব্যাপারটা হলো ?

ব্যথাটা প্রথম কোথায় শুরু হয়েছিল ?

ডাক্তারের কাছে কখন গেলেন ?

ডাক্তার কী বলল ?

এখন অবস্থা কী ?

খাওয়াদাওয়া কি করছেন ?

ফয়সল সাহেব দুপুরের মধ্যেই মহা বিরক্ত হয়ে গেলেন। বীথিকে ডেকে বললেন, যেসব প্রশ্ন সবাই আমাকে জিজ্ঞেস করছে সেগুলির উত্তর লিখে তুমি দেয়ালে টানিয়ে দাও। এক দুই করে নম্বর দিয়ে দেবে।

বীথি হ্যাঁ-সূচক ঘাড় নেড়েছে। অন্যকিছু বললেই তিনি রেগে যাবেন। নানান তর্ক-বিতর্ক শুরু করবেন। এই ঝামেলায় না যাওয়াই ভালো।

দাঁড়িয়ে থাকবে না, এক্ষুনি লিখে ফেল। সবশেষে লিখবে এখন দয়া করে বিদেয় হন। যা জানবার সবই জেনেছেন। মিলি কী করছে ?

রান্নাঘরে বাচ্চার দুধ গরম করছে।

একেবারে আন্ডাবাচ্চা নিয়ে চলে এসেছে ? সে জানে না বাচ্চাকাচ্চা আমি পছন্দ করি না ? ওকে বলো বাসায় চলে যেতে। আমার মরার সময় এখনো হয়নি। সময় হলে তাকে খবর দেবে।

বীথি বলল, এটা বলা কি ঠিক হবে ?

খুবই ঠিক হবে। তুমি বলতে না পারলে আমি বলব। ডেকে আন তাকে।

ডেকে আনতে হলো না। মিলি তার মেয়ে কোলে নিয়ে ঘরে ঢুকল। আদুরে গলায় বলল, আপনার পাশে ওকে শুইয়ে দেই ?

কেন ?

দুধ খাবে। ও দুধ খাওয়ার সময় কাউকে কাছে থাকতে হয়।

ফয়সল সাহেব রুক্ষ গলায় বললেন, ঝামেলা করিস না, ওকে নিয়ে বাসায় চলে যা।

মিলি তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে। সে বাবার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না। মিলি তাকাল বীথির দিকে। বীথি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

বাসায় চলে যাব ?

হ্যাঁ।

কেন ?

কেন কী ? এখানে থেকে লাভটা কী হচ্ছে ? বাচ্চার ঘ্যানঘ্যান পেশাব পায়খানা। একশ ঝামেলা।

কখন সে ঘ্যানঘ্যান করল ?

ফয়সল সাহেব প্রচণ্ড এক ধমক দিলেন। মা'র কোলে বাচ্চাটি এতক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। এই বার সে কাঁদতে শুরু করল। মিলির নিজের চোখেও পানি এসে গেল। সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চোখ মুছল। মিলি ভেবে রেখেছে বেশ কয়েক দিন এ বাড়িতে থাকবে। স্যুটকেস গুছিয়ে এনেছে। কাজের একটি মেয়েকেও এনেছে সঙ্গে, এখন কী করে চলে যাবে ? বাসায় গিয়ে বলবে কী ? বাবা তাড়িয়ে দিয়েছেন ?

বাবু ক্রমাগত কাঁদছে। খিদের কান্না। বাবার কানে যাচ্ছে এবং তিনি নিশ্চয়ই আরও রাগছেন। মিলি সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল। আগে যে ঘরটিতে সে থাকত সে ঘর সকালবেলা সে নিজের জন্যে গুছিয়ে নিয়েছে। এখন কেন যেন মনে হচ্ছে এটা অন্যের বাড়ি। এ ঘরে সে আগে কোনোদিন থাকেনি।

অসুখ সংক্রান্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দেয়ালে টাঙানোর পর ফয়সল সাহেব ঘোষণা করলেন, কাউকে যেন এ ঘরে ঢুকতে না দেওয়া হয়। বীথিকে বললেন, কাউকেই আসতে দেবে না। ওসমানকেও নয়। বুঝতে পারছ ?

পারছি।

ওসমান কি এসেছিল ?

জি-না। এখনো আসেনি। খবর পাননি বোধহয়।

খবর পেলেও আসবে না। মহালায়েক ছেলে। সাহিত্যসভাতে চলে গেছে। কিংবা কোনো মহাকাব্য লিখছে। মহাসাহিত্যিক তো। ও এলেই হাঁকিয়ে দেবে।

ফয়সল সাহেব সিগারেট ধরালেন। বীথি মৃদুস্বরে বলল, ডাক্তার খুব করে বলে গেছেন আপনি যেন সিগারেট না খান। তিনি বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকালেন।

মরবার সময় হয়ে গেছে, সিগারেট খেলেও মরব, না খেলেও মরব, কাজেই এসব নিয়ে বাজে তর্ক করবে না।

তিনি সিগারেট শেষ করে ঘুমুতে গেলেন। ঘুমুলেন সন্ধ্যা পর্যন্ত।

ওসমান সাহেব এলেন বিকেলে। বাড়ি ভর্তি মানুষ। সকালে যারা এসেছিল তাদের অনেকেই আবার এসেছে। ওসমান সাহেব হকচকিয়ে গেলেন। এরা সবাই তাঁর আত্মীয়স্বজন অথচ কাউকে ভালো করে চেনেন না। মৃত্যু, অসুখ, এইসব বড় বড় ঘটনার সময় তাদের দেখা পাওয়া যায়। তাঁরা আসেন। আন্তরিকভাবেই খোঁজখবর করেন।

ওসমান সাহেবকে দেখে কালো লম্বামতো একজন বুড়ো মানুষ বললেন, ভালো আছ বাবা ? ওসমান সাহেব হাসলেন। বুড়ো লোকটি বললেন, যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে আমাদের, সবাই চলে যাচ্ছে। ভদ্রলোকের বলার ভঙ্গিতে কোনো হতাশার ছোঁয়া নেই যেন বেড়াতে যাওয়ার মতো কোনো ব্যাপার নিয়ে কথা বলছেন।

ওসমান সাহেব মনে মনে বললেন, 'যাওয়ার সময় হলো বিহঙ্গের'। নিতান্তই অর্থহীন কথা। এ সময় এটা মনে হওয়ার কোনোই কারণ নেই। কিন্তু একেক সময় একেকটা কথা মনে আসে এবং ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে থাকে। 'যাওয়ার সময় হলো বিহঙ্গের' এই লাইনটি এখন মাথায় ঘুরতেই থাকবে। আটকে যাওয়া রেকর্ডের মতো। কিছুতেই তাড়ানো যাবে না।

বুড়ো লোকটি বললেন, যাও বাবা তুমি ভেতরে যাও। আমরা আছি কিছুক্ষণ।

ওসমান সাহেবের কাছে এ বাড়ি এখন অপরিচিত বাড়ি। সহজভাবে ভেতরে যেতেও কেন জানি সংকোচ লাগছে। মনে হচ্ছে এক্ষুনি কেউ একজন এসে বলবে, আপনি কাকে চাচ্ছেন ?

তিনি সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেলেন। একসময় দোতলায় তাঁর এবং মিলির ঘর পাশাপাশি ছিল। মিলি একটু খুটঘাট শব্দ হলে ছুটে এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলত, ভাইয়া একটু দেখো তো। চোর এসেছে। মিলির ভয় কি এখনো আগের মতোই আছে ? বিয়ের পর মেয়েদের অনেক কিছু বদলে যায়। ভীরু মেয়েরা হঠাৎ সাহসী হয়ে ওঠে। লাজুক মেয়েগুলি হাত নেড়ে নেড়ে হড়হড় করে কথা বলে।

স্লামালিকুম। কখন এসেছেন ?

বীথি তাঁকে দেখে উঠে আসতে শুরু করেছে। উঠে আসার ভঙ্গিটি অত্যন্ত সাবলীল। এটা যেন তার নিজের বাড়িঘর। সে অতিথির খোঁজ নিতে আসছে।

স্যারের ঘুম ভেঙেছে। আপনি কি দেখা করবেন ?

আছেন কেমন ?

ভালোই। তবে খুব দুর্বল। সারা বিকাল ঘুমিয়েছেন। সাধারণত উনি বিকেলে ঘুমান না।

মিলি আসেনি ?

এসেছে। সে ঘুমুচ্ছে।

সবাই ঘুমুচ্ছে, ব্যাপার কী ?

বীথি হাসল। ওসমান সাহেব ভাবলেন, সুন্দর মেয়েদের সবকিছুই কি সুন্দর ? তিনি এখন পর্যন্ত কোনো সুন্দরী মেয়ে দেখেননি যাদের হাসি অসুন্দর।

স্যারের ঘরে যাবেন এখন ?

ধীরে-সুস্থে যাই। তাঁর মেজাজ কেমন ?

খুব খারাপ। সবার ওপর রেগে আছেন। আপনি কি বসবেন বারান্দায় ? চেয়ার এনে দেব ?

না, বসব না। দাঁড়িয়ে থাকতেই ভালো লাগছে।

চা খাবেন ? চা এনে দেব ?

দিতে পারেন।

বীথি নেমে গেল। তাঁর আবার মনে হলো, এই মেয়েটি এ বাড়িতে অত্যন্ত সহজ-স্বাভাবিক ভঙ্গিতে চলাফেরা করছে। আশ্রিত মানুষ কখনো এত সহজ হয় না। তাদের চোখেমুখে সবসময় একটা বিনীত ভাব ফুটে থাকে।

ভাইয়া, তুমি কখন এসেছ ?

মিলি বের হয়েছে তার ঘর থেকে। দীর্ঘ ঘুমের জন্যে তার চোখমুখ ফোলা ফোলা।

তুই অসময়ে ঘুমুচ্ছিলি, ব্যাপার কী ?

রাতে তো আমার ঘুম হয় না, এইজন্যে দিনে ঘুমাই।

রাতে ঘুম হয় না নাকি ?

না।

কেন ?

এমনি হয় না। ভাইয়া, বাবা আজ আমার সঙ্গে খুব রাগারাগি করেছে।

তাই নাকি ?

একটা বাইরের মেয়ের সামনে আমাকে অপমান করেছে।

বাইরের মেয়েটা কে ? বীথি ?

হ্যাঁ। ওর কাণ্ডকারখানা দেখেও অবাক হয়েছি। এমন ভাব করছে যেন সবকিছু তার। এ বাড়ির সব আলমারির চাবি তার কাছে থাকে।

থাকুক না। তাতে অসুবিধা কী ?

বাইরের একটা মেয়ের কাছে আলমারির চাবি থাকবে ? বলছ কী তুমি ?

নিজের ছেলেমেয়েরা যখন কাছেই নেই তখন এছাড়া আর কী করবেন। ও নিয়ে তুই কিছু বলতে যাবি না।

বলব না কেন ? একশবার বলব। তুমি যে ঘরটিতে থাকতে সে ঘরটিতে এখন সে থাকে। অথচ নিচে এতগুলি ঘর খালি পড়ে আছে।

আমি তো আর এখানে থাকি না। কাজেই কোনো অসুবিধা নেই।

যথেষ্ট অসুবিধা আছে। এ বাড়িতে আমাদের ঘরগুলি ঠিক আগের মতো থাকবে। যখন ইচ্ছা আমরা আসব। যতদিন ইচ্ছা থাকব। নিজেদের ঘরগুলিতেই থাকব।

তুই থাকিস। তোর ঘর তো খালিই আছে।

মিলি মুখ অন্ধকার করে দাঁড়িয়ে রইল। বীথিকে ট্রেতে করে চা নিয়ে আসতে দেখে তাঁর মুখ আরও অন্ধকার হয়ে গেল। সে চাপাস্বরে বলল, আপনি ভাইয়ার ঘর দখল করে আছেন কেন ? ভাইয়া খুব বিরক্ত হয়েছে। সে প্রায়ই নিজের ঘরে এসে থাকে। আপনি আসার পর সে একবারও আসেনি।

বীথি অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওসমান সাহেব কী বলবেন ভেবে পেলেন না। এমন অপ্রস্তুত করতে পারে মিলি!

কিন্তু বীথি মেয়েটি বেশ শক্ত, সে সহজেই নিজেকে সামলে নিয়েছে। অন্য কোনো মেয়ে হলে সামলাতে পারত না। কেঁদে-টেদে ফেলত।

বীথি বলল, স্যার আপনাকে ডাকছেন। চা খেয়েই যান। চিনি হয়েছে ?

হ্যাঁ হয়েছে।

বাবা আপনার শরীর কেমন ? ফয়সল সাহেব ছেলের প্রশ্নের জবাব দিলেন না। হাত উঁচিয়ে দেয়ালে টানানো প্রশ্নোত্তরগুলি দেখিয়ে দিলেন। ওসমান সাহেব মৃদু হাসলেন। বৃদ্ধ মানুষের মধ্যে শিশুর ব্যাপারগুলি দেখা দিতে থাকে, কথাটা মিথ্যা নয়।

হাসছিল কেন ? কাজটা হাস্যকর ?

হ্যাঁ। এর উদ্দেশ্য যদি কথা কম বলা হতো তাহলে হাস্যকর হতো না। কিন্তু আপনি কথা কম বলছেন না। বরং আগের চেয়ে বেশি বলছেন।

ঘরে ঢুকেই সেটা বুঝে গেলি ? বড় সাহিত্যিক হয়ে গেছিস মনে হয়। শুদ্ধ করে তো তিন পাতা বাংলা লিখতে পারিস না।

ওসমান সাহেব একটা চেয়ার টেনে বাবার পাশে বসলেন। মৃদুস্বরে বললেন, রাগ করার মতো কিছু তো বলিনি, রাগ করছেন কেন ? এই শরীরে রাগ করাটা ঠিক হবে না।

রাগ করতে হলে দুধ-দই খেয়ে শরীর ঠিক করতে হবে ? কি, চুপ করে আছিস কেন ? বল, শুনে ফেলি।

ওসমান সাহেব শান্তস্বরে বললেন, আমাকে দেখে আপনি উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন, আমি বরং যাই। পরে আসব। তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

বোস তুই, কথা আছে।

তিনি বসলেন। ফয়সল সাহেব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বেশ কিছু সময় তাকিয়ে থাকলেন ছেলের দিকে।

কী বলবেন বলুন।

কেন তোর রাজকার্য পড়ে আছে নাকি ? না কোনো মহাকাব্য লেখার কথা ?

আমার লেখালেখি আপনার পছন্দ নয় ?

এইসব নাকি কান্না আমার পছন্দ হওয়ার কথা না। আমার বয়স হয়েছে। আমি বারো বছরের খুকি না।

ফয়সল সাহেব বালিশের নিচ থেকে সিগারেট বের করলেন। তাঁর হয়তো ধারণা ছিল ওসমান নিষেধ করবে। কিন্তু ওসমান সাহেব কিছুই বললেন না।

তোর সঙ্গে আমার খুব জরুরি কথা আছে।

বলুন, আমি শুনছি।

ঠিক ঠিক জবাব দিবি।

তিনি বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন। বাবা কী বলবেন আঁচ করতে চেষ্টা করছেন।

শুনলাম বৌমা নাকি আলম নামের কোন এক ছেলেকে বিয়ে করছে, কথাটা সত্যি ?

কার কাছ থেকে শুনেছেন ?

কার কাছ থেকে শুনেছি সেটা জরুরি নয়। ঘটনাটা সত্যি কি না বল।

আমি ঠিক জানি না।

কিছুই জানিস না ? কিছুই শুনিসনি ?

ওসমান সাহেব চুপ করে রইলেন।

বেকুবের মতো চুপ করে থাকিস না, কথার জবাব দে।

আমিও শুনেছি।

ঘটনা সত্যি ?

সত্যি হতেও পারে। ও আমাকে একটা শিক্ষা দেওয়ার জন্যে এটা করবে। ঐ ছেলেটির প্রতি তার আলাদা কোনো মমতা আছে বলে মনে হয় না।

তুই একটা মহা বেকুব। তুই বেকুব, তোর বোন বেকুব। দুইজনই বেকুব।

ওসমান সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। মৃদুস্বরে বললেন, এটাই কি আপনার জরুরি কথা ?

না, এটা জরুরি কথা হবে কেন ? তোদের কী হচ্ছে না হচ্ছে সেটা তোদের ব্যাপার। আই ডোন্ট থিংক আই কেয়ার।

জরুরি কথা কী বলুন শুনে যাই।

এখন বলতে ইচ্ছে করছে না।

ঠিক আছে আমি পরে আসব।

আসার কোনো দরকার নেই। যেসব বেকুবের বৌ অন্য লোকের সঙ্গে ভেগে যায়, তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

আপনি ব্যাপারটা যেভাবে দেখছেন আসলে এটা সেরকম নয়। আমরা আলাদা হয়েছিলাম। এই অবস্থায় তার যদি কোনো একটি ছেলেকে পছন্দ হয় এবং সে তাকে বিয়ে করে তাতে দোষের তো কিছু নেই।

ফয়সল সাহেব বাড়ি কাঁপিয়ে ধমকে উঠলেন, শাট আপ!

মিলি এবং বীথি দু'জনেই ছুটে এল। মিলির কোলে তার বাচ্চাটি কাঁদছে। ওসমান সাহেব নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন। বসার ঘরে অনেকেই তখনো বসে আছে। একজন বলল, চললেন ? তিনি জবাব দিলেন না।

গেট খুলে বাইরে পা ফেলা মাত্র মিলি বলল, ভাইয়া বাবা ডাকছে। তিনি ফিরে এলেন। ফয়সল সাহেব বেশ সহজ এবং স্বাভাবিক। বিছানায় বসে আছেন পা ঝুলিয়ে। ছেলেকে ঢুকতে দেখে পা দোলানো বাড়িয়ে দিলেন।

ডেকেছেন নাকি বাবা ?

হুঁ, বস। জরুরি কথাটা বলেই ফেলি।

তিনি কিছু বললেন না। বাবার মুখোমুখি বসলেন। ফয়সল সাহেব গলার স্বর খানিকটা নামিয়ে বললেন, একটা বিয়ে করব বলে ঠিক করেছি। অল্পবয়সী একটা মেয়ে।

অল্পবয়সী একটা মেয়ে আপনাকে বিয়ে করতে রাজি হবে কেন ?

রাজি হবে টাকার লোভে। পৃথিবীতে পুরুষমানুষ হয়তো দু'একটা পাওয়া যাবে যাদের টাকার লোভ নেই। কিন্তু মেয়েমানুষ পাওয়া যাবে না। এ বাড়িটা মেয়েটির নামে লিখে দিলেই সুড়সুড় করে রাজি হবে।

মেয়েদের সম্পর্কে আপনার বড় খারাপ ধারণা।

তোর তো খুব উচ্চ ধারণা ছিল। তার ফল তো হাতে হাতে দেখলি। তোকে লাথি মেরে চলে গেল।

তিনি কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। বাবার দিকে তাকিয়ে রইলেন এক দৃষ্টিতে। যেন বাবাকে বুঝতে চেষ্টা করছেন।

বিয়ে যদি করতেই হয় তাহলে অল্পবয়সী মেয়ে বিয়ে করাই ভালো। এতে বেঁচে থাকার আগ্রহ জন্মে। কী বলিস তুই ? সাহিত্যিক মানুষ, তোর ধারণাটা শুনি।

তিনি জবাব দিলেন না। একবার ভাবলেন, জিজ্ঞেস করেন মেয়েটি কে ? জিজ্ঞেস করা হলো না। সব প্রশ্ন সবসময় করা যায় না।

বাবা আজ যাই।

ঠিক আছে যা।

ফয়সল সাহেব পা দোলাতে লাগলেন। তিনি খুব মজা পাচ্ছেন।

ওসমান সাহেব উদ্দেশ্যহীনভাবে অনেকক্ষণ রাস্তায় হাঁটলেন। বেশ শীত পড়েছে। শীতের রাতে হাঁটতে ভালোই লাগে। তাঁর মাথায় ক্রমাগত বাজছে—'যাওয়ার সময় হলো বিহঙ্গের'। তাড়ানো যাচ্ছে না এটাকে।

তিনি বাড়ি ফিরলেন রাত দশটায়। নবী তখনো আছে। বসার ঘরে আরামের ভঙ্গি করে সিগারেট টানছে। চা-কফি টেবিলের ওপর রাখা।

কোথায় ছিলেন সারা দিন ? আমি সেই সন্ধ্যা থেকে অপেক্ষা করছি। আপনার কোনো ট্রেস নেই। কলেজেও ফোন করেছিলাম। তারাও কিছু জানে না।

ওসমান সাহেব জবাব দিলেন না।

সায়েন্স ফিকশনটি নামিয়ে দিয়েছি। বসে আছি আপনাকে পড়াবার জন্যে।

তিনি ক্লান্তস্বরে বললেন, আজ থাক, অন্য একদিন পড়ব। আজ আমার শরীরটা ভালো না।

না না আজই পড়বেন। গরম গরম। যান, হাতমুখ ধুয়ে আসুন। আকবরের মা, চা করো আমাদের জন্যে। তুরন্ত।

নবী শিস দিতে লাগল। একজন সুখী ও পরিতৃপ্ত মানুষ। হাসিমুখে বলল, আইডিয়াটা জমিয়ে ফেলেছি। অতটা ভালো হবে বুঝতে পারিনি। আপনি গিয়েছিলেন কোথায় ? মনিকার ওখানে নাকি ?

ওসমান সাহেব হ্যাঁ-না কিছুই বলেন না। তাঁর খুব ইচ্ছা হতে লাগল বাবার মতো চেঁচিয়ে উঠতে—শাট আপ। কিন্তু তিনি তা করলেন না। চাদর পায়ে দিয়ে বসলেন সোফায়। মৃদুস্বরে বললেন, পড়ুন।

নবী পড়তে শুরু করল। গল্প জমে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। ওসমান সাহেব এক সময় মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন। চমৎকার লেখা।

১৩

রানুর বড় খালা সুরমা কয়েকদিন ধরে একটি ব্যাপার নিয়ে ভাবছেন। যতই ভাবছেন ততই তাঁর মেজাজ খারাপ হচ্ছে। মেজাজ খারাপ হলে তাঁর কিছু শারীরিক অসুবিধা হয়—ক্ষুধা হয় না, বুকে ধড়ফড় করে। ক'দিন ধরে তা-ই হচ্ছে। এসব ঝামেলা থেকে মুক্তির কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না।

রানুকে এ বাড়ি থেকে চলে যেতে বললে সব সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু তা বলার জন্যে যে সাহস দরকার তা তাঁর নেই। রানুকে বিচিত্র কারণে তিনি ভয় করেন। সে যেদিন প্রথম এসে বলল, খালা, আমি কয়েকদিন তোমার এখানে থাকব। তোমার আপত্তি আছে ?

তাঁর যথেষ্ট আপত্তি ছিল, তবু তিনি বললেন, আপত্তি কিসের ? ঘর তো খালিই পড়ে আছে। থাক যত দিন ইচ্ছা। তিনি কল্পনাও করেননি এই কথার ওপর ভর করে রানু তার ছেলেকে নিয়ে এ বাড়িতে এসে উঠে পড়বে এবং কিছুদিন যেতে না যেতে অপলা এসে জুটবে তার সঙ্গে।

অপলা মেয়েটিকে তিনিই সহ্যই করতে পারেন না। প্রথম দিন এসেই সে বলল, খালা, ছাদের চাবিটি আমাদের কাছে দিন। আমি ছাদে খুব হাঁটাহাঁটি করি। আপনি ছাদ বন্ধ করে রাখেন কেন ?

তিনি ছাদ বন্ধ করে রাখেন কারণ ভাড়াটের ছেলেমেয়েরা ছাদে উঠে বড় বিরক্ত করে। ছাদ হচ্ছে প্রেমের বৃন্দাবন। সামনের বাড়ির ছাদে তো বিরাট এক কেলেঙ্কারিই হলো। এমন কেলেঙ্কারি যে কাউকে বলার উপায় নেই। অপলাকেও বললেন না। শুধু শুকনো মুখে জানালেন চাবিটি পাচ্ছেন না। তার কিছুক্ষণ পরই নূরীর মা এসে বলল, অপলা ছাদে। সে নাকি তার ঢুকিয়ে কীভাবে তালা খুলে ফেলেছে। তালা খোলে চোর ছ্যাঁচর, অপলা ভদ্রলোকের মেয়ে। তার এ কী কাণ্ড!

রানুকে থাকতে দিয়ে তিনি যে কী ভুল করেছেন তা মর্মে মর্মে এখন বুঝছেন। কিন্তু উপায় কী ? তিনি যে সমস্ত ব্যাপারটাই এখন অপছন্দ করছেন তা আকারে-ইঙ্গিতে বোঝাতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু রানু বোধহয় বুঝেও বুঝতে চাইছে না।

সেদিন হঠাৎ কথায় কথায় বললেন, আমার টেলিফোন নাম্বার তুমি কাউকে দিও না। অচেনা মানুষের ফোন কল আমার ধরতে ভালো লাগে না। আমি আমার ভাড়াটেদেরও নাম্বার দেই না।

রানু সহজভাবেই বলেছে, এ নিয়ে চিন্তা করবেন না খালা, টেলিফোনে কথা বলার লোক নেই আমার। এই কথাটা ঠিক। এখন পর্যন্তও কেউ রানুকে টেলিফোন করেনি। রানু গত তিন মাসে চারবার টেলিফোন করেছে। এটাও খারাপ না। তার প্রশংসাই করতে হয়।

সুরমা স্বীকার করেন প্রশংসা করবার মতো এই মেয়ের অনেক কিছুই আছে, কিন্তু তাই বলে তিনি তাকে খামোকা পুষবেন কেন ?

রানু চাকরি পাওয়ার পর বাড়ি ভাড়া হিসেবে এক হাজার টাকা করে দিতে চাইল, তিনি নেননি। একবার নিতে শুরু করলে ওদের এখান থেকে সরানো মুশকিল হবে। তাছাড়া নিজের বোনের মেয়ের কাছ থেকে বাড়ি ভাড়া নেওয়াটাও খারাপ দেখায়। বিশেষ করে সবাই যখন জানে রানু বিপদে পড়েছে।

সুরমা নানাভাবে নিজেকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেন। ভাবতে চান মা-বাপ মরা একটি মেয়েকে সাহায্য করছেন এবং তা বেশিদিন করতেও হবে না। সে ফিরে যাবে তার স্বামীর কাছে। একা একা কোনো মেয়ে থাকতে পারে ? বিশেষ করে সেই মেয়ের যখন একটি ছেলে আছে। ছেলের কারণেই তাকে যেতে হবে। আজ হোক আর কাল হোক। জামাইকে তাঁর কাছে খানিকটা 'ভোন্দা' ধরনের বলে মনে হয়। মিনমিন স্বভাব। চুলের মুঠি ধরে একটা চড় দিলে এইসব মেয়ে জন্মের মতো ঠিক হয়ে যায়—তা করবে না, সবসময় পুতু পুতু করবে। পুরুষমানুষকে হতে হয় পুরুষমানুষের মতো। মাদি-মার্কা পুরুষগুলির জন্যেই এত ঝামেলা।

সুরমা রোদে এসে বসলেন। মাঘ মাস শেষ হয়নি। এখনো কয়েকটা দিন আছে কিন্তু চিড়বিড়ে গরম পড়ে গেছে। কিছুক্ষণ রোদে বসেই তিনি বিরক্ত হয়ে পড়লেন। উঠে গেলেন না। রোদের মধ্যে নাকি কী সব ভাইটামিন আছে। শরীরে যত বেশি লাগানো যায় ততই ভালো। কষ্ট হলেও লাগাতে হবে।

খালা, কড়া রোদে বসে আছেন যে ?

সুরমা ঘাড় ঘুড়িয়ে রানুকে দেখলেন। কোনো জবাব দিলেন না।

আজ একটু টগরকে রাখবেন খালা ? অল্প কিছুক্ষণের জন্যে।

অফিসে যাবে ?

না, আজ অফিস নেই। একটু কেনাকাটা করব।

অপলা কোথায় ? অপলার কাছে রেখে যাও। এইসব পুলাপান বড় বিরক্ত করে। এটা ধরে, ওটা ধরে।

টগর বিরক্ত করবে না।

না গো মা—হাগামুতা আছে। তুমি সাথে করে নিয়ে যাও।

রানু শান্ত গলায় বলল, আপনাকে বেশি বিরক্ত করব না খালা। বাড়ি ভাড়া করব। অফিসের কাছে একটা বাড়ি নেব।

ভালোই তো। স্বাধীন মহিলা হওয়াটাই তো ভালো। আমরা পরাধীন ছিলাম—স্বাধীনতার মর্ম বুঝি না। তোমরা বুঝ।

এসব কেন বলছেন খালা ? ঝগড়া করতে চান নাকি ?

নিজের বোনঝির সঙ্গে কী ঝগড়া করব ?

ঝগড়া করতে না চাইলে টগরকে কিছুক্ষণ দেখেন। বাইরে ঘোরাঘুরি করলেই ওর শরীর খারাপ করে। টগর, নানুকে বিরক্ত করবে না।

সুরমা কিছু না বলে রোদ থেকে উঠে এলেন। মনে মনে রানুর প্রশংসা করলেন। অন্য কোনো মেয়ে হলে এই অবস্থায় ছেলেকে ফেলে বাজারে যেত না। সে গেছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, টগরকে রেখে যাওয়ায় তিনি খুশিই হলেন। এই বিশাল একতলাটায় তাঁর খুব একা একা লাগে। নিজের মেয়েরা বিয়ের পর কোথায় কোথায় চলে গেছে। কেউ ভুলেও খোঁজ করে না। তিনি এই শূন্যপুরী পাহারা দেন। ভাড়াটেদের সঙ্গে ঝগড়া করেন। প্রতি মাসের তিন তারিখে নিজে ব্যাংকে গিয়ে পাঁচ হাজার টাকা জমা দেন। তাঁর কাজ বলতে এইটুকুই। টগর মাঝে মধ্যে এলে তাঁর ভালোই লাগে। যদিও এটা কাউকে বুঝতে দেন না।

টগর সরু চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি হাত ইশারা করে টগরকে ডাকলেন।

পিয়াস লাগছে নাকি রে ?

টগর ভেবে পেল না হঠাৎ করে তার পিয়াস লাগবে কেন ? সে মাথা নাড়ল।

পিয়াস লাগলে বল ফান্টা এনে দেবে।

লাগে নাই।

লেগেছে। মুখ শুকনা।

সুরমা দু'টি ফান্টার বোতল আনালেন। তাঁদের দু'জনের জন্যে দু'টি। তারপর শুরু করলেন ডাকাতের গল্প। খুব ছোটবেলায় নৌকা করে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ একটা ডিঙি নৌকা তাদের নৌকার কাছাকাছি এসে বলল, আগুন আছে ? বিড়ি ধরানির আগুন ?

গল্প শুনে টগর মুগ্ধ হয়ে গেল। সে মৃদুস্বরে বলল, আরেকটা বলেন। সুরমা তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় গল্প শুরু করলেন। এই গল্পটি প্রথমটির চেয়েও ভালো—সাপের গল্প।

মিলি নিউমার্কেটে একটি বইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। রানু অবাক হয়ে বলল, তুমি এখানে কী করছ ?

মিলি হাসিমুখে বলল, বেড়াচ্ছি।

বেড়াচ্ছি মানে! এটা বেড়াবার জায়গা নাকি ? কখন এসেছ ?

অনেকক্ষণ আগে।

মিলি রানুর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগল। তার উৎসাহের সীমা নেই। একসময় রানু বলল, এসো তোমাকে একটা শাড়ি কিনে দেই।

মিলি বিস্মিত হয়ে বলল, কেন আমাকে শাড়ি কিনে দেবে কেন ?

বেতন পেয়েছি আজ। এসো তুমি পছন্দ করো। পাঁচশ টাকার মধ্যে। মিলি কোনো রকম আপত্তি না করে শাড়ির দোকানে ঢুকে পড়ল। প্রায় ঘণ্টাখানিক লাগিয়ে শাড়ি কিনল।

ভাবি, এখন একটা আইসক্রিম খাব।

এখন আইসক্রিম খাবে কেন ? চলো বাসায় চলো, ভাত খাবে। খিদে লাগেনি ?

লেগেছে। কিন্তু আইক্রিম খেতে ইচ্ছা হচ্ছে।

তারা আইসক্রিমের দোকানে ঢুকল। রানুর মনে হলো, মিলি ঠিক সুস্থ নয়। তার কথাবার্তা, আচার-আচরণে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। তবু কোথায় যেন কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে। রানু বলল, তোমার শরীর এখন কেমন মিলি ?

ভালো।

তোমার বাচ্চা কেমন আছে ?

জানি না।

জানি না মানে ?

আমার শাশুড়ি তাঁকে নিয়ে গেছেন।

কোথায় নিয়ে গেছেন ?

ময়মনসিংহ। ওদের বাড়িতে।

তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না মিলি। মিথ্যা কথা বলছ। ঠিক না ?

মিলি হেসে ফেলল।

কেন এত মিথ্যা বলো ?

জানি না কেন বলি। চলো ভাবি উঠি। বাসায় চলে যাব। ঘুম পাচ্ছে।

আমার সঙ্গে যাবে না ?

উঁহু। ভাবি, বাবা যে বিয়ে করছে তুমি শুনেছ ?

রানু কিছুই বলল না। মিলির কোনো কথার গুরুত্ব দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ওর যা মনে আসে তা-ই বলে।

আমার কথা বিশ্বাস করছ না, তাই না ভাবি ?

ঠিক ধরেছ। করছি না।

এবার কিন্তু সত্যি কথাই বলছি। বাবা তার সেক্রেটারিকে বিয়ে করছেন। আমার কথা বিশ্বাস না হলে একশ টাকা বাজি রাখতে পার।

রানু চুপ করে রইল। দেড়টা বাজে। মাথা ধরে গেছে। এত সময় হাঁটাহাঁটি করা ঠিক হয়নি। মিলি গেটের কাছে এসেই বলল, ভাবি, শাড়ির রঙটা এখন আর আমার পছন্দ হচ্ছে না। পাঁচ মিটিটের জন্যে আসবে, শাড়িটা বদলে নেব। প্লিজ ভাবি, তোমার পায়ে পড়ি।

১৪

ওসমান সাহেব দূর থেকে একটি চমৎকার দৃশ্য দেখলেন। গেটের বাইরে অপলা ও টগর।

অপলা হাসছে। অপলার কোলে হাসছে টগর।

তিনি মুগ্ধ চোখে তাকালেন। কিছু কিছু দৃশ্য মুহূর্তের মধ্যে মানুষকে অন্যরকম করে ফেলে। অন্ধকার দূর করে দেয়। মনের কোনো একটা স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় হঠাৎ খানিকটা আলো এসে পড়ে।

তাঁর মন হালকা হয়ে গেল। দীর্ঘদিন তিনি কিছু লিখতে পারছেন না। একটি লাইনও নয়। না লেখার মতো কষ্টও যেন ফিকে হয়ে যাচ্ছে। তিনি হাসলেন। একজনের কান্না অন্যজনকে স্পর্শ করে না। কিন্তু হাসি করে।

অপলা চেঁচাল, দুলাভাই! দুলাভাই! সে আজ এত উল্লসিত কেন ? ওসমান সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, কী খবর অপলা ?

আমাদের ভালো খবর। আপনার খবর কী ?

আমার কোনো খবর নেই। এত খুশি কেন ?

অপলা ঘাড় কাত করে বলল, খুব ভালো সময়ে এসেছেন।

ভালো সময় কেন ?

তা বলব না।

অপলা হাসছে। টগর হাসছে। হাসছেন ওসমান সাহেব। রানু দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দৃশটি দেখল। এমন আনন্দিত হওয়ার মতো কী ঘটেছে ? টগর বাবার কোলে যাওয়ার জন্যে হাত বাড়িয়েছে। এটাও একটা নতুন দৃশ্য—টগর তার বাবা-মা'র প্রতি আলাদা কোনো আবেগ দেখায় না।

ওসমান সাহেব ছেলেকে হাত বাড়িয়ে কোলে নিলেন। টগর বলল, আজ কি বুধবার ?

না, আজ বুধবার না। অন্য একবারে এসে দেখলাম কেমন লাগে। তুমি খুশি হয়েছ টগর ?

হ্যাঁ।

বেশি খুশি ? না অল্প খুশি ?

টগর দাঁত বের করে হাসল। অপলা বলল, চলুন উপরে যাই। ওসমান সাহেবের কেন জানি দোতলায় উঠতে ইচ্ছা হলো না। তাঁর মনে হলো দোতলায় উঠলেই চমৎকার বিকালটা অন্যরকম হয়ে যাবে। রানু এসে কঠিন মুখে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করবে। আজ কারও কঠিন মুখ দেখতে ইচ্ছা করছে না।

তিনি বললেন, অপলা চল রাস্তার মোড়ে যাই। টগরকে চকলেট কিনে দেই। আজ ওর জন্যে কিছু আনা হয়নি।

বৃষ্টি আসবে তো দুলাভাই।

না, আসবে না।

কী করে বুঝলেন ?

দেখছ না একটা বেড়াল হাঁটছে ?

তাতে কী হয়েছে ?

বৃষ্টি আসার আগে বেড়ালরা কখনো ঘর থেকে বের হয় না। পশুপাখিরা প্রকৃতির ব্যাপারগুলি আগে আগে টের পায়।

সত্যি ?

হ্যাঁ, সত্যি।

অপলা কী বলতে গিয়েও বলল না। অপলা না হয়ে রানু হলে তীক্ষ্ণস্বরে বলত, তুমি পৃথিবীর সব রহস্য জেনে বসে আছ? অপলা রানু নয়। অপলা না হয়ে অন্য কোনো মেয়ে হলে বলত, ওমা, আপনি এতকিছু কীভাবে জানেন?

প্রতিটি মানুষ আলাদা, একজনের সঙ্গে অন্যজনের কোনো মিল নেই।

দুলাভাই!

বলো।

টগরকে আমার কাছে দিন। আপনার কষ্ট হচ্ছে।

তোমার কষ্ট হচ্ছে না?

না, আমার অভ্যাস আছে।

মোড়ের দোকানটির কাছাকাছি আসতেই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। অপলা অবাক হয়ে বলল, কী আশ্চর্য, বৃষ্টি পড়ছে কেন! যেন বৃষ্টি পড়াটা উচিত নয়। তিনি হেসে ফেললেন।

আপনি হাসছেন কেন?

তুমি আমার কথাটা এমনভাবে বিশ্বাস করেছ দেখে হাসছি। লেখকদের কথা চট করে বিশ্বাস করতে নেই।

আপনি এত আস্তে আস্তে হাঁটছেন কেন? দৌড়ে দিয়ে ঐ বারান্দায় ওঠেন। টগর ভিজে যাচ্ছে যে।

তিনি সত্যি সত্যি দৌড়ালেন। তার গলা জড়িয়ে টগর খিলখিল করে হেসে উঠল। সে খুব মজা পেয়েছে। ওসমান সাহেব হালকা গলায় বললেন, এই বৃষ্টি বেশিক্ষণ থাকবে না। এক্ষুনি থেমে যাবে।

আপনার কোনো কথা আমি এখন আর বিশ্বাস করি না।

বিশ্বাস করো আর না করো বৃষ্টি থামবেই। যে বৃষ্টির ফোঁটা বড় হয় সে বৃষ্টি বেশিক্ষণ থাকে না।

আপনি এমনভাবে কথা বলেন যে মনে হয় সত্যি কথা বলছেন।

একজন লেখকের গুণ হচ্ছে বিশ্বাসযোগ্যভাবে কথা বলা।

ওসমান সাহেবের বৃষ্টির কথাগুলি মিলে গেল। চট করে বৃষ্টি থেমে গেল। দোকানের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলি মুহূর্তের মধ্যে নেমে গেল রাস্তায়। দারুণ ব্যস্ত সবাই। এরকম একটা মেঘলা সন্ধ্যায় কারোরই তেমন কোনো কাজ থাকার কথা নয়। অথচ সবাই এমন ব্যস্ত যেন এই মুহূর্তে ছুটে না গেলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে।

অপলা বলল, ইস, টগর ভিজে একেবারে কাই হয়ে গেছে। চকলেট নিয়ে চলুন তাড়াতাড়ি বাসায় যাই।

'ভিজে কাই হয়ে গেছে' একটা নতুন ধরনের এক্সপ্রেশন। আগে কখনো শোনা যায়নি। তিনি মনে মনে নোট করে ফেললেন। কখনো না কখনো ব্যবহার করা যাবে।

কিন্তু সত্যি কি ব্যবহার করা যাবে ? কোনোদিন তিনি লিখতে পারবেন কিছু ? আজকাল তাঁর মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কাল রাতে দীর্ঘ সময় লেখার টেবিলে বসেছিলেন। বসে থাকাই হয়েছে। অন্যসময় কাগজে আঁকাবুকি করেন। একটি-দুটি লাইনও লেখা হয়। কাল তাও হয়নি। ঘুমুতে যাওয়ার সময় মনে হয়েছে, এভাবে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না।

দুলাভাই, কী ভাবছেন ?

কিছু ভাবছি না।

চলুন ফিরে যাই। কী কিনবেন কিনে নেন। টগরের ঠান্ডা লাগবে। দেখুন কাঁপছে।

টগর বলল, আমি যাব না। তিনি তাকালেন ছেলের দিকে। টগরের চোখমুখ উজ্জ্বল। তিনি বললেন, বাসায় যাবে না ?

না।

না কেন ? কোথায় যেতে চাও ?

তোমার সঙ্গে যাব।

তিনি তাকালেন অপলার দিকে। সে আবার বলল, বাসায় চলুন তো। আপা খুব রাগ করবে। নির্ঘাৎ টগরের ঠান্ডা লাগবে—দেখুন ওর দাঁত কির কির করছে।

রাস্তায় নেমেই ওসমান সাহেবের মনে হলো, রানুর কাছে ফিরে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। রানুর কাছে না গিয়ে তিনি বরং রাস্তায় রাস্তায় হাঁটবেন। এককালে এরকম করতেন। বিয়ের পর রানুকে নিয়ে কিছুদিন হেঁটেছেন। রানু বিরক্ত হয়েছে। চোখমুখ কুঁচকে বলেছে, এ কী বিশ্রী অভ্যাস। বিনা কারণে হাঁটছ কেন ?

তোমার ভালো লাগছে না ?

এর মধ্যে ভালো লাগার কী আছে ?

রানুর স্বভাবই হচ্ছে প্রশ্ন দিয়ে প্রশ্নের জবাব দেওয়া। শিশুদের স্বভাব। শিশুরাই প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন করে। তার পেছনে থাকে শিশুর সরলতা। কাজেই তাঁদের প্রশ্ন শুনতে ভালো লাগে। বয়স্কদের বেলায় সেটা হয় না।

অপলা বলল, এরকম গম্ভীর হয়ে কী ভাবছেন ?

কিছু ভাবছি না।

আচ্ছা দুলাভাই, আপনি কি রানু আপা সম্পর্কে কিছু শুনেছেন ? তার বিয়ের প্রসঙ্গে কিছু ?

তিনি কিছু বললেন না। অপলা অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, নিশ্চয়ই আপনার কানেও গিয়েছে।

ওর বিয়ের কথা বলছ ?

হ্যাঁ, আলম ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ের গুজব।

শুনেছি।

এটা ঠিক না। আমি আপাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

ওসমান সাহেবের কোনো ভাবান্তর হলো না। যেন তাঁর কিছুই যায়-আসে না। অথচ তার খুশি হওয়া উচিত। উচিত নয় কী?

অপলা মৃদুস্বরে বলল, আমার মনে হয় আপা একদিন না একদিন আপনার কাছে ফিরে যাবে।

তাহলে তুমি খুব খুশি হবে?

হ্যাঁ।

কেন বলো তো?

অপলা এক মুহূর্তও না ভেবে বলল, আপনাকে আমার খুব ভালো লাগে দুলাভাই।

তিনি চমকে তাকালেন। অন্ধকার হয়ে আসছে। অপলার মুখ দেখা যাচ্ছে না। তাঁর খুব ইচ্ছে হলো অপলার মুখের রেখাগুলি দেখতে। তিনি তার কোনো এক উপন্যাসে লিখেছিলেন—একমাত্র কিশোরীরাই ভালোবাসার কথা সরাসরি বলতে পারে। কোনো বইতে বলেছিলেন? এমন নয় যে তিনি অসংখ্য উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু তবু কেমন যেন ঝামেলা হচ্ছে। কিছুই আজকাল আর মনে করতে পারেন না। সব জট পাকিয়ে যায়। সব কিছুই কি এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে?

রানু বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। সে তার শাড়ি বদলেছে। সামান্য কিছু সাজগোজও করেছে। কেন করেছে সে নিজেও জানে না। ওদের আসতে দেখে সে ভেতরে চলে গেল।

ওসমান সাহেব গেটের সামনে এসে বললেন, অপলা, আজ আর ভেতরে যাব না।

কেন?

যেতে ইচ্ছে করছে না। অন্য একদিন আসব।

না না, এসব কী, চলুন। আপা অপেক্ষা করছে আপনার জন্যে।

আমার জন্যে অপেক্ষা করছে না। নাও, টগরকে কোলে নাও। ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

অপলা টগরকে কোলে নিল।

ওর শরীর মনে হয় পুরোপুরি সারেনি। কেমন চট করে ঘুমিয়ে পড়ল।

ও কোলে উঠলেই ঘুমিয়ে পড়ে।

তিনি বললেন, অপলা আমি যাচ্ছি। অপলা বিস্মিত হয়ে বলল, আপনার কী হয়েছে দুলাভাই?

কিছু হয়নি। আমি লিখতে পারছি না।

লিখতে না পারা কি খুব কষ্টের?

হ্যাঁ, খুব কষ্টের। আচ্ছা যাই।

দুলাভাই, প্লিজ আপনি রানু আপার সঙ্গে দেখা করে যান। আপনার পায়ে পড়ি। আমার একটা কথা রাখুন।

তিনি বড়ই অবাক হলেন। মেয়েটির গলায় এত কাতরতা কেন?

আসুন দুলাভাই।

তিনি সিঁড়ি ভেঙে উঠতে শুরু করলেন। হঠাৎ তার বড় ক্লান্তি লাগল। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি কখনোই কিছু করতে পারেন না। মনের ওপর অসম্ভব চাপ পড়ে।

রানু বেশ সহজ-স্বাভাবিকভাবেই কথা-টথা বলল। ওসমান সাহেব জানতে পারলেন সে শিগগিরই এ বাড়ি ছেড়ে দেবে। অফিসের কাছাকাছি একটি ফ্ল্যাট নেবে।

তুমি দেখো তো, তোমার চোখে কোনো খালি বাড়ি পড়ে কি না। তুমি তো হেঁটেই বেড়াও। নাকি এখন আর হাঁট না ?

হাঁটি। এখনো হাঁটি। বাড়ি চোখে পড়লে তোমাকে বলব।

তিনি উঠে পড়লেন। রানু সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে হঠাৎ করে বলল, মিলিকে একজন ভালো ডাক্তার-টাক্তার দেখানো উচিত।

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন ?

আমার মনে হয় ও অসুস্থ।

কী রকম অসুস্থ ?

বুঝতে পারছি না। ওকে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাও। ওর স্বামীর সঙ্গে কথা বোলো।

বলব।

তুমি তো যাও না ওদের বাসায়। যাও একদিন। ওর স্বামীকে বুঝিয়ে বোলো।

ওসমান সাহেবের বেশ মন খারাপ হলো। রিকশায় উঠে তিনি মিলির মেয়েটির জন্যে তিন অক্ষরের একটি নাম ভাবতে লাগলেন। যার শুরু হবে ম দিয়ে। এবং এমন একটি নাম যা আগে কেউ রাখেনি।

প্রথমেই যে নামটি মনে হলো সেটা হচ্ছে 'ময়ূর'। ময়ূর নাম কেউ কি আগে রেখেছে ? পাখিদের নামে প্রচুর নাম আছে—দোয়েল, ময়না। কিন্তু ময়ূরের নাম কেউ রাখেনি অথচ কী চমৎকার একটি পাখি। নাম রাখার ব্যাপারে খুব সূক্ষ্মভাবে হলেও কোনো এক ধরনের সাইকোলজি কাজ করে। ফলের নামে আমরা নাম রাখি—আপেল, বেদানা, কমলা; কিন্তু আম দিয়ে কারও নাম নেই। এর কারণ কী ? ওসমান সাহেব শব্দ করে হেসে উঠলেন। রিকশাওয়ালা চমকে পেছন ফিরে তাকাল। বোধহয় তাঁকে পাগল ভাবছে। মিলির কাছে এখন আর যেতে ইচ্ছে করছে না। কাল যাওয়া যাবে।

১৫

সকাল ন'টা।

এ সময় সাধারণত সবাইকেই ঘরে পাওয়া যায়।

মিলি বাসায় ছিল না। মিলির বর মতিয়ুর রহমান ছিল। এই ছেলেটিকে ওসমান সাহেব পছন্দ করেন। অথচ সে ঠিক পছন্দ করার মতো মানুষ নয়। উদ্ধতপ্রকৃতির মানুষ। হিসেবি ও বৈষয়িক। তবু তাকে ভালো লাগে। কেন ? চেহারার জন্যে নিশ্চয়ই নয়। মতিয়ুর রহমানের চেহারা ভালো নয়। গ্রাম্যভাব আছে। ওসমান সাহেবকে দেখে মতিয়ুর রহমান খুবই অবাক হলো। অতিরিক্ত রকমের ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ভাইসাহেব, কেমন আছেন ?

ভালো।

হঠাৎ এদিকে ?

এমনি এলাম। তেমন কোনো কারণ নেই। মিলি কোথায় ?

মিলি ডাক্তারের কাছে গেছে। এখনিই চলে আসবে।

ঠিক আছে, আমি বসছি। মিলির সঙ্গে দেখা হয় না অনেকদিন। ও আছে কেমন ?

ভালোই আছে। অবশ্যি সবসময় কমপ্লেইন করে ঘুম হয় না। আমি কিন্তু দেখি ঠিকই ঘুমুচ্ছে।

ওষুধ খেয়ে ঘুমায় ? একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখালে কেমন হয় ?

সাইকিয়াট্রিস্ট ?

হ্যাঁ। ও বোধহয় ঠিক সুস্থ না।

মতিয়ুর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বলল, ভাই সাহেব, আপনি কি আজ দুপুরে আমাদের সঙ্গে চারটা ডাল-ভাত খাবেন।

খাব। আমি বিকেল পর্যন্ত থাকব এখানে। মিলি আসবে কখন ?

আমি ওকে আনার জন্যে লোক পাঠাচ্ছি।

লোক পাঠানোর দরকার নেই। ও আসুক ধীরে-সুস্থে।

ডাক্তারের কাছে অন্যসময়ও যেতে পারবে। এখন এসে আপনার জন্যে নিজের হাতে রান্নাবান্না করুক। খুব খুশি হবে। আপনি কি হাতমুখ ধোবেন ?

না। তুমি তোমার কাজ করো। আমার জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না। একা বসে থাকতে আমার খারাপ লাগে না। ভালোই লাগে।

আপনি বসে চা খান, আমি আধঘণ্টার মধ্যে আসছি।

বাজারে যাচ্ছ নাকি ?

না, মিলিকে নিয়ে আসতে যাচ্ছি।

তিনি এদের এই বাড়িতে অনেকদিন পর এসেছেন। বাড়ির অনেকরকম পরিবর্তন হয়েছে। নতুন ঘর উঠেছে কয়েকটি। মিলিদের এই বাড়ি কিনে নেওয়ার কথা ছিল, কিনে নিয়েছে কি না কে জানে। সওদাগরদের বাড়ির মতো বিশাল এক বাড়ি। আসবাবপত্রে ঠাসা। এদের প্রচুর পয়সা হয়েছে মনে হয়। আগে এত সচ্ছলতা ছিল না।

মিলি বাড়িতে ঢুকেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। কলকল করে বলল, তুমি আমার এখানে আসবে একটা আগে বললে না কেন ?

আগে বললে কী হতো ?

কত কিছু করতাম।

তোর মেয়ের নাম ঠিক করেছিস ?

হ্যাঁ, মিনতি। নামটা কেমন ভাইয়া ?

সুন্দর নাম। আমি আসতে আসতে তোর মেয়ের জন্যে নাম ভাবছিলাম। তিন অক্ষরের, 'ম' দিয়ে শুরু।

কী নাম ?

ময়ুর।

মিলি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না।

ময়ুর ?

হ্যাঁ।

ময়ুর কখনো নাম হয় ? তোমার কি মাথা-টাথা খারাপ হয়েছে নাকি ভাইয়া ?

বোধহয় হচ্ছে।

মিলি খুব হাসতে লাগল। যেন অনেকদিন পর সে মজার একটা কথা শুনল। হাসির ভঙ্গিও অস্বাভাবিক। ওসমান সাহেব মনে মনে ভাবলেন, মিলি কি সত্যি অসুস্থ ? মতিয়ুর রাগী চোখে তাকিয়ে আছে। হাসি থামলেই সে হয়তো কিছু বলবে। মিলি হাসি থামাল। তার চোখে পানি এসে গিয়েছিল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছল। মতিয়ুর বলল, তুমি যাও রান্নাবান্না শুরু করো। বারোটা বাজে।

আমার রাঁধতে ইচ্ছে হচ্ছে না। অন্যকেউ রাঁধুক।

তুমি কী করবে ?

আমি ভাইয়ার সঙ্গে গল্প করব। তুমি কাউকে বলো। কিংবা হোটেল থেকে কিছু আনিয়ে নাও।

মতিয়ুর চলে গেল। তার মুখ থমথম করছে। ঘরে রান্নাবান্না করার কেউ হয়তো নেই। খুব সহজেই মিলি হোটেলের প্রসঙ্গ এনেছে—তার মানে এরা প্রায়ই হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে নেয়। কিন্তু ওর শাশুড়ি তো এখানে থাকেন। তিনি থাকতে হোটেলের খাবার আসবে এ বাড়িতে ?

ভাইয়া, তুমি কি মাকে কখনো স্বপ্নে দেখো ?

ওসমান সাহেব ভেবে পেলেন না হঠাৎ মা'র প্রসঙ্গ কেন এল। মিলি কি এলোমেলোভাবে চিন্তা করতে শুরু করেছে ? তিনি মিলির দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন। মিলি হালকাভাবে বলল, আমি প্রায়ই দেখি। রোজ রাতে দেখি। কালও দেখেছি।

কী দেখিস!

দেখি মা খুব লজ্জিত ভঙ্গিতে আমার কাছে এসে দাঁড়ান। অস্পষ্টস্বরে বলেন, ভুল হয়ে গেছে মিলি, কিছু মনে করিস না। তখন আমি তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করতে শুরু করি।

কী নিয়ে ঝগড়া ?

জানি না কী নিয়ে। মা এত ভালো মানুষ ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমি ঝগড়ার স্বপ্ন কেন দেখব ?

স্বপ্ন স্বপ্নই ?

না, স্বপ্ন স্বপ্ন না। স্বপ্নের অনেক মানে আছে।

মিলি কাঁদতে শুরু করল। তিনি কী বলবেন, ভেবে পেলেন না।

কান্না থামা মিলি।

মিলি সঙ্গে সঙ্গে কান্না থামাল। ওসমান সাহেব বললেন, আমি কিছুদিন আমাদের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে থাকব।

কেন ?

এমনি। কোনো বিশেষ কারণ নেই।

আমিও তোমার সঙ্গে যাব ভাইয়া।

একা থাকার জন্যে যাচ্ছি। দলবল এসে গেলে তো আর একা থাকা যাবে না।

এখানে তো একাই থাকতে।

তা ঠিক।

গ্রাম এবং শহরে বেশ-কমটা কি হচ্ছে ?

ওসমান সাহেব মৃদুস্বরে বললেন, অনেকদিন থেকে কিছু লিখতে পারছি না। পরিবেশ বদলে দেখতে চাই লাভ হয় কি না।

তোমার রান্নাবান্না করে দেবে কে ?

লোকজন পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই।

যাবে কবে ?

কাল।

রানু ভাবি জানে ?

না।

মিলি খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, গতকাল রানু ভাবি আর আলম ছেলেটিকে দেখলাম রিকশা করে যাচ্ছে। হাত ধরাধরি করে দু'জন বসে আছে। ওসমান সাহেব হেসে ফেললেন। মিলি বিরক্তিস্বরে বলল, হাসছ কেন ?

এমনি হাসছি।

মিলির কোনো ভাবান্তর হলো না। ওসমান সাহেব বললেন, কাউকে দিয়ে সিগারেট আনিয়ে দে। সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। মিলি উঠল না। যেভাবে বসেছিল সেভাবেই বসে রইল, যেন সে তাঁর কথা শুনতে পায়নি।

মিলি।

বলো।

মতিয়ুরের সঙ্গে কথা বলছিলাম—সে তোকে একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চায়।

জানি, পাগলের ডাক্তার। তোমার কি মনে হয় আমি পাগল ?

না, পাগল হবি কেন ?

আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে বলছ। আসলে তোমার নিজেরও ধারণা আমি পাগল। তা না হলে ডাক্তারের কথা তুলতে না।

তুই এত সুন্দর লজিক বের করেছিস। এরপরও তোকে পাগল বলবে কে ?

বলে, সবাই বলে। আমার শাশুড়ি এখন আমাকে দেখে এমন ভয় পান, আমি ঘরে ঢুকলেই চমকে ওঠেন। পাগলকে মানুষ যেমন ভয় পায় সেরকম আর কী।

বলতে বলতে মিলি খিলখিল করে হাসতে শুরু করল। সে হাসি আর কিছুতেই থামে না। ওসমান সাহেব অবাক হয়ে মিলির দিকে তাকিয়ে রইলেন। সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ একজন মানুষের হাসি। মতিয়ুর ঘরে ঢুকে ধমক দিল, আবার কী শুরু করেছ ? মিলির হাসি থেমে গেল। সে থমথমে গলায় বলল, আমি হাসতেও পারব না ?

তুমি রান্নাঘরে যাও তো মিলি।

না, আমি রান্নাঘরে যাব না। এখানেই থাকব। এবং ভাইয়াকে সব কথা বলে দেব আমি। ভাইয়া শোনো, ও এখন আমাকে ঘর থেকে বেরুতে দেয় না। গেটে তালা দিয়ে রাখে। কাউকে টেলিফোনও করতে দেয় না। টেলিফোনের মাউথ পিস খুলে রেখেছে। সে যখন কাউকে টেলিফোন করতে চায় তখন মাউথ পিস লাগায়।

মিলি, তুমি রান্নাঘরে যাও তো।

না, আমি যাব না। কী করবে তুমি ? মারবে আমাকে ? বেশ তো মারো।

ওসমান সাহেব মৃদুস্বরে বললেন, খিদে লেগেছে মিলি, খাওয়ার ব্যবস্থা কর। মিলি শান্ত মেয়ের মতো সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। হাসিমুখে বলল, দশ মিনিটের মধ্যে খাবার দেব। সে ছুটে বেরিয়ে গেল। ওসমান সাহেব মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে রইলেন, আর সামনে মতিয়ুর রহমান বসে আছে। দুজনের কারও মুখেই কোনো কথা নেই।

মিলিদের বাড়ি থেকে তিনি বের হলেন সন্ধ্যার পর। রিকশাওয়ালাকে বললেন, আমি কোথাও যাব না। শহরেই খানিকটা ঘুরব। তোমার যেদিকে যেতে ইচ্ছা করে সেদিকে যাও।

রিকশাওয়ালা ইতস্তত করছে। মন ঠিক নেই এমন কাউকে রিকশায় তুলতে তার হয়তো দ্বিধা আছে।

১৬

আজকাল ফয়সল সাহেবের ঘুমের রুটিনে অদলবদল হয়ে গেছে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েন। বেশ গাঢ় ঘুম। সেই ঘুমের স্থায়িত্ব কম। জেগে ওঠেন মিনিট পাঁচেকের মধ্যে এবং জেগেই নিজের ওপর রেগে যান। ভয়ঙ্কর রাগ। কেন দীর্ঘদিনের এই ক্রীতদাস শরীর তার কথা শুনবে না ? মৃত্যু কি এসে যাচ্ছে ? সে কি অপেক্ষা করছে বাইরে ? দেখতে সে কেমন ? ফয়সল সাহেবের মনে হলো, সে দেখতে অন্ধ ভিখারির মতো। নোংরা পুতিগন্ধময় তার পোশাক। হাতে লম্বা লম্বা কালো নখ। সমস্ত গায়ে কুষ্ঠরোগীর ঘা। সেই ঘা থেকে লালাভ রস ঝরছে।

আজও ফয়সল সাহেব নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ নিয়ে জেগে উঠলেন। ঘড়ি দেখলেন—সন্ধ্যা ছ'টা। হঠাৎ তাঁর খটকা লাগল সন্ধ্যা না সকাল ? তাঁর মাথা দুলতে লাগল। সময়ের জ্ঞান কি চলে যাচ্ছে ? এ কেমন কথা ? তিনি ভয় পাওয়া গলায় ডাকলেন, বীথি বীথি!

বীথি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকল। সাদা একটা শাড়ি তার গায়ে। লাল একটা শাল ছড়িয়ে দিয়েছে শাড়ির ওপর। শালের উপর মাথার ঘন কালো চুল এলিয়ে দিয়েছে। অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য। এইসব দৃশ্য তিনি আর বেশিদিন দেখবেন না। একজন অচেনা-অজানা যুবক এই মেয়েটির হাত ধরে ছাদে হাঁটাহাঁটি করবে। অসহ্য। ফয়সল সাহেবের মুখে যন্ত্রণার ছাপ পড়ল।

তিনি মুখ কুঁচকে ফেললেন। বীথি ক্ষীণ স্বরে বলল, স্যার আমাকে ডেকেছেন ?

হুঁ।

কী জন্যে ?

এখন সকাল না সন্ধ্যা ?

বীথি বিস্মিত হয়ে বলল, সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা হলে কোথাও আলো নেই কেন ?

বারান্দায় বাতিটা জ্বালিয়ে দেব ?

দরকার নেই, তুমি বসো আমার পাশে।

বীথি বসল।

এত দূরে বসছ কেন ? নাকি বুড়ো মানুষদের কাছে বসতে ভালো লাগে না ? চেয়ারটা টেনে আরও কাছে নিয়ে এসো।

বীথি চেয়ার টানল। ফয়সল সাহেব বীথির ডান হাতের ওপর নিজের হাত রাখলেন। বীথির কোনোরকম ভাবান্তর হলো না। যেভাবে বসেছিল ঠিক সেইভাবেই বসে রইল।

বীথি!

জি।

আমি এই বাড়িটা তোমার নামে লিখে দিয়ে যাব।

বীথি কিছু বলল না। ফয়সল সাহেব বললেন, বারো কাঠা জমির ওপর বাড়ি। জমির ভ্যালুয়েশনই হবে তোমার বিশ লাখ টাকা। বাড়ির দাম আর ধরলাম না। কি কথা বলছ না কেন ?

বীথি শান্তস্বরে বলল, চা খাবেন স্যার ? চা নিয়ে আসি ?

না, চা আনতে হবে না। বসে থাক চুপচাপ। হাত ধরে আছি বলে কি তোমার খারাপ লাগছে ?

জি-না স্যার।

ফয়সল সাহেব বীথির ফর্সা হাতের দিকে তাকালেন। কী ফর্সা হাত! কী নরম! এই কোমল পেলব হাতের ওপর তাঁর হাতটাকে কী কুৎসিত দেখাচ্ছে। তাঁর বুকের ভেতর একটি নিঃশ্বাস পাক খেতে লাগল। ভোগ করবার কত কী আছে পৃথিবীতে, কিন্তু সময় এত অল্প। কিছুই ভোগ করা যায় না। সময় এত কম।

বীথি!

জি স্যার।

বাড়িটা তোমাকে দান করে যাব। বুঝতে পারছ ?

অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, বাতি জ্বেলে দেই ?

দাও।

বীথি উঠে গিয়ে বাতি জ্বালাল। এই মেয়েটি আরও সুন্দর হয়েছে। ঘন কালো চোখ। এত কালো চোখ হয় মেয়েদের ?

বীথি!

জি!

চোখে কাজল দিয়েছ নাকি ?

জি-না।

তুমি যাচ্ছ কোথায় ?

আপনার জন্যে কিছু খাবার নিয়ে আসি।

কিছু আনতে হবে না। যেখানে বসেছিলে সেখানে বসে থাক।

বীথি এসে বসল। ফয়সল সাহেব আবার তাঁর হাত তুলে নিলেন। সময় ফুরিয়ে আসছে। নখদন্ত নিয়ে অপেক্ষা করছে কুৎসিত মৃত্যু! সে তার অন্ধ চোখে তাকিয়ে আছে বারান্দার দিকে।

ফয়সল সাহেবের ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। 'বৃক্ষ বারবার তার যৌবন ফিরে পায়। প্রতি বসন্তে নতুন পাতা আসে তার গায়ে, কিন্তু মানুষের যৌবন আসে একবার।' কোথায় পড়েছেন এটা ? কার লেখা ? ওসমানের কোনো বইতেই কি পড়েছেন ? এমন একটি চমৎকার কথা তার অপদার্থ ছেলে কী করে লিখবে ? নিশ্চয়ই অন্যকেউ লিখেছে। আজকাল কিছু মনে থাকে না।

বীথি।

জি।

ওসমানকে একটা টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করো তো—'বৃক্ষ বারবার তার যৌবন ফিরে পায়'—এই কথাটা সে তার কোনো বইয়ে লিখেছে কি না।

লিখেছেন। বইটির নাম হচ্ছে...

থাক নামের দরকার নেই। তুমি যাও বাতিটা নিভিয়ে দাও। আলো চোখে লাগছে।

বীথি আলো নিভিয়ে দিল।

১৭

রানু আজ একটু সকাল সকাল অফিস থেকে এসেছে। টগরকে নিয়ে একবার ডাক্তারের কাছে যাবে। দিন দিন এমন রোগা হয়ে যাচ্ছে কেন সে ? ভিটামিন-টিটামিন কিছু খাওয়ানো দরকার।

বাসায় ঢুকতে গিয়ে সে চমকে গেল। বসার ঘরের দরজা হাট করে খোলা। সিগারেটের গন্ধ আসছে। অথচ ঘর তালাবন্ধ থাকার কথা। অপলা কলেজ থেকে ফিরবে পাঁচটায়। টগর খালার কাছে। অসময়ে তালা খুলে ঘরে বসে থাকবে কে ?

আলম বসেছিল। রানুকে দেখে সে ফ্যাকাশেভাবে হাসল। রানু বলল, ঘরে ঢুকলে কীভাবে ?

নিচ থেকে চাবি এনে খুলেছি।

ভালো করেছ। কেমন আছ তুমি ?

আলম জবাব দিল না। তার ফর্সা গাল ঈষৎ লাল হয়ে আছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। তাকে নার্ভাস প্রকৃতির মানুষ বলা যাবে না। কিন্তু আজ তাকে নার্ভাস লাগছে। রানু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। একজন নার্ভাস মানুষ হঠাৎ অস্বাভাবিক কিছু করে বসতে পারে। রানু বেশ সহজভাবেই বলল, তুমি বসো, আমি হাতমুখ ধুয়ে আসছি।

আলম কিছু বলল না। আরেকটি সিগারেট ধরাল। রানু বলল, চা-টা কিছু খাবে ?

না। পানি খাব। এক গ্লাস পানি দাও।

রানু পানি দিয়ে গেল। আলম একটি চুমুক দিয়েই গ্লাস নামিয়ে রাখল। বিস্বাদ কিছু মুখে দিলে মানুষের চোখমুখ যেভাবে বিকৃত হয় তার চোখ মুখও সেরকম হয়েছে। আলম বলল, একটু তাড়াতাড়ি আসবে রানু।

তোমার কি কোনো তাড়া আছে ?

না।

তাহলে বসো। আমার দেরি হবে না।

রানু দেরি করতে লাগল। ঠিক এই মুহূর্তে আলমের সামনে বসে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে না। সবসময় সব কিছু ভালো লাগে না। আলম একটি চমৎকার ছেলে। তার সঙ্গে গল্প করতে রানুর ভালো লাগে। কিন্তু আজ কেন জানি ইচ্ছা করছে না।

রানু অনেকখানি সময় নিয়ে গোসল করল। বালতিতে ভেজা কাপড় ছিল, সেগুলি ধুয়ে ফেলল। কাজটা উল্টা করা হলো। কাপড়গুলি আগে ধোয়া উচিত ছিল। সে দ্বিতীয়বার গায়ে পানি ঢালতে লাগল। তার মধ্যে কি শুচিবায়ুর কোনো লক্ষণ দেখা দিচ্ছে ? সম্ভবত দিচ্ছে। বাইরে কোথাও গেলেই সমস্ত শরীর নোংরা মনে হয়। এসব আগে ছিল না। নতুন দেখা দিয়েছে।

আলম গম্ভীর মুখে বসে আছে চেয়ারে। বসার ভঙ্গি রাগী রাগী। রানু ঘরে ঢুকেই বলল, দেরি করে ফেললাম, তাই না ?

হ্যাঁ, তা করেছ। ঠিক এক ঘণ্টা ছ'মিনিট দেরি করেছ।

আই অ্যাম সরি।

আলম শীতলস্বরে বলল, তুমি ইচ্ছা করে এতটা দেরি করলে। আমার মনে হয় তুমি আমাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছ।

এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা কেন ?

আমি জানি না কেন ? কিন্তু তুমি করছ। এটা অবশ্যি নতুন না, প্রায়ই তুমি এরকম করো। করো না ? বলো করো কি করো না ?

আমরা সবাই কখনো কখনো প্রিয়জনদের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি। আমি যেমন করি তুমিও তেমন করো। ঠিক না ?

আলম জবাব দিল না। রুমাল বের করে মুখ মুছল। এটা তার বিদায় নেওয়ার লক্ষণ। উঠবার সময় হলেই সে রুমাল বের করে মুখ মোছে। চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে নেয়। অভ্যাসটা মেয়েলি। পুরুষমানুষের চেহারা সম্পর্কে এতটা সচেতন হওয়া ঠিক না।

আলম বলল, আমি উঠছি।

এখনই উঠবে কী ? বস, চা খাও।

সে হ্যাঁ না কিছুই বলল না। যেভাবে বসেছিল সেভাবেই বসে রইল।

রানু চা বানাতে চলে গেল। অপলা এসে ঢুকল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। পাঁচটা বেজে গেছে নাকি ? অপলা আসে পাঁচটার দিকে।

আলম ভাই, কেমন আছেন ?

ভালো।

এমন মুখ কালো করে রেখেছেন কেন ? আপার সঙ্গে ঝগড়া-টগড়া হয়েছে নাকি ?

না।

দারুণ একটা খবর আছে—দাঁড়ান বলছি। ভেরি অ্যাকসাইটিং। অপলা রান্না ঘরে চলে গেল।

তোমার অফিস কেমন হলো আপা ?

ভালো।

টগর ফেরেনি এখনো ?

না।

দারুণ একটা ব্যাপার হয়েছে আপা।

রানু কোনোরকম উৎসাহ দেখাল না। অপলা প্রায়ই দারুণ খবর বলে। যেসব খবর বলে সেগুলি খুবই হালকা ব্যাপার।

আজ আমাদের কলেজে নবীন বরণ উৎসব হলো। দু'জন বিখ্যাত লেখককে আনা হয়েছিল। একজন হচ্ছেন... আন্দাজ করো তো কে ?

রানু জবাব দিল না।

দুলাভাই। চমৎকার একটা বক্তৃতা দিলেন। এমন সব হাসির কথা বলতে লাগলেন—আমরা হাসতে হাসতে বাঁচি না। দুলাভাই যে এমন হাসাতে পারেন জানতাম না। সাধারণ সব গল্প এমন অন্য রকম করে বলতে লাগলেন—একটা গল্প হচ্ছে একজন ভূতের গল্পের লেখককে নিয়ে। ভদ্রলোক একদিন দুপুরবেলা গল্প লিখতে বসেছেন...

বলতে হবে না। গল্পটা আমি জানি। তুই বসার ঘরে চা-টা দিয়ে আয়।

গল্পটা শেষ করে যাই, এক মিনিট লাগবে।

শেষ করার দরকার নেই।

অপলা থেমে থেমে বলল, দুলাভাই লোকটিকে তুমি পছন্দ না করতে পার, কিন্তু তার গল্পগুলি তো ভালো। গল্প তো কোনো দোষ করেনি ?

রানু উত্তর না দিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। অপলা চা দিতে গিয়ে গল্প শুরু করেছে। হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছে—

বুঝলেন আলম ভাই, আমি তো ভাবিনি দুলাভাইকে দেখব। আমি প্রায় চিৎকার করে উঠেছিলাম। বহু কষ্টে সামলেছি। অনুষ্ঠান শেষে অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্যে ঠেলাঠেলি পড়ে গেল। আমিও অচেনা মেয়ের মতো খাতাটা বাড়িয়ে দিয়েছি। তারপর কী হয়েছে শোনেন...

আলমের কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না। সে নিশ্চয়ই থমথমে মুখে বসে আছে।

বাড়ির সামনে রিকশা এসে থেমেছে। একজন অপরিচিত লোক টগরকে কোলে করে নামছে রিকশা থেকে। কার-না-কার হাতে ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন খালা। রানু টগরের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল। টগর তাকাল। হাসল না, হাত নাড়ল না, কিছুই করল না। কী যে অদ্ভুত হচ্ছে ছেলেটা। সমস্ত দিন মাকে দেখেনি, কিন্তু সে নির্বিকার। যেন মাকে সারা দিন দেখতে না-পাওয়া একটা স্বাভাবিক ঘটনা।

বসার ঘরে অপলা একাই কথা বলে যাচ্ছে। আর তার উচ্ছ্বাস এবং আবেগ দুইই খুব উঁচু তারে বাঁধা। দুলাভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে, এটাই কি উচ্ছ্বাসের মূল কারণ?

আলম ভাই, এই গল্পটা শোনেন। একজন লেখক শুধু ভূতের গল্প লেখেন। একদিন দুপুরবেলায়...

অপলা, তোমার গল্পটা অন্যদিন শুনব। আজ আমার একটা কাজ আছে, আমি উঠব।

এক মিনিট লাগবে। বসুন না।

প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। অন্য একদিন শুনব।

বসুন, আপাকে ডাকি।

না থাক, ওকে ডাকতে হবে না।

আলম ভাই, আপনাদের কি রাগারাগি হয়েছে?

না না কিছুই হয়নি।

আলম ঘর থেকে বের হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টগর ঢুকল। অপলা ব্যস্ত হয়ে পড়ল টগরকে নিয়ে।

এই টগর আজ কী হয়েছে বল তো?

কী হয়েছে?

আমাদের ফাংশনে একজন বিখ্যাত লোক এসেছিলেন। সেই লোকটি লম্বা। চোখে কালো চশমা। বল তো লোকটি কে?

বাবা?

হুঁ। যা কাণ্ড হয়েছে না।

কী হয়েছে?

রানু বসার ঘরে ঢুকে দেখল—টগর অপলার কোলে বসে আছে। মাকে ঢুকতে দেখে লাজুক ভঙ্গিতে হাসল।

কেমন ছিলে সারা দিন, টগর ?

ভালো।

সারা দিন বাসাতেই ছিলে, না অন্য কোথাও গিয়েছিলে ?

টগর সে কথার জবাব দিল না। মুখ টিপে হাসল। যেন এটি একটি অপ্রয়োজনীয় কথা, এর জবাব দেওয়ার দরকার নেই। বাবার কিছু কিছু স্বভাব সে পেয়ে যাচ্ছে। যেসব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার সে কোনো প্রয়োজন মনে করবে না সেসব প্রশ্নের সে জবাব দেবে না। রানু সবসময় ভাবত টগরের বাবা এটা অন্যদের ভাগিয়ে দেওয়ার জন্যে করে থাকে। এখন মনে হয় না। এখন মনে হয়, এটা তার স্বভাব। রানু বলল, টগর, দুপুরে কী দিয়ে ভাত খেয়েছ ?

টগর এই প্রশ্নটিরও জবাব দিল না। সম্ভবত এটাও তার কাছে একটি অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন। সে অপলার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কী যেন বলল। রানু শীতলস্বরে জিজ্ঞেস করল, কী বলছ টগর ? টগর চুপ করে রইল। অপলা হাসি মুখে বলল, দুলাভাই আমাদের ফাংশনে কী বললেন তাই জানতে চাচ্ছে।

এটা ফিসফিস করে বলার দরকার কী ?

হয়তো ভাবছে তুমি রেগে যাবে।

আমি রেগে যাব কেন ?

না রাগলেও বিরক্ত হবে। তার কথা উঠলেই তুমি নীরব হও। হও না ?

রানু লক্ষ করল, অপলা কাটা কাটা জবাব দিচ্ছে। তার গলার স্বর তীক্ষ্ণ। যেন সে একটা ঝগড়া বাঁধাতে চায়। রাগিয়ে দিতে চায় রানুকে। টগর অপলার গলা জড়িয়ে ধরে কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছে। রানু সহজস্বরে বলল, যাও টগর, হাত-মুখ ধুয়ে আস। আমি তোমাকে নিয়ে হাঁটতে যাব।

কোথায় ?

রাস্তায় হাঁটব। শিশুপার্কের দিকেও যেতে পারি। যাবে ?

টগর মাথা নাড়ল। সে যাবে কিন্তু তার মধ্যে তেমন কোনো উৎসাহ দেখা গেল না। যেন নেহায়েত মাকে খুশি করার জন্যে রাজি হওয়া।

রাতে ঘুমুতে যাওয়ার আগে রানু উঁকি দিল অপলার ঘরে। সে গভীর মনোযোগে খাতা খুলে দেখছে। রানুকে ঢুকতে দেখেই সে খাতা বন্ধ করে ফ্যাকাসেভাবে হাসল। রানু লক্ষ করল, অপলার মুখ লালচে হয়ে আছে।

তোর এখানে একটু বসি অপলা ?

বস। আমার এখানে বসতে হলে আবার অনুমতি লাগবে নাকি ?

অপলা নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল। রানু বলল, তোর ঐ খাতায় তোর দুলাভাই কি অটোগ্রাফ দিয়েছে ?

হুঁ।

দেখতে পারি ?

অপলা খাতা বের করল। দু'লাইনের একটি লেখা—'হায় সখী, এ তো স্বর্গপুরী নয়/ পুষ্পে কীট সম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয়।' গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। দেখতে ভালো লাগে।

অপলা ভয়ে ভয়ে বলল, যারা অটোগ্রাফের জন্যে গিয়েছে দুলাভাই তাদের সবার খাতাতেই এরকম সুন্দর সুন্দর লাইল লিখে দিয়েছেন।

জানি। এরকম অসংখ্য লাইন তার মুখস্থ।

তুমি রাগ করোনি তো আপা ?

রাগ করব কেন ?

অপলা মাথা নিচু করে বসে রইল। রানু বলল, কিন্তু তুই এমন ভাব করছিস যেন তোকে একটা প্রেমপত্র লিখে দিয়েছে। তুই এই লেখাটা কম করেও এক লক্ষবার পড়েছিস। পড়িসনি ?

তুমি শুধু শুধু রাগ করছ আপা।

না রাগ করছি না। একজন লেখক তার ভক্ত-পাঠিকাকে সুন্দর একটা কবিতার লাইন লিখে দিয়েছে, এতে রাগ করার কিছু নেই। কিন্তু সেই পাঠিকা যদি মনে করে এই লাইনটি তার জন্যেই লেখা তাহলেই মুশকিল।

কী মুশকিল ?

রানু বলল, তোকে একটা গল্প বলি শোন। আমার বিয়ের পরপর একবার একটি মেয়ে তাকে চিঠি লিখল। বিবাহিত মেয়ে। বিয়েতে ওর কিছু বই পেয়েছিল। সেই বই পড়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে লেখা চিঠি। ও চিঠির জবাব দিল। মেয়েটি আবার লিখল। চমৎকার চিঠি। তারপর একদিন এল দেখা করতে। মেয়েটি দেখতে ভালো নয়। কালো বেঁটে অসম্ভব রোগা। তোর দুলাভাই মেয়েটিকে দেখেই রেগে গেল। মুখ কালো করে বলল, আমি এখন লিখছি, এখন কথা বলতে পারব না। অথচ এই মেয়েটিকে সে সুন্দর চিঠি লিখেছে, বই পাঠিয়েছে।

তারপর ?

তারপর আবার কী! তোর দুলাভাই চলে গেল অন্য ঘরে। মেয়েটি ঘণ্টাখানিক বসে রইল। আমি দু'একটি কথা-টথা বলতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে কথা বলতে আসেনি।

দুলাভাই আর কথা বললেন না ?

না। তবে মেয়েটি যদি সুন্দরী হতো সে তার সামনে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাহিত্য নিয়ে আলাপ করত। আগ্রহ নিয়ে বলত, জীবন কী, জীবনের মানে কী ? মেয়েটি আবার ঘুরে আসত।

অপলা ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। রানু বলল, লোকটির মধ্যে কোনো কিছুর প্রতি কোনো মমতা নেই। মানুষের প্রতি যার মমতা নেই সে লেখক হতে পারে না। লেখকরা মানুষের কথা লেখেন। মমতা ছাড়া তাদের কথা লেখা যায় না।

কিন্তু তিনি তো লিখছেন।

ঐ সব ট্র্যাস। ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়ার জিনিস। যে কবিতার লাইন তোর খাতায় লিখেছে তার পেছনেও কোনো সত্য নেই। অন্যের ধার করা লাইন। তার গল্প-উপন্যাসও সেরকম। তুই ঐ পাতাটি ছিঁড়ে ফেলে দে।

অপলা অবাক হয়ে বলল, কী বলছ তুমি ?

ঠিকই বলছি, ছিঁড়ে ফেল।

না, ওটা আমি ছিড়ব না।

দে পাতাটা আমার কাছে।

অপলা খাতা দিল না। বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল। রানু খাতাটা হাতে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেলল।

আপা তুমি এরকম করলে কেন ?

ঠিকই করেছি।

না, তুমি ঠিক করোনি। এটা আমার জিনিস। আমার জন্যে লেখা। এটা তুমি ছিঁড়তে পার না। তোমার নিজের যা আছে সেসব ছিঁড়ে ফেলো। আমার গুলি কেন ?

অপলা কেঁদে ফেলল। রানু বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল অপলার দিকে। সে নিজেও নিজের আচরণে খুব অবাক হয়েছে। সে কেন এরকম করল ? সমস্ত ব্যাপারটাই ঘটেছে আলমের জন্যে। আলম আজ না এলে এটা হতো না। তার আসার কারণেই রানু অস্থিরতায় ভুগছিল। খাতা ছিঁড়ে ফেলার পেছনে অন্য কোনো যুক্তি নেই। এমন ছেলেমানুষি একটি কাণ্ড রানু করতে পারে না।

অপলা, আই অ্যাম সরি। কিছু মনে করিস না।

অপলা টেবিলে মাথা রেখে কাঁদছে। রানু তার পিঠে হাত রাখল। হঠাৎ তার মনে হলো, অপলার মতো একটি মেয়ের সঙ্গে ওসমানের বিয়ে হলে বেশ হতো। এই কথাটি তার কেন মনে হলো কে জানে!

ওসমান সাহেব বাথরুমে হাতমুখ ধুচ্ছিলেন। কাল রাতে তাঁর ভালো ঘুম হয়নি। চোখ লাল হয়ে আছে। মাথা ভার ভার। এই অবস্থাতেই তাঁকে বেরুতে হবে। আজ অনেকগুলি কথা বলবেন। কলেজে যাবেন। প্রিন্সিপ্যালকে বলবেন, মাস্টারি আর করব না। আমি অসুস্থ। মাস্টারিতে মন বসছে না। রানুর কাছে যাবেন। রানুকে বলবেন বেশ কিছুদিনের জন্যে তিনি গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছেন। নবীর কাছে যেতে হবে। নবী খবর পাঠিয়েছে খুব দরকার।

ওসমান সাহেব বাথরুম থেকে বেরিয়েই দেখলেন রানু এসেছে। সকাল সকাল হঠাৎ তার আসার কোনো কারণ নেই।

কী ব্যাপার রানু ?

রানু সহজ স্বরে বলল, তুমি একটা কাগজে লিখে দাও—'হায় সখী, এ তো স্বর্গপুরী নয়/ পুষ্পে কীট সম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয়।' তারপর নাম সই করো।

কেন ?

দরকার আছে। এই নাও কাগজ।

ওসমান সাহেব লিখতে বসলেন।

লিখতে লিখতে বললেন, তুমি কেমন আছ রানু ?

রানু কিছু বলল না। ওসমান সাহেব বললেন, বাবার শরীর খারাপ হয়েছে। বেশ খারাপ।

তাতে তো তোমার কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। অন্যের অসুখবিসুখে তোমার কিছু যায় আসে না। তোমার উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা সুখে থাকলেই হলো। ওরা সুখে আছে তো ?

তিনি হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতেই বললেন, দাঁড়িয়ে আছ কেন ? বসো। কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে আমার ভালো লাগে না। দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটা ঝগড়ার আর বসার ভঙ্গিটা হচ্ছে সন্ধির।

বসলেই সন্ধি হয়ে যাবে তোমার সঙ্গে ? কেন অদ্ভুত কথাবার্তা বলে আমাকে ভোলাতে চাইছ ? আমি অপলা নই।

ওসমান সাহেব কাগজ এগিয়ে দিলেন। রানু দেখল শুধু দুটি লাইনই নয়, বেশ ক'টি লাইন সেখানে লেখা। 'বিদায় অভিশাপ' পুরো কবিতাটি তার মুখস্থ। বিয়ের রাতে কী মনে করে যেন সে কবিতাটি শুনিয়েছিল। হয়তো রানুকে অভিভূত করতে চেয়েছিল। রানু কি অভিভূত হয়েছিল ? রানুর মনে পড়ল না।

১৮

মিলি বসে আছে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে।

মিলির বর এতটা আশা করেনি। তার ধারণা ছিল ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা শুনে সে রেগে উঠবে। হইচই করবে। ইদানীং সে খুব হইচই করছে। কিন্তু আজ সে বেশ শান্ত। সহজ সুরে পাশে বসা মহিলার সঙ্গে কথা বলছে। মহিলা পান খাচ্ছেন। তিনি নিশ্চয়ই পেসেন্ট নন। কোনো রোগী ডাক্তারের কাছে এসে এমন আরাম করে পান চিবোয় না। মিলি তার বরকে হাত ইশারা করে ডাকল। মতিয়ুর নড়ল না। কাছে গেলেই মিলি হয়তো চট করে রেগে যাবে। সহজ-স্বাভাবিক ভাব মুহূর্তের মধ্যে মাটি হবে। মিলি নিজেই এগিয়ে এল। হাসি মুখে বলল, আমাকে একটা পান এনে দেবে ? পান খেতে ইচ্ছা হচ্ছে।

ডাক্তারের কাছেও সে বেশ স্বাভাবিক রইল। মাথা নিচু করে শান্ত গলায় বলল, পান খাচ্ছি বলে রাগ করছেন না তো ? ডাক্তার সাহেব হাসলেন।

না, রাগ করব কেন ?

আমার বড়ভাই খুব রাগ করেন।

তাই বুঝি ?

জি। কাউকে পান খেতে দেখলেই তার নাকি গরুর জাবর কাটার কথা মনে হয়। ভাইয়া এমনিতে খুব গম্ভীর। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন সব মজার কথা বলে! আপনি আমার ভাইকে চেনেন তো?

হ্যাঁ নামে চিনি। টিভিতে একবার দেখেছিলাম কী একটা প্রোগ্রামে যেন এসেছিলেন। টিভিতে খুব লাজুক মনে হচ্ছিল।

উনার কোনো বই পড়েছেন?

গল্পের বই পড়ার অভ্যাস আমার খুব কম।

আমারও কম। ভাইয়া আমাকে নিয়ে একটি উপন্যাস লিখেছে, সেটি শেষ করতেও আমার এক মাস লেগেছে। আপনি বোধহয় আমার কথা বিশ্বাস করছেন না।

বিশ্বাস করব না কেন?

কেউ বিশ্বাস করে না।

মিলি হাই তুলল। সন্ধ্যাবেলার দিকে তার একবার প্রচণ্ড ঘুম পায়। তারপর বাকি রাতটা কাটে জেগে। কী কষ্ট! কী কষ্ট!

আপনার ভাইকে আপনি খুব পছন্দ করেন?

হুঁ।

আর কাকে পছন্দ করেন?

আর কাউকে না।

কাউকে না?

না। আমার এই কথাটিও আপনি বিশ্বাস করছেন না, তাই না?

বিশ্বাস করব না কেন?

আমার কেন জানি শুধু মনে হয় কেউ আমার কথা বিশ্বাস করে না। আমি অবশ্যি খুব মিথ্যা কথা বলি।

সে তো আমরা সবাই বলি। আমিও বলি।

মিলি খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। ডাক্তার সাহেব অপেক্ষা করতে লাগলেন। মিলি বলল, আপনি আমার সব কথাতেই সায় দিচ্ছেন, কারণ আপনার ধারণা আমি পাগল। তাই আমাকে না রাগাবার চেষ্টা করছেন।

আপনার ধারণা ঠিক নয়। আপনি একজন সুস্থ মানুষ। আপনার কথায় সুন্দর লজিক আছে। একজন মানসিক রোগীর কথাবার্তায় কোনো লজিক থাকে না। প্রায়ই ওরা বুদ্ধিমানের মতো কনভারসেশন চালিয়ে যেতে পারে, কিন্তু লজিকে এসে আটকে যায়।

আমি কিন্তু সত্যি সত্যিই পাগল।

ডাক্তার সাহেব হেসে ফেললেন। মিলিও হাসল। এই ডাক্তারটিকে তার পছন্দ হয়েছে।

ক্লিনিক থেকে বেরিয়েই মিলি বলল, আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। তাকিয়ে থাকতে পারছি না। মতিয়ুর বলল, বাসায় যাচ্ছি। বাসায় গিয়েই ঘুমিয়ে পড়বে। সে তার স্ত্রীর

হাত ধরল। অনেকদিন পর সে স্ত্রীর প্রতি অন্য এক ধরনের মমতা অনুভব করছে। অসহায় শিশুর জন্যে যে ধরনের মমতা অনুভব করা হয় সে ধরনের মমতা।

মিলি বলল, আমার বাসায় যেতে ইচ্ছা করছে না।

বাসায় না গেলে কোথায় যাবে ? রাস্তায় ঘুরবে খানিকক্ষণ ?

না। আমাকে ভাবির বাসায় নিয়ে চলো। অনেকদিন ভাবিকে দেখি না। তাঁকে দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে।

কাল সকালে গেলে হয় না ?

সকাল উনাকে পাওয়া যাবে না। অফিসে চলে যান। তাছাড়া এখন আমার যেতে ইচ্ছা করছে, সকালে হয়তো যেতে ইচ্ছা করবে না। ভাবির সঙ্গে আমার খুব জরুরি কথা আছে।

কী কথা ?

মিলি জবাব দিল না। তার ঘুম পাচ্ছে। গাড়িতে উঠেই সে চোখ বন্ধ করে এলিয়ে পড়ল। কে জানে আজ রাতে হয়তো তার গাঢ় ঘুম হবে। জেগে জেগে রাত কাটাতে আর ভালো লাগছে না।

মতিয়ুর নরম গলায় বলল, ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে তোমার কী কথা হলো ?

তেমন কোনো কথা হয়নি। আমি পান খাচ্ছিলাম তো তাই দেখে উনি খুব রেগে গেলেন।

রাগলেন কেন ?

ভাইয়ার মতো স্বভাব। ভাইয়াও তো রাগত।

বলেই মিলি হাসল। মতিয়ুর আর কিছু বলল না।

মিলিকে দেখে রানু খুবই অবাক হলো।

একী অবস্থা তোমার মিলি! শরীরের এরকম হাল কেন ?

আমি পাগল হয়ে গেছি ভাবি।

কী বলছ আবোলতাবোল ? আসো, তুমি বিছানায় শুয়ে থাকো। তোমার এতটা শরীর খারাপ হয়েছে আমি জানতামই না।

টগর চোখ বড় বড় করে দেখছে মিলিকে। অপলক তাকিয়ে আছে। মিলি বলল, ভাবি ওকে বলো চলে যেতে, আজ রাতে আমি তোমার সঙ্গে ঘুমাব। বলেই সে লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল। এই কথাটি সে দীর্ঘদিন পরে বলল। তার বিয়ের পরও সে বেশ অনেকবার অসময়ে চলে এসেছে রানুর কাছে। লজ্জিত ভঙ্গিতে বলেছে, ভাবি আজ রাতে তোমার সঙ্গে ঘুমাব। রানু হেসে বলল, ঝগড়া কিছু করেছ ?

না, ঝগড়া না। এমনি। ভাইয়াকে বলো অন্য ঘরে ঘুমুতে। আজ সারা রাত গল্প করব আমরা দু'জন। কেমন ভাবি ?

হ্যাঁ করব।

গল্প অবশ্যি করা হতো না। শোয়া মাত্রই মিলি ঘুমিয়ে পড়ত। নিশ্চিন্ত ঘুম। আজ অনেকদিন পর মিলির আবার হয়তো পুরনো শখ জেগে উঠেছে। সারা রাত গল্প করার কথা বলবে, কিন্তু বিছানায় যাওয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়বে।

মতিয়ুর মিলিকে রেখে যেতে রাজি হলো না। নিচুগলায় বলল, ওর শরীর খুবই খারাপ। ও যে কী পরিমাণ বিরক্ত করে ধারণাও করতে পারবেন না। রাতে একজন ডাক্তার এসে থাকেন। আজ সে অনেক ভালো। কতক্ষণ এরকম ভালো থাকবে বলা মুশকিল।

হঠাৎ করে এরকম হলো কেন ?

হঠাৎ করে হয়নি। ধীরে ধীরে হয়েছে। আপনি অনেকদিন পর দেখছেন বলে আপনার কাছে এরকম লাগছে।

ডাক্তার কী বলছেন ?

তেমন কিছু বলছেন না। বলার মতো হয়তো কিছু নেই। আমি গাড়ি রেখে যাচ্ছি, ঘণ্টাখানিক বা ঘণ্টা দুয়েক পর পাঠিয়ে দেবেন।

মিলি বিছানায় শুয়েছিল। অপলা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। টগর অনেক দূরে বসে তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। মিলি টগরের প্রতি কোনোরকম উৎসাহ দেখাল না। যেন সে টগরকে চিনতে পারছে না।

রানু বলল, তুমি কিছু খাবে মিলি ?

আমি কিছুই খাব না। তুমি আমার পাশে বসো।

তোমার শরীর এত খারাপ হয়েছে, আমাকে কিছু বলোনি কেন!

বললে তুমি কী করতে ?

মিলি ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। থেমে থেমে বলল, আমার জন্যে কেউ কখনো কিছু করে না। আমার মা করেনি, আমার বাবা করেনি, তুমি কেন করবে ? তুমি তো বাইরের মেয়ে। রানু কিছু বলল না। চেয়ার টেনে মিলির পাশে এসে বসল।

আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি, তখন একদিন বাবা আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। কারণ খুব সামান্য। মা'র একটা শাড়ি পরে ছাদে হাঁটছিলাম। বাবার ধারণা হলো, পাশের বাসার একটা ছেলের সঙ্গে খাতির জমানোর চেষ্টা করছি। তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ তো ভাবি ?

করছি।

আমি অবশ্যি প্রচুর মিথ্যা কথা বলি, তবে মাঝে মাঝে সত্যি কথাও বলি। আমারই হয়তো লেখক হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু লেখক হয়ে গেল ভাইয়া। যে তার সারা জীবনে কোনো মিথ্যা কথা বলেনি। মজার ব্যাপার, তাই না ভাবি ?

মিলি তাকাল রানুর দিকে। সে হয়তো মনে মনে ভেবেছে এই জায়গাতে রানু আপত্তি করবে, কিন্তু রানু কিছু বলল না। মিলি বলল, ভাইয়া প্রসঙ্গে এই কথাটা কি আমি ঠিক বললাম ভাবি ?

বোধহয় ঠিক।

তবে আমার কী মনে হয় জানো ভাবি, আমার মনে হয় সব মানুষের মিথ্যা বলার অভ্যেস থাকা উচিত। এতে অনেক ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ভাইয়ার যদি মিথ্যা বলার অভ্যাস থাকত তাহলে আর তোমাদের এই ঝামেলা হতো না।

রানু ঠান্ডা গলায় বলল, তোমার তো মিথ্যা বলার অভ্যাস আছে। তোমাদের কোনো ঝামেলা হয় না ?

হয়।

মিথ্যা কথা বলা না-বলার ওপর কোনো সম্পর্ক নির্ভর করে না।

মিলি একটি নিঃশ্বাস ফেলল। অপলা বলল, আপনার বাবা আপনাকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন তারপর কী হলো সেটা বলুন, আমার খুব শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে। রানু বিরক্তস্বরে বলল, ঐসব শুনে কী হবে ?

আমার শুনতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে আপা।

মিলি হাসি মুখে বলল, ব্যাপারটা খুব কষ্টের, কিন্তু এখন কেন জানি আমার হাসি লাগছে। বাবা আমাকে ছাদ থেকে ডেকে আনলেন, তারপর খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন, যে ছেলেটিকে ভোলাবার জন্যে তুমি এত সাজসজ্জা করে ছাদে হাঁটাহাঁটি করছ তার সঙ্গে চলে যাও। এই বলেই দারোয়ানকে গেট বন্ধ করে দিতে বললেন। আমি গেটের বাইরে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার গায়ে ঝলমলে একটা শাড়ি। কিন্তু পায়ে কিছু নেই। খালি পায়ে ছাদে হাঁটছিলাম তো।

তারপর ?

তার পরটা শুনে কী হবে ? বাদ দাও। বাবার স্বভাবই ছিল এরকম। আমাদের দুই ভাই বোনকে কী পরিমাণ কষ্ট যে দিয়েছেন! ভাইয়ার প্রথম বই যখন বের হলো খুব হইচই হলো। অল্পদিনের মধ্যেই ভাইয়া বিখ্যাত হয়ে গেল। তখন বাবা ইংরেজিতে একটা বিশাল প্রবন্ধ লিখলেন এবং সেই প্রবন্ধে প্রমাণ করলেন যে বইটা কোনো এক ফরাসি বিখ্যাত উপন্যাসের দুর্বল অনুকরণ। মিলি শব্দ করে হাসতে শুরু করল। হাসতে হাসতে তার চোখে পানি এসে গেল। রানুর এই প্রথমবারের মতো মনে হলো মিলি বেশ অসুস্থ।

বুঝলে ভাবি, আমরা দু'জন খুব কষ্ট করেছি।

রানু কথা ঘোরাবার জন্যে বলল, তোমার মেয়ে কেমন আছে ?

জানি না কেমন আছে। বোধহয় ভালোই আছে ?

জানো না মানে ?

ও তো আমার সঙ্গে থাকে না। একেক সময় একেকজনের সঙ্গে থাকে। এখন আছে তার এক ফুফুর সঙ্গে। আমার তো মাথার ঠিক নেই—আমার সঙ্গে রাখতে ভরসা পায় না। কখন কী করে বসি। কয়েকদিন আগে আমার কাছে এনেছিল, আমি এমন ভাব করলাম যেন চিনতে পারছি না। আমি মাঝে মাঝে পাগলের ভান করি এবং বেশ ভালোই করি।

মিলি আবার উঁচুস্বরে হাসতে শুরু করল। হাসতে হাসতেই বলল, ভাবি, আমি উঠব।

এখনই উঠবে ?

হ্যাঁ, এসো তুমি আমাকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দাও।

রানু বলল, টগরকে আদর করলে না ? সবসময় তো আদর করতে।

এখন আমার আর ছোট বাচ্চাকাচ্চা ভালো লাগে না ভাবি। টগর, যাই ? অপলা, যাচ্ছি কেমন ?

আবার এসো।

না, আমি আর আসব না।

কেন ?

মিলি হাসতে হাসতে বলল, আর আসতে ইচ্ছা করবে না। অপলা হেসে ফেলল। মিলি বলল, আমার কথা তুমি বিশ্বাস করছ না, তাই না ? মাঝে মাঝে আমি কিন্তু সত্যি কথা বলি।

রানু মিলিকে ধরে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামল। মিলি বলল, আমি নিজে নিজেই নামতে পারব। আমাকে যতটা দুর্বল দেখাচ্ছে তত দুর্বল আমি না। আমি বেশ শক্ত। মাঝে মাঝে দুর্বল হওয়ার ভান করি।

কেন করো ?

যাতে ও আমাকে ভালোবাসে।

মিলি আবার হেসে ফেলল। আদুরে গলায় বলল, আমার শুধু ভালোবাসা পেতে ইচ্ছা করে।

রানু বলল, সে তো সবারই করে। মিলি শান্তস্বরে বলল, না সবার করে না। যেমন তুমি, তোমার কি করে ?

রানু জবাব দিল না।

ভাবি, এখন বিদেয় হচ্ছি। বকবক করে সবার মাথা ধরিয়ে দিয়েছি। পাগল মানুষ, কী করব বলো ?

১৯

রাত তিনটায় ফয়সল সাহেব একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলেন। তার ইদানীংকালের স্বপ্নগুলি অস্পষ্ট কিন্তু আজ রাতের স্বপ্ন অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি দেখলেন, একটা প্রকাণ্ড নেকড়ের মতো জন্তু তাকে কামড়াচ্ছে। বাঁ পায়ে কামড় দিয়ে এক টুকরো মাংস সে ছিঁড়ে নিল। তিনি জেগে উঠলেন বাঁ পায়ে তীব্র ব্যথা নিয়ে। জেগে উঠেও তাঁর মনে হলো, সত্যি সত্যি তাঁর পা থেকে নেকড়েটা বোধহয় মাংস ছিঁড়ে নিয়েছে। মাঝে মাঝে স্বপ্ন ও সত্যের সীমারেখা অস্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি ভয়-পাওয়া গলায় বীথিকে ডাকতে লাগলেন।

বীথি এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। নরম স্বরে বলল, কী হয়েছে স্যার ?

স্বপ্ন দেখেছি।

কী স্বপ্ন ?

কী স্বপ্ন মনে নেই। তুমি ওসমানকে টেলিফোনে ধরো দেখি।

এখন অনেক রাত স্যার।

সেটা কি আমি জানি না ? তোমাকে যা করতে বলেছি করো।

বীথি টেলিফোন সেট শোবার ঘরে নিয়ে এল। ওসমান সাহেবকে পেতে দেরি হলো না। বীথি অস্পষ্টস্বরে বলল, আপনি স্যারের সঙ্গে কথা বলুন।

হ্যালো ওসমান ?

জি। কী ব্যাপার বাবা ?

ব্যাপার কিছু না। তুই কী করছিলি ?

ঘুমাচ্ছিলাম। রাত তিনটা বাজে।

রাত তিনটা বাজলেই ঘুমাতে হবে এমন কোনো কথা নেই। রাত তিনটার সময়ও অনেকে জেগে থাকে।

তা থাকে। আপনি কিছু বলবেন ?

হ্যাঁ বলব। আমি এই বাড়িটা বীথির নামে দানপত্র করতে চাই।

করতে চান, করুন।

তা তো করবই। তোর অনুমতি লাগবে নাকি ? আমি করেই রেখেছি। আলমারিতে দলিল আছে। তোকে টেলিফোন করলাম এই জন্যে যাতে পরে কোনো ঝামেলা না হয়।

কী ঝামেলা হবে ?

তোরা যদি মনে করে বসিস যে আমার মাথা ঠিক ছিল না। কোর্ট-কাছারি করা শুরু করিস।

এ সব কিছুই করব না। আপনার শরীর কি ঠিক আছে ?

ফয়সল সাহেব কিছু না বলে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। বীথিকে বললেন, আমার মধ্যে যে সব খারাপ জিনিস আছে তার কোনোটাই আমার ছেলের মধ্যে নেই। ও ছোটবেলা থেকে আমাকে দেখে দেখে নিজেকে ঠিক করেছে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। মানুষ উল্টোটা করে। খারাপটাই শেখে।

বীথি বলল, আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে ?

হুঁ লাগছে। তুমি একটা টেলিফোন করো এম্বুলেন্সের জন্যে, হাসপাতালে নিয়ে যাও। চেষ্টা করে দেখো আরও কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখতে পার কি না।

ফয়সল সাহেব চোখ বন্ধ করে আধশোয়া হয়ে বসলেন। গেটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অন্ধ ভিখারির ছবিটি তাঁর সামনে ভেসে উঠল। ভিখারিটির সঙ্গে এবার একটি নেকড়ে আছে। নেকড়েটির মুখ হাসি হাসি। পশুরা হাসতে পারে না কথাটা ঠিক না। ছোটবেলায় ভালুকের খেলা দেখাতে একটি লোক এসেছিল। তাঁর স্পষ্ট মনে আছে ভালুকটা তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছিল। ভয়ঙ্কর একটি দৃশ্য। তিনি প্রায় রাতেই এই ভালুকটাকে স্বপ্নে দেখতেন।

ফয়সল সাহেব চোখ মেললেন। বীথি টেলিফোন করছে। কী সুন্দর লাগছে! কী চমৎকার একটি দৃশ্য!

বীথি।

জি স্যার।

পাওয়া গেছে কাউকে ?

এম্বুলেন্স আসছে স্যার।

কাউকে খবর দেওয়ার দরকার নেই। তুমি একাই আমাকে নিয়ে যাও।

বীথি ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

ফয়সল সাহেব মারা গেলেন এম্বুলেন্সে। নিঃশব্দ মৃত্যু। বীথি তাঁর হাত ধরে বসে ছিল। সে পর্যন্ত বুঝতে পারল না। যেমন হাত ধরে ছিল তেমনিই ধরে থাকল।

২০

মিলি একাই কাঁদছে।

ওসমান সাহেব লক্ষ করলেন, বাবার মৃত্যু তাকে তেমন অভিভূত করতে পারছে না। অস্বস্তি লাগছে এই পর্যন্তই। তার মনে হলো, এখন যদি কেউ বলে—আপনার এখানে থাকার দরকার নেই আপনি চলে যান, তাহলে তিনি খুশিই হবেন। তাঁর প্রচণ্ড চায়ের পিপাসা হচ্ছে।

ফয়সল সাহেবের শরীর সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা। সাদা চাদর এখানে একটা রহস্যের সৃষ্টি করেছে। আড়াল মানেই রহস্যময়তা। গোল্ডেন রীমের চশমাপরা একজন ডাক্তার এসে বলল, আপনারা সবাই এখানে ভিড় করছেন কেন ? বাইরে অপেক্ষা করেন। ডেডবডি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

মিলি চেঁচিয়ে কাঁদছে। গ্রাম্য ধরনের কান্না। বিরক্তিকর। ওসমান সাহেব মৃদুস্বরে বললেন, চুপ কর মিলি। মিলি চোখ বড় বড় করে বলল, কেন চুপ করব, কেন ?

সবাইকে বিরক্ত করছিস।

বেশ করছি।

ওসমান সাহেব ডাক্তারের কাছে এগিয়ে গেলেন। যেন ক্ষমা প্রার্থনা করছেন এমন ভঙ্গিতে বললেন, আমরা এক্ষুনি ডেডবডি নেওয়ার ব্যবস্থা করব। আপনি কিছু মনে করবেন না। ডাক্তার তাকাল অবাক হয়ে।

আপনি কে ?

যে মানুষটি মারা গেছেন আমি তাঁর বড় ছেলে।

ডাক্তার তাকিয়ে আছে। তার চোখে বিস্ময়। ওসমান সাহেবের মনে হলো শুধু বিস্ময় নয় অভিযোগও আছে। যেন সে বলছে, তুমি মৃত ব্যক্তিটির ছেলে অথচ তোমার চোখ শুকনো, তুমি দিব্যি নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে হাঁটাহাঁটি করছ। তোমার বোনকে বলছ—কান্না বন্ধ করতে। এটা ঠিক না।

তিনি বারান্দায় চলে গেলেন। লম্বা বারান্দায় বহু লোকজন অপেক্ষা করছে। প্রতীক্ষা। প্রতীক্ষার মতো খারাপ আর কিছুই নেই। এরা সবাই প্রতীক্ষা করছে। তিনি সিগারেট ধরালেন। ডেডবডি নেওয়ার ব্যবস্থা তিনি না থাকলেও হবে। এবং ভালোভাবেই হবে। এ সময় তার আর থাকতে ইচ্ছা করছে না। থাকার প্রয়োজনও নেই। এসমস্ত কাজের জন্যে প্রচুর উৎসাহী লোকজন আছে। এরা খুব আগ্রহ নিয়ে ছোটাছুটি করবে।

আচ্ছা তিনি কি তাঁর কোনো উপন্যাসে মৃত্যু বর্ণনা করেছেন ? তিনি মনে করতে পারলেন না। তবে দীর্ঘ বর্ণনা কোথাও নেই—এটা প্রায় একশ ভাগ গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায়। মৃত্যু ব্যাপারটি তিনি সবসময় এক-দুই লাইনে সারতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর ধারণা তিনি একা নন, মৃত্যুর বর্ণনা খুব কম লেখকই দিয়েছে। সবার মধ্যে একটা পাশ কাটানোর ভাব। প্রায় সবাই ফিলসফি করার চেষ্টা করেছেন। মূল বর্ণনা, তেমন নেই।

শরৎচন্দ্রের দেবদাসেরও একই ব্যাপার। শরৎচন্দ্র পাঠককে বললেন—মরণে ক্ষতি নাই। কিন্তু সেই সময় একটি সুখকর স্পর্শ কপালে আসিয়া পৌঁছে যেন একটি দয়ার্দ্র স্নেহময় মুখ দেখিতে দেখিতে জীবনের ইতি হয়।

ওসমান সাহেব।

তিনি চমকে তাকালেন। বেঁটে মতো লোকটিকে চিনতে পারলেন না। কিছু কিছু মুখ সবসময় অচেনা থাকে। দীর্ঘ পরিচয়েও তাদের কখনো চেনা মনে হয় না।

আপনি এখানে কী করছেন ?

কিছু করছি না।

সবাই আপনাকে খুঁজছে।

কেন ?

ডেডবডি বের করতে হবে না ?

বের করুন। আমাকে দরকার কেন ?

বেঁটে লোকটি অবাক হয়ে বলল, সেকি আপনি ধরবেন না ?

কী ধরব ?

লাশ বের করার সময় ধরতে হবে না ?

না।

আরে আপনি বলেন কী ?

বেঁটে লোকটির বিস্ময়ের সীমা রইল না। তাঁর বিস্ময় দেখে ওসমান সাহেব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। লাশ বের করার সময় তাঁর বোধহয় ধরা উচিত। এটা নিশ্চয় কোনো একটা সামাজিক নিয়ম। কুৎসিত সব নিয়মাকানুন চালু আছে এ সমাজে।

ওসমান সাহেব শীতলস্বরে বললেন, যা করতে হয় আপনারা করুন। আমাকে টানবেন না। প্লিজ।

লোকটি চলে গেল। শেষমাথা পর্যন্ত গিয়ে পিছন ফিরে তাকাল, তার মানে সে বড়ই অবাক হয়েছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না বলেই দ্বিতীয়বার তাকিয়েছে।

তিনি ঘড়ি দেখলেন। ঘড়ি কি বন্ধ হয়ে আছে ? মাত্র আটটা বাজে। হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেলে কেমন হয় ? একটা রিকশায় উঠে চলে যাওয়া যায়। বাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করলেই হবে।

ওসমান সাহেব, স্লামালিকুম।

ওয়ালাইকুম সালাম।

দ্বিতীয় এই লোকটিকেও তিনি চিনতে পারলেন না। এও কি এসেছে তাঁকে নিয়ে যেতে ?

আমি এখানকার একজন ডাক্তার। আমার নাম নাজমুল।

কেমন আছেন ?

স্যার ভালো আছি। আপনাকে প্রথম দেখে আমি চিনতে পারিনি। চেনা চেনা লাগছিল। এখানে কী করছেন ? কোনো পেসেন্ট আছে নাকি ?

হ্যাঁ, একজন ছিলেন। আমার বাবা। মারা গেছেন।

ডাক্তার সাহেব একটু হকচকিয়ে গেলেন। সান্ত্বনা দেওয়ার ব্যাপারটা ডাক্তাররা একেবারেই পারে না। রোগীর মৃত্যু মানেই ডাক্তারদের পরাজয়। পরাজিত মানুষজন কখনো গুছিয়ে কিছু বলতে পারে না। ওসমান সাহেব বললেন, আপনি কি আমাকে এক কাপ চা খাওয়াতে পারেন ?

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আসুন স্যার আমার সঙ্গে।

আমাকে স্যার বলছেন কেন ?

ডাক্তার সাহেব হেসে ফেললেন। হাসি মুখে বললেন, আপনি আমার কাছে অনেক বড় ব্যক্তি। আপনার প্রায় লেখাই আমি দু'তিনবার পড়েছি।

ওসমান সাহেব কিছু বললেন না। ডাক্তার সাহেব বললেন, আমার সৌভাগ্য আপনার সঙ্গে দেখা হলো। আমার অনেক কিছু জিজ্ঞেস করার আছে আপনাকে।

জিজ্ঞেস করুন।

আজ না, অন্য একদিন।

ডাক্তারের ঘরটি ছোটখাটো কিন্তু বেশ সুন্দর করে সাজানো। দেয়ালে সূর্যাস্তের একটা জলরঙ ছবি পর্যন্ত আছে। ফুলদানিতে কিছু প্লাস্টিকের ফুল। এটা চোখে লাগে। প্লাস্টিক দিয়ে ফুল বানানোর বুদ্ধি মানুষকে কে দিল কে জানে।

চায়ের কথা বলে এসেছি। আপনি স্যার আরাম করে বসুন।

আরাম করেই বসেছি।

তিনি ঘড়ি দেখলেন। ঘড়ি বোধহয় বন্ধই হয়ে আছে, এখনো আটটা বাজে।

ক'টা বাজে বলতে পারবেন ডাক্তার সাহেব ?

আটটা।

তাই নাকি ?

জি। আটটা বেজে দু'মিনিট হবে। আমার ঘড়ি একটু স্লো।

ওসমান সাহেব হঠাৎ অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি একটা জিনিস লক্ষ করছেন, মৃত্যুপ্রসঙ্গ আমি মোটামুটি এড়িয়ে গেছি ? আমার উপন্যাসগুলির কোনোটিতে মৃত্যুবিষয়ক কোনো বর্ণনা নেই।

এটা তো স্যার ঠিক বললেন না। আপনার 'অন্যদিন' উপন্যাসে মৃত্যুর দীর্ঘ বর্ণনা আছে। চমৎকার বর্ণনা। মা মারা যাচ্ছে। তার ছোট ছেলে ও বড় মেয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট ছেলেটির বয়স পাঁচ বছর, বড় মেয়েটির বয়স দশ বছর। শীতের রাত।

তিনি চমকে উঠলেন। তাঁর মনে ছিল না এই দৃশ্যটি তিনি ব্যবহার করেছেন। ডাক্তার সাহেব বললেন, স্যার বর্ণনা এত আন্তরিক যেন মনে হয় লেখকের চোখের সামনে এই ঘটনা ঘটেছে।

ওসমান সাহেব ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, চোখের সামনেই ঘটেছে। ছোট ছেলেটি হচ্ছি আমি আর বড় মেয়েটি আমার বোন। ওর নাম ছিল নীলাঞ্জনা। খুব কাব্যিক নাম। আমার মায়ের রাখা। ও মারা যায় এগারো বছর বয়সে।

বলতে বলতে তাঁর গলা ধরে এল। দীর্ঘদিন পর তাঁর চোখ ভিজে উঠল। মানুষের দুঃখগুলি কোথায় লুকানো থাকে ?

চা নিন স্যার। চিনি হয়েছে ?

হ্যাঁ, হয়েছে।

আপনার বোধহয় সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। সিগারেট আনিয়ে দেই ?

দিন। আপনার নামটা ভুলে গেছি। কী নাম বলেছিলেন যেন ?

নাজমুল। নাজমুল হক।

নাজমুল সাহেব, চায়ের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি কি এখন কাইন্ডলি দেখবেন আমার বাবার ডেডবডি নেওয়ার ব্যাপারে ওরা কতদূর কী করেছে। উনি একুশ নম্বর বেডে ছিলেন।

ডাক্তার সাহেব বের হয়ে গেলেন। ওসমান সাহেব ঘড়ি দেখলেন। সাড়ে আট। সময় সত্যি সত্যি থেমে গেছে। আইনস্টাইন সাহেবের থিওরি অব রিলেটিভিটি। কোথায় যেন পড়েছিলেন ফাঁসির আসামির কাছে সময় স্লথ হয়ে যায়। এক-এক মিনিটও তাদের কাছে মনে হয় অনন্তকাল। সেই হিসাবে এরাই সবচেয়ে দীর্ঘজীবী মানুষ।

ডাক্তার সাহেব সিগারেটের একটা প্যাকেট হাতে নিয়ে ঢুকলেন। মৃদুস্বরে বললেন, ওরা এখন বেরুচ্ছে। একটা এম্বুলেন্সে ডেডবডি নেওয়া হচ্ছে। আসুন স্যার। ওরা অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে।

ওসমান সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

সিগারেট নিন স্যার।

তিনি সিগারেট নিলেন। ধন্যবাদ-জাতীয় কিছু বলা উচিত, বলতে পারলেন না। বলার বোধহয় প্রয়োজনও নেই।

নাজমুল সাহেব, যাই।

স্যার, আবার দেখা হবে।

'অন্যদিন'-এর কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে ভালো করেছেন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

ডাক্তার সাহেব কিছুই বুঝতে পারলেন না। ওসমান সাহেব থেমে থেমে বললেন, অনেকদিন পর আপনি আমার বড় বোনের কথা মনে করিয়ে দিলেন। থ্যাংকস।

ন'টার মধ্যে ফয়সল সাহেবের বাড়ি মানুষজনে ভরে গেল। ঢাকা শহরের পরিচিত অর্ধ পরিচিত সব আত্মীয়স্বজন চলে এসেছে। গেট দিয়ে ঢুকছে অত্যন্ত চিন্তিত ও বিষণ্ন মুখে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। একদল ঘুরে বেড়াচ্ছে অলস ভঙ্গিতে, অন্য একদল দারুণ ব্যস্ত। যদিও এতটা ব্যস্ততার কোনোই কারণ নেই। সবাইকে খবর দেওয়া। পত্রিকার অফিসে নিউজ পাঠানো। ফটোগ্রাফার এনে ছবি তোলানো। অসংখ্য কাজ।

ওসমান সাহেব দোতলার বারান্দায় চাদর গায়ে দিয়ে বসেছিলেন। তাঁর একটু শীত শীত করছে। বীথি এসে বলল, আপনি ভেতরে গিয়ে বসুন না। শীত লাগছে তো।

না, ঠিক আছে। মিলি কী করছে ?

ও শুয়ে আছে।

জ্ঞান ফিরেছে ?

হ্যাঁ, ডাক্তার সিডেটিভ দিয়েছে। ঘুমিয়ে পড়বে কিছুক্ষণের মধ্যেই। আপনি কিছু খাবেন ? দু'পিস কেক এনে দেই ?

দিন।

বলেই তাঁর লজ্জা লাগল। দু'ভাইবোনের একজন ঘনঘন ফিট হচ্ছে। অন্যজন দিব্যি বসে আছে। কেক-বিস্কিট খাচ্ছে।

আপনি একটু মিলিকে ডেকে দিন।

ওকে এখন আর ডাকাডাকি করবেন না। ঘুমুতে দিন।

মিলির হাসবেন্ড কোথায় ?

উনি মিলির সঙ্গে আছেন। উনাকে ডেকে দেব ?

না থাক।

বীথি খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, ডেডবডি তো গ্রামের বাড়িতে যাবে। আপনি যাচ্ছেন তো সঙ্গে ?

গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছে নাকি ?

হ্যাঁ। স্যার সেরকম বলে গেছেন। আপনি কি যাচ্ছেন সঙ্গে ?

কখন যাবে ?

কাল ভোরে। ট্রাক ভাড়া করতে গেছে। আপনি একটু কিছু মুখে দিয়ে নিচে গিয়ে বসুন। এভাবে বসে থাকা ভালো দেখায় না।

নিচে গিয়ে আমি করবটা কী ?

কিছু করতে হবে না। বসে থাকবেন।

ওসমান সাহেব নিচে নেমে আসতেই নতুন একটা উদ্দীপনা দেখা দিল। খাটের চারপাশে কয়েকজন দোয়া-দরূদ পড়ছিলেন, তাঁদের গলার স্বর হঠাৎ অনেকখানি উঁচুতে উঠে গেল। ওসমান সাহেব লক্ষ করলেন, অনেকেই রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন। সম্পূর্ণই লোক দেখানো ব্যাপার। তাঁর বাবা এমন কোনো মানুষ ছিলেন না যাঁর মৃত্যুতে পরিচিত মানুষজন চোখের জল ফেলবে।

তিনি কঠিন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কাউকে কখনো নরমস্বরে কিছু বলেননি। আশপাশের প্রতিটি মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে এত লোকজন রুমালে চোখ মুছছে ব্যাপারটা হাস্যকর।

ধূপকাঠি এবং আতরের গন্ধে ওসমান সাহেবের মাথা ধরে গেল। তবু তিনি বসেই রইলেন। লম্বা এবং রোগা ধরনের একজন মাওলানা সাহেব কোরান শরীফ পড়ছেন। তাঁর গলা অপূর্ব। কোরান পাঠের মতো একটি ব্যাপার এত সুন্দর হতে পারে তা তাঁর কল্পনাতেও ছিল না। পড়ার ভঙ্গিতে, গলার স্বরে কোথাও যেন একটি অপার্থিব কিছু আছে যা মন ছুঁয়ে যায়। তিনি চোখ বন্ধ করে ফেললেন।

ওসমান, একটু শুনে যাও তো।

তিনি চোখ মেললেন। মগবাজারের সিদ্দিক সাহেব। তাঁর দূরসম্পর্কের চাচা।

একটু বাইরে আসো আমার সাথে।

তিনি বারান্দায় এলেন। সিদ্দিক সাহেব নিচুস্বরে বললেন, ঘরের আলমারির সব চাবি নিজের কাছে নিয়ে যাও, নয়তো হরি লুট হয়ে যাবে।

হরি লুট হওয়ার মতো কিছু নেই।

তুমি বললেই হলো, নেই। কিছুই জানো না তুমি। ক্যাশ টাকাই আছে দশ-বারো হাজার।

দেখি।

না, দেখাদেখির কিছু নাই। আর শোনো, এই বাড়িভর্তি ফালতু লোকজন এদের সরাবার ব্যবস্থা করো।

কেন ?

পরে আর সরাতে পারবে না। গ্যাট হয়ে বসবে। দান করে গেছেন। হেন-তেন সতেরো কথা বলবে।

ওসমান সাহেব কিছু বললেন না।

তোমার বলতে লজ্জা লাগে তো আমি বলে দেব।

আপনার বলার দরকার নেই।

খুব দরকার আছে। তুমি ব্যাপারটার গুরুত্বই বুঝতে পারছ না। তা ছাড়া শুনলাম বাড়িঘর সব নাকি ঐ মেয়েকে দিয়ে গেছেন ?

হ্যাঁ, দিয়ে গেছেন।

একদম চেপে যাও। আমি দেখব ব্যাপারটা, তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।

ওসমান সাহেব আবার দোতলায় চলে এলেন। মিলি ঘুমায়নি, খুন খুন করে কাঁদছে। সে কি বাবার মৃত্যুর জন্যেই এমন কাঁদছে না পুরনো কোনো দুঃখের কথা ভেবে ভেবে কাঁদছে ? জানার কোনো উপায় নেই। নিজের মনকেই কখনো জানা যায় না, অন্যের মন জানার তো প্রশ্নই ওঠে না।

ওসমান সাহেব সিগারেট ধরিয়ে হাঁটতে লাগলেন। খিদে লেগেছে। ক'টা বেজেছে কে জানে! বীথি এগিয়ে আসছে। অন্ধকারে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। কেন জানি ওসমান সাহেবের ইচ্ছা হলো বীথির মুখ ভালো করে লক্ষ করতে। গালে চোখের জলের কোনো চিহ্ন আছে কি না। চোখ লাল হয়ে আছে কি না। তিনি হাত ইশারা করে বীথিকে ডাকলেন।

বীথি এগিয়ে এল।

কিছু বলবেন ?

ওসমান সাহেব নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, অনেকদিন ধরে আমি কিছু লিখতে পারছি না। বীথি তাকিয়ে রইল। বেশ কিছুক্ষণ কোনো কথা বলল না। ওসমান সাহেব বললেন, মৃত্যু আমার কাছে খুব ছোট ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে। আমার কষ্ট অনেক বেশি।

বীথি কোমলস্বরে বলল, আপনি রানু ভাবিকে নিয়ে আসুন। একটা গাড়ি নিয়ে চলে যান।

ওকে এনে কী হবে ?

বাবার মৃত্যুসংবাদ তো অন্তত তাঁকে দিন। দেওয়া উচিত। টগরকেও আনুন। ওসমান সাহেব রানুকে খবর দিতে গেলেন অনেক রাতে।

রানু ঘুমিয়ে পড়েছিল। এত রাতে তাঁকে আসতে দেখে সে খুব অবাক হলো। চিন্তিত মুখে বলল, কী হয়েছে ? বাবার মৃত্যুসংবাদ দেওয়ার বদলে ওসমান সাহেব ক্লান্তস্বরে বললেন, রানু আমি কিছু লিখতে পারছি না।

২১

রানু অবাক হয়ে বলল, রাত এগারটার সময় তুমি আমাকে এই খবরটা দিতে এলে ?

ওসমান সাহেব চুপ করে রইলেন। রানুর পেছনে পেছনে অপলাও এসে দাঁড়িয়েছে। তার চোখে মুখে কৌতূহল। সে বলল, কী ব্যাপার দুলাভাই ? রানু কাটাকাটা গলায় বলল, তোর দুলাভাই ইদানীং লিখতে পারছে না এই খবরটা দিতে এসেছে।

দুলাভাই ভেতরে এসে বসেন।

ওসমান সাহেব বসবার ঘরে এসে ঢুকলেন। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বসলেন সোফায়। চাপা গলায় বললেন, টগর কি ঘুমুচ্ছে ? রানু বলল, হ্যাঁ।

ওর শরীর ভালো আছে ?

ভালোই আছে।

এক কাপ চা খাওয়াতে পার রানু ? প্রচণ্ড শীত বাইরে।

রানু কিছুই বলল না। অপলা বলল, আপনি আরাম করে বসুন। আমি চা নিয়ে আসছি। আপা তুমি খাবে ?

না।

খাও না একটু। তিন কাপ নিয়ে আসি। গল্প করতে করতে খাব।

রানু কড়া চোখে তাকাল অপলার দিকে। অপলা সেই দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করল। দুলাভাইয়ের হঠাৎ করে এই রাতের বেলা উপস্থিত হওয়াটা তার খুব ভালো লাগছে। কেমন যেন উৎসব মনে হচ্ছে তার কাছে। সে হালকা পায়ে চা আনতে গেল।

ওসমান সাহেব বললেন, রানু, এক গ্লাস পানি খাব।

রানু বলল, তোমার কী হয়েছে ?

আমার কিছু হয়নি।

তোমাকে আমি খুব ভালোভাবে চিনি। অকারণে তুমি এত রাতে এখানে আসবে না। তোমার অহঙ্কারে লাগবে। কী হয়েছে, বলো।

বাবা মারা গেছেন।

কখন ?

রাতে। ঠিক টাইমটা বলতে পারব না। খেয়াল করিনি।

রানু দীর্ঘ সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ওসমান সাহেব নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে সিগারেট টানতে লাগলেন। একসময় বললেন, হঠাৎ করে বেশ শীত পড়ে গেল, তাই না রানু ? নাকি শুধু আমার একারই শীত লাগছে ?

শীত পড়েছে।

রানু উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। খোলা দরজায় ঠান্ডা বাতাস আসছে। ওসমান সাহেব বললেন, তুমি কি যাবে আমার সঙ্গে ? বাবা তোমাকে খুব পছন্দ করতেন। রানু ঠান্ডা গলায় বলল, একটা মৃত্যুসংবাদ দিতে এসে তুমি নিজের লিখতে না পারার খবরটা আগে দিলে। লেখাটা কি এতই জরুরি ?

তিনি কিছু বললেন না। রানু তীক্ষ্ণস্বরে বলল, লেখকরা অন্য মানুষের চেয়ে আলাদা এটা আর যে-ই বিশ্বাস করুক আমি করি না।

আমি আলাদা এটা কখনো দাবি করিনি।

দাবি করতে হবে কেন ? আচার-আচরণ দিয়ে তুমি বুঝিয়ে দিতে চাও তুমি আলাদা।

তাই কি ?

হ্যাঁ তাই। তোমার বাবা মারা গেলেন। এটা একটা ভয়াবহ ব্যাপার। অথচ তুমি নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে এসে বললে, রানু, আমি লিখতে পারছি না। এর মানে কী ?

মৃত্যু খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

একজন লেখক লিখতে না পারলে বাংলা সাহিত্যের এমন কোনো ক্ষতি হবে না।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষতি নিয়ে আমি ভাবি না। আমি আমার নিজের কথাই ভাবি।

এটা ঠিকই বলেছ। নিজেকে ছাড়া তুমি আর কিছুই ভাবতে পার না।

রানু উঠে দাঁড়াল। ওসমান সাহেব বললেন, চলে যাচ্ছ নাকি ?

কাপড় বদলে আসি। যেতে হবে না ? তোমার সঙ্গে গাড়ি আছে ?

আছে। মিলির গাড়ি নিয়ে এসেছি।

ওরা গাড়ি কিনেছে নাকি ?

জানি না কিনেছে কি না।

তা জানবে কেন ?

অপলা চায়ের কাপ নামিয়ে মৃদুস্বরে বলল, দুলাভাই, আমার খারাপ লাগছে। আমি বুঝতে পারিনি আপনি একটা মৃত্যুসংবাদ নিয়ে এসেছেন।

তিনি দ্বিতীয় সিগারেট ধরিয়ে শান্তস্বরে বললেন, তোমাকে অন্যরকম লাগছে কেন অপলা ?

কী রকম ?

একটু যেন অচেনা লাগছে!

শাল গায়ে দিয়েছি তো সেইজন্যে। আপনি আমাকে শাল গায়ে দেওয়া অবস্থায় কখনো দেখেননি।

তোমরা কখন কোন পোশাক পরে কার সামনে গিয়েছ এটা কি মনে রাখো নাকি ?

অপলা লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল, হাসতে হাসতেই বলল, চা-টা ভালো হয়েছে দুলাভাই ?

খুব ভালো হয়েছে। চমৎকার। বসো অপলা।

অপলা বসল তাঁর সামনে। তার মুখ হাসি হাসি। চোখ চিকমিক করছে। এর মানে হচ্ছে ওসমান সাহেবের চেহারায় কোনো দুঃখের ছাপ নেই। ছাপ থাকলে অপলা এমন খুশি খুশিভাবে তাঁর সামনে এসে বসত না। একজনের দুঃখ অন্যজনের ওপর ছায়া ফেলে। ওসমান সাহেবের মন খারাপ হয়ে গেল।

অপলা, তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে ?

কোথায় ?

আমাদের বাড়িতে। টগরকেও নিয়ে চলো।

আপনি রানু আপাকে বলুন। আপা রাজি না হলে তো যাওয়া হবে না।

রানুকে কিছু বলতে হলো না। সে-ই এসে অপলাকে তৈরি হতে বলল। টগরকে ঘুম ভাঙিয়ে কাপড়-জামা পরাতে বসল। টগর কিছুই বলল না। যেন রাতদুপুরে ঘুম

ভাঙিয়ে কাপড়-জামা পরানোটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। শিশুসুলভ কোনোকিছুই তার মধ্যে নেই। এরকম হচ্ছে কেন ছেলেটা ?

রানু বলল, টগর, আমরা তোমার দাদার বাড়িতে যাচ্ছি।

আচ্ছা।

তোমার দাদা মারা গেছেন।

টগরকে এবার কৌতূহলী হতে দেখা গেল। সে চোখ বড় বড় করে তাকাল। রানু বলল, মানুষ যখন খুব বুড়ো হয় তখন তারা মারা যায়।

বাচ্চারা মারা যায় না ?

না।

টগর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বাচ্চারাও মারা যায়। আমি দেখেছি।

কোথায় দেখলে তুমি ?

টগর কোনো উত্তর দিল না। রানু তীক্ষ্ণস্বরে বলল, কোথায় দেখলে তুমি বলো শুনি।

বলব না।

বলবে না কেন ?

বলতে ইচ্ছা করছে না।

তারা বাড়িতে পৌঁছাল একটার দিকে। টগরের চোখে ঘুমের লেশ মাত্র নেই। সে অপলার গলা জড়িয়ে ধরে আছে। অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে দেখছে চারদিকে। মাঝে মাঝে ফিসফিস করে অপলার কানে কানে কী যেন বলছে এবং অপলা বিরক্ত হচ্ছে।

লোকজন বাড়িতে অনেক কম। বেশিরভাগ আত্মীয়স্বজনই চলে গেছেন। যারা আছেন তাঁদের একটা বড় অংশ বসার ঘরে ঝিমুচ্ছে। কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়েছে। আগের জমজমাট ভাব এখন আর নেই। চারদিক মোটামুটিভাবে নিঃশব্দ। শুধু মাওলানা সাহেব এখনো ক্লান্তিহীন। তিনি আগের মতোই সুরেলা গলায় কোরান শরীফ পড়ছেন। সারা রাতই হয়তো পড়বেন।

ওসমান সাহেবের মনে হলো, এই মওলানা সাহেব এর আগেও নিশ্চয়ই অনেক মৃত মানুষের পাশে বসে কোরান শরীফ পড়েছেন। সমস্ত ব্যাপারটিতেই এখন তিনি অভ্যস্ত। এটা তার একটা রুটিন কাজ। অথচ মনে হচ্ছে কী গভীর আবেগ নিয়েই না তিনি কোরান শরীফের আয়াত পড়ে যাচ্ছেন, একটির পর একটি। লেখকরাও তো অনেকটা সে রকম। রুটিন মতো লিখতে বসেন। পাঠকরা সে লেখা পড়ে মনে করে কী গভীর আবেগ ও মমতা নিয়েই না লেখাগুলি লেখা হয়েছে। পাঠকরা হাসে ও কাঁদে।

ওদের ঢুকতে দেখে বীথি এগিয়ে এল। টগরকে বলল, বাবু তুমি আমার কোলে আসবে ? টগর দু'হাত বাড়িয়ে দিল। যেন এর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। অথচ বীথির সঙ্গে তার পরিচয় নেই। বীথি রানুকে বলল, আপনি আসুন আমার সঙ্গে, বাবুকে শোয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। রাতটা নিশ্চয়ই থাকবেন ?

হ্যাঁ থাকব।

আপনার জন্যে একটা ঘর গুছিয়ে রেখেছি।

রানু বীথির সঙ্গে দোতলায় উঠে গেল। অপলা বলল, এই মেয়েটি কে দুলাভাই ?

আমার বাবার সেক্রেটারি। বীথি।

আশ্চর্য, এমন সুন্দর মানুষ হয় ?

খুব সুন্দর নাকি ?

হ্যাঁ।

অপলা খুব অবাক হয়েছে। ওসমান সাহেবের মনে হলো, সৌন্দর্য ব্যাপারটা পরিবেশনির্ভর। গভীর রাতে অপলা একটি অপরিচিত বাড়িতে এসেছে। সে-বাড়িতে একটি মৃতদেহ আছে। স্বভাবতই অপলার মনে ভয় এবং সংশয় ছিল। সে নিশ্চয়ই ভেবে রেখেছিল এ বাড়িতে এসে সে দেখবে চারদিকে সবাই কাঁদছে। এরকম কিছু সে দেখেনি। সে দেখেছে বীথিকে। যার মুখে অন্য ধরনের একটি স্নিগ্ধতা আছে। যার কাঁধে হালকা নীল রঙের চাদর। পরনের শাড়ি সাদা রঙের। ছবিটি সুন্দর। কাজেই অপলার মনে হয়েছে, সে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর রমণীটিকে দেখেছে। দিনের আলোয় এরকম মনে হবে না। কিংবা হয়তো হবে। মনের ওপর প্রথম যে ছাপটি পড়ে তা দীর্ঘদিন থেকে যায়।

অপলা হাঁটতে লাগল ওসমান সাহেবের পিছু পিছু। একবার ক্ষীণস্বরে বলল, বিরাট বাড়ি আপনাদের দুলাভাই। রাজপ্রাসাদের মতো। এটাও একটা আপেক্ষিক কথা। রাতের জন্যে বাড়িটি প্রকাণ্ড মনে হচ্ছে। দিনের আলোয় আর সেরকম মনে হবে না।

অপলা।

বলুন।

কাল আমি ডেডবডি নিয়ে গ্রামের বাড়িতে যাব। ঐ বাড়িটিও খুব সুন্দর। তুমি যাবে আমার সঙ্গে ?

অপলা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বলল, হ্যাঁ দুলাভাই আমি যাব। তিনি ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। মাওলানা সাহেব একমনে কোরান পাঠ করছেন। সবাইকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন এ বাড়িতে একটি মৃত্যু ঘটেছে।

টগরকে ঘুম পাড়িয়ে রানু নিচে আসছিল। সিঁড়ির গোড়ায় এসে থমকে দাঁড়াল। বারান্দার রেলিং ধরে অপলা দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর পাশেই ওসমান। দু'জনের দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিতে অন্যরকম কিছু একটা আছে। রানুর বুকে ছোট্ট একটা ধাক্কা লাগল।

২২

দিন কি খুব দ্রুত কাটে ?

কারও কারও হয়তো কাটে। কিন্তু ওসমান সাহেবের ধারণা তাঁর দিন চলছে শামুকের মতো এবং কখনো একেবারে চলছেই না, থেমে আছে।

কিন্তু আজ বীথির কথা শুনে তিনি চমকে উঠলেন। দ্বিতীয়বারের মতো বললেন, বাবা মারা গেছেন এক বছর হয়েছে ? বলেন কী ?

বীথি হালকাস্বরে বলল, সময় খুব দ্রুত যায়। বলেই সে হাসল। সে-হাসি সে ধরে রাখল অনেকক্ষণ। কেউ কেউ দীর্ঘ সময় হাসি ধরে রাখে। কেউ কেউ ধরে রাখে বিষাদ। দুটিই কঠিন কাজ। বীথি বলল, আপনি আসবেন আজ সন্ধ্যায় ?

কী হবে সন্ধ্যায় ?

তেমন কিছু না। একটা মিলাদ পড়াবার ব্যবস্থা করেছি। অল্পকিছু লোককে আসতে বলেছি।

আমি যাব। আপনার সমিতি কেমন চলছে ?

ভালোই, আপনি তো কোনোদিন দেখতে এলেন না।

আজই তো যাচ্ছি। আজ দেখব। সমিতির মেয়েরা সব ওখানেই থাকে তো ?

সবাই থাকে না। কেউ কেউ থাকে। আমার মতো যাদের কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই তারা থাকে।

বীথি আবার হাসল। ওসমান সাহেবের মনে হলো, এই মেয়েটিকে তিনি মোটেই জানেন না। কখনো ভালোভাবে লক্ষ করেননি, কখনো ভাবেননি। একধরনের মানুষ থাকে যাদের দেখে মনে হয় এদের ভেতর তেমন কোনো রহস্য নেই। এদের লক্ষ করার কিছু নেই। বীথিকে কখনো সে-দলে ফেলা যাবে না। একজন রূপবতী তরুণীকে কখনো সে-দলে ফেলা যায় না। তবু তিনি বীথির প্রতি অনাগ্রহ বোধ করেছেন কেন ? বাবার কারণে কি ? বাবা যে জিনিসটা পছন্দ করবেন তাঁকে সেটি অপছন্দ করতে হবে এমন কিছু কি তাঁর মানসিকতায় ঢুকে গেছে ?

বীথি বলল, কী ভাবছেন ?

কিছু ভাবছি না।

বীথি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আপনার কাছে আমার একটি ক্ষমা প্রার্থনার ব্যাপার আছে। অনেকবার ভেবেছি ক্ষমা চাইতে আসব। কখনো ঠিক সাহস হয়নি।

ওসমান সাহেব বিস্মিত চোখে তাকালেন। বীথি বলল, স্যার আমাকে বাড়িটা লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার ধারণা ছিল এটা আমি কখনো পাব না। আপনারা আপত্তি তুলবেন। কোর্টে গেলে আপনাদের আপত্তি টিকে যাবে। কিন্তু আপনি উল্টোটা করলেন। বাড়িটি পেতে যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেটা দেখলেন।

উল্টোটা করলাম বলেই কি আপনি ক্ষমা চাইতে এসেছেন ?

না, সেজন্যে না। স্যার আমাকে বেশ কিছু নগদ টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। এটা আপনাদের কাছে গোপন করেছিলাম। ক্ষমা চাচ্ছি সে-কারণেই।

বীথি সত্যি সত্যি নমস্কারেরর ভঙ্গিতে হাত জোড় করল। ওসমান সাহেব সিগারেট ধরালেন। সমস্ত ব্যাপারটার ভেতর একটা নাটকীয়তা আছে। নাটকীয়তা তাঁর পছন্দ নয়। বীথি বলল, কত টাকা তা তো জিজ্ঞেস করলেন না ? আমার ধারণা ছিল লেখকদের কৌতূহল অনেক বেশি হয়।

আমি মিথ্যা মিথ্যা লেখক। আমার কৌতূহল কম।

টাকাটা আমার খুব কাজে লেগেছে। সমিতিটা দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। টাকা ছাড়া কিছুই করা যায় না। যেই টাকা হয়েছে অমনি আমার স্বপ্নটা সত্যি করে ফেলেছি।

বীথি উঠে দাঁড়াল। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর একজন তরুণী। চেহারায় অবশ্যি আগের কোমলতা নেই। একটা কাঠিন্য এসে গেছে কিন্তু তার জন্যে খারাপ লাগছে না। চেহারার সঙ্গে মানিয়ে গেছে। ওসমান সাহেবের মনে হলো, সবকিছুই মানুষের চেহারার সঙ্গে মানিয়ে যায়। যখন কেউ নতুন চশমা নেয় সেই চশমা মানিয়ে যায়। যখন চুলে পাক ধরে সেই পাকা চুলও মানিয়ে যায়।

বীথি বিদায় নেওয়ার সময় আরেকবার বলল, আপনি কিন্তু আসবেন।

ন'টার সময় যাওয়ার কথা। ওসমান সাহেব তার আগেই উপস্থিত হলেন। তাঁর জন্যে বড় ধরনের বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। তিনি নিজেদের পুরনো বাড়িটি চিনতে পারলেন না। সামনের বাগানে লম্বা গুদামঘরের মতো একটা ঘর উঠেছে। দু'পাশে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা ছিল, সেখানেও টিনের শেড দেওয়া একতলা দালান। তিনি হকচকিয়ে গেলেন। বীথি বলল, চিনতে পারছেন না, তাই না ?

না, পারছি না।

গুদামঘরের মতো যে লম্বা ঘরটি দেখছেন এটা আমাদের সিউইং সেকশন। তেত্রিশটা ইলেকট্রিক সেলাই মেশিন আছে।

বলেন কী!

দোতলার পুরোবাড়িটা হ্যান্ডিক্রাফট্ সেকশন, মেয়েরা এখানে হাতের কাজ শেখে। আমাদের কিছু অবৈতনিক ইনস্টাকটর আছেন। এখন একজন জাপানি ইনস্টাকটর পেয়েছি, হিরোকো কাশুইয়া। সুন্দর বাংলা বলেন।

এতসব করলেন কীভাবে ?

অনেকে সাহায্য করেছে। বিদেশী অর্গানাইজেশনগুলি সাহায্য করেছে। একটা বড় এমাউন্টের সরকারি সাহায্য পাওয়ার কথা। ওটা পেলে আমরা মিরপুরে মেয়েদের একটা হোস্টেল করব।

ওসমান সাহেবের বিস্ময়ের সীমা রইল না। বীথি গভীর আগ্রহে তাঁকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব কিছু দেখাতে লাগল। সঙ্গে সমিতির কিছু মেয়েও আছে। তাদের সবার বয়সই ত্রিশের নিচে। তারা ওসমান সাহেবকে দেখছে কৌতূহলের সঙ্গে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে নিচু গলায়। সবাই বেশ হাসিখুশি।

মিলাদে যাদের আসার কথা ছিল, তারা কেউ এল না। সাতটার দিকে মিলিকে নিয়ে এল মতিয়ুর। তারও কিছু পর এলেন মগবাজারের সিদ্দিক সাহেব।

যে মাওলানা মিলাদ পড়াবেন তিনি ধাঁধায় পড়ে গেলেন। তিনজন পুরুষ মানুষকে নিয়ে তিনি সম্ভবত এর আগে মৃত্যুবার্ষিকীর মিলাদ পড়াননি। তিনি বিরক্ত গলায় সূরা বলতে লাগলেন এবং ঘড়ি দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরপর বলতে লাগলেন, আর কতক্ষণ অপেক্ষা করব ? বীথি প্রতিবারই বলতে লাগল আর কিছুক্ষণ দেখি। অনেকেরই আসার কথা।

মিলিকে দেখে ওসমান সাহেব অবাক হলেন। ভয়ঙ্কর রোগা হয়ে গেছে। মাথাটা অস্বাভাবিক বড় লাগছে সেই কারণেই। মাথায় বাহারি একটি রুমাল। ওসমান সাহেব বললেন, মাথায় রুমাল কেন রে ?

মিলি হাসিমুখে বলল, মাথা কামিয়ে ফেলেছি তো, সেই জন্যে রুমাল।

মাথা কামিয়ে ফেলেছি মানে ?

কী সব কবিরাজী ওষুধ দেবে। মাথা না কামিয়ে দেওয়া যায় না। প্রথমে আমি রাজি হইনি। পরে ভাবলাম আমি পাগল মানুষ, মাথায় চুল থাকলেই কী, না-থাকলেই বা কী ?

মিলি মাথার রুমাল খুলে ফেলে বলল, কেমন লাগছে আমাকে বলো তো ?

ভালোই লাগছে। কোজাকের মতো।

তোমার যদি মাথায় হাত বুলাতে ইচ্ছা করে হাত বুলাও।

হাত বুলাতে ইচ্ছা করবে কেন ?

ন্যাড়া মাথা দেখলে হাত বুলাতে ইচ্ছা করে না ? মনে নাই পাশের বাসার খোকন যখন মাথা কামাল, তখন আমরা শুধু শুধু ওর মাথায় হাত বুলাতাম।

মিলি হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল। ওসমান সাহেব মন খারাপ করে তাকিয়ে রইলেন। নরমস্বরে বললেন, মিলি, আমি গ্রামের বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন থাকব। তুই যাবি আমার সাথে ?

যাব ভাইয়া।

তোর মেয়েকেও সঙ্গে নিবি।

ও খুব কাঁদবে তো। আমাকে চেনে না। ন্যাড়া মাথা দেখে ভয় পায়।

ভয় কেটে যাবে। ও তোর সঙ্গে যাবে, তুই ভালো হয়ে যাবি।

আমারও ভালো হতে ইচ্ছা করে। পাগল হয়ে থাকতে ভালো লাগে না।

ওসমান সাহেবের মনে হলো, এইসব কথাবার্তা তো পাগলের কথাবার্তা নয়। সুস্থ মানুষের কথাবার্তা। কিন্তু তবু সে সুস্থ নয়। এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

মিলি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, এই পাজি মেয়েটা ঘরবাড়ি কেমন বদলে ফেলেছে দেখেছ ? গুদাম বানিয়ে ফেলেছে। বাড়ি দেখে আমি এমন অবাক হয়েছি, ইচ্ছা করছে মেয়েটিকে একটা চড় দিতে।

মিলি সারাক্ষণ বকবক করতে লাগল। একসময় মতিয়ুর এসে বলল, আর কত, চুপ করো তো। কনটিনিউয়াস কথা বলে যাচ্ছ।

মিলি করুণ মুখে বলল, পাগল মানুষ কী করব বলো!

মতিয়ুর রাগী চোখে তাকিয়ে রইল।

ওসমান সাহেব খুবই মন খারাপ করে বাড়ি ফিরলেন। প্রায় সারা রাত তাঁর ঘুম হলো না। শেষরাতের দিকে ভয়াবহ একটা দুঃস্বপ্ন দেখলেন। তাঁর কেন জানি মনে হলো, তিনি নিজেও পাগল হয়ে যাবেন। জীবন এত জটিল কেন ? অসংখ্যবার নিজেকে

এই প্রশ্ন করেছেন। তাঁর নিজের একটি উপন্যাসের এক ছেলেও এই একই প্রশ্ন করেছিল। সে তার উত্তরও পেয়েছে। কিন্তু তার মনে হচ্ছে উত্তরটা ঠিক না। বিরাট একটা ফাঁকি আছে উত্তরে।

২৩

রানুরা নতুন বাসায় উঠে এসেছে। অফিসের ফ্ল্যাট। দু'টি বেডরুম, দু'টি বারান্দা, ড্রইং কাম ডাইনিং। একটি ছোট্ট স্টোররুমের মতো আছে। বাসায় ঢোকার সময় আনন্দে রানুর চোখে পানি এসে গেল। এটি তার নিজের বাসা, সম্পূর্ণ নিজের মতো করে সাজানো যাবে। স্বাধীনভাবে থাকা যাবে। খালা খবরদারি করতে আসবে না। টগরের জন্যে সুন্দর করে একটা রুম সাজিয়ে দেওয়া যাবে। তার নিজের থাকার একটি ঘর। অপলা নেই, এটি একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। অপলা থাকলে ঘর ভাগ করা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াত। কিছুদিন থেকে অপলার সঙ্গে সম্পর্কও খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল। কেন জানি তাকে আর সহ্য হতো না।

সে এখন মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে সিট পেয়েছে। তার পড়ার খরচ যে মামা দিতেন তিনি এই বাড়তি খরচ কীভাবে দেবেন তা রানু জানে না। ওটা তাদের ব্যাপার। অপলাকে সে একবার জিজ্ঞেস করেছিল, খরচ কীভাবে চালাবি ?

সে শান্ত গলায় বলেছে, ওটা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। দরকার হলে প্রাইভেট টিউশনি করব। বেশ কিছুদিন তুমি আমাকে থাকতে দিয়েছ, তার জন্যে মেনি থ্যাংকস।

তুই এমন করে কথা বলছিস কেন ?

আমি একটা খারাপ মেয়ে আপা। কী করব বলো, যা মনে আসে বলে ফেলি। ক্ষমা করে দাও।

রানু ভাবেনি সত্যি সত্যি অপলা শেষপর্যন্ত হোস্টেলে যাবে। তার ধারণা ছিল, শেষপর্যন্ত টগরের জন্যেই যাওয়া হবে না। টগর যখন বলবে, তুমি যেতে পারবে না খালামণি। তখন তার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব হবে।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার টগর কিছুই বলল না। অপলা চোখ মুছতে মুছতে যখন বলল, টগর যাচ্ছিরে। সে কিছুই বলল না। যেন চলে যাওয়াটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। অপলা বলল, কাঁদিস না। ব্যাটাছেলের কান্না খুব খারাপ।

টগর অবাক হয়ে বলল, কই কাঁদছি না তো। অপলা একাই কেঁদে বুক ভাসিয়ে রিকশায় গিয়ে উঠল। রানু একবার ভাবল বলবে, থাক যেতে হবে না। কিন্তু তা বলা হলো না।

অপলার এভাবে থাকতে অসুবিধা হবে। সমস্যা হবে। সব সমস্যারই সমাধান আছে। এই সমস্যারও নিশ্চয়ই কোনো সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

একটি কাজের মেয়ে পাওয়া গেছে। সে টগরের দেখাশোনা করতে পারবে। তাছাড়া খুব বেশি সময় দেখাশোনা করতেও হবে না। টগরের স্কুল ছুটি হবে বারোটায়। দু'টোর

সময় রানুর অফিস ছুটি হয়। দু-তিন ঘণ্টার ব্যাপার। টগর কোনো অবুঝ ছেলে নয়। কেউ না থাকলেও সে দু-তিন ঘণ্টা সময় অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পারবে। ঘরদুয়ার গুছিয়ে বসতে তার পাঁচ-ছ'দিন লাগল। নিজেই ঘুরে ঘুরে কিছু ফার্নিচার কিনল। একটা কার্পেট কেনার খুব শখ ছিল। কিন্তু কেনা গেল না। অনেকগুলি টাকা একসঙ্গে বেরিয়ে যায়।

রানুর নতুন বাড়িতে ঘনঘন এল শুধু আলম। যতবারই সে এল ততবারই রানু বিরক্ত হলো। ততবারই মনে হলো তার নিজের একটি সংসারে সে জোর করে ঢুকে পড়তে চাইছে। একেকবার তার বলতে ইচ্ছা হলো—প্লিজ বারবার এসে আমাকে বিরক্ত করবে না, আমার ভালো লাগে না। একজন ডিভোর্সি মহিলার কাছে একজন পুরুষ মানুষের বারবার আসা ভালো দেখায় না। লোকজন খারাপ চোখে দেখে।

মনের কথা প্রায় কোনো সময়ই বলা যায় না। বলা গেলে সংসারের জটিলতা কমত। কিন্তু সংসার জটিলতা পছন্দ করে। নয়তো অপলার সঙ্গে এই ঝামেলাটা হতো না।

বুধবার টগর খুব উৎকণ্ঠায় কাটাল। বাবা কি আসবে? তাদের নতুন বাসা সে কি চেনে? তার উৎকণ্ঠার কথা সে অবশ্যি মাকে বলল না। বেশিরভাগ সময়ই বারান্দায় কাটাতে লাগল। সন্ধ্যাবেলা একবার এসে মাকে জিজ্ঞেস করল, বাবা এই বাসা চেনে?

রানু হালকা গলায় বলল, চেনে না। তবে ঠিকানা দিয়ে এসেছি, খুঁজে বের করতে অসুবিধা হবে না।

টগর ইতস্তত করে বলল, বাবা আর খালামণি কি একসঙ্গে আসবে?

রানু চমকে উঠল। টগরের এ ধরনের কথা বলার মানে কী? ওদের দু'জনকে নিয়ে সে কি কোনো কিছু কল্পনা করে?

টগর।

কী?

ওরা দুজন একসঙ্গে আসবে, এটা তুমি কেন বলছ?

টগর কিছু বলল না।

তোমার খালামণি কি তোমাকে কিছু বলেছে?

টগর মাথা নাড়াল। কিছু বলেনি। প্রশ্নটি করে রানু নিজেও লজ্জিত হয়ে পড়ল। এ জাতীয় প্রশ্ন টগরকে করার কোনোই মানে হয় না। কেন সে করল?

ওসমান সাহেব বুধবার এলেন না। তবে তাঁর একটি চিঠি এল। নতুন বাসায় কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না। প্রয়োজন মনে করলে আকবরের মাকে নিয়ে যেতে। বিশ্বাসী পুরনো মানুষ। ও কাছে থাকলে সুবিধা হবে। তিনি আসতে পারছেন না, কারণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। পুরনো অসুখ—অনিদ্রা।

ওসমান সাহেবের চিঠির সঙ্গে অপলারও একটি চিঠি এল। দীর্ঘ চিঠি। সব মিলিয়ে এগারো পৃষ্ঠা। শুরু হয়েছে এভাবে—

আপা,

হোটেলে থাকতে আমার খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু নিজে থেকে ফিরে আসতেও লজ্জা লাগছে। তুমি এসে আমাকে নিয়ে

যাও। আর শোনো আপা, আমাকে নিয়ে তুমি যে সন্দেহ করছ এটা ঠিক না। দুলাভাইকে আমি খুবই পছন্দ করি। কিন্তু তার মানে এই না যে আমি তাঁকে বিয়ে করার জন্যে পাগল হয়ে আছি। অবশ্যি এটা ঠিক যে তাঁর মতো কোনো ছেলের সঙ্গে যদি আমার দেখা হয় তাহলে...। আজ আমার লিখতে লজ্জা লাগছে। তাছাড়া একটা কথা আপা, যদি দুলাভাইকে আমার খুব বেশি ভালো লাগে সেটা কি আমার অপরাধ ? কেন তুমি আমার ওপর ঐ দিন এত রাগ করলে ? ঐদিন সকাল সকাল আমার কলেজ ছুটি হলো। আমি ভাবলাম হঠাৎ করে দুলাভাইকে গিয়ে চমকে দেব। গিয়ে দেখি দুলাভাই নেই। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। এমন সময় তুমি উপস্থিত হলে, আমাকে দেখে ভাবলেন, আমি রোজ এখানে এসে বসে থাকি। আমি কী ঠিক করেছিলাম জানো ? তোমার সঙ্গে বাসায় যাব। তারপর একা একা ছাদে উঠে ছাদ থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ব।

আপা, তুমি দুলাভাইকে জিজ্ঞেস করে দেখো আমি আর কোনোদিন যাইনি। উনি তো মিথ্যা কথা বলেন না। তার এই গুণটি তো তুমি নিজেও স্বীকার করো। করো না ?

গুটি গুটি করে লেখা চিঠি শেষ করতে রানুর আধঘণ্টা লাগল। সেইদিন বিকেলে গিয়ে অপলাকে নিয়ে এল। এই ক'দিনেই অপলা রোগা হয়ে গেছে। তাকে কেমন লম্বা লম্বা লাগছে।

২৪

মতিয়ুর অবাক হয়ে ওসমানের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে ওসমান সাহেবের কথার কোনো অর্থ সে বুঝতে পারছে না। সে বিস্মিত গলায় বলল, মিলিকে আপনি গ্রামের বাড়িতে নিয়ে কিছুদিন রাখতে চান ?

ওসমান সাহেব নিচুস্বরে বললেন, হ্যাঁ, যদি তোমার আপত্তি না থাকে।

মতিয়ুর থমথমে গলায় বলল, আপত্তি অবশ্যই আছে। সে দারুণ অসুস্থ মেয়ে। আপনি কাছাকাছি থাকলে সে কিছুটা সংযত আচরণ করে। এমনিতে তার আচরণ আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। তাছাড়া...

তাছাড়া কী ?

বোনের বিয়ে দিয়েছেন, দায়িত্ব পালন করেছেন। এখন পাগল পুষতে হবে না।

তুমি এভাবে আমার সঙ্গে কথা বলছ কেন ?

মতিয়ুর চুপ করে গেল। ওসমান সাহেব বললেন, তুমি ওকে আমার সঙ্গে দিতে রাজি না ?

জি-না। আমি ওকে ইন্ডিয়া পাঠাব। রাচি মেন্টাল হসপিটালে আমার বন্ধুর একজন পরিচিত ডাক্তার আছেন। প্রফেসর দেবশর্মা। উনার সঙ্গে যোগাযোগ করছি।

কবে নাগাদ পাঠাবে ?

এখনো কিছু জানি না। পাসপোর্ট ভিসা এইসব হাঙ্গামা আছে। আপনি দেশে কবে যাবেন ?

শিগগিরই যাব।

এমনি যাচ্ছেন, না কোনো কারণ আছে ?

এমনি যাচ্ছি।

মিলি ঘুমুচ্ছিল। ওসমান সাহেব অপেক্ষা করলেন না। দেখা না করেই চলে এলেন। মাঝে মাঝে কারও জন্যেই অপেক্ষা করতে ইচ্ছা করে না।

কোথাও যাওয়ার আগে তিনি একধরনের উত্তেজনা অনুভব করেন।

ঢাকা শহরে তার শিকড় গজিয়ে গেছে। কোথাও যাওয়া মানেই শিকড় ছিঁড়ে যাওয়া। মানুষ কি আসলে এক ধরনের বৃক্ষ ? এই কথা ভাবতে ভাবতে তিনি বারান্দায় হাঁটতে লাগলেন। রাত প্রায় এগারোটা। আকবরের মা তার ছেলের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলছে। ওসমান সাহেবের মনে হলো, তাঁর মনের উত্তেজনা ওদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। অন্যসময় এগারোটার অনেক আগেই রফিক ঘুমিয়ে পড়ত। আকবরের মা ঘুম ঘুম চোখে তাকিয়ে থাকত টিভির দিকে। টিভির শেষ অনুষ্ঠানটি না হওয়া পর্যন্ত সে উঠত না। আজ টিভি চলছে না।

আকবরের মা বারান্দায় এসে বলল, চা দিমু ?

না, চা লাগবে না।

গরম দুধ দিমু এক কাপ ?

তিনি চমকালেন। দুধ দেওয়ার কথা বলে সে কি একটু বাড়তি যত্নের চেষ্টা করছে ? রানু এখানে থাকার সময় শোবার আগে তাকে এক কাপ বিস্বাদ গরম দুধ খেতে হতো। আজ হঠাৎ আকবরের মার হয়তো পুরনো কথা মনে পড়েছে। তিনি বললেন, দাও এক কাপ।

আকবরের মা আগুনগরম দুধ নিয়ে এল। এতটা গরম তিনি আন্দাজ করেননি। মুখে নিতেই মুখ পুড়ে গেল।

চিনি দিমু ?

চিনি লাগবে না। তুমি ঘুমাতে যাও।

আপনি কবে আইবেন ?

ঠিক নেই। তুমি ঘুমাতে যাও, আকবরের মা।

সে গেল না। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। রফিক এসে ভয়ে ভয়ে দাঁড়াল তার মা'র পাশে। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, কিছু বলবে আমাকে ?

জি-না।

তোমাদের আমি রানুর বাসায় রেখে আসব। ও নতুন বাসা করেছে। বড় বাসা। অসুবিধা হবে না। এখানে যে বেতন পেতে ওখানেও তাই পাবে।

বলেই ওসমান সাহেবের মনে হলো, আকবরের মা কোনো বেতন নেয় না। তার বেতন সব জমা থাকে। একদিন সবটা একসঙ্গে নেবে। প্রায় আট বছর সে আছে এখানে। এই দীর্ঘ আট বছরে সে কোনো টাকাপয়সা নেয়নি। রানুকে বলেছে, নিলেই তো খরচ কইরা ফেলামু আপা। আপনের কাছে থাউক। বেতন কত কী তা নিয়েও তার কোনো মাথাব্যথা ছিল না। একশ টাকা করে হলেও প্রায় দশ হাজার টাকা। অনেকগুলি টাকা। এত টাকা নিয়ে সে কী করবে ?

ওসমান সাহেব বললেন, আকবরের মা, তুমি কি বেতনের টাকাটা চাও ? অনেক টাকা জমেছে তোমার।

টাকা নিয়ে আমি করমুটা কী ? কারে দিমু ?

নিজের টাকা অন্যকে দিবে কী! নিজে খরচ করবে।

আকবরের মা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমরা আপনাদের সাথে যাইতে চাই ভাইজান।

আমার সাথে কোথায় যাবে ?

দেশের বাড়িত। পাক-সাক করনের দরকার না ? পাক-সাক কে করবে ?

না, তার দরকার নেই।

আকবরের মা ক্ষীণস্বরে বলল, আমরা কাপড়চোপড় ঠিক কইরা রাখছি। তিনি ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। মানুষ মায়াবদ্ধ জীব। তারা মায়ায় পড়ে গেছে। শুধু মানুষই মায়াবদ্ধ ? সমস্ত জীবজগতই কি মায়াবদ্ধ নয় ? খুব ছোটবেলায় তিনি একটি কুকুর পুষেছিলেন। অত্যন্ত গোপনে বাড়ির গ্যারেজের পেছনে তার আহার এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল। কালে এটা কিং কং-এর মতো মহাবলশালী একটা কিছু হবে—এই আশাতেই সম্ভবত তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'কিং কং'। এক মাসের মাথায় কুকুর-সংবাদ প্রকাশ হয়ে পড়ল। ফয়সল সাহেবের নির্দেশে একটা চটের বস্তায় তাকে মুড়ে পাঠিয়ে দেওয়া হলো সাত মাইল দূরে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে কিং কং তৃতীয়দিনের মাথায় বাড়ি এসে উপস্থিত। গেটের ভেতর ঢুকেই সে খুব হৈচৈ করে তার আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। তাকে আবার বস্তাবন্দি করে ফেলে দিয়ে আসা হলো আরও দূরে। বস্তায় ভরে দেওয়া হলো কর্পূর, যাতে কর্পূরের গন্ধে অন্যসব গন্ধ এলোমেলো হয়ে যায়। ঘ্রাণ নিয়ে নিয়ে সে আর ফিরে আসতে না পারে। কিন্তু সে ফিরে এল। দশদিনের মাথায় কাহিল অবস্থায় সে উপস্থিত। এবার আর আগের মতো হৈচৈ নেই, আনন্দ-উল্লাস নেই। তার চোখে ভয়।

ফয়সল সাহেব রেগে আগুন হয়ে গেলেন। বাগানের মালি কাশেম মিয়াকে বললেন, এবার এমন একটা কিছু করো যাতে সে ফিরে আসতে না পারে। যদি সে ফিরে আসে, তোমার চাকরি থাকবে না। কাশেম মিয়া ভয়ে ভয়ে বলল, বস্তাত ভইরা পানিতে ডুবাইয়া দিমু ?

যা ইচ্ছা করো, শুধু মনে রাখবে সে এলে তোমার চাকরি নট।

কিং কং আর ফিরে আসেনি। তিনি দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করছেন কিং কং আবার আসবে। কতবার কাশেম মিয়াকে গোপনে জিজ্ঞেস করেছেন, সত্যি সত্যি পানিতে ফেলে দিয়েছেন কাশেম ভাই ? কাশেম মিয়া চোখ কপালে তুলে বলেছে, তা কেমনে করি ছোড মিয়া ? আমি মানুষ না ? আমার নিজের পুলাপান আছে না ?

তাহলে আসে না কেন ?

আইব আইব। একটু দেরি হইতেছে আর কী।

বারো বছর বয়সে তাঁর প্রথম রচনাটি কিং কিং-কে নিয়ে লেখা। 'আমার পোষা প্রাণী' এই পর্যায়ে ক্লাস সেভেনে তিনি রচনা লিখলেন, বাংলা স্যার মনমোহন বাবু সেই লেখাটি স্কুলের প্রায় সব ক'টি ক্লাসে পড়ে শোনালেন। তিনিই ওসমান সাহেবের লেখার প্রথম মুগ্ধ পাঠক। মনমোহন বাবু তাঁর বরিশালের উচ্চারণে লেখাটা পড়তে পড়তে হঠাৎ থেমে গিয়ে চোখ মুছতেন এবং ধরা গলায় বলতেন, 'পশু হয়ে জন্মানো বড় কষ্ট। অবলা প্রাণী, মুখে ভাষা নাই। মনের কথা কাউকে বলতে পারে না।'

ওসমান সাহেব বারান্দায় হাঁটতে লাগলেন। আকবরের মা তার ছেলেকে নিয়ে এখনো ফিসফিস করছে। ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে বোধহয়। আকাশে বিশাল একটা চাঁদ উঠেছে। শহরে জ্যোৎস্না হয় না কথাটা ঠিক নয়। শহরের জ্যোৎস্নায় অন্য একধরনের বিষণ্নতা আছে। শহরের জ্যোৎস্না পুরনো দুঃখের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়।

তিনি হাঁটতে হাঁটতে কিং কং-এর কথা ভাবতে লাগলেন। সমগ্র সৃষ্টির মূল কথা কী ? বিষাদ ? হয়তোবা। কিন্তু গাঢ় বিষাদ! তীব্র বেদনা তিনি কি কখনো বোধ করেছেন ? মোটা দাগের দুঃখ তাকে কখনো স্পর্শ করেনি। মা'র মৃত্যু বাবার মৃত্যু। অথচ কিং কং-এর কথা মনে হলে এখনো তীব্র বেদনা বোধ হয়। কেন হয় ?

ভাইজান, আপনেরে ডাকে।

কে ডাকে ?

তিনি বিস্মিত হয়ে তাকালেন। এই দুপুররাতে তাকে কে ডাকবে ?

টেলিফোন।

তিনি বিরক্ত মুখে বসার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। বারান্দায় হাঁটতে তাঁর ভালোই লাগছিল। সুর কেটে গেছে। আবার ফিরে আসা যাবে না।

টেলিফোন করেছে নবী। দুপুররাতে অকারণে মানুষকে বিরক্ত করা একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব।

হ্যালো ওসমান সাহেব, কেমন আছেন ?

ভালো।

গর্জিয়াস একটা চাঁদ উঠেছে বাইরে। আপনার লক্ষ করার কথা নয়। আপনার কাজ হচ্ছে মানুষ নিয়ে। প্রকৃতি নিয়ে নয়। হ্যালো, শুনতে পারছেন আমার কথা ?

পারছি।

কিছুক্ষণ আগে একটা প্ল্যান করা হলো, আমরা কয়েকজন মিলে লঞ্চে করে বুড়িগঙ্গায় ঘুরব। সঙ্গে থাকবে হাজির মোরগপোলাও এবং ... বুঝতেই পারছেন কী ? জলযাত্রার ব্যবস্থা। ওসমান সাহেব।

বলুন।

আপনি তৈরি হয়ে থাকুন। আমি আপনাকে নিতে আসছি। আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন নিতীশ বাবু। চিনতে পারছেন তো ?

না।

আপনি তো ভাই অবাক করলেন। নিতীশ শর্মা, কবি ও নাট্যকার। কোলকাতা থেকে এসেছেন। নিতীশ বাবু আমার পাশেই আছেন। কথা বলবেন তাঁর সাথে ?

জি-না। অপরিচিত কারও সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি না।

অপরিচিত হবে কেন। নিতীশ বাবুর লেখা তো পড়েছেন ? স্বরবৃত্তে আসিনি কখনো, পড়েননি ?

কবিতা পড়ি না। নবী সাহেব শুনুন, আমি যাচ্ছি না আপনাদের সঙ্গে।

কেন ?

আমি এ জাতীয় ব্যাপারগুলি ঠিক এনজয় করি না।

মনিকাও যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে। ওর ইচ্ছা আপনাকে সঙ্গে নেওয়ার। আমি নিজে আপনার কোম্পানির জন্যে তেমন উতলা নই। কি যাবেন ?

আমার শরীরটা ভালো নেই।

আপনি তো এখানে ব্যায়াম করার জন্যে আসছেন না। লঞ্চের রেলিং ধরে জ্যোৎস্না দেখবেন। আমরা চাঁদপুর যাব। তারপর ফিরে আসব। নদীবক্ষে রাত কাটাব। নিতীশ বাবুর স্ত্রীও যাচ্ছেন। কীর্তনের একজন নামি শিল্পী। তিনি সারা রাতই গানটান গাইবেন।

কিছু মনে করবেন না নবী সাহেব, আমি যাব না।

নবী সাহেব খানিকক্ষণ কোনো কথা বললেন না। ওসমান সাহেব ভেবে পেলেন না, হঠাৎ তাকে নেওয়ার জন্যে নবী এত ব্যস্ত কেন ? তারা তাঁর স্বভাব জানে। দল বেঁধে প্রকৃতি দেখা, সাহিত্যসভা করা, গানের আসর করা, এসবে তাঁর কোনোকালেই কোনো আগ্রহ ছিল না। তিনি মৃদুস্বরে বললেন, নবী সাহেব, রেখে দেই।

এখনই রাখবেন না, মনিকার সঙ্গে কথা বলুন।

ওসমান সাহেবের বিস্ময়ের সীমা রইল না। মনিকা কি তাঁকে সঙ্গে যাওয়ার জন্যে বলবে ? সেই অনুরোধ না রাখার মতো মনের জোর কি তাঁর আছে ? বহুদিন পর মনিকার সঙ্গে তাঁর কথা হচ্ছে। তাঁর ধারণা ছিল মনিকার প্রতি তিনি এখন আর তেমন কোনো আকর্ষণ অনুভব করছেন না। কিন্তু ধারণা ঠিক নয়। ওসমান সাহেব টেলিফোন হাতে নিয়ে একধরনের উত্তেজনা অনুভব করলেন। তাঁর নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এল। কেউ কখনো হারায় না। মানুষের মনের মতো বিচিত্র আর কী আছে। কাউকে সে হারাতে দেয় না। বিশাল এক অন্ধকার ঘরে সমস্তই সাজানো। যে-কোনো মুহূর্তে আলো ফেলে সে তুচ্ছতম বস্তুকেও আলোকিত করে।

মনিকা শান্তস্বরে বলল, শরীর কি বেশি খারাপ ?

না, খুব বেশি না।

অনেকদিন দেখা হয় না তোমার সাথে। লেখাটেখাও কিছু চোখে পড়ে না।

লিখতে পারছি না।

কেন ?

জানি না। ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে বোধহয়। কিংবা ক্ষমতা হয়তো কোনোকালে ছিলই না।

দুঃখবাদী কথাবার্তা বলছ কেন ?

ওসমান সাহেব হাসলেন। নিঃশব্দ হাসি। মনিকা টের পেল না।

এই গভীর রাতে তোমাকে টেলিফোন করার কারণটি জানো ?

জানি। জ্যোৎস্না দেখা।

না, সেটা তেমন কোনো কারণ নয়। জ্যোৎস্না দেখার জন্যে লঞ্চ ভাড়া করার দরকার নেই। ব্যবস্থা করা হলো নবীর জন্যে। নবীর খবর জানো নিশ্চয়ই।

কী খবর ?

আজ রাত আটটার খবরে তো বলেছে।

খবর আমি শুনিনি।

নবী স্বাধীনতা পদক পেয়েছে। সাহিত্যে সামগ্রিক অবদানের জন্যে।

খুব ভালো খবর। নবী নিশ্চয়ই উল্লসিত।

না। সে গম্ভীর। বলছে, পদক-ফদকের জন্যে আমি লিখি না। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। খবর শুনেই সে ছুটে এসেছে আমার কাছে। সেলিব্রেট করার জন্যে কী করা যায় সেই নিয়ে চিন্তাভাবনা। শেষে নদীবক্ষে ভ্রমণ ঠিক করা হয়।

মনিকা হাসল। কী সুন্দর হাসি!

তুমি আসতে পারছ না ?

শরীরটা ভালো নেই। তাছাড়া—

তাছাড়া কী ?

কাল ভোরে আমি গ্রামের বাড়ি যাচ্ছি, কিছুদিন থাকব সেখানে।

হঠাৎ গ্রামের বাড়িতে কেন ?

কোনো কারণ নেই। এমনি।

আচ্ছা ঠিক আছে। পরে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

মনিকা ফোন রেখে দিল। ওসমান সাহেব ঘুমুতে গেলেন। ঘুম আসবে না। শুয়ে শুয়ে বইটই পড়লে কেমন হয়! কিন্তু বাতি জ্বালাতেও ইচ্ছা করছে না। তিনি অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, নবীর প্রতি তিনি কোনো ঈর্ষা বোধ করছেন না। কেন করছেন না ? সাহিত্যের আসর থেকে তিনি কি নিজেকে নির্বাসিত করেছেন ? এরকম হলো কেন ?

তার পুরনো বইগুলির এডিসন হচ্ছে না। প্রকাশকরা উৎসাহিত বোধ করছে না। কেউ বোধহয় এসব বই আর চায় না। তারা এখন চাইবে নবীর মতো লেখকদের লেখা। যেখানে ঝলমল করবে প্রাণ। নবীর শেষ বইটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা আলোড়ন হয়েছে। একজন লেখকের জন্যে এরচেয়ে বড় পুরস্কার আর কী ?

আচ্ছা তিনি কি আবার কোনোদিন লিখতে পারবেন ? পাঠককে আলোড়িত করবার মতো না হোক, সাধারণ একটি লেখা ? মনে হয় না। লেখা হবে না আর কোনোদিন। এখন তাঁর নির্বাসনের কাল। তিনি ছটফট করতে লাগলেন। শেষরাতে তন্দ্রার মতো হলো। সেই তন্দ্রার মধ্যেই স্বপ্নে দেখলেন, কিং কং ফিরে এসেছে। কিন্তু তার চোখ দু'টি নষ্ট। সে গন্ধ শুঁকে পুরনো বন্ধুকে খুঁজে বের করতে চাচ্ছে কিন্তু পারছে না।

২৫

ওসমান সাহেব অপলাকে রানুর বাসায় দেখে অবাক হলেন। তাঁর ধারণা ছিল সে হোস্টেলে। শেষপর্যন্ত বোধহয় হোস্টেলে যায়নি। তিনি ঐ প্রসঙ্গ তুললেন না। গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছেন, এই খবরটি দিলেন। অপলা বলল, সত্যি যাচ্ছেন ?

হ্যাঁ।

কেন ?

এমনি। কিছুদিন থাকব। শরীর ভালো লাগছে না।

কতদিন থাকবেন ?

সেটা ঠিক করিনি।

যাচ্ছেন কখন ?

এই তো ঘণ্টাখানেকের মধ্যে।

রানু এই খবরে বিশেষ বিচলিত হলো না। তার অফিসে যাওয়ার তাড়া। বেশি সময় দিতে পারছে না। সে বলল, টগর বড় খালার বাসায় আছে। তুমি কি তার সঙ্গে দেখা করতে চাও ?

না। ওখানে গিয়েছে কেন ?

ওর সমবয়সী কিছু বন্ধুবান্ধব আছে। কাল নিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর আর আসতে চায় না।

রানু মৃদুস্বরে বলল, আমাকে মনে হয় সে পছন্দ করে না। ওসমান সাহেব কিছু বললেন না। রানু বলল, তুমি যদি চাও তোমার সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাবে, তাহলে নিতে পার। টগর খুশিই হবে।

তার কোনো দরকার নেই।

রানু বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, নির্বাসনে যাচ্ছ ?

নির্বাসনে যাব কেন ?

লেখকসুলভ একটা চাল দেওয়ার জন্যে যাওয়া আর কী!

উঠি রানু।

রানু বলল, আকবরের মা আর তার ছেলে, ওরা কোথায় থাকবে ?

ওদের বীথির সমিতিতে রেখে এসেছি।

অপলা তাঁকে এগিয়ে দিতে নেমে এল নিচ পর্যন্ত। মৃদুস্বরে প্রায় ফিসফিস করে সে বলল, দুলাভাই, আপনি কি আমাকে চিঠি লিখবেন ?

হ্যাঁ লিখব। অপলা বলল, চোখ মুছতে মুছতে, লিখব আমিও।

অবাক হয়ে দৃশ্যটি ওসমান সাহেব দেখলেন।

২৬

রানু,

কেমন আছ তোমরা ?

কুশল জানতে চেয়ে চিঠি শুরু করা গেল। বিয়ের আগে যেসব চিঠি লিখেছি তার শুরু কেমন ছিল মনে করতে পারছি না। অনেক কিছুর সঙ্গে স্মৃতিশক্তি আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে। পুরনো কথা সহজে মনে পড়তে চায় না। বুড়ো হয়ে যাচ্ছি বোধহয়।

চিঠির শুরুটা ভালো হলো না। তোমার নিশ্চয়ই ভুরু কুঁচকে উঠেছে। তবে একটা মজার কথা কী জানো ? চিঠিতে এলেবেলে যাই লিখি না কেন তুমি মন দিয়ে পড়বে। রাগ দেখানোর জন্যে দু'তিন লাইন পড়েই চিঠি ছুড়ে ফেলবে না। কেন ফেলবে না সেই কারণটিও বলি। কারণ, তুমি যে রাগ করে চিঠি ফেলে দিয়েছ এই দৃশ্যটি আমি দেখব না। যার ওপর রাগ করলে সে যদি না-ই জানল, তাহলে রাগ করার যৌক্তিকতাটা কোথায় ? কাজেই আমার ধারণা তুমি খুব মন দিয়েই চিঠি পড়বে। ঠিক বলিনি ?

এখানে এসে পৌঁছেছি গত পরশু। বিকেল চারটায় যে ট্রেন পৌঁছানোর কথা সেটা পৌঁছাল সন্ধ্যা ছ'টায়। আমার ধারণা ছিল দেখব সব বদলে গেছে, সব অচেনা, শহরতলি শহরতলি ভাব চলে এসেছে গ্রামে। সেরকম কিছুই দেখলাম না। সব কিছু আগের মতোই আছে। আগের মতোই অনেক অপরিচিত মানুষ আমাকে জিজ্ঞেস করল,

আপনার নাম ?

যাইবেন কই ?

কোন গেরাম ?

কার বাড়ি ?

এসব প্রশ্নের উত্তর জানার তাদের দরকার নেই। তবু এমনভাবে জিজ্ঞেস করছে যেন উত্তরগুলি জানা না থাকলে এদের

খুব মুশকিল হয়ে যাবে। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে এরা সবাই আগ্রহ করে বলল, আমাকে কীভাবে যেতে হবে। জুম্মাঘরের ডানদিকের রাস্তা নিতে হবে না, বাঁদিকের রাস্তা নিতে হবে। যদিও তাদের কাছে আমি কিছুই জানতে চাইনি।

রানু, নিশ্চয়ই তুমি অবাক হয়ে ভাবছ এসব আমি লিখছি কেন ? কারণ একটা আছে। আমি মূল কথা বলবার জন্যে আবহ তৈরি করছি। ভূতের গল্প বলার আগে যেমন বাতি নিভিয়ে দেওয়া হয়, কথক গলার স্বর অনেকখানি নামিয়ে আনেন, যাতে গা ছমছমানো একটা ভাব তৈরি হয়। এরকম আর কী!

এ পর্যন্ত লিখেই ওসমান সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। যা লিখতে চাচ্ছেন তা লিখতে পারছেন না। অবান্তর কথাবার্তা লেখা হচ্ছে। অবান্তর এবং অসত্য।

স্টেশন থেকে বাড়ি আসার পথে কেউ তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি। গ্রাম আগের মতো আছে বলে যা লিখেছেন তাও সত্যি নয়। অনেকখানি বদলেছে। ইলেকট্রিসিটি এসেছে। কিছু কিছু বাড়িতে লম্বা বাঁশের মাথায় টিভি এন্টেনা। এ গ্রাম ভিন্ন ধরনের গ্রাম। আগের চেনা গ্রাম নয়। তিনি কি জেনেশুনেই সমস্ত অস্বীকার করতে চাইছেন ? ভান করছেন সব আগের মতোই আছে ?

তাছাড়া 'মূল কথা বলবার জন্যে আবহ তৈরি করছি' এর মানেই কী ? তাঁর কি মূল কথা সত্যি সত্যি কিছু আছে ?

ওসমান সাহেব বিরক্ত গলায় ডাকলেন, আইনুদ্দিন, আইনুদ্দিন!

আইনুদ্দিন প্রায় ছুটে এল।

কিছু কইছেন ভাইজান ?

ক'টা বাজে দেখ তো।

আইনুদ্দিন বোকার মতো তাকিয়ে রইল। বাড়িতে নিশ্চয়ই কোনো ঘড়ি নেই। তিনি তাঁর রিস্টওয়াচ ফেলে এসেছেন। লেখকসুলভ অন্যমনস্কতার কোনো ব্যাপার নয়। ঘড়ি রেখে এসেছেন ইচ্ছা করেই। রওয়ানা হওয়ার মুহূর্তে তার মনে হলো, ঘড়ি কলম কাগজ এসব না নিয়ে গেলে কেমন হয় ? একজন নাগরিক মানুষের পুরোপুরি মুক্তির জন্যে এসব সরঞ্জাম না থাকা একটি পূর্বশর্ত।

জর্জ ম্যারন নামের এক আমেরিকান কবি বছরের একটি মাস নগর ছেড়ে অরণ্যে ঢুকে পড়তেন। কিছুই থাকত না তাঁর সঙ্গে। কাপড় পর্যন্ত নয়। খাদ্য সংগ্রহ করতেন বন থেকে।

তাতে অবশ্যি সাহিত্যের তেমন কোনো লাভ হয়নি। জর্জ ম্যারন নিম্নমানের কবিতাই লিখেছেন। বনবাসের ফল হিসেবে কোনো মুক্ত মানুষের কবিতা লেখা হয়নি।

আইনুদ্দিন!

জি।

ঠিক আছে তুমি যাও।

কয়টা বাজে জাইন্যা আইতাম ?

না, দরকার নেই কোনো। তুমি যাও।

আইনুদ্দিন চিন্তিত মুখে বের হয়ে গেল। ওসমান সাহেব নিশ্চিত হলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই সে একটি ঘড়ি যোগাড় করবে। এখানে পৌঁছানোর একদিন পরই তিনি আইনুদ্দিনের কাছে কাগজ এবং কলম চেয়েছিলেন। আইনুদ্দিন বিব্রত ভঙ্গিতে বলেছিল, কাগজ কলম তো ভাইজান নাই। আইন্যা দিমু ?

থাক, দরকার নেই।

ইস্টিশনের কাছে এক দোকানে পাওয়া যায়।

লাগবে না।

আইনুদ্দিন চলে গেল। সন্ধ্যাবেলা তিনি দেখলেন, তাঁর বিছানার পাশের টেবিলে কাগজ এবং দুটি বলপয়েন্ট কলম। একটি লাল এবং একটি কালো। দু'টি দু'কালির কলম কেন কিনল সে ? ওসমান এই বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ সময় ভাবলেন। মাঝে মাঝে তুচ্ছ জিনিস নিয়ে চিন্তা করতে তার ভালো লাগে। বিনা কারণে কেউ কিছু করে না। আইনুদ্দিনের দু'টি কলম কেনার পেছনেও নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে, যা শুধু আইনুদ্দিনই জানে।

ওসমান সাহেব বারান্দায় চলে গেলেন। সূর্যের দিকে তাকিয়ে যদি সময় টের পাওয়া যায়। তাঁর কাছে মনে হলো এগারোটার মতো বাজে। উঠোনময় ধান শুকোতে দেওয়া হচ্ছে। আইনুদ্দিনের মেয়ে কঞ্চি হাতে উঠোনে বসে আছে। মেয়েটির বয়স ছ-সাত। রোদের আঁচে তার ফর্সা গাল লাল হয়ে আছে। কাক এসে ধানে বসা মাত্রই সে তার কঞ্চি নাড়াছে এবং মুখে বলছে 'হুস'। কাজটি সে করছে খুব আগ্রহ নিয়ে। ওসমান সাহেব অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখলেন। হঠাৎ করে তাঁর মনে হলো, শুধু কাক কেন ধান খেতে আসে ? অন্য পাখিরা কেন আসে না ? উঠোনে ধান পড়ে থাকবে, রঙ-বেরঙের পাখিরা আসবে ধান খাওয়ার জন্যে। দৃশ্যটি কল্পনা করতেই ভালো লাগে।

এই মেয়ে, তোমার নাম কী ?

মেয়েটি গম্ভীর মুখে বলল, বাতাসী।

তিনি হাসতে হাসতে বললেন, আচ্ছা বাতাসী, শুধু কাক ধান খেতে আসে। অন্য পাখিরা কেন আসে না ? এর কারণ তুমি জানো ?

জানি।

কেন আসে না ?

কাউয়া মাইনষেরে ডরায় না। পক্ষী ডরায়।

চমৎকার জবাব। তারচেয়েও চমৎকার হচ্ছে মেয়েটির তৎক্ষণাৎ জবাব দেওয়ার ভঙ্গি। মেয়েটি জবাব দেওয়ার পরও চিন্তিত মুখে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। ওসমান সাহেব বললেন, তুমি স্কুলে পড়ো ?

মেয়েটি সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, চড়ুই পাখি খায়। চড়ুই পাখি ধান খায়।

তিনি সত্যি সত্যি বিস্মিত হলেন। পাখি ধান খায় না কেন এই প্রশ্ন বাতাসীকে বিচলিত করেছে। সে ভাবতে শুরু করেছে।

তুমি স্কুলে পড়ো না বাতাসী ?

না।

কেন ? স্কুল নেই এদিকে ?

আছে।

পড়তে ইচ্ছে করে না ?

না।

ধান পাহারা দিতে ভালো লাগে ?

মেয়েটি এই প্রশ্নের জবাব দিল না। ওসমান সাহেবের মনে হলো, জবাব না দেওয়ার কারণ হচ্ছে সে ভাবতে শুরু করেছে। চট করে কিছু বলবে না। ভেবেচিন্তে বলবে। তিনি উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অপেক্ষা করতে করতে তাঁর মনে হলো, সম্পূর্ণ কর্মশূন্য তৃতীয় দিনটি তার শুরু হয়েছে। খুব একটা খারাপ তো লাগছে না।

এই ক'দিন একবারও লেখালেখির কথা মনে হয়নি। কোনো গল্পের প্লট নিয়ে মাথা ঘামাননি। বেশিরভাগ সময়ই কাটিয়েছেন বারান্দায় বসে। আইনুদ্দিনের ঘরসংসার লক্ষ করেছেন। লক্ষ করেছেন বলাটা ঠিক নয়, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছেন। আইনুদ্দিন গরুর জন্যে ভাতের ফ্যান নিয়ে যাচ্ছে। ঘটনাগুলি ঘটছে চোখের সামনে। এ পর্যন্তই। একে লক্ষ করা বলা চলে না।

এই পরিবারটির দিকে তাকিয়ে থাকতে ওসমান সাহেবের ভালো লাগছে। কর্মব্যস্ত মানুষ দেখতে ভালো লাগে। একবার তিনি কল্যাণপুরের দিকে গিয়েছিলেন। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা গোটা পরিবার ইট ভাঙতে বসেছে। মা, বাবা, দু'টি ছোট ছোট ছেলে, একজন অতি বৃদ্ধা মহিলা। সবাই ইট ভাঙছে মহাউৎসাহে। কঠিন পরিশ্রমের এই কাজে তারা একটা উৎসবের ভাব নিয়ে এসেছে। বৃদ্ধ মহিলাটি মাঝে মাঝে কী যেন বলছে— গোটা পরিবার হেসে উঠছে। মুগ্ধ করে দেওয়ার মতো একটি ছবি। ওসমান সাহেব আটকা পড়ে গেলেন। বেড়াচ্ছেন এরকমের ভান করে এদের পাশ দিয়ে কয়েকবার হেঁটে গেলেন।

বাসায় ফিরে রানুকে খুব উৎসাহ নিয়ে ঘটনাটা বলতেই রানু বলল, ইট ভাঙছিল বউটির বয়স কত ?

কেন ?

ঐ বউটির বয়স নিশ্চয় কম। দেখতেও সে রূপসী। ইট ভাঙবার সময় তাঁর কাপড় নিশ্চয় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। এর জন্যেই দৃশ্যটি তোমার কাছে স্বর্গীয় মনে হচ্ছিল। ইট ভাঙা কোনো স্বর্গীয় ব্যাপার নয়, কষ্টের ব্যাপার।

ওসমান সাহেব থমকে গিয়েছিলেন। কারণ ঐ বউটির সত্যি সত্যি মায়াকাড়া চেহারা ছিল। রানুর কথা উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। আজ যে আইনুদ্দিনের ঘরসংসার

তাঁর ভালো লাগছে এর পেছনেও কি ফ্রয়েডিয় কিছু কাজ করছে ? সম্ভবত নয়। আইনুদ্দিনের স্ত্রীকে তিনি দেখেননি। সে কাজ করছে নতুন বৌয়ের মতো লম্বা একটা ঘোমটা টেনে। তবে অনুমান করা যাচ্ছে বৌটি দেখতে ভালো, কারণ বাতাসী মেয়েটি সুন্দর দেখতে। মা'র মতো হয়েছে নিশ্চয়ই।

তিনি সিগারেট ধরিয়ে বাতাসীকে লক্ষ করতে লাগরেন। মেয়েটি এখন নিজের মনে কথা বলছে। ছড়া টড়া কিংবা গ্রাম্য কোনো বিয়ের গান। কারণ তার মাথা দুলছে। ছন্দের কোনো ব্যাপার ছাড়া মাথা দুলবে না। কাছে দাঁড়িয়ে শুনতে পারলে হতো। কিন্তু কাছে যাওয়া মাত্র এই মেয়ে চুপ করে যাবে। তাছাড়া মেয়েটির ব্যক্তিগত সংলাপে হঠাৎ উপস্থিত হওয়া কি ঠিক ?

ওসমান সাহেব অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে এগিয়ে গেলেন। মেয়েটি মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে গানের মতো গাইছে।

ভাত খাইছে ধান খাইছে
কলাই খাইছে কে ?

গানের কলি একটিই। ঘুরেফিরে তা-ই সে গাইছে। সুরও সম্ভবত তার নিজের। ওসমান সাহেব একধরনের বিষণ্নতা অনুভব করলেন। যে গান একা একা গাওয়া হয়, সেই গান নৈঃসঙ্গের গান। তার সুর নিঃসঙ্গতা এনে দেবেই।

মেয়েটি তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসল কিন্তু গান বন্ধ করল না। সম্ভবত সে বুঝতে পারছে শহর থেকে আসা এই মানুষটি তার গান পছন্দ করছে। শিশুরা অনেক কিছু বুঝতে পারে।

২৭

মিলির চিঠি এসেছে।

দু'টি চিঠি। দু'টি চিঠিতে একই কথা লেখা। একই বক্তব্য। একটি শব্দও এদিক-ওদিক নয়। দু'টি চিঠি পাঠানোর কারণ ওসমান সাহেব ধরতে পারলেন। একটি হারিয়ে গেলেও অন্যটি যাতে পৌঁছে সেই ব্যবস্থা। অদ্ভুত সব চিন্তা মিলির মাথাতেই খেলে।

চিঠির ভাষা গুরুগম্ভীর। এবং আপনি আপনি করে লেখা। যেন পরীক্ষার খাতায় চিঠি লেখা হচ্ছে। একটু এদিক-ওদিক হলে নম্বর কাটা যাবে।

শ্রদ্ধেয় ভাইয়া,

আমার সালাম জানবেন। আপনি বিগত এক সপ্তাহ যাবৎ বাইরে আছেন। আমরা সবাই অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত। এদিকে কয়েকদিন আগে আমি একটি পত্রিকায় পড়লাম, এইমাস বৃশ্চিক রাশির জাতকের জন্যে খুব খারাপ মাস। আমি পত্রিকার লেখাটি আপনার জন্যে লিখে দিচ্ছি।

'বৃশ্চিক রাশির জাতকের ওপর শনি এ মাসে পূর্ণ প্রভাব ফেলবে। দুর্ঘটনা, স্বাস্থ্যহানি, আত্মীয় বিয়োগ প্রভৃতি ঘটার

সম্ভাবনা। নতুন বন্ধু তৈরিতে বিরত থাকুন। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে ভ্রমণে না যাওয়াই ভালো।'

ভাইয়া, আপনি তো এসব বিশ্বাস করেন না। কিন্তু এগুলি সত্যি। প্রথম প্রথম আমিও বিশ্বাস করতাম না। একদিন পত্রিকায় দেখলাম, 'ধনু রাশির জন্যে আজকের দিনটি অশুভ। দুর্ঘটনা যোগ আছে।'

তবু আমি গেলাম। পরে কী হলো তা তো আপনি জানেন। রিকশা একসিডেন্ট করে পা ভেঙে এক মাস হাসপাতালে।

যাই হোক, চিঠি পাওয়া মাত্র আপনি চলে আসবেন। টগর আপনার জন্যে খুব কান্নাকাটি করছে। সেদিন গিয়েছিলাম ভাবির কাছে, নিউ পল্টন লাইনে। আপনার কথা উঠতেই টগর এমন কাঁদতে লাগল যে, আমি নিজেও কাঁদলাম। তাছাড়া টগরের শরীরও খুব খারাপ। কয়েকদিন ধরে একশ তিন জ্বর চলছে। ডাক্তাররা আশঙ্কা করছে হয়তোবা টাইফয়েড।

পুনশ্চ দিয়ে লেখা,

ভাইয়া, ও আমাকে একটুও ঘর থেকে বের হতে দেয় না। গেটে তালা বন্ধ করে রাখে।

ও ভালো কথা, আমি ইন্ডিয়া যাচ্ছি চিকিৎসার জন্যে। আপনার জন্যে কিছু আনতে হলে জানাবেন।

ওসমান সাহেব চিঠিটি বেশ কয়েকবার পড়লেন। মিলি তার স্বভাবমতো মিথ্যায় চিঠি ভরিয়ে দিয়েছে। পা ভাঙার কোনো ব্যাপার তার জীবনে ঘটেনি।

টগর তার জন্যে কাঁদছিল, এটা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। টগরের মধ্যে এ জাতীয় আবেগ নেই। থাকলেও তা গোপনে, অন্যকেউ তাঁর খোঁজ জানবে না। আর জ্বরের ব্যাপারটি তো শেষমুহূর্তে বানানো হয়েছে। গুরুত্ব বাড়ানোর জন্যে লেখা হয়েছে—'ডাক্তাররা আশঙ্কা করছে হয়তো বা টাইফয়েড।' ডাক্তাররা, অর্থাৎ একজন ডাক্তার নয়। কয়েকজন ডাক্তার। খবরগুলি যে মিথ্যা তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে রানুরা এখন নিউ পল্টন লাইনে থাকে না।

তিনি নিজের মনেই খুব হাসলেন। মন ভালো করে দেওয়ার মতো চমৎকার একটি চিঠি। একজন কেউ বলছে—'ফিরে এসো।' সেই বলার আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে প্রতিটি অক্ষরে। মানুষ বাঁধা পড়বার জীব নয়। কিন্তু তাকে বাঁধবার আয়োজনই বোধহয় সবচেয়ে প্রবল।

তিনি গভীর রাত পর্যন্ত জেগে রইলেন। চমৎকার একটি চিঠি লিখলেন মিলিকে। সেখানে কিংকং-এ কথা লেখা হলো। ওসমান সাহেব লিখলেন, 'আমার কেন জানি মনে হয় আমি সারা জীবন একেই খুঁজে বেড়াচ্ছি। তার ছায়া দেখতে চেয়েছি প্রিয়জনদের

মধ্যে। একটা অলৌকিক বিশ্বাস লালন করেছি নিজের মধ্যে যে একদিন না একদিন কিংকং ফিরে আসবে। কিন্তু হারিয়ে যাওয়া কেউ বোধহয় কখনো ফেরে না।'

চিঠিটা পাঠানো হলো না। তাঁর মনে হলো, মিলি এই চিঠির অর্থ বুঝতে পারবে না। মনগড়া মানে দাঁড়া করিয়ে নিজের মনে কাঁদবে। মিলি বড় ভালো মেয়ে। তাকে কাঁদাতে ইচ্ছা করে না।

দোতলার ঘর, বারান্দা, বাড়ির পেছনে পুকুরঘাট এর মধ্যেই ওসমান সাহেবের জীবনযাত্রা চলতে লাগল। খারাপ লাগল না মোটেই। বরং ভালোই লাগতে লাগল। কাক তাড়ানোর ব্যাপারে বাতাসীকে সাহায্য করার জন্যেও তিনি বসতে শুরু করলেন। আইনুদ্দিন এবং তার স্ত্রী কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। এই মানুষটিকে তারা ঠিক বুঝতে পারছে না। গ্রামের মানুষ রহস্যময়তা পছন্দ করে না।

আইনুদ্দিনের ধারণা ছোট সাহেবের মাথায় ছিট আছে। তার স্ত্রী তাকে ঠিক সমর্থন করেনি। কিন্তু গত রাতে তার মনেও সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কারণ আইনুদ্দিনকে ডেকে ওসমান সাহেব বলেছেন, একটা কালো রঙের কুকুরের বাচ্চা জোগাড় করে দিতে পার ? আইনুদ্দিন অবাক হয়ে তাকিয়েছে। তিনি বলছেন, আমি একটা কুকুর পুষতে চাই। তবে কালো রঙ হতে হবে।

ক্যান ?

কিংকং-এর রঙ ছিল কালো।

আইনুদ্দিন এবার বলতে চাইল, কিংকং ? সে বলল না। কুকুরছানা খুঁজে আনল একটি। তাকে দেখা মাত্র ওসমান সাহেব রেগে গেলেন।

এক্ষুনি একে ফেলে দিয়ে এসো।

আইনুদ্দিন ফেলে দিয়ে এল। সে-রাতে ওসমান সাহেব কিছু খেলেন না। অনবরত বারান্দায় পায়চারি করলেন। আইনুদ্দিন ও তার স্ত্রী দূর থেকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

তিনি অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। খিলখিল হাসির শব্দে ঘুম ভাঙল। বাতাসী হাসছে। তার মানে রাত হয়নি। রাত বেশি হলে বাতাসী জেগে থাকত না। কিন্তু তাঁর কাছে মনে হচ্ছে অনেক রাত। আইনুদ্দিন ঘরে কোনো আলো দিয়ে যায়নি। অবশ্যি তার দরকারও নেই। ঘরে প্রচুর আলো। আকাশ ভেঙে জোছনা নেমেছে। কিংবা কে জানে আজ হয়তো হঠাৎ কোনো কারণে দুটি চাঁদ উঠেছে।

ওসমান সাহেব উঠে বসলেন। বিছানার এক অংশ, পড়ার টেবিল এবং আলনায় চাঁদের আলো এসে পড়েছে। সে আলো নদীর জলের মতো কাঁপছে। এরকম মনে হচ্ছে কেন ? চোখের ভুল নাকি ? তিনি বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। বিস্তীর্ণ মাঠে সত্যি সত্যি জোছনার ঢেউ। মাঝে মাঝেই ফুলে ফেঁপে উঠছে। তার কেমন যেন ভয় করতে লাগল। তিনি কাঁপা গলায় ডাকলেন, আইনুদ্দিন, আইনুদ্দিন।

আইনুদ্দিন তাঁর ডাক শুনত পেল না। সে উঠোনে বসে চাঁদের আলোয় দড়ি পাকাচ্ছে। লম্বা ঘোমটা দিয়ে তার বৌ বসে আছে তার পাশে। বাতাসী একটি কঞ্চি হাতে নিয়ে উঠোনের একমাথা থেকে অন্যমাথায় ছুটে ছুটে যাচ্ছে এবং অনবরত হাসছে।

চমৎকার একটি ছবি। এত চমৎকার যে মনে হয় এ রকম কিছু সত্যি সত্যি ঘটছে না। এ ছবিটি বিশুদ্ধ কল্পনা। ওসমান সাহেব দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন মাঠে। আবার তাঁর ভয় ভয় করতে লাগল। তিনি আবার ডাকলেন, আইনুদ্দিন, আইনুদ্দিন।

আইনুদ্দিন দড়ি ফেলে উঠে এল। তার বৌ মাথার ঘোমটা অনেকখানি টেনে দিল। বাতাসী হাতের কঞ্চি ফেলে তার দিকে হাত নাড়তে নাড়তে বিজবিজ করে কী সব বলতে লাগল। কোনো গ্রাম্য ছড়া বোধহয়। এই মেয়েটি প্রচুর ছড়া জানে। এক মুহূর্তের জন্যে না থেমেও সে অনবরত নতুন ছড়া বলতে পারে। তার মার কাছ থেকেই শিখেছে নিশ্চয়ই। কারণ বাতাসীকে তিনি কখনো বাড়ির বাইরে যেতে দেখেননি। আইনুদ্দিন হাতে একটি হারিকেন নিয়ে বারান্দায় উঁকি দিল। নিচুগলায় বলল, ভাইজানের শইলটা এখন কেমুন ?

শরীর ভালোই। ক'টা বাজে আইনুদ্দিন ?

আইনুদ্দিন বিব্রত মুখে দাঁড়িয়ে রইল। এ বাড়িতে কোনো ঘড়ি নেই। আইনুদ্দিন কার কাছ থেকে ঘড়ি একটা নিয়ে এসেছিল। তিনি ফেরত পাঠিয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, বন্ধনহীন অবস্থায় সময়কে দেখতে ভালোই লাগবে। গভীর রাতে ঘুম ভাঙলে জানা যাবে না কটা বাজে, রাত কাটতে কত দেরি। সময়ের কাছে নিজেকে সমর্পণ। কিন্তু আজ হঠাৎ করেই সময় জানতে ইচ্ছা হচ্ছে।

আইনুদ্দিন।

জি।

কটা বাজে জেনে আসতে পারবে ?

পারমু।

যাও জেনে আসো।

চা খাইবেন ভাইজান ?

না, চা-টা কিছু খাব না। আইনুদ্দিন আজ কি পূর্ণিমা ?

জে-না। কাইল। কাইল লক্ষ্মীপূজা।

ওসমান সাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, মাঠের ওপর চাঁদের আলো এমন ওঠানামা করছে কেন ? দেখতে পাচ্ছ আইনুদ্দিন ? আইনুদ্দিন অবাক হয়ে তাকাল মাঠের দিকে। সে তেমন কিছু দেখতে পেল না।

দেখতে পাচ্ছ না ?

বাতাসে ঘাস কাঁপতাছে হেইজন্যে এমুন মনে হয়। ভাইজান, আপনে ভিতরে গিয়া বসেন।

কেন ?

আপনের শইলডা ভালো না।

আজ কী বার ?

বুধবার।

তিনি ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। বুধবার টগরকে দেখতে যাওয়ার দিন। অনেকদিন তাকে দেখতে যাওয়া হয় না। টগর প্রতি বুধবারে তার জন্যে অপেক্ষা করে। কিছুদিন করবে তারপর আর করবে না। কোনো একটি বিশেষ কিছুর জন্যে মানুষ দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে পারে না। মানুষ প্রতিবারই নতুন কিছুর জন্যে প্রতীক্ষা করতে ভালোবাসে।

ভাইজান।

কই।

ডাক্তার সাবরে খবর দেই ?

কেন ?

আপনার শইলডা ভালো না।

আমার শরীর ভালোই আছে। আর শোন, ঘড়ি আনার দরকার নেই।

রাইতে কী খাইবেন ?

কিছুই খাব না। হারিকেন রেখে তুমি নিচে চলে যাও।

আইনুদ্দিন চিন্তিত মুখে নেমে গেল। ওসমান সাহেব নিশ্চিত সে উঠোনে বসা তার স্ত্রীর সঙ্গে কিছুক্ষণ গুজগুজ করে কথা বলবে, তারপর রওনা হবে ডাক্তারের কাছে। সময় জেনে আসবে, এবং খুব সম্ভব ডাক্তারকেও সঙ্গে নিয়ে আসবে। ডাক্তার ভদ্রলোক এসে আর উঠতে চাইবেন না। অনবরত কথা বলবেন। এখানে তাঁর কথা বলার মতো লোক নেই হয়তো।

গতকাল ভদ্রলোক প্রথম এসেছিলেন। বুড়ো ধরনের একজন মানুষ। এই গরমেও স্যুট পরা। স্যুটটি পুরনো এবং ময়লা। কিন্তু গলার টাইটি ঝকঝক করছে। সম্ভবত আজই ট্রাংক খুলে বের করা হয়েছে।

আপনি যে এখানে আছেন জানতামই না। আইনুদ্দিনের কাছে শুনে অবাকই হলাম। আমার স্ত্রীকে বললাম, সেও আসতে চাচ্ছিল। আমার ছেলেমেয়েরা থাকলে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসত। ওরা আবার খুব সাহিত্য-পাগল; একজন কবিতা লিখে ছদ্মনামে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখা বের হয়। আপনার চোখে পড়েছে বোধহয়, সানজা করিম। একটা কবিতার বই বের করতে চায়। বহু খরচান্ত ব্যাপার। কী বলেন ? এদিকে আবার বই না হলে কবি বলে কেউ স্বীকার করতে চায় না। ভালো লিখছে না খারাপ লিখছে এটা কেউ দেখতে চায় না। দেখতে চায় বই ক'টা আছে। কোয়ালিটি নিয়ে কারোর মাথাব্যথা নেই, সবাই চায় কোয়ান্টিটি। ঠিক বলছি কিনা বলেন ?

ভদ্রলোক অনবরত কথা বলতে লাগলেন। নিজেই প্রশ্ন করছেন, নিজেই জবাব দিচ্ছেন। আবার প্রশ্ন করছেন আবার জবাব দিচ্ছেন। অত্যন্ত বিরক্তিকর অবস্থা। আইনুদ্দিন কী মনে করে তাঁকে নিয়ে এসেছে কে জানে। ভদ্রলোকের সঙ্গে ডাক্তারি ব্যাগ। প্রেসার মাপার যন্ত্র। কাজেই দেখাসাক্ষাতের জন্যে আসেননি, চিকিৎসার জন্যেই এসেছেন।

ভাই এখন বলেন, আপনার কী অসুবিধা ?

আমার কোনো অসুবিধা নেই।

সে কী, আইনুদ্দিন যে বলল...

ও ঠিক বলেনি।

ঘুম হচ্ছে না নাকি। সারা রাত বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করেন ?

আমি এমনিতেই রাত জাগি।

তা তো জাগতেই হয়। লেখক মানুষ। আপনারা নাক ডাকিয়ে ঘুমুলে চলে নাকি ?

ওসমান সাহেব ঠান্ডা গলায় বললেন, আপনি অন্য একদিন আসুন। আজ আমি একটু ব্যস্ত।

ডাক্তার অবাক হয়ে বললেন, প্রেসার মাপবেন না ?

জি-না।

টেবিলের ওপর হারিকেন জ্বলছে। সুন্দর করে সাজানো টেবিল। কাগজ, কলম, পিরিচে ঢাকা পানির গ্লাস। ওসমান সাহেব লক্ষ করলেন, দুটি পেনসিলও রাখা আছে। পেনসিল দু'টি কাল ছিল না। আজই আনা হয়েছে এবং আইনুদ্দিনের স্ত্রী এক ফাঁকে রেখে গেছে। তাঁর মনে হলো, এই টেবিলে কোথাও যেন মিলির ছোঁয়া আছে। ওসমান সাহেব বুঝতে পারলেন না হঠাৎ করে মিলির কথা কেন মনে হলো। এরকম মনে হওয়ার কারণ কি পেনসিল দু'টি ? মিলিও লেখার টেবিল গোছাবার সময় কলমের পাশাপাশি দু'টি পেনসিল রাখত। পেনসিল তিনি ব্যবহার করেন না। মিলিকে বলেছেন অনেকবার। লিখতে বসে প্রতিবারই তিনি পেনসিল দু'টি ড্রয়ারে রাখতেন। এবং প্রতিবারই মিলি তা বের করে টেবিলে সাজিয়ে রাখত। মজার ব্যাপার হচ্ছে, মিলির আগ্রহ এই টেবিলেই সীমাবদ্ধ ছিল। কী লেখা হলো না হলো তা নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা ছিল না। বিয়ের পরও রোজ রানুকে টেলিফোন।

হ্যালো ভাবি, ভাইয়ার টেবিল গোছানো হয়েছে ?

হ্যাঁ হয়েছে।

টেবিলক্লথ বদলে দিয়েছ তো ? রোজ নতুন টেবিলক্লথ না দিলে সে লিখতে পারে না। সাতটা টেবিল ক্লথ আছে তার জন্যে। কোনায় শনি, রবি লিখে দিয়েছি।

আমি জানি, তুমি আমাকে বলেছ অনেকবার।

ভাবি দেখো তো আজ কি সোমবার লেখা টেবিলক্লথ আছে কি না। না থাকলে ভাইয়া কিন্তু লিখতে পারবে না।

শোনো মিলি, লেখাটা তৈরি হয় মাথায়। টেবিলক্লথের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই।

তুমি কাইন্ডলি একটু দেখে আসো না ভাবি! এক মিনিটের ব্যাপার।

ঠিক আছে যাচ্ছি।

আরেকটা কথা ভাবি, যে উপন্যাসটা শুরু করেছিল সেটা ক'পৃষ্ঠা লিখেছে সেটাও আমাকে বলবে।

ঠিক আছে বলব। এখন টেলিফোন নামিয়ে রাখি ?

না ভাবি, এখনই রাখবে না। আরেকটু কথা বলি।

ওসমান সাহেব টেবিলের সামনে বসলেন। হারিকেনের আলো কমিয়ে দিলেন। এক চুমুক পানি খেলেন।

গ্লাসের নিচে রাখা রানুর চিঠিটি আবার পড়লেন। পাঁচ-ছয় লাইনে লিখেছে মিলিকে রাঁচিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কাজটা ভালো হয়নি। সম্ভব হলে তুমি ওকে দেশে নিয়ে আসার চেষ্টা করো।

কী চেষ্টা তিনি করবেন ? কার কাছে যাবেন। এবং ওরাই বা তার কথা কেন শুনবে!

বাতাসী এসে দাঁড়িয়েছে পর্দা ধরে। সে ভেতরে ঢোকে না। এঘরে ঢোকা বোধহয় নিষেধ আছে। ওসমান সাহেব বললেন, কী খবর বাতাসী ?

বাতাসী হাসিমুখে বলল,

ইরল বিরল চিরল পাতা
হাত্তীর মাথাত কলাপাতা।

বলেই সে ছুটে নেমে গেল নিচে। মেয়েটির কথা বলার ভঙ্গি—ছুটে পালাবার ভঙ্গির মাঝে কি মিলির কোনো ছাপ আছে ? সে কি ছেলেবেলায় এরকম ছড়া বলত ? কিছুই মনে পড়ছে না। কোনো প্রিয়জন হঠাৎ করে অনেক দূরে চলে গেলে তার কথা বারবার মনে পড়ে। পুরনো সব স্মৃতি ভেসে ওঠে। কথাটা কি ঠিক ? বোধহয় না। অনেক চেষ্টা করেও তিনি মিলি প্রসঙ্গে পুরনো কিছু মনে করতে পারলেন না।

ওসমান সাহেব কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়লেন এবং অত্যন্ত দ্রুত লিখতে শুরু করলেন,

কল্যাণীয়াষু,

মিলি, আজ আমাদের গ্রামের বাড়িতে অদ্ভুত একটা কাণ্ড হয়েছে। প্রচণ্ড জোছনা হয়েছে। অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ জেগে দেখি ঘরে আলোর বন্যা। বন্যার জলের মতোই থৈথৈ করছে জোছনা। একবার ভাবলাম দু'টো চাঁদ উঠল নাকি আকাশে! বারান্দায় গিয়ে দেখি আইনুদ্দিন তার স্ত্রীকে নিয়ে দড়ি পাকাচ্ছে। তাদের ছোট্ট মেয়েটি কঞ্চি হাতে ছোটাছুটি করছে। কী অপূর্ব একটি ছবি, এ ছবি এ ভুবনের নয়, অন্য কোনো ভুবনের। আনন্দে আমার চোখ ভিজে উঠল।

মিলি, সমগ্র জীবনে আমি এমন একজন মানুষ হতে চেয়েছিলাম, যার ভেতরে কোনো রকম ক্ষুদ্রতা থাকবে না। যে এ পৃথিবীর সুন্দর যা কিছু আছে তাকে স্পর্শ করবে...

বাতাসী আবার এসে দাঁড়িয়েছে। আবার কী একটা ছড়া বলল। ওসমান সাহেব তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। আবার লিখতে শুরু করলেন। বাতাসী তাকিয়ে আছে। সে ভেতরে এসে ঢুকল। এই অদ্ভুত মানুষটিকে তার বড় ভালো লাগে। আজ কেন জানি অন্যদিনের চেয়েও ভালো লাগছে।

২৮

ইদানীং রানুর ইনসমনিয়ার মতো হচ্ছে।

গত রাত্রে তিনটা পর্যন্ত জেগে ছিল। আজও ঘুম আসছে না। মাথার দু'পাশে দপদপ করছে। একটু আগেই এক গ্লাস পানি খেয়েছে, কিন্তু এখন আবার তৃষ্ণা হচ্ছে। রানু মশারির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।

অপলা পড়ছে। এত পড়ার কোনো মানে হয়? তার পড়ার ধরনও অদ্ভুত। কোলের কাছে বই নিয়ে হেঁটে হেঁটে পড়া। এরকম না করলে তার নাকি কিছু মনে থাকে না। রানু বারান্দায় যাওয়ার জন্যে দরজা খুলতেই অপলা চেঁচিয়ে উঠল, কে কে? রানু জবাব দিল না। বারান্দায় এসে দাঁড়াল। চারদিক অন্ধকার। কোনো সাড়াশব্দ নেই। যাদের ঘুমিয়ে পড়ার তারা ঘুমিয়ে পড়েছে।

রানু আপা?

হুঁ।

আজ ঘুম আসছে না?

না।

ঠান্ডা পানিতে মাথা ধুয়ে এক গ্লাস গরম দুধ খেয়ে শুয়ে থাক। চিৎ হয়ে শোবে এবং বড় বড় নিঃশ্বাস নেবে, যাতে রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণটা বেশি থাকে।

রানু জবাব দিল না। অপলা কি আজকাল বেশি কথা বলছে? বোধহয় বলছে। এত কথা আগে বলত না।

আপা।

বল।

আনব দুধ গরম করে? তুমি খেলে আমিও খাব। আমারও ঘুমের ট্রাবল হচ্ছে। অবশ্যি আমার ঘুম হচ্ছে না পরীক্ষার টেনশনে।

অপলা বারান্দায় চলে এল। তার হাতে ডিকশনারি সাইজের একটা বই। অপলা হাসতে হাসতে বলল, আজকাল যেসব স্বপ্ন দেখছি সেগুলিও পরীক্ষা সংক্রান্ত। যেমন গতকাল রাতে স্বপ্নে দেখলাম আমাদের এনাটমির কোশ্চেন আউট হয়ে গেছে। সবাই সে কোশ্চেন পেয়েছে। বহু ছোটাছুটি করে আমিও কোশ্চেন জোগাড় করলাম। পরীক্ষা দিতে গিয়ে দেখি, এনাটমির বদলে সেদিন হচ্ছে বাংলা পরীক্ষা। কঠিন সব ব্যাকরণের প্রশ্ন। প্রশ্ন হলো, 'উপপদ তৎপুরুষ সমাস কাহাকে বলে?' বলতে বলতে অপলা হাসতে শুরু করল। রানু লক্ষ করল, হাসির দমকে ডিকশনারির মতো মোটা বইটি মেঝেতে ছিটকে পড়েছে। অপলার সেদিকে লক্ষও নেই।

অপলা!

বলো।

রাতদুপুরে এরকম চেঁচিয়ে হাসা ঠিক না।

সরি আপা। দুধ আনব তোমার জন্যে?

তুই বোস। তোর সঙ্গে কথা আছে।

অপলা বারান্দার মেঝেতেই শিশুদের মতো পা ছড়িয়ে বসল অথচ রানুর পাশেই একটা খালি চেয়ার আছে। রানু দেখল, অপলা শাড়ির আঁচল মুখে গুঁজে হাসির বেগ সামলাবার চেষ্টা করছে।

অপলা, গত কয়েকদিন ধরে একটা মজার জিনিস লক্ষ করছি। অকারণেই তুই খুব হাসছিস। বেশ কথা বলছিস।

পরীক্ষার টেনশনে এরকম হচ্ছে আপা। মেডিকেল টার্মে একে বলে...

মেডিকেল টার্মে যাই বলুক, আমার মনে হয় আমি কারণটা জানি। ভালোই জানি।

জানলে বলো। অবশ্যি যদি বলতে চাও।

তোর মতো বয়েসি মেয়েরা যখন নিষিদ্ধ কিছু করে, তখন এরকম আচরণ করে। হঠাৎ খুব প্রগলভ্ হয়ে যায়। নিজেকে আড়াল করে রাখবার জন্যে কৃত্রিম কিছু আচরণ করে। যেমন তুই করছিস।

অপলা গম্ভীর হয়ে বলল, নিষিদ্ধ কাজটা কী করলাম সেটাও বলো শুনি। পরীক্ষা হয়ে যাক তুমি কত বড় ডিটেকটিভ।

সেটা আমি জানি না তবে অনুমান করতে পারি। আমার ধারণা তুই তোর দুলাভাইকে খুব একটা আবেগের চিঠি লিখেছিস। চিঠিটা পোস্ট করার পর তোর মনে হয়েছে কাজটা ঠিক হয়নি, খুব অন্যায় হয়েছে। অপলা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, তুমি কি আমার চিঠি পড়েছ ?

না পড়িনি। লুকিয়ে অন্যের চিঠি পড়ার অভ্যেস আমার নেই।

না পড়লে চিঠির কথা তুমি জানতে পারতে না। এত বড় ডিটেকটিভ তুমি এখনো হওনি।

অনুমান করে বলেছি। অনুমানটা ঠিক হয়েছে। সব অনুমান তো সবসময় ঠিক হয় না। অনেকবার ভুলও করেছি।

সারা জীবনই তুমি ভুল করেছ। কেউ কেউ ভুল করার জন্যে জন্মায়।

অপলা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। রানু কিছু বলার আগেই ছুটে চলে গেল ভেতরে। রানু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবল, কী লেখা ছিল সেই চিঠিতে ? প্রেমের চিঠি না তো ?

অনেক দূরে কোথাও বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বর্ষা এসে গেল বোধহয়। রানু ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। শীত শীত করছে। বেশ বাতাস বারান্দায়। ভেতর থেকে একটা চাদর নিয়ে আসবে নাকি ? আলসি লাগছে। একবার ভেতরে গেলে আর বারান্দায় আসা হবে না।

অপলা আবার বারান্দায় এসে দাঁড়াল। কেঁদে-টেদে এসেছে বোধহয়। কিংবা এক্ষুনি হয়তো কাঁদবে। রানু তাকিয়ে রইল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। রাত কত হয়েছে কে জানে। নিশ্চয়ই অনেক রাত।

রানু আপা।

বল।

অপলা থেমে থেমে বলল, আমি তাঁকে আবেগের চিঠি লিখলেও তো তোমার কিছু যায় আসে না।

তা ঠিক, কিছুই যায় আসে না।

কোন মেয়ে তাকে কী লিখছে, না লিখছে তাতে তোমার কী ?

বললাম তো একবার—আমার কিছুই না।

এটা তুমি মুখে বলছ, কিন্তু মনে তা স্বীকার করো না। যদি স্বীকার করতে তা হলে আমার সামান্য চিঠি লেখা নিয়ে এতগুলি কথা বলতে না।

রানু হেসে ফেলল। কেমন পাগলের মতো কথা বলছে অপলা। হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলা। যেন ক্লাসে বক্তৃতা দিচ্ছে। রানু শান্তস্বরে বলল, আমি তোকে তেমন কিছুই বলিনি। তোর যদি ইচ্ছে হয় রোজ তাকে দুটো করে চিঠি লিখিস।

হ্যাঁ, আমি লিখব।

বেশ তো লিখবি। ঢাকায় এলে হাত ধরাধরি করে বলধা গার্ডেনে যাবি। আমি কিছুই বলব না।

অপলা কাঁদতে শুরু করল। ব্যাপারটা ঘটল হঠাৎ। অপলা যে কেঁদে ফেলতে পারে এটা সে ভাবেনি। রানু এগিয়ে এসে তাঁর হাত রাখল অপলার পিঠে। শান্ত গলায় বলল, আবেগ খুব মূল্যবান জিনিস এই কথাটা খেয়াল রাখবি। তোর দুলাভাইয়ের মধ্যে অন্য কিছু আছে কি না আমি জানি না। কিন্তু আবেগ যে নেই এটা আমি বলতে পারি। দীর্ঘদিন তার পাশে থেকে আমাকে শিখতে হয়েছে। চল ভেতরে চল। ঠান্ডা লাগছে।

তুমি যাও।

দরজা দিয়ে শুয়ে পড়ব। আয়। আর শোন, কাঁদছিস কেন ?

আমি কাঁদলে তোমার কি অসুবিধা ?

আমার কোনোই অসুবিধা নেই। যত ইচ্ছা কাঁদ। তবে কথায় কথায় কান্না একমাত্র শরৎচন্দ্রের নায়িকাদেরই মানায়, তোকে মানায় না।

তারা ঘুমুতে গেল রাত দু'টোর দিকে। রানু দেখল, টগর তার খাটে নেই। এক ফাঁকে উঠে চলে গেছে অপলার ঘরে। টগর কি তাকে পছন্দ করে না ? কেন করে না ? টগরের পরিস্থিতি অন্য কোনো ছেলের হলে সে তার মাকেই আঁকড়ে ধরত। সেটাই স্বাভাবিক। রানু অপলার ঘরে উঁকি দিল। টগর অপলার গলা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আছে। দৃশ্যটি সুন্দর। কিন্তু মন খারাপ করে দেওয়ার মতো।

অপলা, টগর কি জেগে আছে ?

হুঁ, আছে।

টগর! টগর!

কী ?

আমার সঙ্গে ঘুমাবে না ?

ঘুমাব।

তা হলে এসো।

আসছি।

কিন্তু টগর উঠে এল না। যেন মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যেই বলা। রানু ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে মৃদুস্বরে বলল, অপলা, তুই চিঠিতে কী লিখেছিস ?

তেমন কিছু না আপা। আসতে লিখেছি। এর বেশি কিছু না।

খুব ইনিয়ে-বিনিয়ে লেখা তাই না ?

হ্যাঁ।

আচ্ছা ঘুমো।

টগরকে নেবে না ?

না। ও তোর সঙ্গেই থাক।

রানুর একফোঁটাও ঘুম এল না। হাতের কাছে টগর নেই। বিছানাটা সেই কারণেই কি বিশাল লাগছে ? এক সময় তার মনে হলো, একটা বিশাল মাঠের মাঝখানে সে শুয়ে আছে। তার ভয় ভয় করতে লাগল। ওসমান সবসময় বলত, জীবজগতে মানুষ হচ্ছে একমাত্র প্রাণী, যে একা একা থাকতে পারে। অন্য কোনো প্রাণী পারে না। তাদের সঙ্গী বা সঙ্গিনী প্রয়োজন, তবে মানুষ অসাধারণ কল্পনাশক্তির অধিকারী বলেই সে নিঃসঙ্গ সময়টায় সঙ্গী কল্পনা করে নেয় এবং এক সময় একা থাকাটা তার অভ্যাস হয়ে যায়।

টগরের বাবার নিশ্চয়ই একা থাকাটা এত দিনে অভ্যাস হয়ে গেছে ? রানু এপাশ-ওপাশ করতে লাগল। পাশের ঘরে বাতি জ্বলছে। অপলা বাথরুম করাচ্ছে বাবুকে। খুব সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলছে দু'জনে। কী এত কথা ওদের ? গুজগুজ ফুসফুস। কান পাতলে হয়তো শোনা যাবে, কিন্তু কান পাততে ইচ্ছে করছে না। টগর হাসছে। তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসছে অপলা। ওদের দু'জনের একটি গোপন জগৎ আছে। রানুর সে-জগতে প্রবেশের অধিকার নেই। জোর করে সে অধিকার আদায় করা কি সম্ভব ? রানু কি এখন ডাকতে পারে টগরকে ? শান্ত শীতল গলায় বলতে পারে, তোরা কী নিয়ে হাসছিস টগর ? আমাকেও দলে নিয়ে নে। আমারও হাসতে ইচ্ছে করছে। আমিও হাসব।

কিন্তু কেউ তাকে দলে নিবে না। 'আমি ছিলাম সারা জীবন দলছুট'। ক্লাস নাইনে প্রাকটিক্যাল ক্লাসে চারজন করে গ্রুপিং হবে। একচল্লিশজন ছাত্রী ক্লাসে। দশটি গ্রুপ। সে বাদ পড়ল। তাকে নিয়ে ছাত্রীরা কেউ গ্রুপ করেনি। বদিউজ্জামান স্যার বিরক্ত হয়ে বললেন, কোনো এক গ্রুপের সঙ্গে ঢুকে যা। হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? কিন্তু ঢুকবে কার সঙ্গে ? যাদের কাছেই গেছে তারাই বলেছে, তুমি ভাই অন্য গ্রুপে যাও। সেসময় তার বয়স কম ছিল। আবেগ ছিল প্রচুর। সেও শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের মতোই কাঁদতে শুরু করল। চোখ মুছতে মুছতে বদিউজ্জামান স্যারকে বলল, স্যার আমি সায়েন্স পড়ব না। স্যার অবাক হয়ে বললেন, কেউ তোকে গ্রুপে নিচ্ছে না এইজন্যে সায়েন্স পড়া ছেড়ে দিবি ? রানু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, সেজন্যে না স্যার। সায়েন্স পড়তে আমার ভালো লাগে না।

সায়েন্স কী পড়েছিস যে বুঝে ফেললি সায়েন্স পড়তে ভালো লাগে না ? আর ফিচ ফিচ করে কাঁদছিস কেন ?

মাথাব্যথা করছে স্যার। এ জন্যে কাঁদছি।

আবার মিথ্যা কথা ? মাথা মুড়িয়ে দেব, বুঝলি ?

বদিউজ্জামান স্যার কথায় কথায় বলতেন মাথা মুড়িয়ে দেব। কেউ অঙ্ক পারল না—স্যার হুঙ্কার দিয়ে বললেন, কাল একটা ক্ষুর নিয়ে আসবি তোর মাথা মুড়িয়ে দেব। কেউ ক্লাসে লুকিয়ে লুকিয়ে গল্পের বই পড়ছে—স্যারের চোখে পড়ল, স্যার বললেন, দপ্তরী কালিপদকে ডেকে নিয়ে আয়, ওকে দিয়ে একটা সেভেন ও ক্লক ব্লেড আনিয়ে তোর মাথা মুড়িয়ে দেব।

একজন মানুষ সমগ্র জীবনে অল্প কয়েকজন ভালো মানুষের সাক্ষাৎ পায়, যারা তার ওপর অসাধারণ প্রভাব ফেলে। বদিউজ্জামান স্যার সেরকম একজন মানুষ। ক্লাস নাইনের সেই প্রাকটিক্যাল ক্লাসে রানু লজ্জা ও অপমানে মরে যেতে বসেছিল। ইচ্ছা করছিল ছুটে গিয়ে কোনো একটা চলন্ত গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। হয়তো করেও বসত সেরকম কিছু। বদিউজ্জামান স্যার তাকে দু'ঘণ্টা তাঁর সামনের চেয়ারে বসিয়ে রাখলেন। যতবারই সে বলছে, স্যার উঠি ? ততবারই স্যার বলেছেন, আহা বোস না। এত তাড়া কিসের ? সে বসেছিল মাথা নিচু করে। শুধু সামনে বসে থাকা... কোনো কথাবার্তা নেই। একসময় তিনি বললেন, আচ্ছা যা এখন বাড়ি যা। একা তোর জন্যে একটা গ্রুপ করে দেব। ভালোই হবে। কাজকর্ম ভালো শিখবি। আরেকটা কথা শোন, ছোটখাটো দুঃখকষ্টকে আমল দিতে নাই। ক্লাসের মেয়েরা তোকে পছন্দ করছে না তাতে কিছু যায় আসে না। আমি তো করছি। আমার তো মনে হয় তোর মতো ভালো মেয়ে আমি আমার শিক্ষকতা জীবনে কম দেখেছি। ছত্রিশ বছর ধরে মাস্টারি করছি, কম দিন তো নয়। কী বলিস ? তুই ভালো মেয়ে। খুব ভালো। এটা কখনো ভুলবি না।

এটা স্যারের একটা মিথ্যা কথা। ক্লাসের সব মেয়েকেই স্যার এই কথা কোনো না কোনো সময় বলেছেন। কিন্তু কত মধুর সেই মিথ্যাটি। পৃথিবীতে মধুর মিথ্যার সংখ্যা এত কম কেন ভাবতে ভাবতে রানু চোখ মুছল।

বিয়ের পর সে গিয়েছিল স্যারের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি চিনতে পারলেন না। অবাক হয়ে বললেন, তুমি কোন ব্যাচের মা ? কী যেন নাম তোমার ? রানু মৃদুস্বরে বলেছিল, আপনি আমাকে একবার আশা ও আনন্দের কথা শুনিয়েছিলেন। সেই কথাগুলি আমি প্রায়ই ভাবি। আমার হাসব্যান্ডকে আপনার কথা বলেছিলাম। তিনি আপনাকে দাওয়াত করেছেন। আপনি কি একবার আসবেন আমাদের বাসায় ?

কী করেন তোমার স্বামী ?

তিনি একজন লেখক। আপনি হয়তো চিনবেন।

স্যার চিনলেন এবং উচ্ছ্বসিত হলেন।

মা তোমার পরম সৌভাগ্য। তুমি এমন একজনের পাশে আছ, যিনি একজন অত্যন্ত উঁচু দরের মানুষ। যিনি শোকে ও দুঃখে মানুষকে পথ দেখান, আশা ও আনন্দের কথা

বলেন। এরা মানব জাতির বিবেক। এদের পাশে থাকা ভাগ্যের কথা কিন্তু মা তার সঙ্গে দেখা করতে আমি যাব না। তাঁর সঙ্গে দেখা করার যোগ্যতা আমার নাই। আমি সামান্য মানুষ।

ভোর হচ্ছে।

একতলায় মোরগ ডাকছে। রানু উঠে পড়ল। উঁকি দিল পাশের ঘরে। টগরের মাথা বালিশ থেকে সরে গেছে। কিন্তু দু'হাতে সে অপলাকে জড়িয়ে ধরে আছে।

কত চমৎকার সব দৃশ্য চারদিকে। তবু কত অর্থহীন এই বেঁচে থাকা।

২৯

সারা বিকাল আকাশ মেঘলা ছিল। সন্ধ্যাবেলা চারদিক অন্ধকার করে বৃষ্টি নামল। রানু অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙল বৃষ্টির শব্দে। খোলা জানালায় বৃষ্টির ছাঁট আসছে। ঘরের ভিতর প্রচুর হাওয়া। রানু চোখ না মেলেই হাত বাড়াল, টগর নেই। তার সঙ্গেই শুয়েছিল। এক ফাঁকে উঠে চলে গেছে।

টগর! টগর!

কী মা ?

কী করছ তুমি ?

কিছু করছি না।

টগর কথা বলছে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। বৃষ্টিতে ভিজছে নিশ্চয়। রানু এসে দেখে সত্যি তা-ই। রেলিং ধরে টগর বসে আছে। গা মাথা ভিজে সপসপ করছে। চুল বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। দৃশ্যটি কেমন যেন অন্যরকম। যেন এই ছেলেটির কেউ নেই। বারান্দায় বসে বসে কাঁদছে।

বৃষ্টিতে ভেজা ঠিক না টগর। ভেতরে আসো।

আসছি।

টগর এল না। ঠিক আগের মতোই বসে রইল। রানুর ইচ্ছা হলো কড়া গলায় একটা ধমক দিতে। সে ধমক দিল না। নিজেকে চট করে সামলাল। ছোট বাচ্চাদের খানিকটা নিজের মতো থাকতে দিতে হয়। কিছুক্ষণ ভিজলে এমন কী আর ক্ষতি হবে ?

টগর!

কী মা ?

অপলা কোথায় ? আসেনি এখনো ?

না।

তুমি কি অপলার জন্যেই রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছ ?

টগর জবাব দিল না। সম্ভবত সে অপলার জন্যেই অপেক্ষা করছে। অপলা খাতাপত্র কী সব কিনবার জন্যে নিউমার্কেটে গিয়েছে। এতক্ষণে চলে আসার কথা। আসছে না কেন কে জানে!

রানুর মনে হলো অপলার অনেক সাহস হয়েছে। আগে একা একা কোথাও যেত না। এখন যাচ্ছে। গত সপ্তাহে কলেজ থেকে ফিরল সন্ধ্যা পার করে। তাদের কী নাকি ফাংশান ছিল। রানু দেখল ফর্সামতো রোগা একটি ছেলে এসেছে তার সঙ্গে। অনেক দিনের পরিচিত এমন ভঙ্গিতে ছেলেটি কথা বলছিল। অপলা বলল, চা খেয়ে যাও সিরাজ। ছেলেটি তার উত্তর দেয়নি। মাথা ঝাঁকিয়েছে। যার মানে হ্যাঁ কিংবা না দুই হতে পারে।

রানু একবার ভেবেছিল বলবে, রিকশায় একজন ছেলের সঙ্গে আসা ঠিক না। এরকম আর কোনোদিন আসিস না। রিকশায় দু'জন পাশাপাশি বসা মানেই গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে বসা। এভাবে বসলেই শরীর কথা বলতে শুরু করে। শেষপর্যন্ত অবশ্য এসব কথা বলা হয়নি। কারণ কথাগুলি তার নিজের নয়। ওসমানের কথা। অন্যের কথা নিজের ভেবে বলার কোনো অর্থ হয় না।

রানু বাতি জ্বালাতে গিয়ে দেখল ইলেকট্রিসিটি নেই। শহরের ইলেকট্রিসিটির এমন অবস্থা। একটু ঝড়বৃষ্টি হলেই কারেন্ট নেই। আর একবার নেই হলে সারা রাতের জন্যেই নেই। রানু হারিকেন জ্বালাল। হারিকেনে তেল নেই। কতক্ষণ জ্বলবে কে জানে। ড্রয়ারে মোমবাতি ছিল। কিন্তু এখন নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সে চায়ের পানি চাপিয়ে আবার বারান্দায় এল। টগরের ঠান্ডা লাগছে। কিছুক্ষণ পরপরই কেঁপে উঠছে। নীল হয়ে আছে ঠোঁট। কতক্ষণ ধরে সে বৃষ্টিতে ভিজছে?

টগর!

কী মা?

এসো মাথা মুছিয়ে দেই।

টগর উঠে এল। কোনো আপত্তি করল না।

চা খাবে বাবা? তোমাকে একটু আদা-চা করে দেই?

টগর অবাক হয়ে বলল, আমি বড় হয়ে গেছি, না?

হ্যাঁ, তুমি বড় হয়েছ। অনেক বড়।

এখন আমি রোজ চা খাব?

হ্যাঁ খাবে।

রানু মাথা মুছিয়ে দিতে দিতে হালকা গলায় বলল, শুধু চা না, চাইলে সিগারেটও এনে দেব।

ধুর।

রানু হেসে ফেলল। টগর উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে আছে। শীতে সে অল্প অল্প কাঁপছে। রানুর বড় মায়া লাগল। নির্বিরোধ শান্ত ছেলে হয়েছে টগর। কারও প্রতি তার কোনো অভিযোগ নেই।

রানু পিরিচে চা ঢেলে দিল। টগর কেমন বিড়ালের বাচ্চার মতো চুক চুক করে চা খাচ্ছে। একবার মুখ তুলে মাকে দেখল এবং হেসে ফেলল।

আমাদের টগর সোনামণি আজ এত খুশি কেন ?

এমনি।

না এমনি নয়। নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে।

টগর লজ্জিত ভঙ্গিতে পকেটে হাত দিয়ে এক টুকরা কাগজ বের করল। নীল রঙের চিঠির কাগজ। সে কাগজটা মার দিকে বাড়াল না। টেবিলে রেখে মাথা নিচু করে হাসতে লাগল।

কী এটা ? চিঠি ?

হুঁ

কার চিঠি ? কে লিখেছে ?

আব্বা।

রানু কাগজ তুলে নিল। ওসমানের চিঠি নয়। চিঠিটা অপলার লেখা। বাবার চিঠি এসেছে এই বলে সে নিশ্চয়ই টগরকে বুঝিয়েছে। মেয়েলি ধরনের একটা ট্রিক। রানু অপ্রসন্ন মুখে চিঠিতে চোখ বোলাতে লাগল।

> প্রিয় টগর সোনা,
>
> তুমি কেমন আছগো ? তোমার কথা খুব ভাবি। লেখালেখি নিয়ে খুব ব্যস্ত তাই আসতে দেরি হচ্ছে। তুমি এক কাজ করো না কেন—চলে আসো এখানে। তুমি এলে খুব মজা হবে। আমরা খুব বেড়াব। পুকুরে সাঁতার কাটব। আসবে না তুমি ? না এলে আমি রাগ করব। আসবে, আসবে, আসবে।

রানু ভুরু কুঁচকে দীর্ঘ সময় চিঠিটির দিকে তাকিয়ে রইল। এই নকল চিঠিটা কি উদ্দেশ্যমূলক নয় ? অপলা কি এখানে সূক্ষ্ম একটা চাল দেওয়ার চেষ্টা করছে না ? সে নিশ্চয়ই ভেবেছে টগর চিঠি পেয়েই ব্যস্ত হয়ে উঠবে বাবার কাছে যাওয়ার জন্যে। টগর অবশি সেরকম কিছু করছে না। রানু একবার ভাবল বলে, টগর, এটা একটা নকল চিঠি। এ চিঠি তোমার বাবার লেখা নয়। কিন্তু সে তা বলল না।

বাইরে বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। অপলার দেখা নেই। কত দেরি করবে সে ? রানুর মনে হলো অপলাকে কিছু বলা দরকার। স্বাধীনতা মানে রাত করে বাড়ি ফেরা নয়। সে নিজে একজন স্বাধীন মহিলা, কিন্তু সে কি রাত বিরেতে বাড়ি ফিরে!

অপলা ফিরল কাক ভিজা হয়ে। কাগজ কিনতে গিয়েছিল কিন্তু সঙ্গে কোনো কাগজপত্র দেখা গেল না। সে গুনগুন করতে করতে বাথরুমে কাপড় বদলাতে গেল। বাথরুম থেকেই বলল, ক্যাটস এন্ড ডগস বৃষ্টি নেমে গেছে, তাই না আপা ? আমি আজ অবশ্যি ইচ্ছা করেই ভিজলাম। যখন খুব তেজে বৃষ্টি নামল তখন রিকশার হুড ফেলে দিলাম। রাস্তায় যারা ছিল সবাই তাকিয়ে দেখছিল। আমাকে পাগল ভেবেছে বোধহয়।

রানু তার কথার কোনো জবাব দিল না। মেয়েটি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। এটা ঠিক সহজভাবে গ্রহণ করা মুশকিল। তাকে বললে কেমন হয়—অপলা তুই এরকম হয়ে যাচ্ছিস কেন ?

অপলা খুঁজে মোমবাতি বের করল। যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে পড়তে বসল। পড়া এগোল না। এক জায়গায় বসে সে পড়তে পারে না। ঘুরে ঘুরে পড়তে হয়। বই বন্ধ করে সে টগরের সঙ্গে গল্প করতে বসল। পাশেই রানু আছে। সেদিকে সে কিছুমাত্র লক্ষ করছে না। যেন এ ঘরে রানু নামের কেউ নেই।

ভূতের গল্প শুনবি টগর ?

হুঁ।

হুঁ কী ? ভালো করে বল। বল, হ্যাঁ, শুনব।

হ্যাঁ শুনব।

ভয় পেয়ে কাঁদবি না তো ?

না, কাঁদব না।

সত্যি ভূতের গল্প।

অপলা হারিকেনের আলো আরও খানিকটা কমিয়ে দিল। রানু লক্ষ করল টগর অপলার কোমর জড়িয়ে কোলে মাথা গুঁজে শুয়ে আছে। অপলা টগরের মাথায় বিলি কাটতে কাটতে গল্প করছে। রানু কি ঈর্ষা বোধ করছে ? করছে বোধহয়। তার ইচ্ছা করছে টগরকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে। এই সন্ধ্যাবেলা কিসের ভূতের গল্প।

বৃষ্টি কমে এসেছিল। রাত দশটার দিকে আবার প্রবল বেগে বর্ষণ শুরু হলো। বাতাস বইতে লাগল প্রচণ্ড শব্দে। ঝড় শুরু হলো নাকি ? দূর থেকেই হইচই চিৎকারের শব্দ আসছে। বস্তির কাঁচাঘরবাড়ি কিছু উড়ে গেছে নিশ্চয়ই। অপলা বলল, কেমন ভয় ভয় লাগছে আপা। পুরুষ কেউ নেই।

পুরুষমানুষ থাকলে কী করত ? ঝড় থামিয়ে দিত ?

তা দিত না, তবে সাহস পাওয়া যেত। ঘরে কোনো পুরুষমানুষ না থাকলে কেমন একা একা লাগে।

এরকম মেয়েলি ধরনের কথা বলিস না তো, গা-জ্বালা করে।

মেয়েমানুষ মেয়েলি ধরনের কথাই তো বলব। তোমার নিজেরও কিন্তু আপা ভয় ভয় করছে, শুধু মুখে স্বীকার করছ না।

রানু ঘুমুতে গিয়ে দেখল টগর বিছানায় নেই। আবার অপলার কাছে চলে গিয়েছে। মশারি ফেলতে গিয়ে এক পলকের জন্যে মনে হলো, ঝড়বৃষ্টির রাতে একজন কেউ পাশে থাকলে ভালোই হয়।

আপা।

কী ?

তোমার তো একা একা ভয় লাগবে। সবাই মিলে আজ একসঙ্গে ঘুমুলে কেমন হয় ?

আমার এত ভয়-টয় নেই, তুই ঘুমুতে যা। আর শোন একটা কথা, বানিয়ে বানিয়ে টগরকে চিঠি লেখার দরকার নেই।

বেচারা তার বাবার জন্যে মন খারাপ করে থাকে।

থাকতে থাকতে একসময় অভ্যাস হবে। তখন আর খারাপ লাগবে না।

অভ্যাস হওয়ার দরকার কী ? বাবার জন্যে মন খারাপ হওয়াটা কি খারাপ ?

গত তিন মাসে যে বাবার ছেলের কথা একবারের জন্যেও মনে হয়নি, তার জন্যে মন খারাপ হওয়া ঠিক না।

একবারও ছেলের কথা মনে হয়নি সেটা তুমি কীভাবে বলছ ? চিঠি লিখেননি তার মানে এই নয় যে...

তোর কাছে মানে শুনতে চাই না।

শোন আপা, আমি যদি টগরকে নিয়ে দুলাভাইয়ের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাই তোমার আপত্তি আছে ? মেডিকেল কলেজ দু'দিন বন্ধ থাকবে। সোমবার এবং বুধবার। মঙ্গলবার মিস করলে তিনদিন ছুটি পাওয়া যায়। যাব ?

রানু অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না। বলে কী এই মেয়ে!

কি আপা যাব ? যাওয়া কোনো সমস্যা হবে না। ট্রেনে যাব তারপর...

ছুটি হয়েছে, নিজের বাড়িতে যা।

নিজের বাড়িতে আমার আছে কে বলো ? তাছাড়া এক দু'দিনের জন্যে গিয়ে হবেটা কী। গরমের ছুটিতে তো এমনিতেই যাব। যাব না ?

অপলা রানুর পাশে বসল। সে কি আগের চেয়ে রূপবতী হয়েছে, না হারিকেনের অস্পষ্ট আলোয় তাকে সুন্দর লাগছে ? এত লম্বা চুল ছিল অপলার তা আগে লক্ষ করা হয়নি। অপলা হালকা গলায় বলল, তোমার সঙ্গে আমার অনেক মিল আছে আপা। তোমার কোথাও কেউ নেই, আমারও নেই। এটা এমন কোনো হাসির কথা নয়, কিন্তু অপলা হাসল। রানু বলল, অনেক অমিলও আছে।

তা আছে। স্বভাবচরিত্র দু'জনের দু'রকম।

তোর স্বভাবচরিত্র অবশ্যি দ্রুত বদলাচ্ছে।

তোমারও বদলাচ্ছে। যতদিন যাচ্ছে তুমি ততই কঠিন হচ্ছ। এটা ঠিক না আপা। নিজে কষ্ট পাচ্ছ। অন্যকেও কষ্ট দিচ্ছ।

অপলা ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। উঠে দাঁড়াল। রানু কিছুই বলল না। অপলা দরজার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল এবং শান্তস্বরে বলল, আমি ঠিক করেছি আমি যাব। টগরকে তুমি আমার সঙ্গে দিতে না চাও দিয়ো না। আমি একাই যাব।

হঠাৎ তোর এত আগ্রহের কারণ কী ?

আমি দুলাভাইয়ের একটি চিঠি পেয়েছি। তিনি আমাকে যাওয়ার জন্যে লিখেছেন।

চিঠি কবে পেয়েছিস ?

গতকাল।

সেখানে কি লেখা আছে টগরকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ?

না নেই।

তুই একাই যা। ওকে নেওয়ার দরকার নেই।

আপা, তুমি কি চিঠিটি পড়তে চাও?

না, আমি পড়তে চাই না। অন্যের চিঠি পড়ার অভ্যেস আমার নেই। ব্যক্তিগত চিঠি আমি পড়ি না।

পড়তে চাইলে পড়তে পার। তোমার টেবিলের ওপর রেখে এসেছি। টগরকে আমার সঙ্গে যেতে দাও আপা। প্লিজ!

অপলা ঘুমুতে গেল। অনেক রাত পর্যন্ত তার ঘুম এল না। সে খানিকক্ষণ কাঁদল। কত অদ্ভুত দুঃখকষ্ট আছে মানুষের। এরকম সুন্দর একটি রাতে কেউ কাঁদে? রানু হঠাৎ ঠিক করল, টগরকে সে অপলার সঙ্গে যেতে দেবে।

রানু ভাবতেও পারেনি অপলা সত্যি সত্যি টগরকে নিয়ে রওনা হবে। এ জীবনে আমরা অনেক কিছুই করতে চাই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত করা হয়ে ওঠে না। কল্পনাকে কাজে লাগানো কঠিন। রানু কলেজে উঠে একবার ঠিক করেছিল একা একা সোনারগাঁ যাবে, প্রাচীন রাজধানী ঘুরে ঘুরে দেখবে। এখনো তা করা হয়ে ওঠেনি। অথচ কত কাছে সোনারগাঁ।

রানু লক্ষ করল, অপলা বেশ ঘটা করে তার স্যুটকেস ঠিকঠাক করছে। খুব উৎসাহ নিয়ে টগরের সঙ্গে আসন্ন ভ্রমণ প্রসঙ্গে আলোচনা করছে। উদ্দেশ্য অবশ্যি রানুকে শোনানো। কিন্তু রানু চুপচাপ। সে কোনো রকম আগ্রহ দেখাচ্ছে না। অপলা যখন বলল, টগরের জন্যে কি গরম কাপড় নেব আপা? রানু হেসে বলল, এই গরমে গরম কাপড় কেন?

তাহলে থাক। নেওয়ার দরকার নেই। তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে কি না কে জানে! হয়তো রাতে উঠে কাঁদতে শুরু করবে।

কাঁদবে না।

আমারও মনে হয় কাঁদবে না। আমার কী মনে হয় জানো আপা? আমার মনে হয় বাবাকে ছেড়ে আসতেই চাইবে না।

আসতে না চাইলে রেখে আসিস।

অপলা ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, তা হলে কিন্তু সত্যি সত্যি রেখে আসব। রানু গম্ভীর হয়ে বলল, বললাম তো রেখে আসিস।

কিন্তু তুমি মুখ কালো করে বলছ। এটা রাগের বলা। এই কথাটি তুমি কি হাসি মুখে বলতে পারবে? দেখি, হাসতে হাসতে বলো তো?

রানু কিছু বলেনি। বিরক্ত হয়েছে। ইদানীং অপলা তাকে বেশ বিরক্ত করছে যা সে পছন্দ করে না তা করতে চেষ্টা করছে। ইচ্ছা করেই করছে বোধহয়। কেন সবাই এমন বৈরী হয়ে উঠছে?

অপলারা যাবে সকাল সাড়ে এগারোটায়। রানু অফিসে গেল না। খুব ঘনঘন অফিস কামাই হচ্ছে। এখন পর্যন্ত এ নিয়ে কেউ তাকে কিছু বলছে না। কিন্তু একসময় হয়তো

বলবে। সিদ্দিক সাহেব মিষ্টি মিষ্টি গলায় খুব কড়া কড়া কিছু কথা শুনিয়ে দেবেন। এই লোকটিকে এখনো তার পছন্দ হচ্ছে না। পছন্দ না হওয়ার কোনো কারণ নেই। সিদ্দিক সাহেব মানুষটি ভদ্র, কাজ বোঝেন এবং প্রচুর কাজ করেন। সমস্যাটি কোথায় তা হলে ? এরকম হচ্ছে কেন রানুর ?

টগর সকাল থেকেই বেশ গম্ভীর। বারবার তার নিজের ছোট স্যুটকেস নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। রানু ভেবেছিল শেষমুহূর্তে টগর মত বদলাবে। মাকে ছেড়ে যেতে চাইবে না। কিন্তু টগরের ভাবভঙ্গি সেরকম নয়। সে মাকে কিছুটা এড়িয়ে চলছে। সম্ভবত তার ধারণা হয়েছে মা হঠাৎ বলবে, 'তোমার যাওয়ার দরকার নেই, টগর, তুমি চলে গেলে আমি একলা হয়ে যাব। রাতে ভয় লাগবে। তুমি থেকে যাও।'

টগর অপলার পাশে পাশে ঘুরছে। মাঝে মাঝে আড়চোখে দেখছে মাকে। চোখে চোখ পড়া মাত্র মাথা ঘুরিয়ে নিচ্ছে। যেন সে মাকে চিনতে পারছে না। ওরা রওনা হওয়ার আগে রানু টগরকে নিয়ে বারান্দায় চলে গেল।

টগর খুব সাবধানে থাকবে কেমন ? একা একা পুকুরে যাবে না। আচ্ছা ?

টগর মাথা নাড়ল। সে যাবে না।

ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করবে।

করব।

বাবার জন্যে কী নিয়ে যাচ্ছ টগর ?

টগর অবাক হয়ে তাকাল মার দিকে। ঠিক এই প্রশ্ন সে আশা করেনি।

বাবার জন্যে কিছু একটা নিয়ে যাওয়া উচিত না ? সে নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে, কী আনলে আমার জন্যে ? তখন কী বলবে তুমি ?

কী নেব ?

তুমি ভেবে-টেবে বের করো কী নিতে চাও।

তুমি বলে দাও।

এমন কিছু নিতে হবে যাতে সে খুশি হয়। ভেবে-টেবে বের করতে হবে কী নিলে খুশি হবে। এসো আরও ভাবি। বোকা ছেলে এমন করে কেউ বুঝি ভাবে ? ভাবতে হয় গালে হাত দিয়ে।

টগর সত্যি সত্যি গালে হাত দিল। রানু হেসে ফেলল। চমৎকার একটি ছবি। ছেলে গালে হাত দিয়ে ভাবছে, বাবার জন্যে কী নেওয়া যায় ? এর মধ্যে কোথায় যেন মন খারাপ করার মতো একটা ব্যাপার আছে।

রানু বলল, আমার জন্যে মন খারাপ লাগবে না ?

লাগবে।

তুমি কাঁদবে না আমার জন্যে ?

হুঁ। কাঁদব।

তা হলে একটু কাঁদো আমি দেখি।

টগর ফিক করে হেসে ফেলল। ছোট্ট ছোট্ট হাতে জড়িয়ে ধরল মাকে। রানু একটা নিঃশ্বাস ফেলল। মনে হচ্ছে দীর্ঘদিন সে এই শিশুটিকে দেখবে না। আর সে ফিরে আসবে না মার কাছে।

রানু ভেবেছিল ঘর থেকেই সে তাদের বিদেয় দেবে। কী মনে করে সে ওদের ট্রেনে উঠিয়ে দিতে গেল। ট্রেন ছাড়ার আগে আগে অপলা বলল, তুমি একা একা ও বাড়িতে থাকতে পারবে না আপা। তুমি খালার কাছে চলে যাও। খালার সঙ্গে থাকো। রানু গম্ভীর স্বরে বলল, আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না। তুই টগরকে চোখে চোখে রাখবি। পানিতে যেন না নামে।

কোনো ভয় নেই আপা।

পৌঁছেই টেলিগ্রাম করবি।

টেলিগ্রাম পৌঁছবার আগে তো আমরাই চলে আসব।

তবু করবি।

ঠিক আছে করব।

রানু হঠাৎ লক্ষ করল টগর কাঁদছে। অপলা বিরক্ত হয়ে বলল, এই কাঁদছিস কেন? টগর জবাব দিল না। শাড়ির আঁচলে সে মুখ ঢেকে রেখেছে। বারবার তার ছোট্ট শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। অপলা বলল, মার জন্যে খারাপ লাগছে?

হুঁ।

তাহলে যাওয়ার দরকার নেই। তুই থেকে যা।

উঁহু। আমি যাব।

টগরের কান্না আরও বেড়ে গেল। গার্ড হুইসেল দিয়েছে। গাড়ি চলতে শুরু করবে। অপলা বিব্রত মুখে বলল, আপা, তুমিও উঠে এসো না। প্লিজ।

রানু জবাব দিল না। দাঁড়িয়ে রইল এবং একসময় ট্রেন ছেড়ে দিল। তার নিজের চোখেও কি পানি আসছে? আসছে বোধহয়। সব কেমন ঝাপসা লাগছে। রানু সানগ্লাস চোখে দিল; জল-ভরা চোখ কাউকে দেখাতে ইচ্ছা করে না। ট্রেন চলে যাওয়ার পরও সে কিছুটা সময় ঘুরে বেড়াল স্টেশনে। সিলেট মেল এসে থেমেছে। ব্যস্ত হয়ে যাত্রীরা নামছে। কত বিচিত্র ধরনের মানুষ আছে এই পৃথিবীতে। একজন মানুষের সঙ্গে অন্য জনের কোনো মিল নেই। ছোট একটি বাচ্চা গর্বিত ভঙ্গিতে গট গট করে হাঁটছে। তার মা হাত ধরতে চাচ্ছে। সে কিছুতেই হাত ধরতে দেবে না। কী গম্ভীর শিশুটির চলার ভঙ্গি। টগরের মতো হয়েছে বোধহয়। রানুর চোখ আবার ভিজে উঠছে। মন দুর্বল হয়ে গেছে। ভালো কথা নয়।

রানুর মামা ইসমাইল সাহেব, রানুকে দেখে খুবই অবাক হলেন। দীর্ঘদিন পর সে বাড়িতে এল। ইসমাইল সাহেব বারান্দায় ইজি চেয়ারে শুয়ে ছিলেন। তিনি উঠে বসতে চেষ্টা করলেন, পারলেন না। এখন প্রায় অথর্ব অবস্থায় এসে পৌঁছেছেন। নিজে নিজে কিছুই প্রায় করতে পারেন না।

কেমন আছ মামা ?

ভালো আছি। বেশ ভালো। তুই কী মনে করে ?

দেখতে এলাম। বাসায় কেউ নেই নাকি ? ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

বিয়ে বাড়িতে গেছে। চলে আসবে। সন্ধ্যার আগেই চলে আসবে। তুই বোস।

রানু বসল। ইসমাইল সাহেব হাত বাড়িয়ে রানুকে কাছে টানলেন। হালকা গলায় বললেন, এখনো রাগ পুষে রেখেছিস ?

না মামা, কারও ওপর আমার রাগ-টাগ নেই।

এদিকে তো আসিস না।

ইচ্ছে করেই আসি না।

কেন ?

তোমার কথা না শুনে বিয়ে করেছিলাম। খুবই রাগ করেছিলে তুমি। বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলে, মনে আছে ?

ইসমাইল সাহেব কিছু বললেন না। রানু নিঃশ্বাস ফেলে বলল, সেই বিয়ের আজ এই অবস্থা। লজ্জাতেই আসি না।

আজ কী মনে করে এলি ?

কিছু করার ছিল না। কোথাও যাওয়ার ছিল না। তা-ই এসেছি।

টগরকে কার কাছে রেখে এসেছিস ?

ও তার বাবার কাছে গেছে। গ্রামের বাড়িতে। ওর বাবা কিছুদিন ধরে গ্রামের বাড়িতে আছেন।

জানি।

কীভাবে জানলে ?

কোন পত্রিকায় যেন দেখলাম—কথাসাহিত্যিকের নির্বাসন।

রানু চুপ করে গেল। ইসমাইল সাহেব মৃদুস্বরে বললেন, গ্রাম নিয়ে কিছু লিখবেন বোধহয় ?

জানি না। লিখলে লিখবে। লেখালেখির ওপর আমার কোনো ভক্তি নেই। উৎসাহও নেই। ঐ প্রসঙ্গ থাক মামা। অন্যকিছু নিয়ে আলাপ করো। তোমার শরীর এখন কেমন ?

ভালো না। সময় বোধহয় শেষ হয়ে আসছে।

আফসোস হয় ?

না, দায়িত্ব পালন করেছি। মেয়েগুলির বিয়ে দিয়েছি। ছেলেটা চাকরি করে। আফসোস থাকবে কেন ? কোনো আফসোস নাই।

মামা, চা খাব।

নিজে বানিয়ে খেতে হবে। কাজের ছেলেটা কোথায় যেন গেছে।

তুমি খাবে ?

চা-সিগারেট আমার জন্যে নিষিদ্ধ, তবে তোর খাতিরে খাব এক কাপ।

রানু চা বানাতে গেল। সে প্রায় বারো বছর এই বাড়িতে কাটিয়েছে, কিন্তু তবু সব কেমন অচেনা লাগছে। পুরনো আসবাব প্রায় কিছুই নেই। ঝকঝক করছে চারদিক। তার সময় এরকম ছিল না। এলোমেলো থাকত সবকিছু। এখন ঘর সাজায় কে ? এ বাড়িতে কোনো মেয়ে নেই। মামা তার ছেলের বিয়ে দেননি। নাকি দিয়েছেন কিন্তু তাকে জানাননি ? বোধহয় তাই। মামার সঙ্গে তার এখন আর সম্পর্ক নেই। রানু সবার কাছ থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছে।

মামা তোমার চা। চিনি দেইনি। চিনি নিশ্চয়ই খাও না ?

না, খাই না।

ইসমাইল সাহেব নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। চায়ে চুমুক দেওয়ার ভঙ্গি, বসে থাকার ভঙ্গি সব কিছুতেই গভীর ক্লান্তির ছোঁয়া। সত্যি সত্যি কি তাঁর সময় শেষ হয়ে এসেছে ? যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। রানুর বড় মায়া লাগল। ইসমাইল সাহেব বললেন, আজ রাতটা আমার এখানে থেকে যা। বুলুর বিয়ে দিয়েছি, ওর বৌকে দেখবি।

বুলুর বিয়ের কথা আমাকে তো কিছু বলোনি।

বলার মতো বিয়ে নয়। বলার মতো হলে বলতাম।

ইসমাইল সাহেব ক্লান্ত ভঙ্গিতে চেয়ারে মাথা রাখলেন।

তোমার শরীর এত খারাপ, তবু সবাই তোমাকে একা ফেলে চলে গেল ?

ওরা যেতে চায়নি, আমি জোর করে পাঠিয়েছি। সবসময় সবাই আমাকে নিয়ে ব্যস্ত, এটা সহ্য হয় না।

রানু খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, মামা, আমি টগরকে নিয়ে যখন আলাদা হয়ে গেলাম তুমি কিন্তু একবারও জিজ্ঞেস করলে না কেন এরকম করলাম ?

ইসমাইল সাহেব চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইলেন, কিছু বললেন না।

আমি আশা করেছিলাম তুমি অন্তত জানতে চাইবে। আমার সব কথা শুনবে এবং শেষ পর্যন্ত বলবে, যা করেছিস ভালোই করেছিস।

ইসমাইল সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, যা করেছিস ভালোই করেছিস।

তুমি কিছু না-জেনেই বলেছ। মামা মন দিয়ে শোনো, মনিকা নামের একটি মেয়ের সঙ্গে টগরের বাবার খুব ভাব ছিল। মেয়েটি দারুণ রূপবতী এবং চমৎকার মেয়ে। মামা, তুমি কি আমার কথা শুনছ ?

ইসমাইল সাহেব জবাব দিলেন না। রানু দেখল তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

সন্ধ্যা মিলিয়েছে। গাছে গাছে পাখপাখালি ডাকছে। আকাশে মেঘ। আজও বোধহয় ঝড়বৃষ্টি হবে। রানু ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।

৩০

অপলারা পৌঁছল সন্ধ্যা মিলবার পর।

ট্রেন থেকে নেমেই সে একটি নিঃশ্বাস গোপন করল। আকাশ মেঘে কালো হয়ে আছে, ঘনঘন বিজলি চমকাচ্ছে। অল্প কিছু লোক নেমেছে ট্রেন থেকে, তারা মুহূর্তের মধ্যেই উধাও। ফাঁকা স্টেশন। চারদিক নিশুতি রাতের মতো নীরব। অপলা টগরের হাত ধরে বলল, ভয় লাগছে টগর ?

না। কিসের শব্দ হচ্ছে খালা ?

কী জানি, ঝিঁঝি পোকা বোধহয়। তোর ভয় লাগছে না তো ?

না।

ভয়ের কিছু নেই। তোদের দাদার বাড়ি এখানে সবাই চিনে। বললেই হবে, মোক্তার বাড়ি। স্টেশন থেকে কোয়ার্টার মাইল।

কোয়ার্টার মাইল কী ?

কোয়ার্টার মাইল হচ্ছে খুব কাছে। তোর ভয় লাগছে না তো ?

না।

বৃষ্টি নামার আগে আগেই পৌঁছে যাব। আর না হয় বৃষ্টিতে অল্প ভিজব, কী বলিস মজাই হবে।

টগর উত্তর দিল না। তার মোটেই ভয় লাগছে না। বেশ মজাই লাগছে। বৃষ্টি নামলে আরও মজা হয়। শুধু ঝিঁঝি পোকার ডাকটা শুনতে কেমন কেমন লাগছে। এই পোকাগুলি মানুষকে কামড়ায় কিনা কে জানে। এই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু সে জানে জিজ্ঞেস করলে ঠিক উত্তর পাওয়া যাবে না। অপলা বলবে, না না কামড়ায় না। টগর লক্ষ করল, খালামণি কেমন অসহায় ভঙ্গিতে স্যুটকেস হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সে বোধহয় কাউকে জিজ্ঞেস করতে চায় কোন দিকে যেতে হবে। কিন্তু কাকে জিজ্ঞেস করবে বুঝতে পারছে না।

খালামণি চল।

দাঁড়া একটু, এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন ? ঐ লোকটা আসছে ওকে জিজ্ঞেস করব। ও বোধহয় স্টেশনমাস্টার।

কীভাবে বুঝলে ?

অপলা উত্তর দিল না। লোকটির দিকে এগিয়ে গেল।

স্টেশনমাস্টার অবাক হয়ে বললেন, কোথায় যাবেন ? মোক্তারবাড়ি ? ফয়সল সাহেবের বাড়ি ? সে তো অনেকটা দূর।

কত দূর ?

মাইলখানেক তো হবেই। গ্রামের মাইল শহরের মাইলের মতো না, হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে যাবে তবু মাইল শেষ হবে না। পুরুষমানুষ কেউ নেই আপনাদের সাথে ?

জি-না।

মোক্তার সাহেবের বাড়িতে তো কেউ থাকে না, সেখানে কার কাছে যাবেন ?

অপলার বুক ধক করে উঠল। ট্রেনে ওঠার পর থেকে এরকম একটা আশঙ্কা তার হচ্ছিল—গিয়ে দেখবে বাড়ি তালাবদ্ধ। দুলাভাই চলে গেছেন ঢাকা কিংবা অন্য কোথাও। বাড়ি দেখাশোনার জন্যে যারা ছিল তারাও নেই। মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে গেছে কিংবা অন্য কোনো গ্রামে যাত্রা দেখতে গেছে। ঢাকা ফিরে আসার কোনো ট্রেন নেই, তারা রাত কাটাচ্ছে স্টেশনে। এমন সময় দুষ্ট কিছু লোকজন তাদের ঘিরে ধরল। তাদের মধ্যে একটি লোক খুব লম্বা। তার সরু সরু হাত লোমে ভর্তি। সে খপ করে অপলার হাত ধরে বলল...

দুশ্চিন্তাগুলি এত স্পষ্ট হয় কেন কে জানে ? ট্রেনে ওঠার পর থেকে তার আশপাশের সবাইকেই অপলার দুষ্ট লোক বলে মনে হচ্ছিল। একজন টগরকে বাদাম কিনে দিল, অপলার সঙ্গে খুব খাতির জমানোর চেষ্টা করল। অপলার দৃঢ় ধারণা হলো, লোকটার কোনো একটা মতলব আছে। সেই ধারণা ঠিক হয়নি, লোকটি ময়মনসিংহ স্টেশনে নেমে গেছে এবং নেমে যাওয়ার আগে অপলাকে বলেছে—যদি দেখেন পৌঁছতে পৌঁছতে রাত হয়েছে, তাহলে স্টেশনমাস্টারকে বলবেন পৌঁছে দিতে। অন্যকাউকে বলবেন না। আজকাল গ্রামেও টাউটশ্রেণীর একদল মানুষ তৈরি হয়েছে।

স্টেশনমাস্টার যথেষ্ট করলেন। একজন কুলি জোগাড় করলেন। হারিকেন এবং ছাতার ব্যবস্থা করলেন। এবং বারবার বললেন, মেয়েমানুষের এতটা সাহস থাকা উচিত না। ছোট একটা বাচ্চাকে নিয়ে একা একা রওনা হওয়া। কী সর্বনাশের কথা! দিনকালও ভালো না। যখন-তখন ঝড়টড় হচ্ছে।

পথে নেমে টগরের খুব আনন্দ হলো। কত অদ্ভুত সব দৃশ্য চারদিকে। এবং সবই অচেনা। কতরকম শব্দ উঠছে আর সারাক্ষণই কেমন মজার একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। একটা বাঁশ ঝাড়ের কাছে এসে সে থমকে দাঁড়াল।

ঐ সব কি জোনাকি খালামণি ?

হ্যাঁ।

ওরা কী করছে ?

খেলা করছে বোধহয়।

এখানে এত জোনাকি কিন্তু শহরে জোনাকি নেই কেন ?

জানি না কেন। তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করবে, চলো টগর দাঁড়িয়ে থাকবে না। দেরি হচ্ছে বৃষ্টি নামবে।

বেশিক্ষণ দাঁড়াব না। অল্প একটু দাঁড়াব।

বৃষ্টি নামবে তো।

নামুক।

টগর কিছুক্ষণ পরপরই দাঁড়িয়ে পড়ছে। তাকে আর নড়ানো যাচ্ছে না। অপলা তাকে কোলে তুলতে চেষ্টা করল, সে কোলে উঠবে না। সমস্তটা পথ হেঁটে হেঁটে যাবে।

কিসের শব্দ হচ্ছে খালামণি ?

ঘণ্টা। ঘণ্টার শব্দ হচ্ছে।

ঘণ্টার শব্দ হচ্ছে কেন ?

হিন্দুরা পূজা করছে। ওরা ঘণ্টা বাজিয়ে পূজা করে।

ওরা ঘণ্টা বাজিয়ে পূজা করে কেন ?

জানি না কেন। ওদের জিজ্ঞেস করো।

টগর ভেবে পেল না এত সুন্দর সব দৃশ্য, এত সুন্দর সব শব্দ, কিন্তু খালামণির ভালো লাগছে না কেন। একটা জায়গায় দেখা গেল লক্ষ লক্ষ ব্যাঙ ডাকছে। প্রথমে একটা ব্যাঙ মোটা গলায় কয়েকবার ডাকে তার পরপর অন্য ব্যাঙগুলি লাফালাফি করে ডাকতে ডাকতে হঠাৎ চুপ করে যায়। এ রকম করে কেন ওরা ?

খালামণি!

না আর একটি কথাও না। তুমি আমার কোলে আস টগর। এখনো অনেকদূর।

ব্যাঙরা সবাই একসঙ্গে কথা বলে কেন ?

জানি না কেন। চুপ করে থাকো তো—এখন বৃষ্টি হলে কী অবস্থা হয় দেখবি।

বাড়ির কাছাকাছি আসতে সত্যি সত্যি বৃষ্টি নামল। প্রথমে ছোট ছোট ফোঁটা তারপরই মুষল বর্ষণ। সেই সঙ্গে ঠান্ডা বাতাস। ছাতা মেলতেই সেটা উল্টে গেল। টগর বলল, ছাতা উল্টে গেল কেন খালামণি ?

এবার কিন্তু চড় খাবি টগর।

সঙ্গের কুলি জিজ্ঞেস করল আশপাশের কোনো বাড়িতে গিয়ে দাঁড়াবে কি না। অপলা রাজি হলো না। তারা বাড়িতে পৌঁছল কাকভেজা হয়ে। অপলার শাড়ি কাদায় মাখামাখি। সে দু'বার কাদায় পা পিছলে পড়েছে। স্যান্ডেলের ফিতা গিয়েছে খুলে। রাগে দুঃখে তার কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু টগরের আনন্দের সীমা নেই। তাঁর পাঁচ বছরের ক্ষুদ্র জীবনে এত আনন্দের ভ্রমণ সে এর আগে আর করেনি। এবং কে জানে ভবিষ্যতেও হয়তো আর করবে না। তীব্র ও তীক্ষ্ণ আনন্দের মুহূর্ত একজন মানুষের জীবনে বারবার আসে না।

ওসমান সাহেব বাড়িতেই ছিলেন। হৈচৈ শুনে হারিকেন হাতে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ। দেখতে কেমন সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী লাগছে। তিনি শিশুদের গলায় চেঁচালেন, আরে কারা এসেছে। কাউকেই তো চিনতে পারছি না। এই ছোট ছেলেটা কে ? চেনা চেনা লাগছে কেন ? টগর ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরল। তিনি তাকে কোলে তুলতেই সে মুখ লুকাল তার বুকে। তার কেন জানি বড় লজ্জা লাগছে। কাউকে এখন আর মুখ দেখাতে ইচ্ছা করছে না। অপলা বলল, দুলাভাই, আপনার জামাকাপড় তো সব কাদায় মাখামাখি করে দিল।

দিক। তুমি কেমন আছ অপলা ?

ভালো আছি। আপনি দাড়ি-গোঁফ রেখে এমন রবীন্দ্রনাথ সেজেছেন কেন ?

ব্লেড পাওয়া যায় না। ব্লেডের অভাবে এই কাণ্ড।

আপনাকে দাড়ি-গোঁফে কিন্তু ভালোই লাগছে।

ওসমান শব্দ করে হেসে উঠলেন। ভরাট গলায় হাসি।

টগরও হাসতে শুরু করল। যেন এই রসিকতাটা বুঝতে পেরেছে। ওসমান সাহেব বললেন, আজ তোমরা আসবে এটা কিন্তু আমি জানতাম।

বাজে কথা বলবেন না দুলাভাই।

বাজে কথা না। তোমাদের জন্যে রান্না করতে বলেছি। ফুলির মাকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে।

জানতেন তাহলে স্টেশনে থাকলেন না কেন?

সেটা অবৈজ্ঞানিক কাণ্ড হতো। অবৈজ্ঞানিক কিছু তো আমি করতে পারি না। মনের কোনো খেয়ালকে খানিকটা প্রশ্রয় দেওয়া যায়, বেশি প্রশ্রয় দেওয়া যায় না।

কী করে বুঝলেন আজ আমরা আসব?

তা জানি না। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনে হলো। টেলিপ্যাথি বোধহয়। দুজন আসবে সেটা বুঝিনি। আমার মনে হচ্ছিল তোমরা তিনজনই আসবে।

অপলা থেমে থেমে বলল, আপাও আসত ছুটি পায়নি তাই। বলেই অপলার মনে হলো দুলাভাই যেন অন্য এক রকম ভঙ্গিতে হাসলেন। শিশুদের মিথ্যা কথা প্রশ্রয় দেওয়ার মতো ভঙ্গিতে হাসা। মিথ্যাটি না বললেই হতো।

দুলাভাই, আমরা আসায় আপনি কি খুশি হয়েছেন?

হ্যাঁ।

আপনার নির্জন তপস্যায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করলাম, তাই না?

তপস্যা-টপস্যা কিছু না। মহাপুরুষরা তপস্যা করেন। আমি অতি সাধারণ একজন মানুষ। যাও, গোসল করো কাপড় বদলাও। চা করতে বলেছি। ফুলির মা বাথরুমে পানি তুলে দেবে।

আপনাদের নাকি পাকা ঘাট দেওয়া চমৎকার পুকুর আছে। বৃষ্টির মধ্যেই পুকুরে সাঁতার কাটতে নাকি দারুণ মজা?

কার কাছে শুনলে?

আপার কাছে। আপা বলে দিয়েছে।

ওসমান সাহেব একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। অপলা সুন্দর একটি স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়েছে। বিয়ের পরপর রানুকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে এসেছিলেন। শ্রাবণ মাসের এক দুপুরে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। সেই বৃষ্টিতে দুজনে পুকুরে নেমেছিলেন। রানু কিছুতেই নামতে চাচ্ছিল না। তিনি প্রায় জোর করে তাকে রাজি করিয়েছিলেন। তারপর সে আর উঠে আসতে চায় না। যতবার তিনি বলেন, রানু চল, ওঠা যাক। রানু ততবারই বলে, আর একটু, আর একটু।

সুখের উপকরণ চারদিকে ছড়ানো থাকে। আমরা প্রায় সময়ই তা বুঝতে পারি না। হঠাৎ একসময় তার দেখা পাই এবং অভিভূত হয়ে পড়ি।

অপলা পুকুরে গোসল করতে যাবে বলে ঠিক করল। ফুলির মা আপত্তি করার চেষ্টা করছে। ভর সন্ধ্যায় খোলা চুলে পুকুরে নামা ঠিক না। কিন্তু তার আপত্তি গ্রাহ্য হয়নি। টগরও তার খালামণির সঙ্গে পুকুরে নামবে। সেও নাকি সাঁতার কাটবে।

ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ওসমান সাহেব ছাতা মাথায় দিয়ে একটি হারিকেন হাতে পুকুরঘাটে এসেছেন। জলে নেমেছে টগর এবং অপলা। ফুলি পানিতে পা ডুবিয়ে পুকুরঘাটে বসে আছে। ওসমান সাহেব বললেন, বেশিদূর যেয়ো না অপলা।

আমাকে নিয়ে ভয় নেই দুলাভাই। আমি চমৎকার সাঁতার জানি। আপনি টগরকে উঠিয়ে নিয়ে চলে যান। ওর ঠান্ডা লাগবে।

তুমি না উঠলে ও উঠবে না।

আমি এখানে অনেকক্ষণ থাকব। বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত উঠব না।

ওসমান সাহেব মৃদু হাসলেন। কিছু বললেন না। বিশেষ ঘটনা কি মানুষের জীবনে বারবার ফিরে আসে ? ঠিক অপলার মতো গলায় রানুও তো একদিন এই কথাই বলেছিল। সেদিন তিনি অবশ্যি রানুর পাশে ছিলেন।

আজ ছাতা মাথায় একটি কড়ই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রকৃতি কি একই ঘটনা বিভিন্ন রকমভাবে মানুষের সামনে উপস্থিত করে ? এরকম একটি ঘটনা কি আবার তাঁর জীবনে ঘটবে ? অসম্ভব নয়। একদিন হয়তো টগরের ভালোবাসার একটি মেয়ে এরকম বৃষ্টির রাতে পুকুরে নামবে এবং অবিকল রানুর মতো গলায় বলবে—বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত আমি উঠব না, তিনি দূর থেকে শুনে ফেলবেন।

ওসমান সাহেব মৃদুস্বরে ডাকলেন, অপলা! গ্রামে বসে বসে একটা মজার জিনিস লক্ষ করলাম।

কী সেটা ?

গাছের যৌবন বারবার ফিরে আসে, কিন্তু মানুষের যৌবন মাত্র একবার।

কথা শেষ হওয়া মাত্র জোর বৃষ্টি শুরু হলো। টগর মহানন্দে হাততালি দিল।

৩১

অপলা ভেবে রেখেছিল সে দুদিন থাকবে, শুক্র ও শনি। খুব বেশি হলে তিন দিন। সোমবার ড. মাইতির ক্লাস। ঐ ক্লাসটি ধরতেই হবে। অ্যাবসেন্ট করলে তিনি নামের পাশে দাগ দিয়ে রাখেন এবং পরের দিন এমন সব প্রশ্ন করেন যার উত্তর কারোই জানা থাকে না। প্রশ্নতেই শেষ নয়। শান্তমুখে এমন সব বলেন যা শুনলে ক্লাস ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। যেমন রীতাকে একদিন বললেন, ডাক্তার যে তোমাকে হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। তোমার হাবভাব ডাক্তারের মতো নয়, বিরহী প্রেমিকের মতো। বুঝতে পারছ ? এখন তুমি আমাকে বলো, তোমার ডান হাতের কব্জির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাড়টির কী নাম। উঁচুগলায় বলো যেন সবাই শুনতে পায়।

রীতা কোনোমতে বলল, আমি জানি না স্যার। বলেই সে বসে পড়ল এবং খুব ঘামতে লাগল। মাইতি স্যার বললেন, তোমাকে কিন্তু এখনো আমি বসতে বলিনি। কেউ

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বসে পড়লে আমার খারাপ লাগে। কাজেই তোমাকে আমি এখন এমন প্রশ্ন করব যার উত্তর তোমার জানা আছে বলে আমার ধারণা। বলো, প্রেম এবং ভালোবাসার মধ্যে পার্থক্য কী ?

ক্লাসের সবাই হো হো করে হাসতে লাগল। এই হচ্ছে মাইতি স্যার। তাঁর ক্লাস মিস করার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু অপলা রোববার ভোরে বেশ সহজভাবেই বলল, আজ ঢাকা না গেলে কেমন হয় রে টগর ? টগর গম্ভীর হয়ে বলল, ভালো হয়।

কিন্তু মাইতি স্যার যে আমাকে কাঁচা খেয়ে ফেলবে। সবার সামনে কাঁদিয়ে ছাড়বে। চিনিস তো না তাঁকে।

তা হলে চল যাই।

শরীরটা ভালো লাগছে না। কেমন যেন জ্বর জ্বর লাগছে, দেখ তো গায়ে হাত দিয়ে।

অপলার গা নদীর জলের মতো শীতল কিন্তু টগর উদ্বিগ্নস্বরে বলল, উফ্ খুব জ্বর তো।

যা, স্যুটকেস খুলে কাপড় বের করে ফেল। আগামী সোমবারের আগে ঢাকা গিয়ে পৌঁছলেই হবে। তোর আবার মন খারাপ লাগছে না তো ?

না।

মার জন্যে কান্না আসছে না ?

না।

একটুও না ?

টগর তার জবাবে হেসে ফেলল। এবং পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে গেল। সম্ভবত মনে করল, হাসাটা ঠিক নয়। মার জন্যে কিছুটা হলেও মন খারাপ করা দরকার। কিন্তু তার সত্যি সত্যি মার কথা মোটেও মনে পড়ছে না। বরং মার কাছে ফিরে যেতে হবে ভেবেই খারাপ লাগছিল।

বাবা তার সঙ্গে খুব কথা-টথা বলে না। তবু তাকেই কেন জানি বেশি ভালো লাগে। এর কারণ কী সে প্রায়ই ভাবে। পরশু রাতে অপলাকে জিজ্ঞেস করল। অনেক ইতস্তত করে বলল, খালামণি, বাবা বেশি ভালো, না মা ?

দুজনই ভালো।

মন রাখা কথা। টগর বিশ্বাস করেনি। দুজন লোক সমান সমান ভালো হতে পারে না। একজন একটু বেশি ভালো হলে অন্যজন একটু কম ভালো হবে। তাই নিয়ম। অপলা হাই তুলে বলল, কে বেশি ভালো, কে কম ভালো এসব দিয়ে কী করবি ?

কিছু করব না।

কিছু না করলে ঘুমো। নাকি বাবার সঙ্গে ঘুমুতে ইচ্ছে করে ?

না না।

মনে হচ্ছে করে, আয় রেখে আসি।

অপলা সত্যি সত্যি তাকে রেখে আসতে গেল। টগর লক্ষ করেছে, অপলা খালামণি যা বলে সঙ্গে সঙ্গে তা করে। অন্য কোনো মেয়ে হলে 'আয় রেখে আসি' বলেও রেখে আসার কোনোরকম লক্ষণ দেখাত না। এবং একসময় বড় বড় হাই তুলে ঘুমিয়ে পড়ত। কিন্তু অপলা খালামণি সেরকম নয়। সে যা বলবে তা-ই করবে। এজন্যেই তাকে এত ভালো লাগে। গত পরশু কালবৈশাখী ঝড় হলো। ভীষণ ঝড়। হঠাৎ অপলা খালামণি বলল, চল টগর আম কুড়াতে যাই। কালবৈশাখীতে আম কুড়াতে হয়। টগরের ইচ্ছা করছিল, আবার ভয় ভয়ও করছিল। কী অন্ধকার চারদিক! আবার কেমন শোঁ শোঁ শব্দ উঠছে। বাবা বললেন, মাথার উপর গাছের ডাল ভেঙে পড়বে। যেয়ো না অপলা। খালামণি বলল, আমার ওপর গাছের ডাল ভেঙে পড়লে কারও কোনো ক্ষতি হবে না। বলেই সে নেমে গেল উঠোনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুলিও গেল।

তারা ছোটাছুটি করে আম এনে ঝুড়ি ভর্তি করছে। কী সুন্দর লাগছে দেখতে। বাবা বললেন, টগর তোমার যেতে ইচ্ছা করছে ?

হুঁ।

আমার মনে হয় এরকম ক্ষেত্রে যাওয়াই উচিত। ভয়কে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক না। তা ছাড়া কালবৈশাখীর ঝড়ে বাচ্চাদের ওপর কখনো ডাল ভেঙে পড়ে না। নিয়ম নেই।

কার নিয়ম ?

প্রকৃতির নিয়ম।

বাবা খুব হাসতে লাগলেন। বড়দের সব কথা সবসময় বোঝা যায় না। টগর অবশ্যি খুব বুঝতে চেষ্টা করে। বড়দের কথা শুনতে তার খুব ভালো লাগে।

রোজ রাতে তারা সবাই বারান্দায় বসে অনেকক্ষণ গল্প করে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে, তবু সে জেগে থাকতে চেষ্টা করে। কত রকম কথা বলে বাবা আর খালামণি। বেশিরভাগ কথারই সে অর্থ বুঝতে পারে না। তবু শুনতে ভালো লাগে।

অপলা, টগরকে আমার বিছানায় শুইয়ে দেওয়ার কোনো দরকার নেই। তুমি একা একা ভয় পাবে, ও থাকুক তোমার সঙ্গে।

আমার এত ভয়টয় নেই।

বলো কী! এ বাড়িতে কিন্তু ভূত আছে। সাদা চাদর গায়ে দিয়ে অশরীরী কে একজন বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করে। ফুলির মা তোমাকে সেই গল্প বলেনি ?

বলেছে।

ভূত বিশ্বাস করো না ?

করব না কেন, করি।

সে-কী, আমার তো ধারণা ছিল ডাক্তাররা ভুত বিশ্বাস করে না।

কোনো কোনো ডাক্তার আবার করেও। তাছাড়া আমি তো এখনো ডাক্তার হইনি।

ডাক্তাররাই যদি ভূতে বিশ্বাস করে তাহলে আমরা সাধারণ মানুষেরা যাব কোথায় ?

আপনি বুঝি সাধারণ মানুষ ?

তোমার কি ধারণা আমি অসাধারণ ?

লেখকরা সাধারণ মানুষ নন।

আমি লেখক তোমাকে কে বলল ? একসময় ছিলাম, এখন না। ঐ সব পূর্বজন্মের কথা। এখন আর মনে করতে চাই না।

আপনাকে আবার লেখালেখি শুরু করতে হবে।

আর হবে না।

হতেই হবে। আপনাকে দিয়ে নতুন একটি লেখা শুরু করিয়ে তার পর যাব। তার আগে যাব না।

আর যদি শুরু করতে না পারি তা হলে কি থেকে যাবে ?

হ্যাঁ।

টগর লক্ষ করল হ্যাঁ বলার পরপরই খালামণি খুব গম্ভীর হয়ে পড়ল। তারপর হঠাৎ উঠে চলে গেল। বড়দের কথাবার্তার মতো তাদের আচার-আচরণও দুর্বোধ্য। খালামণি যেভাবে উঠে চলে গেছে তাতে মনে হয় সে খুব রাগ করেছে। কেন সে শুধু শুধু রাগ করবে ? বাবা কি রাগ করার মতো কিছু বলেছে ? কিছুই বলেনি।

রাতে ঘুমুবার সময় টগর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, খালামণি, তুমি বাবার ওপর রাগ করেছ ? অপলা অবাক হয়ে বলল, রাগ করব কেন ? আমি কারও সঙ্গে রাগটাগ করতে পারি না।

বাবাও কারও সঙ্গে রাগ করে না।

উনি মহাপুরুষ কিনা তাই।

মহাপুরুষ কী খালামণি ?

জানি না কী। ঘুমো। নাকি বাবার সঙ্গে ঘুমুতে ইচ্ছা করছে ?

তোমার সঙ্গেই ঘুমুতে ইচ্ছা করছে।

টগর অপলার গলা জড়িয়ে ধরল। অপলা বিরক্তস্বরে বলল, গরমের মধ্যে এরকম জাপটে ধরে আছিস কেন ? একটু দূরে যা। টগর দূরে সরে গেল।

রাগ করলি নাকি টগর ?

না।

তুই তোর বাবার মতো হবি বড় হলে। কারও জন্যে কোনো টান থাকবে না। পাথরের মতো মানুষ।

বাবা পাথরের মতো ?

হ্যাঁ, শক্ত পাথর।

আর মা কিসের মতো ?

সেও পাথরের মতো। তোমাদের সবাই পাথর।

অপলা খুব হাসতে লাগল। টগর অবাক হয়ে লক্ষ করল, হাসতে হাসতে খালামণির চোখে পানি এসে গেছে। সে শাড়ির আঁচলে চোখ মুছছে আর হাসছে। হাসির দমকায়

খাট কাঁপছে। ও ঘর থেকে বাবা এসে বললেন, কী হচ্ছে এখানে ? টগর বলল, খালামণি শুধু হাসছে।

শুধু শুধু কেউ এরকম হাসে ?

অপলা গম্ভীর হয়ে বলল, আমি হাসি। কোনো কারণ ছাড়াই আমি হাসি এবং কাঁদি। আপনি ঘুমুতে যান। ইচ্ছা করলে আপনি, আপনার পুত্রকেও নিতে পারেন।

বসি কিছুক্ষণ তোমার কাছে। হাসির গল্পটি বলো। আমার হাসতে ইচ্ছা করছে।

আমার আর করছে না। ঘুম পাচ্ছে।

বাবা উঠে চলে গেলেন। টগর অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইল। তার কেবলই মনে হতে লাগল খালামণি এখানে এসে বদলে গেছে। তার ধারণা বাবাও সেটা জানেন। এবং তিনিও তার মতোই জেগে জেগে খালামণির ব্যাপারটা ভাবেন। তাঁকে একদিন জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে, কেন খালামণি এরকম করছে ? পরশু দিনের আগের দিন বিকেলে খালামণি বলল, আজ নদীর পাড়ে যাব। একটা নৌকা ভাড়া করে খুব ঘুরব। দুলাভাই তৈরি হয়ে নিন। ফ্লাক্সে করে চা নিয়ে যাব। দৃশ্য দেখতে দেখতে চা খাব। বাবা বললেন, নদী তো অনেকখানি দূর। চার-পাঁচ মাইল হবে।

হলে হবে। আপনি তৈরি হন। খাতা-কলম সঙ্গে নিন। হঠাৎ কোনো ভাব এসে গেলে লিখে ফেলবেন।

ঝড়বৃষ্টি হতে পারে।

হলে হবে।

খালামণি ফ্লাক্স ভর্তি করে চা করল। কী একটা খাবার তৈরি করল। তারপর হঠাৎ মত বদলাল। গম্ভীর হয়ে বলল, দুলাভাইকে নিয়ে কোনো কাজ নেই। আমি আর তুই যাব।

বাবা কাপড় পরছে তো।

পরেছে পরুক। কাপড় পরে বসে থাকুক। চল আমরা রওনা দিয়ে দিই। সন্ধ্যার আগে ফিরতে হবে। হাতে সময় নেই।

টগর মৃদুস্বরে বলল, বাবাকে নিয়ে যাই ? অপলা বিরক্ত হয়ে বলল, তুই তা হলে থাক তোর বাবার সঙ্গে। আমি চললাম। অপলা সত্যি সত্যি একা একা রওনা হয়ে গেল। বাবা পেছন থেকে ডাকল, এ্যাই অপলা, এ্যাই। খালামণি ফিরেও তাকাল না। ফ্লাক্স দোলাতে দোলাতে হনহন করে ছুটতে লাগল। বাবা ফুলির আব্বাকে বলে দিলেন সঙ্গে যেতে। তারপর হাসি মুখে টগরকে বললেন, তোর খালার কী হয়েছে রে ?

জানি না কী হয়েছে।

রাগ নাকি ?

হুঁ।

কার ওপর রাগ ?

তোমার ওপর।

আমার ওপর রাগ, তো তোকে কেন নেয়নি ?

আমার ওপরও রাগ।

বলিস কী! পৃথিবীর সবার ওপরই সে রাগ করেছে নাকি ?

হুঁ।

বাবা খুব হাসতে লাগলেন। এতে হাসির কী আছে ? বড়রা অকারণে কেন হাসে ? এবং কেন মাঝে মাঝে ছোটদের মতো পৃথিবীর সবার সঙ্গে রাগ করে ? এসব প্রশ্নের উত্তর নেই। হয়তো বড় হলেই উত্তর জানা যাবে। কিংবা কে জানে হয়তো জানা যাবে না।

তিনদিনের জায়গায় এক সপ্তাহ হয়ে গেল। অপলার ঢাকা ফিরে যাওয়ার কোনো লক্ষণ নেই। রানু দুটি আর্জেন্ট টেলিগ্রাফ পাঠিয়েছে। দুটিতেই লেখা, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। অপলার মধ্যে ফিরে যাওয়ার কোনো লক্ষণই নেই। ওসমান সাহেব বললেন, পড়াশোনা বন্ধ করে এখানে পড়ে আছ। যাওয়া উচিত না ?

হ্যাঁ উচিত ?

কবে যাবে ? এখানকার স্কুলের একজন টিচার তোমাদের সঙ্গে যাবেন। তাঁকে বলে রেখেছি। কাল রওনা দিলে কেমন হয়।

আপনি যাচ্ছেন না ?

আমি আরও কয়েকদিন থাকব।

তাহলে আমিও থাকব। টগরকে কারও সঙ্গে পাঠিয়ে দিন।

ঠিক বলছ তুমি!

ঠিকই বলছি।

এক রাতে ঘুম ভেঙে টগর দেখল খালামণি কাঁদছে। সে ফিসফিস করে বলল, কী হয়েছে তোমার ? অপলা ধরা গলায় বলল, জানি না কী হয়েছে।

৩২

অনেক রাতে ওসমান সাহেব জেগে উঠলেন।

ঘুম ভাঙলেই সময় জানতে ইচ্ছে করে। এ বাড়িতে কোনো ঘড়ি ছিল না। এখন ঘড়ি আছে। অপলার ছোট্ট লেডিস ঘড়ি। তাকে ডেকে কি জিজ্ঞেস করবেন ক'টা বাজে ? নাকি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে সময় আঁচ করার চেষ্টা করবেন। শেষরাত হলে দক্ষিণ আকাশে দেখা যাবে বৃশ্চিক নক্ষত্রমণ্ডলী যার উজ্জ্বলতম নক্ষত্রটির নাম জ্যেঠা। বৃশ্চিকের কাছেই থাকবে ধনু নক্ষত্রমালা। যার ঠিক উপরে মঙ্গল গ্রহ। এদের অবস্থান থেকে সময় বলে দেওয়া খুব অসম্ভব নয়। ওসমান সাহেব বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশ। মিল্কিওয়ে দেখা যাচ্ছে। মঙ্গল গ্রহের কাছাকাছি উজ্জ্বল একটি তারা। এর নাম কী ? শনি। কিন্তু এত কাছাকাছি কি শনির থাকার কথা ? আকাশ সম্পর্কে একসময় প্রচুর পড়াশোনা করেছিলেন, গ্রহ-নক্ষত্র দেখামাত্র চিনতে পারতেন। এখন সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। মঙ্গল গ্রহের পাশের উজ্জ্বল বস্তুটি কী ?

তিনি শোবার ঘরে ফিরে এলেন। তৃষ্ণা বোধ হচ্ছে। টেবিলে পানির গ্লাস ও জগ। পরপর দু'গ্লাস পানি খেলেন, কিন্তু তৃষ্ণা কমল না। বুক শুকিয়ে ঝাঁ ঝাঁ করছে। ঘুমুনোর চেষ্টা করা অর্থহীন। ঘুম আসবে না, তিনি একটি দুঃস্বপ্ন দেখে জেগেছেন, দুঃস্বপ্নের রেশ যতক্ষণ পুরোপুরি না কাটবে ততক্ষণ ঘুমুনো যাবে না। ওসমান সাহেব ভুরু কুঁচকে ভাবলেন, একে দুঃস্বপ্ন ভাবা কি ঠিক হচ্ছে ? একজন প্রিয় এবং পরিচিত কাউকে স্বপ্নে দেখাটা দুঃস্বপ্ন হতে পারে না।

স্বপ্নে দেখেছেন মিলিকে। স্বপ্নের চেহারাগুলি কখনো খুব স্পষ্ট হয় না। মিলিকে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল ফুলি মেয়েটির মতো। হাত-পা নাড়ার ভঙ্গি অনেকটা অপলার মতো। মিলি যেন খুব ক্লান্ত। এসেছে অনেক দূরের কোনো জায়গা থেকে। অল্পক্ষণ থেকেই তাকে চলে যেতে হবে। সে বলল, ভাইয়া, তুমি আমাকে চিনতে পারছ, আমি মিলি।

হ্যাঁ, চিনতে পারছি।

আমি মরে গেছি, তুমি জানো তো ? বিষ খেয়েছিলাম।

না, বিষ-টিষ খাসনি। চিকিৎসা হচ্ছে তোর।

উঁহু, তুমি জানো না একগাদা ঘুমের বাড়ি খেয়ে ফেললাম ?

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

এখন কেমন আছিস ?

বেশি ভালো না। সারা দিন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছোটাছুটি করতে হয়। বেশিক্ষণ এক জায়গায় থাকা যায় না।

তাই নাকি ? জানতাম না তো। সুখে আছিস, না কষ্টে আছিস ?

সুখেও না কষ্টেও না। এখানে সব অন্যরকম। তোমাকে বোঝাতে পারব না। আত্মাটা আমাদের সঙ্গে থাকে না।

বলিস কী ? কোথায় থাকে ?

তাও জানি না।

সারাক্ষণ এমন ছোটাছুটি কী জন্যে ?

আত্মা খুঁজে বেড়াই।

আশ্চর্য তো!

তোমার এখানে খাবার কিছু আছে ? খুব খিদে পেয়েছে।

তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে খাবারদাবার খুঁজতে লাগলেন। খুঁজতে খুঁজতে তাঁর মনে হলো এটা স্বপ্ন। মিলি করুণ মুখে তাঁর সামনে বসে আছে এটা একটা স্বপ্নদৃশ্য। কাজেই ব্যস্ত হয়ে খাবার খোঁজা অর্থহীন। অথচ মিলি এমন করুণ ভঙ্গিতে বসে আছে যে খাবার না খুঁজেও পারা যায় না। তিনি খানিকটা গম ছাড়া কিছুই পেলেন না। তাঁর কপাল বেয়ে টপ টপ করে ঘাম পড়তে লাগল। এই গম দিয়ে তিনি কী করবেন ? মিলি কিন্তু তার

রোগা হাত বাড়িয়ে মুঠো মুঠো গম নিয়ে মুখে পুরছে। কচ কচ করে চিবাচ্ছে। ওসমান সাহেব জেগে উঠলেন। এ জাতীয় একটি স্বপ্ন দেখার কোনো মানে হয় না। কিন্তু অর্থহীন কিছুই তো ঘটে না পৃথিবীতে। এরকম একটি স্বপ্ন দেখার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। ওসমান সাহেব সিগারেট ধরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। মঙ্গল গ্রহ আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। আকাশ অসম্ভব পরিষ্কার। মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি এত পরিষ্কারভাবে এর আগে তিনি দেখেননি। এই ছায়াপথ ধরেই মৃত মানুষেরা পৃথিবীতে নেমে আসে। কোথায় যেন পড়েছিলেন। বিভূতিভূষণের 'দেবযান'-এ, না অন্য কোথাও ?

তিনি সিগারেট টানতে টানতে স্বপ্নটার কথা ভাবতে লাগলেন। এর একটি লৌকিক ব্যাখ্যা বের করা উচিত। নয়তো স্বপ্নের রেশ কাটবে না। তাঁকে বাকি রাতটা জেগে কাটাতে হবে। কারণ স্বপ্ন দেখে তিনি ভয় পেয়েছেন। প্রচণ্ড তৃষ্ণা বোধ হয়েছে। জেগে উঠে দেখেছেন বালিশ ঘামে ভিজে গেছে। অথচ ভয়ের কিছুই ছিল না স্বপ্নে। অস্বাভাবিকতা যা আছে, তা সব স্বপ্নেই থাকে। তিনি শোবার ঘর থেকে ইজিচেয়ার টেনে আনলেন বারান্দায়। শীতল হাওয়া দিচ্ছে। বসে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে। এরা রোজ ইজিচেয়ারটা বারান্দা থেকে টেনে শোবার ঘরে নিয়ে যায় কেন ? ইজিচেয়ারটা ফিট করতে কষ্ট হচ্ছে। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। খট খট শব্দ হচ্ছে। টগর বা অপলা জেগে উঠতে পারে। তিনি কাউকে জাগাতে চান না। একসময় দুঃস্বপ্ন দেখলেই রানুকে ডেকে তুলতেন। রানু খুব বিরক্ত হতো। মুখ ঝাঁকিয়ে বলত, তুমি একজন বয়স্ক মানুষ না ? ভয়ে অস্থির হয়ে যাচ্ছ কেন ? চোখেমুখে পানি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।

স্বপ্নটা কেন দেখলাম সেটা তোমাকে বলি।

বলার দরকার কী ?

তুমি না শুনলে বাকি রাতটা আমার ঘুম হবে না।

এরকম অদ্ভুত স্বভাব কেন তোমার ?

রানু ঘুম চোখে বসে থাকত। ঘনঘন হাই তুলত। এবং তিনি অনেক সময় নিয়ে স্বপ্ন দেখার কারণ ব্যাখ্যা করতে শুরু করতেন। একসময় ব্যাখ্যা শেষ হতো। তিনি হৃষ্ট গলায় বলতেন, যুক্তিগুলি তোমার পছন্দ হয়েছে তো ?

আমার পছন্দ অপছন্দ দিয়ে তো কিছু না। তোমার পছন্দ হলেই হলো। তোমার কথা শেষ হয়েছে ?

হুঁ।

তা হলে ঘুমুতে আসো। নাকি তোমার জন্যে বাতি জ্বালিয়ে রাখতে হবে ?

না বাতি জ্বালিয়ে রাখার দরকার নেই।

তিনি রানুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমুতে যেতেন। রানু যদি বলত, গরমের সময় এত ঘেঁসাঘেঁসি করে শুতে ভালো লাগছে না। তিনি মৃদুস্বরে বলতেন, ভয়টা পুরোপুরি কাটেনি রানু।

ওসমান সাহেব ইজিচেয়ারে বসে ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অপলা শোবার ঘর থেকে চেঁচাল, কে কে ? অপলা নিশ্চয়ই তাঁর নিঃশ্বাসের শব্দ

শুনতে পায়নি, ঘুমের ঘোরেই চেঁচিয়েছে। কোনো সাড়াশব্দ না পেলে চুপ করে যাবে। কিন্তু অপলা আবার বলল, কে কে ?

আমি। ঘুমাও অপলা।

আপনি বারান্দায় কী করছেন ?

অপলা দরজা খুলে বেরিয়ে এল। বিড়বিড় করে বলল, যা ভয় পেয়েছি। অনেকক্ষণ ধরে আমি জেগে আছি। শুনলাম ঘরে কী সব যেন টানাটানি করা হচ্ছে। তারপর দরজা খোলা হচ্ছে। আমি ভাবলাম চোর।

ওসমান সাহেব বললেন, ক'টা বাজে অপলা ? অপলা অনেকক্ষণ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রইল। সময় বলতে পারল না। অন্ধকারে ডায়াল দেখা যাচ্ছে না।

বাতি না জ্বালিয়ে বলা যাবে না। আপনার কাছে দিয়াশলাই আছে ?

তিনি দিয়াশলাই জ্বালালেন, তিনটা দশ। অথচ মনে হচ্ছে ভোর। অপলা বলল, আপনি এত রাতে বারান্দায় বসে আছেন কেন ?

একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি, তারপর আর ঘুম আসছে না।

কী দুঃস্বপ্ন ?

তিনি আগ্রহ করে স্বপ্নের কথা বললেন। অপলা মৃদুস্বরে বলল, খুব অদ্ভুত স্বপ্নটা। তিনি বললেন, না, অদ্ভুত না। এরকম স্বপ্ন কেন দেখেছি তা সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। অনেকদিন আগে একটা বই পড়েছিলাম—দি ভেইল, সেখানে কিছু মানুষের কথা লেখা হয়েছে—যাদের আত্মা ঈশ্বর জমা রেখেছেন। তারা ব্যাকুল হয়ে স্বর্গ-মর্ত্যে তাদের আত্মা খুঁজছে। গল্পটা খুব দাগ কেটেছিল। এই গল্পটিই স্বপ্নে একটু অন্যভাবে এসেছে।

মিলি আপা বসে বসে গম খাচ্ছেন এটা দেখলেন কেন ?

ও খুব দুখী মেয়ে। অভাবী মেয়ে। ওর দুঃখটা স্বপ্নে এই ভঙ্গিতে এসেছে। ওর প্রতি আমার খুব মমতা।

উনি কেমন আছেন ?

জানি না।

জানবার চেষ্টাও বোধহয় করেননি।

তিনি জবাব দিলেন না। অপলা হাই তুলে বলল, শীত শীত লাগছে। আপনার লাগছে না ?

লাগছে। কাছেই কোথাও শিলাবৃষ্টি হয়েছে। শীত লাগছে সেই কারণে।

আপনি পৃথিবীর সব স্বপ্নের জবাব জানেন না কি ?

না, জানি না। তবে জবাব পেতে চেষ্টা করি। অনেকেই সেটা করে না। চৈত্র মাসের রাতে হঠাৎ বাতাস এত ঠান্ডা হবে কেন, এই নিয়ে আমি ভাবছিলাম।

ওসমান সাহেব হাসলেন। অপলা হাসল না। কেন জানি সে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়ল।

ঘুমুতে যাও অপলা।

আপনি ঘুমুবেন না ?

না, আমি আরও খানিকক্ষণ বসে থাকব।

বসে বসে জটিল সব প্রশ্নের উত্তর ভাববেন ?

তা বলতে পার।

তিনি সিগারেট ধরালেন। অপলা মৃদুস্বরে বলল, আপনাকে একটা সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, দেখি আপনি জবাব দিতে পারেন কি না।

কী প্রশ্ন ?

আমি এখানে এসেছিলাম দু'দিন থাকব ভেবে। কিন্তু আজ নিয়ে আটদিন হলো এখানে আছি। ভেবে-টেবে বলুন তো কেন আছি ? দয়া করে সত্যি কথাটা বলবেন।

আমি জানি না অপলা।

আপনি জানেন। খুব ভালোই জানেন।

ঘুমুতে যাও অপলা।

না, আমি ঘুমুতে যাব না, আপনাকে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

ওসমান সাহেব লক্ষ করলেন, অপলা কাঁদতে শুরু করেছে।

নিঃশব্দ কান্না নয়। শব্দ করে শিশুদের মতো কান্না।

এসো অপলা ঘরে যাই।

অপলা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আমি কাল ভোরে চলে যাব। যাওয়ার আগে জানতে চাই যে আপনি জানেন, কেন আমি এখানে এতদিন থাকলাম।

আমি জানি। জানব না কেন ? আমি যথেষ্ট বুদ্ধিমান।

বুদ্ধিমান, কিন্তু হৃদয় বলে আপনার কিছু নেই। আপা ঠিকই বলেন।

ঘুমুতে যাও অপলা।

আমি যাব না। আপনি যান। আরাম করে ঘুমুন। আমি বসে থাকব এখানে।

এ বাড়িতে কিন্তু ভূত আছে।

কেন বাজে কথা বলছেন! কেন আপনি আমাকে একটা ছোট্ট খুকি মনে করেন ?

ছোট্ট খুকি মনে করি না।

টগর জেগে উঠেছে। সে ভয় পাওয়া গলায় ডাকল, খালামণি, খালামণি, অপলা ভেতরে চলে গেল। ওসমান সাহেব লক্ষ করলেন, অপলা বেশ সহজ ভঙ্গিতেই টগরকে বাথরুম করাতে নিয়ে গেল। ছোটখাটো কথাবার্তাও বলতে লাগল। যেন একটু আগে কিছুই হয়নি।

তিনি নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তাঁর কেন জানি মনে হতে লাগল, টগরকে ঘুম পাড়িয়ে অপলা আবার আসবে এ ঘরে। তিনি তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু অপলা এল না।

৩৩

ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সকাল ন'টায়। আটটা থেকেই মতিয়ুর বলছে, কোনোরকম পাগলামি করবে না। যা জিজ্ঞেস করবে জবাব দেবে। ফ্রিলি কথা বলবে। বানিয়ে বানিয়ে কিছু বলবে না। সবচেয়ে বড় কথা পাগলামি করবে না।

মিলি করুণ স্বরে বলল, আমি পাগল মানুষ, কিছু পাগলামি তো করবই। সেটা উনি চিকিৎসা করে ভালো করবেন। সেইজন্যেই এতদূর আসা।

মতিয়ুর গম্ভীর হয়ে গেল। মিলি বলল, জায়গাটা আমার পছন্দ হচ্ছে, কেমন বিদেশ বিদেশ ভাব।

এটা বিদেশ, বিদেশ বিদেশ ভাব থাকবে না ? তোমার কি ধারণা এটা ঢাকা ?

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল এটা ঢাকা। আমি লবীতে গিয়ে ভাইয়ার নাম্বারে একটা টেলিফোন করে ফেললাম। রিং হচ্ছে কেউ ধরছে না। তখন রিসিপশনের মেয়েটা হিন্দিতে বলল, আপনি কোন নাম্বার চান ?

মতিয়ুর বিরক্ত হয়ে বলল, কেন মিথ্যা কথা বলছ ? তুমি তো ঘরেই ছিলে, কোথাও যাওনি। মিলি হেসে ফেলল।

হাসছ কেন ?

মিথ্যা কথাটা কেমন করে ধরা পড়ে গেল তাই হাসছি। মজা লাগছে খুব।

মিলি সাজগোজ করতে লাগল। ফুলদানিতে হোটেল থেকে ফুল দিয়ে গেছে, সেই ফুল সে খোঁপায় গুঁজতে গুঁজতে বলল, সুন্দর হয়ে যাওয়া দরকার। নয়তো ডাক্তার ভাববেন বাংলদেশের মেয়েগুলি দেখতে পচা। তাই না ?

মতিয়ুর জবাব দিল না। রাগী চোখে তাকিয়ে রইল।

ডাক্তার দেবশর্মা বিশাল ব্যক্তি। বিশাল ব্যক্তিদের সাধারণত কোমল একটি মুখ থাকে। ইনার তাও নেই। প্রকাণ্ড একটা গোঁফের আড়ালে সব কোমলতা ঢাকা পড়েছে। চশমার কাচ এত মোটা যে চোখ দেখা যায় না। মিলি সহজভাবে বলল, কেমন আছেন ডাক্তার সাহেব ?

ডাক্তার দেবশর্মা কোমল গলায় বললেন, ভালো আছি।

ও আমাকে বলেছিল আপনি বাঙালি, কিন্তু আপনাকে দেখে আমার বিশ্বাস হয়নি। এখন কথা শুনে বিশ্বাস হচ্ছে।

চট করে কোনো কিছু বিশ্বাস করা ঠিক না। অনেক বিদেশি চমৎকার বাংলা বলেন। তাছাড়া আমি নিজেও কিন্তু পুরোপুরি বাঙালি না। আমার মা ইউপি-র মেয়ে।

মিলি হাসতে হাসতে বলল, আমি যা শুনি সব বিশ্বাস করে ফেলি। পাগল মানুষ তো।

পাগল নাকি আপনি ?

হ্যাঁ। আমি এইজন্যেই তো আপনার কাছে চিকিৎসার জন্যে এসেছি। আপনি আমাকে ভালো করে দিন।

আপনি কবে থেকে পাগল হয়েছেন ?

খুব ছোটবেলা থেকে।

সময়টা বলুন। খুব ছোট মানে কত ছোট ?

ক্লাস সিক্স থেকে।

বুঝলেন কী করে ?

তা বলতে পারব না। আমরা দু'ভাইবোনই ছিলাম পাগল। আমার বড়ভাইকে আপনি চিনবেন না। খুব নামকরা লেখক। আপনারা তো আর আমাদের লেখকদের বই পড়েন না, কাজেই তাঁর নাম জানবেন না। আমাদের দেশে সবাই তাঁকে চেনে।

তাই নাকি ?

জি, আমাকে নিয়েও একটা বই লিখেছে, নাম হলো 'চৈত্রের দুপুর'। এটা পড়ে কাঁদতে কাঁদতে আপনার চোখে ঘা হয়ে যাবে।

ডাক্তার দেবশর্মা হেসে ফেললেন। মিলি আহতস্বরে বলল, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না, তাই না ?

হ্যাঁ করছি।

তাহলে হাসছেন কেন ?

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সঙ্গে হাসির কোনো সম্পর্ক নেই। আপনি এত সুন্দর করে কথা বলছেন যে শুনেই আমার হাসি আসছে। ভালো কথা, 'চৈত্রের দুপুর' বইটি আমি পড়তে চাই। আপনার সম্পর্কে জানবার জন্যে। চোখে ঘা করবার জন্যে নয়। চা দিতে বলি ?

বলুন।

ডাক্তার চা দিতে বললেন। ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে লাগলেন। মিলির ভদ্রলোককে বেশ লাগল।

মিলি!

বলুন।

আপনার কী কী সমস্যা বলুন তো ?

আমার তো কোনো সমস্যা নেই। আমার ভাইয়ের অনেক রকম সমস্যা।

বলুন তার সমস্যার কথাই বলুন।

ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। আমার ভাই এবং ভাবি আলাদা আলাদা থাকে।

ছাড়াছাড়ি কেন হলো ?

ভাইয়ের একটা দোষ হচ্ছে সে সবসময় সত্যি কথা বলবে। এই জন্যেই ছাড়াছাড়ি হয়েছে।

সত্যি কথা বলার এত সমস্যা তা তো জানতাম না।

সমস্যা তো হবেই। রানু ভাবি একদিন জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা তোমার অনেক উপন্যাসে মনিকার নাম আছে। মনিকার প্রতি তোমার কোনো দুর্বলতা আছে ? ভাইয়া

সঙ্গে সঙ্গে বলল, আছে। অনেকদিন থেকে আছে। একজন মানুষের অনেকের প্রতিই দুর্বলতা থাকতে পারে, তাতে কিছু যায় আসে না।

মনিকা কে ?

মনিকা হচ্ছে একটি খুব বাজে ধরনের মেয়ে।

খুব সুন্দর বুঝি ?

জানি না, আমার সঙ্গে কখনো দেখা হয়নি।

তা হলে কী করে বললেন, বাজে ধরনের মেয়ে ?

মিলি হাসতে হাসতে বলল, আপনি ঠিক ভাইয়ার মতো তর্ক করেন।

আপনার ভাই খুব তর্ক করতে পারে বুঝি ?

খুব পারে। কেউ তাকে তর্কে হারাতে পারবে না।

ভাইকে খুব পছন্দ করেন ?

হ্যাঁ।

খুব পছন্দ ?

হ্যাঁ খুব।

সবচেয়ে অপছন্দ করেন কাকে।

কাউকে না।

আপনার স্বামীর কোন ব্যাপারটা আপনার সবচেয়ে খারাপ লাগে ? মিলি চুপ করে রইল। দেবশর্মা হাসতে হাসতে বললেন, প্রতিটি মানুষেরই কিছু কিছু খারাপ দিক আছে। আপনার স্বামীরও নিশ্চয়ই আছে। আছে না ?

হ্যাঁ আছে।

সেই সম্পর্কে বলুন।

সেই সম্পর্কে আমি বলতে পারব না। আমি কাউকে বলি না। আপনাকেও বলব না। আপনি ডাক্তার হন যাই হন।

ডাক্তার দেবশর্মা হাসিখুশি মেয়েটির গম্ভীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তিনি মেয়েটির সমস্যাটি ঠিক ধরতে পারছেন না।

হোটেলে ফিরে মিলি অনেকক্ষণ ঘুমুল। ঘুম ভাঙল বিকেলে। মতিয়ুর বেরুচ্ছে। মিলি বলল, আমি একা একা থাকব ?

হুঁ, বিশ্রাম করো।

বিশ্রাম লাগবে না, আমিও যাব তোমার সাথে।

তোমার যেতে হবে না। তুমি থাকো।

একা একা আমার ভয় লাগবে না ?

ভয়ের কী আছে। চারদিকে লোকজন।

মিলি ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। হোটেলের লবীতে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ লোক চলাচল দেখল। তারপর রুমে ফিরে দীর্ঘ একটা চিঠি লিখল রানুকে। চিঠি শেষ হওয়ার পর বালিশে মাথা রেখে অনেকক্ষণ কাঁদল।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। তার কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে। সে নেমে গেল নিচে। লবী ফাঁকা ফাঁকা। রিসিপশনে এখন একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। দিনের বেলায় একটি মেয়ে থাকে। গুজরাটি মেয়ে। তার সঙ্গে বেশ খাতির হয়েছে মিলির। মেয়েটি মাথা নেড়ে নেড়ে সুন্দর গল্প করে। ইংরেজি কথাবার্তা। মিলি তার বেশিরভাগই বুঝতে পারে না তবু খুব মাথা নাড়ে, যেন সব বুঝতে পারছে। ঐ মেয়েটি থাকলে বেশ হতো। গল্প করা যেত। মিলি আবার উপরে উঠে এল। ঘর অন্ধকার। ঢুকতে ভয় লাগছে। সুইচ টিপলেই বাতি জ্বলবে। কিন্তু বাতি জ্বালাতে ইচ্ছা করছে না। মিলি খাটে বসে রইল চুপচাপ। ঘর অন্ধকার থাকলেই তার বাচ্চাটির কথা মনে পড়ে। এখন যেমন মনে হচ্ছে।

যেন সে খাটে ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎ ঘুম ভাঙল। দু'বার সে ডাকল 'মা মা' বলে। তারপর উঠে বসল। একা একা খাট থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গেল নিচে। চিৎকার করে সে কাঁদছে। কিন্তু কেউ শুনতে পারছে না। কারণ সবাই এখন একতলার ঘরে বসে ভিসিআর দেখছে। ভিসিআরে খুব একটা ধুমধাড়াক্কা ছবি হচ্ছে। সবাই ছবি দেখছে। কেউ তার কান্না শুনতে পাচ্ছে না।

মিলি ছটফট করতে লাগল। মাঝে মাঝে তার এমন কষ্ট হয়। ইচ্ছা করে কৌটা খুলে ঘুমের ওষুধগুলি বের করতে। না, সে খাবে না। শুধু দেখবে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে। বোতলটার দিকে তাকিয়ে থাকতেও কেন জানি ভালো লাগে। মিলি স্যুটকেস খুলল। দরজার কাছে শব্দ হলো। মতিয়ুর ফিরে এসেছে নাকি ? মিলি উৎকর্ণ হয়ে রইল। না, মতিয়ুর না। মিলি বোতল বের করল। সব মিলিয়ে ছাপ্পান্নটি ট্যাবলেট আছে। একটি বেশিও না কমও না। গুনে রাখা ট্যাবলেট। এখন সে আবার গুনবে। গুনতে গুনতে সে কাঁদবে। নিজের কথা ভেবে কাঁদবে। তাঁর মেয়েটির কথা ভেবে কাঁদবে। রানু ভাবি এবং ভাইয়ার কথা ভেবে কাঁদবে। তারপর আবার বোতলটি লুকিয়ে রাখবে স্যুটকেসে।

মতিয়ুরের ফিরতে অনেক দেরি হলো। সে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। অচেনা শহরে একা একা অনেকক্ষণ ঘুরতে হয়েছে। সে এসে দেখল মিলি দরজা খোলা রেখে ঘুমুচ্ছে। কী সব কাণ্ড মিলির। অচেনা অজানা একটা হোটেলে দরজা খোলা রেখে কেউ ঘুমায় ? অন্য কিছু হোক না-হোক জিনিসপত্র তো নিয়ে যেতে পারত। একটা স্যুটকেস হাতে নিয়ে নেমে গেলে কে ধরতে পারত ?

রাত এগারোটায় মতিয়ুর প্রথম বুঝতে পারল, মিলি এক গাদা ঘুমের ওষুধ খেয়েছে। মতিয়ুরের কিছু করার ছিল না। কারোরই কিছু করার ছিল না। তবু হোটেলের লোকজন প্রচুর ছুটাছুটি করল। হাসপাতালের ডাক্তাররা রাত তিনটা পর্যন্ত চেষ্টা করলেন। কিছুই কাজে লাগল না। রাত তিনটায় মিলি ঘোলা চোখে চারদিক তাকাল। হাত বাড়িয়ে কাউকে খুঁজতে চেষ্টা করল। বিড়বিড় করে কী যেন বলল। কাকে সে খুঁজল, কী সে বলল তা কেউ জানল না। কোনোদিন জানবেও না।

৩৪

প্রিয় রানু ভাবি,

এর আগে তোমাকে দু'টি চিঠি দিয়েছি। শুধু তোমাকে না, যাদের যাদের চিনতাম সবাইকে দিয়েছি। একটা কোলকাতা থেকে, একটা এখান থেকে। কেউ জবাব দেয়নি। কী করে দেবে, আমি তো কোনো ঠিকানা দেইনি।

এখন বাজছে সাড়ে পাঁচটা। চারদিক অন্ধকার। আমি ঘরে এখনো বাতি জ্বালাইনি। অন্ধকারে লিখছি। অন্ধকারে চিঠি লিখতে বেশ লাগে তাই না ভাবি ?

আজ সকালে ডাক্তার দেবশর্মার কাছে গিয়েছিলাম। বিশাল পর্বতের মতো এক ভদ্রলোক। রাগী রাগী চেহারা। ভদ্রলোককে দেখে প্রথমে যা ভয় পেয়েছিলাম। পরে দেখি ভয়ের কিছু নেই। বেশ হাসি-খুশি মানুষ। চা খাওয়ালেন। মজার ব্যাপার কী জানো ভাবি ? চায়ের সঙ্গে বিস্কিট ছিল, ভদ্রলোক চায়ে বিস্কিট ডুবিয়ে ডুবিয়ে খাচ্ছিলেন। এত বড় একজন ডাক্তার এরকমভাবে বিস্কিট খায় ? আমার যা হাসি লাগছিল। একটা বিস্কিট ভেঙে চায়ের কাপে পড়ে গেল। তিনি আবার একটা চামচ দিয়ে সেই বিস্কিট তুলতে গিয়ে নিজের শার্টে ফেলে দিলেন। একটু হলেই আমি হেসে ফেলতাম। ভাগ্যিস হাসি চেপে রাখতে পেরেছি। না পারলে কী একটা লজ্জার কাণ্ড হতো বলো দেখি।

ভাবি, আমি এখন আমার রুমে একা। ও বেড়াতে গেছে। আমাকে সঙ্গে নেয়নি। পাগল মানুষকে নিয়ে কোন ঝামেলা হয় সেই ভয়ে। আমারও যেতে ইচ্ছে করছিল না। শহরটা যা নোংরা। তবে হোটেলটা খুব সুন্দর। সিনেমায় যে রকম হোটেল থাকে সে রকম। রিপিসশনে একটা মেয়ে থাকে, ওর নামটা এখন মনে পড়ছে না। এই মেয়েটা ভালো। আমার মতো বকবক করে। তবে মেয়েটার একটা খুব বাজে স্বভাব আছে। সেটা চিঠিতে লেখা যাবে না। যখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে তখন বলব। আমার বলতে মনে না থাকলে তুমি মনে করিয়ে দিয়ো।

পরশু রাতে তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি। সাদা উইলি শিফনটা পরে তুমি যেন কোথায় যাচ্ছ। বিয়ের পরপর তুমি যেমন সুন্দর ছিলে তোমাকে ঠিক সে রকম সুন্দর লাগছিল। অবশ্যি স্বপ্নে সব মেয়েকেই সুন্দর লাগে। আর পুরুষদের লাগে বিচ্ছিরি। আমি স্বপ্নে যে ক'টা পুরুষকে দেখেছি তাদের সবাই খুব বিচ্ছিরি। অনেক আজেবাজে কথা লিখে ফেলেছি। তাই না ভাবি ? অবশ্যি ভাইয়ার ধারণা আমি খুব সুন্দর চিঠি লিখি। যা মনে আসে তা-ই লিখে

ফেলি বলেই নাকি আমার চিঠিগুলি সুন্দর হয়। ভাইয়া কত যে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে। ওমা, তোমার কাছে ভাইয়ার কথা কেন বলছি ? আমার চেয়ে তুমি তো তাকে অনেক ভালো জানো।

আচ্ছা ভাবি, তোমার কি মনে আছে বিয়ের পর তুমি যখন প্রথম আমাদের বাড়িতে এলে তখন আমি কেমন রেগে গেলাম তোমার উপর, কথায় কথায় ঝগড়া করতাম। তবু অবাক হয়ে শুনলাম তুমি একদিন ভাইয়াকে বলছ, মিলি বেচারির অনেক সমস্যা। বাবা তাকে দেখলেই কেন জানি রেগে যান, এমনসব কথাবার্তা বলেন যে সহ্য করা মুশকিল। আমার এত ভালো লাগল তোমার কথা শুনে। তারপর তোমার সঙ্গে ভাব হলো। মনে আছে প্রায়ই তোমাকে বলতাম, ভাবি, আজ রাতে তোমার সঙ্গে ঘুমুব। তুমি বালিশ নিয়ে আমার ঘরে ঘুমুতে আসতে।

বেশ কিছুদিন থেকে আমার আবার তোমার সঙ্গে ঘুমুতে ইচ্ছা হচ্ছে। ভাইয়ার সঙ্গে তোমার যখন মিটমাট হয়ে যাবে, তখন আমি তোমাদের সঙ্গে কিছুদিন থাকব। তোমাকে ঠিক ছোটবেলার মতো বলব, ভাবি ভয় লাগছে আজ রাতে তোমার সঙ্গে ঘুমুব। তখন তুমি যদি বলো, উঁহু আমি পাগল সঙ্গে নিয়ে ঘুমুব না, তাহলে কিন্তু ভাবি আমি খুব রাগ করব। পাগলরা রাগ করলে কী অবস্থা হয় তুমি তো জানো না। খুব খারাপ অবস্থা হয়।

চিঠি এই পর্যন্তই। রানু চিঠি শেষ করে শীতল চোখে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে রইল মতিয়ুরের দিকে। মতিয়ুর শুকনো মুখে একটা সোফায় বসে আছে। অসম্ভব রোগা লাগছে তাকে। যেন খুব বড় একটা অসুখ করেছে। রানু বলল, মিলির ভাইকে খবর দিয়েছেন ?

ঢাকায় পৌঁছে খবর দিয়েছি। টেলিগ্রাম করেছি।

মিলি তাকিয়ে রইল মতিয়ুরের দিকে। মতিয়ুর বলল, ভাবি আমি যাই ? রানু কিছু বলল না। মাথা নিচু করে বসে থাকা এই লোকটিকে সে এই মুহূর্তে আর সহ্যই করতে পারছে না।

ভাবি, আমি তার চিকিৎসার কোনো ত্রুটি করিনি।

ত্রুটি করেছ এমন কথা কেউ বলছে না।

কারোর বলার দরকার নেই ভাবি। আমার নিজেরই মনে হচ্ছে কোথাও মস্ত বড় একটা গণ্ডগোল করেছি।

রানুকে অবাক করে দিয়ে মতিয়ুর রহমান হাউমাউ করে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল। শোকের এমন তীব্র প্রকাশ বহুদিন দেখা হয়নি। এই লোকটিকে সান্ত্বনাসূচক কিছু কথাবার্তা বলা উচিত, কিন্তু বলতে ইচ্ছা করছে না। কাজের মেয়েটি ছুটে এসেছে। অবাক হয়ে দৃশ্যটি দেখছে।

রানু বলল, বাসায় যাও মতিয়ুর। মতিউর ভাঙা গলায় বলল, বাসায় গিয়ে আমি কী করব ? বাসায় আমার কে আছে ?

কী অদ্ভুত কথা, বাসায় কে আছে ? রানু বিরসমুখে তাকিয়ে আছে। কান্নাকাটি, চিৎকার কিছুই তার মনে দাগ কাটছে না। সবটাই মনে হচ্ছে বানানো, মেকি। লোকটির টাকাপয়সা হয়েছে, কিছুদিনের মধ্যেই সে পুতুল পুতুল ধরনের একটি মেয়ে বিয়ে করবে। গয়নায় তার শরীর ঢেকে দেবে। সেই মেয়েটি পরপর কয়েকটি বাচ্চা দিয়ে সম্পূর্ণ অন্য রকম হয়ে যাবে, গালের হাড় বড় হয়ে যাবে, দাঁতগুলি হয়ে যাবে উঁচু। পৃথিবীর প্রতি অপরিসীম বিরক্তি নিয়ে এই মেয়েটি দুপুরবেলা নিউ মার্কেটে শাড়ির প্যাকেট নিয়ে হাঁটবে।

কে মনে রাখবে মিলির কথা ? কেউ না। তার মেয়েটিও না। সবাই চেষ্টা করবে মিলিকে দ্রুত ভুলে যেতে। ভুলে যাওয়াই ভালো। পাগল মাকে মনে রাখার কোনো দরকার নেই। কেউ কাউকে মনে রাখে না।

৩৫

ঘরে একটু আগে হারিকেন দিয়ে গেছে। বাইরে এখনো আলো আছে। কিন্তু ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। ওসমান সাহেব বসে আছেন চেয়ারে। দরজার দিকে পিঠ দিয়ে বসেছেন। যেন বাইরের পৃথিবীর প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ নেই। তিনি তাকিয়ে আছেন অন্ধকারের দিকে। আজ তাঁর জীবনের একটি বিশেষ দিন। রানু এসেছে। দুপুরবেলা হঠাৎ দেখলেন, একটা ছোট্ট ব্যাগ হাতে নিয়ে সে খনিকটা সঙ্কুচিত ভঙ্গিতে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। মৃদুস্বরে ডাকছে, অপলা অপলা। অথচ তার ডাকা উচিত ছিল টগরকে। সে টগরকে ডাকল না কেন ? এর মানে কি এই যে সে টগরের জন্যে আসেনি ? যদি তাই হয়ে থাকে তা হলে আজ তাঁর জন্যে একটি বিশেষ দিন। কিন্তু তাঁর আনন্দ হচ্ছে না কেন ? বরং কেমন যেন একটা কষ্ট হচ্ছে।

তিনি রানুর জন্যে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন নিজের ঘরে। সে এল না। তিনি নিজেও গেলেন না তার কাছে। যেতে ইচ্ছে করল না।

এখন সন্ধ্যা। বারান্দায় টগরের হৈচৈ শোনা যাচ্ছে। সে তার আনন্দ কিছুতেই সামলাতে পারছে না। রানু কথা বলছে অপলার সঙ্গে। রানুর গলা তিনি শুনতে পাচ্ছেন না কিন্তু অপলার কথা শোনা যাচ্ছে।

তুমি খুব চিন্তা করেছ আমাদের জন্যে তাই না আপা ? পরশুদিন আমরা চলে যেতাম। সব ঠিকঠাক তারপর হঠাৎ টগরের গা গরম হলো। পুকুরে খুব ঝাঁপাঝাঁপি করেছে তো, সেই থেকে ঠান্ডা লেগে জ্বর।

রানু কিছু বলল তার উত্তরে। তার পরপরই তিনি অপলার হাসির শব্দ শুনলেন। সেই হাসিও চট করে থেমে গেল।

ওসমান সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। টেবিলে কাগজ-কলম সাজানো। একটি পেনসিল পর্যন্ত আছে। হারিকেন জ্বলছে। আধো আলো আধো ছায়া পরিবেশ। দীর্ঘ দিন পর

টেবিলটি তাঁকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করল। কেন জানি মনে হচ্ছে অরণ্যের গল্পটি তিনি এখন লিখতে পারবেন। অরণ্য এগিয়ে আসছে। গ্রাস করছে শহরকে। আতঙ্কগ্রস্ত শহরের মানুষ নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে। কাগজ-কলম নিয়ে বসার আগে রানুর সঙ্গে দেখা করা উচিত। কিন্তু কেন যেন ঘর থেকে বেরুতে ইচ্ছা করছে না।

দীর্ঘদিন পর আবার তিনি লিখতে বসলেন। আগের মতো কলম আটকে গেল না। কিন্তু যে-গল্প লেখা হচ্ছে তা অরণ্যের গল্প নয়। শহরের গল্প। শহর গ্রাস করছে অরণ্যকে। তিনি দ্রুতগতিতে লিখছেন—

> সন্ধ্যার পর থেকে নীলুর কেমন যেন লাগতে লাগল। এক ধরনের অস্বস্তি, হঠাৎ ঘুম ভাঙলে যেরকম লাগে সেরকম। সমস্ত শরীর ঝিম ধরে আছে। মাথার ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা।
>
> নীলু বারান্দায় এসে দাঁড়াল। এ বাড়ির বারান্দাটা সুন্দর। কল্যাণপুরের দিকে শহর তেমন বাড়তে শুরু করেনি। গ্রাম গ্রাম একটা ভাব আছে। বারান্দায় দাঁড়ালে ঝিলের মতো খানিকটা জায়গা চোখে পড়ে। গত শীতের আগের শীতে ঝাঁকে ঝাঁকে বুনো হাঁস নেমেছিল। কী অদ্ভুত দৃশ্য! এ বছর নামবে কি না কে জানে। বোধহয় না। শহর এগিয়ে আসছে। পাখিরা শহর পছন্দ করে না।

অনেক রাতে রানু এসে দাঁড়াল দরজার পাশে। তিনি এমনভাবে তাকালেন যেন রানুকে চিনতে পারছেন না। এ যেন অচেনা কেউ। রানু বলল, কেমন আছ ?

ভালো। তুমি ভালো আছ রানু ?

হ্যাঁ। কী করছ! লিখছ ?

তিনি মাথা নাড়লেন। রানু বলল, লেখা এগুচ্ছে ?

হ্যাঁ।

অনেকদিন পর লিখতে বসলে তাই না ?

হ্যাঁ, অনেকদিন পর। ভেতরে এসে বসো রানু।

সে কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে ভেতরে এসে দাঁড়াল। বসল খাটে। কেমন কোমল দেখাচ্ছে রানুর মুখ। কেমন দুঃখী দুঃখী চেহারা। তাকে আজ এমন দেখাচ্ছে কেন ?

মিলির একটি চিঠি আমার কাছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছি। তুমি পড়বে ?

হ্যাঁ পড়ব।

রানু চিঠিটা এগিয়ে দিল। চিঠি পড়তে গিয়ে তিনি লক্ষ করলেন তাঁর চশমার কাচ ঝাপসা হয়ে এসেছে। তিনি কিছু পড়তে পারলেন না। রানু মৃদুস্বরে বলল, মিলির খবরটা পেয়ে তোমার জন্যে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। তোমাদের দুই ভাই বোনের মধ্যে কোথায় যেন একটা মিল আছে। খুব বড় রকমের মিল। অনেক ভেবেছি বের করতে পারিনি। তুমি চিঠিটা আমার কাছে দাও আমি পড়ে শোনাচ্ছি। তুমি পড়তে পারছ না।

রানু চিঠি পড়তে শুরু করল। তিনি তাকিয়ে আছেন রানুর দিকে। চশমার ঝাপসা কাচের ভেতর দিয়ে তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন না। মাঝে মাঝে খুব কাছের মানুষও অস্পষ্ট হয়ে যায়।

টগর পা ঝুলিয়ে খাটে বসে আছে। তার মা চলে এসেছে—এটি তার এখনো ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। তার বারবার মনে হচ্ছে তার মা বোধহয় আসেনি। এই যে মা চলে গেল পাশের ঘরে, সত্যি কি গেল ? হয়তো সে-ঘরে উঁকি দিলে মাকে সে দেখবে না। দেখা যাবে করুণ মুখ করে বাবা বসে আছে।

টগর খাট থেকে নামল। তাকাল অপলার দিকে। অপলা শীতল গলায় বলল, কোথায় যাচ্ছ ?

ঐ ঘরে।

ঐ ঘরে এখন যেয়ো না।

কেন যাব না ?

একটু পরে যাও। আসো আমরা দু'জন গল্প করি।

শিশুরা অনেক জিনিস চট করে বুঝে ফেলে। টগরও হয়তোবা কিছু বুঝল। আবার উঠে বসল খাটে। পা দোলাতে দোলাতে ভয়ে ভয়ে বলল, মা কি এখন থেকে বাবার সঙ্গে থাকবে ? অপলা গাঢ়স্বরে বলল, হ্যাঁ থাকবে।

টগর ছোট্ট করে হাসল। ছেলেমানুষি হাসি। দেখতে এত ভালো লাগে।

খালামণি।

বল।

সত্যি থাকবে ?

হ্যাঁ থাকবে।

তুমি কী করে জানো ?

আমি জানি।

টগর আর কিছু বলল না। পা দোলাতে লাগল। তার মনে হলো খালামণি কাঁদছে। খালামণি এখন অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু টগর বুঝতে পারছে।

তুমি কাঁদছ কেন খালামণি ?

কাঁদছি না তো।

কিন্তু খালামণি কাঁদছে। তার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। বড়দের কত অদ্ভুত দুঃখকষ্ট থাকে। টগরের নিজেরও খুব কান্না পেয়ে গেল। কিন্তু ছেলেদের কাঁদতে নেই। সে প্রাণপণে নিজের কান্না সামলাবার চেষ্টা করতে লাগল।

অপলা ধরা গলায় বলল, টগর তুমি শান্ত হয়ে বসে থাকবে এখানে, বাবার ঘরে যাবে না। কেমন ?

আচ্ছা।

আমি একটু নিচে যাব। একা একা হাঁটব।

কেন ?

অপলা চোখ মুছে শান্ত গলায় বলল, বড়দের মাঝে মাঝে একা একা থাকতে ইচ্ছে করে।

রাত অনেক হয়েছে। ওসমান সাহেব মাথা নিচু করে লিখে যাচ্ছেন। টগর ঘুমিয়ে পড়েছে। রানু রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কী অপূর্ব জোছনার রাত! উঠোনে একা একা দাঁড়িয়ে আছে অপলা। কী দেখছে সে ? রানু একবার ভাবল নিচে নেমে যাবে, অপলার হাত ধরে বলবে, কাঁদছিস কেন বোকা মেয়ে ? কিন্তু সে তা করল না। তাকিয়ে রইল মাঠের দিকে। রানু ডাকল, অপলা! অপলা ফিরে তাকাল। চাঁদের আলোয় ভেজা কী সুন্দর একটি মুখ। তাঁকে ঘিরে জোছনা কেমন থরথর করে কাঁপছে। অদ্ভুত কষ্ট হচ্ছে রানুর। সে আবার ডাকল, অপলা, অপলা!

অরণ্য

মশারির ভেতর একটা মশা ঢুকে গেছে।

পাতলা ছিপছিপে বুদ্ধিমান একটা মশা। কোথাও বসলেই তাকে মরতে হবে এটি জানে বলেই কোথাও বসছে না। ক্রমাগত উড়ছে।

সোবাহান তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল। নিশ্চয়ই একসময় সে বসবে। কিন্তু বসছে না, অসম্ভব জীবনীশক্তি। সোবাহানের মাথায় আজগুবি ভাবনা আসতে লাগল—এই মশাটির বয়স কত ? এ কি বিবাহিত ? এর ছেলেমেয়ে আছে কি ? ওদের একা ফেলে সে মরবার জন্যে মশারির ভেতর ঢুকল ? মৃত্যুর পর ওর আত্মীয়স্বজন কাঁদবে কি ? নাকি প্রেম ভালোবাসা এসব শুধু মানুষের জন্যেই ? বোধহয় না। একবার সোবাহানের ছোটচাচা একটা কাক মেরে গাবগাছে ঝুলিয়ে রেখেছিল। ঘণ্টাখানিকের মধ্যে কাকটির মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হয়ে গেল। হাজার হাজার কাক বাড়ির চারপাশে কা কা করতে লাগল। ভয়াবহ ব্যাপার।

এই মশাটির মৃত্যুসংবাদও কি অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে ? অযুত নিযুত মশা পিন পিন শব্দে উড়ে আসবে ? খুব সম্ভব না। নিচুস্তরের কীটপতঙ্গের মধ্যে প্রেম ভালোবাসা নেই, আর থাকলেও তাতে মৃত্যুর কোনো ভূমিকা নেই।

একসময় মশাটি মশারির এক কোনায় স্থির হয়ে বসল। তার গায়ের রঙ হালকা নীল। পাখার নিচের দিকটা চকচকে খয়েরি। মশারা এমন বাহারি হয় তা সোবাহানের জানা ছিল না। সোবাহান মনে মনে বলল, তুমি মরতে যাচ্ছ। মরবার আগে তোমার কি কিছু বলার আছে ?

মশাটি পাখা নাড়ল। মনের কথা বুঝতে পারে নাকি ? টেলিপ্যাথি ? 'নিম্নশ্রেণীর কীটপতঙ্গরা ভাবের আদানপ্রদান টেলিপ্যাথির মাধ্যমে করিয়া থাকে।' কোথায় যেন পড়েছিল কথাটা। সাপ্তাহিক কাগজেই বোধহয়। সাপ্তাহিক কাগজগুলিতে অদ্ভুত সব খবর ছাপা হয়। একবার এক কাগজে ধর্মপ্রাণ একটা খেজুরগাছের ছবি ছাপা হলো। এই গাছটা নাকি নামাজের সময় হলেই পশ্চিমদিকে হেলে সেজদা দেয়। গাছগাছালির মধ্যেও ধর্ম প্রচারিত হচ্ছে ? ইসলাম ধর্মের অনুসারী এই গাছটি খুব দেখার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মানুষের অধিকাংশ ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকে।

মশাটি সম্ভবত স্বেচ্ছামৃত্যুর জন্যে তৈরি হয়েছে। একটুও নড়ছে না। সোবাহানকে দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসতে দেখে তার ছাইবর্ণের একটি পাখা শুধু কাঁপল। নিম্নশ্রেণীর কীটপতঙ্গরা মানুষকে কীভাবে গ্রহণ করে এটি কোনোদিন জানা হবে না। ঈষৎ অন্যমনস্কতার পর মশাটিকে সোবাহান দু'হাতে পিষে ফেলল।

পিন পিন শব্দ হচ্ছে নাকি ? অযুত নিযুত মশা কি উড়ে আসছে ? যাদের রঙ নীলাভ, পাখার নিচটায় নরম খয়েরি রঙ।

২

ঢাকা শহরে মোট কতজন সোবাহান আছে! সোবাহান আলি, সোবাহান মোল্লা, আহমেদ সোবাহান। দশ-পনেরো হাজার তো হবেই। এদের কেউ কেউ ঘুমোতে যায় অনেক রাতে। ঘুম আসে না। রাত জেগে নানান রকম স্বপ্ন দেখতে এদের বড় ভালো লাগে। যে সমস্ত মশা পিন পিন শব্দে এদের স্বপ্নে বাধা সৃষ্টি করে, এরা উৎসাহের সঙ্গে তাদের পিষে মেরে ফেলে। হাতে রক্তের দাগ নিয়ে ঘুমোতে গেলে এদের সুনিদ্রা হয়।

কিন্তু আমাদের সোবাহান নীল রঙের মশাটি মেরে মন খারাপ করে বসে রইল। আগামীকাল সাড়ে দশটায় একটা চাকরির ব্যাপারে তার এক জায়গায় যাওয়ার কথা। চাকরিটি হলেও হতে পারে। এরকম অবস্থায় মন দুর্বল থাকে। অকারণ প্রাণিহত্যায় চাপা একটি অপরাধ বোধ হয়। সোবাহান মশারির ভেতর উবু হয়ে থাকে। পাশের বেডের জলিল সাহেব তখন কথা বলেন, ঘুমান না কেন ?

বড় মশা।

মশারির ভেতর আবার মশা কী ?

সোবাহান কিছু বলে না। জলিল সাহেব মশা নিয়ে একটা বস্তাপচা ছড়া বলেন— 'দিনে মাছি রাতে মশা, আমাদের স্বর্গে যাওয়ার দশা।' সোবাহান বিরক্তি বোধ করে। কোনো উত্তর দেয় না।

ঘুমিয়ে পড়েন ভাই, ঘুমিয়ে পড়েন। মশার আদমশুমারি করে কোনো ফায়দা নাই। ঠিক কি না বলেন ?

জি, তা ঠিক।

গরমটাও আজ কম, ভালো ঘুম হবে।

জি।

শেষরাতের দিকে বৃষ্টি হবে। এই ধরেন তিনটা সাড়ে তিনটা।

কীভাবে বুঝলেন ?

বুঝি বুঝি, বয়স তো কম হয় নাই।

জলিল সাহেব দীর্ঘ সময় ধরে গলা টেনে টেনে হাসেন। এর মধ্যে হাসির কী আছে সোবাহান বুঝতে পারে না। সে শুয়ে পড়ে, কিন্তু তার ঘুম আসে না। মাথার ওপর ষাট পাওয়ারের একটা বাল্ব। ঝকঝক করে চারদিক। যত রাত বাড়ছে আলো তত বাড়ছে। ঘুম আসার প্রশ্ন ওঠে না। তার চোখ কড়কড় করে।

বাতি জ্বালিয়ে রাখলে অসুবিধা হয় নাকি সোবাহান সাহেব ?

জি-না।

চোর আর বেশ্যা। হা হা হা।

সোবাহান বহু কষ্টে রাগ সামলায়। রাতদুপুরে এ ধরনের কথাবার্তার কী মানে থাকতে পারে ? শুয়ে পড়লেই হয়।

বেশ্যাগুলি অন্ধকারে বসে কী করে জানেন নাকি সাহেব ?

জি-না। জানি না।

জলিল সাহেব অঙ্গভঙ্গিসহ একটা কুৎসিত কথা বলে গলা টেনে টেনে হাসতে থাকেন। পঞ্চাশের ওপর বয়স হলেই লোকজন অশ্লীল কথা বলতে ভালোবাসে। জলিল সাহেবের বয়স পঞ্চাশ এখনো হয়নি। অবশ্যি জুলপির সমস্ত চুল পেকে গেছে। মানুষের জুলপি কি আগে বুড়ো হয়ে যায় ? হয়তো যায়। সোবাহানের জানতে ইচ্ছে করে।

একটা বেশ্যা মাগি আর একটা রেগুলার মাগি—এদের মধ্যে ডিফারেন্সটা কী বলেন দেখি ?

সোবাহান চুপ করে থাকে।

পারবেন না ? আপনি দেখি সাহেব কিছুই জানেন না। হা হা হা।

ডিফারেন্সটা সম্পর্কে একটা রসালো জিনিস জলিল সাহেব আধা ঘণ্টা ধরে বলার পর বাতি নিভিয়ে ঘুমোতে গেলেন। বাতি নেভাবার সঙ্গে সঙ্গে একটা মশা সোবাহানের কানের কাছে পিন পিন করতে লাগল। মশার আত্মা নাকি ? সেই মৃত মশাটিই কি ফিরে এসেছে ? জগতে অনেক অমীমাংসিত রহস্য আছে। ঘুম এল না। মশাটি বিরক্ত করতে লাগল। একবার উঠে বাতি জ্বালাল। মশারির ভেতর কিছুই নেই। কিন্তু ঘুমোতে গেলেই তাকে পাওয়া যাচ্ছে—পিঁ পিঁ পিন পিন। পিঁ পিঁ পিন পিন।

ঘুম আসছে না, ঘুম আসছে না। অসহ্য গুমট। হাওয়া নেই, এক ফোঁটা হাওয়া নেই। সোবাহান একসময় দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। কোথাও হাওয়া নেই। আকাশে মেঘ আছে কি ? সে তাকাল আকাশের দিকে। মেঘশূন্য আকাশ। ভালো লাগে না। কিছু ভালো লাগে না। ভেতরের বাড়ি থেকে কান্নার শব্দ আসছে। কে কাঁদছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মনসুর সাহেবের স্ত্রী ? না তার ছোট শালী ? এ বাড়িতে মাঝে মাঝে এরকম অস্বস্তিকর কান্না শোনা যায়। কে কাঁদে কে জানে ?

সোবাহান! সোবাহান সাহেব!

জি।

একটু আসেন ভিতরে।

কী হয়েছে ?

আরে ভাই আসেন না। বিনা কারণে কেউ ডাকে না।

সোবাহান ঘরে ঢুকে দেখল, জলিল সাহেব বমি করে তার বিছানার একাংশ ভাসিয়ে চোখ বড় বড় করে বসে আছেন। ঘরময় কটু ঝাঁঝালো গন্ধ। বাতাস ভারী হয়ে আছে।

কী হয়েছে ?

কিছু না।

আপনার কি শরীর খারাপ নাকি ?

না।

বমি করে তো ঘর ভাসিয়ে ফেলেছেন।

সন্ধ্যার পর এক ঢোক খেয়েছিলাম। সস্তার জিনিস। সস্তার তিন অবস্থা। প্রথম অবস্থায় নেশা। দ্বিতীয় অবস্থায় বমি। তৃতীয় অবস্থায় আবার বমি।

বলতে বলতেই মুখ ভর্তি করে আবার বমি করলেন। তার হিক্কা উঠতে লাগল। সোবাহান কী করবে বুঝে উঠতে পারল না।

সোবাহান সাহেব।

জি।

পানি আনেন। হা করে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। ভয় নাই, আমি নিজেই পরিষ্কার করব। নিজের গা নিজেই পরিষ্কার করতে হয়। এটা কপালের লিখন। একটা ঝাঁটা জোগাড় করেন।

সব পরিষ্কার টরিষ্কার করে তারা যখন ঘুমোতে গেল তখন ঝেঁপে বৃষ্টি নামল। জলিল উৎফুল্ল স্বরে বললেন, বৃষ্টি নামল—দেখলেন তো ?

জি দেখলাম।

বলেছিলাম না বৃষ্টি হবে ?

হুঁ বলেছিলেন।

জলিল সাহেব গলা টেনে হাসতে লাগলেন।

সোবাহান সাহেব!

জি।

ঠিক আছে ঘুমান। আমি একটু বসি বারান্দায়।

জলিল সাহেব মশারি থেকে বের হয়ে এলেন। ভেতরবাড়ি থেকে কান্না শোনা যাচ্ছে। সোবাহান মৃদুস্বরে বলল, কে কাঁদে জানেন ?

জলিল সাহেব উত্তর দিলেন না। সোবাহান বলল, প্রায়ই শুনি।

জলিল সাহেব ঠান্ডাস্বরে বললেন, যার ইচ্ছা সে কাঁদুক, কিছু যায় আসে না। আমাদের একটা ঘর সাবলেট দিয়েছে আমরা আছি। মাসের শেষে দেড়শ টাকা ফেলে দেই, ব্যস। যার ইচ্ছা কাঁদুক, কী যায় আসে বলেন ? কিছুই আসে যায় না।

জলিল সাহেব দরজা খুলে বারান্দায় বসে রইলেন। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। শীতল হাওয়া দিচ্ছে। কানের কাছে মশা পিন পিন করছে না। কিন্তু ভেতর বাড়িতে কেউ একজন কাঁদছে। প্রায়ই সে কাঁদে। কেন কাঁদে কে জানে। শুনতে ভালো লাগে না। মেয়েদের কান্নায় ঘুমপাড়ানি কিছু আছে। সোবাহানের ঘুম পেতে থাকে। ঘুম আসার সময়টা বেশ সুন্দর। গভীর কোনো নির্জন দিঘিতে ডুবে যাওয়ার সঙ্গে এর একটা মিল আছে। মিলটি সোবাহান ধরতে পারে, কারণ সে একবার সত্যি সত্যি ডুবে যেতে বসেছিল। শুরুটাই ভয়ের। তারপর কোনো ভয় নেই—আলো কমে যেতে শুরু করে, শব্দ কমে যেতে শুরু করে।

ব্রাদার, ঘুমিয়ে পড়লেন ? এই সোবাহান সাহেব!

না, ঘুমাইনি। কেন ?

বমি করার পর পেটে আর কিছু নাই। ক্ষিদে লেগে গেছে।

আমাকে বলে কী লাভ ?

তা ঠিক। ঘুমান। আমি বরং এক গ্লাস পানি খেয়ে শুয়ে পড়ি, কী বলেন ?

খান। ইচ্ছে হলে খান।

খালিপেটে পানি খেলে আবার বমি হবে না তো ?

সোবাহান জবাব দিল না। এই লোকটির সঙ্গে আর থাকা যাচ্ছে না। আগের মেসটিতেই ফিরে যেতে হবে। অসহ্য! সোবাহান ঠিক করল কাল ভোরে প্রথম যে কাজটি করবে সেটা হচ্ছে—কুমিল্লা বোর্ডিং-এ ফিরে যাবে।

কিন্তু সে নিশ্চিত জানে এটা করা হবে না। কারণ সকালে তাকে যেতে হবে চাকরির ব্যাপারে। তারপর আর উৎসাহ থাকবে না। তাছাড়া কারও সঙ্গে বেশি দিন থাকলেই একটা মায়া জন্মে যায়। ছেড়ে যেতে কষ্ট হয়। জলিল সাহেবের সঙ্গে সোবাহান আছে প্রায় পাঁচ বছর ধরে। প্রথম দু'বছর বেঙ্গল মেস হাউসে। বাকি তিন বছর কুমিল্লা বোর্ডিং-এ। এবং এখন শ্যামলীর এই বাড়িতে। জলিল সাহেবের ব্যবস্থা। সোবাহান আসতে চায়নি। জলিল সাহেব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে ভুলিয়েছেন।

মেসে সারা জীবন পড়ে থাকবেন নাকি! একটা ফ্যামিলির সঙ্গে এ্যাটাচড থাকা ভালো। ঘরের রান্না খাবেন। তার টেস্টই অন্যরকম। অসময়ে এক কাপ চা খেতে চাইলেন, জাস্ট গিয়ে বলবেন—ভাবি, এক কাপ চা। ওমনি চা এসে যাবে। সঙ্গে একটা বিসকিট কিংবা এক প্লেট মুড়ি ভাজা।

জলিল সাহেবের মিষ্টি কথার কোনোটি সত্যি হয়নি। তিনি অবশ্যি অনেক চেষ্টা করেছিলেন পেইংগেস্ট হতে। কিন্তু বাড়িওয়ালা মনসুর সাহেবের স্ত্রী খুব পর্দানশীন। এই যে দু'টি লোক বাড়ি সাবলেট নিয়ে আছে, তাদের সঙ্গে এখনো এই মহিলাটির কোনো কথা হয়নি। একবার শুধু এক বড় জামবাটি ভর্তি পায়েস পাঠিয়েছিলেন। সেই পায়েস খেয়ে জলিল সাহেবের পেট নেমে গেল। তিনি গম্ভীর গলায় ঘোষণা করলেন—পায়েসটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ফেলে দেওয়ার বদলে আমাদের ধরিয়ে দিয়েছে। মহা হারামি! এখানে থাকা যাবে না রে ভাই। কুমিল্লা বোর্ডিংই ভালো। সেখানে ফিরতে হবে। কপালের লিখন।

কিন্তু ফিরে যাওয়া হচ্ছে না। দেখতে দেখতে এখানেও তিন মাস হয়ে গেল। আরও কিছুদিন গেলে এ জায়গাটার ওপরও একটা মায়া পড়ে যাবে। ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করবে না। মায়া বড় সাংঘাতিক জিনিস।

৩

দশটায় আসার কথা—সোবাহান ন'টায় এসেছে। বসার জায়গাটা ভালো। বেতের গদিওয়ালা চেয়ার ইউ আকৃতিতে সাজানো। মাঝখানে বেমানান আধুনিক একটা কাচের

টেবিল। টেবিলের ওপর দু'টি অ্যাশট্রে—এত সুন্দর দেখতে যে, গোপনে পকেটে ঢুকিয়ে ফেলার ইচ্ছা বহু কষ্টে দমন করতে হয়। দেয়ালে তিনটি বিভিন্ন মাপের তেলরঙ ছবি। প্রতিটিই দেখতে কুৎসিত। ফ্রেমগুলির জন্যেই বোধ করি ওদের সহ্য করা যায়। সোবাহান মাঝখানের একটি চেয়ারে দুপুর বারোটা পর্যন্ত বসে রইল। এর মধ্যে তিনবার উঠে বারান্দায় গেল থুথু ফেলতে। আজ কেন জানি মুখে ক্রমাগত থুথু জমছে। বারোটার সময় জানা গেল যার জন্যে বসা থাকা সেই এস. রহমান সাহেব আজ আসবেন না। তার শরীর খারাপ। সোবাহান ইনকোয়ারিতে বসে থাকা বেঁটে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, কাল আসব ? মেয়েটি হাসিমুখে বলল, প্রয়োজন থাকলে নিশ্চয়ই আসবেন।

রহমান সাহেব কি কাল আসবেন ?

শরীর ভালো হলে আসবেন। আপনি কি চা খেয়েছেন ?

সোবাহান চমকায়। চায়ের কথা আসছে কোত্থেকে ? মেয়েটি শান্তস্বরে বলল, যে সব গেস্ট এখানে অপেক্ষা করেন তাদের চা দেওয়ার নিয়ম আছে, আপনাকে দেয় নাই ?

জি-না। তাছাড়া আমি গেস্ট না। আমি চাকরির খোঁজে এসেছি।

মেয়েটি কৌতূহলী হলো। ফোন বাজছিল সে সেদিকে লক্ষ না করে বলল, রহমান সাহেব আপনাকে চাকরি দেবেন এমন কিছু বলেছেন ?

না, দেখা করতে বলেছেন।

মেয়েটি টেলিফোন তুলে কাকে যেন ইশারা করল। এক কাপ চা এবং এক পিস ফ্রুট কেক এসে পড়ল। চমৎকার ফ্রুট কেক। চা-টাও বেশ ভালো। চিনি কম। কিন্তু চিনি দিতে বলাটা নিশ্চয়ই ঠিক হবে না। মেয়েটি টেলিফোন নামিয়ে খুব মিষ্টি করে বলল, খান, কেক খান। কাল কি আসবেন ?

জি।

উনি অবশ্যি ইচ্ছা করলে চাকরি দিতে পারেন। আপনি এখন কোনো চাকরি টাকরি করছেন ?

না।

থাকেন কোথায় ?

শ্যামলী।

কথাবার্তা আর হলো না। আবার একটি টেলিফোন এল। মেয়েটি অবিকল ইংরেজদের মতো গলায় ইংরেজি বলতে লাগল। মাঝে মাঝে চাপা হাসি। যে চা কেক খাইয়েছে তাকে কিছু না বলে চলে যাওয়া যায় না। সোবাহান অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু কথা শেষ হচ্ছে না। সোবাহান আন্দাজ করতে চেষ্টা করল যার সঙ্গে কথা হচ্ছে সে ছেলে না মেয়ে। মেয়েই হবে। ছেলেরা এত সময় কথা বলতে পারে না।

বাথরুমে যাওয়া প্রয়োজন। জিজ্ঞেস করবে কাকে ? রিসিপশনের মেয়েটির চেহারা মন্দ নয়। ফর্সা মেয়েরা একটু বেঁটে হলেও খারাপ লাগে না। কিন্তু কালো ও বেঁটে এ দুয়ের কম্বিনেশন ভয়াবহ। কালো মেয়েদের লম্বা হতে হয় এবং লম্বা চুল থাকতে হয়।

মেয়েটি টেলিফোন নামিয়ে রেখে তরতর করে দোতলায় উঠে গেল। আর নামার নাম নেই। সোবাহান আরও পঁচিশ মিনিটের মতো অপেক্ষা করল। রাতে ভালো ঘুম হয়নি। সেজন্যেই মাথায় এখন চাপা যন্ত্রণা হচ্ছে। বাসায় ফিরে টেনে একটা ঘুম দিতে হবে। রিসিপশনিস্ট মেয়েটির নাম কী কে জানে। মাঝে মাঝে সুন্দরী মেয়েদের কুৎসিত সব নাম থাকে। মুন্সিগঞ্জের এসডিও সাহেবের একটি মেয়ে ছিল জলপরীর মতো। নাম তাসকিন। কোনো মানে হয় না। একজন সুন্দরী মেয়ের সুন্দর একটা নাম থাকা দরকার। তাসকিন ফাসকিন নয়, ওর নাম হওয়া উচিত বিপাশা কিংবা জরী।

রিসিপশনিস্ট মেয়েটি নেমে এসে ভ্রূ কুঁচকে বলল, আপনি এখনো যাননি ?

জি-না। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।

কেন ? আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন কেন ?

আপনি যত্ন করে চা খাওয়ালেন। না বলে চলে যাই কীভাবে ?

যত্ন করে চা খাওয়ালেন মানে ? এখানে যে আসে তাকেই চা খাওয়ানো হয়।

সোবাহান বিস্মিত হয়ে বলল, আপনি রেগে যাচ্ছেন কেন ?

মেয়েটি কোনো উত্তর দিল না। সুন্দরী মেয়েরা অকারণে রাগে। এই মেয়েটি যদি কালো, রোগা হতো এবং তার মুখে যদি বসন্তের দাগ থাকত তাহলে সোবাহানের কথায় সে খুশিই হতো। খুশি হওয়ার মতোই কথা।

একজন মোটামুটি সুদর্শন যুবক অপেক্ষা করছিল। হতে পারে যুবকটি চাকরিপ্রার্থী। কাপড়চোপড় ভালো নয়। সারা রাত অঘুমো থাকায় চোখেমুখে ক্লান্তি, তাতে কিছু যায় আসে কি ? কিছুই যায় আসে না।

সোবাহানকে দেখেই জলিল সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, কোথায় ছিলেন সারা দিন ? আপনার ভাই এসে বসে আছেন সকাল থেকে।

সোবাহান উৎসাহ দেখাল না। তার ভাই মাসে একবার করে আসেন। তাঁর আসা এমন কোনো বড় ব্যাপার নয়।

ভাত খেতে গেছেন রশীদের হোটেলে। ওইখানে দেখা পাবেন।

সোবাহান ধীরেসুস্থে জামা কাপড় খুলল। গা ঘামে চট চট করছে। জলিল সাহেব বললেন, পানি নাই, গোসল করতে পারবেন না।

পানি নাই ?

এক বালতি ছিল—আপনার ভাই শেষ করেছেন। গ্রামের মানুষ বেশি পানি ছাড়া গোসল করতে পারে না। আমি বলেছিলাম আধা বালতি খরচ করতে।

আপনি আজ অফিসে যান নাই ?

নাহ। ঘুম থেকেই উঠলাম সাড়ে এগারোটায়। নাস্তা টাস্তা কিছুই করি নাই। একবার ভাবলাম আপনার ভাইর সঙ্গে যাই, চারটা খেয়ে আসি।

গেলেন না কেন ?

ভাতের কথা মনে উঠতেই বমি ভাব হলো, বুঝলেন।

কিছুই খান নাই ?

পানি খেয়েছি দু'গ্লাস।

সোবাহান গা-ভর্তি ঘাম নিয়ে চৌকির ওপর বসে রইল। এ বাড়িতে পানির বড় কষ্ট। রাত আটটার আগে পানি পাওয়ার আজ আর আশা নাই।

সোবাহান সাহেব।

জি।

খাওয়াদাওয়া করবেন না ?

নাহ।

সোবাহান সিগারেট ধরাল। ঘামে ভেজা শরীর। গুমোট গরম। জিভে জ্বালা ধরানো সিগারেট। কী কুৎসিত! কী কুৎসিত!

সোবাহান সাহেব।

বলেন।

আপনি যাওয়ার পরপরই আপনার বন্ধু এসেছিল। বুলু সাহেব। বেশিক্ষণ বসেনি।

বলেছে কিছু ?

টাকা দিয়ে গেছে পাঁচটা। আপনার কাছ থেকে নাকি ধার নিয়েছিল। টেবিল ক্লথের নিচে রেখে দিয়েছি, দেখেন।

সোবাহান ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। বুলু নিশ্চয়ই এই পাঁচ টাকা ফেরত দেওয়ার জন্যে ছ'মাইল হেঁটে এসেছে। এবং হেঁটেই ফিরে গেছে। বাড়তি পয়সা খরচ করার মতো অবস্থা বুলুর না। বুলুর অবস্থা তার চেয়েও খারাপ। সোবাহান হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল, বড় ক্লান্তি লাগছে।

সোবাহানের বড়ভাই ফরিদ আলির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। লোকটির চেহারা ও চালচলন নির্বোধের মতো। নির্বোধ লোকদের প্রচুর বন্ধু-বান্ধব থাকে। তাঁরও আছে। সাগর রেস্টুরেন্ট এন্ড হোটেলের মালিক রশীদ মিয়ার সঙ্গে তাঁর খুব খাতির। তার জন্যে গতবার দু'টা আমগাছের কলম নিয়ে এসেছিলেন। এবারো কিছু এনেছেন নিশ্চয়ই। সোবাহান দেখল ঘরের এক কোনায় একটা পাকা কাঁঠাল, পলিথিনের ব্যাগ-এ ভর্তি কাঁচা আম। এইসব কার জন্যে এনেছেন কে জানে।

কাঁচা আম কার জন্যে ?

আমাদের বাড়িওয়ালার জন্যে। তিনি নাকি গতবার কাঁচা আমের কথা বলে দিয়েছিলেন। কাশ্মিরি আচার হবে। আপনার বড়ভাই কিন্তু মাইডিয়ার লোক। খুব মাইডিয়ার।

জলিল সাহেব টেনে টেনে হাসতে শুরু করলেন। এর মধ্যে হাসির কী আছে কে জানে। বড়ভাইরা মাইডিয়ার হতে পারেন না ?

কাঁঠালটা এনেছেন আমার জন্যে।

কাঁঠালের কথা বলেছিলেন নাকি ?

না। কাঁঠাল আমি সহ্য করতে পারি না। কাঁঠাল হচ্ছে শিয়ালের খাদ্য। জ্যাকফ্রুট। আপনার ভাই বললেন—এই কাঁঠালের নাম নাকি দুধসাগর। কাঁঠালের এরকম বাহারি নাম থাকে জানতাম না।

থাকে, অনেক রকম নাম থাকে।

যা-ই থাকুক। কাঁঠাল কাঁঠালই, কী বলেন ? কাঁঠাল তো আর আপেল না ?

সোবাহান কিছু বলল না। জলিল সাহেব বললেন, কি, খাওয়াদাওয়া করবেন না ?

নাহ।

কোনো কাজ হয় নাই আজ ?

নাহ।

ভদ্রলোক কি স্ট্রেট নো বলে দিল ?

উনার সঙ্গে দেখা হয় নাই।

চাকরি দেনেওয়ালারা হচ্ছে ভগবানের মতো। এদের সহজে দেখা পাওয়া যায় না। এরা প্রায় অদৃশ্য। হা হা হা।

সোবাহান শুয়ে পড়ল। ঘামে ভেজা গা। অসহনীয় গরম। তবু এর মধ্যেই সে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়ল। শুধু ঘুম নয়, ছোটখাটো একটা স্বপ্নও দেখল। একটা নদীর পারে সে বসে আছে। নদীতে একহাঁটু মাত্র পানি। ইচ্ছা করলেই পার হওয়া যায়। কিন্তু সে পার হতে পারছে না। তার কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে। অন্যান্য অর্থহীন স্বপ্নের মতো একটা অর্থহীন স্বপ্ন। দারুণ অস্বস্তি নিয়ে সে জেগে উঠে দেখে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। জলিল সাহেব নেই। তার বড়ভাই ফরিদ আলি জায়নামাজ পেতে চোখ বন্ধ করে গম্ভীর হয়ে বসে আছেন। তিনি মাথা ঘুরিয়ে বললেন, কিরে শরীর খারাপ ?

না।

অসময়ে ঘুমাচ্ছিস ?

সোবাহান গম্ভীর স্বরে বলল, দাড়ি রাখলেন কবে!

ফরিদ আলি মনে হলো লজ্জা পেলেন। মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

ভাবি লিখেছিলেন আপনি ধর্ম নিয়ে মেতেছেন। দাড়ি রাখার কথা লেখেন নাই।

ধর্মকর্ম করা কি দোষের ?

দাড়িতে আপনাকে মানায় না।

মানামানির তো কিছু নাই। দাড়ি তো আর গয়না না।

সোবাহান দেখল তাঁর পোশাক-আশাকও বদলেছে। লম্বা একটা পাঞ্জাবি পরেছেন। চোখে হয়তো সুরমাও আছে। কথাবার্তার ধরন ধারণও অন্যরকম। বেশ জোরের সঙ্গে কথা বলছেন। নামাজ শেষ করতে তাঁর অনেক সময় লাগল। তারপরও দীর্ঘ সময় চোখ বন্ধ করে জায়নামাজের ওপর বসে রইলেন। পীর-ফকির হয়ে গেলেন নাকি ? সোবাহান বারান্দায় গিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। পীর ফকির হয়ে যাওয়া বিচিত্র কিছু না। তাদের

বংশে এটা আছে। তাঁর বাবা নিজেই একচল্লিশ বছর বয়সে কী একটা স্বপ্ন দেখে অন্যরকম হয়ে গেলেন। স্কুল মাস্টারি ছেড়ে দিয়ে এক সন্ধ্যাবেলা ঘোষণা করলেন, বাংলাদেশে যত মাজার আছে তার প্রতিটিতে এক রাত করে কাটাবেন। তাঁর ওপর নাকি এরকম একটা নির্দেশ আছে। নির্দেশ কে দিয়েছেন কিছুই জানা গেল না, তবে এক সকালবেলা তিনি সত্যি সত্যি বেরিয়ে পড়লেন। গৌতম বুদ্ধের গৃহত্যাগ নয়, গৃহী মানুষের গৃহত্যাগ। বহু লোকজন এল। রীতিমতো রোমাঞ্চকর ব্যাপার। সোবাহান তখন পড়ে ক্লাসে ফাইভে। তার বাবাকে নিয়েই এমন উত্তেজনা, এটা তাকে অভিভূত করে ফেলল। এবং আরও অনেকের সঙ্গে সেও এগারো মাইল হেঁটে তাঁকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এল।

তিনি ফিরে এলেন তিন সপ্তাহের মাথায়। দেখা গেল খালি হাতে আসেননি। সবার জন্যেই কিছু না কিছু এনেছেন। মার জন্যে টাঙ্গাইলের শাড়ি। (সে শাড়ি মার পছন্দ হয়নি। জমিন মোটা)। সোবাহানের জন্যে একটা পিস্তল যা টিপতেই প্রচণ্ড একটা শব্দ হয় এবং নল দিয়ে খানিকটা ধোঁয়া বের হয়। ফরিদ আলির জন্যে বার্মিজ লুঙ্গি। রীতিমতো একটি উৎসব। সেবার তিনি প্রায় মাসখানিক থাকলেন। তারপর আবার গেলেন। আর ফেরার নাম নেই। সংসারে নানান অশান্তি। ফরিদ আলি আইএ ফেল করেছে। শুধু তাই নয়, যে বাড়িতে জায়গির থেকে পড়ত সে বাড়ির একজন বিধবা মহিলার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। মহিলাটি তার মায়ের বয়েসী। গল্প-উপন্যাসের জেদি প্রেমিকদের মতো একদিন সে ঘুমের ওষুধও খেয়ে ফেলল। বিশ্রী অবস্থা। হাসপাতালে দিন সাতেক কাটানোর পর তাকে বাড়িতে নিয়ে আসা হলো এবং বারো বছরের একটি কিশোরীর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দেওয়া হলো। মেয়েটির নাম ময়না।

সোবাহানের বাবা ছেলের বিয়ের পরদিন এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে চেনার উপায় নেই। মুখভর্তি দাড়ি গোঁফ। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা বাবরি চুল। চিরুনি দিয়ে আঁচড়ালে টপ টপ করে সেখান থেকে উকুন পড়ে। সেসব উকুনের সাইজও প্রকাণ্ড। উকুন মারার ব্যাপারে তিনি খুব উৎসাহিত হয়ে পড়লেন। ঠিক কতগুলি উকুন মারা পড়েছে তার হিসাব রাখতে লাগলেন। যেমন একদিন সর্বমোট সাতাত্তরটি উকুন মারা পড়ে। এটিই সবচেয়ে বড় রেকর্ড। তিনি এই খবরটি হাসিমুখে অনেককেই দিলেন, যেন এটা তাঁর বিরাট একটা সাফল্য।

বড় ছেলের বিয়ের ব্যাপারেও তিনি দারুণ উৎসাহ প্রকাশ করতে থাকেন। মেয়েটি যে অত্যন্ত সুলক্ষণা এই কথা অসংখ্যবার বলতে লাগলেন। তিনি নাকি ইস্তেখারা করে এই বিয়ের কথা জানতে পেরেই ছুটে এসেছেন। তাঁকে সময় অসময়ে বালিকা পুত্রবধূটির সঙ্গে গল্পগুজব করতে দেখা গেল। প্রায় বছর খানিক তিনি থাকলেন, তারপর আবার গেলেন এবং তাঁর আর কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। ফরিদ আলি আইএ পাশ করলেন। বিএ ক্লাসে ভর্তি হলেন এবং বিএ পরীক্ষায় যথাসময়ে ফেল করলেন। সোবাহান আইএ পাশ করল। ঢাকা শহরে চাকরির চেষ্টা করতে লাগল। কলেজে ভর্তি হয়ে তেমন কোনো পড়াশোনা ছাড়াই একসময় বিএ পাস করে ফেলল।

সোবাহান।

জি।

বারান্দায় বসে আছিস কেন? ভেতরে আয়।

সোবাহান নড়ল না। বেশ বাতাস দিচ্ছে। ভালোই লাগছে বসে থাকতে। ফরিদ আলি আবার ডাকলেন, আয়, ভেতরে আয়, কথা বলি।

সোবাহান ভেতরে এসে ঢুকল।

খালি গায়ে বারান্দায় বসাটা ঠিক না। মেয়েছেলে আছে।

সোবাহান কিছু বলল না। ভেতরে চলে এল।

কী বলবেন।

তোদের বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক আমাকে রাতে খেতে বলেছেন।

সোবাহান ভ্রূ কুঁচকাল।

খেতে বলল কেন?

অসুবিধা কী? আদর করে বলেছে।

যান, খেয়ে আসেন। তার জন্যে কাঁচা আম এনেছেন দেখলাম।

আমের কথা বলেছিলেন গতবার।

বলেছিল বলেই ঘাড়ে করে এক বস্তা আম নিয়ে আসবেন?

ঘাড়ে করে আনব কেন? তুই এরকম করছিস কেন? ভদ্রলোকের সঙ্গে খাতির নাই?

বাড়িওয়ালার সাথে বাড়তি খাতির কিসের?

এটা ঠিক না। সবার সাথে মিল মহব্বত থাকা দরকার।

সোবাহান চুপ করে গেল। কথা বলতে আর ভালো লাগছে না।

তোর ভাবি যেতে বলেছে। অনেকদিন দেশে যাস না।

যাব।

আমার সঙ্গে চল। আমি কাল সকালে রওনা হব।

না। এখন যাওয়া যাবে না।

অসুবিধা কী?

একটা চাকরির ব্যাপারে খোঁজখবর করছি।

তোর ভাবি বলল চাকরি-বাকরি না হলে ব্যবসা-বাণিজ্য দেখতে।

টাকা আসবে কোত্থেকে?

উত্তর বন্দের জমিটা বিক্রি করে দেব। এখন জমির খুব দাম।

জমি বিক্রি করার দরকার নাই।

ফরিদ আলি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর নিচুগলায় বললেন—জমিটা এমনিতেই বিক্রি করতে হবে। আমার নিজের কিছু টাকা দরকার। বিশেষ দরকার।

কেন ?

একটা নামাজঘর। ধর্মীয় বইপুস্তক থাকবে। ঘরটা পাকা করার ইচ্ছা।

ও।

এইজন্যেই এলাম। তোর মত ছাড়া তো জমি বিক্রি হবে না। কাগজপত্র নিয়ে এসেছি। সই করে দিস। রেজিস্ট্রেশনের সময় তোর যাওয়ার দরকার হবে।

কতটা জমি ?

ফরিদ আলি তার উত্তর দিলেন না। এরকম ভাব করলেন যেন শুনতে পাননি। তিনি বদলে যাচ্ছেন। কথাবার্তা যা বলার স্পষ্টভাবে বলছেন। ভাষাটাও শহুরে। তার মানে ইদানীং প্রচুর কথা বলছেন। নানা ধরনের লোকজনের সঙ্গে কথা বলছেন। সোবাহান বলল, আপনার কাছে এখন লোকজন আসে বোধহয়। আসে না ?

আসে কেউ কেউ।

কী জন্যে আসে ?

ধর্মের কথা শুনতে চায়। পরকালের কথা শুনতে চায়।

পরকালের কথা আপনি জানেন ?

যা জানি তা-ই বলি।

সারা দিন কি ধর্মকর্ম করেন ?

আরে না। আমি সংসারী মানুষ। এত সময় কই ?

ভাব ভঙ্গি তো সেরকম দেখি না।

ফরিদ আলি প্রসঙ্গ বদলাতে চেষ্টা করলেন। হালকা গলায় বললেন, তোর এখানে বড় গরম।

হুঁ।

নীলগঞ্জেও গরম, তবে সন্ধ্যার পর আমগাছটার নিচে বসি। বেশ বাতাস। ভালোই লাগে।

লোকজনদের বাণী-টাণী যা দেন সব আমগাছের নিচে বসেই দেন ?

ফরিদ আলি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

৪

মনসুর সাহেবকে বাড়িওয়ালা বলা ঠিক না, কারণ তিনি বাড়িওয়ালা নন। বাড়ি সরকারের। মনসুর সাহেব ফুড ইন্সপেক্টর হিসেবে একটা পরিত্যক্ত বাড়ি কীভাবে যেন পেয়ে গেছেন। ইদানীং তিনি এ বাড়িটিকে নিজের বাড়ির মতো দেখেন। সরকার এইসব বাড়ি নাকি এলটিদের মধ্যে বিক্রি করবেন এরকম গুজব শোনা যাচ্ছে। তবে যাদের দেওয়া হবে তাদের শহীদ পরিবার কিংবা মুক্তিযোদ্ধা হতে হবে। মনসুর সাহেব এর কোনোদলেই পড়েন না, তবু তিনি বহু হাঙ্গামা করে কিছু সার্টিফিকেট যোগাড় করেছেন। যার ভাবার্থ হচ্ছে—'তাঁর বাড়িটি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের লুকিয়ে থাকার একটি আদর্শ স্থান।

তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে তাঁর ঘরে বিস্ফোরক লুকিয়ে রাখতেন। এ করতে গিয়ে মে মাসে তিনি গ্রেফতার হন এবং আট দিন সীমাহীন নির্যাতনের শিকার হন। তাঁর বাঁ পা-টি প্রায় অকর্মণ্য হয়ে পড়ে।'

এসব সার্টিফিকেটের কপি তিনি সরকারের কাছে জমা দিয়েছেন। সেক্রেটারিয়েটে তাঁর ধরাধরির কোনো লোক নেই। এ জন্যে কাগজপত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নড়াতে তার প্রচুর পরিশ্রম হচ্ছে। অর্থ ব্যয়ও হচ্ছে। মাসে দুতিন দিন তিনি সেক্রেটারিয়েটে সারা দিন কাটান। এক অফিস থেকে অন্য অফিসে যাওয়ার সময় পা টেনে টেনে হাঁটেন।

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, আজকাল সত্যি সত্যি বাঁ পায়ে তিনি জোর পান না। পা-টা যেন অচল হয়ে পড়ছে। তাতে কিছু আসে যায় না। আসল কথা—বাড়িটার বন্দোবস্ত নেওয়া। একতলা বাড়ি। দোতলায় দুটি ঘর তোলা শুরু হয়েছিল, শেষ হয়নি। তিনি ইচ্ছা করলে শেষ করে ভাড়া দিতে পারেন, কিন্তু তাঁর সাহসে কুলায় না। ভাড়াটেরা একটা ঝামেলা করতে পারে। হয়তো দেখা যাবে ভাড়াটেরা একটা শহীদ পরিবার। তারা সরকারের কাছ থেকে এলটমেন্ট জোগাড় করে ফেলবে—তিন ঝামেলা।

বাইরের একটা ঘর তিনি জলিল সাহেবকে ভাড়া দিয়েছেন। চেনা লোক। সে আবার আরেকজনকে নিয়ে এসেছে। মাসের শেষে দেড়শ টাকা আসছে। এমন কিছু বড় এমাউন্ট না, কিন্তু দুটি পুরুষমানুষ থাকলে মনের মধ্যে সাহস থাকে। পরিত্যক্ত বাড়িগুলির নানা ফ্যাকড়া। হুটহাট করে পার্টি বের হয়ে পড়ে, যারা দাবি করে এই বাড়ি তাদের কেনা। দখল নিতে আসে। তবে এ বাড়ি নিয়ে এখনো তেমন কিছু হয়নি। সবকিছু খুব সহজভাবে এগুচ্ছে। তবু একটা অশান্তি থাকেই। সবসময় ভয় হয় শেষ পর্যন্ত একটা কিছু ঝামেলা লেগে যাবে।

মনসুর সাহেব আছেন ?

আসেন ভাই, আসেন।

তিনি হাসিমুখে দরজা খুলে দিলেন—আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

ফরিদ আলি ইতস্তত করতে লাগলেন, কারণ ঘরে শাড়ি পরা একটা অল্পবয়স্কা মেয়ে বসে আছে।

ও হচ্ছে যূথি। আমার শ্যালিকা। যূথি, সালাম করো।

যূথি স্লামালিকুম বলে বিব্রত ভঙিতে উঠে দাঁড়াল। জব্বার সাহেব বিরক্ত ভঙিতে বললেন, পা ছুঁয়ে সালাম করো। এইসব শিখিয়ে দিতে হয় ?

মেয়েটি ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ফরিদ আলি গম্ভীর গলায় বললেন, না না, সালাম করতে হবে না। পা ছুঁয়ে সালাম করা ঠিক না। এতে মাথা নিচু করতে হয়। আমরা মুসলমানরা আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে মাথা নিচু করি না।

যূথি তাকিয়ে রইল। মেয়েটা সুন্দর, তবে বড় রোগা। দেখলেই মনে হয় অসুস্থ। ফরিদ আলি বললেন, তুমি কী পড় ? জবাব দিলেন মনসুর সাহেব, মেট্রিক পাস করে বসে আছে। থার্ড ডিভিশনে পাস করেছিল। কলেজে ভর্তি করতে পারি নাই। সেকেন্ড

ডিভিশন ছাড়া কোনো কলেজে নেয় না। বিয়ে দিয়ে দিব, ছেলে খুঁজছি। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি নাই, আমিই গার্জিয়ান। যূথি, যাও, খাবারটাবার দিতে বলো। দাঁড়িয়ে আছ কেন ?

মনসুর সাহেব অকারণে রেগে গেলেন। ফরিদ আলি বললেন, আপনার বাড়ি খুব সুন্দর। ভেতরে অনেক জায়গা মনে হয়।

তা জায়গা আছে। তবে বাড়ি এখনো আমার হয় নাই। চেষ্টা করছি কেনার। হাজার রকমের ফ্যাকড়া।

তাই নাকি ?

আর বলেন কেন ? আপনারা সুফি মানুষ, দুনিয়ার হালচাল তো জানেন না।

মনসুর সাহেব দীর্ঘ সময় ধরে পরিত্যক্ত বাড়ি সম্পর্কে বলতে লাগলেন। ফরিদ আলি তাকিয়ে রইলেন আগ্রহ নিয়ে।

সেক্রেটারিয়েটের চেয়ার টেবিলগুলি পর্যন্ত টাকা খায়।

এইসব কেয়ামতের নিশানা। কেয়ামতের আগে আগে পৃথিবী থেকে আল্লাহপাক সমস্ত সৎ মানুষ তুলে নিবেন। মা তার ছেলেকে বিশ্বাস করবে না। স্ত্রী বিশ্বাস করবে না স্বামীকে!

মনসুর সাহেব ধর্মীয় আলোচনায় বিশেষ উৎসাহ দেখালেন না। তাকিয়ে রইলেন ভাবলেশহীন চোখে। খাবারদাবার যূথি নিয়ে এল। ঘরে কোনো কাজের লোক নেই। যূথিকেই বারবার আসা-যাওয়া করতে হচ্ছে। ডালের বাটি আনার সময় খানিকটা ডাল ছলকে পড়ল। মনসুর সাহেব ধমকে উঠলেন, দেখেশুনে হাঁটো! অন্ধ নাকি ? একটা কাজও ঠিকমতো হয় না।

ফরিদ আলি বললেন, আপনার স্ত্রী কোথায় ?

ও অসুস্থ, শুয়ে আছে।

অসুখবিসুখের মধ্যে ঝামেলা করলেন কেন ?

অসুখবিসুখ লেগেই আছে, ওটা বাদ দেন।

একটিই শালী আপনার ?

জি-না! তিনজন। দু'জনকে বিয়ে দিয়েছি। এইটি বাকি। শালী পার করতে গিয়ে মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে বুঝলেন ?

ফরিদ আলি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে পাশেই। এটা সেটা এগিয়ে দিচ্ছে।

দেখেন না ভাই, একটা ছেলে জোগাড় করতে পারেন কিনা। কিছু খরচপাতি করব। উপায় কী বলেন ?

ফরিদ আলি তাকালেন মেয়েটির দিকে। এ জাতীয় কথাবার্তা শুনে বোধহয় তার অভ্যাস আছে। সে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। মেয়েটা সুন্দর তবে রোগা, বেশ রোগা। মনসুর সাহেব ক্লান্তগলায় বললেন, একটু দেখবেন। আমার খুব উপকার হয়।

জি, আমি দেখব।

ছেলে ভালো হলেই হবে, আর কিছু লাগবে না। ভদ্র ফ্যামিলির ভদ্র ছেলে। ব্যস, আর কোনো ডিমান্ড নাই।

আমি দেখব।

ফরিদ আলি আবার তাকালেন মেয়েটির দিকে। বাচ্চা মেয়ে। মিষ্টি চেহারা। বড় মায়া লাগে। ফরিদ আলি ভাত মাখাতে মাখাতে বললেন, আমার ছোটভাইকে কি আপনার পছন্দ হয়? ও বিএ পাশ করেছে। চাকরিবাকরি অবশ্যি এখনো কিছু পায় নাই। বলেই তিনি তাকালেন মেয়েটির দিকে। মেয়েটি খুবই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

পছন্দ হলে আমাকে বলবেন। কালকের মধ্যে বলবেন। আমি পরশু দিন সকালে চলে যাব।

সে বিয়ে করতে রাজি হবে?

আমি বললে হবে।

ফরিদ আলি খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। মেয়েটি তখনো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

খুব ভালো খেলাম ভাই। শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।

মনসুর সাহেব ধমকে উঠলেন—যূথি, হাত ধোয়ার পানি দাও। দাঁড়িয়ে আছ কেন?

যূথি যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনি রইল, নড়ল না। এই প্রথম বোধহয় তার দুলাভাইয়ের কথার অবাধ্য হলো। ভেতরে থেকে মেয়েলি গলায় ডাকল, যূথি, ও যূথি।

যূথি নিঃশব্দে ভেতরে চলে গেল। ফরিদ আলি বললেন, আপনার স্ত্রীর কী অসুখ?

মনসুর সাহেব বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকালেন।

মাথা খারাপ। মাথার দোষ।

তাই বুঝি?

জি। খুব অশান্তিতে আছি।

কথাটা বলেই মনসুর সাহেবের মনে হলো এটা ঠিক হলো না। তিনি শুকনো গলায় বললেন, তবে ভাই বংশগত নয়। টাইফয়েডের পর এরকম হয়েছে। তাদের বংশে পাগল নাই।

অসুখবিসুখের ওপর মানুষের হাত নাই।

পান খাবেন ফরিদ সাহেব?

জি-না, আমি পান-তামাক কিছু খাই না।

সুফি মানুষ আপনারা।

মনসুর সাহেব একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। বাড়ির ভেতর থেকে কান্নার শব্দ শোনা যেতে লাগল। বড় বিরক্তিকর ব্যাপার। মনসুর সাহেব গলাখাঁকারি দিলেন।

কোনো লাভ হলো না। কান্নার শব্দ বাড়তে লাগল। ফরিদ আলি বসে আছেন চুপচাপ। যেন তাঁর উঠবার কোনো তাড়া নেই। বসে থাকবার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সহজে উঠবেন না।

ফরিদ সাহেব!

জি।

রাত কত হয়েছে ?

জানি না, আমার কাছে ঘড়ি নাই।

মনসুর সাহেব বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকালেন। এই লোক সহজ ইংগিতও ধরতে পারছে না। খাল কেটে কুমির আনা একেই বলে। দিব্যি পা উঠিয়ে চেয়ারে বসে আছে। অবিবেচক মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে এত বেশি কেন ? মনসুর সাহেব কর্কশ গলায় বললেন, যূথি, পান দিতে হবে না ? ফরিদ আলি বললেন, পান আমি খাই না।

আপনার জন্যে না। আমার নিজের জন্যে।

ও আচ্ছা।

ফরিদ আলি আবার নিঃশব্দ হয়ে গেলেন। তিনি কি আজ সারা রাতই এভাবে বসে কাটাবেন ?

যূথি ঘুমোতে যায় অনেক রাতে। এ বাড়িতে কোনো কাজের লোক নাই। রান্নাঘর গুছিয়ে উঠতেই অনেক সময় লাগে। সে দ্রুত কিছু করতে পারে না। তার ওপর তার পরিষ্কারের বাতিক আছে। সবসময় মনে হয় ঠিকমতো ধোয়া হলো না বুঝি। প্লেটের কোথাও বুঝি সাবানের ফেনা লেগে আছে।

আজও সব কাজ সারতে সারতে রাত একটা বেজে গেল। যূথি ঘুমোতে যাওয়ার আগে একবার খোঁজ নিতে গেল মনসুর সাহেবের কিছু লাগবে কিনা। মনসুর সাহেবের অনিদ্রা রোগ আছে। তিনি অনেক রাত পর্যন্ত জাগেন। আজও জেগে ছিলেন। যূথিকে ঢুকতে দেখে চোখ তুলে তাকালেন।

দুলাভাই, কিছু লাগবে ?

না না, কিছু লাগবে না। ঘুমাও নাই এখনো ?

যূথি সরু চোখে তাকিয়ে রইল। মনসুর সাহেবের গলার স্বর অনেকখানি নেমে এসেছে। যূথি অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। মাঝে মাঝে মনসুর সাহেব এরকম নরম স্বর বের করেন। সেটা হয় মধ্যরাতের দিকে।

যূথি!

জি।

তোমার আপা ঘুমাচ্ছে নাকি ?

জি।

আমার জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল, বুঝলে যূথি। সংসার করা কাকে বলে জানলামই না।

যূথি উঠে দাঁড়াল। মনসুর সাহেব বললেন, বসো না আরেকটু।

যূথি দাঁড়িয়ে রইল। কী করবে সে বুঝতে পারছে না। দুলাভাই অন্যরকমভাবে তাকাচ্ছেন।

রাত হয়ে গেছে। আমি যাই দুলাভাই।

যূথি ঘুমায় তার বড় বোন কদমের সঙ্গে। মনসুর সাহেব তার স্ত্রীর সঙ্গে ঘুমান না। সোজাসুজিই বলেন—মাথার ঠিক নাই তার, কোন সময় কী করবে ঠিক আছে? হয়তো ঘুমের মধ্যেই চোখ গেলে দিবে। তখন?

তার ভয়টা অমূলক। কদমের অসুস্থতা সে পর্যায়ের নয়। সে প্রায় সময়ই কাঁদে। এবং বাকি সময়টা সিডেটিভের কল্যাণে ঘুমায়। যূথি এসে ডাকল—আপা, ঘুমিয়েছ?

না।

ক্ষিধে লেগেছে? কিছু খাবে?

না।

মাথায় হাত বুলিয়ে দেব আপা?

দে।

যূথি বাতি নিভিয়ে কদমের পাশে এসে বসল। চুল টেনে টেনে দিতে লাগল। কদম বলল, দাড়িওয়ালা লোকটা কে? কী জন্যে এসেছিল?

দাওয়াত খেতে এসেছিল।

দাওয়াত খেতে এল কেন?

যূথি জবাব দিল না। কদমও জবাবের অপেক্ষা করল না। ঘুমিয়েও পড়ল না। যূথির ঘুম আসছিল না। সে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইল। বারান্দায় দুলাভাই হাঁটাহাঁটি করছেন। তিনি একবার দরজার পাশে এসে ডাকলেন—যূথি, যূথি। যূথি জবাব দিল না। বেশ গরম, তবু সে একটা কাঁথা পর্যন্ত টেনে দিল। তার মনে হলো সেও বোধহয় আপার মতো একসময় পাগল হয়ে যাবে। এটা তার প্রায়ই মনে হয়।

৫

সোবাহান ঘুমিয়ে ছিল। বুলু এসে তাকে ডেকে তুলল—কিরে, অবেলায় ঘুমাচ্ছিস কেন?

সোবাহান কিছু বলল না। বুলু বলল, ওইদিন সাতসকালে কোথায় গিয়েছিলি?

চাকরির ব্যাপারে।

কী রকম বুঝলি, আশা আছে?

হুঁ।

বুলুর মুখ উজ্জ্বল হলো মুহূর্তেই। হাসিমুখে বলল, তোরটা হলেই আমারটা হবে। রাশির একটা ব্যাপার আছে। আমাদের দুজনের সবকিছু একসঙ্গে হয়। ঠিক না?

সোবাহান জবাব দিল না। বুলু বলল, এরকম গম্ভীর হয় আছিস কেন ? শরীর খারাপ ?

না, শরীর ঠিকই আছে।

অবেলায় ঘুমোচ্ছিলি কেন ?

এ ছাড়া করবটা কী ?

সোবাহান কাপড় পরতে শুরু করল। লুঙ্গি বদলে প্যান্ট পরল। বুলু বিস্মিত হয়ে বলল, বেরুচ্ছিস নাকি ?

হ্যাঁ।

কোথায় ?

চা খেতে। ওই মোড়ের দোকানে চা খাব। মাসকাবারি ব্যবস্থা আছে। চল যাই।

চা খাব নারে। ভাত খাব। ক্ষিধে লেগেছে।

সোবাহান কিছু বলল না। বুলু বলল, খাওয়া হয় নাই। মামার সঙ্গে একটা ফাইটিং হয়ে গেল।

তাই নাকি ?

হুঁ। চোর টোর বলল। মামিকে বলে গেছে—আমাকে ভাত দিলে তিন তালাক হয়ে যাবে। চিন্তা কর অবস্থা!

বলিস কী ?

কেলেংকারি কাণ্ড। মামি কাঁদছে। বাচ্চাগুলি কাঁদছে।

বাচ্চারা কাঁদছে কেন ?

সবচেয়ে ছোটটাকে মামা একটা কিক বসিয়ে দিয়েছে। রাগলে তার মাথা ঠিক থাকে না। মহা ছোটলোক। একদিন শুনবি শালাকে আমি খুন করে ফেলেছি।

বুলু তিন প্লেট ভাত খেয়ে ফেলল। সোবাহান বলল, আর কিছু খাবি ? দৈ মিষ্টি ?

বুলু মাথা নাড়ল।

খা, অসুবিধা কিছু নাই। এখন টাকা দিতে হবে না।

না, আর কিছু না। সিগারেট দে। আছে ?

আছে।

বুলু চোখ বন্ধ করে সিগারেট টানতে লাগল। বুলুর চেহারাটা চমৎকার। ফর্সা গায়ের রঙ। মেয়েদের মতো চিবুক। বড় বড় চোখ। তাকে দেখলেই মনে হয় সিনেমার কোনো নায়ক বেকার যুবকের ভূমিকায় পার্ট করছে।

বুঝলি সোবাহান, মামির জন্যে টিকে আছি। মামির দিকে তাকিয়েই ওই শালাকে খুন করতে পারছি না।

তুই এখন কী করবি ?

কিছু করব না। সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরব। এর মধ্যে মামা কিছুটা ঠান্ডা হবে আশা করা যায়।

সন্ধ্যা হতে তো দেরি আছে। এতক্ষণ কী করবি ? আমার সঙ্গে চল।

না, তোর ওখানে যাব না। ঘরটা ভালো না। ঢুকলেই দম বন্ধ হয়ে আসে। আসি। আমি কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করব।

টাকাপয়সা আছে তোর কাছে ?

না।

দশটা টাকা নে আমার কাছ থেকে।

আরে না, টাকা থাকলেই খরচ হয়ে যাবে। তুই বরং এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দে। আমার একটা বাকির দোকান ছিল। ব্যাটার ভগ্নিপতি মারা গেছে। দোকান বন্ধ করে গেছে দেশে।

বুলু উঠে দাঁড়াল। সোবাহান তাকে এগিয়ে দিতে গেল। বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত তারা হাঁটল নিঃশব্দে। বুলুর মুখে গাঢ় দুশ্চিন্তার রেখা। হাঁটছে মাথা নিচু করে। সোবাহান বলল, আমার সঙ্গে এসে কিছুদিন থাকতে পারিস। থাকবি ?

আরে না।

আমার সঙ্গে দেশে যাবি ? কয়েকদিন থেকে আসব।

বুলু জবাব দিল না।

জায়গাটা ভালো। তোর পছন্দ হবে।

বুলু সিগারেট ধরাল। তার সম্ভবত কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।

৬

রহমান সাহেব আজ অফিসে এসেছেন। তার পিএ বলে দিয়েছে এগারোটায় একটা বোর্ড মিটিং আছে, মিটিংয়ের আগে বড় সাহেব কারও সঙ্গে দেখা করবেন না। সোবাহান জিজ্ঞেস করল, বোর্ড মিটিং শেষ হতে কতক্ষণ লাগবে ?

পিএটি বিরক্ত মুখে বলল, তা কী করে বলব ? কী কী এজেন্ডা আছে তার ওপর ডিপেন্ড করে। লাঞ্চ টাইমের আগেই শেষ হবে। লাঞ্চের পরে আসেন। এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন না।

সোবাহান তবু খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। এই মেয়েটির কথাবার্তায় অপমান করার চেষ্টা আছে। অথচ কেমন ভদ্র, বড় বোন বড় বোন চেহারা!

এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। কাজের ক্ষতি হয়। ওয়েটিং রুমে গিয়ে বসুন।

একটা স্লিপ কি দয়া করে পাঠাবেন ? আমার সঙ্গে তাঁর আগে কথা হয়েছে। উনি আমাকে চিনেন।

চিনলেও কোনো কাজ হবে না। বোর্ড মিটিংয়ের আগে তিনি কারও সঙ্গে দেখা করবেন না। আপনি নিচে গিয়ে বসুন। এক কথা কবার বলব!

সোবাহান নিচে নেমে এল। রিসিপশনের মেয়েটি আজ একটা আগুন রঙের সিল্কের শাড়ি পরে এসেছে। তাকে চেনাই যাচ্ছে না। মেয়েদের সৌন্দর্যের বেশির ভাগই বোধহয়

তাদের শাড়ি গয়নায়। সোবাহান এগিয়ে এসে পরিচিত ভঙিতে হাসল। মেয়েটি তাকাল অবাক হয়ে। সোবাহানকে কি চিনতে পারছে না ? গতকালই তো অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়েছে। মেয়েটি বলল, আপনি কি আমাকে কিছু বলছেন ?

জি-না। আমি রহমান সাহেবের কাছে এসেছি।

উনি খুব সম্ভব বোর্ড মিটিং-এ আছেন। উনার পিএ বসেন দোতলায়। রুম নম্বর ৩০২।

উনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।

ও আচ্ছা।

মেয়েটি একটি টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সোবাহানকে সত্যি সত্যি চিনতে পারছে না ? অপমানিত হওয়ার মতো ব্যাপার। সোবাহানের কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল।

আমি গতকাল এসেছিলাম। আপনি বলেছিলেন আজ আসতে।

আমার মনে আছে। আপনি থাকেন শ্যামলীতে। বসুন ওখানে।

সোবাহান বসে রইল।

রহমান সাহেব একটার সময় লাঞ্চ খেতে গিয়ে আর ফিরলেন না। পিএটির সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করে না। তবু তিনটার দিকে সোবাহান গেল তার কাছে। মেয়েটি শুকনো গলায় বলল, দুটোর দিকে তো চলে গেছেন।

আজ আসবেন কি আসবেন না বলে যাননি ?

আমাকে বলে যাবেন কেন ? আমি কি এখানকার হেড মিসট্রেস ? উনি কখন আসবেন না আসবেন সেটা তাঁর ব্যাপার।

এমন ভদ্র চেহারা মেয়েটির। শালীন পোশাকআশাক, অথচ কথাবার্তা বলছে ছোটলোকের মতো। সোবাহান কিছু বলবে না বলবে না ভেবেও বলে বসল, ভদ্রভাবে বলেন।

ভদ্রভাবে কথা বলব মানে ?

মেয়েটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে গেল। সোবাহান শান্তস্বরে বলল, আপনার কথাবার্তা রাস্তার মেয়েদের মতো।

তার মানে ? তার মানে ?

মেয়েটি রাগে কাঁপছে। তার পাশের টেবিলের বুড়ো মতো ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। ভয় পাওয়া গলায় ডাকলেন, সবুর মিয়া, সবুর মিয়া।

সবুর মিয়া ঢুকল না। সোবাহান ভারী গলায় বলল, ভবিষ্যতে আর এরকম ব্যবহার করবেন না।

আপনি কি আমাকে মারবেন নাকি ?

নাহ। মেয়েদের গায়ে আমি হাত তুলি না। ছেলে হলে এক চড়ে মাঢ়ির দুটো দাঁত নড়িয়ে দিতাম।

মেয়েটির গাল গোলাপি বর্ণ ধারণ করল। সোবাহান ঘর থেকে বেরিয়ে এল। খুব সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে নিচে গেল। তার ভয় করছিল হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকজন এসে তাকে ধরে ফেলবে। কিন্তু সেরকম কিছু হলো না। শুধু বুড়োটি পিছু পিছু নেমে এল। সে তাকাচ্ছে ভয় পাওয়া চোখে। তাকে কি গুণ্ডাদের মতো লাগছে ?

রিসিপশনের মেয়েটি টেলিফোনে খুব হাসছে। সকালবেলা তাকে যতটা রূপসী মনে হচ্ছিল এখন আর ততটা মনে হচ্ছে না। সোবাহান তার দিকে তাকিয়ে পরিচিত ভঙিতে হাসল। মেয়েটি টেলিফোনে কথা বলা বন্ধ রেখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল তার দিকে। যেন সে বিস্মিত। কিন্তু বিস্মিত হওয়ার কী আছে ? একজন মানুষ কি আরেকজন মানুষের দিকে তাকিয়ে হাসবে না!

সোবাহান সন্ধ্যা পর্যন্ত রাস্তায় ঘুরল। আজও দুপুরে তার খাওয়া হলো না। বৈশাখ মাসের অসম্ভব কড়া রোদ। ঝাঁ ঝাঁ করছে চারদিক। প্রেসক্লাবের কাছে কাটা তরমুজ বিক্রি হচ্ছে। এক টাকা করে পিস। খেলে হয় একটা।

কিনতে গিয়েও কিনল না। মাঝে মাঝে নিজেকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা হয়। কড়া রোদেই সে আবার রাস্তায় নেমে পড়ল।

ফরিদ আলি বললেন, সোবাহান কি রোজ রোজই এমন দেরি করে ? জলিল সাহেব দাঁত বের করে হাসলেন, তা করে। যুবক মানুষ।

যুবক মানুষ হলেই দেরি করে ফিরতে হবে এটা কী কথা ?

এসে পড়বে। চিন্তা করবেন না।

এক্সিডেন্ট হয় নাই তো ?

আরে এরা চাল্লু ছেলে, এরা এক্সিডেন্ট করবে কী ?

চাল্লু ছেলে ? চাল্লু ছেলে বললেন কেন ?

ফরিদ আলি গম্ভীর হয়ে গেলেন। জলিল সাহেব বললেন, রাতও তো বেশি হয় নাই। দশটা বাজে।

দশটা কম রাত ?

এ আপনাদের নীলগঞ্জ না। এটা ঢাকা শহর। এখানে সন্ধ্যা হয় এগারোটায়। নেন ভাই সিগারেট ধরান, নার্ভ ঠান্ডা হবে।

আমি সিগারেট খাই না।

বাচ্চা ছেলে তো না যে এতটা অস্থির হয়েছেন। অস্থির হওয়ার কিছুই নাই।

ফরিদ আলি রাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বেশ হাওয়া দিচ্ছে, আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঝড়বৃষ্টি হবে বোধহয়।

সোবাহান এল রাত এগারোটায়। ফরিদ আলি ভয় পাওয়া গলায় বললেন, কী ব্যাপার, এত দেরি ?

সোবাহান জবাব দিল না। তাকাল না পর্যন্ত।

আমি তো চিন্তায় অস্থির।

চিন্তার কী আছে ?

চিন্তার কী আছে মানে ? তোকে বলেছিলাম না রাতের ট্রেনে চলে যাব। ছিলি কোথায় তুই ?

সন্ধ্যাবেলা একটা পার্কে গিয়েছিলাম। কেমন করে যেন ঘুমিয়ে পড়লাম। টায়ার্ড হয়ে ছিলাম।

কোথায় ঘুমালি ?

ওইখানে বেঞ্চি আছে। বেঞ্চিতে।

খাওয়াদাওয়া করেছিস ?

হুঁ। আপনি খেয়েছেন ?

হ্যাঁ। জলিল সাহেবের সঙ্গে খেয়ে এলাম।

ফরিদ আলি সোবাহানের হাত ধরলেন। মৃদুস্বরে বললেন, চল আমার সঙ্গে।

কোথায় ?

নীলগঞ্জে। কয়েকদিন থেকে আসবি। তোর ভাবি খুব করে যেতে বলেছে।

একটা কিছু হোক, তারপর যাব।

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে শুরু করছে। দেখতে দেখতে ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হলো। সোবাহান যে গতিতে হাঁটছিল তার কোনো পরিবর্তন হলো না। ফরিদ আলি তার হাত ধরেই থাকল। দু'জনে ঘরে ঢুকল কাকভেজা হয়ে। ফরিদ আলির মুখ চিন্তাক্লিষ্ট। সোবাহানের ব্যাপারটা তিনি বুঝতে পারছেন না।

তারা ঘুমোতে গেল অনেক রাতে। চৌকিটি ছোট—দু'জনের জায়গা হয় না। ঘেঁসাঘেঁসি করে ঘুমোতে হয়। গত রাতে খুব কষ্ট গেছে। আজ আরাম করে ঘুমানো যাবে। শীতল হাওয়া। ফরিদ আলি বললেন, কাঁথা টাথা কিছু আছে নাকি রে ? শীত শীত লাগছে।

বিছানার চাদরটা গায়ে দেন। কাঁথা নাই। একটা লেপ আছে শুধু। লেপ দিব ?

না। এর পরেরবার আসার সময় কাঁথা নিয়ে আসব।

সোবাহান কিছু বলল না। ফরিদ আলি বললেন, ঘুমিয়ে পড়েছিস ?

না ?

মনসুর সাহেবের শালীকে দেখেছিস ? যূথি ? যূথি নাম।

দেখেছি।

মেয়েটি কেমন ?

যক্ষ্মারোগী। আর কেমন। কেন ?

ফরিদ আলি চুপ করে গেলেন। জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাট আসছে। ভালোই লাগছে। সোবাহান বলল, ওই মেয়েটির কথা জিজ্ঞেস করেন কেন ?

মেয়েটাকে আমার পছন্দ হয়েছে। ভালো মেয়ে। একটু রোগা এই যা। বিয়ের পর গায়ে গোশত লেগে যাবে। মনে সুখ থাকলে স্বাস্থ্য ভালো হয়। কত দেখলাম। তোর ভাবিও তো রোগা ছিল। ছিল না ?

এতসব বলছেন কেন ?

তুই মেয়েটাকে বিয়ে কর। রোজগারপাতির কথা চিন্তা করিস না। আল্লাহপাক রুজি রোজগারের মালিক।

আপনি কি বিয়ের কথাবার্তা বলেছেন ?

হুঁ। পাকা কথা দেই নাই। তোকে না জিজ্ঞেস করে দেই কীভাবে! ওদের তোকে পছন্দ হয়েছে।

সোবাহান চুপ করে রইল।

একটা মানুষ ভালো কি মন্দ সেটা চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। ভালো মানুষের চেহারায় নূরানী থাকে।

মেয়েটার চেহারায় নূরানী দেখলেন ?

হুঁ। যাস কই ?

একটু বারান্দায় গিয়ে বসি।

এখন আবার বারান্দায় বসাবসি কী ? একটা বাজে।

ঘুম আসছে না।

সোবাহান বারান্দায় একটা চেয়ার টেনে নিয়ে গেল। বৃষ্টি পড়ছে সমানে। বৈশাখ মাসে এত দীর্ঘ সময় ধরে বৃষ্টি হয় না। ঝমঝম করে খানিকক্ষণ বৃষ্টি হয়ে সব শেষ। মুহূর্তে আকাশে তারা ওঠে। আজ বোধহয় সারা রাতই বৃষ্টি হবে। সমস্ত রাত আকাশ থাকবে মেঘলা।

কান্নার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। নাকি মনের ভুল ? সোবাহান ভালো করে শুনতে চেষ্টা করল। বৃষ্টির শব্দে চাপা পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু কেউ যে কাঁদছে এতে সন্দেহ নেই।

সোবাহান!

সোবাহান তাকিয়ে দেখল ফরিদ আলি উঠে আসছেন। সে তার সিগারেট উঠোনে ছুড়ে ফেলল।

সোবাহান!

জি।

কাঁদছে কে ?

মনসুর সাহেবের শালী বোধহয়। প্রায়ই কাঁদে।

কেন ?

কী জানি কেন।

ফরিদ আলি বড়ই অবাক হলেন। একজন মানুষ শুধু শুধু কাঁদবে কেন ?

৭

নীলগঞ্জ থেকে ভাবির চিঠি এসেছে।

চিঠি পড়ে বুঝবার উপায় নেই মহিলাটির পড়াশোনা ক্লাস সিক্স পর্যন্ত। সুন্দর হাতের লেখা। বানান ভুল প্রায় নেই। ভাষাটাও বেশ ঝরঝরে। দুপুরবেলা শরৎচন্দ্র পড়ে পড়ে তাঁর এই উন্নতি। 'দেবদাস' ভাবি সম্ভবত মুখস্থ বলে যেতে পারেন। 'দেবদাস' তিনি এগারোবার পড়েছেন।

সোবাহান ভাবির দীর্ঘ চিঠিটা দু'বার পড়ল।

প্রিয় ভাই,

দোয়া নিয়ো।

বড় খবর হইল তোমার ভাই উত্তর বন্দের জমি বিক্রি করিয়া দিয়াছেন। বিক্রয়ের পর আমি জানিতে পারি। আমার দুঃখ এই—তুমি শিক্ষিত ছেলে হইয়াও জমি বিক্রয়ের বিষয়ে নীরব থাকিলে। আমার সঙ্গে তোমার ভাই কোনো পরামর্শ করে নাই। কারণ মেয়েদের সঙ্গে কোনো পরামর্শ তিনি করেন না। মেয়েদের পরামর্শে সংসার চলিলে নাকি সংসারে আয় উন্নতি হয় না।

জমি বিক্রয়ের টাকায় নামাজঘর তৈরি হইতেছে। নামাজঘর হইল একটা পাকা কোঠা। সেখানে তোমার ভাই এবাদত বন্দেগি করিবেন। এবাদতের জন্যে পাকা ঘর লাগে তাহা জানিতাম না। আমরা মেয়েমানুষেরা অনেক কিছু জানি না।

সংসারে নানান ঝামেলা। পরামর্শ করিবার কেহ নাই। তুমি আসিলে ভালো হইত। শুনলাম তোমার শরীরও নাকি খুব খারাপ হইয়াছে। হোটেলে খাওয়া—শরীর নষ্ট হইবে জানা কথা। তুমি ভাই কয়েকদিন আমাদের সঙ্গে থাক। তোমার ভাইয়ের নামাজঘর দেখিয়া যাও। আল্লাহ তোমাকে সুখে শান্তিতে রাখুক।

তোমার ভাবি

সোবাহান লক্ষ করল চিঠিতে যূথির কথা নেই। তার মানে ভাইসাহেব এই প্রসঙ্গে কিছু বলেননি। অদ্ভুত লোক!

কার চিঠি এত মন দিয়ে পড়ছেন ?

ভাবির চিঠি।

ফরিদ সাহেবের স্ত্রী ?

জি।

সুন্দর হাতের লেখা।

সোবাহান চিঠি পকেটে রেখে দিল। জলিল সাহেব বললেন, কোথাও যাচ্ছেন নাকি ?

জি।

আরে, ছুটির দিনে কোথায় যাবেন ? বসেন, গল্পগুজব করি।

কাজ আছে।

আরে ভাই রাখেন কাজ। চলেন ভিসিআর দেখে আসি। আমার চেনা জায়গা।

আরেকদিন যাব।

আরে না, আরেকদিন আবার কী! চলেন যাই। এমন জিনিস দেখবেন জীবনে ভুলবেন না। মারাত্মক ছবি।

সোবাহানকে বেরুতে হলো তার সঙ্গে। বারান্দায় যূথি দাঁড়িয়ে ছিল। জলিল সাহেব হাসিমুখে বললেন, কেমন আছ ?

মেয়েটা অস্পষ্টভাবে কী যেন বলল ঠিক বোঝা গেল না।

তোমরা বাইরের মানুষদের দাওয়াত করে খাওয়াও। আমাদের কথা তো মনে করো না। আমাদেরও তো মাঝে মাঝে ভালোমন্দ খেতে ইচ্ছা করে। কী বলেন সোবাহান সাহেব ? করে না ?

সোবাহান অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। রাস্তায় নেমে জলিল সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, মেয়েটা অপুষ্ট কিন্তু তার বুক কেমন ডেভেলপ লক্ষ করেছেন। এর কারণটা বলতে পারেন ? পারবেন না ? হা হা হা! দুনিয়ার হালচাল কিছু দেখি জানেন না। আজকের দিনটা সময় দিলাম, দেখেন ভেবে-টেবে বের করতে পারেন কি না।

মগবাজার চৌধুরীপাড়ার বাড়িটা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও বের করা গেল না। সোবাহান বিরক্ত হয়ে বলল, বাড়ি চিনেন না নিয়ে এলেন কেন ?

আরে ভাই চিনি। চিনব না কেন ? রাতের বেলা এসেছিলাম, তাই ঠিক ইয়ে হচ্ছে না। বাড়ির সামনে লোহার গেট।

লোহার গেট তো সব বাড়ির সামনেই।

তাও ঠিক।

ঘণ্টাখানিক খোঁজাখুঁজি চলল। জলিল সাহেব হাল ছাড়ার পাত্র নন। সোবাহান বলল, বাদ দেন, চলেন ফিরে যাই।

ফিরে গিয়ে তো সেই শুয়েই থাকবেন। আসেন আরেকটু দেখি। এই গলিটা চেনা লাগছে।

চেনা গলিতেও কিছু পাওয়া গেল না। জলিল সাহেবও একসময় হাল ছেড়ে দিলেন। ক্লান্ত স্বরে বললেন, লাচ্ছি খাবেন নাকি ?

নাহ্।

আরে ভাই খান, আমি পয়সা দেব।

পয়সা আমার কাছে আছে, আপনার দিতে হবে না। ইচ্ছে করছে না।

আরে চলেন চলেন।

লাচ্ছির দোকানটিতে ভিড় নেই। দৈয়ের উচ্ছিষ্ট খুড়িগুলিতে মোটা মোটা মাছি ভনভন করছে। ঘরের ভেতরে ভ্যাপসা গরম, তবে মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে। ফ্যানের বাতাসও গরম।

জলিল সাহেব এক গ্লাস লাচ্ছি শেষ করতে আধা ঘণ্টা সময় নিলেন। লাচ্ছি শেষ করে পান আনালেন, সিগারেট আনালেন। ক্লান্ত স্বরে বললেন, বুড়ো হয়ে গেছি, বুঝলেন। ছুটির দিনগুলিতে কী করব বুঝতে পারি না।

বিশ্রাম করেন।

বিশ্রাম করেই বা হবেটা কী ? সংসার দরকার। ঝামেলা দরকার। ঝামেলা অশান্তি এইসব না থাকলে বেঁচে থাকা যায় না। পান খাবেন নাকি একটা ? মুখের মিষ্টি ভাবটা যাবে।

জি-না, খাব না।

এই তো দেখেন না আমার সংসারের কোনো দায়দায়িত্ব নাই। ছোট বোন ছিল বিয়ে দিয়েছি। এখন আমার দিন চলে না। দুপুরবেলা দৈয়ের দোকানে বসে থাকি।

জলিল সাহেব, আমি এখন যাব।

সোবাহান উঠে দাঁড়াল।

আরে এই রোদের মধ্যে কী যাবেন ? বসেন বসেন, রোদ কমুক। আরেকটা লাচ্ছি খান।

আপনি খান।

সোবাহান রাস্তায় নেমে পড়ল। জলিল সাহেব লাচ্ছির শূন্য গ্লাস সামনে নিয়ে বসে রইলেন। তাকে ঘিরে নীল রঙের পুরুষ্ট মাছিরা উড়তে লাগল।

দুপুরে কোথাও যাওয়া যায় না। দুপুর হচ্ছে গৃহবন্দির কাল। সোবাহান উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরল অনেকক্ষণ। আজও তার দুপুরে খাওয়া হয়নি। সকাল থেকে এ পর্যন্ত চা খাওয়া হয়েছে সাত কাপ। সমুচা দুটি। তিনটি নোনতা বিস্কিট। এক গ্লাস লাচ্ছি। এখন ক্ষিধে জানান দিচ্ছে। কিন্তু এ সময়ে হোটেলে উচ্ছিষ্ট খাবার ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। ভাত হয় কড়কড়া। বেয়ারাগুলি ঝিমায়। তিনবার ডাকলে তবেই সাড়া দেয়। অসময়ের কাস্টমারদের প্রতি এদের কোনো মমতা নেই।

সোবাহান মাঝারি সাইজের একটা হোটেলে ঢুকে পড়ল। এক প্লেট ভাত আর ডাল-গোশতের অর্ডার দিয়ে বসে রইল। ভাতের প্লেট নামিয়ে বয়টি দাঁত বের করে বলল, ডাল-গোশত নাই, ইলিশ মাছ আছে। আনুম ?

বয়টির ডান হাতে একটা ফোঁড়া। সাদা হয়ে পেকে আছে। সোবাহানের ক্ষিধে মরে গেল।

কি, খাইবেন না ?

না।

কোথায় খাওয়া যায় ? খাওয়ার কি কোনো জায়গা আছে ? সোবাহানের বমি বমি ভাব হলো। ভাতের থালাটির পাশে পেকে ওঠা ফোঁড়ার ছবিটি উঠে আসছে। কিছু কিছু ছবি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হতে থাকে। সে বাসে চাপা পড়া একটা কুকুর দেখেছিল একবার। মাথাটা থেতলে মিশে গেছে। চোখ বেরিয়ে এসেছে কোটর থেকে। সোবাহানের মনে হয়েছিল চোখ দুটি এখনো সবকিছু দেখছে। অবাক হয়ে জগতের নিষ্ঠুরতা দেখছে।

মৃত্যুর পর যেন চোখ দুটির দেখার শক্তি অনেক বেড়ে গেছে। এরকম মনে হওয়ার কোনো কারণ নেই, তবু মনে হয়। সোবাহান মিলিদের বাড়ির দিকে রওনা হলো।

আরে সোবাহান ভাই, আপনি!

কেমন আছ ?

ইস! এই রোদের মধ্যে কেউ আসে ? হেঁটে এসেছেন, না ?

ঘুমাচ্ছিলে নাকি ?

আমি দিনে ঘুমাই না। যেসব মেয়ের বয়স একুশ তারা দুপুরে ঘুমায় না।

মিলি, ঠান্ডা দেখে এক গ্লাস পানি দাও।

একটু বিশ্রাম করে নিন। এখন ঠান্ডা পানি খেলে সর্দি-গর্মি হবে। আসেন বারান্দায় বসেন। বারান্দায় ঠান্ডা।

সোবাহান বারান্দায় বসে রইল। গা দিয়ে আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে। পুকুরে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে। মিলি তাকিয়ে আছে। কে বলবে এই মেয়ের বয়স একুশ। পনেরো-ষোল বছরের কিশোরীর মতো লাগছে। ভারী মিষ্টি একটি মুখ।

একটা টেবিল ফ্যান এনে দেই ? নাকি ঘরের ভেতর ফ্যানের নিচে বসবেন ?

এখানেই বসব। তুমি পানি আন।

মিলি পানি আনতে গেল। সোবাহান হাত-পা ছড়িয়ে এলিয়ে পড়ল। মাঝে মাঝে সে আসে এ বাড়িতে। আসার তেমন কোনো কারণ নেই। মিলির বড় ভাইয়ের বন্ধু, সেই সূত্রে আসে।

নিন, পানি নিন।

শুধু পানি নয়, একটা প্লেটে দুটি সন্দেশ। সোবাহান লোভীর মতো সন্দেশ খেল। তার এতটা ক্ষিধে পেয়েছে আগে বোঝা যায়নি। মিলি সহজ স্বরে বলল, আপনি দুপুরে কিছু খাননি, তাই না ?

হুঁ।

কেন, খাননি কেন ?

সোবাহান না খাওয়ার কারণটা ব্যাখ্যা করল না। আরেক গ্লাস পানি চাইল। মিলি বড় একটা কাচের জগে পানি নিয়ে এল। পানির ওপর বরফের টুকরো ভাসছে। কাচের জগটি ঝকঝক করছে। বিন্দু বিন্দু পানি জমেছে চারপাশে—দেখেই তৃষ্ণা কমে যায়।

সোবাহান ভাই, আপনি দুমাস পরে এলেন। আপনার কথা মা প্রায়ই বলেন।

খালা কেমন আছেন ?

ভালো না।

এখনো কান্নাকাটি করেন ?

হুঁ। এবং এখনো বিশ্বাস করেন ভাইয়া বেঁচে আছে। মিলিটারিরা তাকে পাকিস্তানে নিয়ে বন্দি করে রেখেছে।

বেশির ভাগ মা-ই তাই ভাবে। আমার নিজেরও মাঝে মাঝে মনে হয় ও হয়তো বেঁচেই আছে।

মিলি ছোট্ট করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। শান্ত স্বরে বলল, খেতে আসুন সোবাহান ভাই। খাবার দেওয়া হয়েছে।

খাবার দেওয়া হয়েছে মানে ?

দুপুরে তো খাননি। টেবিলে ভাত দিতে বলেছি।

চারটার সময় ভাত খেতে বসব নাকি ?

হ্যাঁ বসবেন। আসুন। সিগারেট ফেলে দিন।

শোনো, মিলি।

অল্প চারটা খান। আসুন।

সোবাহানকে উঠতে হলো। হাত-মুখ ধুয়ে ভাত নিয়ে বসতে হলো। কাজের মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে দূরে। মিলি তার ধবধবে ফর্সা হাতে ভাত বেড়ে দিচ্ছে। হাতভর্তি লাল টকটকে কাচের চুড়ি। অদ্ভুত সুন্দর একটা ছবি। স্বপ্নদৃশ্যের মতো।

মিলি, বাসায় কেউ নাই ?

না। আব্বা আম্মা খালার বাসায় গেছেন। ছ'টার মধ্যে এসে পড়বেন। আপনি কিন্তু মার সঙ্গে দেখা না করে যেতে পারবেন না।

আরেকদিন আসব। আজ আমার যেতে হবে এক জায়গায়।

আপনি এলে মার সঙ্গে দেখা করতে চান না।

সোবাহান চুপ করে রইল। মিলি বলল, মা আপনাকে দেখলেই কান্নাকাটি করে তাই আপনার ভালো লাগে না। ঠিক না ?

সোবাহান জবাব দিল না। মিলি বলল, এত তাড়াহুড়ো করছেন কেন ? আস্তে আস্তে খান। ডাল নিয়ে ভালো করে মাখুন। শুকনা শুকনা খাচ্ছেন কেন ?

সোবাহান কী একটা বলতে গিয়েও বলল না। মিলি বলল, চাকরির কিছু হয়েছে আপনার ?

নাহ্।

মা যে আপনাকে এক ভদ্রলোকের কাছে যেতে বলেছিলেন, যাননি ? রহমান সাহেব না কে যেন।

এখনো দেখা হয়নি।

দেখা করবেন। আপনার চাকরি হবে।

আমার কিছু হবে টবে না মিলি। আমি গ্রামে চলে যাব।

এখনই হাল ছেড়ে দিচ্ছেন ?

অনেকদিন চেষ্টা করলাম। আর ভালো লাগে না। উঠি মিলি ?

মিলি তাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিল। রোদের তাপ কমে এসেছে। ঠাণ্ডা বাতাস, দূরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে হয়তো। সোবাহান বড় রাস্তায় নেমে একবার পেছনে তাকাল। মিলি দাঁড়িয়ে আছে। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে একধরনের কাঠিন্য আছে। সোবাহানের তবু মনে হলো, ঠিক এ ধরনের মেয়েদের কাছেই বারবার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে।

একটা ভুল হয়ে গেল। মিলির বর কবে আসবে জিজ্ঞেস করা হয়নি। শিগগিরই তো আসার কথা। মিলির বরকে মিলি চোখে দেখেনি। বিয়ে হয়েছে টেলিফোনে। ভদ্রলোক মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পিএইচডি। মিলির মতো একটি মেয়েকে পাশে পাওয়ার জন্যে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পিএইচডি করতে ইচ্ছা করে। মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং জিনিসটা কী ?

৮

ফরিদ আলির কাছে দু'জন লোক এসেছে নবীনগর থেকে। তিনি তাদের চিনতে পারলেন না। তারা বয়সে ফরিদ আলির কাছাকাছি, কিন্তু দেখা হওয়ামাত্র পা ছুঁয়ে সালাম করল। ফরিদ আলি যথেষ্ট অপ্রস্তুত হলেন। এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। লোক দু'টির একজন কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, হুজুর, আপনার দোয়া নিতে এসেছি।

ফরিদ আলি খানিকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলেন না। কিছুদিন ধরেই তার কাছে দূর দূর থেকে মানুষজন আসে। গত সপ্তাহেই নান্দাইল রোড থেকে একজন প্রাইমারি স্কুলের টিচার তাঁর ছোট মেয়েটিকে নিয়ে এসেছিল। সেদিনও তিনি বলেছিলেন—'আমার কাছে কেন এসেছেন ? আমি একজন অতি নগণ্য ব্যক্তি।' আজও সেই কথা বললেন।

লোক দু'টি কী শুনে তাঁর কাছে এসেছে কে জানে। তারা জড়সড় হয়ে বসে রইল।

আপনারা নিশ্চয়ই খাওয়াদাওয়া করেন নাই ?

জি-না।

বসেন। খাওয়াদাওয়া করেন। মাগরেবের নামাজের পর দোয়া করব।

হুজুর, ছেলেটা বাঁচবে ?

ফরিদ আলি তাকালেন। খুব স্পষ্টভাবে বললেন, মানুষের মৃত্যু নাই। আত্মা বেঁচে থাকে। আত্মার কোনো বিনাশ নাই। মৃত্যুর কথা বলছেন কেন ?

কথাটা বলে তার নিজেরও ভালো লাগল। সত্যিই তো মৃত্যু নিয়ে এত যে মাতামাতি তার কোনো অর্থ হয় না। আমরা সবাই এক মৃত্যুহীন জগতের বাসিন্দা।

আপনার ছেলেটার বয়স কত ?

জোয়ান ছেলে, বিয়ে দিছি গত বৎসর।

কী হয়েছে ?

জানি না হুজুর। রক্তবমি করতেছে।

হুজুর বলছেন কেন আমাকে ? আমার নাম ফরিদ আলি। আমাকে নাম ধরে ডাকবেন।

লোক দু'টি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

আল্লার নামের সাথে মিল রেখে আমাদের নাম। কাজেই নাম ধরে ডাকলে কোনো অপমান হওয়া ঠিক না। আপনারা হাত-মুখ ধোন, বিশ্রাম করেন, খানা আসবে।

এই গ্রামে একটি পাকা মসজিদ আছে।

ফরিদ আলি আগে মসজিদে যেতেন। গত কয়েক মাস ধরে যান না। বাংলাঘরে একা একা নামাজ পড়েন। ইদানীং অবশ্য একা একা নামাজ পড়া হয় না। অনেকেই এখানেই চলে আসে। কেন আসে ? তিনি জানেন না, জানতেও চান না। নামাজের শেষে মাঝে মাঝে দু'একটা কথা বলতে চেষ্টা করেন। সেগুলি কি ওদের ভালো লাগে ? বোধহয় লাগে। আজও দেখা গেল অনেকেই এসেছে। নামাজের শেষে তিনি অন্যদিনের মতো কিছু কথাবার্তা বললেন

> সুখ ভোগ করবার জন্যে আমরা আসি নাই। পৃথিবীতে সুখ নাইরে ভাই। চারদিকে দুঃখ আর কষ্ট। এখানে কেউ কি আছেন যিনি বলতে পারেন তার কোনো দুঃখ নাই। আছেন কেউ ?

মৃদু একটা গুঞ্জন উঠল। নবীনগর থেকে আসা লোকটি চোখ মুছতে লাগল। কথা বলতে বলতে ফরিদ আলির মনে গভীর আবেগের সৃষ্টি হলো এবং তাঁর নিজের চোখ দিয়েও টপ টপ করে পানি পড়তে লাগল

> এমন কেউ কি আছেন যিনি আমাদের দুঃখহীন জগতে নিয়ে যাবেন ? যে জগতে মৃত্যু নাই, ক্লান্তি নাই। দুঃখ নাই। হতাশা নাই। বঞ্চনা নাই।

ফরিদ আলি কথা শেষ করে যখন উঠলেন তখন অনেক রাত। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। নবীনগরের লোক দুটিকে রাতে থেকে যেতে বলা হলো। তারা থাকল না। যাওয়ার সময় তারা আবার তাঁর পা ছুঁয়ে সালাম করতে এল। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে মাথা নিচু করা ঠিক না। তারা কী করবে বুঝতে পারল না। ফরিদ আলি বললেন, চলেন আপনাদের একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

জি-না, জি-না। হুজুর, লাগবে না।

ফরিদ আলি তাদের কথা শুনলেন না। তাদের এগিয়ে দিলেন নিমাই খালের পুল পর্যন্ত। জায়গাটা ঘন অন্ধকার। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ফরিদ আলি আকাশের দিকে

তাকালেন। তারপর হঠাৎ বলে ফেললেন—চিন্তা করবেন না, আপনার ছেলে ভালো হয়ে যাবে। এই কথাটা কেন বললেন তিনি বুঝতে পারলেন না। কিন্তু বলেই সংকুচিত হয়ে পড়লেন।

এই কথাটি কেন তিনি বললেন ? কেন, কেন ? তারা অবাক হয়ে তাকাল তাঁর দিকে। অন্ধকারে তাঁর মুখ দেখা গেল না। লোকটি তাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ফরিদ আলি গাঢ় স্বরে বললেন, ভয়ের কিছু নাই, যান, বাড়ি যান।

বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। ফরিদ আলি ভিজতে ভিজতে রওনা হলেন। বেশ লাগছে তাঁর। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর গা বেয়ে পানি পড়তে লাগল। তিনি বাড়ির দিকে না গিয়ে উল্টোদিকে রওনা হলেন। সেখানে একটা শিমুল গাছ আছে। তার নিচে বসে থাকতে কেমন লাগে এটাই তার দেখার ইচ্ছা। কিংবা তেমন কোনো ইচ্ছা নেই, বসার জন্যেই বসা।

ঘণ্টাখানিকের মধ্যে বৃষ্টি থেমে গেল। তারও বেশ কিছুক্ষণ পর হারিকেন হাতে তাঁকে খুঁজতে এল বাড়ির কামলা। ফরিদ আলি হাসি মুখে বললেন, কিরে রশীদ ?

রশীদ বলল, ছোড ভাই আইছে।

তাই নাকি ?

জি। সঙ্গে তাইনের বন্ধু আছে।

ফরিদ আলির মন আনন্দে ভরে গেল। তিনি উল্লসিত বোধ করলেন।

৯

বুলু মুগ্ধ হয়ে গেল—আরে এ তো দেখি তপোবন! সোবাহান নিজেও কম অবাক হয়নি। বাড়িঘর চেনা যাচ্ছে না। ঝকঝক তকতক করছে। নামাজঘরের সামনে চমৎকার বাগান করা হয়েছে। বাড়ির উত্তরের বিশাল আমগাছটির নিচে লাল সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। বুলু বলল, কেমন যেন শান্তি শান্তি ভাব চলে আসছে। থেকে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

থেকে যা। দাড়ি রেখে মুরিদ হয়ে যা।

তুই মনে হচ্ছে বিরক্ত।

বিরক্ত ফিরক্ত না।

সন্ধ্যাবেলা অনেক লোকজন এল ফরিদ আলির কাছে। বুলু মহা উৎসাহে গেল কথাবার্তা শুনতে। সোবাহান বসে রইল গম্ভীর হয়ে। ভাবি বললেন—তুমি যাও, শুনে আসো। আমাদের বলো। মেয়েমানুষেরা তো আর শুনতে পারে না।

বহু লোকজন আসে নাকি ভাবি ?

তা আসে। বড় বড় লোকজনও আসে।

বড় বড় লোকজন মানে ?

গত সপ্তায় এক জজ সাহেব আসছিলেন।

বলো কী ?

জিপ গাড়ি নিয়ে এসেছে। রাত আটটা পর্যন্ত ছিল।

জ্ঞানের কথা সব শুনল ?

কী কথা শুনল জানি না। আমি মূর্খ মেয়েমানুষ। এত সব কি জানি ?

বুলু খুব আগ্রহ নিয়ে বক্তৃতা শুনল। ফরিদ আলি কখনো মৃদুস্বরে কখনো নিচুগলায় কথা বলতে লাগলেন

> মানুষ পশুর মতো, তবে পশুর মধ্যেও ভালো জিনিস থাকে। যেমন বাঘ। বাঘের ভালো জিনিসটা হচ্ছে তার সাহস। সেরকম মানুষের মধ্যে, খারাপ জিনিসের মধ্যে অনেক ভালো জিনিস থাকে। ওই ভালোটা রেখে খারাপটা বাদ দিতে হবে। রসুল করিম হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলয়হেস সাল্লামের মধ্যেও কিছু খারাপ জিনিস ছিল। সেই জন্যে ফিরিশতা পাঠায়ে আল্লাহ্‌পাক তাঁর বুক কেটে সেটা পরিষ্কার করলেন। আর আমরা তো অতি নিম্নশ্রেণীর মানুষ, আমাদের মধ্যে খারাপ ভাবটা আরও বেশি। কাজেই রাত দিন আল্লাহপাকের কাছে আমাদের বলতে হবে, হে পাওয়ারদেগার, আমাদের ভালো করেন।

সমবেত প্রতিটি মানুষ একসঙ্গে বলল, আমাদের ভালো করেন। বুলুও বলল।

গভীর রাতে জিগির শুরু হলো, তবে ফরিদ আলি জিগিরে সামিল হলেন না। তিনি তাঁর নামাজঘরে ঢুকে পড়লেন। সেখানে কোনো বাতি জ্বালানো হলো না। অন্ধকারে ছোট্ট ঘরটিতে তিনি এক রহস্যময় পুরুষের মতো বসে রইলেন। বাংলাঘরের মুসল্লিরা তালে তালে আল্লাহু আল্লাহু করতে লাগল। তাদের মাথা নড়ছে গা কাঁপছে। চোখমুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। যারা এখানে জমা হয়েছে তারা সবাই কি রাতে ভরপেট খেয়েছে ? বোধহয় না। অনাহারক্লিষ্ট মুখ দেখলেই টের পাওয়া যায়। এরা কি এখানে ক্ষুধা ভুলে থাকার জন্যে এসেছে ? বুলু জিগির করার ফাঁকে ফাঁকে গভীর আগ্রহে সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল। তার বড় ভালো লাগছে।

এক সপ্তাহ থাকার কথা ছিল। তৃতীয় দিনেই সোবাহান ঠিক করল চলে আসবে। ফরিদ আলি বেশ কয়েকবার থাকতে বললেন। সোবাহান প্রতিবারই বলল, না আমার ভালো লাগছে না।

কী, ভালো লাগছে না ?

এইসব জিগির ফিগির।

না হয় এই কদিন জিগির হবে না। সবদিন তো হয়ও না।

সোবাহান ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, আপনি সারা রাত ওই বাংলাঘরে বসে থাকেন কেন ? মানুষের ঘুমের দরকার নাই ?

ঘুমাই তো। দিনে ঘুমাই।

বুলুর আরও কিছুদিন থাকার ইচ্ছা ছিল। সোবাহান তাকে নিয়ে জোর করে চলে এল। ফরিদ আলি স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন। সারা পথে অসংখ্য লোক তাকে সালাম করল। একজন এগিয়ে এল ছাতা হাতে। রোদে যেন তার কষ্ট না হয়। তিনি মৃদু হেসে তাকে বললেন, রোদ তো আল্লাহ্‌র দান। রোদে কষ্ট হবে কেন? কোনো কিছুতেই কষ্ট নাই। কষ্ট মনে করলেই কষ্ট! সুখ মনে করলেই সুখ!

সোবাহান অফিসে ঢোকামাত্র রিসিপিশনের মেয়েটি বলল, আপনি অনেকদিন পরে এলেন। কী ব্যাপার, অসুখ-বিসুখ নাকি?

সোবাহান অবাক হলো। ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

বড় সাহেব আপনার খোঁজ করছিলেন।

উনি কি আছেন?

আছেন। আপনি বসুন। খবর পাঠাচ্ছি।

সে বসে রইল। রিসিপশনের মেয়েটিকে আজ আরও সুন্দর লাগছে। আজ সে কালো রঙের একটি শাড়ি পরেছে। কালো রঙের শাড়িতে মেয়েদের এতটা সুন্দর লাগে তা তার জানা ছিল না।

যান, আপনি স্যারের ঘরে যান।

রহমান সাহেবের বয়স প্রায় পঞ্চাশ। মাথার চুল সব পেকে গিয়েছে। অসম্ভব গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। কথা বলবার সময় চোখে পলক পড়ে না। এদের দেখলেই মনে হয় এরা জন্মেছে বস হওয়ার জন্যে।

বসুন। আপনার নাম সোবাহান?

জি।

ওইদিন আপনি এরকম অশালীন আচরণ করলেন কেন? একজন মেয়েমানুষকে অপমান করে পৌরুষ দেখালেন?

সোবাহান জবাব দিল না। লোকটির ব্যক্তিত্বের তারিফ করল মনে মনে।

আপনি পড়াশুনা কতদূর করেছেন?

বিএ পাস করেছি।

কোন ক্লাস?

সেকেন্ড ক্লাস।

যে মহিলাদের সম্মান দেখাতে জানে না তাকে আমি এই অর্গানাইজেশনে চাকরি দিতে পারি না।

সম্মান অর্জন করতে হয়। অনেক মহিলা আছেন যাদের সম্মান দেখানোর কোনো কারণ নেই।

আপনি যেতে পারেন।

সোবাহান উঠে দাঁড়াল। রহমান সাহেব বেল টিপতেই পিএ ছুটে এল এবং এমন ভাব করল যেন সে সোবাহানকে চিনতে পারছে না। রহমান সাহেব বললেন, ফরেন করেসপনডেন্স ফাইলে কোরিয়া ট্রেডার্সের কোনো চিঠি আছে কি না দেখুন তো।

সোবাহান লোকটির ব্যক্তিত্বের আবার প্রশংসা করল। লোকটি কত সহজেই বুঝিয়ে দিল—তুমি কীটস্য কীট। সোবাহান হাসিমুখে বলল, স্লামালিকুম।

রহমান সাহেব চোখ তুলে তাকালেন। শীতল স্বরে বললেন, আপনি নিচে অপেক্ষা করুন, আমি ডাকব।

সে নিচে নেমে এল। রিসিপশনের মেয়েটি কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। যাওয়ার সময় তাকে কি কিছু বলে যাওয়া উচিত ? এখানে আর তো নিশ্চয়ই আসা হবে না। সোবাহান ইতস্তত করতে লাগল। কিন্তু কথা শেষ হচ্ছে না। বেশ মেয়েটি।

চলে যাচ্ছেন ?

হ্যাঁ।

স্যার কী বললেন ?

তেমন কিছু না।

মেয়েটি মনে হলো বেশ অবাক হয়েছে। অবাক হওয়ার কিছু কি আছে এর মধ্যে ?

সোবাহান হঠাৎ বলে বসল, আপনার নাম জানা হয়নি।

আমার নাম ইয়াসমিন। নাম দিয়ে কী করবেন ?

এমনি জিজ্ঞেস করলাম। কিছু মনে করবেন না।

চা খাবেন ?

নাহ্।

খান, এক কাপ চা খান।

মেয়েটি কাকে যেন ইশারা করল। হালকা গলায় বলল, আমার ধারণা ছিল আপনার চাকরিটা হবে।

এরকম ধারণার কারণ কী ?

কারণ স্যারকে দেখলাম আপনাকে নামে চেনেন। আমাকে বলে রেখেছিলেন সোবাহান নামের কেউ এলে তাকে খবর দিতে। আপনার নিশ্চয়ই ভালো রেফারেন্স আছে।

নাহ্, তেমন ভালো নেই। থাকলে এ অবস্থা হওয়ার কথা না।

তাও ঠিক।

সোবাহান লক্ষ করল মেয়েটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। কী দেখছে কে জানে। দেখার মতো কী আছে তার মধ্যে ?

আপনি রুমাকে যে ট্রিটমেন্ট দিয়েছেন তাতে আমরা সবাই খুব খুশি। থ্যাংকস।

রুমা কে ? রহমান সাহেবের পিএ ?

হ্যাঁ।

সোবাহান বেতের সোফায় বসে রইল সন্ধ্যা পর্যন্ত। সন্ধ্যাবেলা পিএ এসে বলল, আজ দেখা হবে না। স্যারের প্রেসার বেড়েছে।

সোবাহানের চোখের সামনেই রহমান সাহেব বের হয় গেলেন। পলকের জন্যে তাকালেন সোবাহানের দিকে।

রিসিপশনিস্ট মেয়েটি বলল, আপনি পরশু আসুন। একটা কিছু নিশ্চয়ই হবে।

দেখি।

না, দেখাদেখি না। আসুন। এত অল্পতে ধৈর্য হারানো ঠিক না।

ধৈর্য আছে। এখনো হারাইনি।

তারা দুজন একসঙ্গে বেরুল। সোবাহান পাশাপাশি হাঁটছিল। তার ইচ্ছা হচ্ছিল বলে—কোনো রেস্টুরেন্টে বসে এক কাপ চা খাবেন? কিন্তু বলল না। বাংলাদেশে মেয়েরা সন্ধ্যাবেলা কোনো রেস্টুরেন্টে বসে চা খায় না। সোবাহান বলল—আচ্ছা চলি? মেয়েটি মিষ্টি করে হাসল। হয়তো অভ্যাসের হাসি, তবু দেখতে ভালো লাগে। এই মেয়েটির দাঁতগুলি সুন্দর। কোন টুথপেস্ট ব্যবহার করে কে জানে।

সোবাহান ঘরে ফিরল রাত এগারোটায়। জলিল সাহেব বললেন, এত দেরি করলেন? আপনার বন্ধু বুলু সাহেব সন্ধ্যা থেকে বসে ছিলেন। খুব নাকি দরকার।

কী দরকার?

তা তো বলেন নাই, চিঠি লিখে গেছেন। ড্রয়ারে চিঠিটা আছে, পড়ে দেখেন।

চিঠিতে তেমন কিছু লেখা নাই। ইংরেজি বাংলা মিশানো যা আছে তার কোনো পরিষ্কার অর্থও হয় না। বোঝা যায় যে, একটা ইম্পর্টেন্ট খবর আছে। সে খবরটি কী সে সম্পর্কে কিছুই নাই।

জলিল সাহেব চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন, ব্যাপারটা কি কিছু বুঝতে পারছেন?

নাহ্।

খারাপ কিছু না তো?

না, খারাপ আর কী হবে? চাকরি হয়েছে বোধহয়।

চলেন না যাই খোঁজ নিয়ে আসি।

এত রাতে কোথায় যাব!

সোবাহান কোনো উৎসাহ দেখাল না। নির্বিকার ভঙ্গিতে ঘুমোতে গেল। ঘুম আসবে না জানা কথা। অনেক রাত জেগে থাকার পর খানিকটা তন্দ্রামতো হবে। ব্যস। কিংবা এও হতে পারে সারা রাত জেগে কাটবে।

রাত একটা পর্যন্ত ঘুমোবার চেষ্টা করে সোবাহান মশারির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। জলিল সাহেব আলো জ্বালিয়ে কী যেন পড়ছেন।

কী পড়ছেন?

তেমন কিছু না রে ভাই। ফুটপাতের একটা বাজে বই। আপনার মতো ইয়াংম্যানদের পড়া ঠিক না।

জলিল সাহেব, আপনি কি কোনো মেয়েকে দেখে বলতে পারেন মেয়েটি বিবাহিতা না অবিবাহিতা ?

জলিল সাহেব খানিকক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে রেখে বললেন, বলাটা ডিফিকাল্ট। বলতে হলে বিছানায় নিতে হবে। হা হা হা।

সোবাহান বারান্দায় গিয়ে বসল। জলিল সাহেব ভেতর থেকে বললেন, কি ভাই রাগ করলেন নাকি ? বয়স হয়েছে, দুএকটা বেফাঁস কথা বলে বসি। এতে মাইন্ড করা ঠিক না।

মাইন্ড করিনি।

আপনি কি ভাই বিবাহিতা কারুর সঙ্গে কিছু বাধিয়ে বসেছেন ? সিংকিং সিংকিং ড্রিকিং ওয়াটার। সুখে আছেন ভাই। বয়সটাই আপনাদের ফেভারে। জীবনটা কেটে গেল ভেজিটেবলের মতো। বহুত আফসোস হয়, বুঝলেন ?

জলিল সাহেব বারান্দায় এসে বসলেন। সিগারেট ধরালেন। ক্লান্ত স্বরে বললেন, ফ্যামিলি লাইফের একটা চার্ম আছে। এই ধরেন, ফ্যামিলি থাকলে এ সময়ে লেবুর শরবত বানিয়ে খাওয়াত। মাথা টিপে দিত।

সোবাহান বলল, আপনার মাথা ধরেছে নাকি ?

জলিল সাহেব জবাব দিলেন না।

মাথা ধরা থাকলে সিগারেট খাবেন না।

মাথা ধরে নাই। কটা বাজে ?

একটার উপরে।

সামনের রাস্তায় লোক চলাচল নেই। গলির মোড়ের সিগারেটের দোকান একটার দিকে ঝাঁপ ফেলে দেয়। আজ ফেলছে না। অল্পবয়েসী কিছু ছোকরা ঘোরাঘুরি করছে সেখানে। জলিল সাহেব ওই দিকে তাকিয়ে মৃদু গলায় বললেন, ওদের মতলবটা কিছু বুঝতে পারছেন ?

জি-না।

গাঁজা খাবে। রাত একটার পর ওই দোকানে গাঁজা বিক্রি হয়।

তাই নাকি ?

হুঁ। খাবেন নাকি ?

নাহ্।

ইচ্ছা হলে চলেন যাই, দেখি জিনিসটা কী! দু'টাকা করে নেয়। সিগারেটের মধ্যে ভরে দেয়।

না, ইচ্ছা করছে না।

সবকিছু ট্রাই করতে হয়। জীবনে আছে কী বলেন ? মরবার সঙ্গে সঙ্গেই তো ফুটটুস। কি ঠিক বললাম না ?

জি ঠিকই বলেছেন।

আচ্ছা ঠিক আছে, চলেন যাই চা খেয়ে আসি।

রাতে চা কোথায় পাবেন ?

ঢাকা শহরে একটার সময় চা পাওয়া যাবে না ? বলেন কী ? যান সার্টটা গায়ে দিয়ে আসেন।

বড় রাস্তায় দুটি চায়ের দোকান খোলা পাওয়া গেল। একটিতে ইংরেজি গানের ক্যাসেট বাজানো হচ্ছে। জলিল সাহেব গানের দোকানটিতেই বসলেন। চা খাওয়া শেষ হওয়ার পরও বসে রইলেন। সোবাহান বলল, যাবেন না ?

আরে বসেন না, গান শুনি। বাড়িতে গিয়ে তো সেই ঘুমাবেন। ভালোই লাগছে তো গান শুনতে। লাগছে না ?

সোবাহান কিছু বলল না।

বেঁচে থাকতে হলে আনন্দ দরকার। চা খাবেন আরেক কাপ ?

জি-না।

দৈ খাবেন ? খান, পয়সা আমি দেব।

জি-না। আমি উঠব, ঘুম পাচ্ছে। আপনি কি আরও কিছুক্ষণ বসবেন ?

বসি কিছু সময়। ঘরে গিয়ে করবটা কী ?

জলিল সাহেব আরেক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে গানের তালে মাথা নাড়তে লাগলেন। যেন খুব মজা পাচ্ছেন।

সোবাহানের মনে হলো—বেচারাকে ফেলে আসাটা ঠিক হয়নি। আরও খানিকক্ষণ বসলেই হতো। ঘরে গিয়ে তো ঘুমানো যাবে না। দরজা খুলবার জন্যে জেগে থাকতে হবে। তিনি কখন আসবেন তারও ঠিক নেই। দোকান বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই।

১০

নামাজঘরটি ফরিদ আলির পছন্দ হয়েছে।

একটি মাত্র দরজার গোলাকার ছোট্ট ঘর। মেঝে মোজাইক করার ইচ্ছা ছিল—টাকার টান পড়ে গেল। তাতে ক্ষতি হয়নি। কালো সিমেন্টের প্রলেপে ভালোই লাগছে দেখতে।

ঘরের ভেতরটা দিনের বেলাতেও অন্ধকার। অন্ধকার বলেই রহস্যময়। উপাসনার ঘর রহস্যময় হওয়াই তো উচিত। বসতবাড়ি থেকে পঞ্চাশ গজের মতো দূরে। এটাও ভালো। সংসারের কোলাহল থেকে দূরে থাকাই ভালো।

ফরিদ আলি সমস্ত দুপুর সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে ঘরের মেঝে পরিষ্কার করলেন। তার বাড়ির কামলা রোস্তম বলল, আমি সাফ কইরা দেই বড় মিয়া ? ফরিদ আলি বললেন, না। এই ঘরে আমি ছাড়া কেউ ঢুকবে না।

রোস্তম তাকাল অবাক হয়ে।

নির্জনে আল্লাহ খোদার নাম নিতে চাই রোস্তম। নির্জনেই আল্লাহকে ডাকা উচিত। উচিত না ?

জি উচিত।

সন্ধ্যাবেলা ফরিদ আলি ভেতরবাড়িতে অজু করতে গেলেন। অজুর পানি দিতে দিতে পারুল বলল, আপনের সাথে আমার কথা আছে।

ফরিদ আলির কপালে ভাঁজ পড়ল। পারুল তাকে তুমি করে বলত। এখন আপনি করে বলছে। রোজই ভাবেন জিজ্ঞেস করবেন—এর কারণটি কী ? জিজ্ঞেস করা হয় না। লজ্জা লাগে। ফরিদ আলি অজু শেষ করে বললেন, বলো কী বলবে ?

নামাজ শেষ কইরা আসেন তারপর বলি।

না, এখনই বলো। নামাজ শেষ করে আমি আজ আর বাড়ি ফিরব না। রাত কাটাব নামাজঘরে।

কেন ?

ইবাদত বন্দেগি করব। ঘর তো সেজন্যেই বানালাম।

ভিতরের বাড়িতে ইবাদত বন্দেগি করা যায় না ?

গণ্ডগোল হয়। মনে বসে না। বলো, তুমি কী বলতে চাও ?

অন্যদিন বলব। আপনের নামাজের সময় হইছে। নামাজ পড়তে যান।

ফরিদ আলি বাংলাঘরে গিয়ে দেখেন নামাজ পড়ার জন্যে অনেকেই বসে আছে। তিনি বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, আজ থেকে একা একা আল্লাহকে ডাকবেন।

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

আপনারা কিছু মনে করবেন না।

জি-না জি-না। তবে আপনার দু'একটা কথা শুনতে বড় ভালো লাগে। মনে শান্তি হয়।

প্রতি বৃহস্পতিবার মাগরেবের পর আপনাদের সাথে কথা বলব।

জি আচ্ছা। জি আচ্ছা।

আর বলবই বা কী বলেন ? আমি কী জানি ? কিছুই জানি না। বোকার মতো যা মনে আসে বলি। আল্লাহর কাছে গুনাগার হই।

সমবেত মুসল্লিরা অভিভূত হয়ে পড়ে। তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। ফরিদ আলি নামাজঘরে ঢুকে পড়েন। ঘরের রহস্যময় আলো-আঁধার তাঁর বড় ভালো লাগে।

ভেতরবাড়িতে ফিরতে ফিরতে তাঁর রাত দশটা বেজে যায়। পারুল ভাত বেড়ে দেয়। তরকারি গরম করে আনে। ভাত মাখতে মাখতে ফরিদ আলি নিচুস্বরে কথা বলেন, কী যেন বলতে চেয়েছিলে ?

তেমন কিছু না। আপনে ভাত খান। ডাইল নেন।

বলার থাকলে বলো।

পারুল অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আপনে আরেকটা বিয়া করেন। সংসারে ছেলেপুলে আসলে মনে শান্তি আসে।

আমার মনে শান্তি আছে।

না, শান্তি থাকলে মানুষ এই রকম করে না।

কী করলাম আমি ?

বিষয়সম্পত্তি বিক্রি করতেছেন। এইসব আপনের একার না। সোবাহানের অংশও আছে।

সোবাহানকে জিজ্ঞেস করেছি।

আপনে জিজ্ঞাস করলে সে না বলবে না। তবু এইটা উচিত না।

ফরিদ আলি গম্ভীর মুখে বললেন, আমি ধর্মকর্ম করি এটা চাও না তুমি ?

ধর্মকর্ম নিয়া আপনি বাড়াবাড়ি করেন এইটা ঠিক না। মানুষের সংসারি হওয়া লাগে। আপনার উপর দায়িত্ব আছে।

কী দায়িত্ব ?

সোবাহানের বিয়া দিবেন না ?

তার বিয়ে ঠিক করে এসেছি। ওই নিয়ে চিন্তা করবার কিছু নাই। সব ঠিক আছে।

পারুল বিস্মিত হয়ে বলল, কোন জায়গায় ঠিক করলেন ?

ঢাকায়। মেয়ের নাম যূথি। ভালো মেয়ে।

সোবাহান মেয়ে দেখছে ? সে রাজি আছে ?

রাজি অরাজির কী আছে ? আল্লাহর ইচ্ছা থাকলে ওইখানে বিয়ে হবে। ইচ্ছা না থাকলে হবে না।

ওই মেয়ের কথা তো আমাকে কিছু বলেন নাই।

এই তো বললাম। আর কী জানতে চাও ?

ফরিদ আলি উঠে পড়ে শান্তস্বরে বললেন, আজ রাতটা আমি নামাজঘরে কাটাব।

ওইখানেই ঘুমাবেন ?

না, ঘুমাব না। এবাদত বন্দেগি করব।

রাতে আর ফিরবেন না ?

ফজরের নামাজের শেষে ফিরব। আমাকে একটা পান দাও।

পারুল পান এনে দিল। ফরিদ আলি বিছানায় আধশোয়া হয়ে পান খেলেন। পারুল কিছুই বলল না।

নামাজঘরে ঢোকবার আগে ফরিদ আলি সোবাহানকে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখলেন।

তাঁর মনে আজ খুব আনন্দ। চিঠি লিখতে লিখতে তাঁর গভীর আবেগ উপস্থিত হলো। বেশ কয়েকবার তাঁকে চোখ মুছতে দেখা গেল। পারুল তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। দীর্ঘ দিনের চেনা লোক কত দ্রুতই না অচেনা হয়ে যাচ্ছে! ফরিদ আলি চোখ তুলে তাকালেন। শান্তস্বরে বললেন, কী দেখছ ?

না, কিছু না।

একটা চিঠি দিলাম সোবাহানকে। বিয়ের কথাটা লিখলাম। ওর বিয়ে হয়ে গেলে আমার একটা দায়িত্ব শেষ হয়। অজুর পানি দাও। অজু করে চলে যাব।

রাতে আসবেন ?

না।

ফরিদ আলি উঠানে বসে অনেক সময় নিয়ে অজু করলেন। উঠানে ফকফকা জ্যোৎস্না। দেখতে খুব ভালো লাগে। পারুল দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখে। তাকে নতুন বিয়ে হওয়া কিশোরীর মতো লাগে।

প্রায় চৌদ্দ বছর হলো তাদের বিয়ে হয়েছে। পনেরোও হতে পারে। এত দীর্ঘ সময় তারা একসঙ্গে আছে এটা মনেই থাকে না। পারুলকে এখনো অচেনা লাগে।

১১

বেলা এগারোটায় সোবাহান বুলুদের বাসার কড়া নাড়ল। আজ যে ছুটির দিন এটা সোবাহানের মনে ছিল না। বেকার যুবকরা দিনের হিসাব ঠিকমতো রাখতে পারে না। ছুটির দিনে বুলুদের বাসায় গেলে বুলু খুব রাগে। আজও নির্ঘাৎ রাগবে। দরজা খুললেন বুলুর মামা। ভদ্রলোক মিউনিসিপ্যালিটিতে কেরানিগিরি করেন। এত অল্প বেতনের চাকরিতেও তিনি কী করে এমন বিশাল একটি শরীর বানিয়েছেন কে জানে। বাংলাদেশী কিংকং। পালোয়ানদের মতো মাথাটা পর্যন্ত কামানো। সোবাহান কাঁচুমাচু মুখে বলল, বুলু আছে ?

আছে। কেন ?

একটু দরকার ছিল।

মামা বিরক্ত স্বরে ডাকতে লাগলেন, এই বুলু! বুলু!

বুলুর সাড়া পাওয়া গেল না।

ওর জ্বর, শুয়ে আছে বোধহয়। অন্য আরেকদিন এসো। নাকি কোনো বিশেষ দরকার ?

বিশেষ দরকার। একটা চাকরির ব্যাপারে।

আর চাকরি—ওর কপালে চাকরি ফাকরি নাই। যাও ভেতরে চলে যাও। বুলুর ঘর চেনো তো ?

চিনি।

বুলু চাদর গায়ে বিছানায় পড়ে ছিল। দাড়ি গোঁফ গজিয়ে সন্ন্যাসীর মতো লাগছে। সে বিরক্ত গলায় বলল, কতদিন বলেছি ছুটির দিনে আসবি না।

তোর কী হয়েছে ?

জন্ডিস।

কতদিন হলো ?

তা দিয়ে কী করবি ? ওইদিন অসুখ শরীরে খবর দিয়ে এলাম—তুই একটা খোঁজ তো নিবি! কী ব্যাপার!

কী ব্যাপার ?

বুলু জবাব দিল না। গম্ভীর হয়ে রইল।

সোবাহান সিগারেট বের করল। বুলু বিরক্ত মুখে বলল, সিগারেট ধরাস না।

কেন ?

মামা রাগ করে।

রাগ করার কী আছে ? বত্রিশ বছর বয়স হয়েছে এখনো সিগারেট খেতে পারবি না ?

আস্তে কথা বল। সিগারেট খেতে হলে বাইরে গিয়ে খেয়ে আয়।

আমি উঠলাম। যেদিন মামা থাকবে না সেদিন আসব।

আরে বস বস। কথা আছে। চায়ের কথা বলে আসি।

সোবাহান চমকাল। এটা নতুন কথা। বুলু কাউকে চা খেতে বলে না। মোড়ের চায়ের দোকানে নিয়ে যায়। বুলু ফিরে এসেই শুয়ে পড়ল। নিস্পৃহ গলায় বলল, চা আসছে। মামিকে বলে এসেছি।

ব্যাপার কী ? রাজার হালে আছিস মনে হয়। চাকরি হয়েছে নাকি ?

এখনো হয় নাই। হবে। শিগগিরই হবে।

বলিস কী! কোথায় ?

পিডিবিতে।

ম্যানেজ করলি কীভাবে ?

ঘুষ। সাত হাজার দিয়েছি। দশ হাজার চেয়েছিল।

পেলি কোথায় এত টাকা ? মাই গড!

বুলু গম্ভীর হয়ে গেল। চা দিয়ে গেল ওদের কাজের মেয়ে। কাপে কাঁচা মাছের গন্ধ। এক চুমুক খেয়েই সোবাহান কাপ নামিয়ে রাখল। বমি আসছে।

চা খাবি না ?

না, মাছের গন্ধ।

বুলু কিছু বলল না। তার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। চোখের বর্ণ হলুদ। মাথার চুলও মনে হয় পড়ে গেছে। ফাঁকা ফাঁকা লাগছে মাথা।

তোর কি টাক পড়ে যাচ্ছে নাকি ?

হুঁ। বাবার টাক ছিল। পৈতৃকসূত্রে পাওয়া। টাকাপয়সা কিছু পাই নাই। এটাই পেয়েছি।

ঘুষের টাকা জোগাড় করলি কীভাবে ?

বুলু গলার স্বর দুধাপ নামিয়ে ফেলে বলল, রেশমা দিয়েছে।

বলিস কী ?

হুঁ। চার হাজার টাকা সোনার ভরি। তিন গাছি চুড়ি দিয়েছে। একেকটা একেক ভরি। ভরিতে পাঁচ আনা করে খাদ কেটে ন'হাজার টাকা হয়েছে।

বাকি দু'হাজার টাকা কী করলি ?

করব আবার কী, আমার কাছেই আছে।

তোর মামা এসব জানে না ?

নাহ্।

রেশমার কাছে টাকা চাইতে লজ্জা লাগল না ?

নাহ্। তুই এখন যা সোবাহান। মাথা ঘুরছে। শুয়ে থাকব খানিকক্ষণ।

সোবাহান তবুও বসে রইল। বুলুর এখানে আসা হয় না। অনেকটা দূর। এসেই চট করে চলে গেলে পোষায় না। একটার দিকে সোবাহান বলল, চায়ের দোকানে যাবি নাকি ?

আরে না। আমার উঠার শক্তি নাই। তুই এখন যা। নাকি পয়সার দরকার ? লজ্জা করিস না, বল।

না।

দরকার থাকলে বল। ওই দু'হাজার টাকা থেকে দেব। এক মাসের মধ্যে ফেরত দিতে হবে। ওটা আমার বিয়ের টাকা। চাকরি হলেই বিয়ে করব।

চাকরি হবে কবে নাগাদ ?

বারো তারিখে ইন্টারভ্যু। সামনের মাসের এক তারিখে জয়েন করতে হবে।

বিয়ে কি সামনের মাসেই হবে ?

হুঁ। কি, তোর লাগবে কিছু ?

নাহ্।

লজ্জা করিস না।

রেশমা আছে কেমন ?

ভালোই আছে।

তোর অসুখের খবর জানে ?

নাহ্।

যদি চাস তো খবর দিয়ে আসতে পারি।

কী হবে খবর দিয়ে। খামাখা দুশ্চিন্তা করবে। সোবাহান, আজ তুই বাড়ি যা, কথা বলতে ভালো লাগছে না।

বাড়ি কোথায় যে যাব ?

অন্য কোথাও যা। অন্যদের বিরক্ত কর।

ঘরের ভেতর থেকে মামার হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে। ঝনঝন করে কিছু একটা ভাঙল। বাচ্চা একটা মেয়ে কাঁদতে শুরু করল। বুলু মৃদুস্বরে বলল, মামার রাগ উঠে যাচ্ছে। উঠ সোবাহান, আর না। আবার ঝন ঝন করে কিছু একটা ছুড়ে ফেলা হলো। মামার গলা শোনা গেল—সব কয়টাকে খুন করে ফেলব। পাগল বানাতে বাকি রেখেছে। উফ!

সোবাহান নিচুস্বরে বলল, এরকম রোজ হয় নাকি ?

রোজ হয় না, মাঝে মাঝে হয়। আমি বাজারে যেতে পারছি না। তাই রাগ উঠে গেছে।

রাগ কতক্ষণ থাকবে ?

কিছু একটা না-ভাঙা পর্যন্ত থাকবে। তুই এখন উঠ প্লিজ।

চিকিৎসা করাচ্ছিস, না শুয়ে আছিস শুধু ?

শুয়েই আছি। জণ্ডিসের কোনো চিকিৎসা নেই।

অড়হড়ের পাতা সিদ্ধ করে রস খা।

অড়হড়ের পাতা পাব কোথায়! যত ফালতু বাত। উঠ তো।

বুলু রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল। ক্লান্তস্বরে বলল, আর যাব না। হাঁটতে পারছি না। তুই এক কাজ কর, এই দুপুরে না খেয়ে যাবি কী। হোটেলে ভাত খেয়ে যা। পয়সা দিতে হবে না। বাকিতে খা, আমি পরে দিয়ে দেব।

দরকার নাই।

দরকার আছে। তুই যা। খাসির মাথা আর ডাল আছে। খারাপ না, ভালোই। আয় আমার সাথে, আমি বলে দেই—বিসমিল্লাহ হোটেল।

বুলু সোবাহানকে হোটেলে বসিয়ে চলে গেল। এই হোটেলে বুলু প্রায়ই খায়। বাসা ফেলে তাকে হোটেলে কেন খেতে হয় কে জানে!

সোবাহান দু'টার দিকে হোটেল থেকে বেরুল। কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। ছুটির দিন অফিস টফিস বন্ধ, নয়তো যে সব বন্ধুরা ঢাকায় চাকরি বাকরি করছে তাদের কাছে যাওয়া যেত। উত্তরা ব্যাংকের নিউ মার্কেট ব্রাঞ্চে আছে সফিক। তার কাছে গেলেই সে চা নাশতা খাওয়াবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফেরার পথে জোর করে পাঁচ টাকার একটা নোট পকেটে ঢুকিয়ে দেয়—এটা নাকি তাকে দেখতে আসার ফি। সফিক এটা যে শুধু সোবাহানের জন্যে করে তাই না, সবার জন্যে করে। সব বেকার বন্ধুদের জন্যে এই ব্যবস্থা। এ জন্যেই সফিকের কাছে যেতে ইচ্ছে করে না।

আবার উল্টো ধরনের চরিত্রও আছে। মতিঝিলের করিম। যে বেশ কিছুদিন ধরেই অফিস ম্যানেজার না কী যেন হয়ে বসে আছে। গরমের মধ্যে তাকে সার্ট ও টাই পরতে হয়। করিম এদের কাউকে দেখলেই বিরক্ত হয়ে বলে—কতদিন বলেছি অফিসটাইমে কেউ গল্প করতে আসে ? তোদের কি মাথা টাথা খারাপ ?

অফিসটাইম ছাড়া তোকে পাব কোথায় ?

এখন যা, এখন যা। আমার কাজ আছে।

কী কাজ ?

সদরঘাট যেতে হবে। একটা মাল ডেলিভারি নিতে হবে।

তোকে তো ধরে রাখছি না। তুই যা, আমরা ঠান্ডা ঘরে বসি খানিকক্ষণ। আড্ডা দেই। তুই তোর মাল নিয়ে আয়।

অফিস আড্ডা দেওয়ার জায়গা নাকি ?

করিম রাগে চিড়বিড় করতে থাকে।

করিমের হতাশ মুখ দেখতে বড় ভালো লাগে সবার। অ্যাশট্রেতে ছাই না ফেলে ওরা ইচ্ছা করে মেঝেতে ছাই ফেলে। হো হো করে হাসে। করিমের অফিসের সুন্দরী স্টেনোটি হেডমিস্ট্রেসের মতো চোখে তাকায়।

ছুটির দিনে এদের কারও কাছেই যাওয়া যায় না। বেকার বন্ধুদের কাছেও যাওয়া যায় না। ওদের সেদিন নানান কাজ থাকে। সপ্তাহের বাজার করতে হয়। এর বাড়ি ওর বাড়ি যেতে হয়। বুলুর কথাই ঠিক—ছুটির দিনে যে সবচেয়ে ব্যস্ত থাকে সে হচ্ছে একজন বেকার।

রোদ মরে আসছে। সোবাহান আকাশের দিকে তাকাল। মেঘ। আকাশ বিবর্ণ হতে শুরু করেছে। জোর বৃষ্টি হবে। সোবাহানের মন হঠাৎ ভালো হয়ে গেল। বুলু এই কথাটিও ঠিক বলে—আকাশে মেঘ দেখলে সবচেয়ে খুশি হয় বেকার যুবকেরা।

সোবাহান একটা পান কিনল। এবং ঝট করেই দেড় টাকা খরচ করে একটা ফাইভ ফাইভ কিনে ফেলল। মাঝে মাঝে বিলাসী হতে ইচ্ছা করে। অকারণে দেড় টাকা ছাই করে ফেলার মধ্যে একধরনের আনন্দ আছে।

বিকাল পাঁচটার দিকে বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টির আগে আগে সোবাহান চলে গেল মালিবাগে। রেশমা মালিবাগে থাকে। তবে তাকে পাওয়া যাবে কিনা কে জানে ? তাকে কখনো পাওয়া যায় না। সবসময় তার ডিউটি পড়ে অসময়ে। গত বছরই ডিউটি পড়ল ঈদের দিন।

রেশমার বাবা দরজা খুলে দিলেন।

রেশমা আছে ?

হ্যাঁ আছে। বসেন।

আমাকে চিনেছেন ?

জি। আপনি বুলবুলের বন্ধু। বসেন।

আপনার শরীর কেমন ?

ভালো না। বসেন রেশমাকে ডাকি।

ঝড়ের আশঙ্কায় জানালা-টানালা সব বন্ধ। ঘরের ভেতরে গুমোট। হাওয়া ভারী হয়ে আছে। সোবাহান জানালা খুলে দিতেই রঙিন পর্দা পালের মতো উড়তে লাগল। বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। টিনের ছাদ। ঝমঝম করে শব্দ হচ্ছে। অপূর্ব।

সোবাহান ভাই, কেমন আছেন ?

রেশমা গোসল করে এসেছে। চুলে গামছা জড়ানো। জলের সঙ্গে মেয়েদের কোনো একটা সম্পর্ক হয়তো আছে। গা-ভেজা সব মেয়েকেই জলকন্যার মতো লাগে।

আপনি এখানে এলেন প্রায় দু'মাস পর।

সোবাহান হাসল। মেয়েরা দিন-ক্ষণের হিসাব খুব ভালো রাখে।

আপনার বন্ধু বলছিল আপনি নাকি এক বুড়োর সঙ্গে থাকতে থাকতে বুড়োদের মতো হয়ে গেছেন। কথা টথা কম বলেন।

বুড়োরা কথা কম বলে নাকি ? আমার তো ধারণা ওরা কথা বলে সবচেয়ে বেশি।

কথা বেশি বলে রোগীরা। বকবক করে মাথা ধরিয়ে দেয়।

সোবাহানের ভয় হলো রেশমা হয়তো হাসপাতালের গল্প শুরু করবে। নার্সরা রোগীদের গল্প খুব আগ্রহ নিয়ে বলে। সে গল্পে সবকিছুই থাকে—রোগীর বয়স, তার বাড়ি, তার ছেলেমেয়ে; কিন্তু রোগের কথা থাকে না। রোগের যন্ত্রণার প্রসঙ্গ একবারও আসে না। সোবাহান কথার মোড় ঘোরাবার জন্যে বলল, বুলুর কাছে গিয়েছিলাম।

কেমন আছে আপনার বন্ধু ?

বেশি ভালো না, জণ্ডিস হয়েছে।

কী ধরনের জণ্ডিস ? ইনফেকটাস হেপাটাইটিস ?

তা তো জানি না।

বিলরুবিন টেস্ট করিয়েছে ?

জানি না। খুব সম্ভব না।

রেশমা হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে চলে এল। হাসিমুখে বলল, চায়ের সঙ্গে কী খাবেন ?

কী আছে ?

কিছুই নাই। আনাব। মুড়ি ভেজে দেই ?

দাও।

আপনি বসে বসে ঝড়বৃষ্টি দেখেন। আমি চা নিয়ে আসছি। দেরি হবে না।

রেশমা, একটা সিগারেটও আনতে বলবে।

সোবাহান বসে রইল একা একা। বসার ঘরটা ছোট হলেও বেশ গোছানো। সুন্দর একটা শোকেস আছে। যার নিচের তাকে বেশ কিছু গল্প-উপন্যাসের বই। বইগুলির একটিও মলিন নয়। ঝকঝক করছে। রেশমা বই পড়ে মলাট লাগিয়ে। পড়া হলেই মলাট খুলে শোকেসে তালা লাগিয়ে দেয়। বুলু একবার কী একটা বই নিয়ে তরকারির সরুয়া ভরিয়ে ফেরত দিল। রেশমা রাগে তিনদিন কথা বলল না।

ঘর অন্ধকার হয়ে আসছে। বাতি জ্বালাতে ইচ্ছে করছে না। জ্বালাতে গেলে হয়তো দেখা যাবে কারেন্ট নেই। সোবাহান নিচু হয়ে বসে বইগুলির নাম পড়তে চেষ্টা করল। গল্পের বই-টই অনেকদিন পড়া হয় না। কী হবে গল্পের বই পড়ে ? একজন বানানো মানুষের কথা পড়ে কী লাভ ? সেই বানানো মানুষটি প্রেম করে হাসে কাঁদে। কী আসে যায় তাতে ? কিছুই আসে যায় না।

সোবাহান ভাই, চা নেন। ঘর অন্ধকার করে বসে আছেন কেন ? এই নেন সিগারেট।

কাগজে মোড়া দুটো সিগারেট রেশমা বাড়িয়ে দিল।

একটার কথা বলেছিলাম, দুটো আনলে কেন ?

মেয়েরা কোনো জিনিস একটা দেয় না।

চা কিন্তু এক কাপ দিয়েছ।

রেশমা হেসে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, আপনার বন্ধু কি গয়না প্রসঙ্গে কোনো কথা বলেছে ?

বলেছে।

আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল কাউকে বলবে না। এখন আমার মনে হয় সবার কাছেই বলে বেড়াচ্ছে। এটা ঠিক না।

প্রতিজ্ঞা করা হয় প্রতিজ্ঞা ভাঙার জন্যেই। এটাই নিয়ম।

রেশমা কিছু বলল না, গম্ভীর হয়ে রইল। সোবাহান বলল, ওর চাকরিটা খুব দরকার। কিছু না হলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

আপনার দরকার নাই ?

আমারও দরকার। তবে ওর যেমন চাকরি পেলেই বিয়ে করার প্ল্যান আমার তো তেমন কিছু নেই।

রেশমা বলল, ওর অসুখ কি খুব বেশি ?

খুব বেশি না। আমার সঙ্গে তো হোটেল পর্যন্ত এল।

আপনার অসুখের কী অবস্থা ?

আমার আবার কী অসুখ ?

ও বলছিল রাতে নাকি আপনি ঘুমাতে পারেন না। শুধু মনে হয় কানের কাছে মশা পিন পিন করছে।

বুলু বলেছে না ?

হ্যাঁ। তাছাড়া আপনার স্বাস্থ্যও অনেক খারাপ হয়েছে। দাড়ি কামান না কেন ?

যেদিন ইন্টারভ্যু থাকে সেদিন সকালে কামাই। আজ কোনো ইন্টারভ্যু ছিল না।

ও বলছিল আপনার নাকি একটা চাকরি হবে হবে করছে।

জানি না।

সোবাহান উঠে দাঁড়াল।

এই বৃষ্টির মধ্যে যাবেন কোথায় ?

আমার ভিজে অভ্যাস আছে। কিচ্ছু হবে না।

রেশমার বাবা বসে আছেন বারান্দায়। তিনি যন্ত্রের মতো বললেন, আবার আসবেন।

রেশমার বিয়ের পর এই ভদ্রলোক কোথায় থাকবেন ? মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে থাকতে তাঁর কেমন লাগবে ? তাঁকে অবশ্যি থাকতেই হবে। তাঁর জায়গা নেই। এজন্যেই কি রেশমার কাছে যারা আসে তাদের সঙ্গে তিনি এত ভদ্র ব্যবহার করেন ? বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মাথায় মুড়ি কিনতে যান ?

১২

জলিল সাহেব অফিস থেকে একটা সিলিং ফ্যান নিয়ে রাত ন'টার দিকে ফিরলেন। সিলিং ফ্যানের পাখাগুলি একত্র করে বাঁধা। বডিটি বাজারের চটের ব্যাগে লুকানো। জলিল সাহেবের মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে এই সিলিং ফ্যানে কোনো রহস্য আছে।

রহস্য বোঝা গেল রাত দশটার দিকে। ফ্যানটা অফিসের। দারোয়ান সাড়ে তিনশ টাকার বিনিময়ে প্যাক করে দিয়েছে।

সোবাহান সাহেব।

জি।

কাজটা খারাপ হলো নাকি ? মনটা খচখচ করছে।

সোবাহান কিছু বলল না।

খারাপ হলেও কিছু করার নাই। গরমে মরব নাকি ? তাছাড়া দারোয়ান ব্যাটা আমাকে না পেলে অন্য কাউকে বিক্রি করত।

তা করত।

গরম সহ্য হয় না রে ভাই। এখন ফ্যান খুলে নাক ডাকিয়ে ঘুমাবেন। এক ঘুমে রাত কাবার। হা হা হা।

সেই রাতেই তিনি ফ্যান লাগাবার মিস্ত্রি নিয়ে এলেন। তার উৎসাহের সীমা রইল না। রাত এগারোটার দিকে ফ্যান ঝুলানো হলো। রেগুলেটর বসানো হলো। কিন্তু পাখা ঘুরল না। মিস্ত্রি বিরসমুখে বলল, মটর নষ্ট। কয়েল পুড়ে গেছে। এই পাখা ঘুরবে না।

জলিল সাহেবের মুখ অনেকখানি লম্বা হয়ে গেল। সোবাহান বলল, ফ্যান ফেরত দিয়ে টাকা নিয়ে আসেন।

টাকা আর ফেরত পাব ? কী যে বলেন! বেশ্যার ধন সাত ভূতে খায়। আমার টাকাপয়সা হচ্ছে বেশ্যার টাকাপয়সার মতো। সাত ভূতে খাবে। লুটেপুটে খাবে।

নতুন কয়েল লাগালে চলবে বোধহয়।

আরে চলবে না।

জলিল সাহেব বারান্দায় বসে রইলেন। সান্ত্বনার কথা কিছু বলা দরকার বোধহয়। এতগুলি টাকা। সোবাহান চেয়ার টেনে এনে বারান্দায় বসল।

সোবাহান সাহেব।

জি।

সাত ভূতে লুটে খেয়েছে বুঝলেন ? দরিদ্র মানুষ টাকাপয়সা যা জমিয়েছি এইভাবে গেছে। পাঁচ হাজার টাকা জমিয়েছিলাম ব্যাংকে। রাতারাতি বড়লোক হওয়ার জন্যে একজনকে দিলাম টাকাটা। সে নারিকেল ছোবড়া কিনে এনে ঢাকায় বেচবে, যা লাভ তার চল্লিশ ভাগ তার। ষাট ভাগ আমার। পাঁচ বছর আগের কথা। এখনো সেই ছোবড়া এসে পৌঁছায়নি।

এখন আর এসব চিন্তা করে কী করবেন ?

বুড়ো বয়সে খাব কী বলেন ? ছেলে নাই যে ছেলে খাওয়াবে। বিষয়সম্পত্তি নাই। ভিক্ষা করতে বলেন ?

এত দূরের কথা এখনি ভাবার দরকার কী ?

দূর ? দূর কোথায় দেখলেন। সাত বছর আছে চাকরি। কেঁদে টেদে পড়লে বছরখানিকের এক্সটেনশন হতে পারে। ব্যস।

চলেন চা খেয়ে আসি।

না, চা-টা কিছু খাব না। আপনি যান। আমি ঠিক করেছি দারোয়ান শালাকে খুন করে ফাঁসিতে ঝুলব।

খুনটা করবেন কীভাবে ?

ফ্যানের ডাণ্ডাটা খুলে কাল অফিসে নিয়ে যাব।

সোবাহান শব্দ করে হেসে উঠল। আরও কিছুক্ষণ পর দেখা গেল দু'জনে চায়ের দোকানের দিকে যাচ্ছে। রাস্তায় নেমেই সোবাহান হালকা স্বরে বলল, শুধু চা না। আজ চায়ের সাথে দৈ মিষ্টি।

কেন ?

বুলুর চাকরির ব্যবস্থা হয়েছে।

তাতে আপনি মিষ্টি খাওয়াবেন কেন ? বুলু খাওয়ালে খাওয়াবে। আপনি কে ?

ও আমার খুব প্রিয় মানুষ। বড় কষ্ট করেছে।

জলিল সাহেব টেনে টেনে বললেন, বন্ধু, বান্ধবের চাকরিতে এত খুশি হওয়ার কিছু নাই। এখন আপনাকে সে পুছবেও না।

না পুছলেও কিছু যায় আসে না।

বড় বড় কথা বলা সহজ। দুদিন পরে দেখবেন বলতে পারছেন না। দুনিয়াটা নিজের, অন্যের না। বুঝলেন ভাই।

সোবাহান কিছু বলল না। জলিল সাহেব বললেন, বেতন কত দিয়েছে ?

এখনো জানে না। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পায় নাই।

বুঝল কী করে চাকরি হয়েছে ?

ঘুষ দিয়েছে সাত হাজার টাকা।

টাকাও গেল, চাকরিও গেল।

জলিল সাহেবকে প্রথম উৎসাহিত হতে দেখা গেল। তিনি চোখমুখ উজ্জ্বল করে বললেন, বুলু সাহেব এই চাকরি পেলে আমি আপনার গু চেটে খাব। টাকা গেছে যেই পথে চাকরি গেছে সেই পথে। হা হা হা। বুলু সাহেব খুব কাঁচা কাজ করেছে।

পরপর দু'কাপ চা খাওয়ার পর জলিল সাহেব দৈ মিষ্টি খেলেন। তারপর তার ঠান্ডা কিছু খাবার ইচ্ছা হলো। তিনি ইতস্তত করে বললেন, একটা ফান্টা কিনে দুজনে ভাগ করে খাই, কি বলেন ?

আমি খাব না। আপনি খান।

আরে ভাই খান না। গরমের মধ্যে ভালোই লাগবে। এই, ঠান্ডা দেখে একটা ফান্টা দাও।

ফান্টা খেয়ে শেষ করতে করতে বারোটা বেজে গেল। জলিল সাহেব অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়ালেন। পথে নেমেই বললেন, তালের রস খাবেন নাকি ? তাড়ি যার নাম। খাঁটি বাংলাদেশী জিনিস।

জি-না।

চলেন যাই এক গ্লাস করে খেয়ে আসি। এক টাকা করে গ্লাস। বেশি দূর যেতে হবে না।

না, শুয়ে পড়ব।

শুয়ে পড়লে লাভ তো কিছু হবে না। গরমের মধ্যে ঘুমাবেন কীভাবে ? চলেন যাই। যাব আর আসব। জিনিসটা ভালো। চেখে দেখেন।

আজ না। আরেকদিন দেখব।

জলিল সাহেব বিমর্ষ মুখে বাসার দিকে রওনা হলেন। ঘরে ঢুকলেন না, বসে রইলেন বারান্দায়। তার নাকি ফ্যানটার দিকে তাকালেই মাথায় রক্ত উঠে যাচ্ছে। সোবাহান শুয়ে শুয়ে শুনল, জলিল সাহেব নিজের মনে কথা বলছেন, কষ্টের পয়সা। খেয়ে না-খেয়ে জমানো পয়সা—কীভাবে যায়!

সোবাহান গলা উঁচিয়ে ডাকল, কত রাত পর্যন্ত বসে থাকবেন ? আসেন শুয়ে পড়ি।

জলিল সাহেব কোনো জবাব দিলেন না। কতক্ষণ এভাবে বসে কাটাবেন কে জানে।

১৩

রহমান সাহেব আজও অফিসে আসেননি।

সোবাহান চরম ধৈর্যের পরিচয় দিল। লাঞ্চ আওয়ার পর্যন্ত বসে রইল একভাবে। ডান পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেল। তবু নড়ল না। বাথরুমে যাওয়া দরকার তাও গেল না। একভাবে বসে থেকে নিজেকে কষ্ট দেওয়া। এর পেছনে উদ্দেশ্য আছে। সোবাহান দেখেছে খুব কষ্টের পর একটা কিছু ভালো ঘটে যায়। আজও হয়তো এরকম হবে। হঠাৎ দেখা যাবে লাঞ্চের পর এস. রহমান সাহেব এসে পড়েছেন। সোবাহানকে দেখে

বললেন—ও আপনি! আসুন, উপরে চলে আসুন। কাজের ঝামেলায় ব্যস্ত ছিলাম দেখা হয়নি। তার জন্যে অত্যন্ত লজ্জিত। আজ যত কাজই থাকুক আপনারটা আগে শেষ করব। কিছু খাবেন ? ঠান্ডা কিছু ?

বাস্তবে সেরকম কিছু ঘটল না। লাঞ্চ আওয়ারে সবাই খেতে টেতে গেল। আবার ঘণ্টাখানিক পর ফিরেও এল। রহমান সাহেবের দেখা নাই। রিসিপশনিস্ট মেয়েটি আজ তাকে দেখেও দেখছে না। নাকি ভুলে গেছে ? কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়—আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন ? আমি শ্যামলীতে থাকি, সোবাহান। রহমান সাহেবের পি.এর সঙ্গে একবার কথা কাটাকাটি হয়েছিল ? মনে আছে আমাকে ?

মনে থাকার ব্যাপারটি বিচিত্র। কাউকে কাউকে একবার দেখলেই সারা জীবন মনে থাকে। আবার এমন লোকও আছে যাদের সঙ্গে বারবার দেখা হয় তবু তাদের কথা মনে থাকে না। প্রতিবারই তাদের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করতে হয়। যেমন বুলু। বুলু বলে, দেশের বাড়িতে পাঁচ-সাত দিন থেকে ঢাকায় এলে তার মামা নাকি তাকে চিনতে পারেন না। বুলুকে মাথা নিচু করে বলতে হয়—আমি বুলবুল। বুলুর ধারণা সব মানুষের চেহারার সঙ্গে কারও-না-কারও মিল থাকে। পরিচিত কাউকে সে মনে করিয়ে দেয়। এ জন্যেই কোনো মানুষকেই কখনো পুরোপুরি অচেনা লাগে না। বুলুকে লাগে। সে নাকি কাউকে মনে করিয়ে দেয় না।

সোবাহান সাহেব!

সোবাহান চমকে তাকাল। রিসিপশনিস্ট মেয়েটি তাকে ডাকছে। নাম তাহলে মনে আছে। সোবাহান এগিয়ে গেল। পায়ে ঝিঁঝি ধরেছে। হাঁটতে হচ্ছে খুড়িয়ে খুড়িয়ে। মেয়েটি হাসিমুখে তাই দেখছে।

আমাকে কিছু বলছেন ?

হ্যাঁ। রহমান সাহেব টেলিফোন করেছেন তিনি সাড়ে তিনটার দিকে আসবেন। আপনি কি বসবেন এতক্ষণ ?

হ্যাঁ বসব।

অফিস ইউনিয়নের সঙ্গে তাঁর একটা মিটিং আছে। মিটিং শেষ হতে কতক্ষণ লাগবে কে জানে।

লাগুক যতক্ষণ লাগে। আমি বসে থাকব। বাইরে রোদে ঘোরাঘুরি করার চেয়ে এখানে বসে থাকায় আরাম আছে।

মেয়েটি হাসিমুখে বলল, ইউনিয়নের সঙ্গে মিটিংয়ের পর স্যারের মেজাজ খুব খারাপ থাকে। আপনার যাওয়া উচিত যখন তাঁর মেজাজ থাকে ভালো।

মেজাজের ওপর তো চাকরি হবে না। চাকরি হওয়া না-হওয়ায় মেজাজটা কোনো ডিটারমিনিং ফেক্টর নয়।

যেভাবে কথা বলছেন তাতে মনে হয় ডিটারমিনিং ফেক্টরগুলি আপনার পক্ষে।

আমি এখনো জানি না। একজন ভদ্রমহিলা আমাকে একটা চিঠি দিয়ে এখানে পাঠিয়েছেন। ভদ্রমহিলার ধারণা চিঠি দেখানো মাত্র আমার চাকরি হবে।

দেখিয়েছিলেন ?

হ্যাঁ।

কী বললেন চিঠি পড়ে।

পরে দেখা করতে বললেন।

মেয়েটি ইতস্তত করে বলল, কী লেখা ছিল সেই চিঠিতে জানেন ?

খামের চিঠি, আমি পড়ে দেখিনি।

আপনার পায়ের ঝিঁঝি এখনো কমে নাই ?

জি-না। কমতে অনেক সময় লাগছে।

শেষ প্রশ্নটিতে সোবাহান বেশ অবাক হলো।

আপনি তো সারা দুপুর কিছু খাননি ? আমাদের এখানকার স্টাফদের জন্যে ক্যান্টিন আছে। দুপুরে রুটি-গোশত পাওয়া যায়। আপনি ইচ্ছে করলে সেখানে খেতে পারেন। বেশ সস্তা।

আমি তো স্টাফ না।

একদিন হয়তো হবেন। আসেন আমার সঙ্গে, আমি বলে দিচ্ছি। আমিও না হয় আপনার সঙ্গে চা খাব এক কাপ।

সোবাহানের বুক শুকিয়ে গেল। পকেটে টাকা আছে ছ'টি। রুটি-গোশত খেতে কত লাগবে কে জানে। একটি মেয়ের সামনে কখনো বলা যায় না—ভাই, আমার তো দু'টি টাকা কম পড়েছে। কাল এসে দিয়ে যাব। কিছু মনে করবেন না।

না খেয়েই বসে থাকবেন, না যাবেন ?

আজ আর অপেক্ষা করব না। বাসায় চলে যাব। কাল পরশু একবার আসব।

সোবাহান মেয়েটিকে দ্বিতীয় কথা বলার সুযোগ না দিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল।

বাসে করে শ্যামলী এসে পৌঁছাতে লাগল পঁয়তাল্লিশ মিনিট। ফাঁকা বাস। ফাঁকা বাসে উঠে বসলে আপনাতেই মন ভালো হয়ে যায়। সিগারেট ধরিয়ে মুখ ভর্তি করে ধোঁয়া ছাড়তে ইচ্ছা করে।

মন ভালো ভাবটি বাসায় পৌঁছেও বজায় রইল। সোবাহান দেখল চারটি চিঠি এসেছে তার নামে। একটি খুলে পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। খামের আকৃতি ও রঙ দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা একটা রিগ্রেট লেটার। উপরের ঠিকানাটা যেহেতু বাংলায় ভেতরের চিঠিটিও বাংলাতেই লেখা। লেখার ধরনটাও বলে দেওয়া যায়। 'জনাব, আপনাকে অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বর্তমানে আমাদের সংস্থায় কোনো কর্মখালি নাই। ভবিষ্যতে কোনো শূন্য পদ সৃষ্টি হইলে আপনার সহিত যোগাযোগ করা হইবে। আর এই বিষয়ে কোনো অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই।'

ভেতরের লেখা কী হবে জেনেই এই খামটিই সোবাহান আগে খুলল। যা ভাবা গিয়েছে তা নয়। চোখ দান করার জন্যে অনুরোধ করে লেখা। ছাপানো চিঠি। শেষ লাইনে লেখা—'মৃত্যুর পরও আপনার চোখ অনেকদিন বেঁচে থাকবে। এর চেয়ে চমৎকার ব্যাপার আর কী হতে পারে?'

মৃত্যুর পর চোখ বেঁচে থাকার মধ্যে চমৎকারের কী আছে? যদি কিছু থেকেও থাকে তবে তা অনুভব করার মানুষটি কোথায়? সোবহান চিঠিটি ড্রয়ারে ভরে রাখল। ঠিকানা জোগাড় করে চিঠি দিয়েছে সেই কারণেই দু'টি চোখ দিয়ে দেওয়া দরকার। মৃত্যুর পর চোখ বেঁচে থাকবে সে-জন্যে নয়।

দেশ থেকে এসেছে দু'টি চিঠি। একটি ভাবির, অন্যটি ফরিদ আলির। এ চিঠি দুটি রাতে খাওয়াদাওয়া শেষ করে আরাম করে পড়তে হবে।

চতুর্থ চিঠিটির হাতের লেখা অপরিচিত। কে হতে পারে? পুরনো বন্ধুদের কেউ? তারাপদ নয় তো? আইএসসি পাশ করে কীভাবে চলে গেল জার্মানি, তারপর আর খোঁজখবর নেই। হয়তো দেশে ফিরে ঠিকানা বের করে লিখেছে। তারাপদের কথা খুব মনে হয়।

চিঠি তারাপদের নয়। চিঠিটি মিলির লেখা। বিরাট এক কাগজে চার-পাঁচ লাইনের ছোট্ট চিঠি।

> সোবাহান ভাই,
>
> আম্মা চাকরির জন্যে যে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন আপনি কি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন? আম্মা তা জানতে চান। এখনো দেখা না করে থাকলে খুব অন্যায় করেছেন। দেখা করবেন, ফলাফল জানাবেন।
>
> মিলি

সোবাহান হাতমুখ ধুয়ে অবেলায় হোটেলে খেতে গেল। এখন ভাত খাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। গরম গরম সিঙ্গারা ভাজা হচ্ছে। দু'টি সিঙ্গারা এক কাপ চা খেয়ে বাসায় ফিরে দেখে, মনসুর সাহেব বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে শুয়ে আছেন।

স্লামালিকুম। আপনার কি শরীর খারাপ?

না ভাই, শরীর ঠিকই আছে। আপনারা আছেন কেমন?

ভালোই আছি।

ফ্যান কিনেছেন দেখলাম। ভালোই করেছেন। যা গরম। বাইরে একটা চেয়ার এনে বসেন না গল্প করি।

সোবাহান চেয়ার এনে বসল। মনসুর সাহেব হাসিমুখে বললেন, আজই আপনার ভাইয়ের একটি চিঠি পেয়েছি। বিয়ের ব্যাপার আষাঢ় মাসের মধ্যে সেরে ফেলতে চান। আমাদের আপত্তি আছে কি না জানতে চেয়েছেন।

সোবাহান কিছুই বলল না।

আমাদের তরফ থেকে কোনোই আপত্তি নাই। শুভ কাজ। যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো। আপনাকে জানিয়ে দিলাম। আপনার ভাইকেও আজকালের মধ্যে চিঠি লিখব।

ভদ্রলোক পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেট বের করলেন।

নেন, সিগারেট নেন। যূথিকে চা দিতে বলেছিলাম। আপনার জন্যেও দিতে বলি। আর ভাই শোনেন, ওকে নিয়ে যদি বাইরে টাইরে যেতে চান—চিড়িয়াখানা পার্ক এসব আর কী, তাহলে যাবেন। অসুবিধা কিছু নাই। বিয়ের আগে চেনা থাকা দরকার। যূথি! যূথি!

যূথি বের হয় এল। সোবাহানকে দেখে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

দাও, তোমার সোবাহান ভাইকে চা দাও।

মেয়েটির মাথা আরও নিচু হয়ে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল উল্টোদিকে। মনসুর সাহেব বললেন, আপনি আর জলিল সাহেব পরশু রাতে আমার এখানে চারটা ডালভাত খাবেন।

সোবাহান নিচুস্বরে বলল, তার কোনো দরকার নেই।

আছে দরকার আছে। রোজ রোজ হোটেলে খান। মাঝে মধ্যে ঘরের খাওয়াদাওয়া দরকার। যূথি, তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? চা দিতে বললাম না? নাকি কানে আজকাল শুনতে পাও না।

যূথি দ্রুত ঘরের ভেতরে ঢুকতে গিয়ে কপালের সঙ্গে ধাক্কা খেল। মনসুর সাহেব অস্ফুট স্বরে বললেন, সংয়ের মতো চলাফেরা, অসহ্য!

মনসুর সাহেবের মন ভালো নেই। তাঁর স্ত্রী আজ অন্যদিনের চেয়েও বেশি বিরক্ত করছে।

১৪

বুলু চিঁচি করে বলল, আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেন।

বুলুর মামা হুদা সাহেব বললেন, হাসপাতাল কেন?

আমার অবস্থা সুবিধার না।

তুই বুঝলি কী করে?

বোঝা যায়, অবস্থা খারাপ হলে ডাক্তারের আগে টের পায় রোগী।

হুদা সাহেব তাকিয়ে রইলেন বুলুর দিকে। গতকাল থেকে বুলু ফটফট করে কথা বলছে। আগে তার ছায়া দেখলে বুলুর দম বন্ধ হয়ে আসত। হ্যাঁ কিংবা না বলতেই তিনবার বিষম খেত। এখন দিব্যি কথাবার্তা বলছে। কথা বলবার ভঙ্গি এরকম যেন ইয়ার দোস্তের সঙ্গে আলাপ করছে। হুদা সাহেব বহু কষ্টে রাগ সামলালেন। কঠিন স্বরে বললেন, চুপচাপ শুয়ে থাক।

শুয়েই তো আছি। বসে আছি নাকি?

ফটফট করছিস কেন?

ফটফট করছি না। হাসপাতালে ভর্তি করতে বলছি। যত তাড়াতাড়ি সেটা করা যায় ততই ভালো। দি আরলিয়ার দি বেটার।

বুলুর গালে একটা চড় বসাবার প্রচণ্ড ইচ্ছা বহু কষ্টে সামলে হুদা সাহেব পাশের ঘরে গেলেন। ন'টা বেজে গেছে, অফিস যেতে হবে। পাগলামি শুনবার সময় নেই। বুলু ডাকল, মামা! ও মামা!

কী ?

চিন্তা করে দেখলাম আপনার পক্ষে আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করা সম্ভব না। চেহারা পালোয়ানের মতো হলেও হাসপাতালের লোকজন বডিবিল্ডারদের পাত্তা দেয় না। আপনি বরং আমার বন্ধুদের কাউকে খবর দেন।

হুদা সাহেব এই প্রথমবার শান্তস্বরে কথা বললেন। অবিশ্বাস্য রকমের নরম সুরে বললেন, অফিস থেকে এসে দেখব কী ব্যাপার। জয়নাল ডাক্তারকে বলে যাব, দুপুরে একবার যেন দেখে যায়।

হুদা সাহেব অফিস গেলেন চিন্তিত মুখে।

বুলু আর কোনো সাড়াশব্দ করল না। বুলুর মামি দুপুরে এক বাটি চিড়ার পানি এনে খাওয়াতে চেষ্টা করলেন। কয়েক ঢোক গিলেই বুলু বমি করল।

মামি, তোমার শাড়ি বোধহয় নষ্ট করে দিলাম।

মামি কিছু বললেন না। তাকে খুব চিন্তিত মনে হলো। এই ছেলেটির প্রতি তার খুব মমতা।

মামি, বাথরুমে যাওয়া দরকার। ধরতে পারবে ?

পারব।

তোমার যে স্বাস্থ্য, নিজেকেই সামলাতে পার না।

শরীরটা বেশি খারাপ বুলু ?

হুঁ।

তোর মামার সঙ্গে এইভাবে কথা বলিস নারে বাবা। লোকটা রাগলে মুশকিল। আমারও মুশকিল।

অল্প কয়েকটা দিন অপেক্ষা করো মামি। চাকরি শুরু করলেই তোমাকে নিয়ে যাব আমার বাসায়। মামাকে টিট করে দেব। থাক ব্যাটা একা একা বাসায়।

ছিঃ, এইসব কী ধরনের কথা! হাজার হলেও তো মামা।

তাও ঠিক। মামা। মায়ের ভাই। মাদারস ব্রাদার।

তোর ধারণাও ঠিক না—তোকে একেবারে যে অপছন্দ করে তাও না। পছন্দও করে।

বলো কী ?

গত রাতে একবার জিজ্ঞেস করল, তুই ভাত খেয়েছিস কি না।

বলো কী ? এত বড় সৌভাগ্য আমার! শুনে বড় আনন্দ হচ্ছে মামী। এখন তুমি আমাকে তাড়াতাড়ি বাথরুমে নাও। বিছানা নষ্ট করে দেব।

হুদা সাহেব দুপুরবেলাতে ফিরে এলেন। বুলু পড়ে আছে মরার মতো। ডাকলে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। হুদা সাহেব দুপুরে কিছুই খেলেন না। ছুটাছুটি শুরু করে দিলেন। মিউনিসিপ্যালিটির সামান্য জুনিয়ার ক্লার্ক হয়েও সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় বেলা চারটার সময় তিনি মিটফোর্ড হাসপাতালে একটি সিট জোগাড় করে ফেললেন। হাসপাতালের রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ান রোগী দেখে চমকে উঠে বললেন, এত খারাপ অবস্থা! রোগী তো যে-কোনো সময় চলে যাবে। আগে আপনারা করেছেন কী ?

হুদা সাহেব হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করলেন। এটি হাসপাতালের একটি পরিচিত দৃশ্য। রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ানের কোনো ভাবান্তর হলো না। তিনি একটি সিগারেট ধরিয়ে শান্তস্বরে বললেন, বাইরে চলে যান। কান্নাকাটি যা করার বাইরে গিয়ে করবেন। এখানে সিন ক্রিয়েট করবেন না। এতে কাজের ক্ষতি হয়।

১৫

রিসিপশনিস্ট মেয়েটিকে আজ অপূর্ব লাগছে। সবুজ রঙের শাড়িতে কাউকে এত মানায় নাকি ?

সোবাহান সাহেব, আপনি কেমন আছেন ?

ভালোই আছি।

বসুন, আজ স্যারের সঙ্গে দেখা হবে।

কেমন করে বুঝলেন ?

রিসিপশনিস্ট মেয়েটি মিষ্টি করে হাসল।

আমি স্যারকে আপনার কথা বলে রেখেছি।

কী বলেছেন ?

বলেছি একজন ভদ্রলোক অনেকদিন ধরে আপনার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করছেন। স্যার বললেন—এগারোটার সময় তাঁর কাছে আপনাকে পাঠাতে।

থ্যাংক ইউ।

সোবাহান সাহেব, আপনি বসুন।

সোবাহান বসল না, মেয়েটির ডেস্কের কাছেই দাঁড়িয়ে রইল।

মনে হচ্ছে আপনার কিছু একটা হবে।

এরকম মনে হচ্ছে কেন ?

স্যার নাম বলতেই আপনাকে চিনতে পারলেন। আপনি যে অ্যাপ্লিকেশন করেছেন সেটি আনতে বললেন। চা খাবেন ?

না।

না কেন, খান। আপনি বসুন, আমি চা পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। গেস্টদের চা দেওয়ার আমাদের যে নিয়ম ছিল সেটি এখন আর নেই। চা আনতে হবে ক্যানটিন থেকে।

ঝামেলা করার দরকার নেই।

ঝামেলা কিছু না।

সোবাহান বসে রইল চুপচাপ। আজই কি সেই বিশেষ দিন ? বিশ্বাস হতে চায় না। কোনো কিছুতেই এখন আর বিশ্বাস আসে না। চার বছর কাটল চাকরি ছাড়া। চার বছর খুব লম্বা সময়। এর মধ্যে এক বছর কেটেছে প্রাইভেট ট্যুশনি করে। সেই ছেলে মেট্রিক পরীক্ষায় তিন সাবজেক্ট ফেল করায় ট্যুশনি গেল।

বুলু কোত্থেকে প্রুফ রিডিংয়ের চাকরি জোগাড় করে আনল। তার খুব উৎসাহ। বিনা পরিশ্রমে ঘরে বসে রোজগার। মূলধন হচ্ছে—একটা লাল শিস কলম। গভীর রাত পর্যন্ত দু'জনে মিলে প্রুফ দেখাদেখি। সে কাজও বাদ দিতে হলো। পয়সা যা পাওয়া যায় তাতে পোষায় না।

এরমধ্যে করিম প্রাইজবন্ডের ব্যবসার এক খবর নিয়ে এল। পুরনো প্রাইজবন্ড কিনে মিলিয়ে দেখা প্রাইজ আছে কি না। অনেকেই না দেখে প্রাইজবন্ড বিক্রি করে দেয়। একটা পঞ্চাশ হাজার লাগাতে পারলেই ব্যবসার ক্যাপিটাল চলে আসবে হাতে। করিমের খাতায় গত দশ বছরের প্রাইজ পাওয়া বন্ডের নাম্বার লেখা আছে। কাজ হচ্ছে বন্ড কেনা। নাম্বার মিলিয়ে দেখা প্রাইজ আছে কি না। না থাকল বিক্রি করে দেওয়া।

করিম চোখের সামনে পাঁচ হাজার টাকার একটা প্রাইজ বাঁধিয়ে ফেলল। কী তুমুল উত্তেজনা। তারা তিনজন মিলে মানিকগঞ্জ, টঙ্গি, জয়দেবপুর হেন জায়গা নেই যে যায়নি। বুলু এবং সোবাহান বেশিদিন টিকে থাকতে পারল না। করিম ঝুলেই রইল।

অনেকদিন দেখা হয় না করিমের সাথে। চিটাগাং-এ কোন এক ফার্মে নাকি একটা চাকরি হয়েছে। এখনো প্রাইজবন্ডের সন্ধানে ঘোরে কি না কে জানে।

বড় কষ্ট গিয়েছে জীবনের ওপর। বড়ই কষ্ট। কাজ ছাড়া মানুষ থাকতে পারে ? সবচেয়ে অস্বস্তি লাগে ছুটির দিনে। সবার ছুটি, তাদের ছুটি নেই। ছুটি আসে কাজের সঙ্গে। কাজ নেই ছুটিও নেই।

সোবাহান সাহেব।

জি।

যান, স্যারের কাছে যান। এগারোটা বাজে।

এস. রহমান সাহেব হাসিমুখে বললেন, বসুন বসুন। শুনলাম আপনি বেশ কয়েকবার এসেছেন—দেখা হয়নি আমার সঙ্গে।

জি স্যার।

দারুণ ব্যস্ততার মধ্যে থাকি। নানান ঝামেলা। আমি খুবই লজ্জিত—আপনার এতটা ট্রাবল হলো।

কোনো ট্রাবল না স্যার। এমনিতে তো ঘরেই বসে থাকতাম।

চা খাবেন ?

জি-না। এক কাপ খেয়েছি।

খান, আরেক কাপ খান। আমার সঙ্গে খান।

রহমান সাহেব বেল টিপলেন। চায়ের কথা বললেন। একটা চুরুট ধরালেন। ধরিয়ে আবার নিভিয়েও ফেললেন।

সোবাহান সাহেব।

জি স্যার।

ঠিক এই মুহূর্তে আপনাকে আমরা এবজর্ভ করতে পারছি না।

সোবাহান তাকিয়ে রইল।

ফার্মের অবস্থা ভালো নয়। গত বছর আমরা তিন লক্ষ টাকা লস দিয়েছি। ইউনিয়নের চাপে পড়ে বিশ পারসেন্ট হাউসরেন্ট দিতে হয়েছে। ওরা বুঝতে পারছে না ফার্মের কী ক্ষতিটা ওরা করছে। ফার্মের উন্নতি মানেই ওদের উন্নতি, এই সহজ সত্য ওরা বোঝে না। শুধু আদায় আর আদায়। ফার্মই যদি না থাকে আদায় করবে কী ? নিন চা খান। চিনি হয়েছে ?

জি হয়েছে।

আগামী বছর জুন-জুলাই মাসে একবার খোঁজ করবেন। আমি খুব চেষ্টা করব কিছু একটা করতে।

জুন-জুলাই মাসে ?

হ্যাঁ। এর আগে যদি কিছু হয় আপনাকে জানানো হবে। আপনার দরখাস্তটা ফাইলে তুলে রাখব।

সোবাহান চা শেষ করে শীতল গলায় বলল, এই কথাটি বলতে আপনার এত দিন লাগল কেন ?

তার মানে ?

প্রথম দিনই তো আপনি আমাকে এটা বলতে পারতেন। পারতেন না ?

রহমান সাহেব চশমা খুলে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ভদ্রলোক রেগে যাচ্ছেন না সহজভাবেই কথাটা নিচ্ছেন তা বোঝা গেল না।

সোবাহান যেভাবে বসে ছিল সেভাবেই বসে রইল। রহমান সাহেব বললেন, আপনি এখন যেতে পারেন।

কিছু মনে করবেন না, আমি এই কথাটির জবাব আপনার কাছ থেকে জেনে তারপর যাব বলে ঠিক করেছি।

কী জানতে চান ?

হবে না এই কথাটি বলতে আপনার এত সময় লাগল কেন ?

আপনি একজন উদ্ধত প্রকৃতির যুবক। এ ধরনের কাউকে এ ফার্মে আমি কাজ দেব না।

আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দেননি।

রহমান সাহেব উঁচুগলায় বললেন, নাউ ইয়ংম্যান, প্লিজ গেট আউট।

আমি তো আপনাকে বলেছি আমার প্রশ্নের জবাব আপনাকে দিতে হবে।

রহমান সাহেব ভ্রূ কুঁচকে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে রইলেন। কেউ এরকমভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারে এটা তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। সোবাহান ঠান্ডা স্বরে বলল, আমি কিন্তু আপনার কাছ থেকে জবাব জেনে তারপর যাব। তার আগে যাব না।

বসে থাকবেন ?

হ্যাঁ।

সারা দিন বসে থাকবেন ?

হ্যাঁ। বসে থেকে আমার অভ্যাস আছে।

রহমান সাহেব প্রথমবারের মতো হাসলেন। চুরুট ধরালেন। এবং হালকা সুরে বললেন, ঠিক আছে বলছি আপনাকে। কারণ না শুনে যখন যাবেন না তখন তো কারণটা আপনাকে বলতেই হবে। এক মিনিট বসুন, আমি আসছি। চা খাবেন আরেক কাপ ?

না।

বেশ, তাহলে বসে থাকুন। এক্ষুনি আসছি। এক মিনিটের বেশি লাগবে না।

রহমান সাহেব ফিরে এলেন না। দু'জন দারোয়ান এসে সোবাহানের ঘাড় চেপে ধরল। ওদের গায়ে তেমন জোর নেই, তবু ওরা সোবাহানকে প্রায় শূন্যে ভাসিয়ে নামিয়ে নিয়ে এল। একজন পেছন থেকে ডান হাত মুচড়ে ধরে আছে। অন্যজন বাঁ হাত এবং চুলের মুঠি ধরে আছে।

রিসিপশনের মেয়েটি তাকিয়ে আছে অবাক হয়ে। তার চোখ পড়ল সোবাহানের চোখে। সোবাহান চোখ ফিরিয়ে নিল না, তাকিয়েই থাকল। মেয়েটি যেন বড় বেশি অবাক হয়েছে। এত অবাক হওয়ার কী আছে ?

জলিল সাহেব রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সোবাহানকে দেখে উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলেন ? কী হয়েছে আপনার ?

কিছু হয় নাই।

রাত দেড়টা বাজে খেয়াল আছে ? এরকম লাগছে কেন আপনাকে ? কী হয়েছে ?

কিছু হয় নাই।

মনসুর সাহেবের বাসায় খাওয়ার দাওয়াত ছিল মনে নাই আপনার ? আমরা চিন্তায় অস্থির। আপনার খাওয়া ঘরে এনে ঢাকা দিয়ে রেখেছি। এই যে ভাই, এত মন খারাপ লাগছে কেন ? কোথায় ছিলেন ?

জলিল সাহেব সোবাহানের হাত ধরলেন।

কী যে কাণ্ড করেন। আমি ভাবলাম একসিডেন্ট টেকসিডেন্ট হলো কি না!

সোবাহান কিছুই বলল না। জলিল সাহেব নিজের মনেই কথা বলে যেতে লাগলেন—যূথি মেয়েটা অনেক রান্নাবান্না করেছিল। আপনি না আসায় মেয়েটার মনটা ছোট হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে যে আপনার বিয়ে হচ্ছে তা তো ভাই জানতাম না। মনসুর সাহেবের কাছে আজ শুনলাম। বড় শান্ত মেয়ে। সুখ পাবেন। সুখটাই আসল। আপনার কী হয়েছে বলেন দেখি ?

কিছু হয় নাই।

সার্টটা ছেঁড়া কেন ?

জানি না কেন।

আপনার বন্ধু বুলু, তার মামা এসেছিলেন বিকেলবেলা। ওর নাকি অসুখ, মিটফোর্ডে ভর্তি হয়েছে। আপনাকে যেতে বললেন। ভদ্রলোক অনেকক্ষণ আপনার জন্যে বসে ছিলেন।

অসুখ কি খুব বেশি ?

হ্যাঁ। সকালে ঘুম থেকে উঠেই চলে যাবেন।

হাসপাতালে কবে ভর্তি করিয়েছে ?

পরশু দিন।

ঘরে ঢোকার কিছুক্ষণের মধ্যে মনসুর সাহেব উঠে এলেন। যূথি এল পিছু পিছু। খাবারদাবার নিয়ে গেল, গরম করে আনবে। সোবাহান বড় লজ্জায় পড়ল। মেয়েটি মনে হলো তাকে লক্ষ করছে কৌতূহলী চোখে। মনসুর সাহেব বললেন, কোথায় ছিলেন এত রাত পর্যন্ত ?

সোবাহান চুপ করে রইল।

হাত-মুখ ধুয়ে আমার ঘরে চলেন। ওখানেই খাবেন। আবার এখানে টানাটানি করা ঝামেলা।

ভেতরের বারান্দায় টেবিলে খেতে দেওয়া হয়েছে। মেয়েটি মাথা নিচু করে এটা ওটা এগিয়ে দিচ্ছে। সোবাহান ইতস্তত করে বলল, তুমি খেয়েছ ?

যূথি মাথা নাড়ল। সে খায়নি।

বসো। তুমিও খাও।

আপনি খান। আমি পরে খাব।

বড় লজ্জা লাগছে সোবাহানের। মেয়েটি তাকে দেখছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বারান্দায় আর কেউ নেই। মনসুর সাহেব বোধহয় ইচ্ছা করেই আসেননি। সোবাহান নিচুগলায় বলল, তোমার আপা কোথায় ?

আপা ঘুমাচ্ছে। উনার শরীর খারাপ। আপনি তো কিছুই খেলেন না।

আমার ক্ষিধে নেই।

হাত-মুখ ধোয়ার সময় মেয়েটি হঠাৎ বলল, আপনি রোজ রাতে এত দেরি করে ফিরেন কেন ?

সোবাহান অবাক হয়ে তাকাল। থেমে থেমে বলল, চাকরির ধান্ধায় থাকি। নানান জায়গায় যাই।

পান খাবেন ? পান দেব ?

না, আমি পান খাই না।

সোবাহান হাত-মুখ ধুয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। যাওয়ার আগে কিছু বলা দরকার। রান্না চমৎকার হয়েছে এই জাতীয় কিছু। তেমন কোনো কথাই মনে আসছে না। মেয়েটি তাকিয়ে আছে তার দিকে। কিছু শোনার জন্যে অপেক্ষা করছে কি ? সোবাহান আচমকা বলে ফেলল, মাঝে মাঝে অনেক রাতে তোমাদের এখানে কে কাঁদে ?

মেয়েটি শান্তস্বরে বলল, আমি। আপনাদের ওঘর থেকে শোনা যায় আমি বুঝতে পারিনি।

শোনা গেলে কাঁদতে না ?

যূথি জবাব দিল না। সোবাহান একবার ভাবল জিজ্ঞেস করে, কেন কাঁদ ? জিজ্ঞেস করা হলো না। কত রকম দুঃখ আছে মানুষের। সেসব জানতে চাওয়া ঠিক না।

যূথি, যাই। কষ্ট দিলাম তোমাকে। যাও খেতে, খেয়ে নাও।

১৬

বুলুর অবস্থা এতটা খারাপ হয়েছে সোবাহান বুঝতে পারেনি। সে অবাক হয়ে ডাকল, এই বুলু! এই!

বুলু ঘোলা চোখে তাকাল।

এ কী অবস্থা তোর ?

অবস্থা কেরাসিন। হালুয়া টাইট।

হয়েছে কী ?

জণ্ডিস।

জণ্ডিসে এরকম হয় নাকি ?

অভাগাদের হয়।

বুলু চোখ বন্ধ করে ফেলল। ঘুমিয়ে পড়ল বোধহয়। সোবাহান বেডের পাশে রাখা টুলে বসে রইল চুপচাপ। এখন ভিজিটিং আওয়ার নয়। তবু অনেক লোকজন চারদিকে ঘুরঘুর করছে। কোণার দিকে একটি রোগীকে ঘিরে আছে ছ'সাতজনের একটি দল। দু'টি অল্পবয়স্ক মেয়ে আছে। ওরা খিলখিল করে হেসে উঠছে বারবার। বুলুর সাড়াশব্দ নেই।

এই বুলু, এই।

কী ?

জেগে ছিলি নাকি ?

হুঁ। রেস্ট নিচ্ছিলাম। বেশিক্ষণ কথা বলতে পারি না।

রেশমা এসেছিল ?

হ্যাঁ। কাল সারা দিনই ছিল।

আজ আসবে না ?

কী জানি। কেন ?

এমনি জিজ্ঞেস করলাম। লাগছে কেমন তোর ?

ভালোই। কাল রাতে তোর বড়ভাইকে স্বপ্নে দেখলাম।

সোবাহান বিস্মিত হলো। বুলু টেনে টেনে বলল, দেখলাম যেন তোর গ্রামের বাড়িতে গিয়েছি। তোর ভাই গাছের নিচে বসে শান্তির কথা টথা বলছে। দাড়ি চুল সব মিলিয়ে তাকে রবীন্দ্রনাথের মতো লাগছে।

সোবাহান চুপ করে রইল। বুলু ফিসফিস করে বলল, শান্তি ব্যাপারটা কী তোর ভাইকে জিজ্ঞেস করিস তো ?

তুই নিজেই জিজ্ঞেস করিস।

করব। আমি করব। ইন কেস আমি যদি না থাকি, যদি ফুটটুস হয়ে যাই তাহলে তুই জিজ্ঞেস করবি এবং বলবি, লম্বা লম্বা বাত নেহি ছারেগা। ইয়ে গম নেহি।

বুলু নেতিয়ে পড়ল। সোবাহান বলল, তুই এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন ?

ঘাবড়ালাম কোথায় ?

একজন অল্পবয়স্ক ইন্টার্নি ডাক্তার এসে গম্ভীর গলায় বলল, এখানে আপনি কী করছেন ? এটা কি ভিজিট করার সময় ? এখন যান, চারটার সময় আসবেন।

সোবাহান উঠে দাঁড়াল। সম্ভবত এ ডাক্তারটির কথা কেউ শোনে না। সে হয়তো ভেবেছিল সোবাহান উঠতে চাইবে না। তাকে বিনা তর্কে উঠে দাঁড়াতে দেখে তার হয়তো অস্বস্তি লাগল। সে নরম স্বরে বলল, রোগী আপনার কে ?

আমার বন্ধু।

ঠিক আছে চার-পাঁচ মিনিট কথা বলে চলে যান। রোগীকে এখন বিরক্ত করা ঠিক না। রেস্ট দরকার।

ওর এ অবস্থা হলো কেন ?

খারাপ ধরনের জন্ডিস। লিভার ড্যামেজ্‌ড হয়েছে। শরীরের সবচেয়ে বড় অর্গানটাই হচ্ছে লিভার। পাঁচ সের ওজন। সেটা ড্যামেজ্‌ড হলে কী অবস্থা হয় বুঝতেই পারেন।

ডাক্তারটি কোনার দিকের বেডের দিকে চলে গেল। অল্পবয়েসী মেয়ে দু'টি মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসছে।

বুলু।

উ।

কেমন লাগছে ?

ভালো না।

বেশি খারাপ লাগছে ?

হুঁ। তুই এখন যা।

কথা বলার দরকার নাই। তুই শুয়ে থাক চুপচাপ। আমি থাকি আরও কিছুক্ষণ।

শুধু শুধু বসে থেকে কী করবি ?

যাবই বা কোথায় ?

বুলু চোখ বন্ধ করে পাশ ফিরল। একটি নার্স এসে দুধ পাউরুটি দিয়ে গেল। বুলু ক্লান্তস্বরে বলল—সোবাহান, তুই যা। তোকে দেখে বিরক্ত লাগছে। বিকেলে আসিস। আমি ঘুমাব।

তোকে ঘুমাতে নিষেধ করছি ?

যেতে বলছি যা। বাজে তর্ক ভালো লাগে না।

সোবাহান উঠে দাঁড়াল। বুলু থেমে থেমে বলল, বিকেলে আসার সময় এক কাজ করিস, তোর বায়োডাটা, টেস্টিমনিয়েল এইসব নিয়ে আসিস। নাম সই করে একটা ফুলস্কেপ সাদা কাগজ আনিস।

কেন ?

আনতে বলছি নিয়ে আসবি। এত কথা কিসের ?

বুলু চোখ বন্ধ করে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। একটি মাছি ভনভন করে তাকে বড় বিরক্ত করছে। সে চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল।

গুলিস্তানের দিকে রিকশা-টিকশা কিছু যাচ্ছে না। একটা মিছিল বেরিয়েছে। কিসের মিছিল কেউ জানে না। জানার তেমন প্রয়োজনও অবশ্যি নেই। মিছিল হচ্ছে মিছিল। যা দেখামাত্র সেখানে সামিল হয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

সোবাহান নওয়াবপুর রোডের কাছে মিছিলের দেখা পেল। মাঝারি ধরনের মিছিল। প্রচুর লাল নিশান দেখে মনে হয় শ্রমিকদের কোনো ব্যাপার-ট্যাপার হবে। মিছিলের সঙ্গে হাঁটার একটা আলাদা আনন্দ আছে। সবসময় মনে হয় উদ্দেশ্য নিয়ে কোথাও যাওয়া হচ্ছে।

তাছাড়া চোখের সামনে মিছিলের চরিত্র বদলাতে থাকে, তাও দেখতে ভালো লাগে। যত সময় যায় ততই মিছিলের মানুষগুলি রেগে উঠতে থাকে। একটা সময় আসে যখন শুধু আগুনের কথা মনে হয়। চারদিকে আগুন জ্বালিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। এটাই সবচেয়ে চমৎকার সময়। তখন পাশের মানুষটিকেও মনে হয় কতদিনের বন্ধু।

কিন্তু আজকের মিছিল জমছে না। প্রাণ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না। প্রধান কারণ সম্ভবত— মিছিলের সঙ্গে পুলিশ-গাড়ি নেই। লাল রঙের পতাকাগুলি কড়া রোদে হলুদ হলুদ দেখাতে লাগল। এ মিছিলের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। সোবাহান মিছিল ফেলে রেখে বাসায় চলে এল।

আজ দুপুরেও খাওয়া হয়নি। এ অভ্যাসটা সত্যি সত্যি করে ফেলতে পারলে মন্দ হয় না। খাওয়াদাওয়ার ঝামেলাটা তাহলে থাকে না।

সোবাহান বালতি হাতে গোসল সারতে গেল। কাছেই একটা টিউবওয়েল আছে। প্রচণ্ড গরমেও বরফের মতো ঠান্ডা পানি আসে সেখানে। ঝি-শ্রেণীর মেয়েরা এই সময়ে দল বেঁধে গোসল করে। দল বেঁধে ঝগড়া করে। দল বেঁধে হাসে। এ সময়টা ওদের নিজস্ব।

গোসলের পর ক্ষিধে পেয়ে গেল। ভাতের ক্ষিধে। একটি পরিষ্কার থালায় জুঁই ফুলের মতো কিছু ভাত। চারপাশে ছোট ছোট বাটি। একটা বড় কাচের গ্লাসে বরফের মতো ঠান্ডা পানি। এরকম একটা ছবি ভাসতে লাগল চোখের সামনে। ক্ষিধে পেলেই এরকম একটা ছবি ভাসে। মিলিদের বাসার ছবি। ওদের ওখানে চলে গেলে কেমন হয়?

মিলির বর কি এসেছে বিলেত থেকে? কবে যেন আসার কথা? এ মাসেই তো আসার কথা।

একসময় বিলেত যেতে ইচ্ছা করত। কম বয়সে কত অদ্ভুত সব স্বপ্ন থাকে। পৃথিবী থাকে হাতের মুঠোর মধ্যে। তখন মনে হয় খালাশির চাকরি নিয়ে পৃথিবীর যে-কোনো জায়গায় চলে যাওয়া যায়। মহানন্দে রবিনসন ক্রুশোর মতো নির্জন দ্বীপে জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়। বনের ভেতর সারা দিন ঘুরে বেড়ানো, সন্ধ্যাবেলায় সমুদ্রতীরে বালির বিছানায় শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা। চমৎকার সব জীবন।

সোবাহান ভেজা গায়ে ঘরে ফিরে দেখে, ভাবির আরেকটি চিঠি এসেছে। আগের চিঠিটির জবাব দেওয়া হয়নি। এখন কেন জানি চিঠি লিখতে ইচ্ছা করে না। ভাবির এবারের চিঠিটি সংক্ষিপ্ত

> কেন তুমি চিঠি লিখিতেছ না? তোমার ভাইয়ের চিঠির জবাব এখনো দাও নাই। তোমার ভাই খুব চিন্তিত। তিনি অবশ্যি এখন তাঁর নামাজঘর নিয়া আছেন। বেশির ভাগ রাত্রে সেইখানেই থাকেন। অনেক দূর দূরান্ত হইতে তাঁহার কাছে লোকজন আসে। আমার ভালো লাগে না। ভাই, তুমি একবার আসো। যূথির দুলাভাই তোমার ভাইয়ের কাছে একটি দীর্ঘ পত্র দিয়াছেন। সেই সঙ্গে যূথির একটি ছবি। মেয়েটির চেহারা খুব মায়াবতী। আমার পছন্দ হইয়াছে। তোমার নিজের মুখ হইতে এই মেয়েটির সম্পর্কে আরও কথা জানিতে ইচ্ছা করে। তুমি ভাই, চিঠি পাওয়া মাত্র একদিনের জন্যে হইলেও আসিবে।

১৭

মনসুর সাহেব আজ দু'টি খবর পেয়েছেন। প্রথম খবর হচ্ছে তাঁকে বদলি করা হয়েছে কুষ্টিয়ায়। প্রমোশনের বদলি। এখন থেকে বাড়িতে টেলিফোন থাকবে। সরকারি গাড়ি পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় খবরটি এরচেয়ে ভালো। সরকার মুক্তিযুদ্ধকালীন তার অবদানের কথা মনে রেখে তাঁকে এই পরিত্যক্ত বাড়িতে বসবাসের অধিকার দিয়েছেন। সহজ শর্তে সরকারের কাছ থেকে বাড়িটি তিনি কিনে নিতে পারবেন। তবে বাড়ির জন্যে প্রয়োজন এমন কোনো সংস্কারের কাজ সরকার করতে পারবেন না। ইত্যাদি।

মনসুর সাহেব অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি এলেন। বাড়ির ব্যাপারে বিশ রাকাত নফল নামাজ মানত ছিল। মানত পূরণ করা দরকার সবার আগে।

অনেক দিন পর আজ হাঁটতে তাঁর কষ্ট হলো না। পায়ের ব্যথাটা হঠাৎ করে কমে গেছে। হাঁটতেও আজ বড় আনন্দ লাগছে। বাড়ির কাজে এখন ঠিকমতো হাত দিতে হবে। দোতলা কমপ্লিট করে ভাড়া দিতে হবে। সাবলেট দিয়ে দুজন ফালতু লোক রাখার আর কোনো মানে হয় না। জলিল সাহেবকে আজই বলে দিতে হবে।

বদলি নাকচ করার চেষ্টাও শুরু করতে হবে আজ থেকে। এখন ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। বছর খানিক কোথাও নড়াচড়া করা যাবে না। ঢাকা শহরে গ্যাট হয়ে বসে থাকতে হবে। অনেক কাজ হাতে।

মনসুর সাহেবের বাড়ির সামনে অনেক লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ি সংক্রান্ত নতুন কোনো ঝামেলা না তো ? অন্য কেউ কি এসে দখল নিয়ে নিয়েছে ?

মনসুর সাহেবের নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এল। বমি বমি ভাব হলো। জলিল সাহেবকে দেখা গেল এগিয়ে আসছেন।

মনসুর সাহেব, ভাই একটা খারাপ সংবাদ।

খারাপ সংবাদ ? কী খারাপ সংবাদ ?

মনসুর সাহেবের মুখ শুকিয়ে গেল। কপালে ঘাম জমল। লোকজনের কথাবার্তা অস্পষ্ট হয়ে গেল। তার পা কাঁপছে। জলিল সাহেব এগিয়ে এসে তাঁর হাত ধরে ফেললেন।

আপনার স্ত্রী হঠাৎ করে...

মারা গেছে নাকি ?

সবই আল্লাহর ইচ্ছা ভাই। মনটাকে শক্ত করেন।

জলিল সাহেব তাঁকে ধরে বারান্দায় রাখা একটি ইজিচেয়ারে বসিয়ে দিলেন।

মনসুর সাহেবের এখন হয়তো কাঁদা উচিত। কিন্তু কাঁদতে পারছেন না, নিশ্চিত বোধ করছেন। জীবন এখন নতুন করে শুরু করা যাবে। তবু মনসুর সাহেব কাঁদতে চেষ্টা করলেন। আশেপাশে প্রচুর লোকজন এসেছে, তারা শোকের প্রকাশ দেখতে চায়। শোকাহত একজন মানুষকে সান্ত্বনার কথা বলতে চায়। এরাই এখন ছুটাছুটি করবে। মৌলবি ডেকে আনবে। খাটিয়ায় কাঁধ দিয়ে সুর করে বলবে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু।'

মনসুর সাহেব বাড়ির ভেতর ঢুকলেন। চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। গভীর বেদনার সুরে ডাকলেন, কদম! ও কদম! জলিল সাহেব তাঁকে জড়িয়ে ধরে থাকলেন। প্রতিবেশীরা তাঁর পাশে জড়ো হতে শুরু করেছে। তাদের চোখ মমতায় আর্দ্র। মনসুর সাহেব আবার ডাকলেন, কদম! কদম! তার শ্বশুর ফুলের নামে মেয়েদের নাম রেখেছিলেন—বেলি, কদম, যূই...।

একজন ভারিক্কি চেহারার ভদ্রলোক মনসুর সাহেবের হাত ধরে বললেন, মৃত মানুষের নাম ধরে ডাকতে নাই ভাই। আল্লাহকে ডাকেন। আল্লাহ শান্তি দেনেওয়ালা। এখন ভেঙে পড়ার সময় না। অনেক কাজ সামনে। কোথায় মাটি দিবেন ঠিক করেন, তারপর বাকি যা করবার আমরা করব।

কদমের মৃত্যুর সময়টা খারাপ হয়নি। ভালোই হয়েছে বলা চলে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে একটা যোগাযোগ হলো। যোগাযোগের দরকার ছিল। এখন বাড়িসংক্রান্ত কোনো বিপদে এদের সাহায্য পাওয়া যাবে।

কবর দিতে হবে এখানেই। এতে একটা অধিকার আসে। মনসুর সাহেব মুখ বিকৃত করে আবার ডাকলেন, কদম! ও কদম! জলিল সাহেবের চোখ ভিজে উঠল।

মৌলবি চলে এসেছে। তাঁর সঙ্গে মাদ্রাসার দু'টি ছাত্র। কিছুক্ষণের মধ্যে কোরান পাঠ শুরু হয়ে গেল। এ-বাসা ও-বাসা থেকে মহিলারা আসতে শুরু করেছে।

১৮

বুলুর অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। বাথরুমে এখন আর যেতে পারে না। বেড প্যান ব্যবহার করতে হয়। নার্সারা বেড প্যান নিয়ে এলে বুলুর সত্যি সত্যি মরে যেতে ইচ্ছে করে। বড় লজ্জার ব্যাপার। তবে লজ্জাবোধটা তার দ্রুত কমে আসছে। এখন সে পড়ে থাকে আচ্ছন্নের মতো। বোধশক্তি দ্রুত কমে যাচ্ছে। মানুষের চেহারাও এখন মাঝে মাঝে অস্পষ্ট মনে হয়। সোবাহান যখন তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছিসরে বুলু ?

বুলু বিস্মিত হয়ে বলল, কে ?

আমি। আমি সোবাহান। চিনিতে পারছিস না নাকি ?

পারছি। বোস।

রেশমা এসেছিল ?

এসেছিল। আবার আসবে।

কেমন লাগছে রে ?

ভালো না।

সোবাহান বসে রইল চিন্তিত মুখে। বুলু থেমে থেমে বলল, তোর অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়ে দিয়েছি। রেশমা নিয়ে গেছে। হবে!

কিসের কথা বলছিস ?

আমার যে চাকরির কথা ছিল সেইটা। সাত হাজার টাকা দেওয়া আছে। খেলার কথা না। আমি যখন নিতে পারছি না তোকে দিক।

তুই নিতে পারছিস না মানে?

হালুয়া টাইট রে ভাই। বাঁচব না।

কী ছাগলের মতো কথা বলছিস?

এইসব জিনিস বোঝা যায়। আমি বুঝতে পারছি।

বুলু চুপ করে গেল। মিনিট দশেক তার আর কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। সোবাহান বারান্দায় গিয়ে একটা সিগারটে টেনে আবার ফিরে এল। বুলুর মামা এসেছেন। হাতে প্রকাণ্ড সাইজের একডজন কলা। বুলু বলল, কলাগুলি ঢেকে রাখেন মামা। দেখলেই বমি আসছে।

একটা খা। ছিলে দেই?

দেখেই বমি আসছে, খাব কী! ঢেকে রাখেন।

বুলু ক্লান্তস্বরে ডাকল, সোবাহান।

বল।

চাকরিটা নিস। ঝামেলা করিস না। আমার সাত হাজার টাকা লাগানো আছে।

হুদা সাহেব বললেন, কিসের সাত হাজার টাকা?

আছে আছে, আপনি বুঝবেন না।

বুলু চোখ বন্ধ করে পাশ ফিরল।

কদম নেই—এই কথাটি যতবার মনে হয় ততবারই মনসুর সাহেব মনে অন্যরকম একটা স্বস্তি বোধ করেন। মনসুর সাহেবের মেজাজও অনেক ভালো হয়েছে। গত তিনদিন যূথির সঙ্গে উঁচুগলায় কথা বলেননি। রাতেরবেলা খেতে বসে রান্নার প্রশংসাও করলেন।

তরকারিটা ভালো হয়েছে যূথি।

আরেকটু দেই?

দাও। কাঁচামরিচ আছে?

আছে।

দাও দেখি। কাঁচামরিচটা শরীরের জন্যে ভালো। প্রচুর ভিটামিন সি।

রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে তিনি অনেকক্ষণ গল্প করলেন। দোতলাটা ভাড়া দেবেন? না দোতলায় উঠে গিয়ে নিচতলাটা ভাড়া দেবেন।

যূথি, কম্পাউন্ড ওয়ালটা আরও উঁচু করে দিতে হবে। লোহার একটা ভারী গেট দেব। কী বলো?

দেন।

নারকেল গাছের দু'টো চারা এনে লাগাব, বাড়ির সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেবে। ঠিক না?

জি।

চা দাও তো এক কাপ। দুধ দিও না। লেবু দিয়ে দাও।

সেই রাতে মনসুর সাহেবের ঘুম এল না। রাত দু'টা পর্যন্ত জেগে রইলেন। তারপর ডেকে তুললেন যূথিকে। যূথি কাঁদতে শুরু করল। মনসুর সাহেব গাঢ়স্বরে বললেন, আহ্ কাঁদো কেন ? তোমাকে আমিই বিয়ে করব যূথি। ঘরসংসার তো করতেই হবে। হবে না ?

মনসুর সাহেব দুপুররাতে গাঢ়স্বরে নানান রকম সুখের কথা বলতে লাগলেন।

সোবাহান বলল, জলিল সাহেব, মেয়েটা কাঁদছে। জলিল সাহেব নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, মেয়েরা খুব মায়াবতী হয় রে ভাই। অল্প দুঃখেই কাঁদে। আর এর বোন মারা গেছে। সহজ দুঃখ তো না। কাঁদবেই তো। সারা রাত কাঁদবে।

সোবাহান কিছু বলল না। জলিল সাহেব মৃদুস্বরে ডাকলেন, সোবাহান সাহেব।

বলেন।

বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে, শুনেছেন তো ?

শুনেছি।

কোথায় যাবেন কিছু ঠিক করেছেন ?

না।

কুমিল্লা বোর্ডিং-এ যাবেন নাকি ?

আপনি কি ওইখানেই যাবেন ?

হ্যাঁ। জলে ভাসা মানুষ আমি। হোস্টেল বোর্ডিং এইসব ছাড়া যাব কোথায় বলেন ? ঘরসংসার করার শখ ছিল, অভাবের জন্যে পারলাম না।

সোবাহান উত্তর দিল না। জলিল সাহেব বললেন, ঘুমোবেন না ?

ঘুম আসছে না।

রাস্তায় হাঁটবেন নাকি ?

না। বারান্দায় বসে থাকব খানিকক্ষণ।

দু'জন এসে বারান্দায় বসল। অনেক রাত পর্যন্ত বসে রইল। কেউ কোনো কথা বলল না। মেয়েটা কাঁদছে। গভীর রাতে মেয়েদের কান্না শুনতে এত ভালো লাগে কেন কে জানে!

১৯

অনেক লোকজন আসে ফরিদ আলির কাছে।

দুঃখী মানুষেরা শান্তির কথা শুনতে চায়। দূর দূর থেকে তারা আসে। গভীর আগ্রহ নিয়ে বসে থাকে। ফরিদ আলি ভরাট গলায় কথা বলেন। গলার স্বর কখনো উঁচুতে ওঠে না, নিচুতেও নামে না। অবাক হয়ে সবাই তাঁর কথা শোনে। তাদের বড় ভালো লাগে

আজ সবাই শুনছে। গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনছে। শান্তির কথা বলতে বলতে ফরিদ আলির চোখ ভিজে উঠল। তিনি বেশ খানিকক্ষণ কাঁদলেন। ভাঙা গলায় বললেন, আজ আর কিছু বলব না। আকাশের অবস্থা ভালো না। ঝড়বৃষ্টি হবে। ফরিদ আলি গভীর রাত পর্যন্ত একা বসে রইলেন বাংলাঘরে। একসময় পারুল এসে বলল, ভাত খাবেন না ?

না।

নামাজঘরে যাবেন ?

না, নামাজঘরেও যাব না।

তিনি পারুলের সঙ্গে ভেতরের বাড়িতে চলে এলেন। পারুল তাঁকে একটি জলচৌকি এনে বসতে দিল। তিনি উঠোনে বসে রইলেন।

আপনাকে এক কাপ চা এনে দেই ?

দাও।

পারুল চা নিয়ে এল। ফরিদ আলি মৃদুস্বরে বললেন, আমার পাশে একটু বসো পারুল।

পারুল উঠানেই বসতে গেল।

জলচৌকিতেই বসো। দু'জনাতে বসা যাবে।

লোকজন আছে। কে না কে দেখবে।

দেখুক।

পারুল সংকুচিতভাবে বসল তাঁর পাশে। অস্পষ্ট স্বরে বলল, সোবাহান কী লিখেছে ?

ফরিদ আলি জবাব দিলেন না। চুপচাপ বসে রইলেন।

ওর চিঠিটা আমাকে পড়তে দেন।

ফরিদ আলি সে-কথারও জবাব দিলেন না। চিঠিটা পড়তে দেওয়ার তাঁর কোনো ইচ্ছা নেই। অর্থহীন কথাবার্তা লেখা সেখানে। রাতে নাকি তার ঘুম আসে না। লক্ষ লক্ষ মশা কানের কাছে পিন পিন করে। কোনো মানে হয় ? চিঠির শেষে লেখা—ভাইজান, বড় কষ্ট।

ফরিদ আলি মৃদুস্বরে বললেন, ওকে দেশের বাড়িতে নিয়ে আসব। ওর বড় কষ্ট।

২০

দুপুর থেকেই রেশমা ও সোবাহান বসে ছিল বুলুর পাশে। সোবাহান কয়েকবার ডাকল—বুলু! বুলু! বুলু তাকাল ঘোলা চোখে, জবাব দিল না। তিনটার দিকে রোগীর অবস্থা খুব খারাপ হলো। রেশমা একজন ইন্টার্নি ডাক্তারকে ধরে নিয়ে এল। সে মুখ কালো করে খবর দিতে গেল রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ানকে। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই এলেন। গম্ভীর মুখে বললেন, আপনারা কি রোগীর আত্মীয় ?

রেশমা ভাঙা গলায় বলল, হ্যাঁ।

আমার মনে হয় পেসেন্ট কোমায় চলে যাচ্ছে। অবস্থা বেশ খারাপ।

রেশমা তাকিয়ে রইল। কিছু বলতে চাইল, বলতে পারল না।

আমরা পেসেন্টকে ইনটেনসিভ কেয়ারে নিয়ে যাচ্ছি।

সোবাহান বলল, এতটা খারাপ ?

হ্যাঁ, বেশ খারাপ। পালস্ প্রায় পাওয়া যাচ্ছে না।

রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ান দ্রুত চলে গেলেন। সোবাহান বলল, রেশমা, তুমি চেয়ারটায় বসো। তোমার পা কাঁপছে। পড়ে যাবে।

রেশমা বসল না, বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

বুলু মারা গেল বিকাল চারটায়। নিঃশব্দ মৃত্যু। কোনো হৈচৈ হলো না। গলা ফাটিয়ে কেউ কাঁদতে বসল না। রেশমা ও সোবাহান হাসপাতালের করিডোরে দাঁড়িয়ে বুলুর মৃত্যুসংবাদ সহজভাবে গ্রহণ করল। রেশমা ধরাগলায় বলল, একটা রিকশা ঠিক করে দেন সোবাহান ভাই। বাসায় যাব।

খুব মেঘ করেছে আকাশে। বাতাস দিচ্ছে। সন্ধ্যার দিকে আজও হয়তো ঝড় হবে। সোবাহান মৃদুস্বরে বলল, একা একা যেতে পারবে ?

পারব।

আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি ?

না। আপনি এখানে থাকেন। সোবাহান ভাই।

বলো।

বুলুর ওই চাকরিটা আপনার হবে। ওরা আমাকে কথা দিয়েছে। যদি হয় তাহলে আপনি দয়া করে চাকরিটা নেবেন।

সোবাহান কিছু বলল না। রেশমা চোখ মুছে মৃদুস্বরে বলল, বুলু শেষের দিকে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যাতে আপনি চাকরিটা পান। বুলুর বড় কষ্টের চাকরি সোবাহান ভাই।

ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। বাতাসের বেগ বাড়ছে। রেশমার রিকশা বাতাস কেটে এগুচ্ছে খুব ধীরে।

সোবাহান বাড়ি ফিরল অনেক রাতে। সমস্ত শহর অন্ধকারে ডুবে আছে। প্রচণ্ড কালবৈশাখীতে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে সব। শহরটাকে লাগছে গহীন অরণ্যের মতো। রাস্তায় কোনো লোকজন নেই। কী অদ্ভুত লাগে জনশূন্য অন্ধকার রাজপথে হাঁটতে। হাওয়ায় সোবাহানের সার্ট পতপত করে ওড়ে। চোখেমুখে পড়ে বৃষ্টির মিহি কণা।

সোবাহান তার ঘরের বারান্দায় উঠে এল নিঃশব্দে। চারদিক অন্ধকার। রাত কত হয়েছে ? সবাই কি ঘুমিয়ে পড়েছে ? সোবাহান মৃদুস্বরে ডাকল, যূথি! যূথি!

কেউ সাড়া দিল না। সোবাহান গলা উঁচিয়ে দ্বিতীয়বার ডাকল, যূথি! যূথি!

মনসুর সাহেব বেরিয়ে এলেন। জলিল সাহেব এলেন। যূথিও এল। তার হাতে একটা হারিকেন। সে তাকাল অবাক হয়ে। সোবাহান ভাঙা গলায় বলল, যূথি, আমার আজ বড় কষ্ট।

যূথি কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। তারপর এগিয়ে এসে তার দুর্বল রোগা হাতটি রাখল সোবাহানের গায়ে। বাতাসের ঝাপটায় তার অন্য হাতের হারিকেনটি দুলছে। চমৎকার সব নকশা তৈরি হচ্ছে দেয়ালে।

যূথি নরম স্বরে বলল, কাঁদবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিছুই ঠিক হয় না। তবু মমতাময়ী নারীরা আশ্বাসের কথা বলে। আশ্বাসের কথা বলতে তারা বড় ভালোবাসে।

ভ্রমণোপাখ্যান

হোটেল গ্রেভার ইন

এলেম নতুন দেশে। লরা ইঙ্গেলস ওয়াইল্ডারের প্রেইরী ভূমি, ডাকোটা রাজ্য। ভোর চারটায় পৌঁছলাম, বাইরে অন্ধকার, সূর্য এখনো ওঠেনি, হেক্টর এয়ারপোর্টের খোলামাঠে হু-হু করে হাওয়া বইছে। শীতে গা কাঁপছে। যদিও শীত লাগার কথা নয়। এখন হচ্ছে, 'ফল', শীত আসতে দেরি আছে।

আমার মন খুব খারাপ।

দেশ ছেড়ে দীর্ঘদিনের জন্যে বাইরে যাওয়ার উৎসাহ আমি কখনো বোধ করিনি। বর্ষাকালে বৃষ্টির শব্দ শুনব না, ব্যাঙের ডাক শুনব না, চৈত্র মাসের রাতে খোলা ছাদে পাটি পেতে বসব না, শীতের দিনে গ্রামের বাড়িতে আগুনের কাছে হাত মেলে ধরব না, এটা হতে পারে না।

অনেকের পায়ের নিচে সর্ষে থাকে। তারা বেড়াতে ভালোবাসেন। বিদেশের নামে তাঁদের রক্তে বাজনা বেজে ওঠে। আমার কাছে ভ্রমণের চেয়ে ভ্রমণকাহিনী ভালো লাগে। একটা বই হাতে, নিজের ঘরে নিজের চেনা জায়গাটায় বসে থাকব, পাশে থাকবে চায়ের পেয়ালা, অথচ আমি লেখকের সঙ্গে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। লেখক হয়তো সুন্দর একটা হ্রদের বর্ণনা দিচ্ছেন, আমি কল্পনায় সেই হ্রদ দেখছি। সেই হ্রদের জল নীল। জলে মেঘের ছায়া পড়েছে। আমার কল্পনাশক্তি ভালো। লেখক তাঁর চোখে যা দেখছেন আমি আমার কল্পনার চোখে তার চেয়ে ভালো দেখতে পাচ্ছি। কাজেই কষ্ট করে যাযাবরের মতো দেশ-বিদেশ দেখার প্রয়োজন কী?

প্রেইরী ভূমি সম্পর্কে আমি ভালো জানি। লরা ইঙ্গেলস-এর প্রতিটি বই আমার অনেকবার করে পড়া। নিজের চোখে এই দেশ দেখার কোনো আগ্রহ আমার নেই। আমি এসেছি পড়াশোনা করতে। নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে কেমিস্ট্রির মতো রসকষহীন একটি বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি নিতে হবে। কত দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী কেটে যাবে। ল্যাবরেটরিতে, পাঠ্য বইয়ের গোলকধাঁধায়। মনে হলেই হৃৎপিণ্ডের টিকটিক খানিকটা হলেও শ্লথ হয়ে যায়। হেক্টর এয়ারপোর্টের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া হাওয়ার মতো বুকের ভেতরটাও হু-হু করে।

মন খারাপ হওয়ার আমার আরেকটি বড় কারণও আছে। দেশে সতেরো বছর বয়সী আমার স্ত্রীকে ফেলে এসেছি। তার শরীরে আমাদের প্রথম সন্তান। ভালোবাসাবাসির প্রথম পুষ্প। ঢাকা এয়ারপোর্টে আরও অনেকের সঙ্গে সে-ও এসেছিল। সারাক্ষণই সে একটু দূরে দূরে সরে রইল। এই বয়সেই সন্তানধারণের লজ্জায় সে ম্রিয়মাণ। কালো একটা চাদরে শরীরটা ঢেকেঢুকে রাখার চেষ্টাতেই তার সময় কেটে যাচ্ছে। বিদায়ের আগ মুহূর্তে সে বলল, আমাদের প্রথম বাচ্চার জন্মের সময় তুমি পাশে থাকবে না?

আমার চোখে প্রায় পানি এসে যাওয়ার মতো অবস্থা হলো। ইচ্ছে করল টিকিট এবং পাসপোর্ট ছুড়ে ফেলে তার হাত ধরে বলি—চলো, বাসায় যাই।

অল্প কিছুদিন আমাদের আয়ু। এই অল্পদিনের জন্যে আমাদের কত আয়োজন—পাস, ডিগ্রি, চাকরি, প্রমোশন, টাকাপয়সা, ঘরবাড়ি। কোনো মানে হয়? কোনোই মানে হয় না।

আমার মনের অবস্থা সে টের পেল। মুহূর্তের মধ্যে কথা ঘুরিয়ে বলল, যদি ছেলে হয় নাম রাখব আমি। আর যদি মেয়ে হয় নাম রাখবে তুমি। কেমন?

প্লেনে আসতে আসতে সারাক্ষণ আমি আমার মেয়ের নাম ভেবেছি। কত লক্ষ লক্ষ নাম পৃথিবীতে, কিন্তু কোনোটিই আমার মনে ধরছে না। কোনোটিই যেন মায়ের গর্ভে ঘুমিয়ে থাকা রাজকন্যার উপযুক্ত নাম নয়। এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নামটি আমাকে আমার মেয়ের জন্যে খুঁজে বের করতে হবে। আজ থেকে আঠারো, উনিশ বা কুড়ি বছর পর কোনো এক প্রেমিকপুরুষ এই নামে আমার মেয়েকে ডাকবে। ভালোবাসার কত না গল্প সে করবে। হেক্টর এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসে এইসব ভাবছি। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। পৃথিবীটা এমন যে বেশিরভাগ ইচ্ছাই কাজে খাটানো যায় না। আমি বসে বসে ভোর হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছি। এত ভোরে কেউ আমাকে নিতে আসবে এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই। প্রতিবছর হাজারখানেক বিদেশী ছাত্র নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে আসে। কার এত গরজ পড়েছে এদের এয়ারপোর্ট থেকে খাতির করে ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে যাওয়ার?

তুমি বাংলাদেশের ছাত্র—আহামাদ? আমি চমকে তাকালাম। পঁচিশ-ত্রিশ বছরের যে মহিলা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর দিকে বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। চোখ ঝলসে যায়। অপূর্ব রূপবতী। যে পোশাক তাঁর গায়ে তার উদ্দেশ্য সম্ভবত শরীরের সুন্দর অংশগুলোর দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। আমি জবাব না দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। ভদ্রমহিলা আবার বললেন, তুমি কি বাংলাদেশের ছাত্র আহামাদ?

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম।

আমার নাম টয়লা ক্লেইন। আমি হচ্ছি নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটির ফরেন স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজার। আমি খুবই লজ্জিত যে দেরি করে ফেলেছি। চলো, রওনা হওয়া যাক। তোমার সঙ্গের সব জিনিসপত্র কি এই?

ইয়েস।

আমার সব জবাব এক শব্দে, ইয়েস এবং নো-র মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইংরেজিতে একটা পুরো বাক্য বলার মতো সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে একটা পুরো বাক্য বললেই এই ভদ্রমহিলা হা হা করে হেসে উঠবেন।

আহামাদ, তুমি কি রওনা হওয়ার আগে এক কাপ কফি খাবে? বাইরে বেশ ঠান্ডা। হঠাৎ কেন জানি ঠান্ডা পড়ে গেছে। কফি আনব?

না।

আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি পূর্বদেশীয় ছাত্রছাত্রীদেরকে কোনো কিছু খাওয়ার কথা বললেই তারা প্রথমে বলে 'না'। অথচ তাদের খাওয়ার ইচ্ছা আছে। আমি

শুনেছি 'না' বলাটা তাদের ভদ্রতার একটা অংশ। কাজেই আমি আবার তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি কফি খেতে চাও ?

চাই।

ভদ্রমহিলা কাগজের গ্লাসে দু'কাপ কফি নিয়ে এলেন। এর চেয়ে কুৎসিত কোনো পানীয় আমি এই জীবনে খাইনি। কষা তিতকুটে একটা জিনিস। নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসার জোগাড়। ভদ্রমহিলা বললেন, হট কফি ভালো লাগছে না ? আমি মুখ বিকৃত করে বললাম, খুব ভালো।

টয়লা ক্লেইন হেসে ফেলে বললেন, আহামাদ, তোমাকে আমি একটা উপদেশ দিচ্ছি। আমেরিকায় পূর্বদেশীয় ভদ্রতা অচল। এদেশে সবকিছু তুমি সরাসরি বলবে। কফি ভালো লাগলে বলবে—ভালো। খারাপ লাগলে কফির কাপ 'ইয়াক' বলে ছুড়ে ফেলবে ডাস্টবিনে।

আমি ইয়াক বলে একটা শব্দ করে ডাস্টবিনে কফির কাফ ছুড়ে ফেললাম। এই হচ্ছে আমেরিকায় আমেরিকানদের মতো আমার প্রথম আচরণ।

টয়লা ক্লেইনের গাঢ় লাল রঙের গাড়ি ডাউনটাউন ফারগোর দিকে যাচ্ছে। আমি ঝিম ধরে পেছনের সিটে বসে আছি। আশপাশের দৃশ্য আমাকে মোটেই টানছে না। টয়লা ক্লেইন একটা ছোটখাটো বক্তৃতা দিলেন। প্রতিটি শব্দ খুব স্পষ্ট করে বললেন। তাতে বুঝতে আমার তেমন কোনো অসুবিধা হলো না। আমেরিকানদের ইংরেজি বোঝা যায়। ব্রিটিশদেরটা বোঝা যায় না। ব্রিটিশরা অর্ধেক কথা বলে, অর্ধেক পেটে রেখে দেয়। যা বলে তা-ও বলার আগে মুখে খানিকক্ষণ রেখে গার্গল করে বলে আমার ধারণা।

আহামাদ, তোমাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি 'হোটেল গ্রেভার ইন'-এ। হোটেল গ্রেভার ইন পুরোদস্তুর একটা হোটেল। তবে হোটেলের মালিক গত বছর এই হোটেল স্টেট ইউনিভার্সিটিকে দান করে দিয়েছেন। বর্তমানে ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা হোটেলটা চালাচ্ছে। অনেক গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট এই হোটেলে থেকেই পড়াশোনা করে। তুমিও ইচ্ছা করলে তা করতে পার। হোটেলের সব সুযোগ সুবিধা এখানে আছে। বার আছে, বল রুম আছে, সাওয়ানা আছে। একটাই অসুবিধা, হোটেলটা ইউনিভার্সিটি থেকে দশ কিলোমিটার দূরে। তোমাকে বাসে যাতায়াত করতে হবে। এটা কোনো সমস্যা হবে না, হোটেল থেকে দু'ঘণ্টা পরপর ইউনিভার্সিটির বাস যায়। আমি কী বলছি বুঝতে পারছ তো ?

পারছি।

তুমি এসেছ একটা অড টাইমে, স্প্রিং কোয়ার্টার শুরু হতে এখনো এগারো দিনের মতো বাকি। সামারের ছুটি চলছে। এই ক'দিন বিশ্রাম নাও। নতুন দেশের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতেও কিছু সময় লাগে। তাই না ?

ইয়েস।

টয়লা ক্লেইন হেসে বললেন, ইয়েস এবং নো—এই দুটি শব্দ ছাড়াও তোমাকে আরও কিছু শব্দ শিখতে হবে। দুটি শব্দ সম্বল করে কথাবার্তা চালানো বেশ কঠিন।

তিনি আমাকে হোটেলের রিসিপশনে নিয়ে অতিদ্রুত কী সব বলতে লাগলেন ডেস্কে বসে থাকা পাথরের মতো মুখের মেয়েটিকে। সেইসব কথার এক বর্ণও আমি বুঝলাম না। বোঝার চেষ্টাও করলাম না। আমি তখন একটা দীর্ঘ বাক্য ইংরেজিতে তৈরি করার কাজে ব্যস্ত। বাক্যটা বাংলায় এরকম—মিসেস টয়লা ক্লেইন, আপনি যে এই ভোররাতে আমাকে এয়ারপোর্ট থেকে আনার জন্যে নিজে গিয়েছেন এবং নিজে হোটেলে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁর জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আপনার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করছি।

বাক্যটা মনে মনে যখন প্রায় গুছিয়ে এনেছি তখন টয়লা ক্লেইন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বাই! বলেই ছুটে বেরিয়ে গেলেন। আমার আর ধন্যবাদ দেওয়া হলো না। এই মহিলার আচার-ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমার কাছে মনে হয়েছিল উনি একজন অত্যন্ত কর্মঠ, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হাসিখুশি ধরনের মহিলা। পরে জানলাম ইনি একজন খুবই ইনএফিসিয়েন্ট মহিলা। তাঁর অকর্মণ্যতা ও অযোগ্যতার জন্যে পরের বছরই তাঁর চাকরি চলে যায়।

হোটেলে গ্রেভার ইনে আমার জীবন শুরু হলো।

তিনতলা একটা হোটেল। পুরনো ধরনের বিল্ডিং। এর সবই পুরনো, কার্পেট পুরনো, ঘরের বাতাসে পর্যন্ত একশ' বছর আগের গন্ধ। আমেরিকানরা ট্রাডিশনের খুব ভক্ত এটা বলা ঠিক হবে না। তবে ডাকোটা কান্ট্রির অনেক জায়গাতেই দেখেছি ওয়াইল্ড ওয়েস্ট ধরে রাখার একটা চেষ্টা। পুরনো হোটেলগুলোকে পুরনো করেই রাখা হয়েছে। দেয়ালে বাইসনের বড় বড় শিং। যত্ন করে ঝুলানো আগের আমলের পাইপ গান, বারুদের থলে। মেঝেতে বিছানো ভারী কার্পেটের রঙ বিবর্ণ। আমেরিকানরা হয়তোবা এসব দেখে নস্টালজিক হয়। আমি হলাম বিরক্ত। কোথায় এরা আমাকে এনে তুলল ?

আমার ঘরটা দোতলায়। বিরাট ঘর। দুটো খাট পাশাপাশি বিছানো। ঘরের আসবাবপত্র কোনোটাই আমার মন কাড়ল না। তবে দেয়ালজোড়া পুরনো কালের আয়নাটা অপূর্ব। যেন বাংলাদেশের দিঘির কালো জলকে জমিয়ে আয়না বানিয়ে দেয়ালে সাজিয়ে রেখেছে। এরকম চমৎকার আয়না এ যুগে তৈরি হয় কি না আমি জানি না।

আমার পাশের ঘরে থাকেন নব্বই বা একশ' বছরের একজন বুড়ি। এই হোটেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাড়াও বাইরের গেস্টরা ভাড়া দিয়ে থাকতে পারেন। লক্ষ করলাম গেস্টদের প্রায় সবাই বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা শ্রেণীর। পরে জেনেছি, এদের অনেকেই জীবনের শেষের দিকে বছরের পর বছর হোটেলে কাটিয়ে দেন। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্যে নির্মিত ওল্ডহোমগুলো তাঁদের পছন্দ নয়। ওল্ড হোমগুলোতে তাঁরা হসপিটাল হসপিটাল গন্ধ পান। লোকজনও ওল্ড হাউসগুলোকে দেখে করুণার চোখে, এর চেয়ে হোটেলই ভালো।

পাশের ঘরের বৃদ্ধার নাম মনে পড়ছে না—সুসিন বা সুজি জাতীয় কিছু হবে। দেখতে অবিকল 'পথের পাঁচালি'র সত্যজিতের ছবির ইন্দিরা ঠাকরুনের মতো। মাথার চুল সেইরকম ছোটছোট করে কাটা, বয়সের ভারে নুয়ে পড়া শরীর। শুধু পরনে শতছিন্ন শাড়ির বদলে স্কার্ট, ঠোঁটে লিপস্টিক। এই বৃদ্ধা, হোটেলে ঢোকার এক ঘণ্টার মধ্যে আমার দরজায় নক করলেন। দরজা খোলামাত্র বললেন, সুপ্রভাত। তোমার কাছে কি ভারতীয় মুদ্রা আছে ?

না।

স্ট্যাম্প আছে ?

না, তা-ও নেই।

ও আচ্ছা। আমি মুদ্রা এবং স্ট্যাম্প দুটাই জমাই। এটা আমার হবি।

বৃদ্ধা বিমর্ষ মুখে চলে গেলেন। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। এই মহিলা জীবনের শেষ কটি দিন স্ট্যাম্প বা মুদ্রা জমিয়ে যাচ্ছেন কেন বুঝতে পারলাম না। অন্য কোনো সঞ্চয় কি তাঁর জীবনে নেই ? বৃদ্ধা চলে যাওয়ার পরপরই হোটেলের লন্ড্রির লোক ঢুকল। কালো আমেরিকান। এর নাম জর্জ ওয়াশিংটন। নিগ্রোদের মধ্যে আমেরিকার প্রেসিডেন্টদের নাম অনুসারে নাম রাখার একটা প্রবণতা আছে। এই জর্জ ওয়াশিংটন সম্ভবত আমার গায়ের কৃষ্ণবর্ণের কারণে আমার প্রতি শুরুতেই গভীর মমতা দেখাতে শুরু করল। গম্ভীর মুখে বলল, প্রথম এসেছ আমেরিকায় ?

হ্যাঁ।

পড়াশোনার জন্যে ?

হ্যাঁ।

নিজেদের দেশে পড়াশোনা হয় না যে এই পচা জায়গায় আসতে হয় ?

আমি নিশ্চুপ। সে গলা নামিয়ে বলল, বুড়িগুলোর কাছ থেকে সাবধানে থাকবে, এরা বড় বিরক্ত করে। মোটেই পাত্তা দেবে না।

ঠিক আছে।

মদ্যপান করো ?

না।

মাঝে মধ্যে করতে পার, এতে দোষের কিছু নেই। তবে মেয়েদের সঙ্গে মেশার ব্যাপারে সাবধান থাকবে। হুকার (বেশ্যা)-দের নিয়ে বিছানায় যাবে না—অসুখ-বিসুখ হবে। তাছাড়া হুকারদের বেশিরভাগই হচ্ছে চোর। টাকাপয়সা, ঘড়ি এইসব নিয়ে পালিয়ে যাবে। হুকার কী করে চিনতে হয় আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব।

আচ্ছা।

খাওয়াদাওয়া কোথায় করবে ? হোটেলে ?

হুঁ।

খবরদার, এই হোটেলের রেস্টুরেন্টে খাবে না। রান্না কুৎসিত, দামও বেশি। দুই ব্লক পরে একটা হোটেল আছে, নাম—বীফ এন্ড বান।

বীফ এন্ড বান ?

হ্যাঁ। ঐখানে খাবার ভালো, দামেও সস্তা।

তোমাকে ধন্যবাদ।

ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই। বিয়ে করেছ ?

হ্যাঁ।

বউয়ের ছবি আছে ?

আছে।

দেখাও।

আমি ছবি বের করে দেখালাম। জর্জ ওয়াশিংটন নানা ভঙ্গিতে ছবি দেখে বলল, অপূর্ব সুন্দরী। তুমি অতি ভাগ্যবান।

আমেরিকানদের অনেক কুৎসিত অভ্যাসের পাশে পাশে অনেক সুন্দর অভ্যাসও আছে। যার একটি হচ্ছে, ছবি দেখে মুগ্ধ হওয়ার ভান করা। আমি লক্ষ করেছি, অতিসামান্য পরিচয়েও এরা বলে—ফ্যামিলির ছবি সঙ্গে আছে ? দেখি কেমন ?

ছবিতে যদি তারকা রাক্ষসীর মতো কোনো দাঁত বের করা মহিলাও থাকে, এরা বলবে, অপূর্ব! তুমি ভাগ্যবান পুরুষ, লাকি ডগ।

এরা মানিব্যাগে ক্রেডিট কার্ডের পাশে নিজের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের ছবি রাখে। এর কোনো ব্যতিক্রম পাওয়া যাবে না বলেই আমার ধারণা। অবশ্যি স্ত্রী বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে ছবিও বদলায়। নতুন স্ত্রীকে দিনের মধ্যে একশবার মধুর কণ্ঠে 'হানি' ডাকে। সেই 'হানি' একসময় 'হেমলক' হয়ে যায়, তখন খোঁজ পড়ে নতুন কোনো হানির। মানিব্যাগে আবার ছবি বদল হয়।

জর্জ ওয়াশিংটন চলে গেল। আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত একা একা নিজের ঘরে বসে রইলাম। কিছুই ভালো লাগে না। ঘরে চিঠি লেখার কাগজপত্র আছে। চিঠি লিখতে ইচ্ছে করল না। সঙ্গে একটিমাত্র বাংলা বই—রবীন্দ্রনাথের *গল্পগুচ্ছ*। ভেবেছিলাম—একাকিত্বের জীবন, গুল্পগুলো পড়তে ভালো লাগবে। আমার প্রিয় গল্পের একটি পড়তে চেষ্টা করলাম—

> সুরবালার সঙ্গে একত্রে পাঠশালায় গিয়াছি এবং বউ বউ খেলিয়াছি। তাহাদের বাড়িতে গেলে সুরবালার মা আমাকে বড় যত্ন করিতেন এবং আমাদের দুইজনকে একত্র করিয়া আপনা-আপনি বলাবলি করিতেন, আহা দুটিতে বেশ মানায়...

আমার এত প্রিয় গল্প, অথচ পড়তে ভালো লাগল না। ইচ্ছে হলো হোটেলের জানালা খুলে নিচে লাফিয়ে পড়ি।

রাতে খেতে গেলাম 'বীফ এন্ড বান' রেস্টুরেন্টে। আলো ঝলমল ছোটখাটো একটা রেস্টুরেন্ট। বিমানবালাদের মতো পোশাকের তিনটি ফুটফুটে তরুণী খাবার দিচ্ছে। অর্ডার নিচ্ছে। মাঝে মাঝে রসিকতা করছে। এদের চেহারা যেমন সুন্দর কথাবার্তাও তেমনি মিষ্টি। আমেরিকান সুন্দরীরা কেমন তা দেখতে হলে এদের বার রেস্টুরেন্টে উঁকি দিয়ে ওয়েট্রেসদের দেখতে হয়।

আমি কোনার দিকে একটি টেবিলে বসলাম। আমার পকেটে আছে মাত্র পনেরো ডলার। উনিশশো সাতাত্তর সালের কথা, তখন দেশের বাইরে কুড়ি ডলারের বেশি নেওয়া যেত না। আমি কুড়ি ডলার নিয়েই বের হয়েছিলাম। পথে লোভে পড়ে এক কার্টন মার্লবোরো সিগারেট কিনে ফেলায় ডলারের সঞ্চয় কমে গেছে। মেনু দেখে আঁতকে উঠলাম। সব খাবারের দাম আট ডলার নয় ডলার। স্টেক জাতীয় খাবারগুলোর দাম আরও বেশি। বেছে বেছে সবচেয়ে কমদামি একটা খাবারের অর্ডার দিলাম—ফ্রেঞ্চ টোস্ট। দামে সস্তা, তাছাড়া চেনা খাবার। ওয়েট্রেস অবাক হয়ে বলল, এটাই কি তোমার ডিনার ? আমি বললাম, ইয়েস।

সঙ্গে আর কিছু নেবে না ?

কোল্ড ড্রিংক কিংবা কফি ?

নো।

রাতের খাবার শেষ করে একা একা হোটেলের লাউঞ্জে বসে রইলাম। লাউঞ্জ প্রায় ফাঁকা। এক কোনায় দুইজন বুড়োবুড়ি ঝিম মেরে বসে আছে। তাদের দেখে মনে হচ্ছে জীবনের বাকি দিনগুলো কী করে কাটাবে এরা এই নিয়েই চিন্তিত। ওদের চেয়ে আমি নিজেকে আলাদা করতে পারলাম না।

পাশের ঘরেই হোটেলের বার। সেখানে উদ্দাম গান হচ্ছে। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে নারীপুরুষ জড়াজড়ি করে নাচছে। গানের কথাগুলো পরিষ্কার নয়। একটি চরণ বারবার ফিরে ফিরে আসছে—Whom do you want to love yea ? Yea শব্দটির মানে কী কে জানে ?

রাতে ঘুম এল না ভয়ে—ভূতের ভয়।

এই ভূতের ভয়ের মূল কারণ, আমার ঘরে রাখা হোটেল গ্রেভার ইন সম্পর্কিত একটি তথ্যপুস্তিকা। সেখানে আছে, এই পাথরের হোটেলটি কে প্রথম বানিয়েছিলেন সেই সম্পর্কে তথ্য। বিখ্যাত ব্যক্তি কারা কারা এই হোটেলে ছিলেন তাঁদের নাম-ধাম। সেইসব বিখ্যাত ব্যক্তির কাউকেই চিনতে পারলাম না, তবে এই হোটেলে একটি ভৌতিক কক্ষ আছে জেনে আঁতকে উঠলাম। রুম নম্বর ৩০৯-এ একজন অশরীরী মানুষ থাকেন বলে একশ বছরের জনশ্রুতি আছে। যিনি এখানে বাস করেন তাঁর নাম জন পাউল। পেশায় আইনজীবী ছিলেন। এই হোটেলেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরও হোটেলের মায়া কাটাতে পারেননি। পুস্তিকায় লেখা এই বিদেহী আত্মা অত্যন্ত শান্ত ও ভদ্র স্বভাবের। কাউকে কিছুই বলেন না। গভীর রাতে পাইপ হাতে হোটেলের বারান্দা দিয়ে হেঁটে বেড়ান।

হোটেলের তিনশ নয় নম্বর কক্ষটিতে কোনো অতিথি রাখা হয় না। বছরের পর বছর এটা খালি থাকে, তবে রোজ পরিষ্কার করা হয়। বিছানার চাদর বদলে দেওয়া হয়। বাথরুমে নতুন সাবান, টুথপেস্ট দেওয়া হয়। ঘরের সামনে একটা সাইনবোর্ড আছে, সেখানে লেখা—'মিঃ জন পাউলের ঘর। নীরবতা পালন করুন। জন পাউল নীরবতা পছন্দ করেন।'

পুরো ব্যাপারটা একধরনের রসিকতা কিংবা আমেরিকানদের ব্যবসা-কৌশলের একটা অংশ, তবু রাত যতই বাড়তে লাগল মনে হতে লাগল এই বুঝি জন পাউল এসে আমার দরজায় দাঁড়িয়ে বলবেন, তোমার কাছে কি আগুন আছে ? আমার পাইপের আগুন নিভে গেছে।

এমনিতেই ভয়ে কাঠ হয়ে আছি, তার উপর পাশের ঘরের বৃদ্ধা বিচিত্র সব শব্দ করছেন। এই খকখক করে কাশছেন, এই চেয়ার ধরে টানাটানি করছেন, গানের সিকি অংশ শুনছেন, দরজা খুলে বেরুচ্ছেন আবার ঢুকছেন। শেষরাতের দিকে মনে হলো দেশগাঁয়ের মেয়েদের মতো সুর করে বিলাপ শুরু করেছেন।

নিঃসঙ্গ মানুষের অনেক ধরনের কষ্ট থাকে।

পুরোপুরি না ঘুমিয়ে কেউ রাত কাটাতে পারে না। শেষরাতের দিকে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও ঘুম আসে। কিন্তু আমার এল না। পুরো রাত চেয়ারে বসে কাটিয়ে দিলাম। ভোরবেলা আমার ছোটভাই মুহম্মদ জাফর ইকবাল টেলিফোন করল ওয়াশিংটন সিয়াটল থেকে। সে আমার আগে এদেশে এসেছে। পিএইচডি করছে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে। পরিষ্কার লজিকের ঠান্ডা মাথার একটা ছেলে। ভাবালুতা কিংবা অস্থিরতার কিছুই তার মধ্যে নেই। জটিল বিষয় নিয়ে গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে সে অসম্ভব সুন্দর কিছু লেখা লিখে ফেলেছে—'কপেট্রনিক সুখ দুঃখ', 'দীপু নাম্বার টু', 'হাত কাটা রবীন'। প্রসঙ্গের বাইরে চলে যাচ্ছি, তবু বলার লোভ সামলাতে পারছি না। জাফর ইকবালের লেখা পড়লে ঈর্ষার সূক্ষ্ম খোঁচা অনুভব করি। এই ক্ষমতাবান প্রবাসী লেখক দেশে তাঁর যোগ্য সম্মান পেলেন না, এই দুঃখ আমার কোনোদিন যাবে না।

মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ইকবাল টেলিফোন করে খাস ময়মনসিংহের উচ্চারণে বলল, দাদাভাই কেমন আছো ?

আমি বললাম, তুই আমার টেলিফোন নাম্বার কোথায় পেলি ?

আমেরিকায় টেলিফোন নাম্বার পাওয়া কোনো সমস্যা না। তুমি কেমন আছ বলো ?

তোর কাছে ডলার আছে ?

তোমাকে একশ ডলারের একটা ড্রাফট পাঠিয়ে দিয়েছি। আজই পাবে।

একশ ডলারে হবে না। তুই আমাকে একটা টিকিট কেটে দে আমি দেশে চলে যাব।

আমার কথায় সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না। সহজ গলায় বলল, যেতে চাও কোনো অসুবিধা নেই, টিকিট কেটে দেব। কয়েকটা দিন যাক। একটু ঘুরে ফিরে দেখো। এখানে বাংলাদেশী ছেলে নেই ?

বাংলাদেশী ছেলের আমার কোনো দরকার নেই। তুই টিকিট কেটে পাঠা।

আচ্ছা পাঠাব। তুমি কি পৌঁছার সংবাদ দেশে দিয়েছ? ভাবিকে চিঠি লিখেছ?

চিঠি লেখার দরকার কী! আমি নিজেই তো যাচ্ছি।

তা ঠিক। তবু লিখে দাও। যেতে যেতেও তো সময় লাগবে। আজই লিখে ফ্যালো। আর শোনো, তোমার যে খুব খারাপ লাগছে, দেশে চলে যেতে চাচ্ছ, এইসব না লিখলেই ভালো হয়।

আমি চুপ করে রইলাম। ইকবাল বলল, রাতে তোমাকে আবার টেলিফোন করব। আর আমি তোমাদের ফরেন স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজারকেও ফোন করে বলে দিচ্ছি যাতে তিনি বাংলাদেশী ছেলেদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ করিয়ে দেন।

সেই সময় ফার্গো শহরে আর একজন মাত্র বাঙালি ছিলেন। সুফী সাহেব। তিনি এসেছেন এগ্রোনমিতে পিএইচডি করতে। তাঁর সঙ্গে আমার কোনোরকম যোগাযোগ হলো না। দিনের বেলাটা ইউনিভার্সিটিতে খানিকক্ষণ ঘুরলাম। চারদিক বড় বেশি ঝকঝকে, তকতকে। বড় বেশি গোছানো। বিশ্ববিদ্যালয় সামারের বন্ধ থাকলেও কিছু কিছু ক্লাস হচ্ছে। একটা ক্লাসরুমে উঁকি দিয়ে দেখি অনেক ছেলেমেয়ের হাতে কফির কাপ কিংবা কোল্ড ডিংকের বোতল। আরাম করে খাওয়াদাওয়া করতে করতে অধ্যাপকদের বক্তৃতা শুনছে। পৃথিবীতে দু'ধরনের মানুষ আছে। এক ধরনের কাছে বিদেশের সবকিছুই ভালো লাগে, অন্যদের কিছুই ভালো লাগে না। আমি দ্বিতীয় দলের। আমার কাছে কিছুই ভালো লাগে না। যা দেখি তাতেই বিরক্ত হই।

রাতে আবার খেতে গেলাম বীফ এন্ড বানে। সেই পুরাতন খাবার। ফ্রেঞ্চ টোস্ট। রুটিনটি হলো এরকম সকালবেলা ইউনিভার্সিটি এলাকায় যাই। একা একা হাঁটাহাঁটি করি। যা দেখি তা-ই খারাপ লাগে। সন্ধ্যায় হোটেলে ফেরত আসি। রাতে খেতে যাই বীফ এন্ড বানে। ফ্রেঞ্চ টোস্টের অর্ডার দেই। অন্যকিছু খেতে ইচ্ছে করে না। ডলারের অভাব এখন আর আমার নেই। ইউনিভার্সিটি আমাকে চারশ ডলার অগ্রিম দিয়েছে। সিয়াটল থেকে পাঠানো ছোট ভাইয়ের চেকটাও ভাঙিয়েছি। টাকার অভাব নেই। বীফ এন্ড বানে খাবারেরও অভাব নেই। কিন্তু কোনো খাবারই খেতে ইচ্ছা করে না। খেতে গেলেই চোখের সামনে ভাসে এক প্লেট ধবধবে সাদা ভাত। একটা বাটিতে সর্ষেবাটা দিয়ে রাঁধা ইলিশ। ছোট্ট পিরিচে কাঁচা লঙ্কা, আধখান কাগজি লেবু। আমার প্রাণ হু-হু করে। ওয়েট্রেস যখন অর্ডার নিতে আসে, আমি বলি, ফ্রেঞ্চ টোস্ট। সে অবাক হয়ে তাকায়। হয়তো ইতোমধ্যে এই রেস্টুরেন্টে আমার নামই হয়ে গেছে 'ফ্রেঞ্চ টোস্ট'। আমি লক্ষ করছি, আমাকে দেখলেই ওয়েট্রেসরা নিজেদের মধ্যে চাওয়া-চাওয়ি করে এবং একসময় এসে কোমল গলায় বলে, সে-ই খাবার?

আমি বলি, ইয়েস।

ছটি দীর্ঘ রজনী কেটে গেল। তারপর চমৎকার একটা ঘটনা আমার জীবনে ঘটল। ঘটনাটা বিশদভাবে বলা দরকার। এই ঘটনা না ঘটলে হয়তো আমি আমেরিকায় থাকতে পারতাম না। সব ছেড়েছুড়ে চলে আসতাম।

যথারীতি রাতে খাবার খেতে গিয়েছি। ওয়েট্রেস অর্ডার নিতে আমার কাছে আর আসছে না। আমার কেন জানি মনে হলো দূর থেকে সবাই কৌতূহলী ভঙ্গিতে আমাকে দেখছে। ফিসফাস করছে। তাদের দোষ দিচ্ছি না। দিনের পর দিন ফ্রেঞ্চ টোস্ট খেয়ে খেয়ে আমিই এই অবস্থাটা তৈরি করেছি। একা অনেকক্ষণ বসে থাকার পর অর্ডার নিতে একটি মেয়ে এল। আমাকে অবাক করে দিয়ে বসল আমার সামনের চেয়ারে। যে কথাগুলো সে আমাকে বলল তা শোনার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। মেয়েটি নিচু গলায় বলল, দ্যাখো আহামাদ, আমরা জানি তোমার সময়টা ভালো যাচ্ছে না। দিনের পর দিন তুমি একটা কুৎসিত খাবার মুখ বুজে খেয়ে যাচ্ছ। টাকাপয়সার কষ্টের মতো কষ্ট তো আর কিছুই হতে পারে না। তবু বলছি, নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো। দুঃসময় একদিন অবশ্যই কাটবে।

আমি একবার ভাবলাম বলি, তোমরা যা ভাবছ ব্যাপারটা সেরকম নয়। পরমুহূর্তেই মনে হলো—এটা বলার দরকার নেই। এটা বলা মানেই এদের ভালোবাসার অপমান করা। আমি তা হতে দিতে পারি না।

মেয়েটি বলল, আজ তোমার জন্যে আমরা ভালো একটা ডিনারের ব্যবস্থা করেছি। এর জন্যে তোমাকে কোনো পয়সা দিতে হবে না। তুমি আরাম করে খাও এবং মনে সাহস রাখো।

সে উঠে গিয়ে বিশাল ট্রেতে করে টি বোন স্টেক নিয়ে এল। সঙ্গে নানান ধরনের টুকিটাকি। কফি এল, আইসক্রিম এল। ওয়েট্রেসরা সবাই একবার করে দেখে গেল আমি ঠিকমতো খাচ্ছি কি না। আমি খুব আবেগপ্রবণ ছেলে, আমার চোখে পানি এসে গেল। এরা এত মমতা একজন অচেনা অজানা ছেলের জন্যে রেখে দিয়েছিল ? মেয়েগুলো আমার চোখের জল দেখতে পেলেও ভান করল যেন দেখতে পায়নি।

গভীর আনন্দ নিয়ে হোটেল গ্রেভার ইনে ফিরে এলাম। রিসিপশনে বসে থাকা গোমরা মুখের মেয়েটাকে আজ অনেক ভালো লাগল। আমি হাসিমুখে বললাম, হ্যালো।

সেও হাসিমুখে বলল, হ্যালো।

গ্রেভার ইন বারের উদ্দাম গান আজ শুনতে ভালো লাগল। ইচ্ছে করল ভেতরে ঢুকে খানিকক্ষণ শুনি।

আমার পাশের বৃদ্ধার ঘরে নক করে তাঁকে বললাম, আমার কাছে দুটো বাংলাদেশী মুদ্রা আছে, তুমি কি নেবে ?

অনেক রাতে স্ত্রীকে চিঠি লিখতে বসলাম। সেই চিঠিটা খুব অদ্ভুত ছিল। কারণ চিঠিতে তুষারপাতের একটা বানানো বর্ণনা ছিল। তুষারপাত না দেখেই আমি লিখলাম—'আজ বাইরে খুব তুষারপাত হচ্ছে। রাস্তাঘাট ঢেকে গেছে সাদা বরফে। সে যে কী অপূর্ব দৃশ্য তুমি না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না। আমি হোটেলের জানালার কাছে বসে বসে লিখছি। তুমি পাশে থাকলে দুজন হাত ধরাধরি করে তুষারের মধ্যে দাঁড়াতাম।'

যে তিনজন তরুণী আমেরিকা প্রসঙ্গে আমার ধারণাই বদলে দিল আজ তাঁদের কথা গভীর মমতা ও গভীর ভালোবাসায় স্মরণ করছি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে আজ আমরা বিভক্ত। কত দেশ, কত নাম—কিন্তু মানুষ একই আছে। আসছে লক্ষ বছরেও তা-ই থাকবে।

ডানবার হলের জীবন

নর্থ ডাকোটা ইউনিভার্সিটির ক্লাসগুলো যেখানে হয় তার নাম ডানবার হল। ডানবার হলের তেত্রিশ নম্বর কক্ষে ক্লাস শুরু হলো। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ক্লাস। কোর্স নাম্বার ৫২৯।

কোর্স নাম্বারগুলি সম্পর্কে সামান্য ধারণা দিয়ে নেই। টু হানড্রেড লেভেলের কোর্স হচ্ছে আন্ডার গ্রাজুয়েটের নিচের দিকের ছাত্রদের জন্যে। থ্রি হানড্রেড লেভেল হচ্ছে আন্ডার গ্রাজুয়েটের উপরের দিকের ছাত্রদের জন্যে। ফোর হানড্রেড এবং ফাইভ হানড্রেড লেভেল হচ্ছে গ্রাজুয়েট লেভেল।

ফাইভ হানড্রেড লেভেলের যে কোর্সটি আমি নিলাম সে সম্পর্কে আমার তেমন কোনো ধারণা ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অল্পকিছু কোয়ান্টাম মেকানিক্স পড়েছি। একেবারে কিছুই যে জানি না তাও না। তবে এই বিষয়ে আমার বিদ্যা খুবই ভাসাভাসা। জলের ওপর ওড়াউড়ি, জল স্পর্শ করা নয়।

একাডেমিক বিষয়ে নিজের মেধা এবং বুদ্ধির ওপর আমার আস্থাও ছিল সীমাহীন। রসায়নের একটি বিষয় আমি পড়ে বুঝতে পারব না, তা হতেই পারে না।

আমাদের কোর্স কো-অর্ডিনেটর আমাকে বললেন, ফাইভ হানড্রেড লেভেলের এই কোর্সটি যে তুমি নিচ্ছ, ভুল করছ না তো? পারবে?

আমি বললাম, ইয়েস।

তখনো ইয়েস এবং নো-র বাইরে তেমন কিছু বলা রপ্ত হয়নি। কোর্স কো-অর্ডিনেটর বললেন, এই কোর্সে ঢুকবার আগে কিন্তু ফোর হানড্রেড লেভেলের কোর্স শেষ করোনি। ভালো করে ভেবে দেখো, পারবে?

ইয়েস।

কোর্স কো-অর্ডিনেটরের মুখ দেখে মনে হলে তিনি আমার ইয়েস শুনেও বিশেষ ভরসা পাচ্ছেন না।

ক্লাস শুরু হলো। ছাত্র সংখ্যা পনেরো। বিদেশী বলতে আমি এবং ইন্ডিয়ান এক মেয়ে—কান্তা। ছাত্রদের মধ্যে একজন অন্ধ ছাত্রকে দেখে চমকে উঠলাম। সে তার ব্রেইলি টাইপ রাইটার নিয়ে এসেছে। ক্লাসে ঢুকেই সে বিনীত ভঙ্গিতে বলল, আমি বক্তৃতা টাইপ

করব। খটখট শব্দ হবে, এজন্যে আমি ক্ষমা চাচ্ছি। আমি হতভম্ব। অন্ধ ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে এটা আমি জানি। আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও কিছু অন্ধ ছাত্রছাত্রী আছে, তবে তাদের বিষয় হচ্ছে সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা বা দর্শন। কিন্তু থিওরিটিক্যাল কেমিস্ট্রিও কেউ পড়তে আসে আমার জানা ছিল না।

আমাদের কোর্স টিচারের নাম মার্ক গর্ডন। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মস্তান লোক। থিওরিটিক্যাল কেমিস্ট্রির লোকজন তাঁর নাম শুনলে চোখ কপালে তুলে ফেলে। তাঁর খ্যাতি প্রবাদের পর্যায়ে চলে গেছে।

লোকটি অসম্ভব রোগা এবং তালগাছের মতো লম্বা। মুখভর্তি প্রকাণ্ড গোঁফ। ইউনিভার্সিটিতে আসেন ভালুকের মতো বড় একটা কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে। তিনি যখন ক্লাসে যান কুকুরটা তাঁর চেয়ারে পা তুলে বসে থাকে।

মার্ক গর্ডন ক্লাসে ঢুকলেন একটা টি-শার্ট গায়ে দিয়ে। সেই টি-শার্টে যা লেখা তার বঙ্গানুবাদ হলো, সুন্দরী মেয়েরা আমাকে ভালোবাসা দাও।

ক্লাসে ঢুকেই সবার নামধাম জিজ্ঞেস করলেন। সবাই বসে বসে উত্তর দিল। একমাত্র আমি দাঁড়িয়ে জবাব দিলাম। মার্ক গর্ডন বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি দাঁড়িয়ে কথা বলছ কেন ? বসে কথা বলতে কি তোমার অসুবিধা হয় ?

আমি জবাব দেওয়ার আগেই কান্তা বলল, এটা হচ্ছে ভারতীয় ভদ্রতা।

মার্ক গর্ডন বললেন, হুমায়ূন, তুমি কি ভারতীয় ?

না। আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি।

ও আচ্ছা, আচ্ছা। বাংলাদেশ। বসো। এর পর থেকে বসে বসে কথা বলবে।

আমি বসলাম। মানুষটাকে ভালো লাগল এই কারণে যে, সে শুদ্ধভাবে আমার নাম উচ্চারণ করেছে। অধিকাংশ আমেরিকান যা পারে না কিংবা শুদ্ধ উচ্চারণের চেষ্টা করে না। আমাকে যেসব নামে ডাকা হয় তার কয়েকটি হচ্ছে—হামায়ান, হিউমেন, হেমীন।

মার্ক গর্ডন টেবিলে পা তুলে বসলেন এবং বললেন, ক্লাস শুরু করার আগে একটা জোক বলা যাক। আমি আবার ডার্টি জোক ছাড়া অন্যকিছু জানি না। যারা ডার্টি জোক শুনতে চাও না, তারা দয়া করে কান বন্ধ করে ফেলো।

গল্পটি হচ্ছে এক ফরাসি তরুণীকে নিয়ে, যার একটি স্তন বড় অন্যটি ছোট। বিয়ের রাতে তার স্বামী...

গল্পটি চমৎকার, তবে এ দেশে তা আমার পক্ষে লেখা সম্ভব না বলে শুধু শুরুটা বললাম। গল্প শেষ হওয়ার পর হাসি থামতে পাঁচ মিনিটের মতো লাগল। শুধু কান্তা হাসল না, মুখ লাল করে বসে রইল। যেন পুরো রসিকতাটা তাকে নিয়েই করা হয়েছে।

মার্ক গর্ডন লেকচার শুরু করলেন। ক্লাসের ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেল। বক্তৃতার শেষে তিনি বললেন, সহজ ব্যাপারগুলি নিয়ে আজ কথা বললাম, প্রথম ক্লাস তো তাই।

আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। কিছু বুঝতে পারিনি। তিনি ব্যবহার করছেন গ্রুপ থিওরি, যে গ্রুপ থিওরির আমি কিছুই জানি না।

আমি আমার পাশে বসে থাকা আমেরিকান ছাত্রটিকে বললাম, তুমি কি কিছু বুঝতে পারলে ?

সে বিস্মিত হয়ে বলল, কেন বুঝব না, এসব তো খুবই এলিমেন্টারি ব্যাপার।

এক সপ্তাহ চলে গেল। ক্লাসে যাই, মার্ক গর্ডনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। কিছু বুঝতে পারি না। নিজের মেধা এবং বুদ্ধির ওপর যে আস্থা ছিল তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কোয়ান্টাম মেকানিক্স-এর প্রচুর বই জোগাড় করলাম। রাতদিন পড়ি। কোনো লাভ হয় না। এই জিনিস বোঝার জন্যে ক্যালকুলাসের যে জ্ঞান দরকার তা আমার নেই। আমার ইনসমনিয়ার মতো হয়ে গেল। ঘুমুতে পারি না। গ্রেভার ইনের লবিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকি। মনে মনে বলি, কী সর্বনাশ!

আমার পাশের ঘরের বৃদ্ধা আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করে, তোমার কী হয়েছে বলো তো ? তুমি কি অসুস্থ ? স্ত্রীর চিঠি পাচ্ছ না ?

দেখতে দেখতে মিড টার্ম পরীক্ষা এসে গেল। পরীক্ষার পরপর যে লজ্জার সম্মুখীন হতে হবে তা ভেবে হাত-পা পেটের ভেতরে ঢুকে যাওয়ার জোগাড় হলো। মার্ক গর্ডন যখন দেখবে বাংলাদেশের এই ছেলে পরীক্ষার খাতায় কিছুই লেখেনি তখন তিনি কী ভাববেন ? ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যানই বা কী ভাববেন ?

এই চেয়ারম্যানকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের সভাপতি প্রফেসর আলি নওয়াব আমার প্রসঙ্গে একটি চিঠিতে লিখেছেন—'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ যে অল্প সংখ্যক অসাধারণ মেধাবী ছাত্র তৈরি করেছে, হুমায়ূন আহমেদ তাদের অন্যতম।'

অসাধারণ মেধাবী ছাত্রটি যখন শূন্য পাবে তখন কী হবে ? রাতে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম।

মিড টার্ম পরীক্ষায় বসলাম। সব মিলিয়ে দশটি প্রশ্ন। এক ঘণ্টা সময়ে প্রতিটির উত্তর করতে হবে। আমি দেখলাম একটি প্রশ্নের অংশবিশেষের উত্তর আমি জানি, আর কিছুই জানি না। অংশবিশেষের উত্তর লেখার কোনো মানে হয় না। আমি মাথা নিচু করে বসে রইলাম। এক ঘণ্টা পর সাদা খাতা জমা দিয়ে বের হয়ে এলাম।

পরদিনই রেজাল্ট হলো। এ তো আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয় যে, পনেরোটি খাতা দেখতে পনেরো মাস লাগবে।

তিনজন এ পেয়েছে। ছ'জন বি। বাকি সব সি। বাংলাদেশের হুমায়ূন আহমেদ পেয়েছে শূন্য। সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে অন্ধ্র ছাত্রটি। [এ ছেলেটির নাম আমার মনে পড়ছে না। তার নামটা মনে রাখা উচিত ছিল।]

মার্ক গর্ডন আমাকে ডেকে পাঠালেন। বিস্মিত গলায় বললেন, ব্যাপারটা কী বলো তো ?

আমি বললাম, কোয়ান্টাম মেকানিক্সে আমার কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল না। এই হায়ার লেভেলের কোর্স আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

বুঝতে পারছ না, তাহলে ছেড়ে দিচ্ছ না কেন? ঝুলে থাকার মানে কী?

আমি ছাড়তে চাই না।

তুমি বোকামি করছ। তোমার গ্রেড যদি খারাপ হয়, যদি গড় গ্রেড সি চলে আসে তাহলে তোমাকে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যেতে হবে। গ্রাজুয়েট কোর্সের এ-ই নিয়ম।

এই নিয়ম আমি জানি।

জেনেও তুমি এই কোর্সটা চালিয়ে যাবে?

হ্যাঁ।

তুমি খুবই নির্বোধের মতো কথা বলছ।

হয়তো বলছি। কিন্তু আমি কোর্সটা ছাড়ব না।

কারণটা বলো।

একজন অন্ধ ছাত্র যদি এই কোর্সে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেতে পারে আমি পারব না কেন? আমার তো চোখ আছে।

তুমি আবারও নির্বোধের মতো কথা বলছ। সে অন্ধ হতে পারে, কিন্তু তার এই বিষয়ে চমৎকার ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। সে আগের কোর্স সবগুলি করেছে। তুমি করোনি। তুমি আমার উপদেশ শোনো। এই কোর্স ছেড়ে দাও।

না।

আমি ছাড়লাম না। নিজে নিজে অংক শিখলাম। গ্রুপ থিওরি শিখলাম, অপারেটর এলজেব্রা শিখলাম। মানুষের অসাধ্য কিছু নেই, এই প্রবাদটি সম্ভবত ভুল নয়। একসময় অবাক হয়ে লক্ষ করলাম কোয়ান্টাম মেকানিক্স বুঝতে শুরু করেছি।

ফাইন্যাল পরীক্ষায় যখন বসলাম তখন আমি জানি আমাকে আটকানোর কোনো পথ নেই। পরীক্ষা হয়ে গেল। পরদিন মার্ক গর্ডন একটি চিঠি লিখে আমার মেইল বক্সে রেখে দিলেন। টাইপ করা একটি সংক্ষিপ্ত চিঠি, যার বিষয়বস্তু হচ্ছে :

> তুমি যদি আমার সঙ্গে থিওরিটিক্যাল কেমিস্ট্রিতে কাজ করো তাহলে আমি আনন্দিত হব এবং তোমার জন্যে আমি একটি ফেলোশিপ ব্যবস্থা করে দেব। তোমাকে আর কষ্ট করে টিচিং অ্যাসিসটেন্টশিপ করতে হবে না।

একটি পরীক্ষা দিয়েই আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচিত হয়ে গেলাম। বিভাগীয় চেয়ারম্যান নিজের উদ্যোগে ব্যবস্থা করে দিলেন যেন আমি আমার স্ত্রীকে আমেরিকায় নিয়ে আসতে পারি।

পরীক্ষায় কত পেয়েছিলাম তা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। পাঠক-পাঠিকারা আমার এই লোভ ক্ষমার চোখে দেখবেন বলে আশা করি। আমি পেয়েছিলাম ১০০ তে ১০০।

বর্তমানে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি পড়াই। ক্লাসের শুরুতে ছাত্রদের এই গল্পটি বলি। শ্রদ্ধা নিবেদন করি ঐ অন্ধ ছাত্রটির প্রতি, যার কারণে আমার পক্ষে এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল।

আরেকটি কথা, আমি কিন্তু মার্ক গর্ডনের সঙ্গে কাজ করতে রাজি হইনি। এই বিষয়টি নিয়ে আর কষ্ট করতে ইচ্ছা করছিল না, তাছাড়া আমার খানিকটা কুকুরভীতি আছে। মার্ক গর্ডনের ভালুকের মতো কুকুরটিকে পাশে নিয়ে কাজ করার প্রশ্নই ওঠে না।

বাংলাদেশ নাইট

ভোর চারটার সময় টেলিফোন বেজে উঠল, অসময়ে টেলিফোন মানেই রিসিভার না নেওয়া পর্যন্ত বুকে ধড়ফড়। নির্ঘাৎ বাংলাদেশের কল। একগাদা টাকা খরচ করে কেউ যখন বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় কল করে তখন ঘটনা খারাপ ধরেই নিতে হবে। নিশ্চয়ই কেউ মারা টারা গেছে।

তিনবার রিং হওয়ার পর আমি রিসিভার তুলে ভয়ে ভয়ে বললাম, হ্যালো।

ওপার থেকে ভারী গলা শোনা গেল, হুমায়ূন ভাই, খিচুড়ি কী করে রান্না করতে হয় জানেন ?

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। টেলিফোন করেছে মোরহেড স্টেট ইউনিভার্সিটির মিজানুল হক। সেখানকার একমাত্র বাঙালি ছাত্র। অ্যাকাউন্টিং-এ আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্স করছে।

হ্যালো হুমায়ূন ভাই, কথা বলছেন না কেন ? খিচুড়ি কী করে রান্না করতে হয় জানেন ?

না।

তাহলে তো বিগ প্রবলেম হয়ে গেল।

আমি চুপ করে রইলাম। মিজানুল হক হড়বড় করে বলল, কাচ্চি বিরিয়ানির প্রিপারেশন জানা আছে ?

আমি শীতল গলায় বললাম, ক'টা বাজে জানো ?

ক'টা ?

রাত চারটা।

বলেন কী ? এত রাত হয়ে গেছে ? সর্বনাশ!

করছিলে কী তুমি ?

বাংলাদেশের ম্যাপ বানাচ্ছি। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন হুমায়ূন ভাই। সকালে টেলিফোন করব, বিরাট সমস্যায় পড়েছি।

মিজানুল হক খট করে টেলিফোন রেখে দিল। আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম। পার্কোলেটরে কফি বসিয়ে দিলাম। আমার ঘুমাবার চেষ্টা করা বৃথা। মিজানুল হকের মাথার ঠিক নেই, কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার টেলিফোন করবে। অন্য কোনো খাবারের রেসিপি জানতে চাইবে।

এ ব্যাপারটা গত তিনদিন ধরে চলছে। মোরহেড স্টেট ইউনিভার্সিটিতে আন্তর্জাতিক বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে অন্যান্য দেশের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হবে বাংলাদেশ নাইট। এই অঞ্চলে বাংলাদেশের একমাত্র ছাত্র হচ্ছে মিজান, আর আমি আছি নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে। মিজানের একমাত্র পরামর্শদাতা। আশপাশে সাতশ মাইলের মধ্যে দ্বিতীয় বাঙালি নেই।

কফির পেয়ালা হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিজানের টেলিফোন।

হ্যালো, হুমায়ূন ভাই ?

হ্যাঁ।

প্ল্যান-প্রোগ্রাম নিয়ে আপনার সঙ্গে আরেকবার বসা দরকার।

এখনো তো দেরি আছে।

দেরি আপনি কোথায় দেখলেন ? এক সপ্তাহ মাত্র। শালাদের একটা ভেলকি দেখিয়ে দেব। বাংলাদেশ বললে চিনতে পারে না, হা করে তাকিয়ে থাকে। ইচ্ছা করে চড় মেরে মুখ বন্ধ করে দেই। এইবার শালারা বুঝবে বাংলাদেশ কী জিনিস। ঠিক না হুমায়ূন ভাই ?

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।

শালাদের চোখ ট্যারা হয়ে যাবে দেখবেন। আমি আপনার এখানে চলে আসছি।

মিজান টেলিফোন নামিয়ে রাখল। আমি আরেকটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম। এই ছেলেটিকে আমি খুবই পছন্দ করি। তার সমস্যা একটাই, সারাক্ষণ মুখে—বাংলাদেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন একটা খোলার চেষ্টা করেছিল। একজন ছাত্র থাকলে এসোসিয়েশন হয় না বলে সেই চেষ্টা সফল হয়নি। অন্য স্টেট থেকে বাংলাদেশী ছাত্র আনার চেষ্টাও করেছে, লাভ হয়নি। এই প্রচণ্ড শীতের দেশে কেউ আসতে চায় না। শীতের সময় এখানকার তাপমাত্রা শূন্যের ত্রিশ ডিগ্রি নিচে নেমে যায়, কে আসবে এইরকম ভয়াবহ ঠান্ডা একটা জায়গায় ?

মিজান এই ব্যাপারে বেশ মনমরা হয়েছিল। বাংলাদেশ নাইট-এর ব্যাপারটা এসে পড়ায় সেই দুঃখ খানিকটা কমেছে। এই বাংলাদেশ নাইট নিয়েও বিরাট কাণ্ড। মোরহেড স্টেট ইউনিভার্সিটির ফরেন স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজার মিজানকে বলল, তুমি এক কাজ করো—তুমি বাংলাদেশ নাইট পাকিস্তানিদের সঙ্গে করো।

মিজান হুঙ্কার দিয়ে বলল, কেন ?

এতে তোমার সুবিধা হবে। ডবল ডেকোরেশন হবে না। এক খরচায় হয়ে যাবে। তুমি একা মানুষ।

তোমার এত বড় সাহস, তুমি পাকিস্তানিদের সঙ্গে আমাকে বাংলাদেশ নাইট করতে বলছ ? তুমি কি জানো, ওরা কী করেছে ? তুমি কি জানো ওরা আমাদের কতজনকে মেরেছে ? তুমি কি জানো... ?

কী মুশকিল, তুমি এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন ?

তুমি আজেবাজে কথা বলবে, তুমি আমার দেশকে অপমান করবে, আর আমি তোমার সঙ্গে মিষ্টি কথা বলব ?

মিজান, ফরেন স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজারের সামনের টেবিলে প্রকাণ্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিল। টেবিলে রাখা কফির পেয়ালা উল্টে পড়ল। লোকজন ছুটে এল। প্রচণ্ড হইচই।

এরকম মাথা গরম একটা ছেলেকে সবসময় সামলে-সুমলে রাখা মুশকিল। তবে ভরসা একটাই—সে আমাকে প্রায় দেবতার পর্যায়ে ফেলে রেখেছে। তার ধারণা আমার মতো জ্ঞানী-গুণী মানুষ শতাব্দীতে এক-আধটা জন্মায়। আমি যা বলি, শোনে।

মিজান তার ভাঙা মরিস মাইনর নিয়ে ঝড়ের গতিতে চলে এল। সঙ্গে বাংলাদেশের ম্যাপ নিয়ে এসেছে। সেই ম্যাপ দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম। যে কটা রঙ পাওয়া গেছে সব ক'টাই সে লাগিয়েছে।

জিনিসটা দাঁড়িয়েছে কেমন বলুন তো ?

রঙ একটু বেশি হয়ে গেল না ?

ওরা রঙ-চঙ একটু বেশি পছন্দ করে হুমায়ূন ভাই।

তাহলে ঠিকই আছে।

এখন আসুন প্রোগ্রামটা ঠিক করে ফেলা যাক। বাংলাদেশী খাবারের নমুনা হিসাবে খিচুড়ি খাওয়ানো হবে। খিচুড়ির শেষে দেওয়া হবে পান-সুপারি।

পান-সুপারি পাবে কোথায় ?

শিকাগো থেকে আসবে। ইন্ডিয়ান শপ আছে—ওরা পাঠাবে। ডলার পাঠিয়ে চিঠি দিয়ে দিয়েছি।

খুব ভালো।

দেশ সম্পর্কে একটা বক্তৃতা দেওয়া হবে। বক্তৃতার শেষে প্রশ্নোত্তর পর্ব। সবার শেষে জাতীয় সঙ্গীত।

জাতীয় সঙ্গীত গাইবে কে ?

কেন, আমি আর আপনি।

তুমি পাগল হয়েছ ? জীবনে আমি কোনোদিন গান গাইনি।

আর আমি বুঝি হেমন্ত ? এইসব চলবে না, হুমায়ূন ভাই। আসুন গানটা একবার প্র্যাকটিস করি।

মিজান, মরে গেলেও তুমি আমাকে দিয়ে গান গাওয়াতে পারবে না। তাছাড়া এই গানটার আমি কথা জানি না, সুর জানি না।

কথা সুর তো আমিও জানি না হুমায়ূন ভাই। চিন্তা নেই, একটা ব্যবস্থা হবেই।

উৎসবের দিন ভোরবেলাতে আমরা প্রকাণ্ড সসপ্যানে খিচুড়ি বসিয়ে দিলাম। চাল, ডাল, আনাজপাতি সেদ্ধ হচ্ছে। দুটো মুরগি কুচি কুচি করে ছেড়ে দেওয়া হলো। এক পাউন্ডের মতো কিমা ছিল তাও ঢেলে দিলাম। যত ধরনের গরম মসলা ছিল সবই দিয়ে দিলাম। জ্বাল হতে থাকল।

মিজান বলল, খিচুড়ির আসল রহস্য হলো মিক্সিং-এ। আপনি ভয় করবেন না। জিনিস ভালোই দাঁড়াবে।

সে একটা খুন্তি দিয়ে প্রবল বেগে নাড়াতে শুরু করল। ঘণ্টা দুয়েক পর যা দাঁড়াল তা দেখে বুকে কাঁপন লাগে। ঘন সিরাপের মতো একটা তরল পদার্থ। উপরে আবার দুধের সরের মতো পড়েছে। জিনিসটার রঙ দাঁড়িয়েছে ঘন কৃষ্ণ। মিজান শুকনো গলায় বলল, কালো হলো কেন বলুন তো হুমায়ূন ভাই। কালো রঙের কিছুই তো দেইনি।

আমি সেই প্রশ্নের জবাব দিতে পারলাম না। মিজান বলল, টমেটো পেস্ট দিয়ে দেব নাকি ?

দাও।

টমেটো পেস্ট দেওয়ায় রঙ আরও কালচে মেরে গেল। মিজান বলল, লাল রঙের কিছু ফুড কালার কিনে এনে ছেড়ে দেব ?

দাও।

তাও দেওয়া হলো। এতে কালো রঙের কোনো হেরফের হলো না। তবে মাঝে মাঝে লাল রঙ ঝিলিক দিতে লাগল। দু'জনেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। জাতীয় সঙ্গীতেরও কোনো ব্যবস্থা হলো না। মিজানের গানের গলা আমার চেয়েও খারাপ। যখন গান ধরে মনে হয় গলায় সর্দি নিয়ে পাতিহাঁস ডাকছে। শিকাগো থেকে পানও এসে পৌঁছল না।

অনুষ্ঠান সন্ধ্যায়। বিকেলে এক অদ্ভুত ব্যাপার হলো। অবাক হয়ে দেখি দূর দূর থেকে গাড়ি নিয়ে বাঙালি ছাত্রছাত্রীরা আসতে শুরু করেছে। শুনলাম মিজান নাকি আশপাশের যত ইউনিভার্সিটি আছে সব ইউনিভার্সিটিতে বাংলাদেশ নাইটের খবর দিয়ে চিঠি দিয়েছিল। দেড় হাজার মাইল দূরে মন্টানো স্টেট ইউনিভার্সিটি, সেখান থেকে একটি মেয়ে গ্রে হাউন্ড বাসে করে একা একা চলে এসেছে। মিনেসোটা থেকে এসেছে দশজনের একটা বিরাট দল। তারা সঙ্গে নানান রকম পিঠা নিয়ে এসেছে। গ্রান্ড ফোকস থেকে এসেছেন করিম সাহেব, তাঁর ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রী। এই অসম্ভব কর্মঠ মহিলাটি এসেই আমাদের খিচুড়ি ফেলে দিয়ে নতুন খিচুড়ি বসালেন। সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে সাউথ ডাকোটার ফলস স্প্রিং থেকে একদল ছেলেমেয়ে এসে উপস্থিত হলো।

মিজান আনন্দে লাফাবে না চেঁচাবে কিছুই বুঝতে পারছে না। চুপচাপ বসে আছে, মাঝে মাঝে গম্ভীর গলায় বলছে, দেখ শালা বাংলাদেশ কী জিনিস। শালা দেখে যা।

অনুষ্ঠান শুরু হলো দেশাত্মবোধক গান দিয়ে।

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি...।

অন্যান্য স্টেট থেকে মেয়েরা যারা এসেছে তারাই শুধু গাইছে। এত সুন্দর গাইছে। এই বিদেশ বিভুঁইয়ে গান শুনে দেশের জন্যে আমার বুক হুহু করতে লাগল। চোখে জল এসে গেল। কেউ যেন তা দেখতে না পায় সেজন্যে মাথা নিচু করে বসে রইলাম

পরদিন ফার্গো ফোরম পত্রিকায় বাংলাদেশ নাইট সম্পর্কে একটা খবর ছাপা হলো। খবরের অংশবিশেষ এরকম—

> একটি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ জাতির অনুষ্ঠান দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। অনুষ্ঠানটি শুরু হয় দেশের গান দিয়ে। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম, গান শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশী ছেলেমেয়েরা সব কাঁদতে শুরু করল। আমি আমার দীর্ঘদিনের সাংবাদিকতা জীবনে এমন মধুর দৃশ্য দেখিনি...।

কিসিং বুথ

আমেরিকানদের বিচিত্র কাণ্ডকারখানার গল্প বলার সময় কিসিং বুথের গল্পটা আমি খুব আগ্রহ করে বলি। শ্রোতারা চোখ বড় বড় করে শোনে। যুবক বয়েসীরা গল্প শেষ হওয়ার পর মনে মনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হয়তোবা ভাবে, আহা তারা কী সুখেই না আছে।

গল্পটা বলা যাক।

আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 'হোম কামিং' বলে একটি উৎসব হয়। এই উৎসবে আনন্দ মিছিল হয়, হইচই গানবাজনা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে সুন্দরী ছাত্রীটিকে হোম কামিং কুইন নির্বাচিত করা হয়। এই হোম কামিং রানিকে ঘিরে সারা দিন ধরে চলে আনন্দ-উল্লাস।

আমার আমেরিকাবাসের প্রথম বর্ষে হোম কামিং কুইন হলো আন্ডার গ্রাজুয়েট ক্লাসের এক ছাত্রী। স্পেনিশ আমেরিকান, রূপ ফেটে পড়ছে। কিছুক্ষণ এই মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকলে বুকের মধ্যে একধরনের হাহাকার জমে উঠতে থাকে, জগতসংসার তুচ্ছ বোধহয়। সম্ভবত এই শ্রেণীর রূপবতীদের প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে, মুনীগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল।

মেয়েটিকে নিয়ে ভোর এগারোটার দিকে একটা মিছিল বের হলো। আমার ইচ্ছা করল মিছিলে ভিড়ে যাই। শেষ পর্যন্ত লজ্জা লাগল। ল্যাবরেটরিতে চলে এলাম। অনেকগুলি স্যাম্পল জমা হয়েছে। এদের এক্সরে ডিফ্রেকশান প্যাটার্ন জানাতে হবে। ডিফ্রেকশান মেশিনটা ভালো কাজ করছে না। ছবি পরিষ্কার আসছে না। দুপুর একটা পর্যন্ত কাজ করলাম। ঠিক করে রাখলাম লাঞ্চ সারার জন্যে আধঘণ্টার বিরতি দেব।

মেমোরিয়াল ইউনিয়নে লাঞ্চ খেতে গিয়েছি। লক্ষ করলাম মেমোরিয়াল ইউনিয়নের দোতলায় অস্বাভাবিক ভিড়। কৌতূহলী হয়ে দেখতে গেলাম।

জটলা আমাদের হোম কামিং কুইনকে ঘিরেই। এই রূপবতী বড় বড় পোস্টার সাজাচ্ছে। পোস্টারগুলিতে লেখা : নীল তিমিরা আজ বিপন্ন। নীল তিমিদের বাঁচান।

জানা গেল এই হোম কামিং কুইন নীল তিমিদের বাঁচাও সংঘের একজন কর্মী। সে আজ নীল তিমিদের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করবে।

নীল তিমিদের ব্যাপারে আমি তেমন কোনো আগ্রহ বোধ করলাম না। মানুষই যেখানে বিপন্ন সেখানে নীল তিমি নিয়ে লাফালাফি করার কোনো অর্থ হয় না। তবু দাঁড়িয়ে আছি। রূপবতী মেয়েটির আনন্দোজ্জ্বল মূর্তি দেখতে ভালো লাগছে।

আমি লক্ষ করলাম, কাঠগড়ার মতো একটা বেষ্টনী তৈরি করা হচ্ছে। সেখানে লাল কালিতে ঠোঁটের ছবি এঁকে নিচে লেখা হলো 'কিসিং বুথ' [চুম্বন কক্ষ]। তার নিচে লেখা চুমু খাওয়ার নিয়মকানুন।

১. জড়িয়ে ধরবেন না, মুখ বাড়িয়ে চুমু খান।

২. চুমু খাওয়ার সময় খুবই সংক্ষিপ্ত।

৩. প্রতিটি চুমু এক ডলার।

৪. চেক গ্রহণ করা হবে না। ক্যাশ দিতে হবে।

৫. বড় নোট গ্রহণযোগ্য নয়।

ব্যাপারটা কী কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার পাশে দাঁড়ানো আমেরিকান ছাত্র বুঝিয়ে দিল।

হোম কামিং কুইন কিসিং বুথে দাঁড়িয়ে থাকবে। অন্যরা তাকে চুমু খাবে এবং প্রতিটি চুমুতে এক ডলার করে দেবে। সেই ডলার চলে যাবে নীল তিমি বাঁচাও ফান্ডে।

আমি হতভম্ব।

প্রথমে মনে হলো পুরো ব্যাপারটাই হয়তো একধরনের রসিকতা। আমেরিকানরা রসিকতা পছন্দ করে। এটাও বোধহয় মজার রসিকতা।

দেখা গেল ব্যাপারটা মোটেই রসিকতা নয়। মেয়েটি কিসিং বুথে দাঁড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে লাইন। এক একজন এগিয়ে আসছে, ডলার দিচ্ছে, মেয়েটিকে চুমু খেয়ে সরে যাচ্ছে, এগিয়ে আসছে দ্বিতীয় জন। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছি।

মেয়েটির মুখ হাসি হাসি। তার নীল চোখ ঝকমক করছে। যেন পুরো ব্যাপারটায় সে খুবই আনন্দ পাচ্ছে। আনন্দ ছেলেরাও পাচ্ছে। একজনকে দেখলাম দশ ডলারের একটা নোট দিয়ে পরপর দশবার চুমু খেল। এতেও তার স্বাদ মিটল না। মানিব্যাগ খুলে বিশ ডলারের আরেকটি নোট বের করে উঁচু করে সবাইকে দেখাল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড হাততালি, যার মানে—চালিয়ে যাও।

ইউনিভার্সিটির মেথর, ঝাঁড়ুদার এরাও ডলার নিয়ে এগিয়ে এল। এরা বেশ গম্ভীর। যেন কোনো পবিত্র দায়িত্ব পালন করছে। চুমু খেল খুবই শালীন ভঙ্গিতে। মন্দিরের দেবীমূর্তিকে চুমু খাওয়ার ব্যবস্থা থাকলে হয়তো এভাবেই খাওয়া হতো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভারতীয় ছাত্ররা চলে এল। এরা চুমু খাবার লাইনে দাঁড়াল না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জটলা পাকাতে লাগল। এ ওকে ঠেলাঠেলি করছে। কেউ যেতে চাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত একজন এগিয়ে এল, এর নাম উমেশ। বোম্বের ছেলে। মানুষ যে বানর থেকে এসেছে এটা উমেশকে দেখলেই বোঝা যায়। তার জন্যে ডারউইনের বই পড়তে হয় না। উমেশ চুমু খাওয়ার পরপরই অন্য ভারতীয়দের লজ্জা ভেঙে গেল। তারাও লাইনে দাঁড়িয়ে গেল। আমি ল্যাবরেটরিতে চলে এলাম। আমার প্রফেসর তার কিছুক্ষণের মধ্যেই এক্সরের কাজ কী হচ্ছে তার খোঁজ নিতে এলেন। ডিফ্রেকশন প্যাটার্ন দেখতে দেখতে বললেন, তুমি কি ঐ মেয়েটিকে চুমু খেয়েছ ?

আমি বললাম, না।

না কেন ? মাত্র এক ডলারে এমন রূপবতী একটি মেয়েকে চুমু খাওয়ার সুযোগ নষ্ট করা কি উচিত ?

আমি বললাম, এভাবে চুমু খাওয়াটা আমাদের দেশের নীতিমালায় বাধা আছে।

বাধা কেন ? চুমু হচ্ছে ভালোবাসার প্রকাশ। তুমি যদি তোমার শিশুকন্যাকে প্রকাশ্যে চুমু খেতে পার তাহলে একটি তরুণীকে চুমু খেতে পারবে না কেন ? মূল ব্যাপারটা হচ্ছে ভালোবাসা।

আমি বললাম, এই মেয়েটির ব্যাপারে তো ভালোবাসার প্রশ্ন আসছে না।

তিনি অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, আসবে না কেন ? এই মেয়েটিকে তুমি হয়তো ভালোবাসছ না, কিন্তু তার রূপকে তুমি ভালোবাসছ। বিউটি ইজ ট্রুথ। তাই নয় কি ?

আমি চুপ করে রইলাম। তিনি বললেন, একটি নির্জন দ্বীপে যদি তোমাকে ঐ মেয়েটির সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হতো তাহলে তুমি কী করতে ? চুপ করে বসে থাকতে ?

আমি নিচু গলায় বললাম, মুনীগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল।

অধ্যাপক বিরক্ত গলায় বললেন, এর মানে কী ?

আমি ইংরেজিতে তাঁকে ব্যাখ্যা করে দিলাম। অধ্যাপক পরম প্রীত হলেন।

আমি বললাম, তুমি কি চুমু খেয়ে এসেছ ?

না। এখন ভিড় বেশি। ভিড়টা কমলেই যাব।

বিকেল চারটায় এক্সরে টেকনিশিয়ান ছুটে এসে বলল, বসে আছ কেন ? এক্ষুনি মেমোরিয়েল ইউনিয়নে চলে যাও। কুইক। কুইক।

কেন ?

চারটা থেকে চারটা ত্রিশ, এই আধঘণ্টার জন্যে চুমুর দাম কমানো হয়েছে। এই আধঘণ্টার জন্যে ডলারে দুটো করে চুমু।

টেকনিশিয়ান যেমন ঝড়ের গতিতে এসেছিল তেমনি ঝড়ের গতিতেই চলে গেল। আমি গেলাম দেখতে। লাইন এখনো আছে। লাইনের শুরুতেই উমেশকে দেখা গেল। সে মনে হয় লাইনে লাইনেই আজকের দিনটা কাটিয়ে দিচ্ছে। আমার প্রফেসরকেও

দেখলাম। এক ডলারের একটা নোট হাতে দাঁড়িয়ে। তিনি আমাকে দেখে হাত ইশারা করে ডাকলেন।

গল্পটা আমি এই জায়গাতে শেষ করে দেই। শ্রোতারা ব্যাকুল হয়ে জানতে চায়, আপনি কী করলেন ? দাঁড়ালেন লাইনে ?

আমি তাদের বলি, আমি লাইনে দাঁড়ালাম কি দাঁড়ালাম না, তা মূল গল্পের জন্যে অনাবশ্যক।

অনাবশ্যক হোক আর না হোক, আপনি দাঁড়ালেন কি না বলুন।

আমি কিছুই বলি না। বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসি। যে হাসির দু'রকম অর্থই হতে পারে।

প্রথম তুষারপাত

ভিসকোমিটারটা ঠিকমতো কাজ করছিল না। একেক সময় একেক রকম রিডিং দিচ্ছে। আমার সঙ্গে কাজ করে পল রেইমেন। ডিসকোমিটার কাজ করছে না শুনে সে কোত্থেকে লম্বা একটা স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে এল এবং পটপট করে ভিসকোমিটারের সব অংশ খুলে ফেলল। আমি মনে মনে বললাম, বাহ্ বেশ ওস্তাদ ছেলে তো। এত জটিল যন্ত্র অথচ কী অবলীলায় খুলে ফেলল।

আমি বললাম, পল! তুমি কি এই যন্ত্র সম্পর্কে কিছু জানো ?

পল বলল, না।

আমি অবাক হয়ে বললাম, জানো না তাহলে এটা খুলে ফেললে যে ?

দেখি ব্যাপারটা কী ?

পল ভিসকোমিটারের স্প্রিং খুলে বের করে আনল এবং দু'হাতে কিছুক্ষণ টানাটানি করে বলল, এটা গেছে। বলেই স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে উঠে চলে গেল। আমি টেবিলের ওপর একগাদা যন্ত্রপাতির অংশ ছড়িয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। কী করব কিছু বুঝতে পারলাম না।

আমেরিকানদের এই বিচিত্র অভ্যাসটি সম্পর্কে বলা দরকার। আমি এর নাম দিয়েছি স্ক্রু ড্রাইভার প্রেম। সব আমেরিকানদের পকেটে কয়েক সাইজের স্ক্রু ড্রাইভার থাকে বলে আমার ধারণা। প্রথম সুযোগেই এরা সমস্ত স্ক্রু খুলে ফেলবে।

যন্ত্রপাতি সম্পর্কে আমাদের একধরনের ভীতি আছে। ভীতির কারণ আমাদের শৈশব। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করি—বাড়িতে হয়তো একটা রেডিও আছে। ছোট ছেলে রেডিও ধরতে গেল। বাবা চেঁচিয়ে উঠবেন, খবরদার হাত দিবি না। মা চেঁচাবেন, খোকন হাত দিও না, ব্যথা পাবে। ছোট্ট খোকনের মনের ভেতর ঢুকে গেল যন্ত্রপাতিতে হাত দেওয়া যাবে না। হাত দিলেই খারাপ কিছু ঘটে যাবে। বড় হওয়ার পরেও

শৈশবের স্মৃতি থেকেই যায়। ঘরের ফিউজ কেটে গেলেও আমরা একজন মিস্ত্রি ডেকে আনি।

আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। টেবিলে যন্ত্রপাতির অংশ ছড়িয়ে বসে আছি। মনটা খারাপ, এইসব খুঁটিনাটি জোড়া লাগাব কীভাবে তাই ভাবছি। তখন পল আবার ঘরে ঢুকল। উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলল, তাড়াতাড়ি বাইরে যাও, তুষারপাত হচ্ছে।

আমাদের সাহিত্যের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে বর্ষা। মেঘমেদুর আকাশ। শ্রাবণের ধারা। আষাঢ়ের পূর্ণিমা। তেমনি ইংরেজি সাহিত্যে আছে তুষারপাত। বিশেষ করে বছরের প্রথম তুষারপাতের বর্ণনা। বছরের প্রথম বৃষ্টি বলে আমাদের কিছু নেই। সারা বছরই বৃষ্টি হচ্ছে। বর্ষাকালে বেশি, অন্যসময় কম।

এদেশে তুষারপাতের নির্দিষ্ট সময় আছে। সামারে তুষারপাত হবে না। স্প্রিং বা ফলেও হবে না। তুষারপাত হবে শীতের শুরুতে। এবং প্রথম তুষারপাতের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে দীর্ঘ শীতের প্রস্তুতি। ফায়ারিং প্লেস ঠিক করতে হবে। হিটিং সিস্টেম ঠিক আছে কি না দেখতে হবে। শীতের দিনের খাবারদাবারের ব্যবস্থা দেখতে হবে। দিনের পর দিন ঘরবন্দি হয়ে থাকতে হবে, তার জন্যেও প্রস্তুতি দরকার। ব্লিজার্ড হতে পারে। ব্লিজার্ড হলে ছ'সাত দিন একনাগাড়ে গৃহবন্দি থাকতে হবে। তারও প্রস্তুতি আছে। দেখতে হবে সেলারে প্রচুর মদের বোতল আছে কি না। পছন্দসই বিয়ারের পেটি ক'টা আছে। শীতের সিজনে স্কিইং করার পরিকল্পনা থাকলে তার জন্যেও প্রস্তুতি দরকার। অনেক কাজ। সব কাজের শুরুর ঘটা হচ্ছে বছরের প্রথম তুষার।

তুষারপাত দেখার জন্যে ডানবার হলের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। আকাশ ঘোলাটে। বইপত্রে পড়েছি পেঁজা তুলার মতো তুষার পড়ে। এখন সেরকম দেখলাম না, পাউডারের কণার মতো গুঁড়ো গুঁড়ো তুষার পড়ছে। গায়ে পড়ামাত্রই তা গলে যাচ্ছে। খুব যে একটা অপরূপ দৃশ্য তা নয়। তবুও মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি।

দেখতে দেখতে পট পরিবর্তন হলো। শিমুল তুলার মতো তুষার পড়ছে। মনে হচ্ছে মেঘের টুকরো। এই টুকরোগুলি গায়ে পড়া মাত্র গলে যাচ্ছে না। গায়ের সঙ্গে লেগে থাকছে। চেনা এই জায়গা মুহূর্তের মধ্যে অচেনা হয়ে গেল, যেন এটা ডানবার হলের সামনের জায়গা নয়। এটা ইন্দ্রলোকের কোনো-এক মেঘপুরী।

মাত্র দু'ঘণ্টা সময়ে সমস্ত ফার্গো শহর তুষারে ঢাকা পড়ে গেল। চারদিক সাদা। এই সাদা রঙের কী বর্ণনা দেব? তুষারের সাদা রঙ অন্য সাদার মতো নয়। এই সাদা রঙে একটা হিম-ভাব থাকে যা ঠিক কাছে টানে না, একটু যেন দূরে সরিয়ে দেয়। তুষারের শুভ্রতার সঙ্গে অন্য কোনো শুভ্রতার তুলনা চলে না। এই শুভ্রতা অপার্থিব।

ল্যাবরেটরি বন্ধ করে সকাল সকাল হোটেল গ্রেভার ইনে ফিরছি। বাস নিলাম না। তুষারের রূপ দেখতে দেখতে যাব। মাইল দুয়েক পথ। কতক্ষণ আর লাগবে?

পথে নেমেই বুঝলাম খুব বড় বোকামি করেছি। রাস্তা অসম্ভব পিছল। পা ফেলা যায় না, তার ওপর ঠান্ডা। টেম্পারেচার দ্রুত নেমে যাচ্ছে। গায়ে সেই অনুপাতে গরম কাপড়

নেই। ঠান্ডায় প্রায় জমে যাচ্ছি। তবু ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে সারা পৃথিবী বরফের চাদরে ঢাকা। নিজেকে মনে হচ্ছে ক্যাপটেন স্কট—এগুচ্ছি মেরুবিন্দুর খোঁজে। চারদিকের কী অপরূপ দৃশ্য! সুন্দর! সুন্দর! সুন্দর!!! আবেগে ও আনন্দে আমার চোখ ভিজে উঠল।

"Winter for a moment takes the mind; the snow
Falls past the archlight; icicles guard a wall;
The wind moans through a crack in the window
A keen sparkle of frost is on the sill"

জননী

ছোটবেলায় আমার ঘর পালানো রোগ হয়েছিল।

তখন ক্লাস থ্রিতে পড়ি। স্কুলের নাম কিশোরীমোহন পাঠশালা। থাকি সিলেটের মীরাবাজারে। বাসার কাছেই স্কুল। দুপুর বারোটায় স্কুল ছুটি হয়ে যায়। বাকি দীর্ঘসময় কিছুতেই আর কাটে না। আমার বোনেরা তখন রান্নাবাটি খেলে। ওদের কাছে পাত্তা পাই না। মাঝে মাঝে অবশ্যি খেলায় নেয়, তখন আমার ভূমিকা হয় চাকরের। আমি হই পুতুল খেলা সংসারের চাকর। ওদের ফাইফরমায়েশ খাটি। ওরা আমার সঙ্গে তুই তুই করে কথা বলে। কাজেই ওদের পুতুল খেলায় খুব উৎসাহ বোধ করি না।

ঘর-পালানো রোগ তখন হলো। এক ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। চমৎকার অভিজ্ঞতা। হাঁটতে হাঁটতে অদ্ভুত সব কল্পনা করা যায়। মজার মজার দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ানো যায়। কারও কিছু বলার থাকে না।

আমি রোজই তা-ই করি। সন্ধ্যার আগে আগে বাসায় ফিরে আসি। আমার মা নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত। তাঁর ছেলে যে সারা দুপুর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় তাও তিনি জানেন না। আর জানলেও যে ভয়ঙ্কর কিছু করতেন তাও মনে হয় না। তাঁর দিবানিদ্রায় আমি ব্যাঘাত করছি না—এই আনন্দটাই তাঁর জন্যে অনেকখানি ছিল বলে আমার ধারণা।

যাই হোক, একদিনের ঘটনা বলি। হাঁটতে হাঁটতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে একটা বাড়ির বারান্দায় এসে বসলাম। কালো সিমেন্টের বারান্দা। দেখলেই ইচ্ছে করে খালি গায়ে শুয়ে পড়তে। চুপচাপ বসে আছি, হঠাৎ বাড়ির দরজা খুলে গেল। ঘুমঘুম চোখে এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। নরম গলায় বললেন, কী চাও খোকা?

আমি বললাম, কিছু চাই না।

বাসা কোথায়?

আমি জবাব দিলাম না। বাসা কোথায় তা এই মহিলাকে বলার কোনো অর্থ হয় না। তিনি চলে গেলেন না। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর চোখে গভীর বিস্ময় এবং

কৌতূহল। আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। তিনি বললেন, তুমি চলে যেয়ো না, আমি আসছি।

তিনি ঘরের ভেতের চলে গেলেন এবং মিনিট তিনেক পর আবার উপস্থিত হলেন। তাঁর হাতে কী-একটা খাবার। তিনি আমার দিকে বাড়িয়ে বললেন—নাও, খাও।

অপরিচিত কেউ কিছু খেতে দিলে বলতে হয়—খাব না। ক্ষিদে নেই। আমি তা বলতে পারলাম না। জিনিসটা হাতে নিলাম। খেতে গিয়ে বুঝতে পারলাম ঐ খাদ্য এই পৃথিবীর খাদ্য নয়। স্বর্গীয় কোনো অমৃত।

জিনিসটা হচ্ছে জেলি মাখানো এক টুকরো পাউরুটি। এরকম সুখাদ্য পৃথিবীতে আছে এবং তা অপরিচিত কাউকে দেওয়া যায় তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। ভদ্রমহিলা বললেন, আরেকটা দেব ?

আমি না-সূচক মাথা নাড়লাম, তবে তা করতে বড় কষ্ট হলো। ভদ্রমহিলা ভেতরে চলে গেলেন এবং আরও এক টুকরা পাউরুটি নিয়ে ফিরে এলেন।

আমি দ্বিতীয়টিও নিঃশব্দে খেয়ে ফেললাম।

ভদ্রমহিলা বললেন, তোমার নাম কী, খোকা ?

আমি নাম বললাম না। এক দৌড়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে এলাম। তিনি নিশ্চয়ই আমার এই অদ্ভুত ব্যবহারে খুবই অবাক হয়েছিলেন, তবে তিনি হয়তোবা তার চেয়েও অবাক হলেন যখন দেখলেন পরের দিন আমি আবার উপস্থিত হয়েছি।

তিনি আমাকে দেখে খুব হাসলেন। তারপরই খাবার নিয়ে এলেন। ব্যাপারটা রুটিনের মতো হয়ে গেল—আমি রোজ যাই, ভদ্রমহিলা খাবার দেন, আমি খাই এবং চলে আসি।

তিনি আমার জন্যে অপেক্ষা করেন বলে মনে হয়। বারান্দায় এসে বসামাত্র দরজা খুলে বের হয়ে আসেন।

একদিনের কথা বলি। মেঘলা দুপুর। চারদিক কেমন অন্ধকার হয়ে এসেছে। ভদ্রমহিলার বারান্দায় পা দেওয়ামাত্র বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগল।

তিনি দরজা খুলে বললেন, বারান্দায় বৃষ্টির ছাঁট আসবে, ভেতরে এসো খোকা।

আমি ভয়ে ভয়ে ভেতরে এসে দাঁড়ালাম। কী চমৎকার সাজানো বাড়ি। যেন ছবি আঁকা। মানুষের বাড়ির ভেতরটা এত সুন্দর হয় আমার জানা ছিল না।

খোকা, বসো।

আমি ভয়ে ভয়ে সোফায় বসলাম। তিনি বললেন, আজ থেকে তুমি আমাকে মা বলে ডাকবে, কেমন ? তুমি মা ডাকবে, আমি তোমাকে খুব মজার মজার খাবার খাওয়াব। আচ্ছা ?

আমি কিছু বললাম না।

তিনি বললেন, তুমি যে আমাকে মা ডাকছ এটা কাউকে বলার দরকার নেই। এটা তোমার এবং আমার গোপন খেলা।

আমি ভদ্রমহিলার কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারলাম না। তিনি নাশপাতি কিংবা নাশপাতির মতো দেখতে কোনো একটা ফল কেটে দিলেন। বললেন, এসো, তুমি আমার কোলে বসে খাও। তার আগে মিষ্টি করে আমাকে মা ডাকো তো।

আমি মা ডাকতে পারলাম না। বিচিত্র এক ধরনের ভয়ে অন্তর কেঁপে উঠল। শিশুদের মনের গভীরে অনেক ধরনের ভয় লুকানো থাকে। তারই কোনো একটা বের হয়ে এসে আমাকে অভিভূত করে ফেলল। আমি ছুটে বের হয়ে গেলাম। বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে বাসায় পৌঁছলাম।

ঐ রহস্যময় বাড়িতে আর কোনোদিন যাইনি। মানুষের জীবনে কিছু ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। রহস্যময় প্রকৃতি মানুষকে একই পরিস্থিতিতে বারবার ফেলে মজা দেখেন বলে আমার ধারণা। সিলেটের ঐ বাড়ির মহিলার মতো এক মহিলার দেখা পেলাম খোদ আমেরিকায়। আমার বয়স তখন সাতাশ।

শীতের শুরু।

বরফ পড়া আরম্ভ হয়েছে। হোটেল গ্রেভার ইন থেকে বাসে ইউনিভার্সিটিতে আসতে খুব কষ্ট হয়। বাসের ভেতর হিটিং-এর ব্যবস্থা আছে, তবু শীতে জমে যাওয়ার মতো কষ্ট পাই। বাসস্ট্যান্ডে বাসের জন্যে অপেক্ষা করার কষ্টও অকল্পনীয়। আমার ভারতীয় বন্ধু উমেশ আমার জন্যে ইউনিভার্সিটির কাছে একটা ঘর খুঁজে দিল।

আমেরিকান এক ভদ্রমহিলা তার বাড়ির কয়েকটা ঘর বিদেশী ছাত্রদের ভাড়া দেন। ভাড়া খুবই সস্তা, মাসে চল্লিশ ডলার। তবে খাওয়াদাওয়া করতে হবে বাইরে। আমি বাড়িওয়ালির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁর নাম লেভারেল। তিনি কঠিন গলায় বললেন, আমি খুব বেছে বেছে রুম ভাড়া দেই। যাদের দেই তাদের কিছু নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন নিয়ম দুটি হচ্ছে, রাত দশটার পর কোনো বান্ধবীকে ঘরে আনা যাবে না। এবং উঁচু ভ্যলুমে স্টেরিও বাজানো যাবে না।

আমি বললাম, বান্ধবী এবং স্টেরিও—দুটোর কোনোটিই আমার নেই।

তিনি বললেন, এখন নেই, দুদিন পর হবে। সেটা দোষের নয়। তবে আমার নিয়ম তোমাকে বললাম। পছন্দ হলে রুম নিতে পার।

আমি রুম নিয়ে নিলাম। প্রথম মাসের ভাড়া বাবদ চল্লিশ ডলার দেওয়ার পর তিনি একটি ছাপানো কাগজ আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। সেই কাগজে আরও সব শর্ত লেখা। প্রথম শর্ত পড়েই আমার আক্কেল গুড়ুম। লেখা আছে এই বাড়ির কোনো অগ্নিবীমা নেই। কাজেই এই বাড়ির অধিবাসীদের কেউ ধূমপান করতে পারবে না।

সব নিয়ম মানা সম্ভব, কিন্তু এই নিয়ম কী করে মানব ? মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। একবার ভাবলাম ডলার ফেরত নিয়ে হোটেল গ্রেভার ইনে ফিরে যাব। আবার ভাবলাম, বাসায় তো আর বেশিক্ষণ থাকব না, কাজেই তেমন অসুবিধা হয়তো হবে না।

অসুবিধা হলো।

ঘুমুতে যাওয়ার আগে আগে সিগারেটের তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাওয়ার মতো অবস্থা হলো। আমি গরম কাপড় গায়ে দিলাম। গায়ে পার্কা চড়ালাম। মাফলার দিয়ে নিজেকে পেঁচিয়ে মাংকিক্যাপ মাথায় দিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে সিগারেট ধরালাম।

দৃশ্যটা অদ্ভুত। বরফ পড়ছে। এই বরফের মধ্যে জোব্বা-জাব্বা গায়ে এক ছেলে সিগারেট টানার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে।

দিন সাতেক পরের কথা। লেভারেল আমার ঘরে ঢুকে কঠিন গলায় বলল, এগারটা-বারোটার সময় বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানো, তাই না ?

হ্যাঁ।

ধূমপান যারা করে তাদের আমি বাড়ি ভাড়া দেই না।

আমি সামনের মাসে চলে যাব।

খুবই ভালো কথা। মাসের এই ক'টা দিন দয়া করে ঘরে বসেই সিগারেট খাবে। ঠান্ডার মধ্যে বাইরে দাঁড়িয়ে অসুখ-বিসুখ বাঁধাও তা আমি চাই না।

ধন্যবাদ।

শুকনো ধন্যবাদের আমার দরকার নেই। আমি পনেরো বছরে এই প্রথম একজনকে সিগারেট খাওয়ার অনুমতি দিলাম।

থ্যাংক ইউ।

লেভারেল উঠে চলে গেল। তবে যাওয়ার আগে হঠাৎ বলল, তোমার অন্য কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। তুমি আমার এখানেই থাকবে। আমি তোমার সিগারেটের অভ্যাস ছাড়িয়ে দেব।

ভদ্রমহিলা এরপর আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুললেন। আমার সিগারেটের প্যাকেট তাঁর কাছে জমা রাখতে হলো। তিনি গুনেগুনে আমাকে সিগারেট দেন। তাঁর সামনে বসে খেতে হয়। তিনি নানান উপদেশ দেন, ধোঁয়া বুকের ভিতর নিয়ো না। পাফ করে ছেড়ে দাও।

সিগারেট খাবার সময় একজন অগ্নিদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে, এটা অসহ্য।

এছাড়াও তিনি আরও সব সমস্যা করতে লাগলেন। আমার ওজন খুব কম, কাজেই তিনি ওজন বাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। বলতে গেলে রোজ রাতে তার সঙ্গে ডিনার খেতে হয়। তিনি আমার কাপড় ধুয়ে দেন। ঘর ঝাঁট দিয়ে দেন। একদিন তুষার ঝড় হচ্ছিল। ইউনিভার্সিটি থেকে আমি ঠিকমতো ফিরতে পারব না ভেবে নিজেই ইউনিভার্সিটিতে হাজির হলেন। আমি বরফের ওপর দিয়ে ঠিকমতোই হাঁটতে পারছি তবু তিনি হাত ধরে আমাকে নিয়ে এলেন।

বরফের ওপর দিয়ে দুজন আসছি। হঠাৎ উনি আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, হুমায়ূন [ইনিই একমাত্র আমেরিকান যিনি শুদ্ধভাবে আমার নাম উচ্চারণ করতেন] তুমি কি দয়া করে এখন থেকে আমাকে মা ডাকবে ?

আমি স্তম্ভিত।

বলেন কী এই মহিলা!

আমি চুপ করে রইলাম। লেভারেল শান্ত গলায় বললেন, তুমি আমাকে মা ডাকলে আমার খুব ভালো লাগবে। সবসময় ডাকতে হবে না। এই হঠাৎ হঠাৎ।

আমি কী বলব ভেবে পেলাম না। আমাদের মধ্যে আর কোনো কথা হলো না।

আমি বিরাট সমস্যার মধ্যে পড়ে গেলাম।

ভদ্রমহিলার আদরযত্নে খুব অস্বস্তি বোধ করি। কেউ আমার প্রতিটি ব্যাপার লক্ষ রাখছে তাও আমার ভালো লাগে না।

আমি পড়াশোনা করি, তিনি চুপচাপ পাশে বসে থাকেন। বারবার জিজ্ঞেস করেন, আমি পাশে বসে থাকায় কি তোমার অসুবিধা হচ্ছে? আমি ভদ্রতা করে বলি, না।

ঠান্ডা লেগে একবার খানিকটা জ্বরের মতো হলো, তিনি তাঁর নিজের ইলেকট্রিক ব্ল্যাংকেট আমাকে দিয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে একটা কার্ড, সেখানে লেখা তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ওঠো। তোমার মা—লেভারেল।

ভদ্রমহিলার এখানে বেশিদিন থাকতে হলো না। ইউনিভার্সিটি আমাকে বাড়ি দিল। আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নতুন বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। বিদায়ের সময় তিনি শিশুদের মতো চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। ভদ্রমহিলার স্বামী বিরক্ত হয়ে বারবার বললেন, এসব কী হচ্ছে? ব্যাপারটা কী আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। লেভারেল, তুমি এত আপসেট কেন?

আমার হৃদয় খুবসম্ভব পাথরের তৈরি। এই দুর্জনের কাউকেই আমি মুখ ফুটে মা ডাকতে পারিনি।

এই পরবাসে

অকর্মা লোক খুব ভালো চিঠি লিখতে পারে বলে একটা প্রবচন আছে। অকর্মাদের কাজকর্ম নেই, ইনিয়ে বিনিয়ে দীর্ঘ চিঠি তাদের পক্ষেই লেখা সম্ভব।

আমি নিজেও এইসব অকর্মার দলে। গুছিয়ে লিখবার ব্যাপারে আমার জুড়ি নেই। পাঠকরা হয়তো ভুরু কুঁচকে ভাবছেন—এই লোকটা দেখি খুব অহংকারী।

তাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, আমি আসলেই অহংকারী, তবে লিখিতভাবে সেই অহংকার কখনো প্রকাশ করিনি। আজ করলাম। আমি যে চমৎকার চিঠি লিখতে পারি তার একটি প্রমাণ দেব। আমার ধারণা, যেসব পাঠক এতক্ষণ ভুরু কুঁচকে ছিলেন, প্রমাণ দাখিলের পর তাঁদের মুখের অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

প্রবাস-জীবনের সাত মাস পার হয়েছে। আমার স্ত্রী গুলতেকিন আমার সঙ্গে নেই। সে আছে দেশে। হলিক্রস কলেজ থেকে আইএসসি পরীক্ষা দেবে। কোমর বেঁধে পড়াশোনা করছে। পরীক্ষার আর মাত্র মাসখানেক দেরি। এই অবস্থায় আমি আমার

বিখ্যাত চিঠিটি লিখলাম। চার পাতার চিঠিতে একা থাকতে যে কী পরিমাণ খারাপ লাগছে, তার প্রতি যে কী পরিমাণ ভালোবাসা জমা করে রেখেছি, এইসব লিখলাম। চিঠির শেষ লাইনে ছিল—'আমি এনে দেব তোমার উঠানে সাতটি অমরাবতী।'

এই চিঠি পড়ে সে খানিকক্ষণ কাঁদল। পরীক্ষা-টরীক্ষার কথা সব ভুলে গিয়ে সাত মাস বয়েসী শিশুকন্যাকে কোলে নিয়ে চলে এল আমেরিকায়। আমি আমার চিঠি লেখার ক্ষমতা দেখে স্তম্ভিত। পরীক্ষা-টরীক্ষা সব ফেলে দিয়ে চলে আসায় আমি খানিকটা বিরক্ত। দুমাস অপেক্ষা করে পরীক্ষা দিয়ে এলেই হতো।

গুলতেকিন চলে আসায় আমার জীবনযাত্রা বদলে গেল। দেখা গেল সে একা আসেনি, আমার জন্যে কিছু সৌভাগ্য নিয়ে এসেছে, সে আসার সঙ্গে সঙ্গে ইউনিভার্সিটি আমাকে একটা বাড়ি দিল।

দোতলা বাড়ি। একতলায় রান্নাঘর, বসার ঘর এবং স্টাডি রুম। দোতলায় দুটি শোবার ঘর। এত বড় বাড়ির আমার প্রয়োজন ছিল না। ওয়ান বেডরুমই যথেষ্ট ছিল। তবে নর্থ ডাকোটা স্টেটের নিয়ম হচ্ছে বাচ্চার জন্যে আলাদা শোবার ঘর থাকতে হবে। বাচ্চাদের মধ্যে একজন ছেলে এবং একজন মেয়ে হলে তাদের জন্যে আলাদা আলাদা শোবার ঘর থাকতে হবে। তবে দু'জনই ছেলে বা মেয়ে হলে একটি শোবার ঘরেই চলবে।

আমরা নতুন বাড়িতে উঠে এলাম। বলতে গেলে প্রথমবারের মতো আমরা সংসার শুরু করলাম। এর আগে থেকেছি মা-র সংসারে। আলাদা সংসারের আনন্দবেদনার কিছুই জানি না। প্রবল উৎসাহে আমরা ঘর সাজাবার কাজে লেগে পড়লাম। রোজই দোকানে যাই। যা দেখি তা-ই কিনে ফেলি। এমন অনেক জিনিস আমরা দু'জনে মিলে কিনেছি যা বাকি জীবনে একবারও ব্যবহার হয়নি। এই মুহূর্তে দুটি জিনিসের নাম মনে পড়ছে—টুল বক্স, যেখানে করাত ফরাত সবই আছে। এবং ফুট বাথ নেওয়ার জন্যে প্লাস্টিকের গামলা জাতীয় জিনিস।

গুলতেকিন প্রবল উৎসাহে রান্নাবান্না নিয়েও ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভাত মাছ ছাড়াও নানান পরীক্ষামূলক রান্না হতে লাগল। অতি অখাদ্য সেইসব খাদ্যদ্রব্য মুখে নিয়ে আমি বলতে লাগলাম, অপূর্ব।

খুব সুখের জীবন ছিল আমাদের। সাত মাস বয়সের পুতুলের মতো একটি মেয়ে, যে কাউকে বিরক্ত করে না, আপন মনে খেলে। মাঝে মাঝে তার মনে গভীর ভাবের উদয় হয়; সে তার নিজস্ব ভাষায় গান গায়—

গিবিজি গিবিজি, গিবিজি গিবিজি
গিবি॥
গিবিজি গিবিজি গিবিজি গিবিজি
গিবি॥

আহা, সে বড় সুখের সময়।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, এই দেশে প্রবাসী ছাত্রদের স্ত্রীরা ভয়াবহ জীবনযাপন করেন। এদের কিছুই করার থাকে না। স্বামী কাজে চলে যায়, ফেরে গভীর রাতে। এই দীর্ঘসময় বেচারিকে কাটাতে হয় একা একা। এরা সময় কাটায় টিভির সামনে বসে থেকে কিংবা শপিংমলে ঘুরে ঘুরে।

রাতে স্বামী যখন ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে তখন অতি অল্পতেই খিটিমিটি লেগে যায়। স্ত্রী বেচারির ফুঁপিয়ে কাঁদা ছাড়া কিছুই করার থাকে না। আমি এক ভদ্রলোককে জানতাম যিনি রাত একটায় তাঁর স্ত্রীকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিলেন। একবারও ভাবেননি এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে আত্মীয়-পরিজনহীন শহরে মেয়েটি কোথায় যাবে, কার কাছে যাবে।

যাক ওসব, নিজের গল্পে ফিরে আসি। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে রেখেছিলাম, প্রবাস-জীবনে আমি কখনো আমার স্ত্রীর ওপর রাগ করব না। কখনো তাকে একাকিত্বের কষ্ট পেতে দেব না।

আমি অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, আঠারো বছরের এই মেয়ে আমেরিকান জীবনযাত্রার সঙ্গে নিজেকে খুব সহজেই মানিয়ে নিচ্ছে। অতি অল্প সময়ে সে চমৎকার ইংরেজি বলা শিখল। সুন্দর একসেন্ট। আমি অবাক হয়ে বললাম, এত চমৎকার ইংরেজি কোথায় শিখলে?

সে বলল, টিভি থেকে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চৌদ্দ ঘণ্টা টিভি খোলা থাকে। ইংরেজি শিখব না তো করব কী?

একদিন বাসায় এসে দেখি ফুটফুটে চেহারার দুটি আমেরিকান বাচ্চা আমার মেয়ের সঙ্গে ঘুরঘুর করছে। অবাক হয়ে বললাম, এরা কারা?

গুলতেকিন হাসিমুখে বলল, বেবি সিটিং শুরু করেছি।

সে-কী!

অসুবিধা তো কিছু নেই। আমার নিজের বাচ্চাটিকে তো আমি দেখছি, এই সঙ্গে এই দু'জনকেও দেখছি। আমার তো সময় কাটাতে হবে।

গুলতেকিন খুবই অবস্থাপন্ন পরিবারের মেয়ে। ওদের ধানমণ্ডির বাসায় আমি প্রথম কাপড় ধোয়া এবং কাপড় শুকানোর যন্ত্র দেখি। ওদের পরিবারে ম্যানেজার জাতীয় একজন কর্মচারী আছে, তিনজন আছে কাজের মানুষ। ড্রাইভার আছে, মালি আছে। এদের প্রত্যেকের আলাদা শোবার ঘর আছে। এরা যেন নিজেরা রান্নাবান্না করে খেতে পারে সেজন্যে আলাদা রান্নাঘর এবং বাবুর্চি আছে।

সেই পরিবারের অতি আদরের একটি মেয়ে বেবি সিটিং করছে। ভাবতেও অবাক লাগে। কাজটা হচ্ছে আয়ার। এই জাতীয় কাজের মানসিক প্রস্তুতি নিশ্চয়ই তার ছিল না। বিদেশের মাটিতে সবই বোধহয় সম্ভব। বেবি সিটিং-এর কাজটি সে চমৎকারভাবে করতে লাগল। বাসা ভরতি হয়ে গেল বাচ্চায়। সবাই গুলতেকিনকে বেবি সিটার হিসেবে পেতে চায়।

মাঝে মাঝে দুপুরে বাসায় খেতে এসে দেখি পুরোপুরি স্কুল বসে গেছে। বাড়িভর্তি বাচ্চা। তারা আমার মেয়ের দেখাদেখি গুলতেকিনকে ডাকে আম্মা, আমাকে ডাকে আব্বা।

মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে আমেরিকান দম্পতি দুপুররাতে তাদের বাচ্চা নিয়ে উপস্থিত। লজ্জিত গলায় বলছে, আমার বাচ্চাটা চেঁচামেচি করছে রাতে তোমার সঙ্গে ঘুমুবে। কিছুতেই শান্ত করতে পারছি না। আমরা খুবই লজ্জিত। কী করব বুঝতে পারছি না।

গুলতেকিন হাসিমুখে বলল, বাচ্চাকে রেখে যান।

এর জন্যে আমি তোমাকে পে করব।

পে করতে হবে না। রাতেরবেলা তোমার বাচ্চা আমার গেস্ট।

গুলতেকিন শুয়েছে, একদিকে তার গলা জড়িয়ে ধরেছে আমাদের নিজের মেয়ে নোভা। অন্যদিকে আমেরিকান বাচ্চা। চমৎকার দৃশ্য।

টিচিং অ্যাসিসটেন্ট হিসেবে আমি যত টাকা পেতাম সে তারচেয়ে অনেক বেশি পেতে লাগল। আমরা চমৎকার একটা গাড়ি কিনলাম—ডজ কোম্পানির পোলারা।

ছুটির দিনগুলিতে গাড়ি করে ঘুরে বেড়াই। প্রায়ই মনে হয় আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সময়টা কাটাচ্ছি।

টাকাপয়সা নিয়ে আমরা যত তুচ্ছতাচ্ছিল্যই করি, সুখের উপকরণগুলির মধ্যে টাকাপয়সার ভূমিকাটা বেশ বড়। যতই দিন যাচ্ছে ততই তা বুঝতে পারছি। কিংবা কে জানে ধনবাদী এই সমাজ আমার চিন্তাভাবনাকে পাল্টে দিতে শুরু করেছে কি না।

পরবাসে আমার রুটিনটা হলো এরকম ভোরবেলা ল্যাবরেটরিতে চলে যাই। সন্ধ্যাবেলা ফিরে আসি। ঘরে পা দেওয়ার পর ক্লাসের বইপত্র ছুঁয়েও দেখি না। টিভি চালিয়ে দেই, গান শুনি, লাইব্রেরি থেকে নিয়ে আসা গাদা গাদা গল্পের বইয়ের পাতা উল্টাই। নোভাকে বাংলা শেখাতে চেষ্টা করি। গ্লাসের পানি দেখিয়ে বলি—এর নাম পানি। বলো,পানি।

সে বলে, গিবিজি।

গিবিজি নয়। বলো পানি প-া-ন-ই..

গিবিজি, গিবিজি।

মেয়েটিকে নিয়ে তার মা খুব দুশ্চিন্তায় ভোগে। শুধুমাত্র গিবিজি শব্দ সম্বল করে সে এই পৃথিবীতে এসেছে কি না কে জানে। তার দেড় বছর বয়স হয়ে গেছে, এই বয়সে বাচ্চারা চমৎকার কথা বলে। অথচ সে শুধু বলে, গিবিজি। আমি নিজেও খানিকটা চিন্তিত বোধ করলাম।

দু'বছর বয়সে হঠাৎ করে সে কথা বলতে শুরু করল। ব্যাপারটা বেশ মজার, কারণ সে কথা বলা শুরু করল ইংরেজিতে। একটা দুটা শব্দ নয়, প্রথম থেকে বাক্য। এবং বেশ দীর্ঘ বাক্য। বাসায় দুটো ভাষা চালু ছিল—ইংরেজি ও বাংলা। আমরা নিজেরা বাংলা

বলতাম। যেসব বাচ্চা সারা দিন বাসায় থাকত তারা বলত ইংরেজি। সে দুটি ভাষাই দীর্ঘদিন লক্ষ করেছে। বেছে নিয়েছে একটি। ভাষাবিজ্ঞানীদের জন্যে এই তথ্যটি সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ।

আমার দীর্ঘ সাত বছরের প্রবাস-জীবনের অনেক সুখ-দুঃখের গল্প আছে। সবই ব্যক্তিগত গল্প। তার থেকে দু'একটি বলা যেতে পারে।

একদিনের কথা বলি। সন্ধ্যা মিলিয়েছে [বলে রাখা ভালো সামারে সন্ধ্যা হয় রাত নটার দিকে]। আমি পোর্চে বসে চা খাচ্ছি, হঠাৎ লক্ষ করলাম ন'দশ বছরের একটি বালিকা আমার বাসার সামনে হাঁটাহাঁটি করছে। মেয়েটির চেহারা ডল পুতুলের মতো। ফ্রকের হাতায় সে চোখ মুছছে। আমি বললাম, কী হয়েছে খুকি ?

সে বলল, কিছু হয়নি। আমি কি তোমার বাসার সামানে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারি ?

অবশ্যই পার। ভেতরে এসেও বসতে পার।

না। আমার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেই ভালো লাগছে।

রাত সাড়ে দশটায় খাবার শেষ করে বাইরে এসে দেখি মেয়েটি তখনো দাঁড়িয়ে। আমি বললাম, এখনো দাঁড়িয়ে আছ ?

সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমি তো তোমাকে বিরক্ত করছি না। শুধু দাঁড়িয়ে আছি।

ব্যাপারটা কি তুমি আমাকে বলবে ?

মেয়েটি ঘটনাটা বলল।

তার মা একজন ডিভোর্সি মহিলা। মেয়েকে নিয়ে থাকে। সম্প্রতি একটি ছেলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। ছেলেটিকে নিয়ে সে ডেটিং-এ যায়। মেয়েটিকে একা বাড়িতে রেখে যায়। সন্ধ্যা মেলাবার পর মেয়েটির একা একা ভয় করতে থাকে। সে তখন ঘর বন্ধ করে বাইরে এসে দাঁড়ায়। মায়ের জন্যে অপেক্ষা করে। আমার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ানোর কারণ হচ্ছে, আমার ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত বাতি জ্বলে। সে লক্ষ করেছে আমি খুব রাত জাগি।

মেয়েটির কষ্টে আমার চোখে পানি এসে গেল। আমি বললাম, খুকি তুমি আমার ঘরে এসে মার জন্যে অপেক্ষা করো।

সে কঠিন গলায় বলল, না।

সেবারের পুরো সামারটা আমার নষ্ট হয়ে গেল। মেয়েটি রোজ গভীর রাত পর্যন্ত আমার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তার মার জন্যে অপেক্ষা করে। ভদ্রমহিলা মধ্যরাতে মাতাল অবস্থায় ফেরেন। আমার ইচ্ছা করে চড় দিয়ে এই মহিলার সব কটি দাঁত ফেলে দেই। তা করতে পারি না। কান পেতে শুনি মহিলা তার মেয়েকে বলছেন, আর কখনো দেরি হবে না। তুমি কি খুব বেশি ভয় পাচ্ছিলে ?

না।

আমি তোমাকে ভালোবাসি মা।

আমিও তোমাকে ভালোবাসি।

আই লাভ ইউ—কথাটি একজন আমেরিকান তাঁর সমগ্র জীবনে কত লক্ষ বার ব্যবহার করেন আমার জানতে ইচ্ছে করে। এই বাক্যটির আদৌ কি কোনো অর্থ তাদের কাছে আছে?

আরেকটা ঘটনা বলি।

আমার স্ত্রী জেনি লী নামের একটি মেয়ের বেবি সিটিং করত। মেয়েটির বয়স সাত-আট বছর। মেয়েটির মা একজন ডিভোর্সি মহিলা, আমাদের ইউনিভার্সিটিতে সমাজবিদ্যার ছাত্রী। সে ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার পথে মেয়েটিকে রেখে যায়। ফেরার পথে নিয়ে যায়। একদিন ব্যতিক্রম হলো, সে মেয়েকে নিতে এল না। রাত পার হয়ে গেল। পরদিন ভোরে তার বাসায় গিয়ে দেখি বিরাট তালা ঝুলছে। খুব সমস্যায় পড়লাম। মহিলা গেলেন কোথায়? তিন দিন কেটে গেল কোনো খোঁজ নেই। আমরা পুলিশে খবর দিলাম। মহিলার মার ঠিকানা বের করে তাঁকে লং ডিসটেন্স টেলিফোন করলাম। ভদ্রমহিলা কঠিন গলায় বললেন, এইসব ব্যাপার নিয়ে আমাকে বিরক্ত না করলে খুশি হব। আমার মেয়ের সঙ্গে গত সাত বছর ধরে কোনো যোগাযোগ নেই। নতুন করে যোগাযোগ হোক তা আমার কাম্য নয়। জীবনের শেষ সময়টা আমি সমস্যা ছাড়া বাঁচতে চাই।

আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তবে জেনি লী নির্বিকার। সে বেশ সহজ ভঙ্গিতে বলল, আমার মা আমাকে তোমাদের ঘাড়ে ডাম্প করে পালিয়ে গেছে। সে আর আসবে না।

আমি তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে বললাম, অবশ্যই আসবে।

না, আসবে না। আমি না থাকলেই তার সুবিধা। বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারবে। আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকব।

কথাগুলি বলবার সময় মেয়েটির গলা একবারও ধরে এল না। চোখের কোণে অশ্রু চিকচিক করল না। একমাত্র শিশুরাই পারে নির্মোহ হয়ে সত্যকে গ্রহণ করতে।

জেনি লীর মা চার দিন পর ফিরে আসে। সে তার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে লং ডিসটেন্স ড্রাইভে দশ হাজার মাইল দূর মন্টানার এক পাহাড়ে চলে গিয়েছিল।

আমেরিকা কীভাবে বিদেশী ছাত্রদের জীবনে প্রভাব ফেলতে থাকে তার একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েই এই গল্প শেষ করব।

শীতের সময়কার ঘটনা।

এখানকার শীত মানে ভয়াবহ ব্যাপার। ঘর থেকে বেরুনো বন্ধ। আমি ইউনির্ভাসিটিতে যাই। ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে আসি। জীবন এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেল।

আমেরিকানদের মতে এই সময়টা স্বামী-স্ত্রীদের জন্যে খুব খারাপ। সবার মধ্যেই তখন থাকে—'কেবিন ফিবার'। দিনের পর দিন ঘরে বন্দি থেকে মেজাজ হয় রুক্ষ। ঝগড়াঝাটি হয়। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে ডির্ভোসের শতকরা ৭৬ ভাগ হয় শীতের সময়টায়।

আমেরিকানদের কেবিন ফিবারের ব্যাপারটা যে কত সত্যি তার প্রমাণ হাতে হাতে পেলাম। অতি সামান্য ব্যাপার নিয়ে কুৎসিত একটা ঝগড়া করলাম গুলতেকিনের সঙ্গে। সে বিস্মিত গলায় বারবার বলতে লাগল, তুমি এরকম করে কথা বলছ কেন? এসব কী? কেন এরকম করছ?

আমি চেঁচিয়ে বললাম, ভালো করছি।

তুমি খুবই বাজে ব্যবহার করছ। কেউ এরকমভাবে আমার সঙ্গে কথা বলে না।

কেউ না বলুক, আমি বলি।

আমি কিন্তু তোমাকে ছেড়ে চলে যাব।

চলে যেতে চাইলে যাও। মাই ডোর ইজ ওপেন। দখিন দুয়ার খোলা।

সে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল, তারপর নোভাকে চুমু খেয়ে একবস্ত্রে বের হয়ে গেল। আমি মোটেই পাত্তা দিলাম না। যাবে কোথায়? তাকে ফিরে আসতেই হবে।

আশ্চর্যের ব্যাপার, সে ফিরে এল না। একদিন এবং একরাত কেটে গেল। আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। নোভা ক্রমাগত কাঁদছে, কিছুই খাচ্ছে না। আমি কিছুতেই তাকে শান্ত করতে পারছি না। সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় খোঁজ করলাম। কেউ কিছু বলতে পারে না। পুলিশে খবর দিলাম।

ফার্গো শহরে 'অসহায় মহিলাদের রক্ষা সমিতি' বলে একটি সমিতি আছে। সেখানেও খোঁজ নিলাম। আমার প্রায় মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার জোগাড়।

দ্বিতীয় দিন পার হলো। রাত এল। আমি ঠিক করলাম রাতের মধ্যে যদি কোনো খোঁজ না পাই তাহলে দেশে খবর দেব।

রাত আটটায় একটা টেলিফোন এল। একজন মহিলা এটর্নি আমাকে জানালেন যে আমার স্ত্রী গুলতেকিন আহমেদ আমার ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়েছেন। তিনি ডিভোর্সের মামলা করতে চান।

আমি বললাম, খুবই উত্তম কথা। সে আছে কোথায়?

সে তার এক বান্ধবীর বাড়িতে আছে। সেই ঠিকানা তোমাকে দেওয়া যাবে না। আমি কি মামলার বিষয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলব?

মামলার বিষয়ে কথা বলার কিছুই নেই। আমাদের বিয়ের নিয়মকানুন খুব সহজ। এই নিয়মে আমার স্ত্রীকে স্বামী পরিত্যাগ করার অধিকার দেওয়া আছে। এই অধিকার বলে সে যে-কোনো মুহূর্তে আমাকে ত্যাগ করতে পারে। তার জন্যে কোর্টে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

তোমাদের দেশের নিয়মকানুন তোমাদের দেশের জন্যে। আমেরিকায় এই নিয়ম চলবে না।

তোমার বকবকানি শুনতে আমার মোটেই ভালো লাগছে না। তুমি কি দয়া করে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমাকে যোগাযোগ করিয়ে দেবে?

আমি তোমার অনুরোধের কথা তাকে বলতে পারি। যোগাযোগ করার দায়িত্ব তার।

বেশ তাই করো।

আমি টেলিফোন নামিয়ে সারা রাত জেগে রইলাম—যদি গুলতেকিন টেলিফোন করে। সে টেলিফোন করল না। বিভীষিকাময় একটা রাত কাটল। ভোরবেলা সে এসে হাজির।

যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে সে রান্নাঘরে ঢুকে চায়ের কেতলি বসিয়ে দিল। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। কিছুই বলছি না। সে খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দু'কাপ চা বানিয়ে এক কাপ আমার সামনে রেখে বলল, তোমাকে আমি একটা শিক্ষা দিলাম। যাতে ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে আর খারাপ ব্যবহার না করো। যদি করো আমি কিন্তু ফিরে আসব না।

আমি বললাম, আমেরিকা তোমাকে বদলে দিয়েছে।

হ্যাঁ, দিয়েছে। এই বদলানোটা কি খারাপ?

না।

না বলার সৎ সাহস যে তোমার হয়েছে সেজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। তবে যে বিদ্রোহ এখানে আমি করতে পারলাম দেশে থাকলে তা কখনো করতে পারতাম না। দিনের পর দিন অপমান সহ্য করে পশুশ্রেণীর স্বামীর পায়ের কাছে পড়ে থাকতে হতো।

আমি কি পশুশ্রেণীর কেউ?

হ্যাঁ। নাও চা খাও। তোমার চেহারা এত খারাপ হয়েছে কেন? এই দুদিন কিছুই খাওনি বোধহয়?

বলতে বলতে পশুশ্রেণীর একজন মানুষের প্রতি গাঢ় মমতায় তার চোখে জল এসে গেল।

সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি জানি এরপরেও তুমি আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে, তবুও আমি বারবার তোমার কাছেই ফিরে আসব। এই দুদিন আমি একবারও আমার মেয়ের কথা ভাবিনি। শুধু তোমার কথাই ভেবেছি।

আমি মনে মনে বললাম, ভালোবেসে যদি সুখ নাহি তবে কেন মিছে এ ভালোবাসা।

ভাগ্যিস রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন। না জন্মালে ভাব প্রকাশে আমাদের বড় অসুবিধা হতো।

চুমু প্রসঙ্গে আরেকটি গল্প বলি। গল্পের নায়ক আমার ছাত্র—বেন ওয়ালি। টিচিং অ্যাসিসটেন্ট হিসেবে আমি এদের প্রবলেম ক্লাস নেই। সপ্তাহে একদিন এক ঘণ্টা থার্মোডিনামিক্সের অংক করাই এবং ছাত্রদের প্রশ্নের জবাব দেই।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, আন্ডার গ্রাজুয়েটে যেসব আমেরিকান পড়তে আসে, তাদের প্রায় সবাই গাধাটাইপের। কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে হা করে তাকিয়ে থাকে। প্রবল বেগে মাথা চুলকায়। অংক করতে দিলে শুকনো গলায় বলে, আমার ক্যালকুলেটরে ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেছে।

আন্ডার গ্রাজুয়েট পড়াশোনা এদের তেমন জরুরি নয়। খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্যে হাইস্কুলের শিক্ষাই যথেষ্ট। এদের কাছে ইউনিভার্সিটির ফুটবল টিম, বেসবল টিম পড়াশোনার চেয়ে অনেক জরুরি। মেয়েদের লক্ষ্য থাকে ভালো একজন স্বামী জোগাড় করার দিকে। এই কাজটি তাদের নিজেদেরই করতে হয় এবং এর জন্যে যে পরিমাণ কষ্ট এক একজন করে তা দেখলে চোখে পানি এসে যায়।

আমার সঙ্গে রুথ কোয়ান্ডাল বলে এক আমেরিকান ছাত্রী পিএইচডি করত। এই মেয়েটি কোনো স্বামী জোগাড় করতে পারেনি। ভবিষ্যতেও যে পারবে এমন সম্ভাবনাও নেই। মেয়েটি মৈনাকপর্বতের মতো। সে আমাকে দুঃখ করে বলেছিল, আমার যখন সতেরো-আঠারো বছর বয়স ছিল তখন আমি এত মোটা ছিলাম না। চেহারাও ভালোই ছিল। তখন থেকে চেষ্টা করছি একজন ভালো ছেলে জোগাড় করতে। পারিনি। কতজনের সঙ্গে যে মিশেছি। ওদের ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখার জন্যে কত কিছু করতে হয়েছে। আগেকার অবস্থা তো নেই, এখন ছেলেরা ডেটিং-এর প্রথম রাতেই বিছানায় নিয়ে যেতে চায়। না করি না। না করলে যদি বিরক্ত হয়। আমাকে ছেড়ে অন্য কোনো মেয়ের কাছে চলে যায়। এত কিছু করেও ছেলে জুটাতে পারলাম না।

কেন পারলে না ?

পারলাম না, কারণ আমি অতিরিক্ত স্মার্ট। সারা জীবন 'A' পেয়ে এসেছি। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রীদের একজন। ছেলেরা এরকম স্মার্ট মেয়ে পছন্দ করে না। তারা চায় পুতুপুতু ধরনের ভ্যাদা টাইপের মেয়ে। তুমি বিদেশী, আমাদের জটিল সমস্যা বুঝতে পারবে না।

আমি আসলেই বুঝতে পারি না। আমার মনে হয় এদের কোথায় যেন কী একটা হয়েছে। সবার মাথার স্ক্রু-র একটা প্যাঁচ কেটে গেছে। উদাহরণ দেই। এটি আমার নিজের চোখে দেখা।

পুরোদমে ক্লাস হচ্ছে। দেখা গেল ক্লাস থেকে দুটি ছেলে এবং একটি মেয়ে বের হয়ে গেল। সবার চোখের সামনে এরা সমস্ত কাপড় খুলে ফেলল। এইভাবেই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একটা চক্কর দিয়ে ফেলল। এর নাম হচ্ছে স্ট্রিকিং। এরকম করল কেন ? এরকম করল কারণ এরা পৃথিবী জুড়ে যে আণবিক বোমা তৈরি হচ্ছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল।

এদের এইসব পাগলামি সাধারণত ফাইন্যাল পরীক্ষার আগে আগে দেখা দেয়। আমার ছাত্র বেন ওয়ালির মাথায় এরকম পাগলামি ভর করল। স্প্রিং কোয়ার্টারের শেষে ফাইন্যালের ঠিক আগে আগে আমাকে এসে বলল সে একটা বিশেষ কারণে টার্ম ফাইন্যাল পেপারটা জমা দিতে পারছে না।

আমি বললাম, বিশেষ কারণটা কী ?

চুমুর দীর্ঘতম রেকর্ডটা ভাঙতে চাই। গিনিস বুকে নামটা যেন ওঠে।

আমি বেনের মুখে দিকে তাকিয়ে রইলাম। বলে কী এই ছেলে!

আমি বললাম, টার্ম ফাইন্যালের পরে চেষ্টা করলে কেমন হয় ? তখন নিশ্চিন্ত মনে চালিয়ে যেতে পারবে। টার্ম ফ্যাইন্যাল পেপার জমা না দিলে তো এই কোর্সটায় কোনো নম্বর পাবে না।

বেন বিরস মুখে চলে গেল। দু'দিন পর পেপার জমা দিয়ে দিল। আমি ভাবলাম মাথা থেকে ভূত নেমে গেছে। কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। যন্ত্রণা বাড়িয়ে লাভ নেই।

ভূত কিন্তু নামল না। আমেরিকানদের ঘাড়ের ভূত খুব সহজে নামে না। ভূতগুলিও আমেরিকানদের মতোই পাগলা। কাজেই এক বৃহস্পতিবার রাতে অর্থাৎ উইক-এন্ড শুরু হওয়ার আগে আগে বেন রেকর্ড ভাঙার জন্যে নেমে পড়ল। সঙ্গে স্বাস্থ্যবতী এক তরুণী, যার পোশাক খুবই উগ্র ধরনের। এই পোশাক না থাকলেই বরং উগ্রতাটা কম মনে হতো।

চুমুর ব্যাপারটা হচ্ছে মেমোরিয়াল ইউনিয়নের তিনতলায়। যথারীতি পোস্টার পড়েছে—ম্যারাথন চুমু। দীর্ঘতম চুম্বনের বিশ্বরেকর্ড স্থাপিত হতে যাচ্ছে।... ইত্যাদি ইত্যাদি।

দেখলাম ব্যাপারটায় আয়োজনও প্রচুর। দুজন আছে রেকর্ডকিপার, স্টপওয়াচ হাতে সময়ের হিসাব রাখছে। একজন আছেন নোটারি পাবলিক। যিনি সার্টিফিকেট দেবেন যে, দীর্ঘতম চুম্বনে কোনো কারচুপি হয়নি। এই নোটারি পাবলিক সারাক্ষণই থাকবেন কি না বুঝতে পারলাম না। এদের মতো গুরুত্বপূর্ণ মানুষ এরকম একটা ফালতু জিনিস নিয়ে কী করে সময় নষ্ট করে বুঝতে পারলাম না।

বেন এবং মেয়েটিকে নাইলনের দড়ি দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। কেউ সে বেষ্টনীর ভেতর যেতে পারছে না। বাজনা বাজছে। সবই নাচের বাজনা—ওয়াল্টজ। বাজনার তালে তালে এরা দু'জন নাচছে।

আমি মিনিট দশেক এই দৃশ্য দেখে চলে এলাম। এই জাতীয় পাগলামির কোনো মানে হয় ?

পরদিন ভোরে আবার গেলাম। ম্যারাথন চুমু তখনো চলছে। তবে পাত্র-পাত্রী দুজন এখন সোফায় শুয়ে আছে। ঠোঁটে ঠোঁট লাগানো। বাজনা বাজছে। সেই বাজনার তালে তালে সমবেত দর্শকদের অনেকেই সঙ্গী অথবা সঙ্গিনী নিয়ে খানিকক্ষণ নাচছে। রীতিমতো উৎসব।

আমি আমার পাশে দাঁড়ানো ছেলেটিকে বললাম, ক্ষিধে পেলে ওরা করবে কী ? ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে খাওয়াদাওয়া তো করা যাবে না।

তরল খাবার খাবে স্ট্র দিয়ে। কিছুক্ষণ আগেই স্যুপ খেয়েছে।

আমি ইতস্তত করে বললাম, বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন যখন হয় তখন কী করবে ?

জানি না। বাথরুমের জন্যে কিছু সময় বোধহয় অফ পাওয়া যায়। কর্মকর্তাদের জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে। ওদের জিজ্ঞেস করো।

আমার আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করল না। ততক্ষণে ফ্লোরে উদ্দাম নৃত্য শুরু হয়ে গেছে। একজোড়া বুড়োবুড়ি উদ্দাম নৃত্যে মেতেছে। ভয়াবহ লাফ-ঝাঁপ। তালে তালে হাততালি পড়ছে। জমজমাট অবস্থা।

জানতে পারলাম এই বুড়োবুড়ি হচ্ছে বেন ওয়ালির বাবা এবং মা। তারা সুদূর মিনেসোটা থেকে ছুটে এসেছেন ছেলেকে উৎসাহ দেওয়ার জন্যে। ছেলের গর্বে তাঁদের চোখমুখ উজ্জ্বল।

বেন ওয়ালি দীর্ঘতম চুম্বনের বিশ্বরেকর্ড ভাঙতে পারেনি। তবে সে খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল।

লাস ভেগাস

দিনটা ছিল বুধবার। জুন মাসের ষোলো বা সতেরো তারিখ। ডানবার হলের এক্সরে রুমে বসে আছি। আমার সামনে গাদাখানিক রিপোর্ট। আমি রিপোর্ট দেখছি এবং ঠান্ডা ঘরে বসেও রীতিমতো ঘামছি। কারণ গা দিয়ে ঘাম বের হওয়ার মতো একটা আবিষ্কার করে ফেলেছি। পলিমার ক্লে ইন্টারেকশনের এমন একটা ব্যাপার পাওয়া গেছে যা আগে কখনো লক্ষ করা হয়নি। আবিষ্কারটি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা ৮০ ভাগ।

আমি দেখিয়েছি যে, পলিমারের মতো বিশাল অণু ক্লের লেয়ারের ভেতর ঢুকে তার স্ট্রাকচার বদলে দিতে পারে। সব পলিমার পারে না, কিছু কিছু পারে। কোনো কোনো পলিমার ক্লে লেয়ারের ফাঁক বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। কেউ আবার কমিয়ে দেয়। অত্যন্ত অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার।

সন্ধ্যাবেলা আমি আমার প্রফেসরকে ব্যাপারটা জানালাম। তিনি খানিকক্ষণ ঝিম ধরে বসে রইলেন। ঝিম ভাঙবার পর বললেন, গোল্ড মাইন।

অর্থাৎ তিনি একটি স্বর্ণখনির সন্ধান পেয়েছেন। রাত দশটার দিকে তিনি বাসায় টেলিফোন করে বললেন, আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির ৫৭তম অধিবেশন হবে নাভাদার লাস ভেগাসে। সেই অধিবেশনে আমরা আমাদের এই আবিষ্কারের কথা বলব।

আমি বললাম, খুবই ভালো কথা। কিন্তু এখনো ব্যাপারটা আমরা ভালোমতো জানি না। আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির মতো অধিবেশনে তাড়াহুড়া করে কিছু...

প্রফেসর আমার কথা শেষ করতে দিলেন না, ঘট করে টেলিফোন রেখে দিলেন।

পরদিন ডিপার্টমেন্টে গিয়ে খুব চেষ্টা করলাম প্রফেসরের সঙ্গে কথা বলতে। তিনি সেই সুযোগ দিলেন না। লেখালেখি নিয়ে খুব ব্যস্ত। যতবার কথা বলতে চাই দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলেন, দেখছ একটা কাজ করছি, কেন বিরক্ত করছ। আমার কাজ নয়। এটা তোমারই কাজ।

সন্ধ্যাবেলা প্রফেসরের সেই কাজ শেষ হলো। তিনি তাঁর সব ছাত্রকে ডেকে গম্ভীর গলায় বললেন, আমার ছাত্র আহামাদ নাভাদার লাস ভেগাসে তার আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করবে। সে একটা পেপার দেবে। পেপারের খসড়া আমি তৈরি করে ফেলেছি।

আমার মাথা ঘুরে গেল। ব্যাটা বলে কী ? পৃথিবীর সব বড় বড় রসায়নবিদ জড়ো হবে সেখানে। এইসব জ্ঞানী-গুণীর মধ্যে আমি কেন ? এক অক্ষর ইংরেজি আমার মুখ দিয়ে বের হয় না। যা বের হয় তার অর্থ কেউ বুঝে না। আমি এ কী বিপদে পড়লাম!

প্রফেসর বললেন, আহামাদ, তোমার মুখ এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন ?

আমি কাষ্ঠ হাসি হেসে বললাম, আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কেন জানতে পারি ?

আমি বক্তৃতা দিতে পারি না।

এটা খুবই সত্যি কথা।

আমি ইংরেজি বললে কেউ তা বুঝতে পারে না।

কারেক্ট। আমি এতদিন তোমার সঙ্গে আছি, আমি নিজেই বুঝি না। অন্যরা কী বুঝবে।

আমি খুবই নার্ভাস ধরনের ছেলে। কী বলতে কী বলব।

দেখো আহামাদ, আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির অধিবেশনে কথা বলতে পারার সৌভাগ্য সবার হয় না। তোমার হচ্ছে।

এই সৌভাগ্য আমার চাই না।

বাজে কথা বলবে না। কাজটা তুমি করেছ। আমি চাই সম্মানের বড় অংশ তুমি পাও। কেন ভয় পাচ্ছ ? আমি তোমার পাশেই থাকব।

আমি মনে মনে বললাম, ব্যাটা তুই আমাকে এ কী বিপদে ফেললি।

পনেরো দিনের মধ্যে চিন্তায় চিন্তায় আমার দু'পাউন্ড ওজন কমে গেল। আমার দুশ্চিন্তার মূল কারণ হচ্ছে কাজটা আধাখেচড়াভাবে হয়েছে। কেউ যদি কাজের ওপর জটিল কোনো প্রশ্ন করে বসে জবাব দিতে পারব না। এরকম অপ্রস্তুত অবস্থায় এত বড় বিজ্ঞান অধিবেশনে যাওয়া যায় না। ব্যাটা প্রফেসর তা বুঝবে না।

প্রফেসর তার গাড়িতে করে আমাকে লাস ভেগাসে নিয়ে গেলেন। মরুভূমির ভেতর আলো ঝলমল একটি শহর। জুয়ার তীর্থভূমি। নাইট ক্লাব এবং ক্যাসিনোতে ভরা। দিনেরবেলা এই শহর ঝিম মেরে থাকে। সন্ধ্যার পর জেগে ওঠে। সেই জেগে ওঠাটা ভয়াবহ।

আমার প্রফেসরেরও এই প্রথম লাস ভেগাসে আগমন। তিনিও আমার মতোই ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেছেন। হা হয়ে দেখছেন রাস্তায় অপূর্ব সুন্দরীদের ভিড়। প্রফেসর আমার কানে কানে বললেন, এই একটি জায়গাতেই প্রসটিটিউশন নিষিদ্ধ নয়। যাদের দেখছ, তাদের প্রায় সবাই ঐ জিনিস। দেখবে পৃথিবীর সব সুন্দরী মেয়েরা এসে টাকার লোভে এখানে জড়ো হয়েছে।

কিছুদূর এগুতেই এক সুন্দরী এগিয়ে এসে বলল, সান্ধ্যকালীন কোনো বান্ধবীর কি প্রয়োজন আছে ?

আমি কিছু বলবার আগেই প্রফেসর বললেন, না, ওর কোনো বান্ধবীর প্রয়োজন নেই।

মেয়েটি নীল চোখ তুলে শান্ত গলায় বললেন, তোমাকে তো জিগগেস করিনি। তুমি কথা বলছ কেন ?

আমি বললাম, তোমায় ধন্যবাদ, আমার বান্ধবীর প্রয়োজন নেই।

মেয়েটি বলল, সুন্দর সন্ধ্যাটা একা একা কাটাবে ? একগ্লাস বিয়ারের বদলে আমি তোমার পাশে বসতে পারি।

আমরা কথা না বলে এগিয়ে গেলাম। পথে আরও দুটি মেয়ের সঙ্গে কথা হলো। এদের একজন মধুর ভঙ্গিতে বলল, তোমাদের কি ডেট লাগবে ? লাগলে লজ্জা করবে না।

আমার প্রফেসর মুখ গম্ভীর করে আমাকে বুঝালেন, এরা ভয়াবহ ধরনের প্রস্টিটিউট। তোমার কাছ থেকে টাকাপয়সা নেবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গায়ে হাত পর্যন্ত দিতে দেবে না। পত্রপত্রিকায় এদের সম্পর্কে অনেক লেখালেখি হয়েছে।

প্রফেসরের ভাব এরকম যে গায়ে হাত দিতে দিলে তিনি রাজি হয়ে যেতেন।

রাতের খাবার খেতে আমরা যে রেস্টুরেন্টে গেলাম তা হচ্ছে টপলেস রেস্টুরেন্ট। অর্থাৎ ওয়েট্রেসদের বুকে কোনো কাপড় থাকবে না। বইপত্রে এইসব রেস্টুরেন্টের কথা পড়েছি। বাস্তবে এই প্রথম দেখলাম। আমার লজ্জায় প্রায় মাথা কাটা যাওয়ার মতো অবস্থা। মেয়েগুলিকে মনে হলো আড়ষ্ট ও প্রাণহীন। এদের মুখের দিকে কেউ তাকাচ্ছে না, সবাই তাকাচ্ছে বুকের দিকে। কাজেই তারা খানিকটা প্রাণহীন হবেই। চোখের একটা নিজস্ব ভাষা আছে। চোখের ওপর চোখ রেখে আমরা সেই ভাষায় কথা বলি। এইসব মেয়ে চোখের ভাষা কখনো ব্যবহার করতে পারে না। এরা বড় দুঃখী।

প্রফেসর বিরক্ত মুখে আমাকে বললেন, আমাদের এই টেবিলে বসাটাই ভুল হয়েছে। এই টেবিলের ওয়েট্রেসদের বুকের দিকে তাকিয়ে দেখো। ছেলেদের বুক এরচেয়ে অনেক ডেভেলপড্ হয়। এর বুক দেখে মনে হচ্ছে প্রেইরীর সমতল ভূমি।

রাতের খাবারের পর আমরা একটা শো দেখলাম। প্রায় নগ্ন কিছু নারী-পুরুষ মিলে গান বাজনা নাচ করল। একটি জাপানি মেয়ে সারা শরীর পালকে ঢেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দর্শকদের কাছে আসছে, দর্শকরা একটা করে পালক তুলে নিচ্ছে। তার গা ক্রমশ খালি

হয়ে আসছে। সর্বশেষ পালকটি তার গা থেকে খুলে নেওয়ার পর সে স্টেজে চলে গেল এবং চমৎকার একটি নাচ দেখাল। যে মেয়ে এত সুন্দর নাচ জানে তার খালি গা হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

রাত বারোটায় শো শেষ হওয়ার পর আমার প্রফেসর বললেন, লাস ভেগাসে রাত শুরু হয় বারোটার পর। এখন হোটেলে গিয়ে ঘুমুবার কোনো মানে হয় না।

আমি বললাম, তুমি কী করতে চাও ?

জুয়া খেলবে নাকি ?

জুয়া কী করে খেলতে হয়, আমি জানি না।

আমিও জানি না। তবে স্লট মেশিন জিনিসটা বেশ মজার। নিকেল, ডাইম কিংবা কোয়ার্টার (বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা) মেশিনের ফোকরে ফেলে একটা হাতল ধরে টানতে হয়। ভাগ্য ভালো হলে কম্বিনেশন মিলে যায়, ঝুনঝুন শব্দে প্রচুর মুদ্রা বেরিয়ে আসে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের দুজনের নেশা ধরে গেল। মুদ্রা ফেলি আর স্লট মেশিনের হাতল ধরে টানি। দেখা গেল প্রফেসরের ভাগ্য আজ সুপ্রসন্ন। জ্যাক পট পেয়ে গেলেন। এক কোয়ার্টারে প্রায় একশ ডলার। তার সামনে মুদ্রার পাহাড়।

ক্যাসিনো থেকে কিছুক্ষণ পরপর বিনামূল্যে শ্যাম্পেন খাওয়ানো হচ্ছে। ক্যাসিনো যেন বিরাট এক উৎসবের ক্ষেত্র। আমি মুগ্ধ চোখে ঘুরে ঘুরে দেখলাম—ক্যাসিনোর এক একটা টেবিলে কত লক্ষ টাকারই না লেনদেন হচ্ছে। কত টাকাই না মানুষের আছে।

রাত তিনটার দিকে আমরা হোটেলে ফিরলাম। এর মধ্যে আমার প্রফেসর দুশ ডলার হেরেছেন। আমার কাছে ছিল সত্তর ডলার, তার সবটাই চলে গেছে। আমাকে প্রফেসরের কাছ থেকে টাকা ধার করতে হবে এবং তা করতে হবে আজ রাতের মধ্যেই। কারণ আমার ধারণা এই লোক আবার ক্যাসিনোতে যাবে এবং তাঁর শেষ কপর্দকও স্লট মেশিনে চলে যাবে।

রাতে এক ফোঁটা ঘুম হলো না। সমস্ত দিনের উত্তেজনার সঙ্গে যোগ হয়েছে আগামী দিনের সেশনের দুশ্চিন্তা।

হোটেলের যে ঘরে আমি আছি তা আহামরি কিছু নয়। দুটি বিছানা। একটিতে আমি অন্যটিতে থাকবে আমাদের ইউনিভার্সিটিরই এক ছাত্র, জিম। সে এখনো ফেরেনি। সম্ভবত কোনো ক্যাসিনোতে আটকা পড়ে গেছে। রাতে আর ফিরবে না।

আমার ধারণা ভুল প্রমাণ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ফিরল। চোখের সামনে পুরো দিগম্বর হয়ে সটান পাশের বিছানায় শুয়ে পড়ল। আমেরিকানদের এই ব্যাপারটা আমাকে সবসময় পীড়া দেয়। একজন পুরুষের সামনে অন্য একজন পুরুষ কাপড় খুলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না।

ডরমিটরি গোসলখানায় একসঙ্গে অনেকে নগ্ন হয়ে স্নান পর্ব সারে। ব্যবস্থাই এরকম। হয়তো এটাকেই এরা অগ্রসর সভ্যতার একটা ধাপ বলে ভাবছে। এই প্রসঙ্গে ওদের সঙ্গে আমি কোনো কথা বলিনি। বলতে ইচ্ছা করেনি।

কেমিক্যাল সোসাইটির মিটিং-এ গিয়ে হকচকিয়ে গেলাম। যা ভেবেছিলাম ব্যাপারটা মোটেই সেরকম নয়। উৎসব ভালো। পেপারের চেয়ে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাই প্রধান। আলাপের বিষয় একটাই—কেমিস্ট্রি।

এই বিষয়ের বড় বড় সব ব্যক্তিত্বকেই দেখলাম। রসায়নে দুই বছর আগে নোবেল পুরস্কার পাওয়া এক বিজ্ঞানীকে দেখলাম লালরঙের একটা গেঞ্জি পরে এসেছেন—সেখানে লেখা 'আমি রসায়নকে ঘৃণা করি।'

অধিবেশনটি ছোট ছোট ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একসঙ্গে অনেক অধিবেশন চলছে। যার যেটি পছন্দ সে সেখানে যাচ্ছে।

আমাদের অধিবেশনে পঞ্চাশজনের মতো বিজ্ঞানীকে দেখা গেল। আমার আগে বেলজিয়ামের লিয়েগে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞানী পেপার পড়লেন। তাঁকে এমনভাবে চেপে ধরা হলো যে ভদ্রলোক শুধু কেঁদে ফেলতে বাকি রাখলেন। আমি ঘামতে ঘামতে এই জীবনে যতগুলি সূরা শিখেছিলাম সব মনে মনে পড়ে ফেললাম। আমার মনে হচ্ছিল বক্তৃতার মাঝখানেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব। এম্বুলেন্স করে আমাকে হাসপাতালে নিতে হবে। আমার বক্তৃতার ঠিক আগে আগে প্রফেসর উঠে বাইরে চলে গেলেন। এই প্রথম বুঝলাম চোখে সর্ষে ফুল দেখার উপমাটি কত খাঁটি। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার কোনোরকম বাধা ছাড়াই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হলো। প্রথম প্রশ্ন শুনে আমার পিলে চমকে গেল। আমি যখন বলতে যাচ্ছি—এই বিষয়ে আমি কিছুই জানি না, ঠিক তখনই আমার প্রফেসর উদয় হলেন এবং প্রশ্নের জবাব দিলেন। ঝড়ের মতো প্রশ্ন এল, ঝড়ের মতোই উত্তর দিলেন প্রফেসর গ্লাস। আমি মনে মনে বললাম, ব্যাটা বাঘের বাচ্চা, পুরোপুরি তৈরি হয়ে এসেছে।

সেশন শেষে প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করলাম, স্যার আমার বক্তৃতা কেমন হয়েছে?

তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, এত চমৎকার একটি বিষয় নিয়ে এত বাজে বক্তৃতা আমি এই জীবনে শুনিনি।

বলেই হেসে ফেললেন এবং হাসতে হাসতে যোগ করলেন, তাতে কিছুই যায় আসে না, কারণ কাজটাই প্রধান, বক্তৃতা নয়।

কীভাবে সেলিব্রেট করব?

শ্যাম্পেন দিয়ে।

আর কীভাবে?

এক বোতল শ্যাম্পেন কেনা হলো। ব্যাটা পুরোটা গলায় ঢেলে দিয়ে গুনগুন করে গান ধরল—

"Pretty girls are everywhere
If you call me I will be there..."

শীলার জন্ম

আমার দ্বিতীয় মেয়ে শীলার জন্ম আমেরিকায়। জন্ম এবং মৃত্যুর সব গল্পই নাটকীয়, তবে শীলার জন্মমুহূর্তে যে নাটক হয়, তাতে আমার বড় ভূমিকা আছে বলে গল্পটি বলতে ইচ্ছা করছে।

তারিখটা হচ্ছে ১৫ জানুয়ারি।

প্রচণ্ড শীত পড়েছে। বরফে বরফে সমস্ত ফার্গো শহর ঢাকা পড়ে গেছে। শেষরাত থেকে নতুন করে তুষারপাত শুরু হলো। আবহাওয়া দপ্তর জানাল—'নিতান্ত প্রয়োজন না হলে রাস্তায় গাড়ি নিয়ে বের হবে না।'

আমার ঘরের হিটিং ঠিকমতো কাজ করছিল না। ঘর অস্বাভাবিক ঠান্ডা। দুতিনটি কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে আছি। এরকম দুর্যোগের দিনে ইউনিভার্সিটিতে কী করে যাব তাই ভাবছি। দেশে যেমন প্রচণ্ড বৃষ্টি বাদলার দিনে রেইনি ডে-র ছুটি হয়ে যেত, এখানে স্নো ডে বলে তেমন কিছু নেই। চার ফুট বরফে শহর ঢাকা পড়ে গেছে, অথচ তারপরও ইউনিভার্সিটির কাজকর্ম ঠিকমতো চলছে।

সকালবেলার ঘুমের মতো আরামের ব্যাপার এই জগতে খুব বেশি নেই। সেই আরাম ভোগ করছি, ঠিক তখন গুলতেকিন আমাকে ডেকে তুলে ফ্যাকাশে মুখে বলল, আমার যেন কেমন লাগছে।

আমি বললাম, ঠিক হয়ে যাবে।

বলেই আবার ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করলাম। সে ভয় পাওয়া গলায় বলল, তুমি বুঝতে পারছ না, এটা মনে হচ্ছে ঐ ব্যাপার।

ঐ ব্যাপার মানে?

মনে হচ্ছে...

মেয়েরা ধাঁধা খুব পছন্দ করে। আমি লক্ষ করেছি, যে কথা সরাসরি বললেও কোনো ক্ষতি নেই সেই কথাও তারা ধাঁধার মতো বলতে চেষ্টা করে। তার ব্যথা উঠেছে, তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে, এটা বুঝতে আমার দশ মিনিটের মতো লাগল। যখন বুঝলাম তখন স্পাইন্যাল কর্ড দিয়ে হিমশীতল একটা স্রোত বয়ে গেল। কী সর্বনাশ!

আমি শুকনো গলায় বললাম, ব্যথা কি খুব বেশি?

না, বেশি না। কম। তবে ব্যথাটা ঢেউয়ের মতো আসে, চলে যায়, আবার আসে। এখন ব্যথা নেই।

তাহলে তুমি রান্নাঘরে চলে যাও, চা বানাও। চা খেতে খেতে চিন্তা করি প্ল্যান অব অ্যাকশন।

চিন্তা করার কী আছে? তুমি আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে—ব্যস।

কথা না বাড়িয়ে চা বানাও। আবার ব্যথা শুরু হলে মুশকিল হবে।

সে রান্নাঘরে চলে গেল। আমি প্ল্যান অব অ্যাকশন ভাবতে বসলাম। গুলতেকিন পুরো ব্যাপারটা যত সহজ ভাবছে, এটা মোটেই তত সহজ না। প্রধান সমস্যা এই প্রচণ্ড

দুর্যোগে তাকে হাসপাতালে নিয়ে পৌঁছানো। এছাড়াও ছোটখাটো সমস্যা আছে, যেমন নোভাকে কোথায় রেখে যাব ? কে তার দেখাশোনা করবে ? হাসপাতালে গুলতেকিনকে কতদিন থাকতে হবে ? এই দিনগুলিতে নোভাকে সামলাব কীভাবে ?

নাও, চা খাও। চা খেয়ে দয়া করে কাপড় পরো।

নোভাকে কী করব ?

কিছু করতে হবে না। আমি ফরিদকে টেলিফোন করে দিয়েছি, সে এসে পড়বে।

ডাক্তারকেও তো খবর দেওয়া দরকার।

খবর দিয়েছি।

কাজ তো দেখি অনেক এগিয়ে রেখেছ।

হ্যাঁ, রেখেছি। প্লিজ, চা-টা তাড়তাড়ি শেষ করো।

চা শেষ করার আগেই ফরিদ এসে পড়ল। সে কানাডা থেকে এম এস করে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করতে এসেছে। এই ছেলেটি পাকিস্তানি। পাকিস্তানি কারও সঙ্গে নীতিগতভাবেই আমি কোনো যোগাযোগ রাখি না। একমাত্র ব্যতিক্রম ফরিদ। পৃথিবীতে একধরনের মানুষ জন্মায় যাদের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে পরের উপকার করা। পরের উপকার করার সময়টাতেই তারা খানিকটা হাসিখুশি থাকে, অন্যসময় বিমর্ষ হয়ে থাকে। আমি আমার চল্লিশ বছরের জীবনে ফরিদের মতো ভালো ছেলে দ্বিতীয়টি দেখিনি, ভবিষ্যতে দেখব সেই আশাও করি না।

নোভাকে ফরিদের কাছে রেখে আমি হাসপাতালের দিকে রওনা হলাম। বরফঢাকা রাস্তায় আমার ডজ পোলারা গাড়ি চলছে। পেছনের সিটে গুলতেকিন কাত হয়ে শুয়ে আছে, মাঝে মাঝে অস্ফুটস্বরে কাতরাচ্ছে। আমি বললাম, ব্যথা কি খুব বেড়েছে ?

তুমি গাড়ি চালাও। কথা বলবে না। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাও। আমার মনে হচ্ছে বেশি দেরি নেই।

কী সর্বনাশ! আগে বলবে তো।

আমি একসিলেটরে পা পুরোপুরি দাবিয়ে দিলাম। গাড়ি চলল উল্কার গতিতে। আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল বলেই অ্যাকসিডেন্ট না করে সেইন্ট লিউক হাসপাতালে পৌঁছতে পারলাম।

নার্স এসে দেখেশুনে বলল, এক্ষুনি ডেলিভারি হবে, চল ওটি-তে যাই।

গুলতেকিনের চিকিৎসকের নাম ডাঃ মেলয়। ডেলিভারি তিনিই করাবেন। আমেরিকান ডাক্তারদের সবার কাছেই ওয়াকিটকি জাতীয় একটি যন্ত্র থাকে। তিনি যেখানেই থাকেন তাঁর সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে যোগাযোগ করা যায়। হাসপাতাল থেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো। তিনি বললেন, এক মিনিটের মধ্যে রওনা হচ্ছি।

আমি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে যখন সিগারেট ধরিয়েছি তখন হাসপাতালের মেট্রন বলল, তুমি চলো আমার সঙ্গে।

কোথায় ?

অপারেশন থিয়েটারে।

কেন ?

তুমি তোমার স্ত্রীর পাশে থাকবে। তাকে সাহস দেবে।

ও খুবই সাহসী মেয়ে। ওকে সাহস দেওয়ার কোনো দরকার নেই।

বাজে কথা বলবে না। তুমি এসো আমার সঙ্গে। ডেলিভারির সময় আমরা কাউকে ঢুকতে দেই না। শুধু স্বামীকে থাকতে বলি। এর প্রয়োজন আছে।

আমি তেমন কোনো প্রয়োজন দেখতে পাচ্ছি না।

যা ঘটতে যাচ্ছে তার অর্ধেক দায়ভার তোমার। তুমি এরকম করছ কেন ?

আমি মেট্রনের সঙ্গে রওনা হলাম। ওটি-তে ঢোকার প্রস্তুতি হিসেবে আমাকে মাস্ক পরিয়ে দিল। অ্যাপ্রন গায়ে চড়িয়ে দিল। এক ধরনের বিশাল মোজায় পা ঢেকে দেওয়া হলো। আমি ওটি-তে ঢুকলাম। অপারেশন থিয়েটারটি তেমন আলোকিত নয়। আমার কাছে অন্ধকার অন্ধকার লাগল। ঘরটা ছোট এবং যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। ফিনাইলের যে কটু গন্ধ হাসপাতালে পাওয়া যায় তেমন গন্ধও পেলাম না, তবে নেশা ধরানোর মতো মিষ্টি সৌরভ ঘরময় ছড়ানো।

গুলতেকিনকে বিশেষ ধরনের একটা টেবিলে শুইয়ে রাখা হয়েছে। তার দুপাশে দুজন নার্স। ডাঃ মেলয় এসে পড়েছেন, তিনি ছুরি কাঁচি গুছিয়ে রাখছেন। তাদের প্রত্যেকের মুখে মাস্ক থাকার জন্যে তাদের দেখাচ্ছিল ক্লু ক্লাক্স ক্লান-এর সদস্যদের মতো। তাদের ঠিক মানুষ বলে মনে হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল তারা যেন একদল রোবট। আমি গুলতেকিনের হাত ধরে দাঁড়ালাম।

ডেলিভারি পেইনের কথাই শুধু শুনেছি, এই ব্যথা যে কত তীব্র, কত তীক্ষ্ণ এবং কত ভয়াবহ সেই সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। এই প্রথম ধারণা হলো। ঘামে আমার সমস্ত শরীর ভিজে গেল। থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। গলাকাটা কোরবানির পশুর মতো গুলতেকিন ছটফট করছে। একসময় আমি ডাক্তারকে বললাম, আপনি দয়া করে পেইন কিলার দিয়ে ব্যথা কমিয়ে দিন। ডাক্তার নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন, পেইন কিলার দেওয়া যাবে না। পেইন কিলার দেওয়া মাত্র কন্ট্রাকশনের সমস্যা হবে। আর মাত্র কিছুক্ষণ।

সেই কিছুক্ষণ আমার কাছে অনন্তকাল বলে মনে হলো। মনে হলো আমি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আমার স্ত্রীর হাত ধরে প্রতীক্ষা করছি।

একসময় প্রতীক্ষার অবসান হলো, জন্ম হলো আমার দ্বিতীয় কন্যা শীলার। হাত পা ছুড়ে সে কাঁদছে, সরবে এই পৃথিবীতে তার অধিকার ঘোষণা করছে। যেন সে বলছে, এই পৃথিবী আমার, এই গ্রহ-নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য আমার, এই অনন্ত নক্ষত্রবীথি আমার।

গুলতেকিন ক্লান্ত গলায় বলল, তুমি চুপ করে আছ কেন, আজান দাও। বাচ্চার কানে আল্লাহর নাম শোনাতে হয়।

আমি আমার ফুসফুসের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে বললাম, আল্লাহু আকবর...

নার্সের হাতে একটা ট্রে ছিল। ভয় পেয়ে সে ট্রে ফেলে দিল। ডাক্তার আমার দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, What is happening ?

তাদের কোনো কথাই আমার কানে ঢুকছে না। আমি অবাক হয়ে দেখছি আমার শিশুকন্যাকে। সে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। পৃথিবীর রূপরসগন্ধ হয়তোবা ইতোমধ্যেই তাকে অভিভূত করে ফেলেছে। আমি প্রার্থনা করলাম, যেন পৃথিবী তার মঙ্গলময় হাত প্রসারিত করে আমার কন্যার দিকে। দুঃখ-বেদনার সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রগাঢ় আনন্দ বারবার আন্দোলিত করে আমার মামণিকে।

পাখি

উইন্টার কোয়ার্টার শুরু হয়েছে। শীত এখনো তেমন পড়েনি। ওয়েদার ফোরকাস্ট হচ্ছে দু'একদিনের মধ্যে প্রথম তুষারপাত হবে। এ বছর অন্যসব বছরের চেয়ে প্রচণ্ড শীত পড়বে, এরকম কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে। প্রাচীন মানুষেরা আকাশের রঙ দেখে শীতের খবর বলতে পারতেন। স্যাটেলাইটের যুগেও তাদের কথা কেমন করে জানি মিলে যায়।

ভোরবেলা ক্লাসে রওনা হয়েছি। ঘর থেকে বের হয়ে মনে হলো আজ ঠান্ডাটা অনেক বেশি। বাতাসের প্রথম ঝাপটায় মেরুদণ্ড দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। আমি ফিরে এসে পার্কা গায়ে দিয়ে রওনা হলাম। পার্কা হচ্ছে এমন এক শীতবস্ত্র যা পরে শূন্যের ত্রিশ ডিগ্রি নিচেও দিব্যি ঘোরাফেরা করা যায়।

হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি পায়ের সামনে চড়ুই পাখির মতো কালো রঙের একটা পাখি 'চিকু চিকু' ধরনের শব্দ করছে। মনে হলো শীতে আড়ষ্ট হয়ে গেছে। আমি পাখিটিকে হাতে উঠিয়ে নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সে আমার আঙুলে ঠোঁট ঘষতে লাগল। আমার মনে হলো পাখিদের কায়দায় সে বলল, তোমাকে ধন্যবাদ। আমি তাকে নিয়ে বাসায় ফিরে এলাম। উদ্দেশ্য, আমার কন্যাকে পাখিটা দেব। সে জীবন্ত খেলনা পেয়ে উল্লসিত হবে। শিশুদের উল্লাস দেখতে বড় ভালো লাগে।

আমার কন্যা পাখি দেখে মোটেই উল্লসিত হলো না। ভয় পেয়ে চেঁচাতে লাগল। মুগ্ধ হলো মেয়ের মা। সে বারবার বলতে লাগল, ও মা কী সুন্দর পাখি! ঠোটগুলো দেখো, মনে হচ্ছে চব্বিশ ক্যারেট গোল্ডের তৈরি। সে পাখিকে পানি খেতে দিল, ময়দা গুলে দিল। পাখি কিছুই স্পর্শ করল না। একটু পরপর বলতে লাগল 'চিকু চিকু'। ক্লাসের দেরি হয়ে যাচ্ছিল, আমি ক্লাসে চলে গেলাম। পাখির কথা আর মনে রইল না।

বিকেল তিনটার দিকে আমার কাছে একটা টেলিফোন এল। এক আমেরিকান তরুণী খুবই পলিশড গলায় বলল, মিঃ আমেদ, তুমি কি কোনো পাখি কুড়িয়ে পেয়েছ ?

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, হ্যাঁ, কিন্তু তুমি এই খবর জানলে কোত্থেকে ?

আমার বস আমাকে বললেন, আমি ফারগো পশুপাখি ক্লেশ নিবারণ সমিতির অফিস থেকে বলছি।

আমি আতঙ্কিত গলায় বললাম, পাখিকে বাসায় নিয়ে যাওয়া কি বেআইনি ?

না, বেআইনি নয়। আমরা তোমার পাখিকে পরীক্ষা করতে চাই। মনে হচ্ছে ওর ডানা ভেঙে গেছে।

আমি কি পাখিকে নিয়ে আসব ?

তোমাকে আসতে হবে না, আমাদের লোক গিয়ে নিয়ে আসবে। তোমার অ্যাপার্টমেন্টের নাম্বার বলো।

আমি নাম্বার বললাম। এবং মনে মনে ভাবলাম, এ-কী যন্ত্রণায় পড়া গেল!

বাসায় এসে দেখি পাখিটির জন্যে আমার স্ত্রী কার্ডবোর্ডের একটা বাসা বানিয়েছে। নানান খাদ্যদ্রব্য তাকে দেওয়া হচ্ছে। সে কিছু কিছু খাচ্ছেও। তবে আমার কন্যার ভয় ভাঙেনি। সে মার কোল থেকে নামছে না। পাখির কাছে নিয়ে গেলেই চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করছে।

আমার স্ত্রীর কাছে শুনলাম পাশের অ্যাপার্টমেন্টের এক মহিলা এসেছিলেন বেড়াতে, পাখি দেখে তিনিই টেলিফোন করেন।

পশুপাখি ক্লেশ নিবারণ সমিতির লোক এসে সন্ধ্যার আগে পাখি নিয়ে গেল। রাত আটটায় টেলিফোন করে জানাল যে পাখিটার ডানা ভাঙা। এক্সরেতে ধরা পড়েছে। তাকে পশু হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে ডানা জোড়া লাগানো যায়। যদিও এসব ক্ষেত্রে চেষ্টা সাধারণত ফলপ্রসূ হয় না।

আমি মনে মনে ভাবলাম, এ তো দেখি ভালো যন্ত্রণা হলো। মুখে বললাম, আমি খুবই আনন্দিত যে পাখিটার একটা গতি হচ্ছে। পাখি নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তায় ছিলাম।

সাতদিন কেটে গেল। পাখির কথা প্রায় ভুলতে বসেছি, তখন টেলিফোন এল হাসপাতাল থেকে। ডাক্তার সাহেব আনন্দিত গলায় বললেন, ডানা জোড়া লেগেছে।

আমি বললাম, ধন্যবাদ। আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

পাখিটি তোমার কোছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তার কোনো প্রয়োজন দেখছি না। আমার মেয়ে এই পাখি ঠিক পছন্দ করছে না। সে উলের কাঁটা দিয়ে খুঁচিয়ে পাখিটাকে মেরে ফেলতে পারে বলে আমার ধারণা।

তাহলে তো বিরাট সমস্যা হলো।

কী সমস্যা ?

দেখো, এটা হচ্ছে মাইগ্রেটরি বার্ড। শীতের সময়ে গরমের দেশে উড়ে চলে যায়। সমস্যাটা হলো ফারগোতে শীত পড়ে গেছে। এই গোত্রের পাখি সব উড়ে চলে গেছে। একমাত্র তোমার পাখিটিই যেতে পারেনি।

এখন করণীয় কী ?

ছ'মাস পাখিটাকে পালতে হবে। গোটা শীতকালটা তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

আমি তোমাকে আগেই বলেছি আমার পক্ষে সম্ভব না।

আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবলাম, কোন কুক্ষণে না জানি এই পাখি ঘরে এনেছিলাম।

একদিন পর আবার পশুপখি ক্লেশ নিবারণ সমিতির বড়কর্তার টেলিফোন, আমেদ, তুমি নাকি তোমার পাখি নিতে রাজি হচ্ছ না ?

এটা আমার পাখি না। বনের পাখি। খানিকক্ষণের জন্যে বাসায় নিয়ে গিয়েছিলাম।

পাখিটির এই দুঃসময়ে তুমি তার পাশে দাঁড়াবে না ? এই মাইগ্রেটরি পাখি যাবে কোথায় ?

আমি খাঁটি বাংলা ভাষায় বললাম, জাহান্নামে যাক।

তুমি কী বললে ?

বললাম যে তোমরা একটা ব্যবস্থা করো। আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আমার মেয়ে পাখি পছন্দ করে না। আমি বরং এই ছ'মাস পাখিটিকে বাঁচিয়ে রাখতে যা খরচ হয় তা দিতে রাজি আছি।

ভদ্রলোক বললেন, দেখি কী করা যায়।

বাকি দিনগুলি আতঙ্কের মধ্যে কাটতে লাগল। টেলিফোন বাজলেই চমকে উঠি, ভাবি, এই বুঝি পশুপাখিওয়ালারা নতুন ঝামেলা করছে।

দিন দশেক পার হলো। আমি হাঁপ ছেড়ে ভাবলাম, যাক আপদ চুকেছে। তখন আবার টেলিফোন। সেই পশুপাখি ক্লেশ নিবারণ সমিতি। তবে এবার তাদের গলায় আনন্দ ঝরে পড়ছে।

আমেদ, সুসংবাদ আছে।

কী সুসংবাদ ?

তোমার পাখির একটা গতি করা গেছে।

তাই নাকি ? বাহ, কী চমৎকার!

আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি, সিয়াটল ওয়াশিংটনে এই পাখি এখনো আছে। সিয়াটলে শীত এখনো তেমন পড়েনি। কাজেই পাখিরা মাইগ্রেট করেনি।

বলো কী ?

আমরা তোমার পাখিটি সিয়াটল পাঠিয়ে দিচ্ছি। সিয়াটলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে, সে অন্য পাখিদের সঙ্গে মিশে মাইগ্রেট করবে।

অসাধারণ।

আগামী মঙ্গলবার পাখিটি সিয়াটল যাচ্ছে। তুমি বেলা তিনটায় গ্রেহাউন্ড বাস স্টেশনে চলে আসবে। শেষবারের মতো তোমার পাখিটাকে 'হ্যালো' বলবে।

অবশ্যই বলব।

সিয়াটল ফার্গো থেকে তিন হাজার মাইল দূরে। পাখিটাকে খাঁচায় করে গ্রে হাউন্ড বাসের ড্রাইভারের হাতে তুলে দেওয়া হলো। আমি হাত নেড়ে পাখিটাকে বাই জানালাম।

মনে মনে বললাম, এই আমেরিকানরাই মাই লাই হত্যাকাণ্ড ঘটায়। বোমা ফেলে হিরোশিমা নাগাশিকিতে। কী করে তা সম্ভব হয় কে জানে!

ক্যাম্পে

আমার বরাবরই সন্দেহ ছিল আমেরিকানরা জাতি হিসেবে আধাপাগল। এদের রক্তে পাগলামি মিশে আছে। এমন সব কাণ্ডকারখানা করে যা বিদেশী হিসেবে বিস্মিত হওয়া ছাড়া আমাদের কিছু করার থাকে না। যেমন ওদের ক্যাম্পিং-এর ব্যাপারটা ধরা যাক। আগে ক্যাম্পিং বিষয়ে কিছুই জানতাম না। কেউ আমাকে কিছু বলেওনি। নিজেই লক্ষ করলাম, সামারের ছুটিতে দলবল নিয়ে এরা কোথায় যায়। ফিরে আসে কাকতাড়ুয়া হয়ে, গায়ের চামড়া খসখসে, চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, চুল উস্কুখুস্কু। ওজনও অনেক কমে গেছে। সেই কারণেই হয়তো সবাইকে খানিকটা লম্বা দেখায়। কোথায় গিয়েছিলে জিজ্ঞেস করলে বলে, ক্যাম্পে।

সেটা কী ?

ক্যাম্পিং কী তুমি জানো না ?

না।

আমার 'না' শুনে তারা এমন একটি ভঙ্গি করে—যেন আমার মতো জংলি এ দেশে কেন এল তা তারা বুঝতে পারছে না।

খোঁজ নিয়ে জানলাম প্রতিটি আমেরিকান পরিবার বছরে খানিকটা সময় জঙ্গলে কাটায়। তাঁবুটাবু নিয়ে কোনো এক বিজন বনে চলে যায়। একে তারা বলে প্রকৃতির কাছাকাছি চলে যাওয়া।

ল্যাবরেটরিতে আমার সঙ্গে কাজ করে কোয়ান্ডাল। সে তার ছেলেবন্ধুকে নিয়ে ক্যাম্পিং-এ গেল। ফিরে এল হাতে এবং পায়ে গভীর ক্ষতচিহ্ন নিয়ে। গিজলি বিয়ার (প্রকাণ্ড ভালুক) নাকি তাদের তাঁবু আক্রমণ করেছিল। ভয়াবহ ব্যাপার। অথচ রুথ কোয়ান্ডাল এমন ভাব করছে যেন জীবনে এরকম ফান হয়নি। আমি মনে মনে বললাম, বদ্ধ উন্মাদ।

উন্মাদ রোগ সম্ভবত ছোঁয়াচে, কারণ পরের বছর আমি নিজেও ক্যাম্পিং-এ যাব বলে ঠিক করে ফেললাম। দেখাই যাক ব্যাপারটা কী। আমার দ্বিতীয় মেয়েটির বয়স তখন তিন মাস। ফার্গো শহরে যে কটি বাঙালি পরিবার সে সময় ছিল সবাই আমাকে আটকাবার চেষ্টা করল। তাদের যুক্তি—এত বাচ্চা একটা মেয়ে নিয়ে এরকম পাগলামির কোনো মানে হয় না। মানুষের উপদেশ আমি খুব মন দিয়ে শুনি, তবে উপদেশমতো কখনো কিছু করি না। কাজেই চল্লিশ ডলার দিয়ে ইউনিভার্সিটি থেকে একটা তাঁবু ভাড়া করলাম, একটা এলুমিনিয়ামের নৌকা ভাড়া করলাম, আর ভাড়া করলাম ক্যাম্পিং-এর জিনিসপত্র। সেইসব জিনিসপত্রের মধ্যে আছে কুড়াল, ফার্স্ট এইড বক্স, সাপে কাটার ওষুধ, এবং কী আশ্চর্য একটা হারিকেন। খোদ আমেরিকাতেও যে কেরোসিনের হারিকেন পাওয়া যায় কে জানত।

যথাসময়ে গাড়ির ছাদে নৌকা বেঁধে রওয়ানা হয়ে গেলাম। গায়ে ক্যাম্পিং-এর পোশাক—হাফপ্যান্ট এবং বস্তার মতো মোটা কাপড়ের ফ্ল্যাপ দেয়া শার্ট, মাথায় ক্রিকেট আম্পায়ারদের টুপির মতো ধবধবে সাদা টুপি। গাড়ি চলছে ঝড়ের গতিতে। বনে

যাওয়ার এই হচ্ছে নিয়ম। স্পীডিং-এর জন্যে পুলিশ অবশ্যই গাড়ি থামাবে, তবে যখন বুঝবে এই দল ক্যাম্পিং-এ যাচ্ছে তখন কিছু বলবে না। ক্যাম্পিং-এর প্রতি সবারই কিছুটা দুর্বলতা আছে।

ফার্গো শহর থেকে দু'শ দশ কিলোমিটার দূরে একটা ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডে গাড়ি থামালাম। সমস্ত আমেরিকা জুড়ে অসংখ্য ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডে ঢোকা যায়। সেখানে ছোটখাটো একটা অফিস থাকে। বিজন জংলি জায়গা হলেও অফিসটা খুব আধুনিক হয়। টেলিফোনের ব্যবস্থা থাকে, ছোটখাটো বার থাকে, গ্রোসারি শপ এবং বেশ কিছু ভেন্ডিং মেশিন থাকে। সাধারণত স্বামী-স্ত্রী মিলে অফিস এবং দোকানপাট দেখাশোনা করেন।

আমার গাড়ি ঢোকা মাত্রই ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডের ওয়ার্ডেন বিশালদেহী এক আমেরিকান বের হয়ে এল এবং অনেকটা মুখস্থ বক্তৃতার মতো বলল, তুমি চমৎকার একটি জায়গায় এসেছ। এর চেয়ে ভালো ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড নর্থ আমেরিকায় আর নেই। আমরা তুলনামূলকভাবে টাকা বেশি নিই, তবে একরাত কাটালেই বুঝতে পারবে কেন নিই। এমন অপূর্ব দৃশ্য তুমি কোথাও পাবে না। তোমার সামনে সল্ট হ্রদের নীল জলরাশি, পেছনে গভীর বন। এছাড়াও তুমি পাচ্ছ আধুনিক জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ, যেমন খবরের কাগজ এবং ফ্ল্যাস টয়লেট...

ভদ্রলোকের বক্তৃতার মাঝখানেই আমি বললাম, কত দিতে হবে ?

দেখা গেল টাকার পরিমাণ আসলেই অনেক বেশি। হ্রদে নৌকা ভাসানোর জন্যে ফি দিতে হলো, মাছ কেনার জন্যে পারমিট কিনতে হলো... নানান ফ্যাকড়া।

ঝামেলা মিটিয়ে রওয়ানা হলাম জায়গা বাছতে। কোথায় তাঁবু ফেলব সেই জায়গা। ওয়ার্ডেনের স্ত্রী (উনার সাইজও কিংকং-এর মতো) আমাকে সাহায্য করতে নিজেই এগিয়ে এলেন। হ্রদের পাশে এসে চোখ জুড়িয়ে গেল। কাচের মতো স্বচ্ছ জল। দশ ফুট নিচের পাথরের খণ্ডটিও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। হ্রদ যত না সুন্দর পেছনের অরণ্য তার চেয়েও সুন্দর। যে-কোনো সুন্দর জিনিসের সঙ্গে খানিকটা বিষণ্নতা মেশানো থাকে। আমার মন বিষণ্ন হয়ে গেল। গুলতেকিন বলছে, এত সুন্দর! এত সন্দুর!

হ্রদের কাছাকাছি তাঁবু খাটাবার জায়গা ঠিক করে কিংকং ভদ্রমহিলাকে ধন্যবাদ জানালাম। ভদ্রমহিলা যাওয়ার আগে বলে গেলেন, ক্যাম্পিং-এর যাবতীয় জিনিসপত্র নামমাত্র মূল্যে তাদের কাছে ভাড়া পাওয়া যাবে। তবে তারা চেক গ্রহণ করেন না। পেমেন্ট হবে ক্যাশে।

সকাল এগারোটার মতো বাজে। ঝকঝকে রোদ উঠেছে, বাতাসে ঘাসের বিচিত্র গন্ধ, চারদিক ঝিঁঝিঁ। ফ্ল্যাস্কভর্তি করে চা এনেছিলাম। চা শেষ করে প্রবল উৎসাহে তাঁবু খাটাতে লেগে গেলাম। তাঁবুর সঙ্গে একটা ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়েল আছে। কোন খুঁটি কীভাবে পুঁততে হয়, তাঁবুর কোন আংটা কোন খুঁটিতে যাবে সব পরিষ্কার করে লেখা। কাজটা খুবই সহজ মনে হলো। ঘণ্টাখানেক পার হওয়ার পর বুঝলাম কাগজপত্রে কাজটা যত সহজ মনে হচ্ছিল আসলে তত সহজ নয়। তাঁবুর একটা দিক যখন কোনো

মতে দাঁড়ায় তখন অন্য দিক ঝুলে পড়ে। সেইটা ঠিক করতে যখন যাই তখন গোটা তাঁবু মাটিতে শুয়ে পড়ে। আমার স্ত্রী এই দু'ঘণ্টায় পঞ্চাশবারের মতো ঘোষণা করল যে, আমার মতো অকর্মণ্য মানুষ সে আর দেখেনি। সে হলে দশ মিনিটের মাথায় নাকি তাঁবু ঠিক করে ফেলত। আমি তাকে তার প্রতিভা প্রমাণ করার সুযোগ দিলাম। এবং আরও এক ঘণ্টা নষ্ট হলো। দেখা গেল তাঁবু খাটানোয় তার প্রতিভা আমার মতোই।

আমাদের তাঁবু কেমন খাটানো হয়েছে দেখার জন্যে ওয়ার্ডেনের স্ত্রী বিকেলের দিকে এলেন এবং বললেন, সামান্য ফিসের বিনিময়ে তাঁবু খাটানোর কাজটা তাঁরা করে দেন।

ফি দেওয়া হলো এবং চমৎকার তাঁবু তারা খাটিয়ে দিল। দুপুরে আমাদের কিছু খাওয়া হয়নি। খিদেয় প্রাণ বের হয়ে যাচ্ছে। বন থেকে কুড়াল দিয়ে কাঠ কেটে এনে আগুনে মাংস ঝলসে খাওয়াই হচ্ছে নিয়ম।

কাঠ যোগাড় হলো, কিন্তু কিছুতেই আগুন ধরানো গেল না। কেরোসিন ঢেলে দিলে আগুন জ্বলে ওঠে, খানিকক্ষণ জ্বলে তারপর আর নেই। আমি ওয়ার্ডেনের স্ত্রীকে (মিসেস সিমসন) গিয়ে বললাম, আপনি কি সামান্য ফিসের বিনিময়ে আমাদের চুলাটা ধরিয়ে দিবেন ?

ভদ্রমহিলা আমার রসিকতায় খুবই বিরক্ত হলেন এবং গম্ভীর গলায় বললেন, কেরোসিন কুকার পাওয় যায়। তার একটি নিতে পার।

দশ ডলার দিয়ে কোরোসিন কুকার ভাড়া করলাম। দুপুরে লাঞ্চ শেষ হলো সন্ধ্যার আগে আগে। আমাদের মতো প্রচুর ক্যাম্পযাত্রী এখানে এসেছে, তবে তারা সবাই চলে গেছে বনের দিকে। জলের দেশের মানুষ বলে আমরাই একমাত্র জলের কাছাকাছি আছি। বনের চেয়ে জল আমাকে বেশি আকর্ষণ করে।

সন্ধ্যায় নৌকায় খানিকক্ষণ বেড়ালাম। আমেরিকান নিয়ম অনুযায়ী সবার জন্যে লাইফ জ্যাকেট ভাড়া করতে হলো, আরও কিছু টাকা পেলেন মিসেস সিমসন। নৌকায় থাকতে থাকতে চাঁদ উঠে গেল। বিশাল চাঁদ। পঞ্জিকা দেখে রওয়ানা হইনি। পাকেচক্রে পূর্ণিমার মধ্যে পড়ে গেছি। হ্রদের নিস্তরঙ্গ জলে চাঁদের ছায়া, দূরে বনরাজি, পাখপাখালির ডাক, অদ্ভুত পরিবেশ। আমি চিরকাল শহরবাসী, কাজেই পুরোপুরি হকচকিয়ে গেলাম। বারবার মনে হচ্ছে স্বর্গের যেসব বর্ণনা ধর্মগ্রন্থগুলিতে আছে সেই স্বর্গ কি এর চেয়েও সুন্দর ?

তাঁবুতে ফিরলাম সন্ধ্যা মিলাবার অনেক পরে। গুলতেকিন রাতের খাবার রাঁধতে বসল। আমি বড় মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে বের হলাম। সে বলল, এই বনে কি বাঘ আছে ?

আমি বললাম, আছে।

সে বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, বাঘ আমাদের কখন খেয়ে ফেলবে বাবা ?

জগতের সত্যগুলি শিশুরা খুব স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে। কখনোই তেমন বিচলিত হয় না। শিশুদের কাছে আমাদের অনেক কিছু শিখবার আছে।

দূর্বাঘাসের চাদরে আদিগন্ত ঢাকা। বড় গাছগুলির অধিকাংশের নাম আমি জানি না। উইলী, ওক এবং ইউক্লিপটাস চিনতে পারছি। চাঁদের আলোয় চেনা গাছগুলিকেও অচেনা লাগছে।

একসময় আমাকে থমকে দাঁড়াতে হলো। যে দৃশ্যটা চোখে পড়ল তার জন্যে আমার প্রাচ্যদেশীয় চোখ প্রস্তুত ছিল না। একদল তরুণ-তরুণী বনের ভেতর ছোটাছুটি করছে। তাদের গায়ে কাপড়ের কোনো বালাই নেই।

আমি শুনেছি আমেরিকানরা গভীর বনে প্রবেশ করার পর সভ্যতার শিকল—কাপড়চোপড় খুলে ফেলে। ফিরে যায় আদম এবং হাওয়ার যুগে। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা যার নাম। এই দৃশ্য নিজের চোখে কখনো দেখব তা ভাবিনি।

দৃশ্যটি আমার কাছে মোটেই অস্বাভাবিক বা অশ্লীল মনে হলো না। বরং মনে হলো এটাই স্বাভাবিক, এটাই হওয়া উচিত।

আমার মেয়ে বলল, বাবা ওদের কি খুব গরম লাগছে?

আমি বললাম, হ্যাঁ, চলো আমরা ফিরে যাই।

আমি অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইলাম। কত রাত তা জানা হলো না, ঘড়ি দেখতে ইচ্ছে করল না। মেয়ে দুটি তাঁবুতে ঘুমাচ্ছে। আমি এবং গুলতেকিন তাঁবুর বাইরে বসে আছি। স্বামী-স্ত্রীরা প্রেমিক-প্রেমিকার মতো ভালোবাসাবাসির কথা কখনো বলে না। সেই রাতে আমরা বিয়ের আগের সময়ে কেমন করে যেন ফিরে গেলাম। পাশে বসা তরুণীটিকে অচেনা মনে হতে লাগল। বারবার মনে হচ্ছিল—এত আনন্দ আছে পৃথিবীতে!

ভোরবেলায় সূর্যোদয় দেখা আমার কখনো হয়ে ওঠে না। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার অনেক রাতে ঘুমুতে যাওয়ার পরেও জেগে উঠলাম সূর্য ওঠার আগে।

সূর্যোদয়ের দৃশ্যটি এত সুন্দর কখনো ভাবিনি। আগে জানতাম না, সূর্যটাকে ডিমের কুসুমের মতো দেখায়, জানতাম না ভোরবেলায় সূর্য এত বড় থাকে। এই সূর্য আকাশে লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে, তাও জানা ছিল না।

সকালে নাশতা হলো দুধ এবং সিরিয়েলের। নাশতার পর দলবল নিয়ে মাছ ধরতে বের হলাম। আমেরিকায় বড়শি দিয়ে মাছ ধরতে চাইলে স্টেট গভর্নমেন্টের কাছ থেকে লাইসেন্স করতে হয়। লাইসেন্সের ফি পনেরো ডলার। লাইসেন্স করা ছিল, তারপরও বুড়ি সিমসনকে পাঁচ ডলার দিতে হলো। এটা নাকি লেক রক্ষণাবেক্ষণের ফি। বড়শি ফেলে মূর্তির মতো বসে থাকার কাজটি খুব আনন্দদায়ক হবে মনে করার কোনো কারণ নেই—তবু যেহেতু লাইসেন্স করেছি কাজেই বসে রইলাম। শুনেছিলাম আমেরিকান লেকভর্তি মাছ, টোপ ফেলতে হয় না, সুতা ফেললেই হয়, সুতা কামড়ে মাছ উঠে আসে। বাস্তবে সেরকম কিছু ঘটল না। আমি পুরো পরিবার নিয়ে মাছ ধরার আশায় ঝাঁ ঝাঁ রোদে তিন ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম। মাছের দেখা নেই। একসময় বুড়ি সিমসন এসে উদয়

হলেন এবং গম্ভীর গলায় বললেন, লেকের কোন জায়গায় মাছ টোপ খায় এবং কখন কীভাবে বড়শি ফেলতে হয় সেই বিষয়ে তাদের একটি বুকলেট আছে, সামান্য অর্থের বিনিময়ে তা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

সমুদ্রে পেতেছি শয্যা, শিশিরে কী ভয় ? কিনলাম বুকলেট এবং সঙ্গে সঙ্গে ফল লাভ। বিশাল এক নরদার্ণ পাইক ধরে ফেললাম। এই আমার জীবনে প্রথম এবং শেষ মৎস্য শিকার। আমার বড় মেয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল, বাবা, এটা কি তিমি মাছ ? বাবা, আমরা কি একটা তিমি মাছ ধরে ফেলেছি ?

দুপুরে লাঞ্চ হলো সেই মাছ। ওয়েস্টার্ন ছবির কায়দায় আগুনে ঝলসিয়ে লবণ ছিটিয়ে খাওয়া। অন্যসময় এই মাছ আমি মুখেও দিতে পারতাম না। কিন্তু পরিবেশের কারণে সেই আগুনে ঝলসানো অখাদ্যকেও মনে হলো স্বর্গের কোনো খাবার।

লাঞ্চ শেষ হওয়ার আগেই একটা দুঃসংবাদ পাওয়া গেল। জানা গেল ন'বছর বয়সী একটা ছেলে দলছুট হয়ে বনে হারিয়ে গেছে। ছেলেটির বাবা-মা ভাইবোন হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। কী করবে বুঝতে পারছে না। বনে হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা নতুন কিছু না।

টিভি এবং খবরের কাগজে প্রায়ই এরকম খবর আসে। গত বছর উনিশ বছর বয়সী একটা মেয়ে মন্টানার এক বনে হারিয়ে যায়। তাকে উদ্ধার করা হয় তের দিন পরে। সে এই তের দিন ব্যাঙ, সাপখোপ লতাপাতা খেয়ে বেঁচে ছিল। কেউ কেউ ইচ্ছে করেই বনে থেকে যায়। তেত্রিশ দিন পর হারিয়ে যাওয়া এক দম্পতিকে খুঁজে বের করার পর তারা বলেন, নাগরিক সভ্যতায় অতিষ্ঠ হয়ে তারা বনে আশ্রয় নিয়েছেন। তারা ভালোই আছেন। শহরে ফিরতে চান না।

ন'বছর বয়সী শিশুটির নিশ্চয়ই এরকম কোনো সমস্যা নেই। সে নিশ্চয়ই আতঙ্কে অস্থির হয়ে আছে। ক্যাম্পে সাজসাজ রব পড়ে গেল। স্টেট পুলিশকে খবর দেওয়া হলো। ঘণ্টাখানিকের মধ্যে দুটি হেলিকপ্টার বনের উপর দিয়ে চক্রাকারে উড়তে লাগল। হেলিকপ্টপার থেকে জানানো হলো বাচ্চাটিকে দেখা যাচ্ছে। একটা ফাঁকা জায়গায় আছে, নিজের মনে খেলছে। ভয়ের কিছু নেই।

বাচ্চাটিকে যখন উদ্ধার করা হলো, সে গম্ভীর গলায় বলল, আমি হারাব কেন ? আমার পকেটে তো কম্পাস আছে।

দুদিন থাকার পরিকল্পনা নিয়ে গিয়েছিলাম, এক সপ্তাহ থেকে গেলাম। মিসেস সিমসন একদিন এসে বললেন, তোমরা আর থেকো না। বেশিদিন থাকলে নেশা ধরে যাবে। আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করবে না। এই আমাদের দেখো, বছরের পর বছর এই জায়গায় পড়ে আছি। ঘণ্টাখানিকের জন্যেও শহরে গেলে দম বন্ধ হয়ে আসে।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। মিসেস সিমসন বললেন, সতেরো বছর আগে আমিও আমার স্বামীর সঙ্গে ক্যাম্পিং-এ এই জায়গায় এসেছিলাম। এতই ভালো লাগল যে, লিজ নিয়ে ক্যাম্পিং স্পট বানালাম। তারপর থেকে এখানেই আছি। বছরে তিনটা মাস লোকজনের দেখা পাই, তারপর দুজনে একা একা কাটাই।

কষ্ট হয় না ?

না। বনের অনেক রহস্যময় ব্যাপার আছে। তোমরা যারা দু'একদিনের জন্যে আসো, তারা তা ধরতে পার না। আমরা পারি। পারি বলেই...

মিসেস সিমসন তাঁর কথা শেষ করলেন না। আমি বললাম, রহস্যময় ব্যাপারগুলি কী ?

ঐ সব তোমরা বিশ্বাস করবে না। ঐ প্রসঙ্গ বাদ থাক।

তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বনের দিকে তাকালেন। রহস্যময় বন হয়তো কানে কানে তাকে কিছু বলল। দেখলাম তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

মিসেস সিমসন বললেন, একটা মজার ব্যাপার কী জানো ? সমুদ্র মানুষকে আকর্ষণ করে। এত যে সুন্দর সমুদ্র তার পাশেও তিন-চার দিনের বেশি মানুষ থাকতে পারে না। আর বন মানুষকে আকর্ষণ করে। মানুষকে সে চলে যেতে দেয় না। পুরোপুরি গ্রাস করতে চেষ্টা করে। কাজেই তোমরা চলে যাও।

আমরা চলে গেলাম।

সব মিলিয়ে সাত দিন ছিলাম। মিসেস সিমসন তিন দিনের ভাড়া রাখলেন। শান্ত গলায় বললেন, তোমরা তিন দিন থাকতে এসেছিলে সেই তিন দিনের রেন্ট-ই আমি রেখেছি। বাকি দিনগুলি কাটিয়েছ অতিথি হিসেবে। বনের অতিথি। বন তোমাদের আটকে রেখেছে। কাজেই সেই চার দিনের ভাড়া রাখার কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

নামে কী-বা আসে যায়

'সামার হলিডে' শুরু হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত সবার মনই এই সময় খানিকটা তরল অবস্থায় থাকে। অত্যন্ত কঠিন অধ্যাপককেও এই সময় নরম এবং আদুরে গলায় কথা বলতে দেখা যায়।

আমার অধ্যাপকের নাম জোসেফ এডওয়ার্ড গ্লাস। গ্লাস নামের সার্থকতা বুঝানোর জন্যেই হয়তো ভদ্রলোক কাচের মতো কঠিন এবং ধারালো। সামার হলিডের তারল্য তাঁকে স্পর্শ করেনি। ভোর ন'টায় ল্যাবে এসে দেখি সে একটা বিকারের কপার সালফেটের সল্যুসন বানিয়ে খুব ঝাঁকাচ্ছে। নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রচলিত প্রবাদ হচ্ছে, ভোরবেলা গ্লাসের সঙ্গে দেখা হলে সারাটা দিন খারাপ যাবে।

গ্লাসকে দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। প্রবাদের কারণে নয়। মন খারাপ হলো কারণ ব্যাটার আজ থেকে ছুটিতে যাওয়ার কথা। যায়নি যখন তখন বুঝতে হবে সে এই সামারে ছুটিতে যাবে না। ছুটির তিন মাস আমাকে জ্বালাবে। কারণ, জ্বালানোর জন্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি ল্যাবে নেই। সবাই ছুটি নিয়ে কেটে পড়েছে।

আমি প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে নিষ্প্রাণ গলায় বললাম, হাই।

গ্লাস আনন্দে সব ক'টা দাঁত বের করে বলল, তুমি আছ তাহলে। থ্যাংকস। এসো দু'জনে মিলে এই সল্যুশানটার ডিফারেনসিয়েল রিফ্রেকটিভ ইনডেক্স বের করে ফেলি।

আমি বললাম, এটা সম্ভব না। আমি আমার নিজের কাজ করব। এর মধ্যে তুমি আমাকে বিরক্ত না করলে খুশি হব।

বাংলাদেশের পাঠক-পাঠিকারা আমার জবাব শুনে হয়তো আঁতকে উঠেছেন। আমার পিএইচডি গাইড বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রায় ঈশ্বরের মতো ক্ষমতাবান একজন অধ্যাপকের সঙ্গে এই ভাষায় কথা বলা যায় কি না তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে না, তবে আমেরিকান চরিত্র সম্পর্কে যাদের কিছুটা ধারণা আছে, তারাই বুঝবেন আমার জবাব হচ্ছে যথাযথ জবাব।

প্রফেসর গ্লাস খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত মুখে বলল, হামাদ, এটা সামান্য কাজ। এক ঘণ্টাও লাগবে না।

আমি বললাম, আমাকে হামাদ ডাকছ কেন ? আমার নাম হুমায়ূন আহমেদ। হামাদটা তুমি পেলে কোথায় ?

নাম নিয়ে তুমি এত যন্ত্রণা করো কেন হামাদ ? নামে কী-বা যায় আসে ? আমি একজন ওল্ডম্যান। তোমাকে রিকোয়েস্ট করছি কাজটা করে দিতে। আর তুমি নাম নিয়ে যন্ত্রণা শুরু করে দিলে।

আমি ডিফারেনসিয়েল রিফ্রেকটিভ ইনডেক্স বের করে দিলাম। ঝাড়া পাঁচ ঘণ্টা লাগল। কোনো কিছুই হাতের কাছে নেই। সবাই ছুটিতে। নিজেকে ছোটাছুটি করে প্রত্যেকটি জিনিস জোগাড় করতে হয়েছে।

প্রফেসর গ্লাস আমার পাশেই চুরুট হাতে বসে খুব সম্ভব আমাকে খুশি রাখবার জন্যেই একের পর এক রসিকতা করছে। রসিকতাগুলোর সাধারণ নাম হচ্ছে ডার্টি জোকস। ভয়াবহ ধরনের অশ্লীল।

বিকেল পাঁচটায় ল্যাব বন্ধ করে বাসায় ফেরার আগে আগে গ্লাসের কামরায় উঁকি দিলাম। গ্লাস হাসিমুখে বলল, কিছু বলবে হামাদ ?

হ্যাঁ, বলব। আগেও কয়েকবার বলেছি। আজও বলব।

তোমার নামের উচ্চারণের ব্যাপার তো ?

হ্যাঁ।

উচ্চারণ করতে পারি না বলেই তো একটু এলোমেলে হয়ে যায়। এতে এত রাগ করার কী আছে ? আমেরিকনাদের জিহ্বা শক্ত।

আমেরিকানদের জিহ্বা মোটেই শক্ত নয়। অনেক কঠিন উচ্চারণ এরা অতি সহজেই করে। তোমরা যখন কোনো ফরাসি রেস্টুরেন্টে যাও তখন খাবারের ফরাসি নামগুলো খুব আগ্রহ করে উচ্চারণ করো না ?

গ্লাস গম্ভীর চোখে তাকিয়ে রইল। কিছু বলল না।

আমি বললাম, এসো আমার সঙ্গে। চেষ্টা করো, বলো হুমায়ূন।

গ্লাস বলল, হেমেন।

আমি বললাম, হলো না, আবার বলো হুমায়ূন। হু-মা-য়ূ-ন।

গ্লাস বলল, মায়ান।

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম। আমেরিকায় পা দেওয়ার পর থেকে যে জিনিসটি আমাকে পীড়া দিচ্ছে সেটা হচ্ছে শুদ্ধভাবে এরা বিদেশীদের নাম বলতে চায় না। ভেঙেচুরে এমন করে যে রাগে গা জ্বলে যায়। মোরহেড স্টেট ইউনিভার্সিটির মিজানুল হককে বলে হাকু। হাকু পারলে হক বলতে অসুবিধা কোথায় ? অন্য বিদেশীরা এই ব্যাপারটি কীভাবে নেয় আমি জানি না। আমার অসহ্য বোধ হয়।

হংকংয়ের চাইনিজ ছাত্রদের দেখেছি এ ব্যাপারে খুবই উদার। তারা আমেরিকানদের উচ্চারণ সাহায্য করার জন্যে নিজেদের চাইনিজ নাম পাল্টে পড়াশোনার সময়টার জন্যে একটা আমেরিকান নাম নিয়ে নেয়। যার নাম চ্যান ইয়েন সে হয়তো খণ্ডকালীন একটা নাম নিল, মিঃ ব্রাউন। দীর্ঘ চার বছরের ছাত্রজীবনে সবাই ডাকবে মিঃ ব্রাউন। যদিও তার আসল নাম চ্যান ইয়েন। হংকংয়ের চাইনিজগুলো এই কাজটি কেন করে কে জানে। আমি একজনকে জিজ্ঞেস করছিলাম। সে দার্শনিকের মতো বলল, ভুল উচ্চারণে আসল নাম বলার চেয়ে শুদ্ধ উচ্চারণে নকল নাম বলা ভালো। তাছাড়া নাম আমেরিকানদের কাছে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটা হচ্ছে ফাজিলের দেশ। নামের মধ্যেও এরা ফাজলামি করে। তাই না ?

নাম নিয়ে যে এরা যথেষ্ট ফাজলামি করে সে সম্পর্কে সন্দেহের কারণ নেই। এরা পশুর নামে নাম রাখে যেমন, Mr. Fox, Mr. Lion, Mr. Lamb. এরা কীটপতঙ্গের নামে নাম রাখে যেমন, Mr. Beetle (গুবরে পোকা)। একটা নাম পেয়েছিলাম যার বাংলা মানে—ষাঁড়ের গোবর (Mr. Bull dung Junior)। অবশ্যি বাংলা ভাষাতেও খাদু, গেদা ধরনের নাম রাখা হয়। তবে সেসব নাম নিয়ে আমরা বড়াই করি না। আমেরিকানরা করে। আমি একজন আন্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্র পেয়েছিলাম, সে খুবই বড়াই করে বলল, আমার নাম Back Bison (বাইসনের পাছা)।

ধরাকে সরা জ্ঞান করার একটা প্রবণতা আমেরিকানদের আছে। ঢাকা শহরে একবার এক আমেরিকানকে খালি গায়ে হাফপ্যান্ট পরা অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে যেতে দেখেছি। গাড়িতে একজন বাঙালি তরুণী এবং দুইজন বাঙালি যুবক। আমি জানি না, তবে আমার বিশ্বাস, আমেরিকানটির খালি গায়ে গাড়ি চালানোর যুক্তি বোধহয় এদেশে গরম। আমাদের প্রাচ্যদেশীয় সভ্যতায় এই আচরণ গ্রহণযোগ্য নয়, এটা তারা জেনেও এই কাজ করবে। ভাবটা এরকম, আমরা কোনো কিছুই পরোয়া করি না। এরা যখন আমাদের দেশে আসবে তখন আমাদের আচার-আচরণকে সম্মান করবে এটা, আমার বিশ্বাস, আশা করব। তারা যখন তা করবে না তখন মনে করিয়ে দেব যে তারা যা করছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা প্রায় কখনোই তা করি না। সাদা চামড়া দেখলে এখনো আমাদের হুঁশ থাকে না। যাক পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

আমি খুব যে একজন বিপ্লবী ধরনের ছেলে তা নয়। বড় বড় অন্যায় দেখি কিন্তু তেমন কোনো সাড়াশব্দ করি না। সবসময় মনে হয় প্রতিবাদ অন্যেরা করবে, আমার ঝামেলায় যাওয়ার দরকার নেই। তবু বিকৃত উচ্চারণে বিদেশীদের নাম বলাটা কেন জানি শুরু থেকেই সহ্য হলো না। একটা আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করলাম, যাতে আমেরিকনারা শুদ্ধ নামে ডাকার একটা চেষ্টা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের খবরের কাগজে চিঠি লিখলাম, আমার যুক্তি আমেরিকানরা ইচ্ছে করে বিদেশীদের ভুল উচ্চারণে ডাকে। উদাহরণ হচ্ছে, শীলা। নামটা সঠিক উচ্চারণ না করতে পারার কোনোই কারণ নেই। এর কাছাকাছি নাম তাদের আছে। কিন্তু যেই তারা দেখবে এই নামটা একজন বিদেশীর, অমনি উচ্চারণ করবে—শেইল (Sheila)। এর মানে কী ?

সাত বছর ছিলাম আমেরিকায়। এই সাত বছর অনেক চেষ্টা করলাম ওদের দিয়ে শুদ্ধভাবে আমার নামটা বলাতে। পারলাম না। ফল এই হলো যে, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় রটে গেল 'হামাম' নামের এই ছেলের মাথায় খানিকটা গণ্ডগোল আছে। তবে ছেলে ভালো।

বিদেশের পড়াশানো শেষ করে দেশে ফিরে আসছি। আমার দেশে ফিরে যাওয়া উপলক্ষে প্রফেসর গ্লাস তার বাড়িতে একটা পার্টি দিলেন। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার, এই পার্টিতে প্রথমবারের মতো সে শুদ্ধ উচ্চারণ করল। আমার দীর্ঘদিনের আন্দোলনের সুন্দর পরিণতি। আমার ভালো লাগার কথা। আনন্দিত হওয়ার কথা। কেন জানি ভালো লাগল না।

গ্লাস গাড়িতে করে আমাকে পৌঁছে দিচ্ছে।

আমি বললাম, এই তো সুন্দর করে তুমি আমার নাম বলতে পারছ। আগে কেন বলতে পারতে না ?

গ্লাস খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, বিদেশীদের আমরা একটু আলাদা করে দেখি। আমরা তাদের রহস্যময়তা ভাঙতে চাই না। তাদের অন্যরকম করে ডাকি। অন্য কিছু না।

অধ্যাপক গ্লাসের কথা কতটুকু সত্যি আমি জানি না। সে যেভাবে ব্যাপারটাকে দেখেছে অন্যরাও সেভাবে দেখেছে কি না তাও জানি না। গ্লাসের কথা আমার ভালোই লাগল। আমি হাসিমুখে বললাম, তুমি আমাকে তোমার মতো করেই ডাকো।

বিদায় নিয়ে যাওয়ার ঠিক আগমুহূর্তে গ্লাস বলল, হামান, ভালো থেকো এবং আগলি আমেরিকানদের কথা মনে রেখো।

আখ্যানমালা মিসির আলি

নিশিথিনী

মিসির আলির ধারণা ছিল, তিনি সহজে বিরক্ত হন না। এই ধারণাটা আজ ভেঙে যেতে শুরু করেছে। ঠিক এই মুহূর্তে তিনি অসম্ভব বিরক্ত। যে রিকশায় তিনি উঠেছেন, তার সিটটা ঢালু। বসে থাকা কষ্টের ব্যাপার। তারচেয়েও বড় কথা, দু'মিনিট পরপর রিকশার চেইন পড়ে যাচ্ছে।

এখন বাজছে দশটা তেইশ। সাড়ে দশটায় থার্ড ইয়ার অনার্সের সঙ্গে তাঁর একটা টিউটরিয়াল আছে। এটা কোনোক্রমেই ধরা যাবে না। যে-হারে রিকশা এগুচ্ছে, তাতে ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছতে তাঁর আরও পনের মিনিট লাগবে। একালের ছাত্ররা এতক্ষণ তাদের টিচারের জন্যে অপেক্ষা করে না।

মিসির আলি তাঁর বিরক্তি ঢাকবার জন্যে একটা সিগারেট ধরালেন। ঠিক তখন পঞ্চমবারের মতো রিকশার চেইন পড়ে গেল। রিকশাওয়ালার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে চেইন পড়ার ব্যাপারটায় সে আনন্দিত। গদাইলশকরী চালে সে নামল এবং সামনের চাকাটা তুলে ঝাঁকাঝাঁকি করতে লাগল।

চেইন পড়ে গেলে কেউ চাকা তুলে ঝাঁকাঝাঁকি করে বলে তাঁর জানা ছিল না। রুক্ষ গলায় বললেন, এরকম করছ কেন ?

রিকশাওয়ালা জবাব দিল না। গরম চোখে তাকাল এবং মিসির আলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে একটা বিড়ি ধরাল। মিসির আলি রাগ সামলাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কুড়ি থেকে এক পর্যন্ত উল্টোদিকে গুনলেন। জীবনানন্দ দাশের 'মনে হয় একদিন' কবিতার প্রথম চার লাইন মৃদুস্বরে আওড়ালেন। মিসির আলির ধারণা, কিছু কিছু কবিতা মানুষের অস্থিরতা কমিয়ে দেয়। 'মনে হয় একদিন' এমন একটি কবিতা।

কিন্তু আজ তাঁর রাগ কমছে না। রিকশাওয়ালা কঠিন মুখ করে নির্বিকার ভঙ্গিতে বিড়ি টানছে। মিসির আলির দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না।

মিসির আলি নিজেকে সামলাবার জন্যেই ভাবতে লাগলেন—তিনি নিজে যদি সিগারেট ধরাতে পারেন, তাহলে এই লোকটি পারবে না কেন ? জুন মাসের প্রচণ্ড গরমে বেচারা ক্লান্ত ও বিরক্ত। একজন ক্লান্ত ও বিরক্ত মানুষের নিশ্চয়ই বিশ্রাম করার অধিকার আছে। তিনি হালকা গলায় বললেন, নাম কী তোমার ?

সামসু।

বাড়ি কোথায় তোমার সামসু ?

বাড়িঘর নাই।

দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার। সামসু রিকশা চালাও। ক্লাস মিস হবে।

সামসু কোনো পাত্তাই দিল না। রাস্তার পাশে পেচ্ছাব করতে বসে গেল। তার বসার ভঙ্গি থেকেই বোঝা যাচ্ছে সে সহজে উঠবে না, বসেই থাকবে। এই লোকটি কি কোনো অজ্ঞাত কারণে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করছে ?

মিসির আলি রিকশা থেকে নেমে পড়লেন। পাঁচ টাকা ভাড়া ঠিক করা ছিল, তিনি ছ'টাকা দিলেন। সহজ স্বরে বললেন, নাও, ভাড়া নাও। আমি হেঁটে চলে যাব।

সাধারণত রিকশাওয়ালাদের সবচেয়ে ময়লা ন্যাতন্যাতে নোটগুলো দেওয়া হয়। মিসির আলি তাকে দিয়েছেন চকচকে নতুন নোট। এটা তিনি করলেন এই আশায়, যাতে সামসু নামের এই উদ্ধত যুবকটি তাঁর আচরণের জন্যে লজ্জিত বোধ করে।

এরকম কাণ্ডকারখানা মিসির আলি সাহেব করে থাকেন। একবার বাসে তাঁর পাশে সুখী-সুখী চেহারার এক বুড়ো বসল। দু'জনের সিট। কিন্তু বুড়ো অকারণে পা ফাঁক করে তাকে চাপ দিতে লাগল। বিশ্রী কাণ্ড। মিসির আলি খানিকক্ষণ চাপ সহ্য করলেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললেন, আপনার বোধহয় অল্প জায়গায় বসার অভ্যেস নেই, আপনি বরং একাই এখানে আরাম করে বসুন।

মিসির আলি ভেবেছিলেন, লোকটি এতে লজ্জিত ও বিব্রত হবে। সেরকম কিছু হলো না। লোকটি নির্বিকার ভঙ্গিতে দু'জনের জায়গা দখল করে পা দোলাতে লাগল। এরা অসুখী মানুষ। নিজেদের ব্যক্তিগত যন্ত্রণা এরা অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে। ঢাকা শহরে অসুখী মানুষের সংখ্যা এত দ্রুত বাড়ছে কেন ভাবতে ভাবতে মিসির আলি দ্রুত হাঁটতে লাগলেন। মাথার ওপর জুন মাসের গনগনে আকাশ। রাস্তাঘাট তেতে উঠেছে। বাতাসের লেশমাত্রও নেই। এবছর অসম্ভব গরম পড়েছে। এই অসহ্য গরমে রিকশাওয়ালারা মানুষ টানে কীভাবে কে জানে! মিসির আলি সামসু নামের উদ্ধত যুবকটির জন্যে এক ধরনের মায়া অনুভব করলেন।

ক্লাস ফাঁকা। আসমানি রঙের জামদানি শাড়ি পরা একটি মেয়ে শুধু সেকেন্ড বেঞ্চে বসে আছে। মেয়েটির মাথায় ঘোমটা। এটা একটা নতুন ব্যাপার। ইউনিভার্সিটির মেয়েরা মাথায় ঘোমটা দেয় শুধু আজানের সময়।

মিসির আলি ঢুকতেই মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। তিনি অপ্রস্তুত স্বরে বললেন, দেরি করে ফেললাম। সবাই চলে গেছে নাকি ?

জি স্যার।

তুমি বসে আছ কেন ? তুমি কেন ওদের সঙ্গে গেলে না ?

মেয়েটি মৃদুস্বরে বলল, স্যার, আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না ?

হ্যাঁ, চিনতে পারছি। তোমার নাম নীলু।

জি।

তুমি তো এই ক্লাসের নও।

জি-না।

তাহলে ?

আমি স্যার আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বসে আছি। আমি রুটিনে দেখেছি আজ আপনার এঁখানে ক্লাস।

মিসির আলি ভুরু কুঁচকে বললেন, তোমার কি বিয়ে হয়েছে ? মাথায় ঘোমটা, তাই বললাম। নতুন বিয়ে হওয়া মেয়েরা প্রথমদিকে ঘোমটা পরে।

আমার বিয়ে হয়নি।

ও আচ্ছা।

আপনার সঙ্গে আমার খুব একটা জরুরি কথা আছে স্যার।

বলো।

আমি স্যার অনেকটা সময় নিয়ে কথাটা আপনাকে বলতে চাই। আমি কি স্যার আপনার বাসায় যেতে পারি ?

বাসায় আমার কিছু ঝামেলা আছে।

তাহলে স্যার, আপনি কি আমাদের বাসায় একটু আসবেন ? আমার খুব দরকার।

ঠিক আছে, যাব।

আমাদের বাসার ঠিকানা কি আপনার মনে আছে ? একবার গিয়েছিলেন আমাদের বাসায়। আমাদের বাসার দোতলায় আপনার একজন পরিচিত মহিলা থাকতেন। রানু নাম।

আমার মনে আছে।

স্যার, আপনি কি আজই আসবেন ? আমার খুব দরকার।

মিসির আলি তাকিয়ে রইলেন মেয়েটার দিকে। এই মেয়ের নাম নীলু, কিন্তু কোনো-এক বিচিত্র কারণে তাকে অবিকল রানুর মতো দেখাচ্ছে।

স্যার, আপনি কি আজই যাবেন ?

ঠিক আছে রানু।

আমার নাম কিন্তু স্যার নীলু।

মিসির আলি লক্ষ করলেন, মেয়েটা হাসছে। যেন তাকে রানু বলায় সে খুশি। এটাই যেন আশা করছিল।

আমাদের বাসার ঠিকানা কি লিখে দেব ?

লিখে দিতে হবে না। আমার মনে আছে।

আসবেন কিন্তু স্যার।

আসব। আমি আসব।

যাই স্যার, স্লামালিকুম।

নীলু উঠে দাঁড়াল। এত সুন্দর মেয়েটি! শ্যামলা গায়ের রঙ। চোখে-মুখে তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই। কিন্তু তবু এমন মায়া জাগিয়ে তুলছে কেন ? মিসির আলি লজ্জিত বোধ করলেন। তাঁর বয়স একচল্লিশ। এই বয়সের একজন মানুষের মনে এ জাতীয় তরলভাব থাকা উচিত নয়। তাছাড়া এই মেয়েটি তাঁর ছাত্রী।

মিসির আলি শূন্যক্লাসে দীর্ঘসময় বসে রইলেন। একসঙ্গে বেশ কয়েকটা জিনিস নিয়ে তিনি ভাবছেন। মেয়েটির মাথায় ঘোমটা কেন ? এই মেয়েটি দীর্ঘদিন ধরেই ক্লাসে আসছে না কেন ? মেয়েটি চলে যাওয়ার সময়ও একটা অস্বাভাবিক আচরণ করেছে।

সোজাসুজি হেঁটে গেছে, একবারও পেছন ফিরে তাকায়নি। মেয়েরা সাধারণত পেছন ফিরে তাকায়।

সবচেয়ে রহস্যময় ব্যাপারটি হচ্ছে, একটি মৃতা মেয়ের ছাপ আছে নীলুর মধ্যে। যেভাবেই হোক আছে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে না।

তিনি সিগারেট ধরালেন।

প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে না—কথাটা কি সত্যি ? তাঁর মনে হলো, সত্যি নয়। প্রকৃতির কাজই হচ্ছে নানান রকম রহস্য সৃষ্টি করা। মানুষের কাজ হচ্ছে সেই রহস্যের কুয়াশা সরিয়ে দেওয়া। এমন একদিন কি আসবে যখন কেউ বলবে না—দেয়ার আর মেনি থিংস ইন হেভেন অ্যান্ড আর্থ...।

আরে মিসির আলি সাহেব না ? এখানে কী করছেন ? একা-একা ক্লাসে বসে আছেন কেন ?

তিনি দাড়িওয়ালা এই লোকটাকে চিনতে পারলেন না। হাতে রেজিস্ট্রি খাতা, কাজেই অধ্যাপক হবেন। মুখখানা হাসি-হাসি। পান খেয়ে দাঁত লাল করে ফেলেছেন। পান-খাওয়া লোকজন কি কিছুটা নম্র স্বভাবের হয় ? মিসির আলির মনে হলো পান এবং স্বভাবের ভেতরে কোনো-একটা সম্পর্ক আছে। তিনি যে ক'জন পানবিলাসী লোককে চেনেন, তাদের সবাই সদালাপী।

কী, কথা বলছেন না কেন ? কিছু ভাবছেন নাকি ?

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। শান্ত ও নরমস্বরে বললেন, জি-না, কিছু ভাবছি না।

আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না ?

জি-না।

দাড়িওয়ালা অধ্যাপক অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। মিসির আলি বিব্রত বোধ করলেন। কাউকে 'চিনতে পারছি না' বলা তাকে প্রায় অপমান করার শামিল। বিশেষ করে অধ্যাপকশ্রেণীর মানুষরা এ ব্যাপারে খুব স্পর্শকাতর।

সত্যি চিনতে পারছেন না ?

জি-না। আমার একটা প্রবলেম আছে, কিছুই মনে থাকে না।

মাসখানেক আগে আমি আপনার কাছে একজন রোগী নিয়ে গিয়েছিলাম—ফিরোজ নাম। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র।

ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আপনি ফিরোজের দুলাভাই।

হ্যাঁ দুলাভাই।

এবং আপনার নাম হচ্ছে নাজিমুদ্দিন। হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট।

এই তো চিনতে পারছেন।

চিনতে পারছি এসোসিয়েশন থেকে। একটা মনে পড়লে, অন্যগুলো মনে পড়তে থাকে। এসোসিয়েশন অব আইডিয়াস।

ফিরোজ তো অনেকখানি ইমপ্রুভ করেছে। এত অল্প সময়ে যে আপনি এতটা করবেন, আমরা কেউ কল্পনাও করিনি। দারুণ ব্যাপার!

মিসির আলি কিছু বললেন না। ফিরোজ আজ বিকেলে তাঁর কাছে আসবে। প্রতি সোমবার ফিরোজের সঙ্গে তাঁর একটি সেশন হয়। অথচ নীলুকে বলে রেখেছেন, আজ যাবেন তাদের বাসায়। তাঁর কাজকর্ম ইদানীং এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে কেন ? বয়স বাড়ছে।

মিসির আলি সাহেব।

জি ?

চলুন, লাউঞ্জে বসে চা খাওয়া যাক।

চলুন।

আপনি এত গম্ভীর হয়ে আছেন কেন ? কী ভাবছেন এত ?

কিছু ভাবছি না।

তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। দীর্ঘনিঃশ্বাসটি কেন ফেললেন, এই নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলেন। অকারণে তো কেউ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে না। সবকিছুর পেছনেই কারণ থাকে। এই জগতে কার্যকারণ ছাড়া কিছুই হয় না। সবই লজিক। জটিল লজিক। জটিল কিন্তু অভ্রান্ত। লজিকের বাইরে এক চুলও কারও যাওয়ার ক্ষমতা নেই।

২

গত দু'মাস ধরে ফিরোজ প্রতি সোমবারে মিসির আলির কাছে আসে। পাঁচটার সময় আসে, থাকে সাতটা পর্যন্ত। আজ কী মনে করে তিনটার সময় চলে এসেছে। মিসির আলি তখনো ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরেননি। তাঁর কাজের মেয়ে হানিফা দরজা খুলে দিল। সে দরজা খুলল ভয়ে-ভয়ে। ফিরোজের দিকে তাকালেই তার বুক টিপটিপ করে। বড় ভয় লাগে।

স্যার কি আছেন, হানিফা ?

জি-না।

আজ একটু সকাল-সকাল এসে পড়েছি। আমি বসি, কেমন ?

জি আইচ্ছা।

তুমি আমাকে এক গ্লাস লেবুর শরবত খাওয়াতে পার ? প্রচণ্ড গরম।

হানিফার বয়স দশ। কিন্তু সে খুবই চটপটে। মিসির আলি সাহেব তাকে অল্পদিনের মধ্যেই বর্ণপরিচয় করিয়েছেন। পড়াশোনার ব্যাপারে তার অসম্ভব আগ্রহ। মেয়েটি এমনিতেও চটপটে। সে বড় এক গ্লাস শরবত বানাল। তিন টুকরা বরফ ছেড়ে দিল। ট্রেতে করে শরবতের গ্লাস এবং আরেক গ্লাস ঠান্ডা পানি নিয়ে এল। সে দেখেছে শরবত খাবার পরপরই সবাই পানি খেতে চায়।

ফিরোজ অবশ্যি উল্টোটা করল। পানি খেল প্রথমে। তারপর বেশ সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল, তুমি আমাকে ভয় পাও কেন হানিফা ?

ভয় পাই না তো।

পাও, খুবই ভয় পাও। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি এখন সেরে গেছি। পুরোপুরি না সারলেও অসুখটা আর নেই। চেঁচামেচি হৈচৈ কিছুই করি না। ঠিক না ?

জি ঠিক।

এখন দেখো না—সবাই একা-একা ছেড়ে দেয়। আগে ছাড়ত না।

হানিফা কিছু বলল না।

ফ্যানটা ছেড়ে দাও।

হানিফা ফ্যান ছেড়ে দিল। ফিরোজ ভারী গলায় বলল, এই গরমে সুস্থ মানুষই পাগল হয়ে যায়। আর আমি তো এমনিতেই পাগল।

হানিফার বুকের ভেতর ধক করে উঠল। বলে কী এই লোক! বাড়িতে আর কেউ নেই। শুনশান নীরবতা। হানিফার ইচ্ছা করতে লাগল, বাড়ির বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে।

হানিফা।

জি ?

আমাকে ভয় লাগছে ?

জি।

ভয়ের কিছু নেই। আমি সেরে গেছি। ঠিক আছে, তুমি যাও। আমি বসে থাকব চুপচাপ।

হানিফা রান্নাঘরে চলে গেল। কী মনে করে সে রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। কেন জানি দারুণ ভয় করতে লাগল তার।

ফিরোজ বসে আছে চুপচাপ। তার চোখ ঈষৎ লাল। খুব সূক্ষ্মভাবে হলেও তার মধ্যে একধরনের অস্থিরতা লক্ষ করা যায়। ছেলেটির বয়স বাইশ, অত্যন্ত সুপুরুষ। চিবুক এবং ঠোঁট কিশোরীদের মতো। বড় বড় চোখ, পাতলা নাক। তাকে দেখলে মনে হয়, মেয়ে বানাতে গিয়ে প্রকৃতি কী মনে করে শেষমুহূর্তে তাকে পুরুষ বানিয়েছে, এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কিছু কাঠিন্য ঢেলে দিয়েছে।

ফিরোজের সমস্যাটা শুরু হয় এইভাবে—সে দু'বছর আগে জানুয়ারি মাসে তার এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল। যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল একটাই, গ্রাম দেখা। ফিরোজ কখনো গ্রাম দেখেনি।

বন্ধুর বাড়ি ময়মনসিংহের মোহনগঞ্জে। চমৎকার একটা জায়গা। ভোরবেলায় আকাশের গায়ে নীলাভ গারো পাহাড় দেখা যায়। চারদিকে ধু-ধু প্রান্তর, বর্ষা আসামাত্র যা পানিতে ডুবে যায়। সেই পানি সমুদ্রের মতো গর্জন করতে থাকে। অল্প বাতাসেই সমুদ্রের মতো বিশাল ঢেউ ওঠে।

এখন অবশ্যি শুকনো খটখট করছে চারদিকে। তবু ফিরোজ মুগ্ধ হয়ে গেল। সবচেয়ে মুগ্ধ হলো বন্ধুর বাড়ি দেখে। বিশাল এক দালান। সিনেমাতে পুরনো আমলের জমিদার বাড়ির মতো বাড়ি। একেকটি ঘর এত উঁচু এবং এত বিশাল যে, কথা বললেই প্রতিধ্বনি হয়।

ফিরোজের বন্ধুর নাম আজমল চৌধুরী। সে তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাড়ি দেখাল। অতিথিদের থাকবার জায়গা। নায়রীদের থাকবার জায়গা। কুয়োতলা। বাড়ির পেছনের সারদেয়াল, যেখানে পূর্বপুরুষদের কবর আছে। ফিরোজের বিস্ময়ের সীমা রইল না। কী কাণ্ড! সে মুগ্ধকণ্ঠে বলল, এ তো হুলস্থুল ব্যাপার রে আজমল! তোরা রাজা-মহারাজা ছিলি, তা তো কোনোদিন বলিসনি।

এখন কিছুই নেই। দালানটাই আছে, আর কিছুই নেই। সেই দালানই ভেঙে ভেঙে পড়ছে। আরেকটা ভূমিকম্প হলে গোটা দালানই ভেঙে পড়ে যাবে। তাছাড়া খুব সাপের উপদ্রব।

বলিস কী!

এখন ভয় নেই কোনো। সব সাপ হাইবারনেশনে চলে গেছে। গরমের সময় ভয়াবহ কাণ্ড হয়।

কোনো ব্যবস্থা করতে পারিস না?

আজমল কঠিন স্বরে বলল, এর একটামাত্র ব্যবস্থাই আছে, সব ছেড়ে-ছুড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া।

এত চমৎকার ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাবি, বলিস কী?

চলে যাব। এখানে থাকলে মারা পড়তে হবে। তিনটা মাত্র মানুষ আমরা। আমি, মা আর আমার ছোটবোন। এত বড় বাড়ি দিয়ে আমি করব কী? জঙ্গল হয়ে গেছে চারদিকে, দেখছিস না?

দু'দিন থাকার পরিকল্পনা নিয়ে ফিরোজ গিয়েছিল, কিন্তু পঞ্চম দিনেও সে ফেরার কথা কিছু বলল না।

বড় আনন্দে সময় কাটতে লাগল। গ্রাম যে এত ইন্টারেস্টিং হবে, তা তার ধারণার বাইরে ছিল। শুধু একটি খটকা লেগে থাকল তার মনে। আজমলের বোনের সঙ্গে তার দেখা হলো না, যদিও মেয়েটি এই বাড়িতেই থাকে। মেয়েটির নাম নাজ। আজমলের মা প্রায়ই তাঁর মেয়েকে চিকন গলায় ডাকেন, ও নাজ, ও নাজ। তার উত্তরে মেয়েটি ক্ষীণস্বরে সাড়া দেয়। মেয়েটির সাড়াশব্দ এইটুকুই। ফিরোজ একবার ভেবেছিল, আজমলকে তার বোনের কথা জিজ্ঞেস করে। শেষপর্যন্ত তা করা হয়নি। প্রাচীনপন্থী একটি পরিবার, হয়তো কিছু মনে করে বসবে। এদের হয়তো কঠিন পর্দার ব্যাপার আছে।

ষষ্ঠ দিন সন্ধ্যায় মেয়েটির সঙ্গে ফিরোজের দেখা হয়ে গেল। ফিরোজ অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙল সন্ধ্যাবেলা। চারদিক অন্ধকার। ঘরে আলো দিয়ে যায়নি। ফিরোজ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমেই হকচকিয়ে গেল। সতের-আঠার বছরের একটি মেয়ে দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার একহাতে একটি হারিকেন। হারিকেনের আলো পড়েছে মেয়েটির মুখে। এই মুখ কি কোনো মানবীর মুখ? অসম্ভব! পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত রূপ কি এই মুখে আঁকা নয়? ফিরোজ চোখ ফিরিয়ে নিতে চাইল, পারল না। সে তাকিয়েই রইল।

মেয়েটি বলল, আমি নাজনীন।

কিছু-একটা বলতে হয়। ফিরোজ বলতে পারল না। কোনো কথা তার মনে এল না। এই অসম্ভব রূপবতী মেয়েটিকে সে কী বলবে?

ভাইয়া বাজারে গেছে, এসে পড়বে। আপনি বড় ঘরে বসুন, চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ফিরোজ বড় ঘরের দিকে রওনা হলো আচ্ছন্নের মতো, এবং সে মনে করতে পারল না মেয়েটির গায়ে শাড়ি ছিল, না সালোয়ার-কামিজ ছিল। মেয়েটির চুল কি বেণি-বাঁধা ছিল, না খোলা ছিল। তার মুখটি কি গোলাকার, না লম্বাটে। কিছুই মনে নেই। শুধু মনে আছে একটি তুলি দিয়ে আঁকা মুখ সে দেখে এসেছে। যে-শিল্পী ছবিটি এঁকেছেন তাঁর বাস এ পৃথিবীতে নয়, অন্য কোনো ভুবনে।

রাতে খাবার সময় আজমল সহজ স্বরে বলল, নাজের সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে, তাই না? নাজ বলছিল।

ফিরোজ কিছু বলল না। আজমল বলল, ও কিছুতেই তোর সামনে আসতে চাচ্ছিল না। দেখাটা সেজন্যেই এমন হঠাৎ হয়েছে।

আসতে চাচ্ছিল না কেন?

লজ্জা। ওর পোলিওতে একটা পা নষ্ট। এই লজ্জায় সে কারও সামনে পড়তে চায় না।

আজমলের মুখ কঠিন হয়ে গেল। সে রুক্ষস্বরে বলল, পৃথিবীর সমস্ত লজ্জা তার মধ্যে। শুধু তোর সামনে কেন, কারও সামনেই সে যায় না।

সমস্ত রাত ফিরোজ এক ফোঁটা ঘুমোতে পারল না। এত কষ্টের রাত তার জীবনে আসেনি। এবং ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটল পরদিন দুপুরে।

ফিরোজ একা-একা শিয়ালজানি খালের পাড় ধরে হাঁটতে গেল। এবং তার এক ঘণ্টার মধ্যেই চার-পাঁচজন লোক তাকে ধরাধরি করে নিয়ে এল। তার চোখ লাল টকটক করছে। দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে। কথাবার্তা অসংলগ্ন। মাঝে-মাঝে বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠছে এবং দৌড়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করছে।

আজমল এবং তার মা হতভম্ব। নাজনীন সমস্ত ব্যাপার দেখে অনবরত কাঁদছে। বাড়ি ভর্তি হয়ে গেছে মানুষে। নানান জল্পনা-কল্পনা। খারাপ বাতাস লেগেছে। জিনে ধরেছে। কালির আছর হয়েছে।

ফিরোজকে নিয়ে আসা হলো ঢাকায়। সারিয়ে তুললেন মিসির আলি সাহেব। সেই সারানোর ব্যাপারটা সাময়িক। কিছুদিন সুস্থ থাকে, আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। লোকজনদের গলা টিপে ধরতে চায়। জিনিসপত্র ভেঙে একাকার করে।

তবে এখন অবস্থা অনেক ভালো। অসুস্থতার সময় আগের মতো ভায়োলেন্ট হয় না। চুপ করে থাকে। কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলে না। খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে অন্ধকার ঘরে বসে থাকে। ঘর থেকে শুধু বিড়বিড় শব্দ শোনা যায়। যেন সে কারও সঙ্গে কথা বলছে।

যখন সে সুস্থ থাকে, তখন তার অসুস্থ অবস্থার কথা বিশেষ মনে থাকে না। মিসির আলি সাহেব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যা বের করেছেন, তা খাতায় লিখে রেখেছেন। লেখা হয়েছে ফিরোজের জবানিতে।

অসুস্থতার বিবরণ

> সারা রাত নানান কারণে আমার ঘুম হয়নি। শেষ রাতের দিকে একটু ঘুম এল। তাও অল্পকিছুক্ষণের জন্যে। ছ'টার সময় বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে দেখি, আজমল একটা চাদর গায়ে দিয়ে আমবাগানে রোদের জন্যে অপেক্ষা করছে। চট করে রোদ উঠবে মনে হলো না। কারণ খুব কুয়াশা। আমি লক্ষ করেছি, আটটা-ন'টার আগে এ অঞ্চলে সূর্যের দেখা পাওয়া যায় না।

আজমল আমাকে দেখে বলল, আজ এত সকাল-সকাল উঠলি যে ? চোখ লাল কেন ? রাতে ঘুম হয়নি ?

হয়েছে।

চা খাবি এক কাপ ? নাশতা হতে দেরি হবে। চাল কোটা হচ্ছে, পিঠা হবে। সময় লাগবে।

চা এক কাপ খাওয়া যায়।

চা খেতে খেতে পাখি শিকার নিয়ে কথা হলো। এখান থেকে প্রায় মাইল চারেক দূরে পুকইরা বিলে নাকি খুব হাঁস নামছে। শেষরাতে উঠে গেলে প্রচুর পাওয়া যাবে।

আমি হাঁস মারার ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দেখালাম, কিন্তু আজমলের কাছ থেকে কোনোরকম সাড়া পাওয়া গেল না। অথচ এখানে যার সঙ্গেই দেখা হয়, সে-ই জিজ্ঞেস করে পাখি শিকার করতে এসেছি কি না। আজমলের এরকম অনাগ্রহের কারণ নাশতা খাওয়ার সময় টের পাওয়া গেল। এদের পাখি মারার কোনো বন্দুক বর্তমানে নেই। একটা দোনলা উইনস্টন গান ছিল। অর্থনৈতিক কারণে বিক্রি করে ফেলতে হয়েছে। শিকারের প্রসঙ্গ উঠতেই এই কারণে আজমল মন খারাপ করেছে। আমার নিজেরও তখন একটু খারাপ লাগল। শিকারের প্রসঙ্গটা না তুললেই হতো।

রোদ উঠল দশটার দিকে। আমি ভেবেছিলাম আজমলের সঙ্গে বাজারের দিকে যাব। কিন্তু আজমল বলল, তুই থাক, আমি দেখি একটা বন্দুকের ব্যবস্থা করা যায় কি না।

আমি বললাম, বন্দুকের ব্যবস্থা করার কোনো দরকার নেই। শিকারের দিকে আমার কোনো ঝোঁক নেই।

আজমল আমার কোনো কথা শুনল না। সে অসম্ভব জেদি। আমাকে রেখে চলে গেল। আমার তেমন কিছু করার নেই। শিয়ালজানি খাল ধরে উত্তরদিকে হাঁটতে শুরু করলাম।

এ অঞ্চলে হিন্দু বসতি খুব বেশি। এদের ঘরদুয়ার খুব পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন। দেখতে ভালো লাগে। তবে অনেক বাড়িঘর দেখলাম ফাঁকা। আজমলের কাছে শুনেছি, অনেক

হিন্দু পরিবার একাত্তরের যুদ্ধে কোলকাতা গিয়ে আর ফিরে আসেনি। বেশ কিছু মারা পড়েছে পাকিস্তানি আর্মির হাতে। এদের ঘরবাড়ি ফাঁকা। বড় বড় ঘাস জন্মেছে। জনমানবশূন্য বাড়িঘর দেখতে কেমন যেন ভয় ভয় লাগে। গা ছমছম করে।

আমি ঠিক করলাম বাড়ি ফিরে যাব। চড়চড় করে রোদ উঠছে। পানির তৃষ্ণা হচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে এসেছি। যে জায়গাটায় আছি, তা অসম্ভব নির্জন। আমি বিশাল একটা বকুল গাছের নিচে দাঁড়ালাম খানিকক্ষণ। তখনই ব্যাপারটা ঘটল। গরগর একটা শব্দ শুনলাম গাছে। যেন কেউ গাছের ডাল নাড়াচ্ছে। আমি চমকে গাছের দিকে তাকাতেই রক্ত হিম হয়ে গেল।

দেখলাম গাছের ডালে একজন মানুষ বসে আছে। খালি গা। পরনে একটা প্যান্ট। চোখে গোল্ড রিম একটা চশমা। লোকটি রোগা এবং দারুণ ফর্সা। মুখের ভাব অত্যন্ত রুক্ষ। সে সাপের মতো সরসর করে নেমে এল। একজন মানুষ গাছ থেকে নেমে আসার মধ্যে তেমন অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু আমার শরীর কাঁপতে লাগল। ঘামে গা চটচটে হয়ে গেল। লোকটির দৃষ্টি অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ। চশমার কাচের আড়ালেও তার চোখ চকচক করছে। সে এক পা এক পা করে এগিয়ে এল আমার দিকে। আমার প্রচণ্ড ইচ্ছা করছিল ছুটে পালিয়ে যেতে। কিন্তু আমার পা যেন মাটিতে লেগে গেছে। নড়বার সামর্থ্য নেই। লোকটির কাছ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়ারও ক্ষমতা নেই। সে এগিয়ে এল আমার দিকে, তারপর একটা চড় বসিয়ে দিল। এর পরের ঘটনা আমার আর কিছুই জানা নেই।

মিসির আলি সাহেব তাঁর ছোট ছোট অক্ষরে প্রচুর নোট লিখেছেন। প্রায় পঁচিশ পৃষ্ঠার একটি বিশ্লেষণী প্রবন্ধও আছে ইংরেজিতে লেখা। কিছু পয়েন্টস আছে আন্ডারলাইন করা। দু'-একটি পয়েন্ট এরকম—

১. ফিরোজের গল্পে বেশ কিছু মজার ব্যাপার আছে। সে চশমাপরা একটি লোককে নেমে আসতে দেখল খালি গায়ে। কিন্তু তার পরনে আছে প্যান্ট। যে লোকটি চশমা এবং প্যান্ট পরে, সে খালি গায়ে থাকে না। লুঙ্গিপরা একটি লোক খালি গায়ে নেমে এলে বাস্তব চিত্র হতো। ফিরোজ দেখেছে একটি অবাস্তব চিত্র। অবাস্তব চিত্রগুলো আমরা দেখি স্বপ্নে। ফিরোজ কি একটি স্বপ্নদৃশ্যের বর্ণনা করছে?

২. ফিরোজ বলছে লোকটির পরনে ছিল প্যান্ট। কিন্তু প্যান্টের রঙ কী, তা সে বলতে পারছে না। তার মানে কি এই যে, প্যান্টের কোনো রঙ ছিল না। স্বপ্নদৃশ্য সবসময় হয় সাদাকালো। স্বপ্ন বর্ণহীন। অবশ্যি সে একটি রঙ স্পষ্ট উল্লেখ করছে। সেটি হচ্ছে চশমার ফ্রেমের রঙ। সে বলছে গোল্ড রিম চশমা। অর্থাৎ সে সোনালি রঙ দেখতে পাচ্ছে, স্বপ্নদৃশ্যে যা সম্ভব নয়।

৩. তার গল্পের কোথাও সে নাজনীন প্রসঙ্গ উল্লেখ করেনি। আমার মনে হচ্ছে, ফিরোজের সমস্ত ব্যাপারটায় নাজনীনের একটি ভূমিকা আছে। অসুস্থ হওয়ার আগের রাত সে অনিদ্রায় কাটিয়েছে। অনিদ্রার

মূল কারণ রূপবতী একটি মেয়ে। আমি লক্ষ করেছি, আমার সঙ্গে কথাবার্তার সময়ও সে এই প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যায়। কেন যায় ?

৪. সে তার গল্পে বলেছে, সে একটি বকুলগাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু যে-গাছের নিচে সে দাঁড়িয়ে ছিল, সেটা একটা বটগাছ। ফিরোজ বকুলগাছ এবং বটগাছের পার্থক্য জানবে না, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সে গাছের নিচে আসার আগেই একটি ঘোরের ভেতর ছিল বলে আমার ধারণা। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস বকুলগাছ প্রসঙ্গে তার কোনো একটি পীড়াদায়ক স্মৃতি আছে। (পরে বকুলগাছ প্রসঙ্গে আরও তথ্যাদি আছে।)

৫. ফিরোজের চশমাপরা লোকটি ছিল ফর্সা, রোগা ও লম্বা, যার চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই বর্ণনা আজমলের বেলায়ও খাটে। এই ছেলেটি অসম্ভব ফর্সা, রোগা এবং লম্বা। সে অবশ্যি চশমা পরে না, মেডিকেল কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়বার সময় তার চশমা ছিল। এবং সেটা ছিল গোল্ড রিম চশমা। সেই সময় ফিরোজ এবং আজমল ছিল রুমমেট।

ফিরোজ প্রসঙ্গে ইংরেজিতে কিছু নোটস আছে। নোটসগুলোর বঙ্গানুবাদ দেয়া হলো—

বকুলগাছ বিষয়ে কয়েকটি কথা

আমার প্রাথমিক অনুমান ছিল বকুলগাছ প্রসঙ্গে ফিরোজের একটি পীড়াদায়ক স্মৃতি আছে। অনুমান মিথ্যা নয়। আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, ফিরোজরা একসময় সিলেটের মীরাবাজারে থাকত। তার বাসা থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে একটি বকুলগাছ ছিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খুব ভোরবেলায় বকুল ফুল কুড়াতে যেত।

ফিরোজের বয়স তখন আট বছর। সে তার বড় বোনের সঙ্গে এক ভোরবেলায় ফুল কুড়াতে গিয়ে একটি অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখল। একটি নগ্ন যুবতীর মৃতদেহ দড়িতে ঝুলছে। এটি একটি হত্যাকাণ্ড। মেয়েটিকে মেরে দড়িতে ঝুলিয়ে দিয়েছে।

অল্পবয়স্ক একটি শিশুর কাছে নগ্ন নারীদেহ এমনিতেই যথেষ্ট অস্বাভাবিক। সেই দেহটি যদি প্রাণহীন হয়, তাহলে তা সহ্য করা মুশকিল।

ফিরোজ অসুস্থ হয়ে পড়ল। প্রবল জ্বর এবং ডেলিরিয়াম। শৈশবের এই দৃশ্য ফিরোজের মস্তিষ্কের নিউরোনে জমা আছে, তা বলাই বাহুল্য।

মিসির আলি সাহেব বাড়ি ফিরলেন পাঁচটা বাজার কিছু পরে। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। ক্ষণেক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। ঝাঁকে-ঝাঁকে কাক উড়ছে আকাশে। ঝড় হবে সম্ভবত। পশুপাখিরা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের খবর আগে আগে পায়।

ঘরে ঢুকে যে দৃশ্যটি দেখলেন, তার জন্যে মিসির আলির মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। ফিরোজ বসে আছে মূর্তির মতো। তার হাতে একটা লোহার রড। সে শক্ত হাতে রড চেপে ধরে আছে। এত শক্ত করে চেপে ধরে আছে যে, তার হাতের আঙুল সাদা হয়ে আছে। চামড়ার নিচের শিরা নীল হয়ে ফুলে উঠেছে।

রড সে পেল কোথায় ? এই প্রশ্নটির উত্তর পরে ভাবলেও হবে। ঠিক এই মুহূর্তে তাঁকে বুঝতে হবে, ফিরোজ এরকম আচরণ কেন করছে। তিনি সহজ স্বরে বললেন, একটু দেরি করে ফেললাম। তুমি কি অনেকক্ষণ হয়েছে এসেছ নাকি ?

ফিরোজ জবাব দিল না। তার চোখ টকটকে লাল। নিঃশ্বাস ভারী। কী সর্বনাশের কথা! মিসির আলি প্রাণপণে চেষ্টা করলেন স্বাভাবিক থাকতে।

বুঝলে ফিরোজ, খুব ঝড়বৃষ্টি হবে। আকাশ অন্ধকার হয়েছে মেঘে। তোমার হাতে ওটা কি লোহার রড নাকি ?

হুঁ।

লোহার রড নিয়ে কী করছ ? দাও রেখে দিই।

না।

চা-টা কিছু খেয়েছ ?

ফিরোজ কোনো জবাব দিল না। তার দৃষ্টি তীব্র ও তীক্ষ্ণ।

সিগারেট খাবে ? নাও একটা সিগারেট ধরাও।

আশ্চর্যের ব্যাপার, ফিরোজ রড ছেড়ে দিয়ে হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিল। মনে হচ্ছে একটা ভয়াবহ বিপর্যয় এড়ানো গেছে। সিগারেট শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে এটা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। সিগারেট শেষ হতে লাগবে তিন মিনিট। তিন মিনিট যথেষ্ট দীর্ঘ সময়।

তোমার জ্বর নাকি ফিরোজ ?

ফিরোজ জবাব দিল না। মিসির আলি তার কপালে হাত দিলেন। গা ঠান্ডা হয়ে আছে। মিসির আলি বললেন, হুঁ, বেশ জ্বর তো। একটা ট্যাবলেট খেয়ে নাও, জ্বরটা কমবে।

তিনি ড্রয়ার খুলে একশ' মিলিগ্রাম লিব্রিয়ামের ট্যাবলেট বের করলেন। অত্যন্ত কড়া ঘুমের ওষুধ। কোনো রকমে খাইয়ে দিতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে কাজ করবে। সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে গিয়ে ধরবে। মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহের পরিমাণ কমে আসবে। উত্তেজিত অংশগুলোর উত্তেজনা দ্রুত হ্রাস পাবে। লিব্রিয়াম একটি চমৎকার ওষুধ।

নাও ফিরোজ, খেয়ে নাও।

ফিরোজ কোনোরকম আপত্তি ছাড়াই ওষুধ খেয়ে ফেলল। রক্তে ওষুধ মেশবার জন্যে সময় দিতে হবে। বেশি নয়, অল্পকিছু সময়। এই সময়টা গল্পগুজবে আটকে রাখতে হবে।

চা খেলে কেমন হয় ফিরোজ ? বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে চা-টা জমবে মনে হয়। খাবে ?

হুঁ, খাব।

বসো, আমি চা নিয়ে আসছি। কিংবা এক কাজ করো। শুয়ে পড়ো সোফায়, আরাম করো।

মিসির আলি বেরিয়ে এলেন। শোবার ঘরের দরজা লাগিয়ে এলেন বারান্দায়। এখন তিনি নিশ্চিন্ত বোধ করছেন। ফিরোজকে বারান্দায় এলে দরজা ভেঙে আসতে হবে। এটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এর মধ্যেই লিব্রিয়াম তার কাজ করতে শুরু করবে।

মিসির আলি ডাকলেন, হানিফা, হানিফা।

হানিফা রান্নাঘরের দরজা খুলে বের হয়ে এল। ভয়ে আতঙ্কে তার মুখ সাদা হয়ে গেছে। সে কাঁপছে থরথর করে।

কী হয়েছিল হানিফা ?

হানিফা কিছু বলতে পারল না। আতঙ্ক এখনো তাকে ঘিরে আছে। মিসির আলি সাহস দেওয়ার জন্যে হানিফার মাথায় হাত রাখলেন। হানিফা ক্ষীণ স্বরে বলল, এই লোকটা একটা লোহার শিক লইয়া আমারে মারতে আইছিল।

তারপর ?

আমি দরজা বন্ধ কইরা বইসা ছিলাম। তারপর শুনি সে কার সাথে যেন কথা কইতেছে!

কার সাথে কথা বলছে ?

অন্য একটা মানুষ।

তুমি দেখেছ অন্য কোনো মানুষ ?

জি-না, কিন্তু কথা শুনছি। মোটা গলা।

ঠিক আছে এখন যাও, ভালো করে এক কাপ চা বানাও। ভয়ের কিছু নেই।

হানিফা চা বানাতে গেল। মিসির আলি লক্ষ করলেন, মেয়েটির পা এখনো কাঁপছে। চা বানাতে বানাতে ঠিক হয়ে যাবে। ভয় থেকে মুক্তি পাওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে, কোনো-একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকা।

মিসির আলি ঘড়ি দেখলেন। দশ মিনিট পার হয়েছে। লিব্রিয়াম নিশ্চয়ই তার কাজ শুরু করেছে। বসার ঘর থেকে কোনো সাড়াশব্দ আসছে না। এখন নিশ্চিন্তে সেখানে যাওয়া যায়।

তিনি বসার ঘরে ঢুকলেন। ফিরোজ লোহার রড হাতে বসে আছে। অসুখের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তাঁর শিরদাঁড়া দিয়ে একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল। তিনি শুকনো গলায় বললেন, চা বানাতে বলে এসেছি। চা চলে আসবে।

ফিরোজ চাপা গলায় বলল, আজ আপনার একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা করবার কথা।

মিসির আলির চমকে ওঠা উচিত, কিন্তু তিনি চমকে উঠলেন না। তিনি জানেন, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় মানুষের টেলিপ্যাথিক সেন্স প্রবল হয়ে ওঠে। ফিরোজের এখন

সেই অবস্থা। সে ব্যাখ্যার অতীত কোনো-একটি উপায়ে তাঁর মস্তিষ্কের বায়োকারেন্ট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করছে।

একটি মেয়ের সঙ্গে আপনার দেখা করবার কথা না ?

হ্যাঁ, কথা আছে।

তার কাছে গেলে আপনার বিপদ হবে।

কী করে বুঝলে ?

আমাকে বলে গেছে।

কে বলে গেছে ? ঐ চশমাপরা লোক ?

হ্যাঁ।

মিসির আলি লক্ষ করলেন ফিরোজের চোখের পাতা ঘনঘন পড়তে শুরু করেছে। REM—র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট। লিব্রিয়াম কাজ করতে শুরু করেছে।

তিনি সহজ স্বরে বললেন, শোনো ফিরোজ, আমি আমার সারা জীবনে আমার নিজের লাভক্ষতির দিকে তাকাইনি। আমি ঐ মেয়েটির কাছে যাব।

ফিরোজ ঘুমিয়ে পড়ল।

বাইরে গাড়ি হর্ন দিচ্ছে। ফিরোজকে নেবার জন্যে গাড়ি পাঠিয়েছেন তার বাবা-মা।

মিসির আলি ড্রাইভারকে নিয়ে ধরাধরি করে ঘুমন্ত ফিরোজকে গাড়িতে তুলে দিলেন। ড্রাইভারকে বললেন, ও অসুস্থ। আজ রাতটা ওকে তালাবন্ধ করে রাখতে হবে। সকালবেলা আমি ওকে দেখতে যাব। আর শোনো, ও রাতে বিড়বিড় করে কথা-টথা বলবে। একটা ক্যাসেট রেকর্ডারের ব্যবস্থা করতে বলবে, যাতে ওর সমস্ত কথাবার্তা রেকর্ড হয়ে যায়। এটা খুব দরকার।

ড্রাইভার শুকনো মুখে তাকিয়ে রইল। মিসির আলি ঘরে পা দিতেই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। সেই সঙ্গে বাতাস। এরকম দুর্যোগের রাতে নীলুর কাছে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। মিসির আলি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেললেন।

ফিরোজের ব্যাপারে তাঁর মনটা খারাপ হয়ে গেছে। হঠাৎ এরকম হবে কেন ?

৩

বহু খোঁজাখুঁজি করেও মিসির আলি নীলুদের বাড়ি বের করতে পারলেন না। তাঁর কাছে কোনো ঠিকানা নেই। তিনি ইচ্ছা করেই ঠিকানা রাখেননি। না রাখাটা বোকামি হয়েছে। কাঁঠাল বাগানের যে-অঞ্চলে লাল রঙের দোতলা বাড়ি থাকার কথা, সেখানে লাল রঙের কোনো বাড়িই নেই।

কয়েকটি পানবিড়ির দোকানদারকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—লাল রঙের দোতলা বাড়ি, ভেতরে ফুলের বাগান আছে। ওরা যখন শুনল তিনি ঠিকানা জানেন না এবং বাড়ির মালিকের নামও জানেন না, তখন খুবই অবাক হয়ে গেল।

ঢাকা শহরে ঠিকানা দিয়াও বাড়ি পাওন যায় না, আফনে আইছেন ঠিকানা ছাড়া। কেমুন লোক আফনে!

মিসির আলির নিজেরও মনে হলো, কাজটা বুদ্ধিমানের মতো হয়নি। স্মৃতির উপর বিশ্বাস করতে নেই। স্মৃতি হচ্ছে প্রতারক। নানানভাবে সে মানুষকে প্রতারণা করে।

অন্য কোনো মানুষ হলে এতক্ষণে খোঁজাখুঁজি বন্ধ করে বাড়ি চলে যেত। কিন্তু তিনি ভিন্ন ধরনের মানুষ। কোনো-একটি বিষয় শেষ না দেখে তিনি ছাড়েন না। কাজেই সকাল দশটার সময় তাঁকে দেখা গেল একটা রিকশা ঠিক করতে। ঘণ্টা হিসাবে চুক্তি। এক ঘণ্টা সে মিসির আলিকে নিয়ে কাঁঠাল বাগানের বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরবে। তিনি বাড়ি বের করতে চেষ্টা করবেন।

মিসির আলির কোলে রসমালাইয়ের একটা হাঁড়ি। কী মনে করে যেন তিনি এক সের রসমালাই কিনে ফেলেছেন। ছাত্রীর বাড়িতে খালি হাতে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু এখন মিষ্টির হাঁড়িটা একটা উপদ্রবের মতো লাগছে। মিসির আলির কেন যেন মনে হচ্ছে, যে-কোনো মুহূর্তে হাঁড়ি ভেঙে তার সমস্ত শরীর মাখামাখি হয়ে যাবে।

রিকশাওয়ালাটা বুড়ো এবং চালাক। খুব কম পরিশ্রমে সে এক ঘণ্টা পার করতে চায়। রিকশা চলছে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে। মিসির আলি বললেন, বুড়ো মিয়া, আপনি এই যে আস্তে আস্তে রিকশা চালাচ্ছেন, এতে কিন্তু আপনার কষ্ট বেশি হচ্ছে। প্রতিবারই নতুন করে মোমেনটাম দিতে হচ্ছে। কিন্তু আপনি যদি জোরে চালাতেন, তাহলে মোমেনটামের জন্যে বল দিতে হতো একবার। বাকি সময়টা শুধু ফ্রিকশন কাটানোর জন্য অল্প কিছু বল লাগত।

বুড়ো রিকশাওয়ালাকে এই জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কিছুমাত্র অনুপ্রাণিত করতে পারল না। তার রিকশার গতি আরও শ্লথ হয়ে গেল।

মিসির আলি ভাবতে চেষ্টা করলেন, যে বাড়িতে আগে একবার এসেছেন, সে-বাড়িটি এখন খুঁজে না পাওয়ার পেছনে কী কী কারণ থাকতে পারে। অনেকগুলো কারণ হতে পারে। পরবর্তী সময়ে হয়তো লাল রঙের দালানটিকে সাদা রঙ করা হয়েছে। দোতলা ছিল, তিনতলা করা হয়েছে। ফুলের বাগান নষ্ট করে ঘর তোলা হয়েছে। কিংবা এ-ও হতে পারে যে, মস্তিষ্কের যে-অংশ বস্তুজগতের অবস্থানিক বিষয়গুলোর বিশ্লেষণ করে নিউরোন স্মৃতিকক্ষে জমা রাখে—তাঁর সেই অংশ কাজ করছে না।

মিসির আলি হঠাৎ লক্ষ করলেন, তাঁর রসমালাইয়ের হাঁড়ি দু'খণ্ড হয়েছে। সমস্ত গায়ে, রিকশার সিটে এবং নিচে রসে মাখামাখি। এই অবস্থায় নীলুর বাসা খোঁজার কোনো মানে হয় না। অথচ একঘণ্টা পার হতে এখনো পনের মিনিট বাকি। পনের মিনিট আগে রিকশা ছেড়ে দেওয়ারও প্রশ্ন ওঠে না। তিনি রিকশাওয়ালাকে ছায়ায় নিয়ে রিকশা দাঁড় করাতে বললেন।

রসে মাখামাখি হয়ে তিনি পনের মিনিট রিকশার সিটে বসে রইলেন। মিষ্টির লোভে তাঁর মাথার ওপর কাক ডাকতে লাগল। দু'-একটা সাহসী কাক ছোঁ মেরে মেরে রসগোল্লার টুকরা ঠোঁটে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে। বুড়ো রিকশাওয়ালা অবাক হয়ে তাঁকে দেখছে। সে তার জীবনে এমন বিচিত্র যাত্রী খুব বেশি পায়নি। মিসির আলি বললেন, পনের মিনিট পার হলেই আমি চলে যাব, বুঝলেন?

রিকশাওয়ালা মাথা নাড়ল—সে বুঝেছে।

আজ গরম সে-রকম নেই। কাল রাতে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় আজ একটা শীতল ভাব আছে। তাছাড়া রাস্তাঘাট ঝকঝক করছে। গাছপালায় সতেজ ভাব। কচুরিপানার মতো হালকা বেগুনি ফুল ফুটে আছে জারুল গাছে। কী চমৎকার যে লাগছে দেখতে! এই ফুলগুলোর জন্যেই চারদিকে একটা কোমল ভাব চলে এসেছে।

মিসির আলি বাসায় ফিরলেন এগারটার সময়। বাসায় এক ফোঁটা পানি নেই। একটার দিকে বাড়িওয়ালা কল ছাড়বে। তার আগে গোসলের কোনো সম্ভাবনা নেই। রসমালাইয়ের রস সারা গায়ে মেখে বসে থাকতে হবে।

তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। হানিফাকে চা বানাতে বলে ফিরোজের ফাইল খুলে বসলেন। এই ফাইলটিতে লেখা—ফিরোজ/মোহনগঞ্জ। মোহনগঞ্জে ফিরোজের অভিজ্ঞতা এবং মোহনগঞ্জ প্রসঙ্গে যাবতীয় খবরাখবর এখানে আছে। তিনি মোহনগঞ্জের বিভিন্ন লোকজনের কাছে যেসব চিঠিপত্র লিখেছেন, তার কপি এবং সেইসব চিঠিপত্রের জবাবও এখানে আছে।

মিসির আলি পাতা উল্টাতে লাগলেন। প্রথম চিঠিটি নাজনীনকে লেখা। তারিখ দেওয়া আছে ১৭.০৬.৮৫, প্রায় এক বছর আগে লেখা চিঠি। আজ হচ্ছে ১০.০৬.৮৬। মিসির আলি নিজের লেখা চিঠির উপর চোখ বোলাতে লাগলেন।

> নাজনীন,
>
> কল্যাণীয়াসু, আমার ভালোবাসা নাও। পরিচয় দিয়ে নিচ্ছি—আমি মিসির আলি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিষয়ের একজন অধ্যাপক। ফিরোজ খান নামের একজন মানসিক রোগীর চিকিৎসার দায়িত্বে নিয়োজিত। তাকে চিকিৎসা করা হচ্ছে মেডিস্টিক সাইকোথেরাপি পদ্ধতিতে। এই রোগীকে তুমি চেনো। ও তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিল এবং সে অসুস্থ হয়ে পড়ে তোমাদের বাড়িতেই। শোনো নাজনীন, মানসিক রোগের উৎপত্তি মনে। মানুষের মন বিচিত্র জিনিস। সমগ্র নক্ষত্রপুঞ্জে যে রহস্য ও জটিলতা আছে, তার চেয়েও অনেক বেশি রহস্যময় মানুষের মন। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে সেই রহস্যের জট খুলতে চেষ্টা করি। প্রায় সময়ই তা সম্ভব হয় না। ফিরোজের বর্তমান যে অবস্থা, তার কারণ অনুসন্ধান করতে তোমার সাহায্য প্রয়োজন। একটি অসুস্থ ছেলের সাহায্যে তুমি কি এগিয়ে আসবে না ? আমি যা জানতে চাই, তা হচ্ছে—ফিরোজের সঙ্গে তোমার ক'বার দেখা হয়েছে এবং কী কী কথা হয়েছে। কোনো কিছু বাদ না দিয়ে আমাকে জানাবে। আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন তথ্যও অর্থবহ হতে পারে। আমার শরীরটা বিশেষ ভালো না। শরীর একটু ভালো হলে

তোমাদের বাড়িটা দেখতে যাব। এই ব্যাপারে তোমারই বড়ভাই আজমলের সাথে কথা হয়েছে। আদর ও ভালোবাসা নাও।

মিসির আলি

চিঠির উত্তর তিনি এক সপ্তাহের ভেতর পেয়ে গেলেন। তিনি মুগ্ধ হলেন চিঠি পড়ে। সহজ এবং আন্তরিক ভঙ্গিতে লেখা চিঠি। হাতের লেখা বড় সুন্দর। তার চিঠির অংশবিশেষ এরকম—

'ভাইয়া যে তার বন্ধুকে নিয়ে বেড়াতে আসবে, তা আমি জানতাম। গরমের ছুটির সময় এসে বলে গিয়েছিল। ভাইয়া সেই কলেজে পড়ার সময় থেকে তার বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে বেড়াতে আসে। আমাদের বাড়িটা বিশাল। ভাইয়া তার বন্ধুদের এই বাড়ি দেখিয়ে মুগ্ধ করতে চায় বলেই আমার ধারণা।

যাই হোক, ভাইয়ার বন্ধুরা এলে আমার খুব ভালো লাগে। বাড়িতে একটা উৎসব উৎসব ভাব থাকে। ভাইয়ার মেজাজ থাকে খুব খারাপ (আপনি বোধহয় জানেন না, ভাইয়া খুব রাগী)।

এবার যখন ফিরোজ ভাই বেড়াতে এল—আমার মোটেও ভালো লাগেনি। কারণ ভাইয়ার এই বন্ধুকে এখানে নিয়ে আসার পেছনে একটি উদ্দেশ্য ছিল, যা আমার পছন্দ হয়নি। ভাইয়া চাচ্ছিল, আমি তার বন্ধুর সঙ্গে গল্পটল্প করি, চা-টা বানিয়ে দিই। এবং তা করলেই তার বন্ধু আমাকে পছন্দ করে ফেলবে। আমার শারীরিক ত্রুটি তার চোখে পড়বে না। আমার একটি ভালো বিয়ে হবে। ভাইয়ার ধারণা, তার এই বন্ধু পৃথিবীর সেরা মানুষদের একজন।

মা'র কাছ থেকে এসব শুনে আমার খুব মন খারাপ হলো। একটি ছেলেকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বিয়ে করতে হবে কেন? বিয়েটা কি এতই জরুরি? আমি ভাইয়াকে ডেকে নিয়ে বললাম, আমি কখনো, কোনো অবস্থাতেই তোমার এই বন্ধুর সামনে যাব না। ভাইয়া চোখ লাল করে বলল, যেতেই হবে। আমি শান্ত গলায় বললাম, এটা নিয়ে তুমি যদি জোর খাটাও, আমি তাহলে মরে যাব। ভাইয়া চুপ করে গেল। আমি শান্ত ধরনের মেয়ে। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই ভয়ঙ্কর জেদি। ভাইয়া তা খুব ভালোই জানে। সে আমাকে ঘাঁটাল না। আমি ভেতরের বাড়িতে থাকতে লাগলাম। ভুলেও বাইরে পা বাড়াই না। তবু একদিন সন্ধ্যায় দেখা হয়ে গেল। ফিরোজ ভাইকে দেখে মনে হলো, তিনি খুব অবাক হয়েছেন। আমি হকচকিয়ে গিয়েছি। নিজেকে সামলে নিয়ে কোনোমতে বললাম, বড় ঘরে গিয়ে বসুন, সেখানে চা দেওয়া হবে।

এই বলে আমি চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েছি। পোলিওর জন্যে আমার এক পায়ে কোনো জোর নেই, কাজেই উল্টে পড়ে গেলাম। ফিরোজ ভাই আমাকে টেনে তুললেন। এটাই স্বাভাবিক। এতে লজ্জা বা অপমানের কিছুই নেই। কিন্তু আমি রেগে গেলাম এবং কঠিন গলায় বললাম, হাত ছাড়ুন।

তিনি পাংশুবর্ণ হয়ে গেলেন। আমার হাত ছেড়ে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন।

মিসির আলি এই চিঠিটা বেশ অনেকবার পড়েছেন এবং প্রতিবারই তাঁর মনে হয়েছে, চমৎকার একটি চিঠি। আন্তরিক এবং কোনো ভান নেই। একজন মানুষ সবচেয়ে বেশি ভান করে তার চিঠিতে। যে এই ভানের উপরে উঠে আসতে পারে, তাকে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে হয়।

সুন্দরী একটি মেয়ের মনটাও বোধহয় সুন্দর হয়।

মিসির আলি অন্যমনস্কভাবে খাতার পাতা উল্টাতে লাগলেন। এখনো পানি আসেনি। আজ কি বাড়িওয়ালা তার পানির পাম্পটি খুলবে না ? ওদের নিজেদের কি পানির দরকার হয় না ? দুপুরের খাওয়া-দাওয়ারও একটা ব্যবস্থা করতে হয়। রান্নাবান্না কিছু হয়নি। হানিফা জ্বরে কাতর। কালকের ঘটনায় বেচারি বেশ ভয় পেয়েছে। সকালে একশ' এক জ্বর ছিল, এখন একশ' দুই। দুটি প্যারাসিটামল কিছুক্ষণ আগেই খাওয়ানো হয়েছে। জ্বর কমে যাওয়া উচিত, কিন্তু কমছে না। বিকেল নাগাদ না কমলে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

তিনি খাতাপত্র গুছিয়ে উঠলেন। উঁকি দিলেন হানিফার ঘরে। হানিফার জন্যে তিনি একটি ঘর দিয়েছেন। এই ঘরে ছোট্ট একটি খাট আছে, পড়ার চেয়ার-টেবিল আছে, একটি আলনা আছে। এই মেয়েটি কখনো কল্পনাও করেনি, কোনোদিন এতগুলো জিনিস তার হবে।

হানিফা, তোর জ্বর কেমন রে ?

ভালো।

মিসির আলি কপালে হাত দিয়ে চমকে উঠলেন।

ভালো কোথায় ? অনেকখানি জ্বর তো! মাথায় পানি ঢালতে হবে।

হানিফা জ্বরতপ্ত চোখে তাকিয়ে রইল। এই লোকটিকে সে বুঝতে পারছে না। একজন কাজের মেয়ের জন্যে কেউ এতটা দরদ দেখায়, না দেখানো উচিত ?

হানিফা।

জি ?

জ্বর খুব বেশি। জ্বর নামাতে হবে। পানি তো বোধহয় এক ফোঁটাও নেই।

জি-না।

যাই, বাড়িওয়ালাকে পাম্প ছাড়তে বলি।

বলেন।

ফিরোজদের বাড়ি থেকে কেউ এসেছিল ?

জি-না।

টেলিফোন করে একটা খোঁজ নিতে হয়। কী বলিস হানিফা ?

জি, নেন।

হানিফা চোখ বন্ধ করে ফেলল। তার জ্বর বোধহয় বাড়ছে। চোখ ছোট ছোট হয়ে এসেছে। চোখের সাদা অংশ কেমন ঘোলাটে দেখাচ্ছে। মিসির আলি চিন্তিত মুখে বাড়িওয়ালার উদ্দেশে রওনা হলেন।

বাড়িওয়ালা করিম সাহেব বাসাতেই ছিলেন। পানি এখনো ছাড়া হয়নি শুনে তিনি খুব হৈচৈ করতে লাগলেন। বারবার বললেন, এই সামান্য কাজের জন্যে আপনি নিজে আসলেন প্রফেসর সাহেব! বড় লজ্জায় ফেললেন আমাকে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

মিসির আলি সাহেব বললেন, একটা টেলিফোন করা যাবে করিম সাহেব ?

একটা কেন, একশ'টা করা যাবে। যখন ইচ্ছা তখন করা যাবে। দরকার হলে ট্রাঙ্কল করবেন—খুলনা ময়মনসিংহ বরিশাল। টেলিফোনের বিল আবদুল করিমকে কিছু করতে পারবে না, বুঝলেন প্রফেসর সাহেব ? ওরে, টেলিফোনটা প্রফেসর সাহেবকে এনে দে। আর দেখ ঠান্ডা পেপসি বা সেভেন আপ কিছু আছে কি না।

কিছু লাগবে না।

আপনি না বললেই হবে নাকি ? আপনার একটা ইজ্জত আছে না ? ছয় মাসে এক বছরে একবার আসেন। আমি বলতে গেলে রোজই বসে থাকি আপনার ওখানে। আপনি ফ্যানটার নিচে ঠান্ডা হয়ে বসেন তো দেখি।

মিসির আলি বসলেন। বাড়িওয়ালা করিম সাহেব মিসির আলিকে একটু বিশেষরকম স্নেহ করেন। গত দু'বছরে তিনি প্রতিটি ফ্ল্যাটের ভাড়া তিন দফায় বাড়িয়েছেন, শুধু প্রফেসর সাহেবের ভাড়া এক পয়সাও বাড়েনি। কেন বাড়েনি কে জানে!

ফিরোজের মাকে টেলিফোনে পাওয়া গেল। তাঁর কাছ থেকে যে-সমস্ত তথ্য জানা গেল সেগুলো হচ্ছে—ফিরোজ ভালো আছে, সুস্থ এবং স্বাভাবিক। তার ঘরে একটি মাইক্রোফোন বসিয়ে ঘরের যাবতীয় শব্দ টেপ করা হয়েছে। টেপগুলো তিনি সন্ধ্যাবেলা পাঠাবেন।

ফিরোজের মা চিন্তিত স্বরে বললেন, আপনি অসুস্থ বলেছিলেন কেন ? আমরা খুব ভয়ে ভয়ে রাতটা কাটালাম। আপনার ওখানে সে কিছু করেছিল নাকি ?

না, তেমন কিছু করেনি। একটু উদ্‌ভ্রান্ত মনে হচ্ছিল। ফিরোজ কি আছে ঘরে ?

হ্যাঁ আছে। কথা বলবেন ?

বলব। দিন ওকে।

ফিরোজের গলা শান্ত ও স্বাভাবিক।

কেমন আছ ফিরোজ ?

ভালো।

কী করছিলে ?

কিছু করছিলাম না। একটা উপন্যাস নিয়ে বসেছিলাম।

কার উপন্যাস ?

জন স্টেইনবেক। নাম হচ্ছে গিয়ে আপনার, সুইট থার্সডে। স্যার, আপনি পড়েছেন এটা ?

গল্প-উপন্যাস আমি পড়ি-টড়ি না। একজন লেখকের বানানো দুঃখ-কষ্টের বিবরণ পড়ে কী হয় বলো ? এমনিতেই আমাদের চারদিকে প্রচুর দুঃখ-কষ্ট আছে।

স্যার, আপনাকে বইটা পড়তেই হবে। আমার পড়া শেষ হলেই আপনাকে দিয়ে আসব।

আচ্ছা, ঠিক আছে। শোনো ফিরোজ।

বলুন।

কাল রাতে তোমার কেমন ঘুম হয়েছিল ?

ভালো।

কী রকম ভালো ?

খুব ভালো। এক ঘুমে রাত পার করেছি। কী জন্যে জিজ্ঞেস করছেন স্যার ?

এমনি জানতে চাচ্ছি। কোনো স্পেসিফিক কারণ নেই। তুমি কি কাল রাতে কোনো স্বপ্ন দেখেছ ?

জি-না স্যার।

চট করে না বলে দিও না। চিন্তা করে তারপর বলো।

এবার ফিরোজ সময় নিল জবাব দেওয়ার আগে।

একটা স্বপ্ন দেখেছি। আর ওটা তো আমি প্রায়ই দেখি।

কোনটা ?

ঐ যে, ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিচ্ছি, তারপর দেখি কোনো প্রশ্নের উত্তর জানি না।

এটা ছাড়া আর কোনো স্বপ্ন দেখোনি ?

জি-না।

শোনো ফিরোজ, এছাড়াও যদি অন্য কোনো স্বপ্নের কথা মনে পড়ে, আমাকে জানিও।

জি আচ্ছা।

তুমি কি আজ সন্ধ্যার দিকে একবার আসবে ?

না স্যার, আজ আসব না। বইটা শেষ করব।

প্রেমের উপন্যাস নাকি ?

ফিরোজ লাজুক স্বরে বলল, হুঁ।

টেপগুলো পরীক্ষা করতে করতে রাত তিনটা বেজে গেল। প্রথম চারটি টেপে তেমন কিছু নেই। একবার শুধু কিছুক্ষণের জন্যে আহ্ উহ্ শব্দ। সেটা স্বপ্ন দেখার জন্যে, কিংবা বেকায়দা অবস্থায় শোয়ার জন্যে। তবে শেষ টেপটিতে মিসির আলির জন্যে বড় ধরনের বিস্ময় অপেক্ষা করছিল।

তিনি বিচিত্র একটি কণ্ঠস্বর শুনলেন সেখানে। তীক্ষ্ণ, তীব্র। হাই ফ্রিকোয়েন্সি। কথাগুলো এরকম—

অপরিচিত কণ্ঠস্বর হুঁ হুঁ ফিরোজ! ফিরোজ... (অস্পষ্ট)

ফিরোজের কণ্ঠস্বর না। না। উঁহ্ না।

অপরিচিত লোহার রডটা কোথায় ?

ফিরোজ জানি না, আমি জানি না।

অপরিচিত (অস্পষ্টভাবে কিছু বলল। নিঃশ্বাসের শব্দ।)

ফিরোজ না। না। না।

অপরিচিত লোহার রড। রড।

ফিরোজ না। না।

অপরিচিত (অস্পষ্টভাবে কিছু কথা। হাসির শব্দ।)

মিসির আলি অসংখ্যবার এই অংশটি বাজিয়ে বাজিয়ে শুনলেন। অস্পষ্ট অংশগুলো উদ্ধার করতে পারলেন না। অপরিচিত যে-কণ্ঠস্বর শুনছেন, তা ফিরোজেরই কণ্ঠস্বর। এটি তার একটি দ্বিতীয় সত্তা। সেকেন্ড পারসোনালিটি। ফিরোজকে পুরোপুরি সুস্থ করতে হলে তার দ্বিতীয় সত্তাটিকে ভালোভাবে বুঝতে হবে।

হানিফা ছটফট করছে। তার জ্বর কমেনি। এখন একশ' দুইয়েরও কিছু বেশি। মিসির আলি চিন্তিত বোধ করলেন। রাত দশটার দিকে জ্বর অনেক কম ছিল। নিরানব্বই পয়েন্ট পাঁচ। এখন এত বাড়ল কেন ?

হানিফা জেগে আছে। কিন্তু কোনোরকম সাড়াশব্দ করছে না। মিসির আলি কোমল গলায় বললেন, খারাপ লাগছে নাকি রে বেটি ?

না।

মাথার যন্ত্রণা আছে ?

আছে।

বেশি ?

জি।

মাথা টিপে দেব ?

হানিফা লজ্জিত স্বরে বলল, জি-না।

না কেন ? আরাম লাগবে। তার আগে মাথায় পানি ঢেলে জ্বরটা কমাতে হবে।

তিনি বাথরুমে ঢুকলেন পানির বালতির খোঁজে। তাঁর নিজের শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না। মাথা ভার ভার লাগছে। বমি-বমি লাগছে। শুয়ে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু একটি বাচ্চামেয়ে জ্বরে ছটফট করবে, আর তিনি শুয়ে থাকবেন—এটা হয় না।

হানিফার এ বাড়িতে আসার ইতিহাস বেশ বিচিত্র। গত বছর জুলাই মাসের দিকে একবার বেশ বড় একটা ঝড় হলো। রাত একটায় জেগে উঠে দেখেন, দড়ামদুড়ুম শব্দে জানালার পাট আছড়ে পড়ছে। বৃষ্টির ছাটে ঘর ভেসে যাচ্ছে। ইলেকট্রিসিটি নেই। চারদিক অন্ধকার। মোটামুটি একটি ভয়াবহ অবস্থা। তিনি জানালা বন্ধ করতে গিয়ে দেখলেন, আট-ন বছরের একটা বাচ্চা একা-একা দেয়াল ঘেঁসে বসে আছে।

কে রে তুই ?

মেয়েটি ভয় পাওয়া স্বরে বলল, আমি।

এখানে কী করছিস ?

ঘুমাইতাছি।

জেগে জেগে ঘুমাচ্ছিস নাকি ?

মেয়েটি জব[illegible] দিল না।

বাপ-মা [illegible] থায় ?

বাবা-মা নাই।

আত্মীয়স্বজন কেউ নেই ?

না।

তুই কি এরকম একা-একা মানুষের বারান্দায় ঘুমোস নাকি ?

মেয়েটি জবাব দিল না। মিসির আলি বললেন, ভয় লাগছে না তোর ?

না।

বলিস কী! নাম কী তোর ?

হানিফা।

আয়, ভেতরে আয়। ইস, ভিজে জবজবে হয়ে গেছিস তো!

মিসির আলি হ্যারিকেন জ্বালিয়ে তাকালেন মেয়েটির দিকে। ছেলেদের মতো ছোট ছোট করে কাটা চুল। আদুরে একটা মুখ।

তোর বাপের নাম কী ?

জানি না।

বলিস কী! মা'র নাম ?

জানি না।

তোর হাতে কী ? মুঠোর ভেতর কী আছে ?

হানিফা মুঠি খুলল। ভাংতি পয়সা।

ভিক্ষা করে পেয়েছিস ?

হুঁ।

মিসির আলি শুনলেন। দু'টাকা ত্রিশ পয়সা। এই বিশাল পৃথিবীতে আগামীকাল এই মেয়েটি যাত্রা শুরু করবে—দু'টাকা ত্রিশ পয়সা, একটা নোংরা ফ্রক এবং একটা তালি দেওয়া প্যান্ট নিয়ে। কোনো মানে হয় ?

তিনি একটি শুকনো লুঙ্গি বের করলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, কাপড় বদলে এটা পরে ফেল। নিউমোনিয়া বাধাবি তো। ঐ ঘরে একটা বিছানা আছে, ওখানে গিয়ে শুয়ে থাক।

মিসির আলি ভেবেছিলেন, সকাল হলেই সে চলে যেতে ব্যস্ত হয়ে যাবে। একবার যাযাবর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে গেলে বন্ধন আর ভালো লাগে না। কিন্তু হানিফা সকালবেলা চলে যাওয়ার কোনোরকম লক্ষণ দেখাল না। এমনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল, যেন এইটি তার ঘরবাড়ি।

হানিফার প্রতি সমাজের যে দায়িত্ব ছিল, মিসির আলি তা পালন করেছেন। নিজেই তাকে পড়তে শিখিয়েছেন। যোগ-ভাগ-গুণ শিখিয়ে নিয়ে গেছেন স্কুলে ভর্তি করাবার জন্যে। কেউ ভর্তি করাতে রাজি হয়নি। এত বড় মেয়েকে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি করানো সম্ভব নয়। তিনি হানিফাকে বলেছেন, ঠিক আছে, তুই ঘরে বসেই পড়াশোনা চালিয়ে যা। যথাসময়ে প্রাইভেটে তোকে দিয়ে ম্যাট্রিক দেওয়াব। আমি নিজে তো সবসময় দেখতে পারি না। একজন মাস্টার রেখে দেব।

শেষরাতের দিকে হানিফার জ্বর কমে এল। শরীর ঘামতে লাগল। সে বিড়বিড় করে নানান কথা বলতে লাগল। মেয়েটির বিড়বিড় করে বলা কথাগুলো থেকেই মিসির আলি বড় ধরনের একটি আবিষ্কার করলেন। তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না।

এই প্রসঙ্গে যথাসময়ে বলা হবে।

৪

সাইকোলজি বিভাগের সভাপতি ড. সাইদুর রহমানের মেজাজ সকাল থেকেই খারাপ। মেজাজ খারাপের প্রধান দুটি কারণের একটি হচ্ছে—সুইডেনে একটি কনফারেন্সে তাঁর যাওয়ার খুব শখ ছিল, কিন্তু আমন্ত্রণ আসেনি। তিনি চেষ্টা তদবিরের তেমন কোনো ত্রুটি করেননি। যেখানে একটা চিঠি দেওয়া দরকার, সেখানে তিনটি চিঠি দিয়েছেন। প্রফেসর নোয়েল বার্গকে বাংলাদেশের হস্তশিল্পের নমুনা হিসাবে একটি চটের ব্যাগ পাঠিয়েছেন, যেটা কিনতে তাঁর তিনশ' টাকা লেগেছে। রাজশাহীতে তৈরি খুব ফ্যান্সি ধরনের ব্যাগ। প্রফেসর নোয়েল বার্গ একটি চিঠিতে ব্যাগের জন্যে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, কিন্তু বহু প্রতীক্ষিত নিমন্ত্রণের চিঠি পাঠাননি।

সাইদুর রহমান সাহেবের মেজাজ খারাপের দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে—মিসির আলি সংক্রান্ত সমস্যা। মিসির আলি লোকটিকে তিনি মনেপ্রাণে অপছন্দ করেন। পার্টটাইম টিচার হিসেবে মিসির আলির অ্যাপয়েন্টমেন্টের বিপক্ষে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। লাভ হয়নি। অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে। এবং অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় ভাইস-চ্যান্সেলর সাহেব বলেছেন, কোনো পোস্ট অ্যাডভারটাইজ হওয়ামাত্র তাঁকে নেওয়া হবে।

সাইদুর রহমান সাহেব গত দু'বছরে কোনো পোস্ট অ্যাডভারটাইজড হতে দেননি। এডহক ভিত্তিতে একজনকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন।

তাঁর ধারণা ছিল এডহক অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্যে মিসির আলি হৈচৈ করবেন। কিন্তু মিসির আলি কিছুই করেননি। এটাও একটা রহস্য। এই লোকটির কি জীবনে উন্নতি করবার কোনোরকম ইচ্ছা নেই, না তার সবটাই ভান ?

মিসির আলির ওপর আজ ভোরবেলায় তাঁর রাগ চরমে উঠেছে। কারণ তিনি দেখেছেন, সুইডেন থেকে মিসির আলির নামে একটি খাম এসেছে। তাঁর ধারণা, এটা কনফারেন্সের নিমন্ত্রণপত্র। কারণ প্রেরকের নামের জায়গায় প্রফেসর নোয়েল বার্গের নাম আছে। প্রফেসর নোয়েল বার্গ হচ্ছেন কনফারেন্সের আহ্বায়ক।

সাইদুর রহমান সাহেব অফিসে খোঁজ নিলেন—মিসির আলি এসেছেন কি না। জানা গেল তিনি এসেছেন। কাজেই সুইডেনের সেই খাম নিশ্চয়ই খোলা হয়েছে। সাইদুর রহমান সাহেব হেডক্লার্ককে বললেন, মিসির আলি সাহেবের সঙ্গে যদি দেখা হয়, তাহলে বলবেন, আমি খোঁজ করছিলাম।

জি আচ্ছা স্যার।

তাঁকে তো খুঁজেই পাওয়া যায় না। ডিপার্টমেন্টে আসেন না নাকি ?

ক্লাস না থাকলে আসেন না।

গতকাল এসেছিলেন ?

জি, গতকাল এসেছিলেন। একজন ছাত্রীর ঠিকানা খুঁজে বের করবার জন্যে খুব হৈচৈ করলেন।

তাই নাকি ?

জি স্যার। নীলুফার ইয়াসমিন। সে দেড় বছর ধরে ইউনিভার্সিটিতে আসে না, এখন তার ঠিকানা খোঁজার জন্যে যদি অফিসের সব কাজকর্ম বন্ধ রাখতে হয়, তাহলে তো মুশকিল।

কাজকর্ম বন্ধ রাখতে হবে কেন ? এসব পার্সোনাল কাজের জন্যে তো অফিস না। আপনি স্ট্রেইট বলে দেবেন।

জি আচ্ছা স্যার।

তাছাড়া একজন টিচার ছাত্রীর ঠিকানার জন্যে ব্যস্ত হবে কেন ? এসব ঠিক না। নানান রকমের কথা উঠতে পারে।

মিসির আলি ভেবেই পেলেন না, ইউনিভার্সিটির একজন ছাত্রীর ঠিকানা বের করা এত সমস্যা হবে কেন ? অফিসে নেই। অফিস থেকে বলা হলো, সমস্ত রেকর্ডপত্র ডিন অফিসে। ডিন অফিসে গিয়ে জানলেন রেকর্ডপত্র আছে রেজিস্ট্রার অফিসে। রেজিস্ট্রার অফিসে যে কেরানি এসব ডিল করে, দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করেও তার দেখা পাওয়া গেল না। সকালবেলা সে নাকি এসেছিল। চা খেতে গিয়েছে। মিসির আলি রেজিস্ট্রার অফিসের ক্যান্টিনেও খুঁজে এলেন। দেখা পাওয়া গেল না। আবার আসতে হবে আগামীকাল।

ডিপার্টমেন্টে ফিরে এসে শুনলেন—সাইদুর রহমান সাহেব তাঁকে খোঁজ করেছেন। মিসির আলি বিস্মিত হলেন। সাইদুর রহমান সাহেব তাঁকে পছন্দ করেন না। বড় রকমের প্রয়োজনেও তাঁর খোঁজ করেন না। আজ করছেন কেন ?

স্লামালিকুম স্যার।

ওয়ালাইকুম সালাম।

আপনি কি আমার খোঁজ করছিলেন ?

বসুন মিসির আলি সাহেব। আছেন কেমন ?

ভালো।

মিসির আলি বসলেন।

কী জন্যে ডেকেছিলেন ?

তেমন কিছু না।

সাইদুর রহমান সাহেব সিগারেট ধরালেন। সুইডেনের চিঠির প্রসঙ্গ তুলবেন কি না বুঝতে পারলেন না। তুললেও এমনভাবে তুলতে হবে, যাতে এই লোক বুঝতে না পারে, তিনি এই ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী।

মিসির আলি বললেন, স্যার, আপনি কি কিছু বলবেন ?

তেমন ইম্পর্টেন্ট কিছু না। সুইডেনের কনফারেন্সের খবর কিছু জানেন ? মানে আমার যাওয়ার কথা ছিল। পেপারের অ্যাবস্ট্রাক্ট পাঠিয়েছিলাম প্রফেসর নোয়েলের কাছে।

মিসির আলি সহজ গলায় বললেন, আমি ওদের ইনভাইটেশন পেয়েছি। পেপার দেওয়ার জন্যে বলেছে।

তাই নাকি ?

সাইদুর রহমান সাহেব নিভে গেলেন। টেনে টেনে বললেন, যাচ্ছেন কবে নাগাদ ? এক সপ্তাহের ভেতরই তো রওনা হওয়া উচিত ?

আমি যাচ্ছি না স্যার।

কেন ?

আমার কাজের মেয়েটি অসুস্থ।

সাইদুর রহমান সাহেব নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। কাজের মেয়ে অসুস্থ, এই জন্যে সে সুইডেন যাবে না। বদ্ধ উন্মাদ নাকি!

কাজের মেয়ে অসুস্থ, সেই কারণে যাচ্ছেন না ?

ওটা একটা কারণ। তাছাড়া অন্য একটি কারণ আছে।

জানতে পারি ?

নিশ্চয়ই পারেন। আমি একজন রোগীর মনোবিশ্লেষণ করছি। এই মুহূর্তে আমার পক্ষে বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়।

সত্যি বলছেন ?

মিসির আলি অবাক হয়ে বললেন, মিথ্যা বলব কেন ?

আপনি কি আপনার ডিসিশন ওদেরকে জানিয়েছেন ?

আজই তো মাত্র চিঠি পেলাম।

তবু আপনার উচিত ইমিডিয়েটলি আপনার ডিসিশন ওদের জানানো। হয়তো ওদের কোনো অলটারনেট ক্যানডিডেট আছে।

স্যার, আপনার কি সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা ? ইচ্ছা থাকলে বলেন।

বলব মানে! আপনি কী করবেন ?

নোয়েল আমার বন্ধুমানুষ। ইংল্যান্ডে আমরা একসঙ্গে ছিলাম। আমার তিনটা পেপার আছে, যেখানে নোয়েল হচ্ছে একজন কো-অথর। আপনার বোধহয় চোখে পড়েনি।

সাইদুর রহমান সাহেবের মুখ তেতো হয়ে গেল। তিনি বিরক্ত স্বরে বললেন, সুইডেন কি একটা যাওয়ার মতো জায়গা ? আছে কী সেখানে বলুন ? দেখার কিছু আছে ? কিছুই নেই। একটা ফালতু জায়গা।

দেখাদেখিটা তো ইম্পর্টেন্ট নয়। সেমিনারটাই প্রধান। সারা পৃথিবী থেকে জ্ঞানীগুণীরা আসবেন।

ঐসব কচকচানি শুনে কোনো লাভ হয় ? কোনোই লাভ হয় না। শুধু বড় বড় কথা।

এটা ঠিক বললেন না। সেখানে যাঁরা আসবেন, তাঁরা কথার চেয়ে কাজ অনেক বেশি করেন। বিশেষ করে এমন কিছু লোক আসবেন, যাঁদের দেখলে পুণ্য হয়।

আপনিও তো ওদের নিমন্ত্রিত, তার মানে বলতে চাচ্ছেন, আপনাকে দেখলেও পুণ্য হবে ?

মিসির আলি একটু হকচকিয়ে গেলেন। পর মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, তা হবে। আপনি অনেকক্ষণ আমাকে দেখলেন। অনেক পুণ্য করলেন। উঠি স্যার ?

ড. সাইদুর রহমান বহু কষ্টে রাগ সামলালেন। মনে-মনে এমন কিছু গালাগালি দিলেন, যা তাঁর মতো অবস্থার ব্যক্তিরা কখনো দিতে পারে না। এর মধ্যে একটি গালি ভয়াবহ।

৫

বছরখানেক হলো নীলুর বাবা জাহিদ সাহেবের স্বাস্থ্য দ্রুত ভাঙতে শুরু করেছে। এমন কিছু অসুখ তাঁকে ধরেছে, যা শুধু কষ্টকর নয়, অত্যন্ত বিরক্তিকর। কিছুই হজম হয় না। পানি মেশানো দুধ, লেবুর রস দিয়ে বার্লি, এক স্লাইস রুটি বা শিং মাছের মসলাবিহীন ঝোল—কিছুই না। ডাক্তার প্রায় সবই দেখানো হয়েছে। ডাক্তাররা বলেছেন, লিভার কাজ করছে না। ডাক্তারদের শুকনো ধরনের কথাবার্তা, ইতস্তত ভাবভঙ্গি থেকে তাঁর ধারণা হয়েছে—অসুখটা জটিল। হয়তোবা লিভার ক্যানসার-ট্যানসার বাধিয়ে বসেছেন। ডাক্তাররা সরাসরি তাঁকে কিছু বলেন না। তিনিও জিজ্ঞাসা করতে ঠিক সাহস পান না।

নীলুর সঙ্গে এই নিয়ে আলাপ করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু নীলু তাঁর সঙ্গে তেমন কোনো কথাবার্তা বলে না। তিনি কিছু একটা বলতে শুরু করলে মন দিয়ে শোনে, কিন্তু কথার মাঝখানে এমন একটি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে বসে যে, তাঁর ধারণা হয় নীলু আসলে কিছু শুনছে না। শুধু তাকিয়েই আছে।

নীলুকে ইদানীং তিনি ভয় করেন। যে-নীলু তাঁর সঙ্গে থাকে, তাকে তাঁর নিজের মেয়ে বলে কখনো মনে হয় না। এ যেন একটি অচেনা মেয়ে—যাকে কোনোদিনই ঠিক চেনা যাবে না।

অবশ্যি নীলু তাঁর সঙ্গে একেবারেই যে কথাবার্তা বলে না, তা নয়। কথাবার্তা বলে। এসে জিজ্ঞেস করে, চা লাগবে বাবা ? এই পর্যন্তই। তিনি যদি বলেন লাগবে, তাহলে সে উঠে গিয়ে চা বানিয়ে কাজের ছেলেটির হাতে পাঠিয়ে দেবে। যদি বলেন লাগবে না, তাহলে চুপ করে যাবে। দ্বিতীয় কোনো কথা বলবে না।

জাহিদ সাহেব আজকাল তাঁর দ্বিতীয় মেয়েটির অভাব অনুভব করেন। সে পাশে থাকলে বাসার অবস্থা হয়তো আরেকটু স্বাভাবিক হতো। বিলুর বিয়েটা তিনি ভালো দিতে পারেননি। অথচ তখন মনে হয়েছিল, কী চমৎকার একটি ছেলে! তিনি বারবার জিজ্ঞেস করেছেন, তুমি দেশে চলে আসবে তো বাবা ? বিদেশে সেটল করবে না তো ? আমি আমার মেয়েকে দেশান্তরী করতে চাই না। আমি একা মানুষ, আমি চাই আমার দুটি মেয়ে আমার আশেপাশেই থাকবে।

বিলুর বর হাসিমুখে বলেছে, বিদেশে সেটল করব কেন ? কী আছে ওখানে ? মানুষ হিসেবে কোনো দাম আছে আমাদের ? আমি বছরখানেক থাকব। কিছু টাকাপয়সা জমিয়ে দেশে ফিরব। মাথা গুঁজবার মতো একটা বাড়ি তো কিনতে হবে।

জাহিদ সাহেব ছেলের কথা বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু এখন জানতে পেরেছেন, সে মনটানাতে একটা বাড়ি কিনেছে। যে-ছেলে দেশে চলে আসবে, সে নিশ্চয় বিদেশে বাড়ি কেনে না। তাছাড়া, বিলু সুখী হয়নি বলে তাঁর ধারণা। বিলুর চিঠিপত্রে অবশ্য কিছু লেখা থাকে না। চিঠিগুলো প্রাণহীন। যেন লেখার জন্যেই লেখা। দায়িত্ব পালনের চিঠি। একজন সুখী মেয়ের চিঠিতে থাকবে আনন্দের ছবি। সে তার বরের কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখবে। খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে উচ্ছ্বাস থাকবে। সেসব কিছু থাকে না। বাবা হিসেবে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। সৎপাত্রে মেয়েকে বিয়ে দিতে পারেননি। অথচ ছেলেটিকে সত্যি সত্যি তাঁর পছন্দ হয়েছিল। ভদ্র ছেলে। চমৎকার কথাবার্তা। দারুণ শার্প। সেই সঙ্গে রসিক। খাওয়ার টেবিলে একবার সে এক গল্প শুরু করল। এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে এক ভণ্ড তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেছে। হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়েছে তর্কযুদ্ধ দেখতে। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মঞ্চে বসে আছেন। ভণ্ড পণ্ডিত ঢুকল এবং গম্ভীর হয়ে বলল—'ফুন ফুনাফুন ?' দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তিনি তাঁর সারা জীবনে 'ফুন ফুনাফুন' বলে কিছু শোনেননি। এর মানে কী, তা তাঁর জানা নেই।

ভারী মজার গল্প। জাহিদ সাহেব গল্প শুনে হাসতে হাসতে বিষম খেলেন। নীলু মতো গম্ভীর মেয়েও হেসে ফেলল। এই কি সেই ছেলে ?

জাহিদ সাহেব আজকাল বেশির ভাগ সময়ই বারান্দায় বসে এইসব কথা ভেবে ভেবে কাটান। দু'তিনটে পত্রিকা তাঁর হাতের কাছে থাকে, সে-সব পড়া হয় না। পনের খণ্ড মুক্তিযুদ্ধের দলিল কিনেছেন। শখ ছিল গোড়া থেকে পড়বেন, তা পড়তে পারছেন না। ইচ্ছা করে না। মাঝে মাঝে শুধু অষ্টম খণ্ডে চোখ বুলিয়ে যান। অষ্টম খণ্ড হচ্ছে অত্যাচার ও নির্যাতনের কাহিনী। পড়তে পড়তে তাঁর বুক হুহু করে।

আজও তাই করছিলেন। হঠাৎ লক্ষ করলেন, নীলু তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। নীলু নিঃশব্দে চলাফেরা করে। হঠাৎ উপস্থিত হয়ে চমকে দেয়। জাহিদ সাহেব বললেন, কী খবর মা ?

কোনো খবর নেই বাবা।

কোথাও বেরুচ্ছিস ?

না।

নীলু বসল তাঁর পাশের চেয়ারে। তিনি লক্ষ করলেন, নীলু বেশ সাজগোজ করেছে। কপালে টিপ। সুন্দর একটি শাড়ি। খোঁপায় ফুল পর্যন্ত দিয়েছে। জাহিদ সাহেব বললেন, তোর স্যার তো আর এলেন না।

উনি এসেছিলেন। বাড়ি চিনতে পারেননি। রিকশা করে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে দু'বার গেলেন।

তুই দেখেছিস ?

নীলু কিছু বলল না। সে দেখেনি। না দেখেই বলেছে। খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু জাহিদ সাহেব জানেন অস্বাভাবিক হলেও এটা সত্যি। নীলু না দেখেই অনেক কিছু বলতে পারে। কেমন করে পারে, তা তিনি জানেন না। জানতে চানও না। নীলুর এই অস্বাভাবিক ক্ষমতাকে তিনি ভয় করেন।

কোনোদিন ভোরবেলায় নীলু এসে বলে, বাবা, আজ তোমার দিনটি ভালো যাবে। আজ বিলুর চিঠি পাবে।

তিনি হাসতে চেষ্টা করেন, কিন্তু হাসি ঠিক আসে না।

চিঠির সঙ্গে ছবিও পাবে। সুন্দর সুন্দর ছবি পাঠিয়েছে বিলু।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

নীলু হাসে। এই নীলু আগের নীলু নয়। এই নীলুকে তিনি চেনেন না।

জাহিদ সাহেব বললেন, তোর স্যার এসেছিলেন, তাঁকে ডেকে ঘরে আনলি না কেন ?

উনি নিজেই খুঁজে বের করবেন। আমাদের এই স্যার কোনো জিনিসই মাঝপথে ছেড়ে দেন না।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। খুব মেথডিকেল মানুষ। তোমার সঙ্গে তো বাবা উনার একবার দেখা হয়েছিল।

আমার মনে নেই।

নীলু হাসতে হাসতে বলল, স্যারটা খুব আনইমপ্রেসিভ। তাঁর কথা মনে না থাকারই কথা।

জাহিদ সাহেব নীলুর গলায় এক ধরনের আবেগ অনুভব করলেন। এই আবেগের কারণ কী ? তিনি প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বললেন, খুব গরম পড়েছে এবছর।

নীলু বলল, প্রতি বছর গরমের সময় তুমি এই কথাটা বলো। আবার শীতের সময় বলো—এ বছর মারাত্মক শীত পড়েছে। বলো না বাবা ?

বলি বোধহয়।

আমরা বেঁচে থাকি বর্তমানকে নিয়ে। অতীতের কথা আমাদের কিছু মনে থাকে না।

কথাটা কি ঠিক ? না, ঠিক নয়। কিছু কিছু অতীত তার কালো সিল শক্ত করে বসিয়ে দেয়, কিছুতেই তা তুলে ফেলা যায় না। নীলুর বিয়ের চেষ্টা করতে গিয়ে তিনি প্রথম তা লক্ষ করলেন। যে-কোনো আলাপ অল্পকিছুদূর এগুনোর পরই বরপক্ষের লোকজন জানতে পেরে যায়, তাঁর এই মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল একটি বাড়িতে। যে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, সে একজন ভয়াবহ খুনি। কিন্তু কাউকেই তিনি বিশ্বাস করাতে পারেননি যে, সেই খুনি নীলুকে স্পর্শ করতে পারেনি। কোনো-এক রহস্যময় কারণে তার মৃত্যু হয়েছিল। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে ডাক্তার অবশ্যি লিখেছিল—মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে মৃত্যু। কিন্তু জাহিদ সাহেব তা বিশ্বাস করেন না। তিনি জানেন মৃত্যুর কারণ অমীমাংসিত এবং রহস্যময়।

সেই রহস্য তাঁর মেয়েকে এখনো ঘিরে আছে। তিনি তা চান না। তিনি তাঁর মেয়ের জন্যে একটি সহজ স্বাভাবিক জীবন চান। একটি ছোট্ট সুখী সংসার। দুটি শিশু, তিনি যাদের হাত ধরে পার্কে বেড়াতে যাবেন। বাদাম কিনে দিবেন। একজন হঠাৎ পড়ে গিয়ে ব্যথা পাবে। তিনি কোলে নিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করবেন। তাই দেখে অন্যজনের হিংসা হবে। তাকেও কোলে নিতে হবে। কেউ তখন আর কোল থেকে নামতে চাইবে না। বড় ঝামেলায় পড়ে যাবেন তিনি।

তাঁর চিন্তায় বাধা পড়ল। নীলু হেসে উঠল খিলখিল করে। পুরনো দিনের নীলুর মতো। জাহিদ সাহেব অবাক হয়ে বললেন, হাসছিস কেন ?

তুমি কী অদ্ভুত সব কল্পনা করো বাবা!

নীলু হাসতে হাসতে উঠে চলে গেল। জাহিদ সাহেব স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। এ কোন নীলু ? এই ভয়ঙ্কর ক্ষমতার উৎস কী ?

৬

মিসির আলি হানিফাকে পিজিতে ভর্তি করিয়ে দিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, মেয়েটি একা-একা থাকতে ভয় পাবে। কিন্তু হানিফা ভয় পেল না।

থাকতে পারবি তো ?

হুঁ।

অনেক রকম পরীক্ষা-টরীক্ষা করবে ডাক্তাররা। ভয়ের কিছু নেই।

আমি ভয় পাই না।

তিনি ভেবে দেখলেন, মেয়েটির ভয় না পাওয়ারই কথা। যে জীবন শুরু করেছে রাস্তায়, তার আবার ভয় কিসের ?

হানিফা।

জি।

আমি দু'দিনের জন্যে ঢাকার বাইরে যাব। মোহনগঞ্জ যাব। তুই থাকতে পারবি তো ?

পারব।

দু'দিন পরই এসে পড়ব। এর মধ্যে ডাক্তাররা পরীক্ষা-টরীক্ষা যা করবার করবেন। তাছাড়া আমি আমাদের বাড়িওয়ালাকে বলে যাব, তিনি খোঁজখবর করবেন।

খোঁজখবরের দরকার নাই।

দরকার থাকবে না কেন ? দরকার আছে। যাই তাহলে, কেমন ?

জি আচ্ছা।

মিসির আলি বিমর্ষ মুখে বের হয়ে এলেন। মেয়েটির অসুখ তাঁকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছেন ডাক্তারের পরামর্শে। ডাক্তারের ধারণা, হার্টসংক্রান্ত কোনো সমস্যা। ইসিজি টিসিজি করাতে হবে। হার্টবিট খুবই নাকি ইররেগুলার।

তাঁর ট্রেন রাত ন'টায়। তিনি ঠিক করলেন, রওনা হওয়ার আগে পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলে যাবেন। পুলিশ কমিশনার সাজ্জাদ হোসেন তাঁর কলেজ জীবনের বন্ধু। খুব-একটা পরিচয় তখন ছিল না। এখন হয়তো চিনতেই পারবে না। তবু পুরনো পরিচয়ের সূত্র টানা যেতে পারে। গরজটা যখন তাঁর।

সাজ্জাদ হোসেন তাঁকে চিনলেন। শুধু যে চিনলেন তাই নয়, উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। জড়িয়ে-টড়িয়ে ধরে একটা কাণ্ড করলেন। পুলিশের লোকদের মধ্যে এতটা আবেগ থাকে, তা মিসির আলি ভাবেননি। তাঁর ধারণা ছিল, দিন-রাত ক্রাইম নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে এরা আবেগশূন্য হয়ে পড়ে। সেটাই স্বাভাবিক।

সাজ্জাদ হোসেন বললেন, ফ্যানটার নিচে আগে আরাম করে বস, তারপর বল কী দরকারে এসেছিস। পুলিশের কাছে কেউ বিনা প্রয়োজনে আসে না।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। পুলিশ এবং ডাক্তার—এই দু'ধরনের মানুষের কাছে কেউ বিনা প্রয়োজনে যায় না। এখন তুই বল, কী ব্যাপার ? আত্মীয়স্বজন কাউকে পুলিশে ধরেছে ?

না, সেসব কিছু না।

নে, সিগারেট নে। নিশ্চিন্তে খা। ঘুসের পয়সায় কেনা নয়। নিজের কষ্টে উপার্জিত রোজগার থেকে কেনা। হা হা হা!

মিসির আলি সিগারেট ধরালেন। সাজ্জাদ বললেন, বিয়ে-টিয়ে করেছিস ?

না।

জানতাম করবি না। তুই হচ্ছিস একটা অড-বল। আমি বিয়ের পাট চুকিয়েছি আট বছর আগে। বাচ্চাকাচ্চা কিছু হয়নি। হবেও না।

সাজ্জাদ হোসেনের চোখে-মুখে ক্ষণিকের জন্য একটা ছায়া পড়ল। কিন্তু তিনি তা নিমেষেই কাটিয়ে উঠলেন। হাসিমুখে বললেন, জেসমিন চৌধুরী।

মিসির আলি চিনতে পারলেন না। সাজ্জাদ হোসেন অবাক হয়ে বললেন, সত্যি চিনতে পারছিস না ? ও তো টিভিতে অভিনয় করে। মারাত্মক! তাকে কেউ চেনে না, এটা তো আমি ভাবতেই পারি না।

টিভি নেই আমার বাসায়।

বলিস কী! বাসায় খাট-পালঙ্ক আছে তো ? নাকি মেঝেতে পাটি পেতে ঘুমাস ? হা হা হা। এখন বল তোর সমস্যা।

আমার একটি কাজের মেয়ে আছে—হানিফা।

জিনিসপত্র নিয়ে ভেগে গেছে ?

না, তা না। আমি এই মেয়েটির অতীত ইতিহাস খুঁজে বের করতে চাই। সেটা কীভাবে করা সম্ভব, তা-ই জানার জন্যে তোর কাছে আসা।

পাস্ট হিস্ট্রি জানতে চাস কেন ?

মেয়েটি জানে না, তার বাবা-মা কে। আত্মীয়স্বজন কে কোথায়, তাও বলতে পারে না। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই সে দেখেছে যে, সে ভাসছে। আমি ওর বাবা-মাকে ট্রেস করতে চাই।

সাজ্জাদ হোসেন গম্ভীর স্বরে বললেন, খামোখা চেষ্টা করছিস। কিছুই ট্রেস করা যাবে না। সম্ভবত জন্ম হয়েছে বেশ্যাপল্লীতে। তারপর হারিয়ে গেছে সেখান থেকে।

আমার তা মনে হয় না।

কেন মনে হয় না ?

মিসির আলি তার জবাব না দিয়ে বললেন, আমার মনে হয় মেয়েটির শৈশব কেটেছে বিদেশে।

চোখ নীল ? ব্লন্ড চুল ?

না। মেয়েটি বাঙালিই, কিন্তু বাবা-মা হয়তো বিদেশে ছিলেন।

কেন বলছিস এসব ? তোর লজিক কী ?

মিসির আলি আরেকটা সিগারেট ধরালেন। এবং থেমে থেমে বললেন, হানিফা মেয়েটি গত পরশু রাতে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রচণ্ড জ্বর। জ্বরের ঘোরে সে বিড়বিড় করে বলছিল—'ইট হার্টস, ইট হার্টস।'

সাজ্জাদ হোসেন তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলেন। মিসির আলি বলে চললেন, আমার মনে হয়, খুব ছোটবেলায় মেয়েটি যখন অসুস্থ ছিল, তখন সে তার মাকে বলত—'মামি, ইট হার্টস।' পরশু রাতে প্রচণ্ড জ্বরের মুখে অতীতের চাপা-পড়া কথাগুলো বের হয়ে এসেছে। অবচেতন মন সেই সময় সক্রিয় হয়ে ওঠে। এ জাতীয় ব্যাপারগুলো ঘটে।

সাজ্জাদ হোসেন শুধু বললেন, ভেরি ইন্টারেস্টিং!

মিসির আলি বললেন, হারিয়ে যাওয়া ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে বাবা-মা নিশ্চয়ই থানায় ডায়েরি করান। সেখান থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না ? ধর, আমি যদি জানতে চাই, পাঁচ থেকে আট বছর আগে কোন কোন বাচ্চা নিখোঁজ হয়েছিল— জানা যাবে কি ?

না, এত পুরনো রেকর্ডপত্র কে বের করবে বল ? এটা তো ইংল্যান্ড আমেরিকা না যে, সব কম্পিউটারে ঢোকানো আছে, বোতাম টিপলেই বেরিয়ে আসবে।

পুরনো রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা নেই ?

নতুন রেকর্ড রাখারই জায়গা নেই, আর পুরনো রেকর্ড! একটা মিসিং পার্সন ব্যুরো আছে, সেখানে কোনো কাজ হয় না। তাছাড়া সেন্ট্রালি ইনফরমেশন রাখার কোনো ব্যবস্থা আছে বলে আমার মনে হয় না। প্রতিটি থানায়ও আলাদা আলাদাভাবে খোঁজ করতে হবে। সেটা একটা বিশাল ব্যাপার।

বিশাল হলেও নিশ্চয়ই অসম্ভব না।

কিছুটা অসম্ভবও।

তোর পক্ষে কিছু করা সম্ভব না ?

সাজ্জাদ হোসেন গম্ভীর হয়ে রইলেন। মিসির আলি বললেন, আমি নিজে সমস্ত পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারি।

সেটা মন্দ না, গুড আইডিয়া।

না, আইডিয়াটা খুব গুড নয়।

নয় কেন ?

অন্য এক সময় বলব, কেন নয়। আজ উঠতে হবে। ময়মনসিংহ যাচ্ছি একটা জরুরি কাজে। ফিরে এসে তোর সাথে যোগাযোগ করব।

মিসির আলি উঠে পড়লেন।

৭

ফিরোজরা ধানমণ্ডির যে বাড়িটিতে থাকে, তাকে বাড়ি না বলে রাজপ্রাসাদ বলা যেতে পারে। বিশাল একটি দোতলা বাড়ি। বাড়ির চারপাশে জেলের মতো উঁচু পাঁচিল। গেটে বড় বড় করে লেখা—'কুকুর হইতে সাবধান'। গেটটি চব্বিশ ঘণ্টাই বন্ধ থাকে। বন্ধ গেট ডিঙিয়ে ভেতরে ঢোকা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারণ দারোয়ান একজন আছে, যে প্রায় কখনোই গেটের কাছে থাকে না। আর থাকলেও ভান করে যে, কলিং বেলের শব্দ শুনতে পায়নি।

পৃথিবীর প্রায় সব জায়গাতেই বিশাল বাড়িগুলো জনশূন্য হয়ে থাকে। এ বাড়িতেও তা-ই। তিনটি প্রাণী এ বাড়িতে বাস করে। ফিরোজ এবং তার বাবা ও মা। বাড়ির কাজকর্ম দেখাশোনার জন্যে দশজনের একটা বাহিনী আছে। তবে রাতে তারা এ বাড়িতে

ঘুমায় না। বাড়ির পেছনেই হোস্টেল ঘরের মতো চার-পাঁচটা রুমের একটা টিনের হাফ-বিল্ডিং আছে। এরা রাতে সেখানে থাকে। মূল বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা হচ্ছে কলিং বেল। রাতেরবেলায় প্রয়োজন হলে কলিং বেল টিপে এদের ডাকা হয়। সে প্রয়োজন সাধারণত হয় না।

ফিরোজের অসুখের পর অবস্থা খানিকটা বদলেছে। তার ঘরের সামনের বারান্দায় রহমতের শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। কাদেরের মাকেও মূল বাড়ির একতলায় থাকতে দেওয়া হয়েছে। তবে এ ব্যবস্থা সাময়িক।

ফিরোজের বাবা ওসমান সাহেবের বয়স প্রায় ষাট। ফিরোজ তাঁর তিন নম্বর ছেলে। ফিরোজের আগে দু'টি ছেলে যথাক্রমে ন'বছর এবং এগার বছর বয়সে মারা যায়। দু'টি মৃত্যুই অস্বাভাবিক। বড় ছেলে মারা যায় পিকনিক করতে গিয়ে। স্কুলের সব ছেলেরা দল বেঁধে গিয়েছিল সালনায়। পিকনিক শেষ করে সবাই ফিরে এল, কেউ লক্ষই করল না একটি ছেলে কম। সালনার পুকুরে সে ভেসে উঠেছিল।

ওসমান সাহেবের মধ্যম ছেলেটি মারা গেছে রোড এ্যাক্সিডেন্টে। সে রাস্তা পার হওয়ার সময় আচমকা দৌড় দেয়নি বা হঠাৎ কোনো ট্রাকের সামনে গিয়ে পড়েনি। সে হাঁটছিল ফুটপাত ধরেই। কিন্তু সিমেন্টের বস্তা বোঝাই একটি ট্রাক সেই ছুটির দিনের সকালে ফুটপাতে উঠে গিয়েছিল।

যে পরিবারের দু'টি ছেলে অপঘাতে মারা যায়, সেই পরিবারের বাবা-মা সাধারণত ভেঙে পড়েন। এই পরিবারটির ক্ষেত্রে সেরকম কিছু ঘটেনি। ওসমান সাহেব অত্যন্ত শক্ত ধরনের মানুষ। কোনো কারণে বিচলিত হওয়া তাঁর স্বভাবের মধ্যেই নেই। তাঁর স্ত্রী ফরিদা স্বামীর এই গুণ কিছু পরিমাণে পেয়েছেন। বড় বড় ঝড়-ঝাপটাতে মোটামুটি স্থির থাকতে পারেন।

ফিরোজের ভয়াবহ বিপর্যয়েও তাঁরা স্বামী-স্ত্রী স্থির ছিলেন। ধৈর্য হারাননি। ফরিদা একবার শুধু বলেছিলেন, আমাদের ওপর কারওর অভিশাপ আছে। আর তাতেই ওসমান সাহেব এমন ভঙ্গিতে তাকিয়েছিলেন যে, তিনি দ্বিতীয়বার এ জাতীয় কথা বলেননি। স্বামীকে তিনি বেশ ভয় পান। তাঁর ইচ্ছা ছিল ফিরোজকে চিকিৎসার জন্যে বিদেশে নিয়ে যান। তাও সম্ভব হয়নি ওসমান সাহেবের জন্যে। তিনি বারবার জোর দিয়ে বলেছেন, আমি আমার বদ্ধ উন্মাদ ছেলেকে বিদেশে নিয়ে যাব না। কিছুটা সুস্থ হোক, তারপর নিয়ে যাব।

ফরিদা বলেছিলেন, চিকিৎসা যে করছে, সে তো ডাক্তার না। একজন ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করাও। ভদ্রলোক মাস্টার মানুষ, উনি কী চিকিৎসা করবেন ?

যদি কেউ কিছু করতে পারে, উনিই পারবেন। ধৈর্য ধরো।

তিনি ধৈর্য ধরলেন। ধৈর্য ধরা বিফলে যায়নি। ফিরোজ এখন সুস্থ। ভয়াবহ একটা স্তর সে পার হয়েছে। ওসমান সাহেবের ধারণা, ফিরোজ এখন পুরোপুরি ভালো। সহজ-স্বাভাবিক মানুষ। কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো পড়াশোনা শুরু করবে। এখন তাকে নিয়ে বাইরে যাওয়া যায়। পাহাড়ের উপরে কোনো ঠান্ডা জায়গায়। হাতের কাছেই আছে

নেপাল। প্লেনে যেতে তেতাল্লিশ মিনিট লাগে। ওসমান সাহেব ঠিক মনস্থির করতে পারছেন না। এখনো হয়তো ফিরোজকে নিয়ে বাইরে বেরুবার মতো অবস্থা হয়নি। মিসির আলি সেরকমই বলেছেন। মিসির আলির মতের সঙ্গে তিনি একমত নন। তবু তাঁকে অগ্রাহ্য করার সাহস হয় না। হয়তো আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। ততক্ষণে বর্ষা শুরু হবে। তিনি শুনেছেন, বর্ষায় নেপাল দর্শনীয় নয়। দিনরাত টিপটিপ করে বৃষ্টি। হোটেলের ঘরেই বন্দি জীবন যাপন করতে হবে।

ওসমান সাহেব একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। তিনি অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। এটা একটা নতুন ব্যাপার। তাঁর জীবনে ধৈর্যের অভাব কোনোদিন ছিল না। তিনি সমস্ত জটিলতাকে সহজভাবে গ্রহণ করেন। এখন কি তা পারছেন না? ওসমান সাহেব চুরুট ধরিয়ে ক্লান্ত গলায় ডাকলেন, ফরিদা, ফরিদা।

ফরিদা পাশের ঘরেই ছিলেন। তিনি ঘরে ঢুকলেন।

ফিরোজ কেমন আছে আজ?

ভালো।

কী করছে?

ভেতরের বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে আছে।

শুধু শুধু বসে আছে?

না, কী যেন করছে। ডাকব?

ডাকো।

ফরিদা ডাকতে গেলেন। এবং ফিরে এলেন কাউকে না নিয়ে।

ফিরোজ ঘুমাচ্ছে।

দুপুর এগারটায় কিসের ঘুম?

ওসমান সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। যদিও বিরক্ত হওয়ার কোনোই কারণ নেই। জুন মাসের দুপুরবেলায় কারও চোখে ঘুম জড়িয়ে আসাটা অন্যায় নয়। তাঁর নিজেরই ঘুমঘুম পাচ্ছে।

ফরিদা বললেন, তোমার কী হয়েছে? এমন রেগে কথা বলছ কেন?

রেগে কথা বলছি নাকি?

হুঁ। বেশ কয়েক দিন থেকেই লক্ষ করছি অল্পতেই ইউ আর লুজিং ইওর টেম্পার। তোমার ব্লাড প্রেসার কি বেড়েছে?

না।

চেক করিয়েছ?

না।

চেক না করিয়ে কীভাবে বলছ, বাড়েনি? আমার তো মনে হয় বেড়েছে। শম্ভুবাবুকে ডাকি?

কাউকে ডাকতে হবে না। তুমি তোমার নিজের কাজ করো।

আমার আবার কী কাজ যে করব ?

ওসমান সাহেব বুঝতে পারছেন, তাঁর মেজাজ খারাপ হতে শুরু করেছে। অসম্ভব খারাপ। এই মুহূর্তে তা চেক করা উচিত। রাগ সামলাবার কী-একটা পদ্ধতি যেন পড়েছিলেন বইয়ে। পায়ের নখের দিকে তাকিয়ে এক থেকে কুড়ি পর্যন্ত গোনা। কিন্তু তাঁর পায়ে জুতো। তিনি পায়ের নখের দিকে তাকাতে পারছেন না।

ফরিদা বললেন, তুমি এরকম করছ কেন ?

কী রকম করছি ?

অস্বাভাবিক আচরণ করছ।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, তাই। আজ দশটায় তোমার বোর্ড মিটিং ছিল। কোনো কারণ ছাড়াই তা ক্যানসেল করেছ। এবং...।

বলো, কী বলতে চাও—থেমে গেলে কেন ?

বেশ কিছুদিন থেকেই তুমি কোনো কাজকর্ম দেখছ না।

তাতে কিছুই আটকে নেই ফরিদা। আমি বিশ্রাম করছি। আমি ক্লান্ত। আমার মতো বয়সের একটি মানুষের ক্লান্ত হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

ফরিদা ওসমান সাহেবের চেয়ারে বসলেন। চেয়ারের দুহাতলে নিজের হাত তুলে দিলেন। বসার ভঙ্গি অনেকটা সিংহাসনে বসার মতো। ওসমান সাহেব তাঁর স্ত্রীর বসার এই ভঙ্গিটির সঙ্গে পরিচিত। এভাবে বসা মানেই ফরিদা যুক্তি দিয়ে কিছু বলবে। সে যুক্তিগুলো কিছুতেই ফেলে দেওয়া যাবে না। ওসমান সাহেব বললেন, বলো, তুমি কী বলবে।

ফরিদা সহজ কিন্তু দৃঢ়স্বরে বললেন, গত তিন-চার দিন ধরে তুমি এরকম আচরণ করছ এবং আমার মনে হয় ফিরোজের কোনো-একটা ব্যাপার তোমাকে এফেক্ট করেছে। সেটা কী ?

কিছুই না। ফিরোজের কোনো ব্যাপার নয়। ফিরোজ এখন সুস্থ।

না, সে পুরোপুরি সুস্থ হয়নি।

ফরিদার কণ্ঠ তীব্র ও তীক্ষ্ণ। ওসমান সাহেব কিছু বললেন না। তিনি ভালো করেই জানেন, গত তিনদিন ধরে ফিরোজ খুবই অসুস্থ। তাঁর ধারণা, এই তথ্যটি তিনি একাই জানেন। এখন বুঝতে পারছেন, এ ধারণা সত্য নয়।

ফরিদাও সেটি জানে।

ওসমান সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, আমার জন্যে এক কাপ চা দিতে বলো।

ফরিদা উঠলেন না। তিনি জানেন, ওসমান সাহেবের চায়ের পিপাসা হয়নি। আলোচনার মোড় ফেরাবার জন্যেই চায়ের প্রসঙ্গটা টেনে আনা। ওসমান সাহেব বললেন, আজ বোধহয় বৃষ্টি হবে। বৃষ্টি খুব দরকার।

এই কথাটিও শুধু শুধু বলা। মেঘ-বৃষ্টি-রোদ নিয়ে ওসমান সাহেব কখনো মাথা ঘামান না, তাঁর এত সময় নেই।

ফরিদা।

বলো।

ফিরোজের বর্তমান অবস্থাটা তুমি জানো ?

জানি।

কখন জানলে ?

চারদিন আগে।

আমাকে বলোনি কেন ?

তুমিও তো জানতে। তুমিও তো আমাকে কিছু বলোনি।

বাড়ির অন্যরা জানে ?

জানি না। অন্যরা জানে কিনা জিজ্ঞেস করিনি। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করেনি।

মিসির আলি সাহেব জানেন ? তাঁকে কিছু বলেছ ?

না, আমি কিছু বলিনি।

আমার মনে হয় তাঁকে ব্যাপারটা জানানো উচিত।

উচিত হলে জানাও।

আরও আগেই জানানো উচিত ছিল। তাই না ফরিদা ?

ফরিদা কোনো জবাব না দিয়ে উঠে গেলেন। তাঁর মাথা ধরেছে। তিনি খানিকক্ষণ শুয়ে থাকবেন। রোজ দুপুরবেলায় তাঁর মাথা ধরে। ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকতে হয়।

ওসমান সাহেব বারান্দায় উঁকি দিলেন। ফিরোজ ইজিচেয়ারে ক্লান্ত ভঙ্গিতে ঘুমাচ্ছে। নিশ্চিন্ত আরামের ঘুম। কে বলবে তার এত বড় সমস্যা আছে।

সমস্যাটি ওসমান সাহেব তিনদিন আগে প্রথম লক্ষ করেন। রাত ন'টার দিকে রোজকার রুটিনমতো তিনি ফিরোজের ঘরে ঢুকলেন। ফিরোজ হাসিমুখে বলল, কী খবর বাবা ?

কোনো খবর নেই। এলাম খানিকক্ষণ গল্পগুজব করতে। বেড-টাইম গসিপিং।

বসো।

কী করছিস ?

কিছু করছি না। পড়ছি।

কী পড়ছিস ?

গল্প-উপন্যাস এইসব, সিরিয়াস কিছু নয়।

মাঝে মাঝে অবশ্যি গল্প-উপন্যাসও বেশ সিরিয়াস হয়।

তা হয়। তবে আমি পড়ি হালকা জিনিস। এখন পড়ছি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস— 'নৌকাডুবি'।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস হালকা জিনিস! বলিস কী তুই ?

বেচারা নোবেল প্রাইজ পেয়েছে বলেই যে তাঁকে ভারী ভারী উপন্যাস লিখতে হবে, তেমন তো কোনো কথা নেই।

ফিরোজ হাসতে শুরু করল। সহজ স্বাভাবিক হাসি। একজন অসুস্থ মানুষ এরকম ভঙ্গিতে হাসতে পারে না। ওসমান সাহেব নিজেও হাসলেন এবং ঠিক তখনই একটা জিনিস লক্ষ করলেন, ফিরোজের বিছানার উপর প্রায় আড়াই হাত লম্বা একটা লোহার রড পড়ে আছে।

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, লোহার রডটা এখানে কেন ?

ফিরোজ তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না।

কে রেখেছে এটা এখানে ?

আমি।

কেন ?

এমনি।

এমনি মানে ? বিছানার উপর কেউ লোহার রড রাখবে কেন ? ব্যাপারটা কী ?

ওসমান সাহেব লক্ষ করলেন, ফিরোজের মুখ কেমন যেন কঠিন হয়ে আসছে। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। জ্বলজ্বল করছে।

দে আমার কাছে, বাইরে রেখে আসি।

না।

না মানে ? এটা দিয়ে তুই কী করবি ?

ফিরোজ গম্ভীর গলায় বলল, বাবা তুমি এখন যাও, আমি ঘুমাব।

তুই ঘুমাবি, ভালো কথা, কিন্তু লোহার রড পাশে নিয়ে ঘুমাতে হবে কেন ?

ঘুমালে অসুবিধা কী ?

অসুবিধা কিছুই নেই। কিন্তু সবকিছুর একটা কারণ আছে। তুই কারণটা আমাকে বল।

না, বলব না।

ওসমান সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। ফিরোজের চোখ লাল হয়ে উঠছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ভারী ভারী নিঃশ্বাস ফেলছে। ওসমান সাহেবের মনে হলো, সামথিং ইজ রং। সামথিং ইজ ভেরি রং।

ফিরোজ।

জি ?

রড পাশে নিয়ে ঘুমানোর কারণটা আমাকে বল। প্লিজ। তুই একটি বুদ্ধিমান ছেলে। কারণ নেই, এমন কিছু তোর পক্ষে করা সম্ভব নয়।

ফিরোজ টেনে টেনে বলল, ও আমাকে রাখতে বলেছে।

কে রাখতে বলেছে ?

ঐ লোক।

কোন লোক ? তার নাম কী ?

নাম জানি না।

লোকটা কে ?

খালি গায়ের একটা লোক। কালো প্যান্ট পরা, চোখে চশমা। সোনালি ফ্রেমের চশমা।

ওসমান সাহেব কিছুই বুঝতে পারলেন না। কার কথা বলছে সে ?

ফিরোজ বলল, মিসির আলি স্যারকে ঐ লোকের কথা আমি বলেছি। উনি চেনেন।

আই সি।

সে আমাকে বলেছে, লোহার রড সব সময় সঙ্গে রাখতে। যদি না রাখি, সে রাগ করবে।

এই ব্যাপারগুলো কি তুমি মিসির আলি সাহেবকে বলেছ ?

জি-না।

বলোনি কেন ?

ঐ লোক আমাকে বলেছে এটা না বলতে।

আই সি।

বাবা, তুমি চলে যাও। আমার ঘুম পাচ্ছে।

মাত্র সাড়ে ন'টা বাজে। এখনই ঘুম পাচ্ছে কি ? আরেকটু বসি। গল্প করি তোর সঙ্গে।

গল্প করতে ইচ্ছা করছে না। তুমি এখন যাও।

তিনি চলে এলেন, কিন্তু সারা রাত তাঁর ঘুম হলো না। তাঁর মনে হতে লাগল— দরজায় একটা তালা লাগিয়ে রাখা উচিত, যাতে ফিরোজ কিছু বুঝতে না পারে। কিন্তু তালা লাগানোর সাহস তাঁর হলো না। তালা লাগানোর ব্যাপারটা ফিরোজকে আরও এফেক্ট করবে। ভালোর চেয়ে মন্দ হবে বেশি।

ওসমান সাহেব ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকা ফিরোজের দিকে তাকিয়ে আছেন। কী নিশ্চিন্তেই না ঘুমাচ্ছে সে। কে বলবে সে অসুস্থ। কত সহজ, কত স্বাভাবিক ঘুমাবার ভঙ্গি। কোলের উপর একটা বই। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বপ্ন লজ্জাহীন'। উপন্যাসটি কেমন কে জানে! সুনীলের কোনো বই তিনি পড়েননি।

গল্প-উপন্যাস তাঁর পড়া হয়ে ওঠে না।

ফিরোজ ঘুমের মধ্যেই নড়ে উঠল। ওসমান সাহেব মৃদুস্বরে ডাকলেন, ফিরোজ।

ফিরোজ জবাব দিল না। তার পায়ের কাছে ভারী লোহার রডটি আছে। রডটির মাথা বেশ ধারাল। বারবার সেখানে চোখ আটকে যায়।

ওসমান সাহেব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তাঁর বারবার মনে হচ্ছে, এই লোহার রডটি ভয়ঙ্কর কোনো কিছুর জন্যে অপেক্ষা করছে।

মিসির আলির সঙ্গে দেখা হওয়ার দরকার। তিনি নাকি ঢাকায় নেই। কোথায় গিয়েছেন কেউ বলতে পারে না। কবে ফিরবেন, তাও কারও জানা নেই।

৮

মোহনগঞ্জ স্টেশনে মিসির আলি নামলেন রাত সাড়ে সাতটায়। গায়ে প্রবল জ্বর। মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা। চোখ মেলতে পারছেন না—এরকম অবস্থা। তাঁর নিজের বোকামির জন্যে এটা হয়েছে।

শ্যামগঞ্জ পর্যন্ত ট্রেনে প্রচণ্ড ভিড় ছিল। কামরায় লেখা 'পঁচিশ জন বসিবেন'। বসেছে পঞ্চাশ জন। আরও পঞ্চাশ জন দাঁড়িয়ে। অসম্ভব গরম। বাথরুমের খোলা দরজা দিয়ে আসছে উৎকট দুর্গন্ধ। বারবার মিসির আলির নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। নরকযন্ত্রণা বোধহয় একেই বলে। যাত্রীদের মধ্যে একজন রোগী আছে, যে কিছুক্ষণ পরপর গোঁ-গোঁ শব্দ করছে। সেই শব্দ শুনে মনে হয়, এক্ষুনি বোধহয় তার প্রাণবিয়োগ হবে। ভয়াবহ অবস্থা!

মিসির আলি শ্যামগঞ্জ নেমে পড়লেন। খোলা জায়গায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বুক ভর্তি করে নিঃশ্বাস নেবেন, এ আশায়। ট্রেন ছাড়ার সময় হঠাৎ মনে হলো—ছাদে বসে গেলে কেমন হয়? অনেকেই তো যাচ্ছে। বাতাসের অভাব হবে না সেখানে। গ্রামের ভেতর দিয়ে ট্রেন যাবে, টাটকা বাতাস পাওয়া যাবে। তিনি ছাদে উঠে পড়লেন।

ছাদের অবস্থা বেশ ভালো। চমৎকার হাওয়া। মিসির আলি নিজেকে ধন্যবাদ দিলেন, ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্তটি নেবার জন্যে।

সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল না। হিরণপুর আসবার আগেই আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল। প্রবল বাতাস বইতে শুরু করল। ধরবার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। তাঁর মনে হতে লাগল, যে-কোনো মুহূর্তে তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে চষা খেতে ফেলবে। জীবনের ইতি হবে সেখানেই। বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে বর্ষণ। বৃষ্টির ফোঁটা সূঁচের মতো গায়ে বিঁধছে। আর কী ঠাণ্ডা! যেন বরফের চাই থেকে গলে গলে পড়ছে।

একটা ভালো অভিজ্ঞতা। কিন্তু এই অভিজ্ঞতার কথা অন্যকে বলার মতো সুযোগ কি আর হবে? মিসির আলি বাতাসের ঝাপ্টা সামলাবার চেষ্টা করছেন। ছাদের উপরে বসা মানুষগুলোর কেউ কেউ আজান দিতে শুরু করেছে। আল্লাহকে খুশি করার একটা চেষ্টা। আল্লাহ খুশি হলেন কি না বোঝা গেল না—ঝড়বৃষ্টি কিছুই কমল না, তবে ড্রাইভার ট্রেন দাঁড় করিয়ে ফেলল। ছাদের উপরে বসে-থাকা অসহায় মানুষগুলোর আজানের শব্দ নিশ্চয়ই তাঁর কানে গিয়েছে। আজানের ধ্বনি একেবারে বৃথা যায়নি।

ঝড় আধঘণ্টার মতো স্থায়ী হলো। এবং পরের কুড়ি মিনিটের মধ্যে মিসির আলির গায়ের তাপ হুহু করে বাড়তে লাগল। মোহনগঞ্জ স্টেশনে নেমে তাঁর মনে হলো, প্লাটফরমেই শুয়ে পড়েন।

স্যার, আপনি কি মিসির আলি?

হুঁ।

আমি চৌধুরী বাড়ি থেকে আপনাকে নিতে এসেছি স্যার।

ও আচ্ছা।

আপনি কোন ট্রেনে আসবেন সেটা বলেন নাই, আমি সকাল থেকে সব ক'টা ট্রেন দেখছি।

খুব কষ্ট দিলাম—না ?

জি স্যার, তা দিলেন।

মিসির আলি হেসে ফেললেন। বেশ ছেলেটি। বুদ্ধিমান এবং স্মার্ট। কথাবার্তায় কোনো গ্রাম্য টান নেই।

কী করো তুমি ?

এখানকার কলেজে স্যার বিএ পড়ি। চৌধুরী বাড়িতে থাকি।

নাম কী তোমার ?

জহুরুল হক।

জহুরুল হক সাহেব, চলো রওনা হওয়া যাক।

চলুন। আপনার মালপত্র কোথায় ?

মালপত্র কিছুই নেই। একটা হ্যান্ডব্যাগ ছিল, সেটা বাতাসে উড়ে গেছে।

বাতাসে উড়ে গেছে মানে ?

ছাদে বসে এসেছি তো—ঝড়ের মধ্যে পড়েছি।

বলেন কী! কী সর্বনাশ!

শোনো জহুরুল, এখান থেকে যাওয়ার ব্যবস্থা কী ? আমার কিন্তু হাঁটার ক্ষমতা নেই।

হাঁটা ছাড়া তো যাওয়ার অন্য কোনো ব্যবস্থাও নেই। নদীতে এখনো পানি হয়নি, নৌকা চলে না।

মিসির আলি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পথে নামলেন। সেখানে আবার তাঁকে বৃষ্টিতে ধরল।

জ্বরের ঘোর কাটতে মিসির আলীর দু'দিন লাগল। পুরোপুরি আচ্ছন্ন অবস্থা গেল এ দু'দিন। সবকিছু স্বপ্নদৃশ্যের মতো। যা দেখেন, তাই মনে হয় কাটা কাটা খণ্ডচিত্র। একটির সঙ্গে অন্যটির মিল নেই।

একটি অপরূপ রূপবতী মেয়েকে প্রায়ই উদ্বিগ্ন মুখে তাঁর পাশে বসে থাকতে দেখেন। এই মেয়েটিই বোধহয় নাজনীন। মেয়েটি মাথায় পানি ঢালে। মাথার চুল টেনে দেয় এবং অত্যন্ত নরম স্বরে জিজ্ঞেস করে, চাচাজি, এখন কি একটু ভালো লাগছে ? বলুন, ভালো লাগছে ?

তাঁর ভালো লাগে না। তবু মেয়েটিকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে বলেন, ভালো লাগছে মা, বেশ ভালো লাগছে।

একজন বয়স্কা মহিলাকেও প্রায় সর্বক্ষণই তাঁর ঘরের চেয়ারে বসে থাকতে দেখেন। ইনি বোধহয় নাজনীনের মা। এই মহিলাটি কথা-টথা বলেন না।

চব্বিশ ঘণ্টা থাকবার পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিলেন, তাকে থাকতে হলো এক সপ্তাহ। চার দিনের দিন তিনি নিজের ঘর থেকে বেরুলেন এবং খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে আবার জ্বর বাঁধিয়ে ফেললেন। সেই জ্বর পুরোপুরি ছাড়ল না। তবু এর মধ্যেই যে-সব কাজ করবার কথা, সব করলেন।

প্রথম কাজ ছিল ফিরোজ এসে যেসব জায়গায় গিয়েছে, সেসব জায়গায় যাওয়া।

দেখা গেল, সে খুব বেশি বেড়ায়নি। বাড়ি এবং শিয়ালজানি খাল—এ দু'য়ের মধ্যেই তার গতিবিধি সীমিত ছিল। একদিন শুধু 'উত্তর-বন্ধ' বিলে গিয়েছিল মাছ ধরা দেখতে। সেখানে সে নিজেই নেমেছিল মাছ মারতে। তখন শিং মাছ কাঁটা ফুটিয়ে দেয়। সে ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ে। তার ধারণা, সাপে কেটেছে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। কারণ, ঘটনাটি ঘটে তার অসুস্থ হওয়ার আগের দিন। খুব সম্ভব ঘটনাটি তার মনের উপর ছাপ ফেলে। রাতে তার একটু জ্বরজ্বরও হয়।

যে বটগাছের নিচে চশমাপরা লোকটির সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, সেই গাছটিও তিনি দেখতে গেলেন। এবং গাছের নিচে দাঁড়িয়ে তাঁর মনে হলো, ঘটনাটি এখানে ঘটেনি। ফিরোজের বর্ণনা অনুসারে জায়গাটা নির্জন। দু'একটা পরিত্যক্ত হিন্দু ঘরবাড়ি ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু বটগাছটা যে-অঞ্চলে, সে-জায়গাটা নির্জন নয়। পাশেই শিয়ালজানি খালের উপর একটি বাঁশের সাঁকো, যার উপর দিয়ে লোকজন চলাচল করছে। নদীর ওপারেই কয়েক ঘর কুমোরের বাস। তাদের বাড়ি ভর্তি ছেলেমেয়ে, যারা খুব হৈচৈ করে খেলে। এই অঞ্চলটিকে নির্জন বলা চলে না।

ঘটনাটি নিশ্চয়ই অন্য কোথাও ঘটেছে এবং ফিরোজ ঘোরের মধ্যে হেঁটে হেঁটে চলে এসেছে বটগাছের নিচে, যেখানে অন্য লোকজন তাকে দেখতে পায়।

মিসির আলি শিয়ালজানি খালের দু'পার ধরে প্রচুর খোঁজাখুঁজি করলেন, কোনো বকুলগাছ পাওয়া যায় কি না। পাওয়া গেল না।

তাঁর দ্বিতীয় কাজ ছিল এখানে আসার পর ফিরোজের সঙ্গে যাদের দেখা হয়েছে, তাদের সঙ্গে আলাপ করা। জানতে চেষ্টা করা, তারা ফিরোজের আচার-ব্যবহারে কোনো অস্বাভাবিকতা লক্ষ করেছে কি না। দেখা গেল, খুব অল্পকিছু লোকের সঙ্গে তার কথা হয়েছে। কেউ তেমন কিছু বলেনি। মিসির আলি প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর ইন্টারভ্যুর খুঁটিনাটি লিখে ফেললেন। কয়েকটি নমুনা—

মোসাম্মাৎ সালেহা বেগম

বয়স ৫০/৫৫। আজমল চৌধুরীর মা। পর্দানশীন। কম কথা বলেন। রাতে চোখে ভালো দেখতে পান না।

প্রশ্ন ফিরোজ ছেলেটি কেমন ?

উত্তর ভালো।

প্রশ্ন কেমন ভালো ?

উত্তর এত বড় লোকের ছেলে, কিন্তু অহঙ্কার নাই।

প্রশ্ন বুঝলেন কী করে অহঙ্কার নেই ?

উত্তর আমার পা ছুঁয়ে সালাম করল।

প্রশ্ন যেদিন সে অসুস্থ হয় সেদিন, অর্থাৎ অসুস্থ হওয়ার আগে কি তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল ?

উত্তর হয়েছিল, চা খাওয়ার সময়।

প্রশ্ন কোনো কথা হয়েছিল ?

উত্তর না।

প্রশ্ন ওকে দেখে কি আপনার একটু অন্যরকম লাগছিল ?

উত্তর না। তবে চোখমুখ ফোলা ছিল। রাতে ঘুম হয়নি, সেজন্য বোধহয়।

প্রশ্ন বুঝলেন কী করে, ওর রাতে ঘুম হয়নি ? কারণ আপনার সঙ্গে তো ওর কোনো কথা হয়নি।

উত্তর সে আজমলের কাছে বলছিল, তাই শুনলাম।

প্রশ্ন আপনি জিজ্ঞেস করেননি, কী জন্যে ঘুম হয়নি ?

উত্তর না।

নাজনীন সুলতানা

বয়স ২০/২১। মমিনুন্নেসা কলেজ থেকে বিএ পাস করে বাড়িতে আছে। অপরূপ রূপবতী। মায়ের মতো স্বল্পভাষী নয়। ইনহিবিশন কেটে গেলে প্রচুর কথা বলে। লাজুক নয়। কথাবার্তায় মনে হলো অত্যন্ত জেদি, তবে হাসিখুশি ধরনের মেয়ে।

প্রশ্ন কেমন আছ নাজনীন ?

উত্তর ভালো আছি চাচা। আপনি এমন খাতা-কলম নিয়ে প্রশ্ন করছেন কেন ? আমার কাছে মনে হচ্ছে, আমি কোনো পত্রিকায় ইন্টারভ্যু দিচ্ছি।

প্রশ্ন ফিরোজকে তোমার কেমন লেগেছিল ?

উত্তর ভালো।

প্রশ্ন কেমন ভালো ?

উত্তর বেশ ভালো! (এই পর্যায়ে মেয়েটি ঈষৎ লজ্জা পেয়ে গেল)

প্রশ্ন ঠিক কী কারণে তুমি বলছ বেশ ভালো ?

উত্তর জানি না কী কারণে।

প্রশ্ন ফিরোজ অসুস্থ হওয়ার পেছনে কি কোনো কারণ আছে বলে মনে হয় ?

উত্তর এইসব নিয়ে আমি কখনো ভাবিনি চাচা।

প্রশ্ন আচ্ছা, ফিরোজ অসুস্থ হয়ে তোমাদের বাড়িতে এল। সেসময় তুমি তার সামনে গিয়েছিলে ? তোমাকে কি সে চিনতে পেরেছিল ?

উত্তর চিনতে পেরেছিলেন কি না, তা তো চাচা বলতে পারব না। তবে উনি খুব হৈচৈ করছিলেন, আমাকে দেখে হৈচৈ থামিয়ে ফেলেন। রাতেরবেলাও খুব চিৎকার শুরু করলেন। তখন ভাইয়া আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। আমাকে দেখে চুপ করে গেলেন।

প্রশ্ন আচ্ছা এখন আমি একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি। জবাব দিতে না চাইলে জবাব দিও না। প্রশ্নটি হচ্ছে—ধরো, ফিরোজ যদি এখন পুরোপুরি সেরে যায় এবং তোমাকে বিয়ে করতে চায়, তুমি কি রাজি হবে ?

উত্তর (খুব সহজ এবং শান্ত গলায়) হ্যাঁ হব। চাচা, আজকের মতো থাক। আপনার জন্যে এখন শরবত নিয়ে আসি। নাকি চা খাবেন ? আপনি খুব ঘনঘন চা খাচ্ছেন—এটা কিন্তু চাচা ভালো না।

হরিপ্রসন্ন রায়

এম. বি. বি. এস

স্থানীয় ডাক্তার। বয়স ৪০/৪৫। ব্যস্তবাগীশ লোক। এ অঞ্চলে তাঁর খুব পসার আছে। ইন্টারভ্যু চলাকালেই দু'জন লোক তাঁকে নিতে এল। কথা বেশি বলেন।

প্রশ্ন আপনি কখন রোগীকে দেখতে এলেন ?

উত্তর আমাকে খবর পাঠিয়েছে পাঁচটায়। তখন যাওয়ার উপায় ছিল না। কারণ ধর্মপাশা থেকে একজন পেসেন্ট এসেছে, এখন-তখন অবস্থা। পেটের ব্যথা। আলসার ছিল, সেই পেইন। কাজেই আমি সন্ধ্যার পরে গিয়ে উপস্থিত হই। ধরুন ছ'টা সাড়ে ছ'টা। শীতকাল তো, ছ'টার সময় চারদিক অন্ধকার।

প্রশ্ন আপনি কী দেখলেন ? মানে রোগীর অবস্থার কথা বলছি।

উত্তর গোঁ-গোঁ শব্দ করছে। মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে। হিস্টিরিয়ার লক্ষণ মনে হলো। চোখ বড় বড় করে ঘোরাচ্ছিল। ভয়াবহ অবস্থা! আমি নাড়ি দেখলাম। হার্টবিট ছিল খুব হাই। হিস্টিরিয়াতে এরকম হয়।

প্রশ্ন ওষুধপত্র কী দিলেন ?

উত্তর তেমন কিছু না। ঘুমের ওষুধ দিয়েছি, ফেনোবারবিটন। তারপর বললাম ইমিডিয়েটলি ঢাকা নিয়ে যেতে।

প্রশ্ন কতক্ষণ ছিলেন আপনি ?

উত্তর রাত দশটা পর্যন্ত ছিলাম। ওরা খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল। নাজনীন কান্নাকাটি করছিল। কাজেই রোগী ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত ছিলাম।

প্রশ্ন ঘুমের মধ্যে রোগী কি কোনো কথাবার্তা বলছিল ?

উত্তর না, সাউন্ড ঘুম। আমি ঘুমের মধ্যে আরেকবার নাড়ি দেখলাম। হার্টবিট বেশি ছিল, তবে আগের চেয়ে কম। কত ছিল তা মনে নেই।

প্রশ্ন গায়ে টেম্পারেচার ছিল ?

উত্তর আমি যখন দেখি, তখন অল্প ছিল। নাইনটি নাইন পয়েন্ট ফাইভ। আমি চলে আসার সময় বলেছিলাম, সকালবেলা আবার দেখব। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। ভোর পাঁচটার ট্রেনে রোগীকে নিয়ে তারা ঢাকা চলে যায়।

জহুরুল হক

বয়স ২০/২১। স্থানীয় কলেজের ছাত্র। বুদ্ধিমান এবং স্মার্ট। চৌধুরীদের বাড়ি লজিং থাকে। এদের সঙ্গে ক্ষীণ আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। কথাবার্তা শুনে ধারণা হলো, নাজনীন মেয়েটির প্রতি সে খানিকটা অনুরক্ত।

প্রশ্ন ফিরোজের সঙ্গে তোমার কথা হয়েছিল ?

উত্তর জি-না। আমি একটু দূরে দূরে ছিলাম।

প্রশ্ন দূরে দূরে ছিলে কেন ?

উত্তর আজমল ভাই সবসময় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। আমি আজমল ভাইকে সবসময় এড়িয়ে চলি। তাঁকে ভীষণ ভয় পাই। কাজেই...।

প্রশ্ন ভয় পাও কেন ?

উত্তর আজমল ভাই ভীষণ রাগী। চট করে রেগে যায়। ওদের ফ্যামিলির সবাই খুব রাগী। এখনো ওদের মধ্যে কিছুটা জমিদার-জমিদার ভাব আছে। সবাইকে মনে করে ছোটলোক।

প্রশ্ন ফিরোজ কেন অসুস্থ হয়েছিল বলে তোমার ধারণা ?

উত্তর জানি না কেন হয়েছে। তবে লোকে বলে, ওরা ধুতুরার বীজ খাইয়ে পাগল করে ফেলেছে।

প্রশ্ন বলো কী তুমি!

উত্তর না, আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। লোকে কী বলে, সেটা বললাম।

প্রশ্ন লোকে এজাতীয় কথা কেন বলছে ?

উত্তর এদের পূর্বপুরুষরা খুব অত্যাচারী জমিদার ছিল। এরা মানুষের প্রাণ অতিষ্ঠ করে দিয়েছিল। এরা প্রচুর অন্যায় করেছে, সেইজন্যেই এসব বলে।

প্রশ্ন তুমি মনে হয় এদের ওপর রেগে আছ ?

উত্তর না, রাগব কেন ? সত্যি কথাটা আপনাকে বললাম।

মোহনগঞ্জে আসায় মিসির আলি সাহেবের তেমন কোনো লাভ হয়নি। এখন পর্যন্ত এমন কোনো তথ্য পাননি, যেটা তাঁর কোনো কাজে আসবে। চট করে অবশ্যি কোনো কিছুই

পাওয়া যায় না। খুঁজতে হয়। জট খোলার প্রথম ধাপই হচ্ছে অনুসন্ধান। অন্ধকারে হাতড়ানোর মতো কোনো আলোর ইশারা থাকতে হবে। সেরকম কোনো আলোর সন্ধান মিসির আলি এখনো পাননি।

তবে যাওয়ার দিন ভোরবেলায় একটি সূত্র পাওয়া গেল। অস্বস্তিকর একটি সূত্র, যাকে গ্রহণ করাও যায় না, আবার ফেলে দেওয়াও যায় না। নাজনীন এসে বলল, চাচা, আসুন আপনাকে একটা মজার জিনিস দেখাব।

কী মজার জিনিস ?

আমাদের এক পূর্বপুরুষ পিতলের একটা কলসি পেয়েছিলেন। কলসিভর্তি ছিল মোহর। সেই মোহর পেয়েই তারা জমিদার হলো।

কলসিটার কোনো বিশেষত্ব আছে ?

না। সাধারণ কলসি, তবে অমাবশ্যার সময়ে এটা ঝনঝন শব্দ করে।

তুমি নিজে শুনেছ ?

না, তবে অনেকেই শুনেছে। আমি আর ভাইয়া এক অমাবশ্যার রাতে কলসির পাশে জেগে ছিলাম। কিচ্ছু শুনতে পাইনি।

মিসির আলি হাসিমুখে বললেন, প্রাচীন মোহর ভর্তি কলসি—এজাতীয় গল্প খুব প্রচলিত। তবে এসবের কোনো ভিত্তি নেই।

চাচা, অনেকেই কিন্তু শব্দ শুনেছে।

হয়তো ইঁদুর ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। ইঁদুর শব্দ করেছে।

মিসির আলি কলসি দেখার জন্যে কোনোরকম আগ্রহ বোধ করলেন না। শুধুমাত্র নাজনীনের মন রক্ষার জন্যে সঙ্গে গেলেন। দোতলার উত্তরের সবচেয়ে শেষের ঘরটির তালা খুলল নাজনীন। মিসির আলির শিরদাঁড়া দিয়ে একটি ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। কলসির কারণে নয়। এ ঘরে কয়েকটি পুরনো পেইনটিং আছে। তাদের একটিতে খালি গায়ে একটি লোক ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। তার পরনে কালো রঙের প্যান্ট। চোখে সোনালি চশমা। শুকনো ধরনের কঠিন একটি মুখ।

নাজনীন, এ ছবিটা কার ?

আমার দাদার বাবা। উনি খালি গায়ে ঘোড়ায় চড়তেন।

নাম কী উনার ?

মাসুক চৌধুরী।

উনার সম্পর্কে আর কী জানো তুমি ?

বিশেষ কিছু জানি না। শুনেছি, খুব অত্যাচারী ছিলেন। তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলা ঘোড়ায় চড়ে আসছিলেন। হঠাৎ প্রজারা তাঁকে ঘিরে ফেলে।

তারপর ?

তারপর আবার কী ? মেরে ফেলে। লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে মারে।—চাচা, এই দেখুন কলসি। আবার কী কী যেন লেখাও আছে গায়ে। চেষ্টা করে দেখুন, পড়তে পারেন কি না। পালি ভাষায় লেখা।

লেখা পড়ার ব্যাপারে তিনি বিন্দুমাত্র উৎসাহ বোধ করলেন না। ঠান্ডা গলায় বললেন, তোমার দাদার বাবাকে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে মারে ?

হ্যাঁ। উনার কথা এত জিজ্ঞেস করছেন কেন ?

এমনি জিজ্ঞেস করছি। আচ্ছা, ফিরোজ কি এই ঘরটি দেখেছে ? সে কি এই ঘরে ঢুকেছিল ?

জি-না।

কী করে বুঝলে ঢোকেনি ?

কারণ, ঘরটা তালা দেওয়া থাকে। এই তালার একটিমাত্র চাবি। সেই চাবি থাকে আমার কাছে।

জানালা-টানালা দিয়ে এই ঘরে ঢোকার কোনো উপায় নেই, তাই না ?

উঁহু, আর উপায় থাকলেই শুধু শুধু জানালা দিয়ে ঢুকতে যাবেন কেন ? কী আছে এই ঘরে ?

মিসির আলি দাঁড়িয়ে রইলেন ছবির সামনে। তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। তিনি জট খুলতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু জট খুলছে না। আরও পাকিয়ে যাচ্ছে। ফিরোজ যদি একবার এই ঘরে ঢুকত, তাহলে সমস্ত ব্যাপারটাই অনেক সহজ হয়ে যেত। তিনি বলতে পারতেন—ফিরোজ এই ছবিটি দেখেছে। তার মনে ছাপ ফেলেছে এই ছবি। পরবর্তী সময়ে ছবির মানুষটিকেই সে দেখেছে। হেলুসিনেশন। কত সহজ সমাধান! কিন্তু ফিরোজ এই ছবি দেখেনি।

মিসির আলি বললেন, একটি মাত্র চাবি ?

হ্যাঁ।

তুমি কি নিশ্চিত যে এই ঘরের দ্বিতীয় কোনো চাবি নেই ?

হ্যাঁ, নিশ্চিত।

মিসির আলি আবার তাকালেন ছবির দিকে। তার কেন জানি মনে হলো, ছবির মানুষটি তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। বিদ্রূপের হাসি। তাচ্ছিল্যের হাসি।

৯

নীলু পত্রিকার খবরটা চারবার পড়ল।

একটা লাল কলম দিয়ে বক্স করা খবরটির প্রতিটি লাইন দাগাল, তারপর কাগজটা তার বাবাকে দিয়ে এল। খবরটা এরকম—

পুরানা পল্টনে আতঙ্ক

(স্টাফ রিপোর্টার)

শুক্রবার রাত একটার দিকে পুরানা পল্টন এলাকায় মধ্যযুগীয় নাটকের অবতারণা হয়েছে। লোহার রড হাতে এক যুবক অত্র

অঞ্চলে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য অনুযায়ী উক্ত যুবকটির পরনে ছিল কালো প্যান্ট। গায়ে কোনো কাপড় ছিল না। সে প্রথমে একটা রাস্তার কুকুর পিটিয়ে মেরে ফেলে এবং তার পরপরই গাড়ি বারান্দায় শুয়ে থাকা কিছু ছিন্নমূল মানুষকে আক্রমণ করে। সৌভাগ্যবশত কেউ হতাহত হয়নি। চিৎকার এবং হৈচৈ শুনে প্রচুর লোকজন জমে যায় এবং যুবকটি পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। নীলক্ষেত পুলিশফাঁড়ির সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করি। ফাঁড়ি কর্তৃপক্ষ জানান যে, এই প্রসঙ্গে তারা কিছুই জানেন না।

জাহিদ সাহেব খবরটা পড়লেন। কিন্তু তাঁর কোনো ভাবান্তর হলো না। পত্রিকা খুললেই এ জাতীয় খবর থাকে। বাংলাদেশের কোথাও না কোথাও কেউ না কেউ ত্রাসের সৃষ্টি করছে। একবার খবর বেরুল, ছোট ছোট শিশুদের পানিতে ডুবিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে। একবার বেরুল, রক্তচোষার আগমন ঘটেছে। এরা কাউকে একা পেলেই ধরে বেঁধে সিরিঞ্জ দিয়ে টেনে সমস্ত রক্ত নিয়ে যাচ্ছে। খলিলুল্লাহ বলে এক লোককে নিয়ে প্রচুর হৈচৈ হলো। এই লোকটির প্রধান খাদ্য নাকি মৃত মানুষের কলিজা। অবিশ্বাস্য ব্যাপার! কতটুকু সত্যি কে জানে!

জাহিদ সাহেবের ধারণা, এ জাতীয় খবরের বেশির ভাগই রিপোর্টাররা চা-সিগারেট খেতে খেতে তৈরি করেন। মানুষের কৌতূহল জাগিয়ে পত্রিকার কাটতি বাড়ান। এ জাতীয় খবরের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, বেশ কয়েকটি ফলো-আপ স্টোরি ছাপা হবে এবং সবশেষে একটি সচিত্র ফিচারের মাধ্যমে ঘটনার ইতি হবে। অতঃপর রিপোর্টাররা অন্য কোনো ভয়াবহ ঘটনা ফাঁদতে চেষ্টা করবেন—'অজ্ঞাতনামা জন্তু' বা এই জাতীয় কিছু।

কিন্তু নীলু এই খবরটি এভাবে দাগিয়েছে কেন ? বর্তমানে নীলুর কিছু অস্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। সে কি সেই ক্ষমতার কারণেই কিছু আঁচ করছে ?

দুপুরবেলা খাবার সময় জাহিদ সাহেব প্রসঙ্গটা তুললেন। হালকা গলায় বললেন, 'পুরানা পল্টনে আতঙ্ক' এই খবরটা তুই দাগিয়েছিস কেন ?

নীলু জবাব দিল না। তার মুখ থমথমে। জাহিদ সাহেব বুঝলেন, নীলু এখন কোনো কথারই জবাব দেবে না। মাঝে মাঝে সে এরকম চুপ করে যায়। প্রয়োজনীয় কথাটাও বলে না।

জাহিদ সাহেব মেয়ের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নিজের মনে বললেন, দরজা-টরজা ভালোমতো বন্ধ করে ঘুমানো উচিত। বলা তো যায় না। পল্টন আর কাঁঠালবাগান—খুব একটা দূরের ব্যাপার না।

তাঁর এসব বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে মেয়েকে আলোচনায় টেনে আনা। কিন্তু নীলু একটি কথাও বলল না। খাওয়ার মাঝখানেই সে উঠে চলে গেল।

জাহিদ সাহেব যা ভেবেছিলেন, তা-ই। ফলো-আপ স্টোরি ছাপা হয়েছে। খবর চলে এসেছে প্রথম পাতায়। আকর্ষণীয় শিরোনাম।

নগ্নগাত্র বিভীষিকা

(স্টাফ রিপোর্টার)

> পহেলা জুলাই শনিবার, পুরানা পল্টন এলাকায় ত্রাস সৃষ্টিকারী যুবক আবার আজ গভীর রাতে দেখা দিয়েছে। যথারীতি তার হাতে ছিল লোহার রড। এবার তার রডের আঘাতে রাহেলা নাম্নী এক পতিতা গুরুতর আহত হয়। তার ডান হাত এবং পাঁজরের দুটি হাড় ভেঙে যায়। তাকে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রাহেলার বর্ণনা অনুযায়ী রাত আনুমানিক দুই ঘটিকার সময় নগ্নগাত্র যুবক একটি সুঁচাল লোহার রড নিয়ে উপস্থিত হয় এবং...।

নীলু আজও খবরটির চারদিকে লাল পেনসিল দিয়ে দাগ দিল। তারপর বাবাকে খবরের কাগজটি দিয়ে বলল, বাবা, আমাকে একটা কাজ করে দেবে?

নিশ্চয়ই দেব। কাজটা কী?

আমি মিসির আলি স্যারকে চিঠি লিখেছি। ঐটি তাঁকে পৌঁছে দেবে। তিনি অবশ্যি এখনো ঢাকায় ফেরেননি। তুমি দরজার নিচ দিয়ে রেখে আসবে, যাতে আসামাত্র পেয়ে যান।

জাহিদ সাহেব বিস্মিত হয়ে মেয়ের দিকে তাকালেন। নীলু বলল, স্যারের খুব বিপদ। খালি গায়ে ছেলেটি স্যারকে মেরে ফেলবে। তাঁকে সাবধান করা দরকার।

বলিস কী!

আমি যা বলছি, ঠিকই বলছি। তুমি এক্ষুনি যাও। খামের উপর ঠিকানা লেখা আছে। আমি নিজেই যেতাম, কিন্তু আমার ভালো লাগছে না।

জাহিদ সাহেব দেখলেন, খামের উপর পুরানা পল্টনের ঠিকানা লেখা।

১০

পুলিশ কমিশনার রাত এগারটায় পুরানা পল্টন এলাকায় এলেন। থমথম করছে চারদিক। একটি ভিখিরিকেও দেখা গেল না। দোকানপাট সব বন্ধ। তিনি লক্ষ করলেন, একতলার বাসিন্দাদের প্রায় সবাই এই প্রচণ্ড গরমেও জানালা বন্ধ করে শুয়েছে। আতঙ্কের মতো ভয়াবহ কিছুই নেই। এবং পুলিশের শাস্ত্রে আতঙ্কগ্রস্ত মানুষের মতো ভয়াবহ কিছুই নেই। মিছিলের মানুষজন হঠাৎ ক্ষিপ্তের মতো পুলিশের গাড়িতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কারণ রাইফেল হাতে পুলিশকে দেখে তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়।

সাজ্জাদ হোসেন গাড়ি থেকে নেমে সিগারেট ধরালেন। এ অঞ্চলে টহলপুলিশের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন তাদের জন্যে। কিছুক্ষণ

কথাবার্তা বলবেন। হঠাৎ করেই তাঁর মনে হলো, গোরস্থানের ভেতর কিছু ফিক্সড পোস্ট সেন্ট্রি দেওয়া দরকার। লুকিয়ে থাকার জন্যে গোরস্থান হচ্ছে আদর্শ জায়গা। কেউ কিচ্ছু টের পাবে না। একসময় আত্মগোপনকারী দেয়াল টপকে ঝাঁপিয়ে পড়বে অসতর্ক পথচারীর ওপর।

তিনজন পুলিশের একটি দল আসছে গল্প করতে করতে। সাজ্জাদ হোসেন লক্ষ করলেন, এদের সঙ্গে টর্চ লাইট নেই। অথচ বলে দেওয়া হয়েছিল, পাঁচ ব্যাটারির একটি টর্চ লাইট যেন সঙ্গে থাকে। পুলিশ বাহিনীতে একটি কাজও কি কখনো ঠিকমতো করা হবে না!

হল্ট।

তিনজন দাঁড়িয়ে পড়ল এবং স্যালুট দিল।

তোমরা তিনজন কেন ? একেকটা দলে দু'জন করে থাকতে বলেছি। তৃতীয় জন এসে জুটল কীভাবে ?

জানা গেল, এই ব্যবস্থা তারা নিজেরা করে নিয়েছে। তিনজন থাকলে নাকি মনে বেশি সাহস থাকে।

তোমরা কি লোহার রড হাতে একটা লোকের ভয়ে আধমরা হয়ে গেছ ? একজন আনসারের সাহসও তো তোমাদের চেয়ে বেশি।

ওরা কিছু বলল না। তিনি থমথমে গলায় বললেন, মেইন রোড ধরে হাঁটছ কেন ? আমি বলেছি না, অলিগলিতে থাকবে এবং কিছুক্ষণ পরপর বাঁশি বাজাবে ? আমি পনের মিনিট এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, একবারও তো তোমাদের বাঁশি শুনলাম না।

বাঁশি শুনলে তা স্যার ঐ ব্যাটা সাবধান হয়ে যাবে। ধরতে পারব না।

ঐ ব্যাটার জন্যে আমার মোটেও মাথাব্যথা নেই। বাঁশি বাজানো দরকার অন্যদের সাহস দেওয়ার জন্যে। যাতে সবাই বুঝতে পারে, ভালো পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে। বুঝতে পারছ ?

জি স্যার।

আর শোনো, রাত একটার পর যাকেই দেখবে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। খালি গায়েই হোক কিংবা কোট-প্যান্ট পরাই হোক। বুঝতে পারছ ?

জি স্যার।

সাজ্জাদ হোসেন গোরস্থানে ঢুকলেন। সন্দেহজনক কিছুই কোথাও নেই। টুপি পরা দু-তিনজন লোক ঘোরাফেরা করছে। এরা গোরস্থানেরই লোক। তবু তিনি তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। ওদের একজন হাসিমুখে বলল, গোরস্থানে কোনো আজেবাজে লোকে ঢোকে না স্যার। গোরস্থান হইল গিয়া আল্লাহ পাকের খাস জায়গা।

সাজ্জাদ হোসেন প্রচণ্ড ধমক দিয়ে তাকে থামালেন। তাঁর আঠার বছরের পুলিশী জীবনে তিনি ভয়ঙ্কর সব অপরাধীকে গোরস্থান এবং মসজিদে লুকিয়ে থাকতে দেখেছেন।

তোমরা সজাগ থাকবে এবং লক্ষ রাখবে।

জি আচ্ছা স্যার।

কাল থেকে গোরস্থানের ভেতরেও আমি পুলিশ বসাব।

জি আচ্ছা স্যার।

যত সব শুয়োরের বাচ্চা।

ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। পুলিশ সাহেব গালটা কাকে দিলেন, বোঝা গেল না। এই লোকের মেজাজ খারাপ। গোরস্থানের ভেতর কেউ এরকম গরম দেখায় না। এত সাহস কারও নেই।

সাজ্জাদ হোসেন তাঁর জিপ নিয়ে আরও খানিকক্ষণ এই অঞ্চলে ঘুরলেন। একটা পাগল-ছাগল রড হাতে বের হয়েছে এবং সেই কারণে এ জাতীয় পুলিশি তৎপরতার কোনো মানে হয় না। কিন্তু এটা করতে হয়েছে, কারণ একজন মন্ত্রীর শ্বশুরবাড়ি এই অঞ্চলে। এমনিতেই মন্ত্রীদের যন্ত্রণায় প্রাণ বের হয়ে যায়, তার উপর ইনি হচ্ছেন নন পার্লামেন্টারিয়ান মন্ত্রী। এঁদের গরমই আলাদা।

তিনি মন্ত্রী সাহেবের শ্বশুরবাড়ির সামনে জিপ থামালেন। বাড়ির সামনেই পুলিশ পাহারা আছে। সব ক'জন মন্ত্রীর শ্বশুরবাড়ির সামনে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করতে হলে তো সর্বনাশ! বিশাল এক পুলিশ বাহিনী লাগবে মন্ত্রীদের আত্মীয়স্বজনদের জন্যে।

সাজ্জাদ হোসেনের মুখ তেতো হয়ে গেল। তিনি শব্দ করে থুথু ফেললেন। মিসির আলির বাড়িও এ অঞ্চলে। ঠিকানা সঙ্গে নেই। ঠিকানা থাকলে একবার যাওয়া যেত। মিসির আলির কাজের মেয়েটি সম্পর্কেও তিনি কিছু খোঁজখবর নিয়েছেন। হারিয়ে যাওয়া বেশ কিছু মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেগুলো দিয়ে মিসির আলিকে আপাতত ঠান্ডা করা যাবে।

সেন্ট্রি এগিয়ে আসছে।

সাজ্জাদ হোসেন বললেন, কী খবর ?

খবর স্যার ভালোই।

সব ঠিকঠাক ?

জি স্যার। তবে স্যার, এই বাড়ির লোকজন আমার সাথে খুব রাগারাগি করছে।

কেন ?

এরা নাকি দু'জন সেন্ট্রি চেয়েছিল। একজন দেখে রেগে গেছে।

দু'জন লাগবে কেন ? এরা কোন দেশের মহারাজ ?

স্যার, কী বললেন ?

কিছু বলিনি। যাও, ডিউটি দাও।

এরা স্যার জিজ্ঞেস করছিল, তোমাদের ডিউটি অফিসার কে।

তাই নাকি ?

জি স্যার। বলছিল, ব্যাটার চাকরি খাব।

সাজ্জাদ হোসেন আবার থুথু ফেললেন। মন্ত্রীদের আত্মীয়স্বজনেরা কথায় কথায় চাকরি খেতে চায়। চাকরি ছাড়া ওদের মুখে অন্য কিছু রোচে না। শালা!

সেন্ট্রি।

জি স্যার?

যাও, ডিউটি করো। দেখি, আমি আরেকজনকে পাঠাব।

সাজ্জাদ হোসেন মনে মনে ভাবলেন, পুলিশের চাকরি করার মানেই হচ্ছে পদে-পদে অপমানিত ও অপদস্থ হওয়া।

১১

মিসির আলি ঢাকা পৌঁছলেন রবিবার ভোরে। দরজা খুলেই নীলুর চিঠিভর্তি খাম পেলেন। চিঠিতে একটিমাত্র লাইন—'স্যার, আপনার বড় বিপদ!' কিসের বিপদ, কী সমাচার, কিছুই লেখা নেই।

মেয়েদের নিয়ে এই সমস্যা। তাদের সব চিঠিতেই অপ্রয়োজনীয় কথার ছড়াছড়ি। শুধু প্রয়োজনীয় কথাগুলোর বেলায় তারা শর্টহ্যান্ড ভাষা ব্যবহার করে। আজ পর্যন্ত তিনি মেয়েদের এমন কোনো চিঠি পাননি, যেখানে জরুরি কথাগুলো গুছিয়ে লেখা।

তবে নীলু একটি কাজ করেছে। নিজের বাড়ির ঠিকানা দিয়েছে। এক্ষুনি চলে যাওয়া যায়। মিসির আলি গেলেন না। হাত-মুখ ধুয়ে প্ল্যান করতে বসলেন, আজ সারা দিনে কী কী করবেন।

ক. হানিফার খোঁজ নেবেন।

খ. ইউনির্ভাসিটিতে যাবেন।

গ. ফিরোজের খোঁজ নেবেন।

ঘ. সাজ্জাদ হোসেনের সঙ্গে দেখা করবেন।

ঙ. আজমলের সঙ্গে দেখা করবেন।

এই পাঁচটি কাজ শেষ করবার পর নীলুর কাছে যাওয়া যেতে পারে। তাঁর এমন কোনো বিপদ নেই যে এক্ষুনি ছুটে যেতে হবে। তবে কেন জানি নীলুর কাছে আগে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে। ফ্রয়েডিয়ান কোনো ব্যাখ্যা এর নিশ্চয়ই আছে।

ট্রেনে আসতে আসতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এবং আশ্চর্য, নীলুকে স্বপ্নে দেখলেন। স্বপ্নটি এমন ছিল যে, জেগে উঠে তাঁর নিজেরই লজ্জা করতে লাগল। কেবলই মনে হতে লাগল, তাঁর পাশে বসে থাকা লোকগুলোও তাঁর স্বপ্নের ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে। তিনি যে খানিকক্ষণ আগেই একটি রূপবতী মেয়ের হাত ধরে নদীর ধারে হাঁটছিলেন, এটা সবাই জানে।

হানিফা সুস্থ।

তবে অনেক রোগা হয়ে গেছে। মুখ শুকিয়ে হয়েছে এতটুকু। হানিফার কাছে তিনি ঠিক সময়েই এসেছেন। আজই তার রিলিজ অর্ডার হবে। আর একদিন দেরি হলে

মুশকিল হয়ে যেত। মেয়েটি ঘাবড়ে যেত। কারণ এই সাতদিন কেউ তাকে দেখতে আসেনি। অথচ বাড়িওয়ালা করিম সাহেব বারবার বলেছেন, তিনি প্রতিদিন একবার এসে খোঁজ নেবেন। আমাদের দেশের মানুষদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, যে কাজগুলো তারা করতে পারবে না, সেই কাজগুলোর দায়িত্ব তারা সবচেয়ে আগ্রহ করে নেবে।

চল হানিফা, বাসায় যাই।

চলেন।

তুই তো দারুণ রোগা হয়েছিস রে বেটি।

আপনেও রোগা হইছেন।

অসুখে পড়ে গিয়েছিলাম রে হানিফা। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছিল, তাতে মনে হয়েছিল নিউমোনিয়াতে ধরেছে। মরতে-মরতে বেঁচে গেছি। তুই বস এখানে, আমি রিলিজ অর্ডারের ব্যবস্থা করি।

রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ান বললেন, হানিফা মেয়েটি আপাতত সুস্থ, কিন্তু আবার অসুস্থ হয়ে পড়বে।

কেন ?

ওর প্রবলেমটা হার্টের একটা ভাল্বে। তার জন্মই হয়েছিল একটা ডিফেকটিভ ভাল্ব নিয়ে। তার ছোটবেলায় ডাক্তাররা চেষ্টা করেছেন ভাল্বটা রিপেয়ার করতে। ওপেন হার্ট সার্জারি হয়েছে তার।

কী করে বুঝলেন ? মেয়েটি বলেছে ?

না, সে কিছু বলেনি। জিজ্ঞেস করেছিলাম। তার কিছু মনে-টনে নেই। তবে আমাদের বুঝতে না পারার কোনো কারণ নেই। ওর হার্ট আবার ওপেন করতে হবে।

এখানে করা যাবে ?

আগে যেখানে করা হয়েছিল, সেখানে করলেই ভালো হয়। আমাদের এখানে এত ছোট বাচ্চাদের ওপেন হার্ট সার্জারির সুযোগ নেই।

আপনার ধারণা, ওর অপারেশনটা এ দেশে হয়নি ?

না, এ দেশে হয়নি। পশ্চিমা কোনো দেশে হয়েছে। কেন, আপনি জানেন না ?

জি-না, আমার জানা নেই।

মিসির আলি চিন্তিত মুখে হানিফাকে নিয়ে ঘরে ফিরলেন। সাজ্জাদ হোসেনের সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। সে কতদূর কী করেছে জানা দরকার, বা আদৌ কিছু করেছে কি না। কিছু না করারই কথা। এ দেশের বেশির ভাগ লোকই কোনো কাজ করতে চায় না। কেন করতে চায় না—এই নিয়ে কিছু ভালো গবেষণা হওয়া দরকার। কর্মবিমুখতার কারণটি কী ? যদি একাধিক কারণ থেকে থাকে, সেগুলোই-বা কী ?

সাজ্জাদ হোসেনকে টেলিফোনে পাওয়া গেল না। যতবারই টেলিফোন করা হয়, ততবারই খুব চিকন গলায় একজন পুরুষ মানুষ বলে, উনি ব্যস্ত আছেন। মিটিং চলছে।

মিসির আলি বড় বিরক্ত হলেন। পুলিশরা এত মিটিং করে, তাঁর জানা ছিল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এয়ারকন্ডিশনড ঘরে বসে মিটিং করার মতো সময় তো তাদের থাকার কথা নয়। এগুলো হচ্ছে করপোরেট অফিসগুলোর কাজ—শুধু কথা বলা, বকবক করা। কিছুক্ষণ পরপর কফি খাওয়া। সুখে সময় কাটানো যার নাম।

সাজ্জাদ হোসেনের সময়টা অবশ্যি খুব সুখে কাটছিল না। মন্ত্রীর শাশুড়ির কল্যাণে তিনি একটি বিপজ্জনক অবস্থায় আছেন। আইজি মতিয়ুর রহমান পিএসপি'র কাছে তাঁকে জবাবদিহি করতে হচ্ছে।

আইজি মতিয়ুর রহমান ছোটখাটো মানুষ, কিন্তু দারুণ কড়া অফিসার। পুলিশমহলে একটি চালু কথা আছে—মতিয়ুর রহমানের সামনে দাঁড়ালে হাতিরও বুক কাঁপে। সাজ্জাদ হোসেনের বুক কাঁপছিল।

মতিয়ুর রহমান বললেন, দু'জন সেন্ট্রি চেয়েছিল, দিতেন দু'জন, কেন ঝামেলা করলেন ?

আমি স্যার দিতাম, পরে অফিসে ফিরে মনে হলো খামোখা...।

একজন মন্ত্রীর শাশুড়ির ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনেক বড় ব্যাপার, কেন বুঝতে পারেন না ? তাছাড়া যে একজন সেন্ট্রি ছিল, সকালবেলা দেখা গেল সে ঘুমাচ্ছে।

সারা রাত ডিউটি দিয়েছে স্যার, কাজেই ভোরবেলা ঘুম এসে গেছে। পুলিশ হলেও তো স্যার এরা মানুষ।

এখন বলেন, আমি কী করি। মিনিস্টার সাহেব ভোর সাতটায় আমাকে টেলিফোন করে বলেছেন, আপনার বিরুদ্ধে অ্যাকশান নেবার জন্যে।

সাজ্জাদ হোসেন ক্লান্ত গলায় বললেন, কী আর করবেন স্যার। অ্যাকশান নিতে বলেছে, অ্যাকশান নেন।

মতিয়ুর রহমান সাহেব ফাইল থেকে একটি চিঠি বের করে বললেন, আমি মিনিস্টার সাহেবকে এই চিঠিটা পাঠিয়েছি। কী লিখেছি শুনুন—

> জনাব,
>
> পুলিশ কমিশনার সাজ্জাদ হোসেনের বিরুদ্ধে আপনি আমাকে যে অ্যাকশান নেবার কথা বলেছেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আপনাকে জানাচ্ছি যে সাজ্জাদ হোসেন পুলিশ বাহিনীর একজন দক্ষ, নিষ্ঠাবান এবং সৎ অফিসার। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের জন্যে তাকে বীর বিক্রম উপাধিতে সম্মানিত করা হয়েছে। এ জাতীয় একজন অফিসারের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে লিখিত অভিযোগের প্রয়োজন আছে। আপনার অভিযোগের উপর ভিত্তি করে তদন্ত হবে। তদন্তকারী অফিসার সাজ্জাদ হোসেনকে দোষী সাব্যস্ত করবার পরই ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্ন ওঠে।
>
> বিনীত

মতিয়ুর রহমান চিঠি পড়া শেষ করে বললেন, ঠিক আছে ?

থ্যাংকয়ু ভেরি মাচ স্যার।

থ্যাংকস দেওয়ার কিছু নেই। সত্যি কথাই লিখেছি। তবে, আপনার উচিত আরও ট্যাক্টফুল হওয়া।

যাব স্যার ?

হ্যাঁ যান।

স্যার, একটা কথা বলি ?

বলুন।

স্যার, আমার ইচ্ছা হচ্ছে কালো একটা প্যান্ট পরে খালি গায়ে হাতে একটা লোহার রড নিয়ে যাই এবং ঐ শাশুড়ির মাথায় একটা বাড়ি দিয়ে আসি।

কথাটা বলেই সাজ্জাদ হোসেনের মনে হলো, একটা বড় ভুল হয়ে গেল। আইজি এমন কোনো ব্যক্তি নন, যিনি রসিকতা সহজভাবে নেবেন। কিন্তু অবাক কাণ্ড, মতিয়ুর রহমান সাহেব হেসে ফেললেন। মুচকি হাসি নয়। হা হা করে হাসি।

সাজ্জাদ হোসেনের জীবনে এটা একটা স্মরণীয় দিন। তাঁর মনের গ্লানি কেটে যেতে শুরু করেছে। তিনি অফিসে ফিরে দুটি সংবাদ শুনলেন—দশ মিনিট পরপর কে নাকি তাকে খোঁজ করছে এবং গত রাতে নগ্নগাত্র ত্রাস একটি ছ'বছরের ছেলেকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। তার ডেডবডি কিছুক্ষণ আগেই রিকভার করা হয়েছে। চেনার উপায় নেই। লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে থেঁতলে ফেলা হয়েছে।

সজ্জাদ হোসেন তক্ষুনি জিপ নিয়ে বেরুলেন।

হ্যালো, এটা কি ফিরোজদের বাসা ?

হ্যাঁ।

আপনি কে কথা বলছেন ?

আপনি কে এবং আপনার কাকে দরকার, সেটা বলুন।

আমার নাম মিসির আলি।

ও আচ্ছা। আমি ফিরোজের মা।

স্লামালিকুম আপা।

ওয়ালাইকুম সালাম।

আমি সপ্তাহখানেক বাইরে ছিলাম। আপনাদের খবর দিয়ে যেতে পারিনি।

ও।

গিয়েছিলাম চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে, ঝামেলায় পড়ে এত দেরি হলো। আমি ফিরোজের ব্যাপারেই খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম।

ও।

ফিরোজ কেমন আছে ?

ভালো।

ওকে টেলিফোনটা দিন।

ওকে টেলিফোন দেওয়া যাবে না।

বাসায় নেই।

না।

কোথায় গিয়েছে ? বাইরে ?

হ্যাঁ।

তাহলে আমি বরং রাতের বেলা একবার টেলিফোন করব।

না, রাতের বেলা টেলিফোন করবেন না। ওকে পাওয়া যাবে না।

কেন, ও কি রাতে ফিরবে না ?

না। ও ঢাকার বাইরে।

ঢাকার বাইরে! কোথায় ?

ওর মামার বাড়িতে—বরিশালে।

কিন্তু আমি তো বলেছিলাম ওকে দীর্ঘদিন চোখে-চোখে রাখতে হবে।

কোনো উত্তর নেই।

হ্যালো।

বলুন।

কী হয়েছে ফিরোজের ?

কী আবার হবে ? কিছুই হয়নি। ও ভালো আছে।

কিন্তু আপনার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে, কিছু-একটা হয়েছে। আপনি কি দয়া করে বলবেন ?

ওর কিছু হয়নি। ও ভালো আছে। ও আছে তার মামার বাড়িতে।

বরিশালে ?

হ্যাঁ, বরিশালে।

আপনি ঠিক কথা বলছেন না। কারণ ফিরোজের মামার বাড়ি বরিশাল নয়। ফিরোজ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য আমার জানা। দয়া করে আপনি আমাকে বলুন, কী হয়েছে।

কিছু হয়নি। অনেকবার তো এই কথা বললাম। তবু কেন বিরক্ত করছেন ?

ওসমান সাহেবকে দিন। তাঁর সঙ্গে কথা বলব।

উনি বাসায় নেই।

কখন ফিরবেন ?

জানি না কখন ফিরবেন।

শুনুন আপা, আমি আসছি এই মুহূর্তে।

মিসির আলি টেলিফোন নামিয়ে রেখে তক্ষুনি ধানমণ্ডি ছুটলেন। কিন্তু ওসমান সাহেবের বাড়ির ভেতর ঢুকতে পারলেন না। দারোয়ান গেট বন্ধ করে বসে আছে। সে কিছুতেই গেট খুলবে না। ওসমান সাহেব এবং তাঁর স্ত্রী—কেউ নাকি বাড়ি নেই। কখন ফিরবেন তারও ঠিক নেই। মিসির আলি বললেন, ঠিক আছে, আমি বসার ঘরে অপেক্ষা করব। গেট খোল।

সাহেব আর মেমসাহেব বাড়িতে না থাকলে গেট খোলা নিষেধ আছে।

মিসির আলি প্রায় দু'ঘণ্টা বন্ধ গেটের ওপাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। কোনো লাভ হলো না। নীলুদের বাসা কাছেই কোথাও হবে। ঝিকাতলা ধানমণ্ডি থেকে খুব-একটা দূর নয়। মিসির আলি সেদিকেই রওনা হলেন।

ফিরোজের কথা বারবার মনে আসছে। কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছেন না। কী হলো ছেলেটার ? আর যদি কিছু হয়েই থাকে, সবাই মিলে এটা তাঁর কাছে গোপন করছে কেন ? রহস্যটা কী ? রাতে ফেরবার পথে আরেকবার খোঁজ নিতে হবে।

১২

মিসির আলি নরম স্বরে বললেন, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক। আমার এক ছাত্রী কি এ বাড়িতে...।

বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, আসুন, আমি নীলুর বাবা। আমার নাম জাহিদুল ইসলাম।

স্লামালিকুম।

ওয়ালাইকুম সালাম। বসুন আপনি। নীলু এসে পড়বে।

ওকে খবর দিন। আমি বেশিক্ষণ থাকব না, আকাশের অবস্থা ভালো না—ঝড়বৃষ্টি হবে।

জাহিদ সাহেব তাঁর মেয়েকে খবর দেওয়ার জন্যে মোটেই ব্যস্ত হলেন না। খবর দেওয়ার কিছু নেই। নীলু খবর পেয়ে গেছে। দশ মিনিট আগেই সে বলেছে, স্যার আমাদের বাসার দিকে রওনা হয়েছেন। এসে পড়বেন কিছুক্ষণের মধ্যে।

নীলুর মুখ উজ্জ্বল এবং হাসি হাসি। এইসব জাহিদ সাহেবের ভালো লাগছে না। একজন মাঝবয়সী অধ্যাপকের জন্যে এত আগ্রহ নিয়ে তাঁর মেয়ে অপেক্ষা করবে কেন ?

তিনি একটি সুস্থ স্বাভাবিক মেয়েকে নিজের পাশে চান—যার কোনো অলৌকিক ক্ষমতা নেই। কী হবে না হবে, তা সে আগে থেকে বলতে পারবে না। অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে যে গ্রহণ করবে আর দশটি মেয়ের মতো।

মিসির আলি বললেন, আমি আপনার এ বাড়িতে আগে একবার এসেছি। আনিস সাহেব বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁর স্ত্রীকে কিছুদিন চিকিৎসা করেছিলাম।

আমি জানি।

আনিস সাহেব কি এখনো এ বাড়িতে থাকেন ?

না।

অন্য কোনো ভাড়াটে এসেছে বুঝি ?

না, বাড়ি ভাড়া দিই না এখন, যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।

এ কথা বলছেন কেন ?

রানু মেয়েটা এ বাড়িতে না থাকলে, আজ আমার মেয়ের এ অবস্থা হতো না।

এত জোর দিয়ে তা বলা কি ঠিক ? অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা আমরা কেউ তো জানি না।

জাহিদ সাহেব গম্ভীর হয়ে গেলেন। রোগা, কালো এবং কিঞ্চিৎ কুঁজো হয়ে বসে থাকা এই লোকটিকে তাঁর মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। নীলু এই লোকটির মধ্যে কী দেখেছে ? জাহিদ সাহেবের ইচ্ছা হচ্ছে উঠে চলে যেতে। কিন্তু বাইরের একটি লোককে একা বসিয়ে রেখে উঠে চলে যাওয়া যায় না। তিনি লক্ষ করলেন, ভদ্রলোক সিগারেট ধরিয়েছেন। তাঁর সামনেই অ্যাশট্রে তবু তিনি চারদিকে ছাই ফেলছেন। কী কুৎসিত স্বভাব! এরা ছাত্রদের কী শেখাবে ? নিজেরাই তো কিছু শেখেনি।

মিসির আলি বললেন, আপনার আরেকটি মেয়ে ছিল। ওর কি বিয়ে হয়ে গেছে ?

হ্যাঁ।

কোথায় আছে সে ?

বাইরে।

বিলুর প্রসঙ্গ উঠলেই জাহিদ সাহেব অনেক কথা বলেন। কিন্তু আজ এই লোকটির সঙ্গে কোনো কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না। তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

মিসির আলি সাহেব।

জি ?

আমার মাথা ধরেছে, আমি একটু শুয়ে থাকব। কিছু মনে করবেন না। আমি নীলুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

জি আচ্ছা।

জাহিদ সাহেব নীলুর ঘরে উঁকি দিয়ে অবাক এবং দুঃখিত হলেন। নীলু শাড়ি বদল করেছে। সাধারণ শাড়ি বদলে বেগুনি রঙের চমৎকার একটি শাড়ি পরেছে এবং চুল বাঁধছে। এর মানেটা কী ?

নীলু।

জি ?

তোর স্যার বসে আছেন নিচে।

যাচ্ছি বাবা।

বেশিক্ষণ উনাকে আটকে রাখা ঠিক না। আকাশের অবস্থা খারাপ।

বাবা, আমি তো উনাকে আজ রাতে এখানে থেকে যেতে বলব।

সে কী! কেন ?

আমার কথা শেষ হতে অনেক রাত হয়ে যাবে। এত রাতে আমি উনাকে ছাড়ব না।

কথাটা তাহলে দিনের বেলা বল। কাল উনাকে আসতে বলে দে।

বাবা, উনার সঙ্গে আজই আমার কথা বলা দরকার। একটা রাত উনি এখানে থাকলে, তোমার কি কোনো আপত্তি আছে ?

জাহিদ সাহেব হ্যাঁ-না কিছুই বলতে পারলেন না। নীলু বলল, আমাদের গেস্টরুমটা ঠিকঠাক করে রেখেছি। উনি সেখানেই থাকবেন। তুমি এত গম্ভীর হয়ে আছ কেন বাবা ? আপত্তি থাকলে বলো—আমার আপত্তি আছে।

আমার আপত্তি আছে।

আপত্তিটা কেন ?

ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে তোর এত কিসের খাতির ?

খাতির কিছু নেই বাবা। উনি আমার টিচার এবং চমৎকার একজন টিচার। আমি অনেক কিছু শিখেছি তাঁর কাছ থেকে। তাঁর প্রতি আমার অন্যরকম একটা শ্রদ্ধা আছে।

এই জন্যেই কি এত শাড়ি-গয়না পরে সাজতে শুরু করেছিস ?

না বাবা, সেজন্যে সাজছি না এবং তুমি যা ভাবছ তাও ঠিক না। আমি এত সাজগোজ করছি, কারণ স্যার রিকশা করে আসতে আসতে ভাবছিলেন, আমাকে দেখবেন বেগুনি রঙের একটা শাড়ি পরা অবস্থায়। কাজেই আমি এইভাবে সেজেছি। রহস্যময় সবকিছুতে স্যারের অবিশ্বাস আছে, আমি সেটা দূর করতে চাই। চলে যেও না বাবা, আমার কথা এখনো শেষ হয়নি। এই স্যার রানু আপার ব্যাপারটা খুব ভালো জানেন। রানু আপার রহস্যের সঙ্গে আমার রহস্যের একটা মিল আছে। সেই মিল নিয়ে স্যারের সঙ্গে আমি কথা বলব।

নীলু দম নেওয়ার জন্যে থামল। জাহিদ সাহেব কী বলবেন, ভেবে পেলেন না।

বাবা।

বল।

স্যার যদি আজ রাতে এ বাড়ির গেস্টরুমে থাকেন, তোমার কি খুব বেশি আপত্তি হবে ?

না।

আমি যখন স্যারের সঙ্গে কথা বলব, তখন তুমি ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে থাকতে পার।

না, আমি শুয়ে থাকব, আমার মাথা ধরেছে।

না বাবা, তোমার মাথা ধরেনি। তুমি আমার স্যারকে খুবই অপছন্দ করছ বলে এরকম করছ। বাবা, তোমাকে শুধু একটা কথা বলি—মানুষ হিসেবে উনি প্রথম শ্রেণীর। তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না, তাই না ?

বিশ্বাস করব না কেন ? করছি।

না, তুমি করছ না। তাতে অবশ্যি কিছু যায় আসে না, তবে তুমি যদি বিশ্বাস করতে, তাহলে আমার ভালো লাগত। ঠিক আছে বাবা, তুমি যাও, শুয়ে থাক। রাত দশটার সময় টেবিলে ভাত দেব, তখন তোমাকে ডাকব।

নীলু বসার ঘরে ঢুকল নিঃশব্দে। মিসির আলি চাঁপা ফুলের হালকা একটা সুবাস পেয়ে চমকে পেছনে ফিরলেন। নীলু বলল, কেমন আছেন স্যার ?

তিনি কোনো জবাব দিতে পারলেন না। তাঁর দারুণ অস্বস্তি ও লজ্জা লাগতে লাগল। একটা বিব্রতকর অবস্থা। কারণ তিনি রিকশায় আসতে আসতে নীলুকে যেভাবে দেখবেন কল্পনা করেছিলেন, সে ঠিক সেভাবেই সেজেছে। কাকতালীয় মিল বলে একে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। দুটি কারণে এরকম হতে পারে। হয়তো নীলু এরকম সেজে বসেছিল। তিনি তাঁর ESP-র মাধ্যমে তা টের পেয়েছেন। এটা সম্ভব নয়, কারণ মিসির আলি খুব ভালো করেই জানেন, তাঁর কোনো ESP ক্ষমতা নেই। দ্বিতীয় কারণটি যদি সত্যি হয়, তাহলে বড় অস্বস্তির ব্যাপার হবে। তিনি রিকশায় আসতে আসতে যা ভাবছিলেন, নীলু তা টের পেয়েছে এবং সেইভাবে সেজেছে। এরকম হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

মিসির আলি রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন! তাঁর মনে নীলু সম্পর্কে যে-সব কল্পনা আছে, তা তিনি আড়াল করে রাখতে চান। বিশেষ করে ট্রেনে আসতে আসতে যে স্বপ্নটা দেখেছেন। এটি যদি নীলু টের পায়, তাহলে বড় লজ্জার ব্যাপার হবে। তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন, দেখ নীলু, স্বপ্নের উপর আমার হাত নেই। স্বপ্ন হচ্ছে স্বপ্ন।

কিন্তু মনোবিজ্ঞানের একজন শিক্ষক হিসেবে তিনি জানেন, স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন নয়। অবচেতন কামনা-বাসনার ছবি। তিনি তাকালেন নীলুর দিকে। মেয়েটির মুখে হাসি। ছোটদের দুষ্টুমি দেখে বড়রা যেরকম হাসে, সেরকম।

নীলু বলল, স্যার চলুন, আমরা বারান্দায় গিয়ে বসি।

আমি বেশিক্ষণ বসব না নীলু। আকাশের অবস্থা ভালো না! ঝড় হবে।

হলে হবে। ঝড়বৃষ্টি নিয়ে ঠিক এই মুহূর্তে আপনাকে ভাবতে হবে না।

বারান্দায় অন্ধকার। সেখানে পাশাপাশি দুটি বেতের চেয়ার দেওয়া আছে। গ্রিল থাকা সত্ত্বেও বারান্দায় বসে অনেকখানি আকাশ দেখা যায়। যে আকাশে অনবরত বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মিসির আলি বললেন, কী বলবে তুমি, বলো।

নীলু বলল, আপনি একবার ক্লাসে ESP-র ওপর বলেছিলেন। আপনার মনে আছে ?

আছে।

আমার এবং আমার কয়েকজন বন্ধুর ESP আছে কি না তা পরীক্ষা করলেন। মনে আছে ?

হ্যাঁ, মনে আছে। 'জেনার কার্ড' দিয়ে পরীক্ষা।

সেই পরীক্ষায় আমরা কেউ পাস করতে পারিনি। তার মানে, আমাদের কারওই এক্সট্রা সেনসরি পারসেপশান ক্ষমতা নেই।

হুঁ, তা ঠিক। যাদের লজিক খুব তীক্ষ্ণ, তাদের এটা থাকে না। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের, যাদের লজিক খুব দুর্বল, তাদের থাকে।

স্যার, আমি জানি না আমি এখন একটি নিম্নশ্রেণীর প্রাণী কি না, কিন্তু আমার ESP ক্ষমতা অনেক বেশি। ঠিক এই মুহূর্তে আপনি কী ভাবছেন, আমি বলে দিতে পারি।

নীলু বলতে বলতে হেসে ফেলল। এবং হাসি ঢাকার জন্যে অন্যদিকে মুখ ফেরাল। মিসির আলি খুব লজ্জায় পড়ে গেলেন। কারণ, তিনি একটি আপত্তিকর ভাবনা ভাবছিলেন। তিনি ভাবছিলেন—নীলুর সঙ্গে রিকশা করে যাচ্ছেন। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে দু'জনেই ভিজে জবজবে। হুড তোলা এবং পর্দা ফেলা। রিকশাওয়ালা বাতাস কাটিয়ে বহু কষ্টে এগুচ্ছে। তিনি নীলুর হাত ধরে আছেন।

স্যার।

বলো।

শুধু শুধু আপনি এত লজ্জা পাচ্ছেন কেন ? আমরা সবাই তো এরকম কত অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তা করি, এবং এটাই তো স্বাভাবিক।

হুঁ, তা ঠিক। আমার সঙ্গে কী বলতে চাচ্ছিলে বলো। আমি বেশিক্ষণ থাকব না। ঝড় আসবে।

বলতে না বলতেই বড় বড় ফোটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। বাতাস বইতে শুরু করল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়ে চারদিক অন্ধকারে ডুবে গেল। নীলু মৃদু স্বরে বলল, রানু আপাকে তো আপনি ভালো মতোন চিনতেন, তাই না স্যার ?

হ্যাঁ।

রানু আপার সঙ্গে আমার কী কী মিল আছে ?

কোনো মিল নেই। প্রতিটি মানুষই আলাদা। একজন মানুষের সঙ্গে অন্য একজন মানুষের মিল থাকে সামান্যই।

কিন্তু রানু আপার অসম্ভব ESP ক্ষমতা ছিল। ছিল না ?

তা ছিল।

আমারও আছে। আছে না ?

হ্যাঁ, আছে।

রানু আপা কি আপনাকে কখনো বলেছিল, তার ভেতরে একজন দেবী বাস করেন ?

বলেছিল।

আপনি বিশ্বাস করেননি ?

না, করিনি। এইসব ছেলেমানুষী জিনিস বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে।

স্যার, রানু আপা যা বলত, এখন আমি যদি তা-ই বলি—আপনি বিশ্বাস করবেন না ?

না।

পৃথিবীতে অনেক রহস্যময় ব্যাপার আছে স্যার।

একসময় ঝড়বৃষ্টিকেও রহস্যময় মনে করা হতো, এখন করা হয় না। মানুষের জ্ঞান, মানুষের বুদ্ধি রহস্যময়তাকে সরিয়ে দিচ্ছে। এই পৃথিবীতে যত অলৌকিক ব্যাপার আছে, তার প্রতিটির পেছনে আছে একটি লৌকিক ব্যাখ্যা।

মিসির আলি সিগারেট ধরালেন এবং বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলতে লাগলেন—দেখ নীলু, তুমি বলছ তোমার ভেতর একজন দেবী আছেন। সেই দেবী যদি এই মুহূর্তে তোমার ভেতর থেকে বের হয়ে আসেন এবং আমাকে বলেন, এই যে মিসির আলি সাহেব। তাহলেও আমি ব্যাপারটা বিশ্বাস করব না। আমি খুঁজব একটা লৌকিক ব্যাখ্যা।

কী হবে সেই ব্যাখ্যা ?

আমি যা দেখব, মনোবিজ্ঞানীর ভাষায় তার নাম হেলুসিনেশন। কিছু কিছু ড্রাগস আছে, যা খেলে হেলুসিনেশন হয়। যেমন এলএসডি। ইংল্যান্ডে আমি এক ছাত্রকে দেখেছিলাম—সে এলএসডি খেত যিশু খ্রিষ্টকে দেখার জন্যে। এলএসডি খেলেই সে যিশু খ্রিষ্টকে দেখতে পেত। তুমি বুঝতেই পারছ, সে যা দেখত, তা হেলুসিনেশন।

নীলু দীর্ঘ সময় চুপ করে বসে রইল। বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। এক-একটা বাতাসের ঝাপটা এসে গা ভিজিয়ে দিচ্ছে, তবু দু'জনের কেউ নড়ল না। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। শুধু মিসির আলির সিগারেটের আলো ওঠানামা করছে।

নীলু ক্ষীণস্বরে বলল, স্যার।

বলো।

আমি একটি খারাপ লোকের হাতে পড়েছিলাম স্যার। একটা ভয়ঙ্কর খারাপ লোক আমাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নির্জন একটা ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। সে একটা ক্ষুর নিয়ে এসেছিল আমাকে মারতে। তখন সেই দেবী আমাকে রক্ষা করেন। সমস্ত ব্যাপারটা আমার দেখা। দেবীকেও আমি দেখেছি। একটি অপূর্ব নারীমূর্তি।

তুমি বলতে চাও, তারপর থেকে সেই দেবী তোমার সঙ্গে আছে ?

হ্যাঁ।

তুমি যা দেখেছ, তার যে একটা লৌকিক ব্যাখ্যা হতে পারে—তা কি তুমি ভেবেছ ?

সবকিছুর ব্যাখ্যা নেই স্যার।

চেষ্টা করে দেখি, এর একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায় কি না।

ঠিক আছে, চেষ্টা করুন।

রানু মেয়েটির সঙ্গে তোমার খুব ভাব ছিল। তার কাছ থেকেই দেবীর ব্যাপারটি তুমি শুনেছ। একটা নতুন ধরনের কথা। রোমান্টিক ফ্লেভার আছে দেবীর ব্যাপারটায়, কাজেই জিনিসটা তোমার মনে গেঁথে রইল। তুমি নিজে যখন বিপদে পড়লে, ঐ জিনিসটাই উঠে এল তোমার মনের ভেতর থেকে। একটা হেলুসিনেশন হলো। তীব্র মানসিক চাপ এবং তীব্র হতাশা থেকে এই হেলুসিনেশনের জন্ম। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে stress induced hallucination.

ঐ খারাপ লোকটি মারা গেল কীভাবে ?

তার মৃত্যু হয়েছে স্বাভাবিক কারণে। পা পিছলে উল্টে পড়ে মাথায় আঘাত পেয়েছে বা এই জাতীয় কিছু। এখানে দেবীর কোনো ভূমিকা নেই। লোকটির সুরতহাল রিপোর্ট থেকেই তার মৃত্যুর কারণ বের হয়ে আসা উচিত। কী ছিল পোস্টমর্টেম রিপোর্টে ?

মিসির আলি প্রশ্নের জবাবের জন্যে অপেক্ষা করলেন। কোনো জবাব পাওয়া গেল না। নীলু মনে হচ্ছে গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে। অন্ধকারে পরিষ্কার কিছু দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু কেন জানি তাঁর মনে হলো, মেয়েটি কাঁদছে। কাঁদবে কেন সে ? কাঁদার মতো কোনো কথা কি তিনি বলেছেন ?

নীলু।

জি।

আমি এখন উঠি ? আমার যাওয়ার দরকার। এ বৃষ্টি কমবে না। যত রাত হবে, তত বাড়বে। তুমি কি আমাকে আরও কিছু বলবে ?

নীলু জবাব দিল না। মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন।

তোমার বাবাকে খবর দাও, বিদেয় নিয়ে যাই।

নীলু কঠিন কণ্ঠে বলল, আপনি যাচ্ছেন কোথায় ?

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, বাসায় যাচ্ছি, আর কোথায় যাব ?

না, আপনার বাসায় যাওয়া হবে না। আজ রাতে আপনি এখানে থাকবেন।

কী বলছ তুমি!

আপনার জন্যে ঘর রেডি করে রেখেছি। সঙ্গে অ্যাটাচড বাথরুম আছে। আপনার কোনো অসুবিধা হবে না।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না। এখানে কেন থাকব ?

এখানে থাকবেন, কারণ আজ রাতে লোহার রড নিয়ে একটি ছেলে আপনাকে মারতে যাবে। আমি আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করছি না বা বানিয়েও কিছু বলছি না। আমি অনেক কিছুই বুঝতে পারি। ঐ ছেলেটির নাম যদি আপনি জানতে চান, তাও বলতে পারি। কি, জানতে চান ?

মিসির আলি ক্ষীণস্বরে বললেন, ওর কী নাম ?

ওর নাম ফিরোজ। স্যার, আপনি কি আমি যা বলছি, তা বিশ্বাস করছেন ?

বুঝতে পারছি না। আমি একটি দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেছি।

দ্বিধার মধ্যে পড়েন বা না পড়েন—আমি এখান থেকে আপনাকে যেতে দেব না, কিছুতেই না।

মিসির আলি লক্ষ করলেন, মেয়েটি কঠিন স্বরে কথা বলছে। তার কথা বলার ধরন থেকেই বলে দেয়া যায়, এই মেয়ে তাকে যেতে দেবে না।

নীলু, আমার বাসায় কাজের মেয়েটি আছে একা।

না, 'ইমা' আপনার ঘরে নেই। আপনার ফিরতে দেরি দেখে সে বাড়িওয়ালার ঘরে ঘুরতে গেছে।

তুমি ওর কী নাম বললে ?

যা নাম, তা-ই বললাম—ইমা।

ইমা ?

হ্যাঁ, ইমা।

ওর বাবার নাম বলতে পারবে ?

ইমা নাম থেকেই আপনি ওর বাবাকে বের করতে পারবেন।

বলতে বলতে নীলু হেসে উঠল। হাসিতে একটি ধাতব ঝংকার। অন্য এক ধরনের কাঠিন্য। যেন এ নীলু নয়, অন্য একটি মেয়ে। অচেনা একজন মেয়ে।

স্যার আসুন, আপনাকে আপনার ঘর দেখিয়ে দিই। ড্রয়ারে মোমবাতি আছে, মোমবাতি জ্বালিয়ে বসে বসে বৃষ্টির শোভা দেখুন। আমি যাব রান্না করতে।

তোমাদের টেলিফোন আছে না ?

আছে। দিয়ে যাচ্ছি আপনার ঘরে। যত ইচ্ছা টেলিফোন করুন।

টেলিফোনে অনেক চেষ্টা করেও ফিরোজদের বাড়ির কাউকে ধরা গেল না। হয় টেলিফোন নষ্ট কিংবা রিং হচ্ছে, কেউ ধরছে না। আশ্চর্য ব্যাপার!

বাড়িওয়ালা করিম সাহেবকে টেলিফোন করলেন। করিম সাহেব জেগে ছিলেন এবং তিনি জানালেন হানিফা তাঁর বাসাতেই আছে। ঘুমাচ্ছে।

মিসির আলি মোমবাতি জ্বালিয়ে গেস্টরুমে বসে রইলেন একা-একা। এখনো ইলেকট্রিসিটি আসেনি। বাজ পড়ে কোনো ট্রান্সফরমার পুড়ে-টুড়ে গেছে হয়তো। কেউ ঠিক করবার চেষ্টা করছে না। এ দেশে কেউ কোনো কিছু ঠিক করবার জন্যে ব্যস্ত নয়। শহর অন্ধকারে ডুবে আছে তো কী হয়েছে ? থাকুক ডুবে। দুষ্ট লোকেরা অন্ধকারে বেরিয়ে আসবে ? আসুক বেরিয়ে। আমরা কেউ কারও জন্যে কোনো মমতা দেখাব না। মমতা এ যুগের জিনিস নয়।

কিন্তু সত্যি কি নয় ? মমতা কি কেউ কেউ দেখাচ্ছে না ? নীলু যে তাঁকে আটকে রাখল, তার পেছনে কি মমতা কাজ করছে না ?

সে কেন তাঁকে এই মমতাটা দেখাচ্ছে ? কেন, কেন ? তাঁর ভুরু কুঞ্চিত হলো। কপালের শিরা দপদপ করতে লাগল। জ্বর আসছে নাকি ?

তিনি আবার সিগারেট ধরালেন। প্যাকেট শূন্য হয়ে আসছে। রাত কাটবে কী করে ? এ বাড়িতে এখনো কোনো কাজের লোক তাঁর চোখে পড়েনি, যাকে সিগারেট আনার জন্যে অনুরোধ করা যায়।

স্যার, আপনার চা।

নীলু এসে দাঁড়িয়েছে। মোমবাতির আলোয় কী সুন্দর লাগছে তাকে! মিসির আলি বিব্রত স্বরে বললেন, চা তো চাইনি।

রান্না হতে দেরি হবে। চা খেয়ে খিদেটা চেপে রাখার ব্যবস্থা করুন।

তিনি চায়ের পেয়ালা হাতে নিলেন। এবং নিজের অজান্তেই বলে ফেললেন, তুমি আমার নিরাপত্তার জন্যে হঠাৎ এত ব্যস্ত হলে কেন ?

নীলু মৃদু হেসে বলল, এই প্রশ্নের জবাব এখন দেব না। একদিন নিজেই বুঝতে পারবেন। চায়ে চিনি হয়েছে কিনা তাড়াতাড়ি দেখুন। আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারব না।

হয়েছে।

নীলু নিঃশব্দে চলে গেল। মিসির আলির হঠাৎ মনে হলো, তিনি চাঁপা ফুলের গন্ধ পাচ্ছেন। হালকা সুবাস, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তা গাঢ় হলো। তিনি ঘরের ভেতর ফিসফিস কথা শুনলেন। কে কথা বলছে ? দমকা বাতাসে মোমবাতি নিভে গেল। এবং তিনি স্পষ্ট শুনলেন, মল পরে হেঁটে যাওয়ার মতো কে যেন তার পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। 'কে কে' বলে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও তিনি থেমে গেলেন। এ সব মনের ভুল। এ জগতে কোনো রহস্য নেই। আশেপাশে নিশ্চয়ই কোনো চাঁপা ফুলের গাছ আছে। গন্ধ আসছে সেখান থেকেই।

কিন্তু তবু তাঁর মনে হচ্ছে, দরজার ওপাশে পর্দার আড়ালে কেউ-একজন দাঁড়িয়ে আছে, এবং তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। কে সে ? অন্য ভুবনের কেউ ? নাকি অবচেতন মনে তার জন্ম ? পৃথিবীর সমস্ত অশরীরীর জন্মই কি অবচেতন মনে নয় ? অবচেতন মন জিনিসটির অবস্থান কোথায় ? মস্তিষ্কের নিউরোনে ? নিউরোনের বৈদ্যুতিক আবেশই কি আমাদের নানান রকম মায়া দেখাচ্ছে ?

তিনি ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। পর্দাটি খুব নড়ছে। যেন কেউ পর্দা নাড়িয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করছে।

তিনি দেয়াশলাই জ্বাললেন। আলো আসুক। আলোর স্পর্শে সব মায়া কেটে যাক। তিনি যেন নিজেকে সাহস দেওয়ার জন্যেই বললেন, এ পৃথিবীতে রহস্যের কোনো স্থান নেই।

১৩

সন্ধ্যাবেলা ওসমান সাহেব নিজে গিয়ে পরীক্ষা করলেন, গেট বন্ধ করা হয়েছে কি না। তালা টেনে টেনে দেখলেন। দারোয়ানকে বললেন, ভোর হওয়ার আগে গেট খুলবে না। কেউ ঢুকতে চাইলে বলবে, বাড়িতে কেউ নেই।

জি আচ্ছা।

রাতটা মোটামুটি সজাগ কাটাবে। কোনো শব্দটব্দ হলে বের হয়ে দেখবে কী ব্যাপার।

জি আচ্ছা।

ওসমান সাহেব চিন্তিত মুখে ঘরে ঢুকলেন। ফরিদার সঙ্গে তাঁর দেখা হলো, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোনো কথা হলো না। দু'জন এমন ভাব করছেন, যেন কেউ কাউকে

চেনেন না। অনিদ্রাজনিত কারণে ফরিদার চোখ লাল। তিনি বসে আছেন মূর্তির মতো। ওসমান সাহেব তাঁর সামনের চেয়ারটাতে দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে থেকে মৃদুস্বরে বললেন, ফিরোজ কেমন আছে ?

ফরিদা জবাব দিলেন না।

ওসমান সাহেব বিরক্ত স্বরে বললেন, আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছি। কানে যায়নি ?

ফরিদা কোনো সাড়াশব্দ করলেন না। ঠান্ডা চোখে তাকালেন। ওসমান সাহেব চাপা স্বরে বললেন, কথার জবাব দাও। ফিরোজ কেমন আছে ?

ভালো।

ভালো মানেটা কী ? গুছিয়ে বলো।

গুছিয়ে বলতে পারব না। তুমি দেখে আসো। আর শোনো, আমার সঙ্গে এরকম ভঙ্গিতে কথা বলবে না।

ফরিদা উঠে গেলেন। রওনা হলেন ফিরোজের ঘরের দিকে। ক্রুদ্ধ আওয়াজ আসছে সে ঘর থেকে। চাপা আওয়াজ। কোনো মানুষের কণ্ঠ থেকে এ ধরনের আওয়াজ হওয়া সম্ভব নয়। যে এমন আওয়াজ করছে, সে মানুষ হতে পারে না। ফরিদার গা কাঁপতে লাগল। কী হচ্ছে এসব! তিনি কি এগিয়ে যাবেন, না ফিরে আসবেন ? এগিয়ে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা করছে না, কিন্তু তিনি গেলেন।

কাছাকাছি যাওয়ামাত্র ক্রুদ্ধ গর্জন থেমে গেল। তিনি দেখলেন, ফিরোজ বেশ ভালোমানুষের মতো চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছে। হাতে একটি বই। সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক ভাবভঙ্গি। ফরিদা বললেন, কেমন আছিস তুই ?

ভালো। তুমি কেমন আছ মা ?

ফরিদার চোখে পানি এসে গেল। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে এই প্রথম ফিরোজ এমন স্বরে কথা বলল।

ফিরোজ, তুই আমাকে চিনতে পারছিস তো ?

চিনতে পারব না কেন ? কী বলছ তুমি!

গত দু'দিন তো চিনতে পারিসনি।

তোমরাও তো আমাকে চিনতে পারনি।

আমরা চিনতে পারব না কেন ?

না, চিনতে পারনি। চিনতে পারলে নিজের ছেলেকে তালাবদ্ধ করে রাখতে না। তোমরা বিশাল একটা তালা দিয়েছ। হা হা হা।

ফরিদা কথা ঘোরাবার জন্যে বললেন, কিছু খাবি ফিরোজ ?

হ্যাঁ, খাব। কিন্তু মা, টেবিলে খাবার দেবে। তালা খুলে ফেলবে। আমি খাবার ঘরে টেবিল-চেয়ারে বসে খাব।

ফরিদা কোনো উত্তর দিলেন না। শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। ফিরোজ যা বলছে তা সম্ভব নয়। তালা খুলে তাকে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

কি মা, কথা বলছ না যে? তালা খুলবে না?

ফরিদা জবাব দিলেন না।

কিন্তু মা তালাবন্ধ করে কাউকে আটকে রাখা ঠিক না। খুব অন্যায়। অন্যায় নয়?

হ্যাঁ, অন্যায়।

বেশ, তালা খোল।

ফিরোজ উঠে দাঁড়াল। তার কোলের উপর রাখা বইটি মেঝেতে পড়ে গেল, ফিরোজ সেদিকে ফিরেও তাকাল না। সে এগিয়ে এসে জানালার শিক ধরে দাঁড়াল। ফরিদা জানালার পাশ থেকে একটু দূরে সরে গেলেন।

দূরে চলে গেলে যে মা? ভয় লাগছে? হা হা হা। খুব ভয় লাগছে, না?

ফিরোজ জানালার শিক ধরে ঝাঁকাতে লাগল।

তিনি ভয় পাওয়া গলায় বললেন, এরকম করছিস কেন?

লোহার শিকগুলো কেমন শক্ত, তা-ই দেখছি।

এরকম করিস না বাবা।

তালা খুলে দাও, এরকম করব না। আমি চিড়িয়াখানার জন্তু নই মা, যে, আমাকে খাঁচার মধ্যে বন্দি করে রাখবে। যাও, বাবার কাছে যাও। চাবি নিয়ে আস। বদ্ধ ঘরে আমার দম আটকে আসছে। আমি খোলা মাঠে খানিকক্ষণ হাঁটব। যাও, যা করতে বলছি করো।

ফরিদা বসার ঘরের দিকে এগুলেন। ফিরোজ জানালার শিক ধরে ঝাঁকাচ্ছে। তার মুখ হাসি হাসি। যেন শিক ঝাঁকানো খুব-একটা মজার ব্যাপার। আনন্দের একটা খেলা। খুব ছোটবেলায় ফিরোজ এরকম করত। জানালায় উঠে শিক ধরে ঝাঁকাত।

ওসমান সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। কঠিন স্বরে বললেন, কী পাগলের মতো কথা বলছ! তালা খুলব মানে? কী হয়েছে তুমি জানো না?

ফরিদা চুপ করে রইলেন।

একটা ছেলে মারা গেছে। তার পরেও তুমি বলছ তালা খুলব।

তালা দিয়েই-বা লাভ কী হচ্ছে? ঐ রাতেও তো তালাবন্ধ ছিল। ছিল না?

ওসমান সাহেব এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। হ্যাঁ, ঐ রাতে তালাবন্ধ ছিল। এবং ভোরবেলা ঘর তালাবন্ধই পাওয়া গেছে।

ফরিদা বললেন, ঐ ছেলের মৃত্যুর সঙ্গে ফিরোজের কোনো সম্পর্ক নেই। ফিরোজ ঘরেই ছিল।

ঘরে থাকলেই ভালো।

ফরিদা স্বামীর পাশে বসলেন। তাঁর মুখ শান্ত। তাঁর চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ। ওসমান সাহেব বললেন, তুমি কিছু বলবে ?

হ্যাঁ।

বলে ফেল। এভাবে তাকিয়ে থেক না।

ফিরোজ প্রসঙ্গে তুমি যে ডিসিশন নিয়েছ, আমার মনে হয় তা ঠিক নয়। তুমি কতদিন তাকে তালাবন্ধ করে রাখবে ? ওর চিকিৎসা করাও। মিসির আলিকেই-বা আসতে দিচ্ছ না কেন ?

ঐ ছেলেটির মৃত্যুর প্রসঙ্গ চাপা পড়ার আগে আমি কাউকে এ বাড়িতে আসতে দেব না। উনি টেলিফোন করলে বলবে—ফিরোজ মামার বাড়ি গেছে।

এতে ফিরোজের অসুখ বাড়তেই থাকবে।

বাড়ুক। তুমি নিশ্চয়ই চাও না, তোমার ছেলেকে ওরা ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিক। চাও ?

না, চাই না।

তাহলে চুপ করে থাক। একটা তালা আছে, আরেকটা তালা লাগাও।

ফিরোজকে শুধু শুধু সন্দেহ করছ। তালাবন্ধ ঘর থেকে সে কীভাবে বের হবে ?

তা জানি না। কিন্তু সে বের হয়েছে—এটা আমি যেমন জানি, তুমিও তেমন জানো। এই নিয়ে আমি কোনো কথা বলতে চাই না। তুমি অন্য ঘরে যাও। আমাকে একা থাকতে দাও।

ঝনঝন শব্দ হচ্ছে ফিরোজের ঘরে। সে প্রচণ্ড শব্দে জানালা ঝাঁকাচ্ছে।

ফরিদা নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করলেন। ওসমান সাহেব বের হয়ে এসে কঠিন স্বরে ফিরোজকে বললেন, এরকম করছিস কেন ? স্টপ ইট।

ফিরোজ হাসি মুখে বলল, রাগ করছ কেন বাবা ?

ওসমান সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

দরজা খুলে দাও বাবা। আমি খাবার ঘরে বসে ভাত খাব। খিদে লেগেছে। কি, খুলবে না ?

লোহার রডটা আমার কাছে দে, আমি তালা খুলে দিচ্ছি।

না বাবা, ওটা সম্ভব নয়। লোহার রডটা দেওয়া যাবে না।

কেন দেওয়া যাবে না ?

ও রাগ করবে।

কে রাগ করবে ?

নাম বললে চিনবে ? শুধু শুধু জিজ্ঞেস করছ কেন ? তালা খুলবে কি খুলবে না ?

ওসমান সাহেব জবাব না দিয়ে চলে এলেন। ফিরোজ জানালা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে খুব হাসতে লাগল।

থার্ড ইয়ার ফাইনালের ডেট দিয়ে দিয়েছে।

মেডিকেলের ছাত্রদের কারও দম ফেলার সময় নেই। ক্লাস এখন সাসপেন্ডেড। আজমল ঠিক করে রেখেছে, সে এখন থেকে নাশতা খেয়ে পড়তে বসবে এবং একটানা পড়বে লাঞ্চ টাইম পর্যন্ত। এক ঘণ্টার ব্রেক নেবে লাঞ্চে, তারপর আবার পড়া। তাছাড়া পাস করার উপায় নেই। নানান দিক দিয়ে খুব ক্ষতি হয়েছে এ বছর। প্রতিদিনই কোনো-না-কোনো ঝামেলায় পড়া হচ্ছে না। এরকম চললে পরীক্ষা দেওয়া হবে না। এবার পরীক্ষায় না বসলে ডাক্তারি পড়া বন্ধ করে দিতে হবে। খরচ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। গ্রামের বাড়ি বিক্রি করে দিলে হতো, কিন্তু মা বেঁচে থাকতে তা সম্ভব নয়। তাছাড়া বিক্রি করেও লাভ হবে না কিছু। ভাঙা রাজপ্রাসাদ কে কিনবে ? কার এত গরজ ?

আজমল বই নিয়ে বসেই উঠে পড়ল—জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে মিসির আলি ঢুকছেন। তার খুব ইচ্ছা হতে লাগল, বইপত্র নিয়ে অন্য কোনো ঘরে চলে যায়। কিছুক্ষণ খুঁজে-টুজে তিনি চলে যাবেন। কিন্তু ভদ্রলোকের যা স্বভাব-চরিত্র, তিনি আবার আসবেন। আবার আসবেন! অসহ্য! কেন জানি আজমল তাঁকে সহ্য করতে পারে না। কেন সহ্য করতে পারে না—এ নিয়েও সে ভেবেছে, কিছু বের করতে পারেনি। লোকটি ভালোমানুষ ধরনের, তবে অসম্ভব বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান কেউ ভালোমানুষ হতে পারে না। ভালোমানুষেরা বোকাসোকা ধরনের হয়।

ভেতরে আসব ?

আজমল বিরক্তি গোপন করে বলল, আসুন।

আমি পরশুও একবার এসেছিলাম। তোমার রুমমেটকে বলে গিয়েছিলাম, আজ সকালে আসব। সে তোমাকে কিছু বলেনি ?

জি-না, বলেনি। ভুলে গেছে বোধহয়। বসুন।

মিসির আলি বসতে বসতে বললেন, অনেকদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা। এর মধ্যে তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। জানো বোধহয়।

জি জানি। নাজ চিঠি লিখেছিল।

খুব যন্ত্রণায় ফেলেছিলাম ওদের। অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম।

আজমল কিছু বলল না।

মিসির আলি বললেন, বেশিক্ষণ তোমাকে বিরক্ত করব না। একটা কথা শুধু জিজ্ঞেস করতে এসেছি।

জিজ্ঞেস করুন।

তোমাদের বাড়িতে একটা ঘর আছে, যেখানে তোমাদের পূর্বপুরুষদের কিছু ছবিটবি আছে। তুমি কি সেই ঘরে ফিরোজকে নিয়ে গিয়েছিলে ?

জি হ্যাঁ, নিয়ে গিয়েছিলাম।

কিন্তু ঐ ঘর তো তালাবন্ধ। ওর চাবি থাকে নাজনীনের কাছে। সে তো বলল, ও ঘর খোলা হয়নি।

আমার কাছে একটা চাবি আছে, ও জানে না।

খালি গায়ে একজনের ছবি আছে। ঐ ছবিটা কি ফিরোজকে দেখিয়েছ ?

সব ছবিই দেখিয়েছি।

আমি এই বিশেষ ছবিটি প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করছি। শুনেছি এঁকে ক্ষিপ্ত প্রজারা লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলে। এটা কি সত্যি ?

জি সত্যি। শাবল দিয়ে পিটিয়ে মারে।

এই গল্পটি কি তুমি ফিরোজের সঙ্গে করেছ ?

জি-না, করিনি।

অন্যকেউ কি করেছে বলে তোমার ধারণা ?

মনে হয় না। গল্প করে বেড়াবার মতো কোনো ঘটনা এটা না।

মিসির আলি উঠে পড়লেন। আজমল বলল, আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না ?

না। উঠি এখন। তুমি পড়াশোনা করছিলে, করো। আর ডিসটার্ব করব না।

আজমল তাঁকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল। মিসির আলি বললেন, নাজনীন মেয়েটি বড় ভালো। ওকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। চমৎকার মেয়ে।

আজমল কিছু বলল না।

মিসির আলি বললেন, নাজনীন আমাকে বলেছে শীতের সময় একবার যেতে। আমি কথা দিয়েছি, যাব। এই শীতেই যাব। যাই আজমল, আর আসতে হবে না।

তিনি মাথা নিচু করে হাঁটতে লাগলেন। ফিরোজ ছবিটা দেখেছে। জট খুলতে শুরু করেছে। এই ছবির ছাপ পড়েছে ফিরোজের চেতনায়। এবং মিসির আলির ধারণা, লোকটির মৃত্যুসংক্রান্ত গল্পটিও সে শুনেছে। লোহার রড নিয়ে তার খালি গায়ে বের হওয়ার রহস্যটি হচ্ছে ছবিতে এবং গল্পটিতে।

বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। মিসির আলি গ্রাহ্য করলেন না। বরং বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এগিয়ে যেতে তাঁর ভালোই লাগছে। ফিরোজের অসুখের পেছনের কারণগুলো দাঁড় করাতে চেষ্টা করতে লাগলেন। অনেকগুলো ঘটনাকে একসঙ্গে মেলাতে হবে। ঘটনাগুলো এরকম—

১. অসম্ভব রূপবতী একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হলো। মেয়েটির পোলিও। এই ঘটনাটি তাকে অভিভূত করল।

২. মেয়েটি তাকে আহত করল, সে কড়া গলায় বলল, আমার হাত ছাড়ুন।

৩. ফিরোজ খালি গায়ের লোকটির ছবি দেখল। এবং খুব সম্ভব তার মৃত্যুবিষয়ক গল্পটিও শুনল।

৪. রাতে তার প্রচণ্ড জ্বর হলো। জ্বরের ঘোরে ঐ লোকটির ছবি বারবার মনে হলো।

৫. সে নির্জন নদীর পাড় ধরে একা-একা হাঁটতে গেল, তখনই একটি হেলুসিনেশন হলো।

মিসির আলি বৃষ্টিতে নেয়ে গেছেন। রাস্তার লোকজন অবাক হয়ে তাঁকে দেখছে। ঢালাও বর্ষণ উপেক্ষা করে কেউ এমন নির্বিকার ভঙ্গিতে হাঁটে না।

১৫

সাইদুর রহমান সাহেব অবাক হয়ে বললেন, আপনার কী হয়েছে!

মিসির আলি বললেন, শরীরটা খারাপ স্যার।

শরীর তো আপনার সব সময়ই খারাপ। এর বাইরে কিছু হয়েছে কি না বলেন। আপনাকে হ্যাগার্ডের মতো দেখাচ্ছে!

গত পরশু রাতে কে যেন তালা ভেঙে আমার ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র ভেঙেচুরে তছনছ করেছে।

আপনি বাসায় ছিলেন না ?

আমি তো স্যার প্রথমেই আপনাকে বলেছি তালা ভেঙে ঢুকেছে। কাজেই আমার ঘরে থাকার প্রশ্ন ওঠে না।

সাইদুর রহমান সাহেব গম্ভীর হয়ে গেলেন।

মিসির আলি বললেন, আমি ছুটির অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছি। দিন দশেকের ছুটির আমার খুব দরকার।

সাইদুর রহমান সাহেব মুহূর্তের মধ্যে গম্ভীর হয়ে গেলেন। ঠাণ্ডা গলায় বললেন, ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস-ট্রাশ তো এমনিতেও হয় না। এর মধ্যে আপনারা ছুটি নিলে তো অচল অবস্থা। এর চেয়ে আসুন, সবাই মিলে ইউনির্ভাসিটি তালাবন্ধ করে চলে যাই, কী বলেন ?

মিসির আলি সহজ স্বরে বললেন, আপনি কি স্যার আমার সঙ্গে রসিকতা করতে চেষ্টা করছেন ?

রসিকতা করব কেন ?

গত দু'বছরে আমি কোনো ছুটি নিইনি। এখন নিতান্ত প্রয়োজনে চাচ্ছি। দিতে না চাইলে দেবেন না। আপনার নিজের কী অবস্থা ? এ বছরে আপনি কি কোনো ছুটি নেননি ?

অন্যের সঙ্গে সবসময় একটা কমপেয়ার করার প্রবণতা আপনার মধ্যে খুব বেশি। এটা ঠিক না মিসির আলি সাহেব। আপনি সি.এল.-এর ফরমটা রেখে যান, আমি রিকমেন্ড করে দেব।

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। সাইদুর রহমান বললেন, উঠবেন না, আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে। বসুন।

তিনি বসলেন। জরুরি কথাটা কী আঁচ করতে চেষ্টা করলেন। সাইদুর রহমান সাহেবের মুখ হাসি হাসি। কাজেই কথাটা মিসির আলির জন্যে নিশ্চয়ই সুখকর হবে না।

আপনার পার্টটাইম অ্যাপয়েন্টমেন্টের মেয়াদ তো শেষ হতে চলল। এক্সটেনশনের জন্যে কী করছেন ?

মিসির আলি বিস্মিত হয়ে বললেন, আমাকে কিছু করতে হবে নাকি। আমার তো ধারণা ছিল, আমার কিছু করার নেই। ইউনিভার্সিটি যা করার করবে।

সাইদুর রহমান সাহেব কিছু বললেন না। তাঁর চোখ-মুখ উজ্জ্বল। এর মানে কী? তাঁকে কি এক্সটেনশন দেওয়া হবে না? সেটা তো সম্ভব নয়। যেখানে ফুলটাইম টিচার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হওয়ার কথা, সেখানে পার্টটাইম চাকরির এক্সটেনশন হবে না? এটা কেমন কথা!

স্যার, আপনি ঠিক করে বলেন তো ব্যাপারটা কী। আমার মেয়াদ শেষ?

এখনো কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে একজনের এডহক অ্যাপয়েন্টমেন্ট তো হয়েছে। এখন আর আমাদের টিচারের শর্টেজ নেই।

তাই নাকি?

হ্যাঁ তাই। খাজনার থেকে বাজনা বেশি। ছাত্রের চেয়ে টিচারের সংখ্যা বেশি।

মিসির আলি ঠান্ডা গলায় বললেন, আমি তো আপনার কোনো ক্ষতি করিনি। আপনি কেন আমার পেছনে লেগেছেন?

আরে, এটা কী বলছেন! আমি আপনার পেছনে লাগব কেন? কী ধরনের কথা এসব?

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। আর এখানে বসে থাকার কোনো মানে হয় না।

সাইদুর রহমান সাহেব বললেন, কি, চললেন?

হ্যাঁ, চললাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কর্তাস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করলে কেমন হয়? তাঁরা কি কিছু করতে পারবেন? পারবেন নিশ্চয়ই। কিন্তু এ জাতীয় কারও সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব কম সংখ্যক অধ্যাপককেই তিনি চেনেন।

স্যার, স্লামালিকুম।

মিসির আলি তাকিয়ে দেখলেন, দু'টি ছাত্র দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বললেন, তোমরা কিছু বলবে?

জি না স্যার।

আচ্ছা, ঠিক আছে।

তিনি হাঁটছেন ক্লান্ত ভঙ্গিতে। চাকরি চলে গেলে তিনি অথই পানিতে পড়বেন। সময় ভালো না। দ্বিতীয় কোনো চাকরি চট করে জোগাড় করা মুশকিল। সঞ্চয় তেমন কিছু নেই। ইচ্ছা করলে সঞ্চয় করা যেত। ইচ্ছা করেনি। এ পৃথিবীতে কিছুই জমা করে রাখা যায় না। সব খরচ হয়ে যায়।

মিসির আলি হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে বললেন, I cannot and will not believe that man can be evil.

তাঁর প্রিয় একটি লাইন। প্রায়ই নিজের মনে বলেন। কেন বলেন? এই কথাটি কি তিনি বিশ্বাস করেন না? যা আমরা বিশ্বাস করি না অথচ বিশ্বাস করতে চাই, তাই আমরা বারবার বলি।

তিনি ঘড়ি দেখলেন। তিনটা বাজে। শরীর খারাপ লাগছে। বাসায় ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু অনেক কাজ পড়ে আছে। আজমলের সঙ্গে দেখা করা এখনো হয়ে ওঠেনি। ফিরোজের সঙ্গে দেখা করতে পারেননি। তার সঙ্গে দেখা করার সবক'টি প্রচেষ্টা বিফল হয়েছে। অথচ খুব তাড়াতাড়ি দেখা করা দরকার। সাজ্জাদ হোসেনেরই-বা খবর কী ? সে কি হানিফা সম্পর্কে কোনো তথ্য পেয়েছে ? না কোনো চেষ্টাই করেনি ?

নীলুর সঙ্গেও আর দেখা হয়নি। এর মধ্যে দু'বার গিয়েছেন ঝিকাতলায়। দু'বারই বাসার সামনে থেকে চলে এসেছেন। কেন যে তাঁর লজ্জা লাগছিল। লজ্জার কী আছে ? কিছুই নেই। তিনি যাচ্ছেন তাঁর ছাত্রীর বাসায়। এর মধ্যে লজ্জার কী ?

লাইব্রেরি থেকে একটা বই ইস্যু করার কথা—'ইল্যুশন অ্যান্ড হেলুসিনেশন', ড. জিম ম্যাকার্থির বই। প্রচুর কেইস হিস্ট্রি আছে সেখানে। কেইস হিস্ট্রিগুলো দেখা দরকার। কোনোটার সঙ্গে কি ফিরোজের বা নীলুর ব্যাপারগুলো মেলে ? পুরোপুরি না মিললেও অনেক উদাহরণ থাকবে খুব কাছাকাছি। সেগুলো খুঁটিয়ে দেখা দরকার।

মিসির আলি লাইব্রেরিতে চলে গেলেন। সাধারণত যে বইটি খোঁজা হয়, সে বইটিই পাওয়া যায় না। ভাগ্যক্রমে এটি ছিল। চমৎকার বই। তিনশ'র মতো কেইস হিস্ট্রি আছে। আজ রাতের মধ্যেই শেষ করে ফেলতে হবে। তিনি স্টিভিনসনের 'সমনোমবলিক প্যাটার্ন' বইটিও নিয়ে নিলেন। এটিও একটি চমৎকার বই। তাঁর নিজেরই ছিল। তাঁর কাজের ছেলেটি পুরনো বইয়ের দোকানে বিক্রি করে দিয়েছে। মহা বদমাশ ছিল। তাঁকে প্রায় ফতুর করে দিয়ে গেছে। তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। মানুষ কত বিচিত্র! এই ছেলেটিকে তিনি বিশেষ স্নেহ করতেন। স্নেহ অপাত্রে পড়েছিল। মানুষের বেশির ভাগ স্নেহ-মমতাই অপাত্রে পড়ে।

কেউ আমার খোঁজ করেছিল, হানিফা ?

জি-না।

চা বানিয়ে আন। দুধ-চিনি ছাড়া।

হানিফা চলে গেল। তার শরীর বোধহয় খানিকটা সেরেছে। মুখের শুকনো ভাবটা কম। ঘরে ওজন নেওয়ার কোনো যন্ত্র নেই। যন্ত্র থাকলে দেখা যেত, ওজন কিছু বেড়েছে কি না।

মিসির আলি ইজি চেয়ারে শুয়ে জিম ম্যাকার্থির বইটির পাতা ওল্টাতে লাগলেন। কত বিচিত্র কেইস হিস্ট্রিই না ভদ্রলোক জোগাড় করেছেন!

কেইস হিস্ট্রি নাম্বার সিক্সটি থ্রি
মিস কিং সিলভারস্টোন
বয়স পঁচিশ।
কম্পুটার প্রোগ্রামার।
দি এনেক্স ডিজিটাল্‌স্ লিমিটেড
ডোভার। ক্যালিফোর্নিয়া।

মিস কিং সিলভারস্টোন থ্যাংকস গিভিংয়ের দু'দিন আগে দি এনেক্স ডিজিটাল্‌স্‌ লিমিটেডের তিনতলার একটি ঘরে কাজ করছিলেন। সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। অফিসের একজন গার্ড ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। গার্ড একতলায় কফিরুমে। সে বলে গেছে মিস সিলভারস্টোন যেন কাজ শেষ করে যাওয়ার সময় তাকে বলে যান।

কাজেই মিস সিলভারস্টোন রাত আটটার সময় কাজ শেষ করে কফিরুমে গেলেন। অবাক কাণ্ড, কফিরুম অন্ধকার। কেউ কোথাও নেই। তিনি ভয় পেয়ে ডাকলেন—'মুলার।' কেউ সাড়া দিল না।

তিনি ভাবলেন মুলার হয়তো-বা সোফায় ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন—মুলার নেই, তবে সোফায় একজন অস্বাভাবিক লম্বা মানুষ বসে আছে। মানুষটি নগ্ন। তিনি চেঁচিয়ে ওঠার আগেই লোকটি বলল, ভয় পেও না। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

তুমি কে?

আমি এই গ্রহের মানুষ নই। আমি এসেছি সিরাস নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে। আমি পৃথিবীর একটি রমণীর গর্ভে সন্তানের সৃষ্টি করতে চাই।

মিস সিলভারস্টোন পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। তাঁর পা যেন মেঝের সঙ্গে আটকে গেছে। তিনি চিৎকার করতে চেষ্টা করলেন—গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হলো না। তিনি অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, একে একে তাঁর গায়ের কাপড় আপনাআপনি খুলে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে তিনি সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গেলেন। এই লোকটি তখন উঠে দাঁড়াল। তিনি লক্ষ করলেন লোকটির গায়ের চামড়া ঈষৎ সবুজ। এবং তার গা থেকে চাপা এক ধরনের আলো বেরুচ্ছে।

লোকটি এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরল। আপনাআপনি বাতি নিভে গেল।

এই হচ্ছে মিস কিং সিলভারস্টোনের গল্প। তিনি পরবর্তী সময়ে গর্ভবতী হয়ে পড়েন এবং ডাক্তারের কাছে জানতে চান, তাঁর বাচ্চাটির গায়ের রঙ সবুজ হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু।

ম্যাকার্থির একুশ পৃষ্ঠার বিশ্লেষণ আছে কেইস হিস্ট্রির সঙ্গে। তিনি অভ্রান্ত যুক্তিতে প্রমাণ করেছেন, এটি ইলিউশনের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। মিস সিলভারস্টোন সেখানে দেখেছেন মুলারকে। সিরাস নক্ষত্রপুঞ্জের কোনো আগন্তুককে নয়।

মিসির আলি একটির পর একটি কেইস হিস্ট্রি গভীর আগ্রহে পড়তে শুরু করলেন। তাঁর নিজেরও এরকম একটি বই লেখার ইচ্ছা হতে লাগল। সেখানে রানু, নীলু, ফিরোজের কেইস হিস্ট্রি এবং অ্যানালিসিস থাকবে। কিন্তু তা করতে হলে এদের সমস্ত রহস্য ভেদ করতে হবে। তা কি সম্ভব হবে ? কেন হবে না ? অসম্ভব আবার কী ? নেপোলিয়নের কী-একটি উক্তি আছে না এ প্রসঙ্গে—Impossible is the word...? উক্তিটি কিছুতেই মনে পড়ল না।

হানিফা চা বানিয়ে এনেছে। সুন্দর লাগছে তো মেয়েটিকে। মেয়েটির ব্যাপারে খোঁজ নিতে হবে। তিনি কি অলস হয়ে যাচ্ছেন ? বোধহয়। বয়স হচ্ছে। আগের কর্মদক্ষতা এখন আর নেই। মিসির আলি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

আপনের চা।

হানিফা চায়ের কাপ সাবধানে নামিয়ে রাখল। তিনি লক্ষ করলেন, মেয়েটি নখে নেলপালিশ লাগিয়েছে। নেলপালিশ তিনি তাকে কিনে দেননি। সে নিজেই তার জমানো টাকা থেকে কিনেছে। তাঁর নিজেরই কিনে দেওয়া উচিত ছিল।

হানিফা বস। তোর সঙ্গে গল্পগুজব করি কিছুক্ষণ।

হানিফা বসল। মিসির আলি বললেন, আমি তোর বাবা-মাকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছি, বুঝলি ?

হানিফা কিছু বলল না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। তিনি কি পারবেন এর কোনো খোঁজ বের করতে ? না পারার কী আছে ? এটি এমন জটিল কাজ নিশ্চয়ই নয়। সাজ্জাদ হোসেন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁকে তিনি বলেছেন, মেয়েটির নাম 'ইমা' হওয়ার সম্ভাবনা। এই নামের কোনো নিখোঁজ মেয়ের তথ্য আছে কি না দেখতে। সে চোখ-মুখ কুঁচকে বলেছে, বুঝলি কী করে, ওর নাম ইমা ? তিনি সে প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি। দিতে পারেননি বলাটা ঠিক হলো না, বলা উচিত—দিতে পারতেন, কিন্তু দেননি। সব প্রশ্নের উত্তর সবাইকে দেওয়া যায় না। 'ইমা' নামটি কোত্থেকে পাওয়া, সেটা কাউকে না বলাই ভালো, বিশেষ করে পুলিশকে। পুলিশরা এ জাতীয় আধিভৌতিক ব্যাপার সাধারণত বিশ্বাস করে না।

পুলিশের উপর পুরোপুরি নির্ভরও তিনি করেননি। তাঁর এক ছাত্রকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। তার কাজ হচ্ছে প্রতিদিন পাবলিক লাইব্রেরিতে গিয়ে পুরনো পত্রিকা ঘাঁটা। দেখবে 'ইমা' নামের নিখোঁজ মেয়ের কোনো খবর ছাপা হয়েছে কি না। এই কাজের জন্য সে ঘণ্টায় পঞ্চাশ টাকা করে পাবে। দশ ঘণ্টার জন্যে পাঁচ শ' টাকা তিনি তাকে আগেই দিয়ে দিয়েছেন। কাজে যাতে উৎসাহ আসে, তার জন্যে এক হাজার টাকার একটি পুরস্কারের কথাও বলেছেন। যদি সে 'ইমা' নামের কোনো নিখোঁজ বালিকার খবর বের করতে পারে, তাহলে এককালীন টাকাটা পাবে।

এই ব্যাপারে মিসির আলির মন খুঁতখুঁত করছে। 'ইমা' নামটির উপর এতটা গুরুত্ব দেওয়া ঠিক হয়নি। যে-কোনো নিখোঁজ বালিকার সংবাদ সংগ্রহ করতে বলাটাই যুক্তিযুক্ত ছিল। একজনের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার উপর এতটা আস্থা রাখা ঠিক নয়। তিনি নিজে একজন যুক্তিবাদী মানুষ। তাঁর জন্যে এটা অবমাননাকর।

১৬

রাত আটটা।

সাজ্জাদ হোসেন অফিসের টেবিলেই মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করছেন। গতরাতে এক ফোঁটাও ঘুমোননি। দিনের বেলায়ও ঘণ্টাখানেকের মতো শোওয়ার সময় পাওয়া যায়নি। এবং খুব সম্ভব আজ রাতটাও তাঁর জেগেই কাটবে। লোহার রড হাতের সেই নগ্নগাত্র আগন্তুক তাঁর সর্বনাশ করে দিয়েছে। পুলিশ বাহিনীর নাকের ডগায় আরেকটি খুন হয়েছে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

একটি লোক রোজ রাতে লোহার রড হাতে একই জায়গায় ঘোরাঘুরি করবে, অথচ তাকে ধরা যাবে না—এটা কেমন কথা!

স্যার, আপনার সঙ্গে এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান।

সাজ্জাদ হোসেন টেবিল থেকে মাথা তুললেন। তাঁর আরদালি দাঁড়িয়ে আছে। এই লোকটির কি কোনো বুদ্ধিশুদ্ধি নেই? তাকে বলে দিয়ে এসেছেন যেন কিছুতেই আগামী দু'ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে ডাকা না হয়। অথচ দশ মিনিট পার না হতেই ব্যাটা ডাকতে এসেছে। তিনি বরফশীতল গলায় বললেন, বলো আমি নেই।

স্যার, আমি বলেছি যে আপনি আছেন।

তাতে অসুবিধা নেই। এখন গিয়ে বলো যে, আমার আগের কথাটা ঠিক না। উনি আসলে নেই, কোথায় গিয়েছেন কেউ জানে না।

স্যার, উনি একজন সাংবাদিক। পত্রিকা অফিস থেকে এসেছেন।

সাজ্জাদ হোসেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। সাংবাদিকদের বিরাগভাজন হওয়ার মতো সাহস তাঁর নেই। পত্রিকায় দীর্ঘ আর্টিকেল বের হয়ে যাবে—'পুলিশ অফিসারের দুর্ব্যবহার।'

আসতে বলো। আর শোনো, দু'কাপ চা দিতে বলো।

সাংবাদিক ভদ্রলোকের নাম মীরউদ্দীন। ভদ্রলোক শুধু যে পেশায় সাংবাদিক তা-ই নয়—চেহারায়, পোশাকে, এমনকি হাবেভাবেও সাংবাদিক। প্রশ্নের ধরন ডিটেকটিভের মতো। প্রতিটি বাক্যের শেষে একটি খোঁচা আছে, যা ঠিক সহ্য করা মুশকিল। সাংবাদিক, কাজেই সহ্য করতে হবে। এবং কিছুতেই চটানো যাবে না। মীরউদ্দিনের কাছ থেকে জানা গেল যে, একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'নগ্নগাত্র বিভীষিকা' শিরোনামে একটি প্রচ্ছদ কাহিনী ছাপবে। কাজেই পুলিশের বক্তব্যটি শোনবার জন্যে তিনি দয়া করে এখানে তশরিফ রেখেছেন।

আমার প্রশ্নের জবাব দিতে আপনার কোনো আপত্তি নেই তো?

না, নেই। প্রশ্ন করুন।

নগ্নগাত্র ব্যক্তিটি প্রসঙ্গে আপনার কী ধারণা?

তেমন কোনো ধারণা নেই। পাগল-টাগল হবে আর কী।

তাকে পাগল বলার পেছনে আপনার যুক্তি কী ?

একটাই যুক্তি—কোনো সুস্থ মাথার লোক একটা লোহার রড নিয়ে খুনখারাবি করে বেড়ায় না।

কেন, সুস্থ লোকও তো খুনখারাবি করে।

তা করে, কিন্তু তার পেছনে কোনো মোটিভ থাকে। এর কাণ্ডকারখানার পেছনে কোনো মোটিভ নেই।

বুঝলেন কী করে, মোটিভ নেই ? হয়তো মোটিভ আছে, আপনারা ধরতে পারছেন না।

সাজ্জাদ হোসেনের বিরক্তির সীমা রইল না। এ তো মহা ত্যাঁদড়ের পাল্লায় পড়া গেল! জ্বালিয়ে মারবে মনে হচ্ছে।

নগ্নগাত্রকে নিয়ে পুরানা পল্টন এলাকায় গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। সেটা কি আপনি জানেন ?

না, জানি না। কী গুজব ?

সেটা আপনি নিজেই কষ্ট করে জেনে নেবেন। কারণ পুলিশের উচিত শহরের চালু গুজবগুলোর প্রতি লক্ষ রাখা। কি, উচিত না ?

সাজ্জাদ হোসেন জবাব দিলেন না। এই লোকের সঙ্গে কথা যত কম বলা যায়, ততই ভালো।

এখন আপনি দয়া করে বলুন, লোকটিকে ধরবার ব্যাপারে পুলিশ বাহিনী কি চূড়ান্ত রকমের ব্যর্থতার পরিচয় দেয়নি ?

না। ধরবার চেষ্টা হচ্ছে, শিগগিরই ধরা পড়বে। হয়তো আজ রাতেই ধরা পড়বে।

আচ্ছা, বিদেশে অপরাধীকে ধরবার জন্যে ট্রেইন্ড পুলিশ কুকুর আছে, এরা গন্ধ শুঁকে শুঁকে অপরাধীকে বের করে ফেলে। এখানে এমন কিছু নেই ?

না নেই। কারণ এটা বিদেশ নয়। বাংলাদেশ।

কিন্তু বাংলাদেশে তো পুলিশ বাহিনীর একটা মাউন্টেড রেজিমেন্ট আছে। যার প্রতিটি ঘোড়া লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে কেনা। অপ্রয়োজনীয় ঘোড়ার পেছনে এত টাকা খরচ না করে দু'-একটা শিক্ষিত কুকুর কি কেনা যায় না ?

আমাকে এসব বলছেন কেন ভাই ? আমি সামান্য ব্যক্তি। এসব কর্তাব্যক্তিদের বলেন।

আমি আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই। উচিত কি উচিত না ?

উচিত তো বটেই।

সাজ্জাদ হোসেন উঠে পড়লেন। শুকনো গলায় বললেন, আমার ডিউটি আছে। আর থাকতে পারছি না।

এই সাংবাদিকের সঙ্গে আরও কিছু সময় কাটালে প্যাঁচে পড়ে যেতে হবে। চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে। আজকের ইন্টারভ্যু দিয়েই তাঁর ভয় ভয় লাগছে। না জানি কী ছাপা হয়! তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। চাকরি বাঁচিয়ে চলা ক্রমেই মুশকিল হয়ে পড়ছে।

সাজ্জাদ হোসেন জিপ নিয়ে খানিকক্ষণ একা-একা পুরানা পল্টন এলাকায় ঘুরলেন। তারপর খুঁজে বের করলেন মিসির আলির বাড়ি।

এটা সেই বাড়ি, যা 'নগ্নগাত্র' এসে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে। তাঁর জানা ছিল না। মিসির আলির সঙ্গে এর পরেও তাঁর দেখা হয়েছে, কিন্তু মিসির আলি এ প্রসঙ্গে কোনো কথা বলেননি। যেন এটা বলার মতো কোনো ব্যাপার নয়। অথচ মিসির আলিকে দু'-তিনবার স্টেটমেন্ট দিতে হয়েছে। একজন ইনভেসটিগেটিং অফিসার এসে সব দেখেশুনে গিয়েছে। যথেষ্ট হৈচৈ করা হয়েছে এটা নিয়ে। অন্য যে-কেউ হলে প্রথম সুযোগেই ঘটনাটা বন্ধু-বান্ধবদের বলত। মিসির আলি বলেননি। লোকটি কি ইচ্ছে করেই নিজেকে আলাদা প্রমাণ করবার জন্যে এরকম করে ?

সাজ্জাদ হোসেন কড়া নাড়লেন। মিসির আলি ঘরেই ছিলেন। তিনি দরজা খুললেন। সাজ্জাদ হোসেনকে দেখে বিন্দুমাত্র অবাক হলেন না। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো তিনি যেন বন্ধুর জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

সাজ্জাদ হোসেন বললেন, খবর কী তোর ?

ভালো।

খোঁজ নিতে এলাম টিকে আছিস, না নগ্নগাত্র এসে তোকে পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে দিয়ে গেছে।

না, এখনো বানায়নি।

তোর 'ইমা'র পাত্তা এখনো লাগাতে পারিনি। পারলেই জানবি।

পারার সম্ভাবনা কী রকম ?

কম। খুবই কম। ঠান্ডা পানি খাওয়াতে পারবি ? খুব ঠান্ডা।

ঠান্ডা পানি হবে না। ঘরে ফ্রিজ নেই।

বাড়িওয়ালার ঘরে নিশ্চয়ই আছে। তোর ইমাকে পাঠিয়ে দে না, নিয়ে আসুক। ঠান্ডা পানি খেতে ইচ্ছা হচ্ছে।

মিসির আলি ইমাকে পাঠালেন না। নিজেই ঠান্ডা পানির বোতল নিয়ে এলেন। সাজ্জাদ হোসেন টেবিলে পা তুলে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসে আছেন। দেখলেই মায়া লাগে। লোকটির উপর দিয়ে ঝড় যাচ্ছে। মিসির আলি বললেন, চা খাবি ?

না। তোর সোফায় ঘণ্টাখানিক শুয়ে থাকব।

সোফায় কেন ? বিছানায় শুয়ে থাক।

সোফা হলেই চলবে। বিছানা লাগবে না। তুই কাঁটায় কাঁটায় একঘণ্টা পরে ডেকে তুলবি।

ঠিক আছে, তুলব।

সাজ্জাদ হোসেন সোফায় লম্বা হলেন এবং দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লেন। তবে তাঁকে ডেকে তুলতে হলো না। ঠিক এক ঘণ্টা পরে নিজে নিজেই জেগে উঠলেন। প্রাণী হিসেবে মানুষের তুলনা নেই। তার অবচেতন মন সর্বক্ষণ কাজ করে। যথাসময়ে তাকে সজাগ করে দেয়। বিপদের আভাস দিতে চেষ্টা করে। মুশকিল হচ্ছে তার কর্মপদ্ধতি আমাদের জানা নেই। সাজ্জাদ হোসেন বললেন, এক কাপ চা খাব। তারপর যাব। আজ সারা রাত ডিউটি। যেভাবেই হোক, আজ নগ্নগাত্রকে ধরবই।

মিসির আলি শান্তস্বরে বললেন, ম্যানিয়াকদের ধরা খুব মুশকিল। এদের ইন্দ্রিয় খুব সজাগ থাকে।

সজাগ থাকুক আর যা-ই থাকুক, ব্যাটাকে আজ ধরবই।

'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড'-এর দেশ খোদ ইংল্যান্ডেও কিন্তু কিছু কিছু ম্যানিয়াকদেরকে ধরতে তিন-চার বছর সময় লেগেছে। একজনের নাম তুই নিশ্চয়ই জানিস—রোড সাইড স্ট্রাংগলার। বেছে বেছে ব্লন্ড মেয়েদের খুন করত। সাড়ে ছ'বছর চেষ্টা করেও কিন্তু ওকে ধরা যায়নি।

আমি ধরব। আজ রাতেই ধরব।

মিসির আলি চুপ করে গেলেন। সাজ্জাদ হোসেন বললেন, উঠি ?

চা না খাবি বললি ?

মত বদলেছি, খাব না।

মিসির আলি বললেন, আমি কি তোর সঙ্গে যেতে পারি ?

আমার সঙ্গে যাবি ? কেন ?

আমি ধানমণ্ডির একটা বাড়িতে ঢুকতে চাই। ওরা ঢুকতে দিচ্ছে না। গেট বন্ধ করে রাখছে এবং বলছে বাড়িতে কেউ নেই। কিন্তু আমি জানি বাড়িতে লোকজন আছে। পুলিশের গাড়িতে করে গেলে দারোয়ান ভয় পেয়ে গেট খুলবে।

আজ রাতেই যেতে হবে ?

হুঁ।

তোকে ঢুকতে দিচ্ছে না কেন ?

আছে, অনেক ব্যাপার আছে, পরে বলব। আমাকে ও-বাড়িতে নামিয়ে দিতে তোর অসুবিধা আছে ? অসুবিধা থাকলে থাক।

না, অসুবিধা নেই।

রাত সাড়ে দশটার মতো বাজে।

দারোয়ান জেগেই ছিল। মিসির আলি যা ভেবেছিলেন, তা-ই হলো। পুলিশ এসেছে শুনে সে গেট খুলল। মিসির আলি ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

ওসমান সাহেব এবং তাঁর স্ত্রী দু'জনেই দোতলার বারান্দা থেকে দেখলেন, মিসির আলি গেট দিয়ে ঢুকছেন এবং বেশ সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেঁটে আসছেন। ওসমান সাহেব নিচে নেমে এলেন। মিসির আলি বললেন, আপনি ভালো আছেন ?

ওসমান সাহেব সে-প্রশ্নের জবাব দিলেন না। মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

মিসির আলি বললেন, অসময়ে এসেছি। উপায় ছিল না বলেই আসতে হয়েছে। আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই।

১৭

ওসমান সাহেবের বসার ঘর। রাত প্রায় এগারটা। একটি কম পাওয়ারের টেবিল ল্যাম্প ছাড়া ঘরে কোনো আলো নেই। আবছা অন্ধকার। এই আবছা অন্ধকার ঘরে তিনজন মানুষ মুখোমুখি বসে ছিলেন। একজন উঠে চলে গেলেন। ফরিদা। তিনি নিঃশব্দে কাঁদছিলেন। যে আলোচনা চলছিল, তা তাঁর সহ্য না হওয়ায় উঠে গেছেন। এখন বসে আছেন দু'জন—মিসির আলি এবং ওসমান সাহেব। কথাবার্তা এখন বিশেষ হচ্ছে না। ওসমান সাহেবের যা বলার তা বলেছেন। এখন আর তাঁর কিছু বলার নেই। তিনি বসে আছেন মূর্তির মতো। দেখে মনে হচ্ছে, তাঁর মধ্যে জীবনের ক্ষীণতম স্পর্শও নেই। যেন একজন মরা মানুষ।

মিসির আলি বললেন, আপনি বলছেন, ফিরোজকে তালাবন্ধ করে রেখেছেন ?

হ্যাঁ।

কবে থেকে ?

আজ নিয়ে ছ'দিন।

এটা তো বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। কারণ এই ছ'দিনে বেশ ক'বার সে বের হয়ে গেছে। পুরানা পল্টন এলাকায় তাকে দেখা গেছে। পত্রিকায় নিউজ হয়েছে।

ওসমান সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, কীভাবে কী হচ্ছে আমি জানি না। আমি যা করেছি, সেটা বললাম। তালা দেওয়া আছে। আপনি নিজে গিয়ে দেখতে পারেন।

সেই তালার চাবি কার কাছে ? অর্থাৎ আমি জানতে চাচ্ছি, অন্য কেউ তালা খুলে দিতে পারে কি না।

না, পারে না। কারণ চাবি আমার কাছে।

অর্থাৎ আপনি বলতে চাচ্ছেন তালাবন্ধ করে রাখা সত্ত্বেও সে বের হয়ে পড়ছে ?

আমি কিছুই বলতে চাচ্ছি না। আপনার যা ইচ্ছা মনে করতে পারেন।

মিসির আলি ঠান্ডা গলায় বললেন, আমি কোনো আধিভৌতিক ব্যাপারে বিশ্বাস করি না। একজনকে তালাবন্ধ করে রাখা হবে, তবু সে বের হয়ে যাবে—এটা আর যে-ই বিশ্বাস করুক, আমি করব না।

বিশ্বাস করতে আমি আপনাকে বলছি না। আপনি নিজে গিয়ে দেখুন। সেটা না করে আপনি একই কথা বারবার আমাকে বলছেন কেন ?

সেটা বলছি, কারণ আমি আগে সমস্ত ব্যাপারটা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা করতে চাই। ওসমান সাহেব, আমি, আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই, আমি এই ছেলেটিকে সুস্থ করে তুলতে চাই। আপনি আমাকে শত্রুপক্ষ মনে করছেন, এটা ঠিক না। আমার কোনো পক্ষ নেই। আমি একজন চিকিৎসক।

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন এবং সহজ স্বরে বললেন, চলুন ফিরোজের ঘরটা দেখে আসি।

আপনি একাই যান, আমি যাব না।

আপনি যাবেন না কেন?

আমার সহ্য হয় না। আমি নিজেও পাগল হয়ে যাব।

মিসির আলি একাই রওনা হলেন।

ফিরোজের ঘর নিঃশব্দ। সে এই গরমেরও চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে মিসির আলি চমকে উঠলেন। মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ। গালের হনু উঁচু হয়ে আছে। সেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণের কিছুই নেই, কেমন কালি মেরে গেছে। মিসির আলি লক্ষ করলেন, ফিরোজের হাতের নখ বড় বড় হয়েছে। নখের নিচে ময়লা জমে দেখাচ্ছে শকুনের নখের মতো। ঘুমের মধ্যেই ফিরোজ পাশ ফিরল। মিসির আলি লক্ষ করলেন, সে হাঁ করে ঘুমাচ্ছে এবং মুখ দিয়ে লালা পড়ে বিছানার একটা বেশ বড় অংশ চটচটে হয়ে আছে। কুৎসিত একটা দৃশ্য।

ঘরের একটিমাত্র দরজা, সেখানে সত্যি সত্যি বিরাট একটা তালা ঝুলছে। দু'দিকে দু'টি বিশাল জানালা। জানালায় লোহার গ্রিল। সেই গ্রিল ভেঙে বের হওয়া অসম্ভব। সুস্থ মানুষ দূরের কথা, একজন পাগলও সেই চেষ্টা করবে না।

মিসির আলি বসার ঘরে ফিরে এলেন। ওসমান সাহেব বললেন, ঘর যে বন্ধ, এটা আপনার বিশ্বাস হয়েছে?

হ্যাঁ হয়েছে।

এখন বলুন সে কীভাবে বের হয়?

ফিরোজের ঘরের সঙ্গে একটা এ্যাটাচড বাথরুম আছে। বাথরুমের ভেতরটা আমি দেখতে পাইনি। তবে আমার ধারণা, বাথরুমে বেশ বড় একটি ভেন্টিলেটার আছে, এবং ফিরোজ সেই ভেন্টিলেটার দিয়ে বের হয়।

ওসমান সাহেব নড়েচড়ে বসলেন। সিগারেট ধরালেন। মিসির আলি লক্ষ করলেন, সিগারেট ধরাতে গিয়ে তাঁর হাত কাঁপছে। মিসির আলি বললেন, এক্ষুনি আপনি ভেন্টিলেটার বন্ধ করার ব্যবস্থা করুন। আজ রাতে যেন সে বের হতে না পারে।

হ্যাঁ, করছি।

আমি এখন চলে যাব। কিন্তু কাল ভোরে আবার আসব। আপনার দারোয়ানকে বলে দিন, যাতে সে আমাকে ঢুকতে দেয়।

হ্যাঁ, আমি বলব।... মিসির আলি সাহেব।

বলুন।

আমার ছেলে কি কোনোদিন সুস্থ হয়ে উঠবে ?

নিশ্চয়ই হবে। হতেই হবে।

এত রাতে আপনি বাড়ি গিয়ে কী করবেন ? থেকে যান এখানে।

না, থাকতে পারব না। আমার সঙ্গে একটা ছোট মেয়ে থাকে, সে একা ভয় পাবে। আপনি দেরি না করে ভেন্টিলেটারটা বন্ধ করার ব্যবস্থা করুন।

করছি। এক্ষুনি করছি।

ফরিদা ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে খুব উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত মনে হলো। তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, এবং তিনি কাঁপছেন। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। ফরিদা থেমে বললেন, মিসির আলি সাহেব, ফিরোজ জেগেছে। আপনাকে ডাকছে। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

কেমন আছ ফিরোজ ?

ভালো আছি। তুই কেমন আছিস ?

মিসির আলি চমকে উঠলেন। ভারি গম্ভীর গলায় কথা বলছে ফিরোজ। চোখে-মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি। সে পায়ের উপর পা তুলে চেয়ারে বসে আছে।

তুই তুই করে বলছি বলে রাগ করছিস না তো ? তুই তো আবার প্রফেসর মানুষ।

রাগ করছি না, তবে দুঃখিত হচ্ছি। সবাইকে সবার প্রাপ্য সম্মান দেওয়া উচিত।

তা উচিত। কিন্তু মুশকিল কী জানিস, সারা জীবন তুই ছাড়া কোনো সম্বোধন করিনি। আমাকে চিনতে পারছিস তো ? তুই তো গিয়েছিলি আমাদের বাড়িতে।

মিসির আলি চুপ করে রইলেন। যে কথা বলছে, সে ফিরোজ নয়। ফিরোজের দ্বিতীয় সত্তা। সেকেন্ড পার্সোনালিটি।

কী-রে, চুপ করে আছিস কেন ? ভয় পাচ্ছিস ? হা হা হা।

না, ভয় পাচ্ছি না।

খাঁচায় আটকে রেখেছিস, ভয় পাবি কেন ? ছেড়ে দে, তারপর দেখি তোর কত সাহস।

আমার সাহস কম।

এই তো একটা সত্যি কথা বললি। হ্যাঁ, তোর সাহস কম। তবে তোর বুদ্ধি আছে। মাথা খুব পরিষ্কার। বোকা বন্ধুর চেয়ে বুদ্ধিমান শত্রু ভালো।

আমি কারও শত্রু নই।

বাজে কথা বলিস না। তুই আমার শত্রু—মহা শত্রু!

কেমন করে ?

তুই ফিরোজকে সারিয়ে তুলতে চাচ্ছিস। ওকে সারিয়ে তুললে আমি যাব কোথায় ? ডাণ্ডাপেটা করব কীভাবে ? তুইই বল।

ডাণ্ডাপেটা করতেই হবে ?

করব না ? বলিস কী তুই! আমাকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে, আমি ছেড়ে দেব ? পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে ফেলব।

লাভ কী তাতে ?

লাভ-লোকসান জানি না। ছোট চৌধুরী লাভ-লোকসানের পরোয়া করে না। তোকে আমি একটা শিক্ষা দেব। এক বাড়ি মেরে টপ করে মাথাটা ফাটিয়ে দেব। গল-গল করে ঘিলু বের হয়ে আসবে। ছিটকে আসবে রক্ত। বড় মজার ব্যাপার হবে। তবে তুই দেখতে পাবি না। আফসোসের কথা।

মিসির আলি তাকিয়ে দেখলেন, এ বাড়ির প্রায় সবাই এসে জড়ো হয়েছে। চোখ বড় বড় করে শুনছে এই অস্বাভাবিক কথোপকথন। কাঁদছেন শুধু ফরিদা।

ফিরোজ হিসহিস করে উঠল, কী, চুপ করে আছিস যে ? কথা বলছিস না কেন ? ভয় পেয়েছিস ? ভয় পেয়ে শেষটায় মেয়েমানুষের আঁচল ধরলি ? লজ্জা করে না ?

কার কথা বলছ ?

ওরে হারামির বাচ্চা, তুই জানিস না কার কথা বলছি ? তোর পেয়ারের নীলু বেগম। যার ইয়ে দুটি...। এবং যার ইচ্ছে হচ্ছে...।

কুৎসিত সব কথা। সে একনাগাড়ে বলে যেতে লাগল। কদর্য অশ্লীলতা। যা ছাপার অক্ষরে লেখার কোনো উপায় নেই। ফিরোজ যে-সব কথা বলতে লাগল, তার ভগ্নাংশও অশ্লীলতম পর্ণো পত্রিকায় থাকে না। ফরিদা দ্রুত ঘরে চলে গেলেন। কাজের লোকগুলি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। ওসমান সাহেব ধৈর্য হারিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, শাট আপ!

ফিরোজ হাসিমুখে তাকাল ওসমান সাহেবের দিকে। যেন খুব মজার কথা বলছে, এমন ভঙ্গিতে বলতে লাগল, আমাকে ইংরেজিতে গাল দিচ্ছে। বাহ বেশ মজা তো! কাকে তুই ইংরেজিতে গাল দিচ্ছিস ? তোর নাড়িনক্ষত্র আমি জানি। সালেহা নামের কাজের মেয়েটির সঙ্গে তুই কী করেছিস, বলে দেব ? খুব মজা পেয়ে গিয়েছিলি, তাই না ? ক'দিন খুব সুখ করে নিলি। বলব কী করেছিলি ? বলব ? হা হা হা। কী, পালিয়ে যাচ্ছিস কেন ? লজ্জা লাগছে ? ফুর্তি করার সময় লজ্জা লাগেনি ? একটা ঘটনা বরং বলেই ফেলি...।

ওসমান সাহেব বললেন, মিসির আলি সাহেব, আপনি চলে আসুন।

আপনি বসার ঘরে গিয়ে বসুন। আমি আসছি।

তুই যাচ্ছিস না কেন ? কথাগুলো শুনতে মজা লাগছে ? তোর ইয়ে... (কিছু কুৎসিত কথা)।

মিসির আলি গম্ভীর গলায় বললেন, ফিরোজ, চুপ করো।

ঠিক আছে, চুপ করলাম। তুই আজ রাতে কোথায় থাকবি ?

বাসাতেই থাকব।

তাহলে দেখা হবে।

না, দেখা হবে না। বাথরুমের ভেন্টিলেটার বন্ধ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ফিরোজের কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল ব্যাপারটা বুঝতে। তারপর লণ্ডভণ্ড কাণ্ড করল। চেয়ার ভাঙল, লাথির পর লাথি বসাতে লাগল পালঙ্কে। কাপ বাটি ছুড়ে ছুড়ে ফেলতে লাগল। চোখে দেখা যায় না এমন ব্যাপার। ভয়াবহ উন্মত্ততা। মনে হয় না এ কোনোদিন শান্ত হবে। মিসির আলি একটি সিগারেট ধরালেন। ফিরোজ চাপা গলায় গর্জন করছে। ক্রুদ্ধ পশুর গর্জন। সমস্ত আবহাওয়াই দূষিত হয়ে গেছে। নরকের একটি ক্ষুদ্র অংশ নেমে এসেছে এখানে।

মিসির আলি দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের বললেন, তোমরা যাও। বারান্দার বাতি নিভিয়ে দাও। ও আপনাআপনি শান্ত হবে।

১৮

নাজনীন একটি ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখেছে। স্বপ্নটি দেখেছে ছাড়া ছাড়া ভাবে। তবু সব মিলিয়ে একটা অর্থ দাঁড় করানো যায়। এবং অর্থটি ভয়াবহ। নাজনীন দেখেছে—একটা ছোট ঘরের একপ্রান্তে একটি বিছানা। বিছানাটিতে সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে একজন লোক শুয়ে আছে। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ আরেকজন লোক ঘরে ঢুকল। লোকটার হাতে একটা লোহার রড। লোকটি টান দিয়ে ঘুমিয়ে থাকা লোকটির ওপর থেকে চাদর সরিয়ে ফেলল। লোকটির মুখ দেখা যাচ্ছে। এবং সেটি একটি পরিচিত মুখ—মিসির আলির মুখ। স্বপ্নের মধ্যেই প্রচণ্ড একটা শব্দ হলো, এবং দেখা গেল মিসির আলির মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।

নাজনীন জেগে উঠল চিৎকার করে। স্বপ্ন এত ভয়াবহ হয়! নাজনীন বাকি রাতটা আর ঘুমুতে পারল না। ছ'রাকাত নফল নামাজ পড়ল। কোরান শরীফ পড়ল। মন শান্ত হলো না। নাজনীনের মা বললেন একটা ছদকা দিয়ে দিতে। প্রাণের বদলে প্রাণ। সেই ছদকা তো ভোর না হওয়ার আগে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই কঠিন। নাজনীন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে খানিকক্ষণ কাঁদল। সে জানে এটা স্বপ্ন। স্বপ্ন কখনো সত্যি হয় না। তবু এমন লাগছে কেন?

ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে একটি টেলিগ্রাম পাঠাল, 'সাবধান থাকবেন।' টেলিগ্রামটি পাঠিয়েই মনে হলো, এর অর্থ তো উনি কিছুই বুঝবেন না। তিন ঘণ্টা পর দ্বিতীয় একটি টেলিগ্রাম করল। এই টেলিগ্রামটি বেশ দীর্ঘ।

চাচা,

আপনার সম্বন্ধে খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। একটি লোক লোহার রড দিয়ে আপনার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। আপনাকে অনুরোধ করছি, সাবধানে থাকবেন।

নাজনীন

১৯

নিজের মেয়েকে চিনতে না পারার মতো কষ্টের কি কিছু আছে? জাহিদ সাহেব বসে বসে তাই ভাবেন। তাঁর বড় অস্থির লাগে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কেমন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন। এরকম হবে, জানতেন। দুই মেয়ে বড় হবে, এদের বিয়ে হবে, আলাদা জীবন হবে। তিনি পড়ে থাকবেন একা। এ অবস্থা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। পুরোপুরি সেরকম অবশ্যি হয়নি। এক মেয়ে তাঁর সঙ্গেই আছে। কিন্তু এই মেয়েকে তিনি চেনেন না। এ এক অচেনা নীলু।

আজ দুপুরে খেতে গিয়ে দেখেনে, মাংসের ভুনা তরকারি এবং খিচুড়ি করা হয়েছে। তিনি অবাক হয়ে বললেন, আজ খিচুড়ি যে!

নীলু বলল, তুমি খেতে চেয়েছিলে, তাই।

জাহিদ সাহেব খেতে চেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু কাউকে সে-কথা বলেননি। নীলুর সঙ্গে গতকাল রাত থেকেই তাঁর কোনো কথা হয়নি। অথচ সে ঠিকই জানল। শুধু আজই নয়, এরকম প্রায়ই হয়। বড় অস্বস্তি লাগে। শুধু অস্বস্তি নয়, একটু ভয় ভয় করে। একেক রাতে ভয়টা অসম্ভব বেড়ে যায়। কেন বাড়ে, তাও তিনি জানেন না। তাঁর ইচ্ছা করে সব ছেড়ে ছুড়ে দূরে কোথাও চলে যান। যেখানে কেউ তাঁর কোনো খোঁজ পাবে না।

প্রথম এরকম হলো বিলুর বিয়ের চারদিন পর। বিলু নেই। বিয়েবাড়ির আত্মীয়স্বজন সব চলে গেছে। বাড়ি একেবারেই খালি। মন-টন খারাপ করে জাহিদ সাহেব নিজের ঘর ছেড়ে ঘুমাতে গেলেন নীলুর পাশের ঘরে। একজন কেউ থাকুক আশেপাশে। যাতে ডাকলে সাড়া পাওয়া যায়।

অনেক রাত পর্যন্ত তাঁর ঘুম এল না। সামনের জীবন কেমন কাটবে, তাই নিয়ে ভাবতে লাগলেন। মৃত স্ত্রীর কথা মনে করে খানিকক্ষণ কাঁদলেন। প্রথম জীবনে একটি ছেলে হয়েছিল—দেড় বছর বয়সে মারা যায়। মিষ্টি কথা বলত। পাখিকে বলত 'বাকি'। ফুলকে বলত 'কুল'। অনেকদিন পরে মৃত ছেলের কথা মনে করেও চোখ মুছলেন। আর ঠিক তখন এক অদ্ভুত ব্যাপার হলো। চাঁপা ফুলের তীব্র গন্ধে অভিভূত হয়ে গেলেন। ব্যাপার কী! ফুলের গন্ধ আসছে কোত্থেকে? তাঁর নিজের একসময় বিরাট ফুলের বাগান ছিল। সে-সব আর কিছু নেই। বাগান জঙ্গল হয়েছে।

জাহিদ সাহেব অবাক হয়ে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াতেই নূপুরের শব্দ শুনলেন। খুব হালকা, কিন্তু স্পষ্ট। এর মানে কী? তিনি নীলুর ঘরের সামনে দাঁড়ালেন। আশ্চর্য! নীলু যেন কার সঙ্গে কথা বলছে। গভীর রাতে কে এসেছে নীলুর ঘরে? জাহিদ সাহেব ভয়ার্ত গলায় ডাকলেন, নীলু, ও নীলু।

নীলু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলল।

কার সঙ্গে কথা বলছিস?

আছে একজন। তুমি চিনবে না।

জাহিদ সাহেব ঘরে উঁকি দিলেন। কাউকে দেখতে পেলেন না। নীলু বলল, ঘুমিয়ে পড়ো বাবা। এত রাত পর্যন্ত জেগে আছ কেন?

জাহিদ সাহেব বললেন, কী হচ্ছে এসব! কার সঙ্গে কথা বলছিলি ?

ও তুমি বুঝবে না বাবা।

বুঝব না মানে ? বুঝব না মানে কী ?

অনেক কথা বাবা। পরে তোমাকে বলব।

না, এখনই শুনব।

নীলু বলল, এবং নীলুর কথা তিনি কিছুই বুঝলেন না। একজন কেউ নীলুর সঙ্গে আছে—যে নীলুকে তার মহাবিপদ থেকে রক্ষা করেছিল। কী অদ্ভুত কথা!

জাহিদ সাহেব দারুণ দুশ্চিন্তায় দিন কাটাতে লাগলেন। তাঁর ধারণা হলো, নীলুর বড় কোনো অসুখ হয়েছে। তিনি ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বললেন। দু'জন পীরের কাছ থেকে তাবিজ আনালেন। সেইসব তাবিজ পরতে নীলু কোনো আপত্তি করল না। ডাক্তারদের ওষুধপত্র খেতেও তার কোনো অনীহা দেখা গেল না। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হলো না। এবং হবেও না কোনোদিন। তাঁর বাকিজীবন কাটবে অদ্ভুত এই নীলুকে সঙ্গে নিয়ে—যাকে তিনি চেনেন না, বোঝেন না। যে মনের কথা বুঝে ফেলে। যার ঘরে অপরিচিত এক রমণীকণ্ঠ শোনা যায় এবং দমকা হাওয়ার মতো চাঁপা ফুলের গাঢ় গন্ধ যাকে হঠাৎ ঘিরে ফেলে।

আজ বুধবার। আকাশে মেঘ নেই। রৌদ্রোজ্জ্বল একটি সুন্দর সকাল। জাহিদ সাহেব অনেক দিন পর উৎফুল্ল বোধ করলেন। তাঁর মনে হলো, দুঃস্বপ্ন কেটে যাবে। নীলু ভালো হয়ে যাবে। তাঁর চমৎকার একটি বিয়ে হবে। ছেলেপুলে আসবে তাদের সংসারে। সেইসব ছেলেমেয়ে নিয়ে তাঁর শেষজীবন ভালোই কাটবে। একজন মানুষ তো সারা জীবন দুঃখী থাকতে পারে না। দুঃসময়ের পর আসে সুসময়। জীবনচক্রের এই এক কঠিন নিয়ম। তবে কারও কারও ক্ষেত্রে দুঃসময়টা দীর্ঘ হয়, এই যা। যেমন তাঁর হয়েছে।

জাহিদ সাহেব ডাকলেন, নীলু, নীলু মা। অনেক দিন পরে তাঁর কণ্ঠে আনন্দ ঝরে পড়ল।

নীলু এল না। তিনি উঁকি দিলেন নীলুর ঘরে। তার ঘর অন্ধকার। দরজা জানালা বন্ধ। পর্দা টেনে দেওয়ায় ঘরের বাতাস ভারী হয়ে আছে।

কী হয়েছে নীলু ?

কিছু হয়নি।

এভাবে শুয়ে আছিস কেন ? শরীর ভালো না ?

তিনি নীলুর কপালে হাত দিলেন। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। নীলুর চোখ-মুখ রক্তবর্ণ। তিনি হতভম্ব হয়ে বললেন, কী হয়েছে মা ?

কিছু হয়নি।

কিছু হয়নি, মানে ? তোর গায়ে তো প্রচণ্ড জ্বর। কখন জ্বর এল ? ডাক্তার ডাকা দরকার। এক্ষুনি দরকার।

বাবা, এই নিয়ে তুমি ভাববে না। কাউকে ডাক্তার দরকার নেই।

দরকার নেই, বললেই হলো!

বাবা, তোমার পায়ে পড়ি। আমাকে একা থাকতে দাও। বিরক্ত করো না। ভয় নেই, জ্বর সেরে যাবে।

জাহিদ সাহেব লক্ষ করলেন, নীলু কাঁদছে।

মা, কী হয়েছে তোর ?

কিচ্ছু হয়নি বাবা। আমি সেরে যাব। আমি আবার আগের মতো হব। যে আমার সঙ্গে থাকত, সে আমাকে বলেছে।

সে কে ?

আমি নিজেও জানি না, সে কে! এক মহাবিপদে সে আমাকে রক্ষা করেছিল। বাবা, তুমি যাও।

জাহিদ সাহেব মুখ কালো করে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। চমৎকারভাবে যে দিনটি শুরু হয়েছিল, সেটি খানখান হয়ে ভেঙে পড়ল। তিনি খবরের কাগজ হাতে নিয়ে একা-একা বারান্দায় বসে রইলেন।

২০

বুধবার। সময় সাতটা দশ।

সন্ধ্যার ঠিক পরপর মিসির আলি নিউ ইস্কাটন রোডের যে তিনতলা দালানের সামনে এসে দাঁড়ালেন, তার নাম 'নিকুঞ্জ'। লোকজন বিশাল প্রাসাদ তৈরি করে নাম দেয় 'কুটির'! এরকম বাড়ির নাম কেউ কুটির রাখে ?

বাড়ির সামনে ফুটবলের মাঠের মতো বড় লন। লনের ঘাস বড় বড় হয়ে আছে। লনের চারদিকে একসময় ফুলের বাগান ছিল। এখন নেই। শ্বেতপাথরের একটি শিশুমূর্তি (সম্ভবত ফোয়ারা) আছে মাঝখানে, তাতে শ্যাওলা পড়েছে। চারদিকে অবহেলা ও অযত্নের ছাপ।

মিসির আলির মনে হলো—এ বাড়ির মালিক দেশে থাকেন না। চাকর-বাকরের হাতে বাড়ির দায়িত্ব দিয়ে তিনি থাকেন বিদেশে। হঠাৎ হঠাৎ আসেন, আবার চলে যান। মিসির আলি খানিকটা শঙ্কিত বোধ করলেন। বাড়ির মালিক এস. আকন্দ সাহেবের সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়া খুবই জরুরি। কারণ মিসির আলির ছাত্র শেষ পর্যন্ত 'ইমা' নামের একটি মেয়ের খবর পত্রিকায় পেয়েছে। খবরের শিরোনাম—'হারিয়ে গেল ইমা'। ডল হাতে তিন বছর বয়সী একটি বালিকার ছবি আছে খবরের সঙ্গে।

মেয়েটি তার বাবা-মার সঙ্গে ঢাকা থেকে খুলনা যাচ্ছিল। খুব চঞ্চল মেয়ে। সারা দিন ছোটাছুটি করেছে। স্টিমারে উঠে তার খুব ফুর্তি। একজন আয়া তার সঙ্গে সঙ্গে। বরিশাল থেকে স্টিমার ছাড়ার কিছুক্ষণ পরই আয়া দেখল ইমা নেই। সিঁড়ি দিয়ে দোতলা থেকে একা-একা নিচে নেমে গেছে ? সে ছুটে এল নিচে। সেখানেও ইমা নেই। সে কি

রেলিং টপকে নদীতে পড়ে গেছে ? আয়া ভয়ে-আতঙ্কে অজ্ঞান হয়ে গেল। ইমার বাবা-মা তখনো কিছু জানেন না। তাঁরা টেলিস্কোপিক লেন্স লাগিয়ে দূরের একটি মাছধরা নৌকার ছবি তোলার চেষ্টা করছেন।

এ জাতীয় বাড়িগুলোতে সাধারণত দারোয়ান এবং কুকুর থাকে। কিন্তু এ বাড়িতে দুটোর কোনোটাই দেখা যাচ্ছে না। মিসির আলি অনেকটা দ্বিধা নিয়েই গেটের ভেতর ঢুকলেন। কলিং বেল থাকার কথা। তাও চোখে পড়ছে না। তবে বাড়িতে লোক আছে। আলো জ্বলছে।

আচ্ছা, এরকম হওয়া কি সম্ভব যে, এ বাড়িতে এস. আকন্দ নামের কেউ থাকেন না! এককালে ছিলেন, এখন নেই। কিংবা খবরের কাগজে যে এস. আকন্দের কথা আছে, ইনি সেই ব্যক্তি নন।

হওয়া অসম্ভব নয়। তবে সাজ্জাদ হোসেন বেশ জোর দিয়েই বলেছেন—এটিই ঠিকানা। খবরের কাগজের কাটিং থেকে ঠিকানা বের করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সাজ্জাদ হোসেনকে। এটি মনে হচ্ছে তিনি ঠিকই করেছেন।

কলিং বেল খুঁজে পাওয়া গেল না। মিসির আলি দরজায় ধাক্কা দিলেন। দরজা খুলে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

কাকে চান ?

এটা কি আকন্দ সাহেবের বাড়ি ? এস. আকন্দ ?

জি।

উনি কি আছেন ? তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

উনি খুবই ব্যস্ত। আজ রাত দু'টার ফ্লাইটে লন্ডন চলে যাচ্ছেন। আপনার কী দরকার বলুন ?

আমার খুবই দরকার।

আমাকে বলুন।

আমি তাঁকেই চাই। বেশি সময় লাগবে না। পাঁচ মিনিট সময় নেব।

ঠিক আছে বসুন, আমি দেখি।

মিসির আলি সাহেব বসার ঘরে একা-একা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বসে রইলেন। বসার ঘরটি সুন্দর। অসংখ্য দর্শনীয় জিনিসপত্র দিয়ে জবড়জং করা হয়নি। ঘাস রঙের একটা কার্পেট। নিচু নিচু বসার চেয়ার। দেয়ালে একটিমাত্র পেইনটিং—চার-পাঁচজন গ্রামের ছেলেমেয়ে পুকুরে সাঁতার কাটতে নেমেছে। অপূর্ব ছবি। ছবিটির জন্যেই বসবার ঘরে একটি মায়া-মায়া ভাব চলে এসেছে। মিসির আলি মনে মনে ঠিক করলেন, তাঁর কোনো দিন টাকাপয়সা হলে এরকম করে একটি ড্রইংরুম সাজাবেন। সেরকম টাকাপয়সা অবশ্যি তাঁর হবে না। সবার সব জিনিস হয় না।

আপনি কি আমার কাছে এসেছেন ? আমি সাবির আকন্দ।

মিসির আলি ভদ্রলোককে দেখলেন। বেশ লম্বা। শ্যামলা গায়ের রঙ। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। মুখে একটি কঠিন ভাব আছে। তবে চোখ দু'টি বড় বড়, যা মুখের কঠিন ভাবের সঙ্গে মানাচ্ছে না।

আমি আপনাকে কোনো সময় দিতে পারব না। আমি আজ একটায় চলে যাচ্ছি।

আমি আপনার বেশি সময় নেব না। আপনি পত্রিকার এই কাটিংটি একটু দেখুন।

আকন্দ সাহেব দেখলেন। কাটিংটি ফিরিয়ে দিয়ে মিসির আলির পাশে বসে ক্লান্ত স্বরে বললেন, এটা আপনি আমাকে কেন দেখাচ্ছেন ? কিছু কিছু জিনিস আমি মনে করতে চাই না। এটা হচ্ছে তার একটি।

মিসির আলি বললেন, আমার সঙ্গে একটি মেয়ে থাকে। আমার ধারণা, ও ইমা।

ভদ্রলোক কোনো কথা বললেন না। তাঁর মুখের একটি পেশিও বদলাল না।

আপনার এই মেয়ের কি খুব ছোটবেলায় ওপেন হার্ট সার্জারি হয়েছিল ?

হ্যাঁ। ইংল্যান্ডে। ওর বয়স তখন দু'বছর।

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি আপনার পরিচয়টি জানতে পারি ?

পারেন। আমার নাম মিসির আলি। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পার্টটাইম শিক্ষক।

আকন্দ সাহেব সিগারেট ধরিয়ে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে টানতে লাগলেন।

মিসির আলি বললেন, আমি বুঝতে পারছি, ঘটনার আকস্মিকতা আপনাকে কনফিউজ করে ফেলেছে এবং এটা যে আপনারই মেয়ে, তা আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না।

ভদ্রলোক কিছু বললেন না।

মিসির আলি বললেন, একবার এই মেয়েটি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং জ্বরের ঘোরে বলতে থাকে 'মামি ইট হার্টস, মামি ইট হার্টস'; তখনই আমার প্রথম মনে হলো...।

মিসির আলি কথা বন্ধ করে আকন্দ সাহেবের দিকে তাকালেন। ভদ্রলোকের মুখ রক্তশূন্য। মনে হচ্ছে এক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে পড়বেন। তারপর আনন্দ আর যন্ত্রণা একসঙ্গে মেশানো গলায় আকন্দ সাহেব থেমে থেমে বললেন, খুব ছোটবেলায় হার্টের অসুখে কষ্ট পেত, তখন বলত, 'মামি ইট হার্টস।' ওর নাভিতে একটি কালো জন্মদাগ আছে ?

আমি বলতে পারছি না। তবে এই মেয়ে আপনারই মেয়ে কি না, তা বোঝার একমাত্র উপায় হচ্ছে DNA টেস্ট। আপনার এবং এই মেয়ের রক্ত পরীক্ষা করে সেটা বলে দেওয়া সম্ভব। এটা একটা অভ্রান্ত পরীক্ষা।

জানি। তার দরকার হবে না। আমি আমার মেয়েকে দেখলেই চিনতে পারব। আমি কি এখনই যেতে পারি আপনার সঙ্গে ?

হ্যাঁ, পারেন।

আমি আমার স্ত্রীকেও সঙ্গে নিতে চাই।

নিশ্চয়ই সঙ্গে নেবেন।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সমস্ত মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। তিনি বললেন, আপনি কী করেন ?

এই প্রশ্ন আগে একবার করা হয়েছে এবং তার জবাবও দেওয়া হয়েছে। তবু মিসির আলি দ্বিতীয়বার জবাব দিলেন।

আকন্দ সাহেব কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, আমার মেয়েটি কী করে আপনার ওখানে ?

মিসির আলি শান্তস্বরে বললেন, ও আছে কাজের মেয়ে হিসেবে। ভাত-টাত রেঁধে দেয়। বিনিময়ে খেতে পায় এবং থাকতে পায়।

ভদ্রলোক চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন। যেন তিনি মিসির আলির কথা বুঝতে পারছেন না। তিনি ফিসফিস করে নিজের মনেই কয়েকবার বললেন, কাজের মেয়ে! কাজের মেয়ে!

২১

বুধবার। সময় রাত আটটা একুশ।

মিসির আলি ভেবেছিলেন পিতা, কন্যা এবং মাতার মিলনদৃশ্যটি চিরদিন মনে রাখার মতো একটি দৃশ্য হবে। কিন্তু বাস্তবে সেরকম হলো না। কোনো হৈচৈ, কোনো কান্নাকাটি—কিছুই না। ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রী অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলেন হানিফার দিকে। এভাবে তাকিয়ে থাকার কিছু ছিল না। হানিফা দেখতে অবিকল তার মা'র মতো। নাকের ডগায় তার মা'র মতো একটি তিল পর্যন্ত আছে। ভদ্রলোক বললেন, আমরা তোমার বাবা-মা, তুমি খুব ছোটবেলায় হারিয়ে গিয়েছিলে। এখন আমরা তোমাকে নিতে এসেছি।

হানিফা ফ্যালফ্যাল করে তাকাল মিসির আলির দিকে। মিসির আলি হাসলেন। সাহস দিতে চেষ্টা করলেন। এরকম একটি নাটকীয় মুহূর্তের জন্যে তিনি হানিফাকে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। তাকে বলেছিলেন যে, তার বাবা-মা'র খোঁজ করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এবং খোঁজ পাওয়া যাবে।

ভদ্রমহিলা এগিয়ে এসে হানিফার হাত ধরলেন। মিসির আলি ভেবেছিলেন, এই মহিলাটি হয়তো কিছুটা আবেগ দেখাবেন। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে কাঁদবেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। হয়তো আবেগকে সংযত করলেন। ভদ্রমহিলার গলার স্বর ভারি মিষ্টি। তিনি মিষ্টি গলায় বললেন, মা, আমার কথা কি তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না ? দেখো, আয়নায় তাকিয়ে দেখো—আমি অবিকল তোমার মতো দেখতে।

মিসির আলি ওদের সামনে থেকে সরে গেলেন। বাইরের একজনের উপস্থিতি হয়তো এদের কাছে ভালো লাগবে না।

তাঁরা চলে গেলেন পনের মিনিটের মধ্যে। যাওয়ার আগে মিসির আলি বললেন, ওর জিনিসপত্রগুলি নিয়ে যান। ভদ্রমহিলা কঠিন স্বরে বললেন, কোনোকিছুই নেবার প্রয়োজন নেই।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, যাওয়ার আগে এস. আকন্দ সাহেব অত্যন্ত শুকনো গলায় একবার শুধু বললেন, আমাকে কষ্ট করে খুঁজে বের করবার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। ব্যস, এইটুকুই।

মিসির আলি ভেবে পেলেন না, এরা তাঁর সঙ্গে এমন আচরণ কেন করলেন! তাঁদের মেয়েটি তার বাসায় গৃহভৃত্য ছিল, এইটিই কি তাঁদের মর্মপীড়ার কারণ হয়েছে ? এত বিচিত্র কেন মানুষের মন!

অবশ্যি তাঁদের বিচিত্র আচরণের অন্য একটি ব্যাখ্যাও দাঁড় করানো যেতে পারে। হয়তো আজকের এই ঘটনার আকস্মিকতায় তাঁরা হকচকিয়ে গেছেন। আচার-আচরণে অস্বাভাবিকতা এসে পড়েছে এ কারণেই।

মিসির আলি হঠাৎ লক্ষ করলেন, তাঁর চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। হানিফা নামের মেয়েটির জন্যে খারাপ লাগছে। বেশ খারাপ লাগছে। মেয়ে জাতটাই হচ্ছে মায়াবতীর জাত। কখন যে এই মেয়েটি মায়ায় জড়িয়ে ফেলেছে, নিজেই বুঝতে পারেননি।

হানিফার সঙ্গে তাঁর আর কোনোদিন দেখা হবে না। ওঁরা নিশ্চয়ই তাঁদের মেয়েকে নিয়ে এখানে আসবেন না। তিনি নিজেও যাবেন না। কারণ তিনি কোনো পিছুটান রাখতে চান না। কিংবা কে জানে, একদিন হয়তো যাবেন। দেখবেন ঝড়ের রাতে পাওয়া ভিখিরি মেয়েটিকে রাজরাণী বেশে কেমন লাগছে। সে কি মনে রাখবে তার দুঃসহ শৈশব ? যদি রাখে, তবেই সে জীবনে অনেক বড় হবে। এবং তার ধারণা, এই মেয়েটি তা মনে রাখবে।

মিসির আলি চোখ মুছে নিজের ঘরে ঢুকলেন। বারবার চোখ ভিজে উঠছে কেন ? তাঁর মতো একজন শুকনো ধরনের মানুষের হৃদয়ে এত ভালোবাসা কোত্থেকে এল ?

দরজায় নক হচ্ছে। কে এল এত রাতে ?

মিসির আলি দরজা খুলে অবাক হয়ে দেখলেন—আকন্দ সাহেব। তাদের গাড়ি দূরে দাঁড়িয়ে। তিনি শুধু একা নেমে এসেছেন। মিসির আলি অবাক হয়ে বললেন, কী ব্যাপার!

বাসার কাছাকাছি পৌঁছার পর মনে হলো, আপনাকে আমি যথাযথ ধন্যবাদ দিইনি।

ধন্যবাদের কোনো প্রয়োজন নেই।

আপনার নেই। আপনি সাধারণ মানুষের ঊর্ধ্বে। কিন্তু আমি নিতান্তই সাধারণ মানুষ।

ভদ্রলোক জড়িয়ে ধরলেন মিসির আলিকে এবং ছেলেমানুষের মতো চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। ভদ্রলোকের স্ত্রী হানিফাকে নিয়ে নেমে এসেছেন গাড়ি থেকে। তিনি শক্ত করে হানিফার হাত ধরে রেখেছেন, যেন হাত ছেড়ে দিলেই মেয়েটি পালিয়ে যাবে।

মিসির আলি কোমল স্বরে বললেন, শান্ত হোন। আপনি শান্ত হোন। আসুন, ভেতরে গিয়ে বসি।

ভদ্রলোক ধরা গলায় বললেন, প্লিজ, আরও কিছুক্ষণ আপনাকে জড়িয়ে রাখার সুযোগ দিন। প্লিজ।

২২

বুধবার। সময় রাত দশটা চল্লিশ।

ওসমান সাহেবের ঘুমের সময় হয়ে গিয়েছে। ইদানীং তিনি সিডাকসিন না খেয়ে ঘুমাতে পারেন না। তিনি উঠলেন। একটি সিডাকসিন ট্যাবলেট খেয়ে মাথায় পানি ঢাললেন, হাত-মুখ ধুলেন। বিছানায় যাওয়ার আগে রোজকার অভ্যেসমতো উঁকি দিলেন ফিরোজের ঘরে। গত তিনদিন তিন রাত ধরে ফিরোজ তার ঘরে আটক। দু'দিন দু'রাত সে ছটফট করেছে, জিনিসপত্র ভেঙেছে, খাবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজ সারা দিন তেমন কিছু করেনি। ভাত-টাত কিছুই খায়নি, তবে কোনোরকম চিৎকার এবং হৈচৈ করেনি। এখন সম্ভবত করবে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার পাগলামি বাড়ে, অস্থিরতা বাড়ে।

ওসমান সাহেব ফিরোজের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বেশ অবাক হলেন। ফিরোজ শান্ত ভঙ্গিতে বসে আছে। গায়ে একটি শার্ট। চুল আঁচড়িয়েছে। মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি নেই। শেভ করেছে। এবং সম্ভবত গোসলও করেছে। ওসমান সাহেব নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না।

কেমন আছ ফিরোজ ?

ফিরোজ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল এবং সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল, ভালো আছি। তুমি কেমন আছ বাবা ?

ভালো ভালো। আমি ভালো, বেশ ভালো।

ওসমান সাহেবের বিস্ময়ের সীমা রইল না। কী অদ্ভুত কাণ্ড! ফিরোজ কি সুস্থ ? নিশ্চয়ই সুস্থ।

বাবা, মাকে ডাক। খিদে পেয়েছে, ভাত খাব।

নিশ্চয়ই খাবি। নিশ্চয়ই। কী দিয়ে খাবি ?

যা আছে, তাই দিয়ে খাব। স্পেশাল কিছু লাগবে না।

লাগবে না কেন ? নিশ্চয়ই লাগবে। দাঁড়া ডাকছি। তোর মাকে ডাকছি। তোর শরীরটা এখন ভালো, তাই না ?

হ্যাঁ ভালো। বাবা, আমার ঘরটা খুব নোংরা হয়ে আছে, একটা ঝাড়ু দিতে বলো। তালা খোলার দরকার নেই। জানালা দিয়েই দাও।

ওসমান সাহেব ঝাড়ু এনে দিলেন এবং ছুটে গেলেন স্ত্রীকে খবর দিতে। ফরিদাকে ঘুম ভাঙিয়ে তুলে এনে দেখেন, ফিরোজ ঘর মোটামুটি পরিষ্কার করে ফেলেছে। কত সহজ এবং স্বাভাবিক তার ব্যবহার। ফরিদার চোখে পানি এসে গেল।

মা, ভাত দাও আমাকে। খুব খিদে লেগেছে।

দিচ্ছি বাবা, দিচ্ছি। এক্ষুনি দিচ্ছি।

জানালার শিকের ফাঁক দিয়ে দিও না মা। নিজেকে জন্তুর মতো লাগে। মনে হয় আমি চিড়িয়াখানার একটা পশু।

না না, জানালা দিয়ে খাবার দেব না। টেবিলে খাবার দিচ্ছি। তুই চেয়ার-টেবিলে বসে খাবি।

আর শোনো মা, আমার বিছানার চাদর-টাদর বদলে দাও। ধবধবে সাদা চাদর দেবে।

দিচ্ছিরে বাবা, দিচ্ছি।

আনন্দে ফরিদা বারবার মুখ মুছতে লাগলেন। সব ঠিক হয়ে গেছে। আর কোনো সমস্যা নেই। তাদের দুঃস্বপ্নের রাত শেষ হয়েছে।

খাবার টেবিলে ভাত সাজিয়ে ওসমান সাহেব ফিরোজের ঘরের তালা খুললেন। ফিরোজ বেরিয়ে এল। তার হাতে লোহার রড। তার পরনে একটি কালো প্যান্ট, খালি গা। সে থমথমে গলায় বলল, কি, ভয় লাগছে ? ভয়ের কিছু নেই। মিসির আলির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। ও আমার চিকিৎসা করবে।

ওসমান সাহেব একটি কথাও বলতে পারলেন না। ফিরোজ হেঁটে হেঁটে গেল গেটের কাছে। দারোয়ানকে ঠান্ডা গলায় বলল গেট খুলে দিতে। দারোয়ান গেট খুলে দিল।

টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশে মেঘের পরে মেঘ জমতে শুরু করেছে। রাস্তায় কেন যে স্ট্রিট লাইট নেই। ফিরোজ লম্বা পা ফেলে অন্ধকারে নেমে গেল।

২৩

বুধবার।

জাহিদ সাহেব রাত এগারটার দিকে একজন ডাক্তার ডেকে আনলেন।

নীলুর আকাশপাতাল জ্বর। তিনি নিজে হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন। ডাক্তারের অবস্থাও তাই। ডাক্তার মুখ শুকনো করে বলল, এই মেয়েকে এক্ষুনি হাসপাতালে নিতে হবে। আমি আমার ডাক্তারি জীবনে এত জ্বর কারও দেখিনি। আপনি মেয়েটির মাথায় বরফ চাপা দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। আগে টেম্পারেচার কমাতে হবে।

ফ্রিজে বরফ ছিল না। তারা দু'জন ধরাধরি করে নীলুকে বাথরুমে নিয়ে ঝরনার কল খুলে দিল। পানির ধারার স্রোতে যদি গায়ের তাপ কমানো যায়।

নীলু পড়ে আছে মরার মতো। তার চোখ রক্তবর্ণ। সে কিছুক্ষণ পরপরই মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে এবং ফিসফিস করে বলছে, স্যারের বড় বিপদ। তুমি কি তাকে দেখবে না ? এইটুকু কি তুমি আমার জন্য করবে না ?

জাহিদ সাহেব ডাক্তারকে বললেন, এইসব কী বলছে ডাক্তার সাহেব ?

প্রলাপ বকছে। ডেলিরিয়াম। আপনি মেয়ের কাছে থাকুন, আমি এ্যাম্বুলেন্সের জন্যে যাচ্ছি। টেলিফোন আছে তো ?

জি আছে। বসার ঘরে।

ডাক্তার সাহেব দ্রুত নিচে নেমে গেলেন। নীলু কাতর স্বরে বলল, বাবা, তুমি খানিকক্ষণ আমাকে একা থাকতে দাও। আমি ওর সঙ্গে কথা বলি।

কার সঙ্গে কথা বলবি ?

যে আমার সঙ্গে থাকে, তার সঙ্গে। ওর সাহায্য আমার ভীষণ দরকার। বাবা প্লিজ। প্লিজ। তুমি আছ বলে সে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারছে না। বাবা, আমি তোমার পায়ে পড়ি।

নীলু সত্যি সত্যি হাত বাড়িয়ে বাবার পা স্পর্শ করল। জাহিদ সাহেব বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই চাঁপা ফুলের তীব্র সুবাস পেলেন।

স্পষ্ট শুনলেন নূপুর পায়ে কে যেন হাঁটছে। নীলুর কথাও শোনা যাচ্ছে, আমার এত বড় বিপদে তুমি আমাকে দেখবে না ?

অপরিচিত একটি কণ্ঠ শোনা গেল। জাহিদ সাহেব কিছু বুঝতে পারলেন না। তিনি একমনে আয়াতুল কুরসি পড়তে লাগলেন।

২৪

বুধবার মধ্যরাত্রি।

মিসির আলির রুটিনের ঝামেলা শুরু হয়ে গেছে। ঘরে রান্না হয়নি। তাঁকে রাতে হোটেলে খেয়ে আসতে হয়েছে। ডাল-গোশত নামের যে খাদ্যটি তিনি কিছুক্ষণ আগে গলাধঃকরণ করেছেন, তা এখন জানান দিচ্ছে। মিসির আলি পেটে ব্যথা নিয়ে জেগে আছেন। ফুড পয়জনিং-এর লক্ষণ কি না কে জানে! পেটের ব্যথা ভুলে থাকবার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে, থ্রিলার জাতীয় কোনো রচনায় মনোনিবেশ করা। কিন্তু ঘরে এ জাতীয় কোনো বই নেই। তবু মিসির আলি বুক সেলফের কাছে গেলেন। সবই একাডেমিক বই। একটি সায়েন্স ফিকশন পাওয়া গেল—Horseman from the Sky. তেমন কোনো ইন্টারেস্টিং বই নয়। আগে একবার পড়েছেন। তবুও সেই বই হাতে নিয়েই বিছানায় গেলেন এবং তখন ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। বৃষ্টি ও বাতাস দুই-ই থেমে গেছে, তবুও। মাঝরাতে লোডশেডিং হওয়ার কথা নয়, কিন্তু ঢাকা শহরের ইলেকট্রিসিটির কোনো ঠিকঠিকানা নেই।

মিসির আলি অত্যন্ত বিরক্ত মুখে ড্রয়ার খুললেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, ড্রয়ারে বড় বড় দু'টি মোমবাতি পাওয়া গেল। হানিফা নিশ্চয়ই একসময় কিনে রেখে দিয়েছে। মিসির আলি মোমবাতি জ্বালিয়ে বই খুললেন। দ্বিতীয়বার পড়বার সময় বইটি অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি শারীরিক ব্যথা ভুলে আগ্রহ নিয়ে বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলেন। চমৎকার লেখা—এক ভোরবেলায় মস্কো শহরের প্রাণকেন্দ্রে এক ঘোড়সওয়ারের আগমন হলো। লোকটির চেহারা কুৎসিত। মাথায় সার্কাসের ক্লাউনের টুপির মতো এক টুপি। সে তার ঘোড়া নিয়ে নানান খেলা দেখাতে শুরু করল। দেখতে দেখতে তাকে ঘিরে ভিড় জমে গেল।

এত মজার একটি বই আগেরবার পড়তে এত বাজে লাগছিল কেন ? পাঠকের জন্ম ? মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। চা বানাবেন। চা খেতে খেতে আরাম করে পড়া যাবে। তাঁর মনে হলো মোমবাতির আলোয় বই পড়ায় আলাদা একটা আনন্দ আছে। আধো

আলো আধো ছায়া। বইয়ের জগতটিও তো তাই—অন্ধকার এবং আলোর মিশ্রণ। লেখকের কল্পনা হচ্ছে আলো, পাঠকের বিভ্রান্তি হচ্ছে অন্ধকার। নিজের তৈরি উপমা নিজের কাছেই চমৎকার লাগল তাঁর। তিনি নিজেকে বাহবা দিয়ে সিগারেটের জন্যে পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিতেই দরজায় খুব হালকাভাবে কে যেন কড়া নাড়ল।

মিসির আলি ঘড়ি দেখলেন, রাত প্রায় একটা। এত রাতে কে আসবে তাঁর কাছে। তিনি বিস্মিত স্বরে বললেন, কে, কে ?

কোনো জবাব পাওয়া গেল না। মিসির আলি গলা উঁচিয়ে বললেন, কে ওখানে ?

আমি।

মিসির আলির বিস্ময়ের সীমা রইল না। নীলুর গলা। সে এত রাতে এখানে কী করছে ? পাগল নাকি ?

কী ব্যাপার নীলু ?

নীলু জবাব দিল না। ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। মিসির আলি ছুটে গিয়ে দরজা খুললেন। নীলু নয়, ফিরোজ দাঁড়িয়ে আছে।

ফিরোজের দু'টি হাত পেছন দিকে। সে-হাতে সে কী ধরে আছে তা মিসির আলির বুঝতে অসুবিধা হলো না। তাঁর শিরদাঁড়া দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। তিনি হাসতে চেষ্টা করলেন।

কেমন আছ ফিরোজ ? নীলুর গলা তো চমৎকার ইমিটেট করলে। এসো, ভেতরে এসো। ইস, ভিজে গেছ দেখি।

ফিরোজ ভেতরে ঢুকল। পলকের জন্যে মিসির আলির ইচ্ছা করল ছুটে পালিয়ে যেতে। কিন্তু তিনি পারলেন না। তাঁর পা পাথরের মতো ভারী হয়ে গেছে। অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলার চেষ্টা করলেন।

কিছু খাবে ফিরোজ ? চা খাবে ? ঠান্ডায় চা-টা ভালো লাগবে। ইনফ্যাক্ট আমি চা বানানোর জন্যেই উঠেছিলাম।

ফিরোজ দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝখানে। সে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে। সে মাঝে মাঝে ঠোঁট টিপে হাসছে।

মিসির আলি বললেন, বসো ফিরোজ, দাঁড়িয়ে আছ কেন ? এতক্ষণ শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলাম। একটা সায়েন্স ফিকশন। তুমি কি সায়েন্স ফিকশন পড় ?

ফিরোজ এবার শব্দ করে হাসল। মিসির আলি শিউরে উঠলেন। কী অমানুষিক হাসি! এই হাসির জন্ম পৃথিবীতে নয়, অন্য কোনো ভুবনে। অচেনা ভয়ঙ্কর এক ভুবন, যার কোনো রহস্যই মিসির আলির জানা নেই। মিসির আলির সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেল। তিনি বহু কষ্টে বললেন, তুমি কি আমাকে মেরে ফেলবে ফিরোজ ?

হ্যাঁ।

কেন ফিরোজ ? আমি কি তোমার ক্ষতি করেছি ?

ফিরোজ তার জবাব দিল না। লোহার রডটি উঁচু করল। মিসির আলি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। চিৎকার দিতে ইচ্ছে করল, চিৎকার দিতে পারলেন না। তাঁর কাছে শুধু মনে হলো, মোমবাতির আলো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠছে এবং আশ্চর্যের ব্যাপার—ছেলেবেলার একটি স্মৃতি তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমের এক দুপুরে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ব্রহ্মপুত্রের শীতল জলে। ঠান্ডা ও ভারী সেই পানি। মাছের চোখের মতো সেই স্বচ্ছ জলে ইচ্ছে করে তলিয়ে যেতে।

মৃত্যুর আগে গত জীবন চোখের সামনে একবার হলেও ভেসে ওঠে, এটা কি সত্য ? হয়তো সত্য। নয়তো হঠাৎ করে ভুলে যাওয়া শৈশবের এই ছবি চোখে ভাসবে কেন ?

মিসির আলি কিছু-একটা বলতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু বলতে পারলেন না। তার আগেই লোহার রড প্রচণ্ড বেগে নেমে এল তাঁর দিকে। চারদিকে সীমাহীন অন্ধকার। তীব্র ও তীক্ষ্ণ ব্যথা। এক গভীর শূন্যতা। মিসির আলি বুঝতে পারছেন, তিনি তলিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর চারদিকে সীমাহীন জলরাশি। তিনি কিছু বলতে চেষ্টা করলেন, বলতে পারলেন না।

মিসির আলি। মিসির আলি। তাকাও তুমি। তাকিয়ে দেখো।

মিসির আলি চোখ মেললেন। মোমবাতি জ্বলছে। আলো এবং আঁধার। তিনি কি বেঁচে আছেন ? নাকি এটা মৃত্যুর পরের কোনো জগৎ ? কোনো অদেখা ভুবন ?

মিসির। মিসির।

কে কথা বলে ? কোত্থেকে আসছে কিন্নর কণ্ঠ। ঘাড় ঘুরিয়ে কিছু দেখার উপায় নেই। সমস্ত শরীর অসহ্য ব্যথায় কুঁকড়ে যাচ্ছে। নিঃশ্বাস নিতে এত কষ্ট। এত কষ্টও আছে পৃথিবীতে ? কোথায়, ফিরোজ কোথায় ?

মিসির। মিসির আলি। আর কোনো ভয় নেই। সে পালিয়ে গেছে। আমি এসেছি। তাকাও। তাকাও আমার দিকে।

কে পালিয়ে গেছে ? কে কথা বলছে ? কার দিকে তাকাতে বলছে ? মিসির আলি তাকাতে গিয়ে ব্যথায় নীল হয়ে গেলেন। মুখ ভর্তি করে বমি করলেন। টকটকে লাল রক্ত এসেছে বমিতে। ফুসফুস ফুটো হয়েছে। পাঁজরের হাড় ঢুকে গেছে ফুসফুসে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে এই কারণে।

মিসির আলির চোখে জল এসে গেল। এত কষ্ট, এত কষ্ট!

মিসির, মিসির।

কে তুমি ?

তাকিয়ে দেখো।

মিসির আলি তাকালেন। যন্ত্রণা এবং ব্যথার জন্যেই কি তিনি এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখছেন ? হেলুসিনেশন ? হেলুসিনেশন।

মিসির আলি, আমি কে বলো তো।

জানি না কে।

ভালো করে দেখো, ভালো করে দেখো। চোখ নামিয়ে নিচ্ছ কেন ? আমার সঙ্গে কথা বলতে থাকো, তাতে ব্যথা ভুলে থাকবে। বলো আমি কে ?

মিসির আলি আবার মুখ ভর্তি করে বমি করলেন।

আমিই সেই দেবী। তুমি তো আমাকে বিশ্বাস করো না। নাকি এখন করছ ?

তুমি আমার কল্পনা। উইশফুল থিংকিং। দেবী আবার কী ?

আমিই কিন্তু তোমাকে বাঁচিয়েছি।

দেবীমূর্তি খিলখিল করে হেসে উঠল। কী চমৎকার হাসি! কী অপূর্ব সুরধ্বনি! ঘরে চাঁপা ফুলের গন্ধ, তীব্র সৌরভ। হেলুসিনেশন। হেলুসিনেশন হচ্ছে। হেলুসিনেশন ছাড়া এ আর কিছুই নয়।

দেবী হাসল। চাঁপা ফুলের গন্ধ কি দেবীর গা থেকেই আসছে ? তাকে রক্তমাংসের মানবীর মতোই লাগছে। ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু কী কষ্ট! কী কষ্ট! মিসির আলি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, দেবী, আমার কষ্ট কমিয়ে দাও।

আমাকে বিশ্বাস করছ তাহলে ?

না।

কেন করছ না ? এ জগতের সমস্তই কি যুক্তিগ্রাহ্য ? এই আকাশ, অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জ ? তুমি কি বলতে চাও এর কোথাও কোনো রহস্য নেই ? অসীম কী ? এই সামান্য প্রশ্নের জবাব কি তোমার জানা আছে ? বলো, তুমি জানো ?

আজ জানি না, কিন্তু একদিন জানব। আমি না জানলেও আমার পরবর্তী বংশধর জানবে।

মিসির আলি, তুমি বড় অদ্ভুত লোক।

মিসির আলি কাতর কণ্ঠে বললেন, আমার ব্যথা কমিয়ে দাও। আমার ব্যথা কমিয়ে দাও।

দেবী হেসে উঠল। মৃদুস্বরে বলল, আমায় বিশ্বাস করছ না, অথচ ব্যথা কমিয়ে দিতে বলছ ?

বড় কষ্ট, বড় কষ্ট!

তোমার বন্ধু চলে আসছে। তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। তুমি আবার সুস্থ হয়ে উঠবে। এবং মজার ব্যাপার কী জানো ? নীলুর সঙ্গে বিয়ে হবে তোমার। যদি কোনোদিন হয়, আমার কথা মনে করো।

মিসির আলি আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে লাগলেন। তিনি দেবীর কথা এখনো শুনতে পাচ্ছেন। কী অপূর্ব কণ্ঠ! কী অলৌকিক সৌন্দর্য! কিন্তু এ সবই মায়া। অসুস্থ ব্যথা-জর্জরিত মনের সুখকল্পনা। প্রকৃতি চাচ্ছে নারকীয় কষ্ট থেকে তাঁর মন ফিরিয়ে নিতে।

সেজন্যেই সুখের স্বপ্ন দেখিয়ে তাঁকে ভোলাচ্ছে। হয়তো নীলুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে। তাতে কিছুই প্রমাণিত হয় না। প্রমাণ বড় কঠিন জিনিস। বড় কঠিন।

মিসির আলি কাতর কণ্ঠে বললেন, কষ্ট কমিয়ে দাও। কষ্ট কমিয়ে দাও।

অপরূপা নারীমূর্তি চাঁপা ফুলের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে দূরে সরে যাচ্ছে। তার পায়ে ঝুমঝুম করছে নূপুর। কে যেন দরজা ধাক্কা দিচ্ছে। কে সে ? সাজ্জাদ হোসেন ? ওরা কি ধরে ফেলেছে ফিরোজকে ? ওকে সুস্থ করে তুলতে হবে। ইসিটি দিয়ে দেখলে হয়। কিংবা কে জানে হয়তো এখন সে সুস্থ। তাঁকে একবার আঘাত করেই তার চেতনা ফিরে এসেছে।

হানিফা। হানিফা কেমন আছে ? কোথায় আছে ? সুখে আছে তো ?

আহ্ বড় কষ্ট! কেউ আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। ঘুম পাড়িয়ে দাও। আমি তলিয়ে যেতে চাই অতল অন্ধকারে। বড় কষ্ট, বড় কষ্ট।

সাজ্জাদ হোসেন দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন। টর্চের আলো ফেললেন মিসির আলির মুখে। সাজ্জাদ হোসেনের মুখে এক ধরনের প্রশান্তি লক্ষ করা গেল। কারণ, নগ্নগাত্র আগন্তুককে কিছুক্ষণ আগেই ধরা হয়েছে। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, পুলিশকে সে প্রথম যে কথাগুলি বলে তা হচ্ছে, আপনারা স্যারকে বাঁচানোর চেষ্টা করুন। এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে যান। আর আমার বাবাকে টেলিফোন করে বলুন, আমি ভালো হয়ে গেছি। স্যারের বাসায় একজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে আমাকে ভালো করে দিয়েছে।

গল্পের অধিকাংশ চরিত্রই কাল্পনিক। পরিচিত কিছু চরিত্র এবং কিছু ঘটনা ব্যবহার করেছি। তবে কাউকে হেয় করবার জন্যে করা হয়নি। মানুষের প্রতি আমার মমতা মিসির আলির মতো হয়তো নয়, কিন্তু খুব কমও নয়।

কিশোর উপন্যাস

সূর্যের দিন

এ বাড়ির নিয়ম হচ্ছে যাদের বয়স চৌদ্দর নিচে, তাদের বিকেল পাঁচটার আগে ঘরে ফিরতে হবে। যাদের বয়স আঠারোর নিচে, তাদের ফিরতে হবে ছ'টার মধ্যে।

খোকনের বয়স তেরো বছর তিন মাস। কাজেই তার বাইরে থাকার মেয়াদ পাঁচটা। কিন্তু এখন বাজছে সাড়ে সাতটা। বাড়ির কাছাকাছি এসে খোকনের বুক শুকিয়ে তৃষ্ণা পেয়ে গেল। আজ বড়চাচার সামনে পড়ে গেলে ভূমিকম্প হয়ে যাবে।

অবশ্যি চমৎকার একটি গল্প তৈরি করা আছে। খোকন ভেবে রেখেছে সে মুখ কালো করে বলবে, সাজ্জাদের সঙ্গে স্কুলে খেলছিলাম, হঠাৎ দেখলাম বিরাট একটা মিছিল আসছে। সবাই খুব স্লোগান দিচ্ছে, 'জাগো বাঙালি জাগো'। আমরা দূর থেকে দেখছি। এমন সময় গণ্ডগোল লেগে গেল। পুলিশের গাড়ির ওপর সবাই ইটপাটকেল মারতে লাগল। চারদিকে হইচই, ছোটাছুটি। আমি সাজ্জাদকে সঙ্গে নিয়ে ছুটতে লাগলাম। পেছনে চারদিকে পটাপট শব্দ হচ্ছে, বোধহয় গুলি হচ্ছে। আমরা আর পেছন ফিরে তাকাইনি, ছুটছি তো ছুটছিই। ফিরতে দেরি হলো এইজন্যে।

খুবই বিশ্বাসযোগ্য গল্প। আজকাল রোজই মিছিল হচ্ছে। আর রোজই গণ্ডগোল হচ্ছে। মিছিলের ঝামেলায় পড়ে যাওয়ার কথা সবাই বিশ্বাস করবে।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, বড়চাচাকে ঠিক সাধারণ মানুষের পর্যায়ে ফেলা যায় না। তাঁর সম্ভবত তিন নম্বর চোখ বলে কিছু আছে যা দিয়ে তিনি অনেকদূর পর্যন্ত দেখে ফেলেন। কথা বলতে শুরু করেন অত্যন্ত নিরীহ ভঙ্গিতে। ভাবখানা এরকম যেন কিছুই জানেন না। সেবারের ঘটনাটাই ধরা যাক। ফজলুর পাল্লায় পড়ে ফার্স্ট শো সিনেমা (গোলিয়াথ অ্যান্ড দ্য ড্রাগন, খুবই মারাত্মক ছবি) দেখে বাড়িতে পা দেওয়ামাত্র বড়চাচার সামনে পড়ে গেল। বড়চাচা হাসিমুখে বললেন, এই যে খোকন, এইমাত্র ফিরলে বুঝি ?

জি চাচা।

একটু মনে হয় দেরি হয়ে গেছে।

অঙ্ক করছিলাম।

তাই নাকি ?

জি। ফজলুর এক মামা এসেছেন। খুব ভালো অঙ্ক জানেন। উনি দেখিয়ে দিচ্ছিলেন।

পাটিগণিত ?

জি পাটিগণিত। পাটিগণিতই উনি ভালো জানেন। তৈলাক্ত বাঁশের অঙ্কটা আজ খুব ভালো বুঝেছি।

বড়চাচা দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, একটা মুশকিল হয়ে গেল খোকন। তোমার দেরি দেখে ফজলুদের বাসায় লোক পাঠানো হয়েছিল। সে কিন্তু তোমাদের দেখতে পায়নি।

খোকন মহা বিপদেও মাথা ঠান্ডা রাখতে পারে। এবারও পারল। হাসিমুখে বলল, আমরা তো ফজলুর বাসায় অঙ্ক করছিলাম না। ওদের বাসায় খুব গণ্ডগোল হয় তো, তাই আমরা জহিরদের বাসায় গেলাম।

এটা ভালোই করেছ। পড়াশোনা করার জন্যে নিরিবিলি দরকার। ফজলুর মামা যে তোমাদের জন্যে এতটা কষ্ট স্বীকার করেছেন সেজন্যে তুমি তাঁকে আমার হয়ে ধন্যবাদ দিয়ো।

জি চাচা, দেব।

আর তুমি তাঁকে আগামীকাল আমাদের বাসায় চা খেতে বলবে। তুমি নিজে গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসবে, কেমন ?

খোকন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বড়চাচা চশমার কাচ পরিষ্কার করতে করতে বললেন, খোকন, কী সিনেমা দেখলে ?

এই হচ্ছেন বড়চাচা। এরকম একজন মানুষের ভয়ে যদি কারও বুক কাঁপে তাহলে বোধহয় তাকে ভীরু বা কাপুরুষ বলা ঠিক হবে না। খোকন এই ঠান্ডার মধ্যেও ঘামতে লাগল।

তবে একতলার সবচেয়ে বাঁ-দিকের ঘরটিতে আলো জ্বলছে। এটা একটা সুলক্ষণ। এর মানে হচ্ছে বড়চাচার কাছে মক্কেল এসেছে। তিনি মামলার নথিপত্র নিয়ে ব্যস্ত। খোকন এত রাত পর্যন্ত বাইরে এটা বোধহয় এখনো ধরতে পারেননি। যা হওয়ার হবে। খোকন খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল।

কিন্তু আশ্চর্য, কিছুই হলো না। সবাই যেন কেমন খুশি খুশি। উৎসব উৎসব একটা ভাব। ছোটরা চিৎকার চেঁচামেচি করছে। কেউ তাদের বকছে না। বড়চাচি পান বানাতে বানাতে কী একটা গল্প বলে হেসে গড়িয়ে পড়ছেন। ঈদের আগের রাতে যেরকম একটা আনন্দভাব থাকে, চারদিকের অবস্থা সেরকম। কিছু ঘটেছে, কিন্তু এখনই কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে না। খোকন এমন ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াতে লাগল যেন সে সারাক্ষণ বাড়িতেই ছিল। অনজু আর বিলু সাপলুডু খেলছিল। ওদের পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। বিলুটা মহা চোর। তার পড়েছে চার কিন্তু সে পাঁচ চেলে তরতর করে মই বেয়ে উঠে গেল। পরেরবার উঠল পাঁচ, একেবারে সাপের মুখে। সে আবার চালল চার। অনজুটা এমন বোকা কিছুই বুঝতে পারছে না। খোকন বলল, এসব কী হচ্ছে বিলু ?

কিছুই হচ্ছে না। তুমি মেয়েদের খেলায় কথা বলতে এসেছ কেন ? কোথায় ছিলে সারা সন্ধ্যা ?

ঘরেই ছিলাম। যাব আবার কোথায় ?

খোকন সেখানে আর দাঁড়াল না। চলে এল দোতলায়। বাবার ঘরে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'প্যাথলজি' শব্দের মানে কী ? যাতে বাবা বুঝতে পারেন সে পড়াশোনা নিয়েই আছে।

বাবাকে কিছু জিজ্ঞেস করা মুশকিল। তিনি অল্পকথায় কোনো জবাব দিতে পারেন না। 'প্যাথলজি' শব্দের মানে বলতে তিনি পনেরো মিনিট সময় নিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের

কথা বললেন, ভেষজবিজ্ঞানের ইতিহাস বললেন, শারীরবিদ্যায় প্রাচীন গ্রিকদের অবদানের কথা বললেন। খোকন চোখ বড় বড় করে শুনল। তার ভঙ্গিটা এরকম যেন সে খুব মজা পাচ্ছে। বাবা বক্তৃতা শেষ করে বললেন, যা যা বললাম সব খাতায় লিখে রাখবে।

জি রাখব।

লিখবার আগে ছোটদের এনসাইক্লোপিডিয়াটাও দেখে নেবে। আমি হয়তো অনেক পয়েন্ট মিস করেছি।

আমি দেখে তারপর লিখব।

গুড। আর শোনো, সন্ধ্যাবেলা তোমার মা তোমার খোঁজ করছিলেন। সারা বিকাল তুমি তার কাছে যাওনি। চারদিকে ঝামেলা টামেলা হচ্ছে, সে খুব চিন্তিত থাকে। যাও, দেখা করে আসো।

মা থাকেন দোতলায় সবচেয়ে শেষ ঘরটায়। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন। হার্টের খুব খারাপ ধরনের একটা অসুখ, যাতে একটুও নড়াচাড়া করা যায় না। রাতেরবেলা একজন অ্যাংলো নার্স মিস গ্রিফিন এসে মা'র সঙ্গে থাকে। সে ছেলেদের মতো সিগারেট খায়। বাচ্চারা কেউ শব্দ করে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলেই প্রচণ্ড ধমক দেয়।

মিস গ্রিফিন মা'র ঘরের সামনের বারান্দায় বসে সিগারেট টানছিল। খোকনকে দেখেই ভ্রূ কুঁচকে বলল, কী চাও তুমি ?

মা'র কাছে যাব।

এখন না। এখন ঘুমাচ্ছে। সকালে আসবে। গো অ্যাওয়ে।

খোকন নিচে নেমে এসে দেখল টেবিলে ভাত দেওয়া হয়েছে। ফার্স্ট ব্যাচ খেতে বসবে। ফার্স্ট ব্যাচ হচ্ছে বাচ্চাদের, যাদের বয়স পনেরোর নিচে, তাদের। এদের সঙ্গে বসে খেতে খোকনের লজ্জা লাগে। কিন্তু কিছু করার নেই, বড়চাচার নিয়ম। কবির ভাই গত নভেম্বরে পনেরোতে পড়েছেন। কাজেই তিনি এখন গম্ভীর মুখে সেকেন্ড ব্যাচ বড়দের সঙ্গে খেতে বসেন। ফার্স্ট ব্যাচ খেতে বসলেই এক ফাঁকে এসে বলেন, আহ্ বড্ড গণ্ডগোল হচ্ছে। খাওয়ার সময় এত কথা কিসের ? খোকনের গা জ্বলে যায়। কিন্তু সহ্য করা ছাড়া উপায় কী ?

খেতে বসেই খোকন জানতে পারল কী জন্যে আজ বাড়িতে এমন খুশি খুশি ভাব। ছোটচাচারা আমেরিকা থেকে ঢাকা চলে আসছেন। বিদেশ আর ভালো লাগছে না। আনন্দে খোকন বিষম খেয়ে ফেলল। ছোটচাচা এখন থেকে এ বাড়িতেই থাকবেন, এরচেয়ে আনন্দের খবর আর কিছু হতে পারে নাকি ?

ছোটচাচা ফুর্তি ছাড়া এক মিনিটও থাকতে পারেন না। সবসময় তাঁর মাথায় মজার মজার সব ফন্দি আসে। খোকন যখন ক্লাস থ্রিতে পড়ে তখন তিনি একবার ঠিক করলেন,

ঢাকা শহরের ভিক্ষুকদের গড় আয় কী তা নিয়ে একটা সমীক্ষা চালাবেন। সমীক্ষার বিষয় হচ্ছে, একজন ভিক্ষুক দৈনিক কত আয় করে। তারপর একদিন সত্যি সত্যি নকল দাড়িগোঁফ লাগিয়ে ময়লা একটা লুঙ্গি পরে খালিগায়ে ভিক্ষা করতে বেরুলেন। দুপুর তিনটার মধ্যে আড়াই সের চাল, এক টাকা পঁয়ত্রিশ পয়সা এবং একটা ছেঁড়া হলুদ রঙের সোয়েটার পেয়ে গেলেন। গম্ভীর হয়ে বললেন, পেশা হিসেবে ভিক্ষাবৃত্তি খুব খারাপ না। যে লোক এমন একটা কাণ্ড করে তাকে ভালো না বেসে পারা যায়?

খোকন খাওয়া শেষ করে যখন হাতমুখ ধুচ্ছে তখন বড়চাচা বেরুলেন তাঁর ঘর থেকে। খোকনের সামনে দাঁড়িয়ে শান্তস্বরে বললেন, সাতটা বাজার দশ মিনিট আগে আমি তোমাকে এ বাড়িতে দেখিনি, কোথায় ছিলে? খোকন বলতে চেষ্টা করল, বাথরুমে ছিলাম। বলতে পারল না। কথা গলা পর্যন্ত এসে আলজিবে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল। বড়চাচা দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, চারদিকে হাঙ্গামা-হুজ্জত হচ্ছে। এর মধ্যে তুমি বাইরে। স্বাধীনতা বেশি পেয়ে যাচ্ছ। যাই হোক, তুমি কোথায় ছিলে কী করছিলে তা শুদ্ধ বাংলায় লিখে আজ রাত দশটার মধ্যে আমার কাছে জমা দেবে।

জি আচ্ছা।

কাল সারা দিন ঘর থেকে বেরুবে না। সারা দিন থাকবে দোতলায়। নিচে নামবে না।

জি আচ্ছা।

মিছিল-টিছিলে গিয়েছিলে নাকি?

জি-না।

আচ্ছা ঠিক আছে, যাও।

খোকন দোতলায় তার নিজের ঘরে এসে মুখ কালো করে বসে রইল। কী জন্যে আজ ফিরতে দেরি হয়েছে তা লেখাটা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারল না। বিষয়টা গোপনীয়। কিন্তু বড়চাচার কাছে গোপন করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? নির্ঘাৎ ধরে ফেলবেন।

খোকন একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সত্যি কথাই লিখতে শুরু করল। লেখা হলো সাধু ভাষায়।

> আজ (২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১) আমরা একটি গোপন দল করিয়াছি। দলটির নাম 'ভয়াল-ছয়'। দলের সদস্য সংখ্যা ছয়। সদস্যরা কিছুদিনের মধ্যেই পায়ে হাঁটিয়া পৃথিবী ঘুরিতে বাহির হইবে। আমাদের প্রথম গন্তব্য আফ্রিকার গহীন অরণ্য। কঙ্গো নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল।

২

প্রায় দশটা বাজে।

ভয়াল-ছয় বাহিনীর দু'জন সদস্যকে দেখা গেল খোকনদের বাড়ির সামনে হাঁটাহাঁটি করছে। দু'জন বেশ চিন্তিত। একজনের নাম শাহজাহান। সে বেশ বেঁটে। তার বন্ধুদের ধারণা, যতই দিন যাচ্ছে ততই সে বেঁটে হচ্ছে। ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় সে নাকি এতটা বেঁটে ছিল না। ক্লাসের ছেলেরা তাকে শাহজাহান ডাকে না, ডাকে 'বল্টু'। বেঁটে ছেলেদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা সাধারণত খুব লম্বা হয়। কিন্তু শাহজাহানের ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম আছে। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সাজ্জাদও সাইজে শাহজাহানের মতোই। সাজ্জাদ পড়াশোনা ও মারামারি দুটোতেই সমান দক্ষ বলে তার অন্য কোনো নাম নেই। ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় টুনু তাকে দুয়েকবার 'মুরগি' ডাকার চেষ্টা করেছে। সাজ্জাদ টিফিন টাইমে টুনুর নাকে গদাম করে একটা ঘুসি মেরে বলেছিল, আর মুরগি ডাকবি ? টুনু দুহাতে নাক চেপে বলল, না।

বল, কোনোদিন ডাকব না।

কোনোদিন ডাকব না।

টুনু মুরগি নাম দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করেনি। উল্টো তাকেই সবাই 'চীনা-মুরগি' ডাকতে শুরু করল। চীনা-মুরগিও ভয়াল-ছয় বাহিনীর একজন সদস্য। তারও খোকনদের বাসায় আসার কথা ছিল। আসতে পারেনি, কারণ তার ছোটভাই আজ সকালেই সাইকেলের নিচে পড়ে হাত ছিলে ফেলেছে। টুনুকে তার ভাইয়ের সঙ্গে হাসপাতালে যেতে হয়েছে। সাড়ে ন'টার মধ্যে টুনুর চলে আসার কথা। কিন্তু আসছে না। এদিকে খোকনও বেরুচ্ছে না বাড়ি থেকে। সাজ্জাদ বলল, কী করবি পল্টু ? গেট দিয়ে ঢুকবি খোকনদের বাড়ি ?

নাহ।

নাহ কেন ? খেয়ে তো ফেলবে না। দারোয়ানকে গিয়ে বলব, আমরা খোকনের বন্ধু।

তুই গিয়ে বল।

সাজ্জাদ সাহস করে গেট পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েও ফিরে এল। খোকনদের বাড়ির দারোয়ানটির চাউনি খুব আন্তরিক মনে হলো না তার কাছে। তার উপর একটি কুকুর আছে। গেটের কাছে যাওয়া মাত্রই সে এমন একটি ডাক ছাড়ল যাকে কুকুরের ডাক বলে মনে হয় না। বল্টু বলল, কিরে ভীতুর ডিম, গেলি না ভিতরে ?

বড়লোকের বাড়িতে ঢুকতে ইচ্ছা করে না।

বল্টু কিছু বলল না। কারণ এটি তারও মনের কথা। যে-বাড়ির ছেলেদের পাঁচ জোড়া জুতা থাকে সে-বাড়িতে ঢুকতে ভালো লাগে না। সাজ্জাদ বলল, ঢিল মারলে কেমন হয় ? খোকনের ঘরের জানালায় চল ঢিল মারি।

কোনটা ওর জানালা ?

সাজ্জাদ চুপ করে গেল। খোকনের ঘর কোনটি তা তার জানা নেই। একদিন মাত্র সে এসেছিল এ বাড়িতে। তাও ভেতরে ঢোকেনি। বল্টু বলল, চল দারোয়ানকে গিয়ে বলি ভিতরে খবর দিতে। খোকনকে গিয়ে বলবে, দু'জন বন্ধু এসেছে খুব জরুরি দরকার।

যদি না যায় ?

যাবে না মানে ? একশবার যাবে।

তাহলে তুই গিয়ে বল।

আমি একা বলব কেন ? আমার কী দায় পড়ল ?

দুজনের কাউকেই যেতে হলো না। দেখা গেল দারোয়ান নিজেই আসছে। গেটের ভেতরে তাকে যেরকম ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল এখন আর সেরকম মনে হচ্ছে না।

আপনাদের ডাকে।

কে ডাকে ?

বড়সাহেব। আসেন আমার সাথে।

বল্টু এবং সাজ্জাদ মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। বড় সাহেব মানে খোকনের বড়চাচা। তিনি তাদের ডাকবেন কেন শুধু শুধু! এই সময় টুনুকে আসতে দেখা গেল। সে বোধহয় কিছু একটা আঁচ করেছে। সাজ্জাদ দেখল—টুনু দাঁড়িয়ে পড়েছে। পরমুহূর্তেই টুনুকে লম্বা লম্বা পা ফেলে পাশের গলিতে ঢুকে পড়তে দেখা গেল। এরকম ভীতুর ডিমকে 'ভয়াল-ছয়'-এ ঢোকানো খুব ভুল হয়েছে।

বড়চাচা ইজিচেয়ারে শুয়ে ছিলেন। ওদের দেখে উঠে বসলেন।

খোকনের সঙ্গে মনে হয় তোমাদের খুব জরুরি প্রয়োজন। অনেকক্ষণ ধরেই দেখছি ঘুরঘুর করছ।

ওরা জবাব দিল না। বড়চাচা বললেন, তোমরা দু'জনেই কি 'ভয়াল-ছয়'-এ আছ ?

সাজ্জাদ ও বল্টু মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। এর মানে কী ? ভয়াল-ছয়ের কথা তো তাঁর জানার কথা নয়।

বড়চাচা শান্তস্বরে বললেন, তোমরা কি খোকনের বন্ধু ?

উত্তর দিল সাজ্জাদ, জি।

আফ্রিকার গহীন অরণ্যে যাচ্ছ কবে ?

প্রশ্ন করা হলো বল্টুকে। বল্টুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল।

খুব শিগগিরই রওনা হচ্ছ নাকি ?

জি।

পায়ে হেঁটেই যাবে ?

জি।

প্রথমেই একেবারে আফ্রিকার গহীন অরণ্যে ? এই দেশটা একবার দেখে নিলে হতো না ?

বল্টু বলল, এই দেশ আমরা পরে দেখব।

আমার মনে হয় প্রথমে নিজের দেশটাই দেখা উচিত। আমি হলে তা-ই করতাম। বসো, তোমরা ওই চেয়ারে বসো।

ওরা বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্লেটে করে সন্দেশ চলে এল। বড়চাচা বললেন, খোকনের সঙ্গে তো আজ দেখা হবে না। ও আজ সারা দিন ঘর থেকে বেরুতে পারবে না। সাজ্জাদ ও বল্টু দু'জনের কেউই কোনো কথা বলল না। বড়চাচা বললেন, জিজ্ঞেস করো কেন খোকন আসবে না ? কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না। বড়চাচা বললেন, ও কাল রাত ন'টার পর বাড়ি ফিরেছে, সেজন্যে শাস্তি। বুঝতে পারছ ?

জি পারছি।

তোমরা ছাড়া আর কে কে যাচ্ছে ? সব মিলে ছ'জন না ?

জি-না, পাঁচজন। টগর আজ সকালে বলেছে সে যাবে না।

যাবে না কেন ?

ওর নাকি ভয় লাগছে।

তাহলে তোমরা এখন ভয়াল-পাঁচ ?

জি।

আমার তো মনে হয় আরও কমবে। শেষমুহূর্তে অনেকেই পিছিয়ে পড়বে। শেষমুহূর্তে অনেকের সাহস থাকে না। খাও, সন্দেশ খাও।

সাজ্জাদ সন্দেশ খেতে খেতে চারদিকে তাকাল। সিনেমায় বড়লোকদের বাড়ি যেরকম সাজানো থাকে সেরকম সাজানো। লাল টুকটুক কার্পেট। ময়লা জুতা পরে কেউ নিশ্চয়ই এ কার্পেটে পা দেয় না। কার্পেট থেকেই লালাভ একটি আভা ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। ঘরের দেয়াল ঘেঁসে উঁচু উঁচু চেয়ার। চেয়ারের গদিগুলিও লাল রঙের। মাঝখানের মস্ত টেবিলটি কি পাথরের তৈরি ? খোকনকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

সন্দেশ খাচ্ছ না কেন ? যে ক'টি খেতে পারো খাও।

গবগব করে পাঁচ-ছটা সন্দেশ শেষ করে দেওয়াটা অভদ্রতা হবে ভেবেই বল্টু ইতস্তত করছিল। বড়চাচা বললেন, খেতে ইচ্ছে হলে খাবে। না খাওয়ার মধ্যে কোনো ভদ্রতা নেই।

সাজ্জাদ একসঙ্গে দুটো সন্দেশ মুখে পুরে দিল। মিষ্টির ভেতরও যে এমন সুন্দর গন্ধ থাকতে পারে তা তার জানা ছিল না। এ মিষ্টিগুলি কি বাড়িতেই তৈরি হয় ? সাজ্জাদের হঠাৎ করে বড়লোক হওয়ার ইচ্ছে হলো। খোকনদের মতো বড়লোক। বড়চাচা বললেন, আচ্ছা, তাহলে তোমরা যাও। খোদা হাফেজ।

বল্টুর ইচ্ছে হলো এগিয়ে গিয়ে পাঁ ছুঁয়ে সালাম করে ফেলে। মুরুব্বিদের সঙ্গে হাঠাৎ দেখা হলে যেরকম করা হয়। কিন্তু সাহসে কুলাল না। যখন বেরিয়ে যাচ্ছে তখন

বড়চাচা আবার ডাকলেন, তোমাদের একটা কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি। তোমরা কি মিছিলে যাও ? অর্থাৎ আমি জানতে চাচ্ছি, ভয়াল-ছয়ের সদস্যরা মিছিলে যায় ?

সাজ্জাদ ইতস্তত করে বলল, ওরা যায় না, আমি যাই।

কেন যাও ?

সাজ্জাদ জবাব দিতে পারল না।

এসব মিছিল-টিছিল কেন হচ্ছে জানো ?

জানি।

কেন ?

সাজ্জাদ জবাব দিতে পারল না। বড়চাচা গম্ভীর মুখে বললেন, না, তুমি জানো না। মিছিল-টিছিল করা এখন আমাদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কথায় কথায় মিছিল, সভা, শোভাযাত্রা। এসব কী ? রাতদিন রাস্তায় চেঁচামেচি করলে মানুষ কাজ করবে কখন ?

সাজ্জাদ কিছু বলল না। বড়চাচা হঠাৎ করে কেন রেগে যাচ্ছেন সে বুঝতে পারছে না।

আওয়ামী লীগ ইলেকশনে জিতেছে, ভালো কথা। কিন্তু এমন করছে যেন তারা যা বলবে তা-ই। আরে বাবা, পাকিস্তানের কথাও তো শুনতে হবে। হবে কি না বলো ?

সাজ্জাদ না বুঝেই মাথা নাড়ল।

শেখ সাহেবের যে পরিকল্পনা তাতে তো দেশটাই ছারখার হবে। পাকিস্তান আনার জন্যে আমরা কম কষ্ট করেছি ? এখন পাকিস্তানের কথা বলে না, সবাই শুধু বাঙালি বাঙালি করে। বাঙালি ছাড়াও তো লোক আছে। পাঞ্জাবি আছে, সিন্ধী আছে, এরা মানুষ না ? সবাইকে নিয়ে মিলেমিশে থাকা যায় না ?

জি যায়।

বড়চাচা গলা উঁচিয়ে বললেন, মিছিল-টিছিলে কখনো যাবে না। এখন পড়াশোনার সময়। পড়াশোনা করবে। ব্যস। কথায় কথায় মিছিল—এসব কী ? যাও বাড়ি যাও।

৩

ছুটির দিনে খোকন সাধারণত খুব ভোরে ওঠে। বই নিয়ে পড়তে হবে না এই আনন্দেই ঘুম ভেঙে যায় সকাল সকাল। এখন সবদিনই ছুটি। অনেকদিন ধরে স্কুল হচ্ছে না। তবু এ বাড়ির নিয়মে ছুটি মাত্র একদিন—শুক্রবার। সেদিন ঘুম থেকে ওঠার জন্যে কেউ ডাকডাকি করবে না। কেউ যদি সারা দিন ঘুমাতে চায় তাহলে তাও পারবে। ছোটরা বাড়ির ভেতর চিৎকার চেঁচামেচি করলেও তাদের কোনো প্রশ্ন করা হবে না। টিভির সামনে রাত এগারোটা পর্যন্ত বসে থাকলেও কেউ বলবে না—যাও, ঘুমুতে যাও। সেদিন হচ্ছে স্বাধীনতার দিন।

আজ শুক্রবার। খোকন জেগে উঠেছে খুব ভোরে। তার ইচ্ছে হলো কিছুক্ষণ চেঁচিয়ে কাঁদতে। এরকম সুন্দর একটি ঝকঝকে দিনে তাকে ঘরে বসে থাকতে হবে ? তাছাড়া

আজ দুপুরে স্কুলের বারান্দায় ভয়াল-ছয়ের একটি গোপন জরুরি মিটিং বসবে। সে মিটিং-এ সবাই থাকবে, শুধু সে থাকবে না। সবাই হয়তো ভাববে সে আর ভয়াল ছয়ে নেই। তাকে বাদ দিয়েই আজ নিশ্চয়ই সব ঠিকঠাক হবে। খোকন হাতমুখ ধুয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। রতনের মা এসে একবার জিজ্ঞেস করল—নাশতা ঘরে দিয়ে যাবে কি না। খোকন বলল, সে আজ নাশতা খাবে না, তার খিদে নেই। রতনের মা দ্বিতীয়বার কিছু বলল না। শুক্রবার খাওয়া নিয়ে পীড়াপীড়ি করা নিষিদ্ধ। কেউ খেতে না চাইলে খাবে না। রতনের মা দুমিনিট পরেই আবার এসে হাজির।

দাদাভাই, আপনেরে ডাকে।

কে ডাকে ?

আপনের আম্মা।

খোকনের মা'র শরীর মনে হয় আজ অন্যদিনের চেয়েও খারাপ। মাথার নিচে তিন-চারটা বালিশ দিয়ে তাঁকে শোয়ানো হয়েছে। মুখ রক্তশূন্য। ঘরের বড় বড় জানালায় ভারী পর্দা ঝুলছে। চারদিক অন্ধকার। খোকন ঘরে ঢুকতেই তিনি নিচুগলায় বললেন, কাল বিকেলে তোকে খুঁজছিলাম, কোথায় ছিলি ?

মায়ের সামনে খোকন মিথ্যা বলতে পারে না। সে মৃদুস্বরে বলল, বাইরে ছিলাম।

মিছিল-টিছিলে যাস নাই তো ?

না।

ঝামেলার মধ্যে যাবি না, কেমন ?

আচ্ছা।

বস্ এখানে। দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? তুই তো আমার ঘরে আসাই বন্ধ করে দিয়েছিস।

খোকন বসল। খোকনের মা বললেন, একটা কমলা খাবি ?

না।

না কেন, খা একটা।

তিনি একটি কমলা বের করে দিলেন।

আমার কাছে দে, আমি ছিলে দিচ্ছি।

আমি ছিলতে পারব।

দে আমার কাছে।

খোকনের মা কমলা ছিলতে লাগলেন। কিন্তু দেখে মনে হলো এটুকু কাজ করতেই তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে। তিনি টেনে টেনে বললেন, মিস গ্রিফিন বলছিল গণ্ডগোল নাকি প্রায় মিটমাটের দিকে। ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে নাকি শেখ মুজিবের মিটমাট হয়ে গেছে। এখন নাকি শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হবে।

খোকন কিছু বলল না।

মিটমাট হয়ে গেলেই হয়। মনে একটা শান্তি পাওয়া যায়। তাই না খোকন ?

হ্যাঁ।

কিন্তু তোর বাবা বলছিল, এত সহজে নাকি কিছু হবে না। পাকিস্তানিরা নাকি চায় না শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হয়। আমি এখন কার কথা বিশ্বাস করি ?

খোকন উঠে দাঁড়াল।

মা এখন যাই।

বোস না আরেকটু, বোস।

পরে আসব।

আচ্ছা আসিস। মিছিল-টিছিলে যাস না কিন্তু, লক্ষ্মী বাবা।

বললাম তো আমি যাই না।

ওইসব বাচ্চাছেলেদের জন্যে না।

খোকন নিজের ঘরে এসে 'মুণ্ডুহীন লাশ' পড়তে বসল। মঞ্জুর কাছ থেকে বহু সাধ্য সাধনা করে আনা হয়েছে। কিন্তু পড়তে ভালো লাগছে না। খোকন বই বন্ধ করে জানালার পাশে বসে রইল। জানালা থেকে দেখা যাচ্ছে টুনুকে। তার জন্যেই ঘুর ঘুর করছে বোধহয়। যারা সাধারণ গরিব ঘরের ছেলে তাদের মতো সুখী বোধহয় আর কেউ নেই। কেউ তাদের আটকে রাখে না। যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারে। এই যে সাজ্জাদ, মিছিল দেখলেই ঢুকে পড়ে। কেউ তাকে কিছু বলে না। একদিন একা একা গিয়ে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা শুনে এল।

খোকন জানালা বন্ধ করে দিল। বাইরে তাকিয়ে থাকতেও খারাপ লাগছে। দোতলার সিঁড়িতে অনজু আর বিলু গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। খোকন কড়াগলায় ধমক দিল, গোলমাল করিস না। ওরা গোলমাল করতেই লাগল। করবে জানা কথা। আজ ছুটির দিন। ওরা কোনো কথা শুনবে না। খোকন ভাবল, ছাদে গিয়ে বসে থাকবে। চুপচাপ।

ছাদে যাবার পথে বাবার সঙ্গে দেখা। বাবা থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমার কি অসুখ করেছে ?

জি-না।

কাল অনেক রাত পর্যন্ত তোমার ঘরে বাতি জ্বলছিল, কী করছিলে ?

কিছু করছিলাম না।

জেগে ছিলে নাকি ?

জি।

জেগে ছিলে অথচ কিছুই করছিলে না ?

বাবা খুবই অবাক হলেন। খোকনের বাবা রকিব সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন টিচার। ইতিহাস পড়ান। তিনি খুব সহজে অবাক হতে পারেন। তাঁর বেশ কিছু অদ্ভুত ব্যাপার আছে। যেমন, প্রায়ই খোকনের সঙ্গে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে কথা বলেন। সেসময় তাকে তুমি তুমি করে বলেন। অন্যসময় তুই করে।

খোকন ঠিক করে বলো তো তোমার শরীর খারাপ করেনি তো ?

জি-না।

দেখি এদিকে এসো, জ্বর আছে কি না দেখি।

তিনি খোকনের কপালে হাত রাখলেন।

না, জ্বর নেই তো।

রকিব সাহেব আবার অবাক হলেন। যেন জ্বর না থাকাটাও অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার।

কাল অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলে, কিছু নিয়ে চিন্তা করছিলে নাকি ?

হ্যাঁ।

আমাকে বলতে চাও ? বলতে চাইলে বলতে পারো।

খোকন ইতস্তত করতে লাগল। বাবা বেশ আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। মাঝে মাঝে খোকনের প্রতি তাঁর আগ্রহ খুব বেড়ে যায়। খুব খোঁজখবর করেন। তারপর আবার আগ্রহ কমে যায়। বইপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কিছুই আর মনে থাকে না।

আমরা ছয়জন বন্ধু মিলে একটা দল করেছি। দলের নাম ভয়াল-ছয়।

বলো কী! খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। দলের কাজ কী ?

আমার ভূ-পর্যটন করব।

ভূ-পর্যটন করবে ?

হ্যাঁ। প্রথমে যাব আফ্রিকা।

বাহ্, বেশ মজার তো।

বাবা এবার আর অবাক হলেন না। হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতে বললেন, ছোটবেলায় আমিও একটা দল করেছিলাম। আমাদের দলের কাজ ছিল গুপ্তধন খুঁজে বের করা। কোনো গুপ্তধন আমরা খুঁজে পাইনি। তখন আমার বয়স ছিল বারো কি তেরো। তোমার এখন কত বয়স ?

তেরো বছর তিন মাস।

এই বয়সটাই হচ্ছে দল করবার বয়স।

বাবা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন।

কবে যাচ্ছ আফ্রিকায় ?

এখনো ঠিক হয়নি।

তাড়াতাড়ি ঠিক করে ফেলা দরকার। আমরা সবসময় শুধু পরিকল্পনা করি। কাজ আর করা হয় না। তোমরা যদি একদিন সত্যি সত্যি হাঁটতে শুরু করো, তাহলে ভালোই হবে। মাইল দশেক যেতে পারলেও অনেক কিছু শিখবে।

বাবা হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। খোকন বুঝতে পারল না এখন তার কী করা উচিত। চলে যাওয়া উচিত না দাঁড়িয়ে থাকা উচিত। কারণ বাবার অন্যমনস্কতা খুব বিখ্যাত। একবার শুরু হলে দীর্ঘ সময় থাকে। তখন কাউকে চিনতে পারেন না।

খোকন।

জি।

ছুটির দিনে তুমি তোমার দলের সঙ্গে না থেকে ঘরে বসে আছ কেন?

বড়চাচা বলেছেন আজ কোথাও বেরুতে পারব না।

ও আচ্ছা। কারণটা কী?

খোকন কারণ বলল। রকিব সাহেব বললেন, শাস্তিটা একটু মনে হয় বেশি হয়ে গেছে। তোমার কী মনে হয়?

খোকন কিছু বলল না।

তোমার বড়চাচা হয়তো ভেবেছেন তুমি মিছিল-টিছিলে গিয়েছ, সেজন্যেই এমন শাস্তি। তুমি গিয়েছিলে নাকি?

না।

কখনো যাওনি?

খোকন চুপ করে রইল।

কয়েকবার গিয়েছ, তাই না?

হ্যাঁ।

আমার কী মনে হয় জানো? আমার মনে হয়, মিছিল করবে যুবকরা। মিছিল হচ্ছে প্রতিবাদের ভাষা। এ কাজটি যুবকদের জন্যে। শিশুরা শিখবে, যুবকরা কাজ করবে, বৃদ্ধরা ভাববে। ঠিক না?

হ্যাঁ।

রকিব সাহেব হঠাৎ করে খানিকটা গম্ভীর হয়ে বললেন, তোমার কি ধারণা শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হবেন?

আমি জানি না।

এ নিয়ে কখনো ভেবেছ?

না।

আমি অবশ্যি অনেক ভেবেছি। আমি নিজেও বুঝতে পারছি না। শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী করা ছাড়া ওদের উপায় নেই। ইলেকশনে জিতেছেন। কিন্তু ওরা করতে চাচ্ছে না। ওদের অজুহাত বের করতে হবে। কী অজুহাত দেবে সেটাও একটা সমস্যা। সমস্যা নয়?

হ্যাঁ।

এদিকে ভুট্টো সাহেব বলেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানে আমার দল সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে। তার মানে কী বলতে পারো?

না।

ভুট্টো সাহেবই পাকিস্তানকে দুটি অংশ হিসেবে ভাবছেন। অথচ তারা দোষ দিচ্ছে আমাদের। ভাবখানা এরকম যেন আমরাই পকিস্তানকে দু'ভাগে ভাগ করতে চাচ্ছি।

আমরা চাচ্ছি না ?

ওরা যা শুরু করেছে তাতে চাওয়াই উচিত। আমি অন্তত চাই। তবে যারা একসময় পাকিস্তানের জন্যে আন্দোলন করেছেন, দুঃখকষ্ট ভোগ করেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই চান না। যেমন তোমার বড়চাচা।

বড়চাচা চান না ?

মনে হয় না। তবে আমার ভুলও হতে পারে।

শেষপর্যন্ত কী হবে ? পাকিস্তান ভাগ হয়ে যাবে ?

নির্ভর করছে ওদের ওপর। ওরা যদি আমাদের ন্যায্য অধিকার স্বীকার করে তাহলে হয়তোবা ওদের সঙ্গে থাকা যাবে। কিন্তু ওরা আমাদের বিশ্বাস করতে পারছে না। পরিস্থিতি ভালো না।

বাবা কথা শেষ না করেই চটি ফটফট করে তাঁর ঘরে ঢুকে গেলেন। খোকন চলে গেল ছাদে। এ বাড়ির ছাদটা প্রকাণ্ড। রোজ বিকেলে ব্যাডমিন্টন খেলে অনজু আর বিলু। চুন দিয়ে ঘর আঁকা আছে।

খোকন বেশ খানিকক্ষণ একা একা ঘুরে বেড়াল। ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগছিল না। আবার নিচে যেতেও ইচ্ছা করছিল না। একসময় রতনের মা এসে বলল, এখন নাশতা দেই ?

বললাম তো কিছু খাব না।

এক গ্লাস দুধ আইন্যা দিমু ?

না।

আপনেরে আম্মা ডাকে।

একটু আগেই গেলাম। আবার ?

হ্যাঁ। আসেন আমার সাথে।

খোকন দেখল তার মা হাঁপাচ্ছেন। অসুখ বোধহয় খুব বেড়েছে। খোকন বলল, মা ডেকেছ ?

হ্যাঁ, তুই নাকি কিছু খাস নাই ? কেনরে ব্যাটা, কারও উপর রাগ করেছিস ?

না।

আমি তো কোনো খোঁজখবর করতে পারি না। কী খাস না-খাস কে জানে!

আমি ঠিকই খাই।

মা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, রতনের মা, যাও তো খোকনের খাবার নিয়ে এসো। আমার সামনে বসে সে খাবে। খোকনের একবার ইচ্ছা হলো বলে, ছুটির দিনে খাওয়া নিয়ে পীড়াপীড়ি করা যাবে না। বড়চাচার নিষেধ আছে। কিন্তু সে কিছু বলল না। মা'কে কষ্ট দিতে তার কখনো ইচ্ছা করে না। মা এত ভালো।

৪

ভয়াল-ছয় বাহিনীর তিনজন সদস্যকে স্কুল গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। তিনজনই অত্যন্ত বিমর্ষ। টুনু একটা ঘাসের ডাটা চিবুচ্ছে। সাজ্জাদ রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। দলের বাকি সদস্যদেরও এসে পড়ার কথা। কেউ আসছে না। সময় সকাল দশটা। রোদ উঠেছে কড়া। বেশ গরম লাগছে। টুনু বলল, চল ছায়াতে দাঁড়াই। কেউ জবাব দিল না। ওইদিন টুনু কাপুরুষের মতো পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে কেউ তার সঙ্গে কথা বলছে না।

এক জায়গায় এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। তারা পাঁচিলে উঠে পা ঝুলিয়ে বসল। পাঁচিলে ওঠা নিষেধ। হেড স্যার খুব রাগ করেন। কিন্তু আজ শুক্রবার, স্কুল বন্ধ। হেড স্যারের এদিকে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। যতক্ষণ ইচ্ছা পা ঝুলিয়ে বসে থাকা যাবে। বল্টু হঠাৎ ফিসফিস করে বলল, মুনির আসছে। তিনজনেই তাকাল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। মুনির হনহন করে আসছে। তার হাতে কী একটা বই। গল্পের বই নিশ্চয়ই। ওদের দেখতে পেয়েই সে বই শার্টের নিচে লুকিয়ে ফেলল। মুনিরের সঙ্গে ওদের তেমন ভাব নেই। যে ছেলে প্রতি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয় তার সঙ্গে কারও ভাব থাকে না। ক্লাস টিচার সোলায়মান স্যারের ধারণা, মুনিরের মতো ভালো ছাত্র এই স্কুলে এর আগে আর ভর্তি হয়নি। পরেও হবে না। গত বৎসর স্কুল ম্যাগাজিনে তাঁর একটা ইংরেজি গল্প ছাপা হয়েছে। গল্পের নাম—'দি বেগার বয়'। হেড স্যার সেই গল্প আবার স্কুল অ্যাসেম্বলীতে পড়ে শুনিয়েছেন এবং বলেছেন, ক্লাস সেভেনের ছেলের ইংরেজি দেখলে ? বিএ এমএ পাসরাও এমন লিখতে পারবে না। এর গল্পের মরালটা লক্ষ করবে—'যে ছেলে ভিক্ষা করে তার মধ্যেও মনুষ্যত্ব আছে।'

মুনির স্কুল গেটের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। সন্দেহভরা গলায় বলল, অ্যাই, তোরা কী করছিস ?

কিছু করছি না।

ওয়ালের উপর বসে আছিস কেন ? হেড স্যার নিষেধ করেছেন না ?

আমরা কারও নিষেধ মানি না।

ও, তোরা তো আবার ভয়াল-ছয়।

ভয়াল-ছয়টা মুনির এমনভাবে বলল যেন খুব একটা হাস্যকর ব্যাপার। সাজ্জাদ চুপ করে রইল। দলের কথাটা এরকম জানাজানি হলো কী করে কে জানে। মুনির বলল, নিষেধ না মানার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নেই।

না থাকলে নাই। আমরা নিষেধ মানি না।

কোনো নিষেধ মানিস না ?

না। তোর শার্টের নিচে এটা কী বই ?

'রাতের আতঙ্ক'। এটা আমি কাউকে দিতে পারব না। এখনো পড়া হয়নি।

তোর বই আমরা চাই না।

তারা চুপ করে গেল। মুনির চলে যাচ্ছে না। দাঁড়িয়েই আছে। বল্টু বলল, তুই চলে যা। দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

তুই কী করছিস?

আমি যা-ই করি তাতে তোর কী?

মুনির ইতস্তত করে বলল, আমাকে দলে নিলে এই বইটা পড়তে দেব।

সে শার্টের ভেতর থেকে বই বের করল। মোটা একটা বই। মলাটে মুখোশপরা একটা মানুষের ছবি। তার হাতে পিস্তল। অন্য হাতে লম্বা একটি বর্শা।

কি, নিবি আমাকে দলে?

ভালো ছাত্রদের আমরা দলে নিই না।

কেন? ভালো ছাত্ররা কী দোষ করল?

ভালো ছাত্ররা পড়াশোনা করবে। আমরা পড়াশোনা করব না।

কী করবি তাহলে?

দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াব।

আমিও ঘুরব তোদের সাথে।

মুনিরকেও দেখা গেল দেয়ালের ওপর উঠে বসেছে। ভয় পাওয়া গলায় বলল, পড়ে যাব না তো?

কেউ উত্তর দিল না।

আমাকে দলে নিয়েছিস?

ভেবে দেখি। দলের অন্যরা যদি রাজি হয়।

অন্যরা কখন আসবে?

আসবে এক্ষুনি।

কিন্তু দলের অন্যদের আসার আগেই স্কুলের দপ্তরি কালিপদ এসে বলল, হেড স্যার আপনাদের ডাকে। টুনুর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সাজ্জাদ বিড়বিড় করে বলল, হেড স্যার কোত্থেকে এলেন? কালিপদ তার জবাব দিল না। হাত ইশারা করে দেখাল। হেড স্যার হোস্টেলের বারান্দায় লুঙ্গি পরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখের ভাব অস্বাভাবিক গম্ভীর।

হেড স্যার প্রথম কিছু সময় কোনো কথাই বললেন না। তারা যে এসে দাঁড়িয়েছে সেটাও যেন চোখে পড়েনি। বেশ কিছুক্ষণ পর মেঘ গর্জন করলেন।

ওয়ালের উপর বসে ছিলি কেন?

কোনো জবাব নেই।

তোর হাতে ওটা কী বই?

'রাতের আতঙ্ক'।

এসব আজেবাজে বই পড়তে নিষেধ করেছি, মনে নাই?

সবাই চুপচাপ।

তোদের বলি নাই—এখন চারদিকে ঝামেলা হচ্ছে, এখন ঘরে বসে থাকবি ? পাঠ্যবই পড়বি। ট্রান্সলেশন করবি।

জি স্যার, বলেছেন।

দু'বছর পর এসএসসি পরীক্ষা। খেয়াল আছে ? শাহজাহান বল তো, রাইনোসেরাস মানে কী ?

গণ্ডার স্যার।

রাইনোসেরাস বানান কর।

শাহজাহান টেনে টেনে বলল, আর ওয়াই...। বলেই থেমে গেল। হেড স্যার আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। মুনির ফিসফিস করে বলল, স্যার আমি বলব ?

না, তোমার বলতে হবে না। যাও, এখন ঘরে যাও। খবরদার কোনো মিছিলে-টিছিলে যাবে না।

জি আচ্ছা, স্যার।

আর ওই বইটা রেখে যাও আমার কাছে। ম্যাট্রিক পাস করার আগে কোনো আউট বই পড়বে না। যেসব বই পড়ে কিছু শেখা যায় না সেসব বই পড়ার কী মানে ? বলো কোনো মানে আছে ?

নাই, স্যার।

যাও, বাড়ি যাও। আর এই তুমি, ঘাস চিবাচ্ছ কেন ? ঘাস খায় ছাগলে। তুমি কি ছাগল ? বলো, তুমি ছাগল ?

টুনু মুখ কালো করে বলল, জি-না স্যার।

ঘাস-লতাপাতা এসব যেন আর খেতে না দেখি। যাও, বাড়ি যাও।

বড় রাস্তার মোড়ে এসে টুনু বলল, সে বাড়ি চলে যাবে। সাজ্জাদ বলল, যেতে চাইলে যা, তোকে আমরা বেঁধে রেখেছি ?

এটা রাগের কথা। এরপর যাওয়া যায় না। এই সময় একটা বেশ বড়সড় মিছিল আসতে দেখা গেল। সমুদ্রগর্জনের মতো গর্জন, 'জেগেছে জেগেছে বীর জনতা জেগেছে, জাগো জাগো জাগো, বীর জনতা জাগো।' সাজ্জাদ বলল, যাবি নাকি মিছিলে ?

কেউ কিছু বলল না। শুধু মুনির বলল, না, স্যার নিষেধ করেছেন।

ওরা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। মিছিলটাও প্রকাণ্ড। শেষই হতে চায় না। পেছনে চার-পাঁচটা পুলিশের ট্রাক। দেখলেই কেমন ভয় লাগে। মুনির ফিসফিস করে বলল, খুব গণ্ডগোল হবে। চল বাড়ি যাই।

তোর ভয় লাগে, তুই যা।

কত পুলিশ, দেখেছিস ?

পুলিশকে ভয় পেলে তুই চলে যা। তোকে ধরে রেখেছি নাকি ?

মুনির ইতস্তত করে বলল, হেড স্যার দেখলে খুব রাগ করবেন। তাছাড়া বাসায় আজ বড় খালামণির আসার কথা। বড় খালামণি আমাকে না দেখলে খুব রাগ করেন।

সাজ্জাদ বলল, তোর আসলে ভয় লাগছে। ভীতুর ডিম কোথাকার!

মুনির মুখ কালো করে ফেলল। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকল না। গলির ভেতর ঢুকে পড়ল। মুনিরের সাথে টুনুও চলে গেল। তার নাকি পেট ব্যথা করছে। সাজ্জাদ বলল, বল্টু, তুইও যাবি নাকি ?

নাহ।

কী করবি তাহলে ? মিছিলের সাথে যাবি ?

হুঁ। কিন্তু কিছু হয় যদি ?

দূর, কী হবে ?

ভয়াল-ছয়ের দুই সদস্য মিছিলে ঢুকে পড়ল। অদ্ভুত একটা উত্তেজনা। গর্জনে চারদিক কেঁপে কেঁপে উঠছে। একেকটা ঘামে ভেজা মুখ কী ভয়ঙ্কর রাগী। মিছিল যতই এগোচ্ছে মানুষের সংখ্যা ততই বাড়ছে। যেদিকে তাকানো যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। মিছিল কোনদিকে যাচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

সাজ্জাদ আর বল্টু হাত ধরাধরি করে হাঁটছিল। হাঠাৎ কে একজন পেছন থেকে বল্টুর শার্টের কলার চেপে ধরল। বল্টু ঘাড় ফিরিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। জামিল স্যার! অঙ্ক করান, দারুণ রাগী। স্যারের এক হাতে একটা লাল নিশান।

তোরা এখানে কী করছিস ? যা, এক্ষুনি বাড়ি যা। এটা হাওয়া খাওয়ার জায়গা ? আর কে কে আছে তোদের সাথে ?

আর কেউ নেই, স্যার।

ঠিক করে বল।

না স্যার, আমরা দু'জনই।

এক্ষুনি বাড়ি যা, খুব গণ্ডগোল হবে। ওই গলি দিয়ে বেরিয়ে পড়। এক্ষুনি। এক্ষুনি। খুব গণ্ডগোল হবে। দৌড়া। দৌড়া।

স্যারের কথা শেষ হওয়ার আগেই কোথাও কিছু একটা হলো। দারুণ ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল চারদিকে। ঢেউয়ের মতো মানুষের স্রোত আসতে লাগল। দুম দুম শব্দ হলো সামনে। গুলির শব্দ না টিয়ার গ্যাস ? কয়েকজন প্রাণপণে চিৎকার করছে, আগুন আগুন! কোনোদিকে নড়ার রাস্তা নেই তবু এর মধ্যেই সাজ্জাদ প্রাণপণে ছুটছে। বল্টু তার হাত শক্ত করে চেপে ধরে আছে। কালো কোট গায়ে দেওয়া একটা লোক বলল, এই খোকারা, মাটিতে শুয়ে পড়ো। দেখছ কী ? গুলি হচ্ছে। ওরা কী করছে নিজেরা বুঝতে পারছে না। একজন বুড়ো মানুষ বললেন, কোনো খোলা বাড়ি দেখে ঢুকে পড়ো। কোনো বাড়ির দরজা খোলা নেই। সাজ্জাদের মনে হলো সে আর দৌড়াতে পারছে না। ডান পায়ের নখ উঠে গেছে বা কিছু হয়েছে। এবার পেছন থেকে দ্রিম দ্রিম শব্দ আসছে।

একতলা একটি বাড়ির গেটে বুড়ো মানুষ একজন কে যেন দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি হাত বাড়িয়ে ওদের ধরে ভেতরে ঢুকিয়ে ফেললেন।

সেদিন ছিল পহেলা মার্চ। ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করেছে সকাল এগারোটায়। বারোটা নাগাদ বাঙালিরা বেরিয়ে পড়েছিল রাস্তায়। সেই জনসমুদ্র দেখে স্তম্ভিত সরকার দুপুর একটায় ঘোষণা করল, বিকেল পাঁচটা থেকে কার্ফু। কেউ ঘর থেকে বেরুবে না। সেই ঘোষণা বাতিল করে নতুন ঘোষণা দেওয়া হলো, কার্ফু বেলা তিনটা থেকে। যে যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। রাস্তায় দেখামাত্র তাদের গুলি করা হবে।

সাজ্জাদ এবং বল্টু আটকা পড়ে গেল একটা অচেনা বাড়িতে।

৫

খোকনের ছোটচাচা আমিন সাহেব ঢাকা এয়ারপোর্ট এসে পৌঁছলেন বিকেল তিনটায়। চারদিক কেমন থমথম করছে। প্রচুর পুলিশ। এয়ারপোর্ট থেকে কেউ বেরুতে পারছে না।

আমিন সাহেবকে নেওয়ার জন্যে কেউ আসেনি। রাস্তাঘাট ফাঁকা। পুলিশের গাড়ি আর অ্যাম্বুলেন্স ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না। কাস্টমসের একজন অফিসার বললেন, শহরে কার্ফু জারি হয়েছে। তবে আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে না। আপনাদের পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন।

আমিন সাহেব দুঘণ্টা অপেক্ষা করলেন। কোনো ব্যবস্থা হলো না। খোকনের ছোটচাচি রাহেলা খুব অস্থির হয়ে পড়লেন। কারণ প্রিসিলার হঠাৎ শরীর খারাপ করেছে। দু'বার বমি হয়েছে। জ্বর আসছে মনে হয়। ওকে ডাক্তার দেখানো উচিত। রাহেলা বললেন, এখন আমরা কী করব ? সারা রাত এয়ারপোর্টে বসে থাকব নাকি ?

অন্যরা যদি বসে থাকে আমরাও থাকব।

এ আবার কী ধরনের কথা ? লোকজনদের সঙ্গে কথাটথা বলে দেখো কিছু করা যায় কি না।

আমিন সাহেব দু'এক জায়গায় টেলিফোন করতে চেষ্টা করলেন। কোনো লাভ হলো না। লাইন নষ্ট বা কিছু একটা হয়েছে।

এয়ারপোর্টে বেশ কিছু লোক আটকা পড়েছে। একটি আমেরিকান ফ্যামিলিকে দেখা গেল খুব চিন্তিত। ভদ্রলোকের নাম পিটার কল। তিনি যেচে এসে আমিন সাহেবের সঙ্গে কথা বললেন, তোমাদের শহরের অবস্থা তো ভয়াবহ মনে হচ্ছে।

হুঁ।

আন্দোলন হচ্ছে শুনেছিলাম, এতটা বুঝতে পারিনি।

নরওয়ে থেকে এক ভদ্রমহিলা এসেছেন, তিনি শহরে ঢুকতে চান না। পরবর্তী ফ্লাইটে নরওয়ে চলে যেতে চান। ইংল্যান্ডের দুটি পরিবার আছে। ওদের সঙ্গে তিনটি

ছেলেমেয়ে। ছেলেমেয়েগুলি সমস্ত এয়ারপোর্ট জুড়ে ছোটাছুটি করছে। বাচ্চাগুলির মাকেও মনে হলো বেশ হাসিখুশি। খুট খুট করে ছবি তুলছে।

আমিন সাহেব ফিরে এসে দেখলেন প্রিসিলা আবার বমি করছে। তার গায়ে বেশ জ্বর।

কিরে প্রিসিলা, খারাপ লাগছে ?

নো, আই অ্যাম জাস্ট ফাইন।

রাহেলা বললেন, কিছু ব্যবস্থা করতে পারলে না ?

না। অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে। জায়গায় জায়গায় মশাল মিছিল বের করছে। কেউ কার্ফু মানছে না। গুলিটুলিও হচ্ছে বোধহয়, শব্দ শুনলাম।

এখন আমরা কী করব ?

বসে থাকো।

তোমাকে কতবার বলেছি দেশে ফেরার দরকার নেই। শুনবে না।

গণ্ডগোল হচ্ছে বলে নিজের দেশে ফিরব না ?

এইরকম দেশে ফিরে লাভটা কী ?

আমিন সাহেব প্রিসিলাকে কোলে নিয়ে বসলেন। প্রিসিলা রিনরিনে গলায় ইংরেজিতে বলল, গণ্ডগোল হচ্ছে কেন ?

গণ্ডগোল হচ্ছে কারণ আমরা বাঙালিরা বলছি, আমরা মানুষের মতো বাঁচতে চাই। পাকিস্তানিরা মানছে না। ওদের ধারণা, আমরা মানুষ না।

রাহেলা বিরক্ত মুখে বললেন, থাক, রাজনৈতিক বক্তৃতা মেয়েকে না শোনালেও হবে।

না শোনালে হবে না। এরা আন্দোলনের মধ্যে বড় হবে। এদের জানা দরকার এসব কী জন্যে হচ্ছে।

এখন না জানলেও হবে। এখন দয়া করে চুপ করে থাকো।

আমিন সাহেব চুপ করে গেলেন। প্রিসিলা বলল, এরকম ঝামেলা কতদিন চলবে ?

বলা মুশকিল। অনেকদিন ধরে চলতে পারে। তবে শুরু যখন হয়েছে তখন একদিন না একদিন শেষ হবে। শুরু হওয়াটাই শক্ত।

তোমার কথা বুঝতে পারছি না বাবা। ইংরেজিতে বলো।

আমিন সাহেব ইংরেজিতে বললেন। তারপর হাসিমুখে বললেন, এখন থেকে তোমাকে বাংলায় কথা বলা শিখতে হবে মা। ভালো করে বাংলা শিখে নাও।

হোয়াই ডেডি ?

কারণ তুমি বাঙালি মেয়ে, সেইজন্যে।

রাহেলা বিরক্ত হয়ে বললেন, বাংলায় কথা বলা শিখতে হবে না। তুমি কথাবার্তা ইংরেজিতে বলবে। নয়তো ইংরেজি ভুলে যাবে।

রাত আটটার দিকে একটা মাইক্রোবাস পাওয়া গেল যেটা বিদেশীদের হোটেলে পৌঁছে দেবে। আটকেপড়া বাঙালিদের সম্পর্কে কারও কোনো মাথাব্যথা নেই। আমিন সাহেব কথা বলতে গেলেন ওদের সঙ্গে। একজন পাকিস্তানি মিলিটারি অফিসারের দায়িত্বে বাসটি যাবে। আমিন সাহেবকে মিলিটারি অফিসারটি শান্তভাবে বলল, ব্যবস্থাটি ফরেনারদের জন্যে।

কিন্তু আমার মেয়েটি অসুস্থ।

অসুখ হোক আর যাই হোক, আমার কিছু করার নেই। এই অবস্থার জন্যে দায়ী আপনারা—বাঙালিরা। এর ফল ভোগ করতে হবে আপনাদের।

আচ্ছা, আমাদের না হয় কোনো একটা হাসপাতালে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দিন।

একবার তো বলেছি এটা সম্ভব নয়।

কিন্তু আপনারা বিদেশীদের জন্যে তো করছেন।

হ্যাঁ, ওরা আমাদের অতিথি।

আমার মেয়েটিও বিদেশী। ওর জন্ম আমেরিকায়। ও জন্মসূত্রে আমেরিকান। ওর আমেরিকান পাসপোর্ট আছে।

আপনি আমাকে যথেষ্ট বিরক্ত করেছেন। আর করবেন না।

আমিন সাহেব গম্ভীর মুখে ফিরে এসে দেখেন প্রিসিলাকে একটা টেবিলে শোয়ানো হয়েছে। একজন রোগামতো ভদ্রলোক তাকে পরীক্ষা করছেন। রাহেলা বলল, উনি একজন ডাক্তার।

ডাক্তার সাহেব বললেন, কী হয়েছে ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে বমিটা বন্ধ করা দরকার। মুশকিল হয়েছে আমার সঙ্গে কোনো ওষুধপত্র নেই। আমিও আপনাদের মতোই আটকা পড়েছি।

ডাক্তার সাহেব থাকতে থাকতেই প্রিসিলা আরও দু'বার বমি করল। ডাক্তার সাহেব বললেন, ওকে হাসপাতালে ট্রান্সফার করা দরকার। আসুন, দেখা যাক একটা অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যায় কি না।

কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স জোগাড় করা গেল না। রাহেলা কাঁদতে লাগলেন। বেশ কয়েকবার বললেন, এইজন্যেই দেশে আসতে চাইনি। তবু আসতে হবে। কী আছে এই দেশে ?

আমিন সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, প্রিসিলা মা, তুমি কেমন আছ ?

ভালো। জাস্ট ফাইন।

ভোর হলেই আমরা তোমার দাদুমণির বাড়ি চলে যাব।

ভোর হতে কত দেরি ?

বেশি দেরি নেই।

ডাক্তার সাহেব প্রিসিলার কাছেই বসে রইলেন। তাঁরা সবাই অপেক্ষা করতে লাগলেন ভোরের জন্যে।

৬

সম্পূর্ণ অচেনা একটা বাড়িতে ঢুকে পড়া এবং প্রায়ান্ধকার একটি ঘরে নিঃশব্দে বসে থাকা খুব সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু বাইরে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। বুড়ো ভদ্রলোক সদরদরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। সব ক'টি জানালাও বন্ধ করা হয়েছে। চারদিকে গা চমকানো একটা অন্ধকার। বুড়ো লোকটি সাজ্জাদের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখে মোটা ফ্রেমের একটা চশমা। একটু রাগী চেহারা। গায়ে সাদা রঙের একটা চাদর। নুয়ে নুয়ে হাঁটেন।

তোমার নাম কী ?

সাজ্জাদ।

আর তোমার নাম ?

শাহজাহান।

তোমাদের ভয় লাগছে ?

জি-না।

সাজ্জাদ, তোমার পা কেটে গিয়েছে দেখছি, ব্যথা করছে ?

জি-না।

এসো আমার সাথে। পা ধুইয়ে ডেটল লাগিয়ে দিচ্ছি।

আমার কিছু লাগবে না।

বাজে কথা বলবে না। বাজে কথা আমি পছন্দ করি না। নীলু। নীলু।

সাজ্জাদ এবং টুনু দেখল, ওদের বয়েসী একটি মেয়ে এসে দরজার ওপাশে দাঁড়িয়েছে। বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, এই মেয়েটি আমার নাতনি। ওর নাম নীলাঞ্জনা। আর এদের একজনের নাম শাহজাহান, অন্যজনের নাম সাজ্জাদ। বলো তো নীলু কার নাম সাজ্জাদ ?

সাজ্জাদ এবং শাহজাহান মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। বুড়োটা পাগল নাকি ? মেয়েটি কিন্তু ঠিকই সাজ্জাদের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল। বুড়ো মহাখুশি।

ঠিক হয়েছে। এখন যাও ডেটল নিয়ে আসো। তুলা আনো। আর সাজ্জাদ শোনো, তুমি বাথরুমে গিয়ে পা ধুয়ে আসো। নীলুর সঙ্গে যাও। নীলু দেখিয়ে দেবে।

আমার কিচ্ছু লাগবে না।

একটা চড় লাগাব। যা বলছি করো।

সাজ্জাদ উঠে পড়ল। বাথরুমটা বাড়ির একেবারে শেষপ্রান্তে। নীলু বলল, দাদুমণির রাগ খুব বেশি। তিনি যা বলেন তা সঙ্গে সঙ্গে না করলে খুব রাগ করেন।

সাজ্জাদ মুখ গোমড়া করে বলল, আমি কাউকে ভয় পাই না।

কাউকে না ?

শুধু হেড স্যারকে ভয় পাই।

আমার দাদুমণিও তো হেড স্যার।

তাই নাকি ?

হুঁ। অবশ্যি এখন রিটায়ার করেছেন।

এই বাড়িতে আর কেউ থাকে না ?

না। শুধু আমরা দুজন আর একটি কাজের মেয়ে আছে। সে এসে রান্না করে দিয়ে যায়। আজকে আসেনি।

তুমি কোন ক্লাসে পড়ো ?

আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি। এইবার সেভেনে উঠব।

সাজ্জাদ খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, তুমি রাইনোসেরাস বানান করতে পারো ?

নীলু অবাক হয়ে বলল, না, রাইনোসেরাস কী ?

এক ধরনের গণ্ডার।

রাইনোসেরাস বানান করার দরকার কী ?

কোনো দরকার নেই। আমি নিজেও জানি না।

পা ধুতে ধুতে সাজ্জাদের মনে হলো, এই ছোট্ট মেয়েটি মন্দ নয়। পায়ে পানি ঢালছে চোখ বন্ধ করে। সাজ্জাদ বলল, অ্যাই, চোখ বন্ধ করে পানি ঢালছ কেন ?

রক্ত দেখতে পারি না যে, এইজন্যে। তোমার ব্যথা লাগছে ?

না। আমার ব্যথা-টেথা লাগে না।

ইস, কী মিথ্যুক!

সাজ্জাদ ফিরে এসে দেখে বুড়ো ভদ্রলোক মস্ত একটা জাবদা খাতা খুলে কী যেন লিখছেন। সাজ্জাদকে ঢুকতে দেখেই বললেন, তোমরা কোন ক্লাসে পড়ো ?

ক্লাস সেভেনে।

সবাই এক স্কুলে পড়ো ?

জি।

মিছিলে গিয়েছিলে নাকি ?

জি-না।

আবার মিথ্যা কথা!

জি, গিয়েছিলাম।

বুড়ো লোকটি খাতা বন্ধ করে গম্ভীর গলায় বললেন, একটা জিনিস আমি খুব অপছন্দ করি, সেটা হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা। কেউ যদি মিথ্যা কথা বলে আমি তা সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারি।

এই সময় বাইরের রাস্তায় খুব হইচই হতে লাগল। ঘণ্টা বাজিয়ে একটা দমকল গেল। লোকজন ছোটাছুটি করতে লাগল। একটা ভারী ট্রাক গেল। সম্ভবত মিলিটারি ট্রাক। বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, মনে হচ্ছে আজ রাতটা তোমাদের এখানেই কাটাতে

হবে। শোনো, নীলু আমাকে দাদুমণি ডাকে। তোমরাও তাই ডাকবে। এখন যাও, নীলুর সঙ্গে গল্প-টল্প করো। পরে তোমাদের সঙ্গে কথা বলব। দাদুমণি খাতা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

এদের বাড়িটি বেশ বড়। অনেকগুলি কামরা নীলুর দখলে। একটিতে নীলুর লাইব্রেরি। সেই লাইব্রেরি দেখে সাজ্জাদ ও বল্টুর আক্কেল গুড়ুম। একটা পুচকে মেয়ের এত বই! নীলু বলল, সব আমার দাদুমণি কিনে দিয়েছেন।

তুমি পড়েছ সবগুলি ?

পড়ব না কেন ?

বল্টু বলল, 'নীল আতঙ্ক' পড়েছ ? দারুণ বই!

না, পড়িনি।

আমি নিয়ে আসব তোমার জন্যে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নীলু তার সমস্ত সম্পত্তি দেখিয়ে ফেলল। তাদের সবচেয়ে মজা লাগল দাদুমণির 'মিথ্যা খাতা' দেখে। 'মিথ্যা খাতা'য় দাদুমণি সব মিথ্যা খবরগুলি তুলে রাখেন। খবরের শেষে মজার সব মন্তব্য লেখা থাকে। দুএকটা নমুনা দেওয়া যাক।

অদ্ভুত গাছ

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

নোয়াখালীর ছাগলনাইয়াতে জনৈক আহমেদ আলীর একটি অদ্ভুত খেজুরগাছ দেখিবার জন্যে মানুষের ঢল নামিয়াছে। উক্ত খেজুরগাছটি নামাজের সময় সেজদার ভঙ্গিতে নুইয়া পড়ে। খেজুরগাছের এই অদ্ভুত কাণ্ডের কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতেছে না।

মন্তব্য : নোয়াখালীর ছাগলনাইয়াতে আমি নিজে গিয়েছিলাম। এই জাতীয় গাছের কোনো সন্ধান আমাকে কেহ দিতে পারে নাই। এই মিথ্যা সংবাদ প্রচারের আসল উদ্দেশ্য কী ? বুঝিতে পারিতেছি না।

আমগাছে কাঁঠাল

প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে সম্প্রতি সাতক্ষীরার কুণ্ডচরণ বৈরাগীর একটি আমগাছে প্রকাণ্ড কাঁঠাল ফলিয়াছে। কুণ্ডচরণ আমাদের নিজস্ব সংবাদাতাকে জানান যে, উক্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার জন্যে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ আসিতেছে। সাতক্ষীরা মহকুমার এসডিও সাহেবও আসিয়াছিলেন।

মন্তব্য আমি সাতক্ষীরার এসডিও সাহেবকে একটি চিঠি লিখে

জানতে পারি যে, তিনি নিজে সেই কাঁঠাল দেখেননি, তবে খবর শুনেছেন। আমি পত্রিকার সম্পাদকের কাছে নিজস্ব সংবাদদাতার ঠিকানা জানতে চাই। সম্পাদক সাহেব আমাকে জানান, উক্ত সংবাদদাতা বর্তমানে ছুটিতে আছেন।

ছাগলের গর্ভে সর্পশিশু

সম্প্রতি একটি ছাগল দুটি সর্পশিশু প্রসব করিয়াছে। ঘটনাটি ঘটে ময়মনসিংহ জেলার নীলগঞ্জে। প্রসবের দুই ঘণ্টার মধ্যে একটি সর্পশিশুর মৃত্যু ঘটে। তবে অন্যটি এখনো সুস্থ আছে। ব্যাপারটি স্থানীয় জনগণের মনে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছে।

মন্তব্য গাঁজাখুরির একটা সীমা থাকা দরকার।

নীলু হাসিমুখে বলল, দাদুমণি মিথ্যা কথা একেবারেই সহ্য করতে পারেন না।

তিনি নিজে বুঝি সবসময় সত্যি কথা বলেন ?

তা বলেন।

যখন আমাদের মতো ছোট ছিলেন তখনো বলতেন ?

তা তো জিজ্ঞেস করিনি।

সাজ্জাদ গম্ভীরভাবে বলল, তখন তিনি ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলতেন। জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে।

নীলু হেসে ফেলল। হাসি আর থামতেই চায় না। এই সামান্য কথায় কেউ এত হাসে নাকি ?

একসময় তারা নীলুর পোষা ময়না দেখতে গেল। এই ময়নাটিকে নীলু নিজেই নাকি কথা বলা শিখিয়েছে। এমনভাবে শিখিয়েছে যাতে মনে হয় ময়না বুঝি সত্যি সত্যি কথা বলে। কেউ কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই ময়না বলবে, তোমার নাম কী ? তোমার নাম কী ?

নাম বলার পর ময়না দু'এক মিনিট চুপ করে থেকে বলবে, তুমি কেমন আছ ?

এই প্রশ্নের জবাব দিলেই ময়না বলবে, ওগো বাড়িতে মেহমান এসেছে।

দারুণ মজার ব্যাপার।

বিকেলবেলা দাদুমণি বললেন, এইবার রান্নাবান্না শুরু করা যাক। কী খাবে তোমরা ?

বল্টু গম্ভীর গলায় বলল, আমাদের খিদে নেই।

এটা তো ঠিক বললে না। তোমার খিদে না থাকতে পারে, কিন্তু অন্যদের নেই সেটা বুঝলে কী করে ?

নীলু খিলখিল করে হেসে উঠল।

সন্ধ্যার পর বল্টু বিনা নোটিসে কাঁদতে শুরু করল। দাদুমণি প্রথম কিছুক্ষণ এমন ভাব করলেন যেন দেখতে পাননি। সাজ্জাদ খুব অস্বস্তি বোধ করছিল। তার ধারণা নীলু

খুব হাসাহাসি করবে। কিন্তু নীলু হাসল না। সেও এমন ভাব করল যেন কিছু দেখতে পায়নি। শেষপর্যন্ত দাদুমণি বললেন, তোমার বোধহয় পেট ব্যথা করছে, তাই না ? বল্টু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, হ্যাঁ।

আমিও তাই ভেবেছিলাম। বাসার জন্যেও বোধহয় একটু খারাপ লাগছে। লাগছে না ?

লাগছে।

বাসায় তোমার কে কে আছেন ?

আব্বা, আম্মা আর দাদি।

সকাল হলেই ওরা কার্ফু তুলে নেবে। তখন সবার আগে আমি তোমাকে বাসায় পৌঁছে দেব। কেমন ?

বল্টু মাথা নাড়ল।

একটা তো মোটে রাত। দেখতে দেখতে কেটে যাবে। মাঝে মাঝে দেশের খুব বড় দুঃসময় আসে। তখন দেশের মানুষকে কষ্ট করতে হয়। এই যেমন আমরা করছি।

দাদুমণি কিছুক্ষণ থেমে থেকে মৃদুস্বরে বললেন, এই গণ্ডগোল, মিছিল কেন হচ্ছে তোমরা জানো ?

জানি।

কেন হচ্ছে ?

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করেছে, সেইজন্যে।

কিন্তু এর আগেও তো আমরা অনেক মিছিল-টিছিল করেছি। করিনি ?

করেছি।

সেগুলি কী জন্যে করেছি জানো ?

সবাই চুপ করে রইল। দাদুমণি বললেন, তোমাদের এসব জানা উচিত। চোখের সামনে এত বড় একটা আন্দোলন হচ্ছে। কেন হচ্ছে জানা উচিত না ?

জি।

আমি অনেকের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি। গোড়ার কথাগুলি অনেকেই জানে না। সমগ্র পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষ আছে, এই জিনিসটা জানো ?

না।

একধরনের মানুষ হচ্ছে শোষক, যারা শোষণ করে। আর অন্যধরনের মানুষ হচ্ছে শোষিত। অর্থাৎ এদের শোষণ করা হয়। পাকিস্তানের জন্ম হলো মুসলমানদের নিয়ে। তখন শোষিত মানুষরা ভাবল আর তাদের দুঃখকষ্ট থাকবে না। এইবার সুখ আসবে।

সুখ কিন্তু এল না। কারণ পাকিস্তানেও একদল আছে যারা শোষক। তারা ধনী, তাদের হাতে ক্ষমতা আছে। এদের বেশিরভাগই হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানি। দেশের রাজধানীও তাদের অংশে। কাজেই তারা জোরেসোরে শোষণ শুরু করল। এবং আমরা

পূর্বপাকিস্তানের মানুষরা হলাম শোষিত। আমাদের শোষণ করতে লাগল তারা, যাতে কিছুতেই মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারি। কাজেই আমরা তাদের ঘৃণা করতে শুরু করলাম। আমাদের এই ঘৃণা তারা কখন প্রথম বুঝতে পারল জানো ?

না, কখন ?

ভাষা আন্দোলনের সময়।

ভাষা আন্দোলনের সময় তাদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। তখন তারা বুঝতে পারল, আরে পূর্বপাকিস্তানের এই মানুষগুলি তো সহজ পাত্র নয়। কাজেই তারা এখন খুব সাবধান। এবং আমার কী মনে হয় জানো ? আমার মনে হয় এরা কিছুতেই শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা দেবে না।

সাজ্জাদ হঠাৎ বলে বসল, আমাদের হাতে ক্ষমতা আসলে আমরাও কি শোষক হয়ে যাব ?

যেতে পারি। হয়তো দেখা যাবে আমরা তখন পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ করতে শুরু করেছি। তখন হয়তো তারাও আন্দোলন শুরু করবে।

নীলু বলল, এসব শুনতে ভালো লাগছে না দাদুমণি। একটা ভূতের গল্প বলো।

দাদুমণি বললেন, এখন আর ভূতের গল্প বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না। ঠিক তখন কারেন্ট চলে গিয়ে চারদিকে অন্ধকার হয়ে গেল। উত্তরদিক থেকে খুব হইচই হতে লাগল। দাদুমণি দরজা খুলে কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ফিরে এসে বললেন, কোথায় যেন আগুন লেগেছে, উত্তরদিকে। বিরাট আগুন।

রাতের ভাত খাওয়ার সময় রেডিওতে বলল লেফটেনেন্ট জেনারেল টিক্কা খান পূর্বপাকিস্তানে আসছে।

বল্টু আবার কাঁদতে শুরু করল। দাদুমণি বললেন, কী হয়েছে বল্টু ? পেট ব্যথা করছে ?

না, বাসার জন্যে খারাপ লাগছে।

কার্ফু উঠলেই আমি তোমাকে বাসায় দিয়ে আসব।

বল্টু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, যদি কার্ফু না ওঠে ?

৭

কার্ফু তোলা হলো সকাল ন'টায়।

চারদিকে কেমন ছমছমে ভাব। যেন কিছু একটা হবে। কী হবে কেউ জানে না, কেউ কিছু বুঝতে পারছে না। যুবকদের চেহারা একই সঙ্গে রাগী ও বিষণ্ন।

এয়ারপোর্টে আমিন সাহেব মেয়েকে কোলে নিয়ে অপেক্ষা করছেন। ডাক্তার ভদ্রলোক বললেন, বাসায় না গিয়ে মেয়েকে সরাসরি কোনো হাসপাতালে নিয়ে যান। বডি ডিহাইড্রেটেড হয়ে গেছে। রাহেলা অস্থির হয়ে পড়েছেন, এতক্ষণেও নেওয়ার জন্যে কোনো গাড়ি আসছে না কেন ? তিনি বললেন, গাড়ি লাগবে না, চলো একটা বেবিট্যাক্সি নিয়ে চলে যাই।

এত মালপত্র কী করব ?

পড়ে থাকুক।

বেবিট্যাক্সি, রিকশার সংখ্যা খুব কম। বহু কষ্টে একটি জোগাড় করা গেল। রাস্তায় যানবাহন তেমন নেই। কিন্তু প্রচুর মানুষ। ছোট ছোট দল বানিয়ে জটলা পাকাচ্ছে। রাস্তার প্রতিটি মোড়ে ইপিআর-এর বড় বড় ভ্যান। ভ্যানের মাথায় মেশিনগান বসিয়ে সৈন্যরা অপেক্ষা করছে। আমিন সাহেব বললেন, দেখে মনে হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র। রাহেলা, অবস্থা দেখো।

তুমি দেখো। আমার দেখার শখ নেই।

এত সৈন্য নামিয়েছে শহরে, আশ্চর্য!

প্রিসিলা বলল, বাবা, আমি সৈন্য দেখব। রাহেলা ধমক দিলেন, সৈন্য দেখতে হবে না। শুয়ে থাকো। আমিন সাহেব বললেন, ওকে দেখতে দাও। দেখে অভ্যস্ত হোক। এ দেশের অবস্থা জানতে হবে না তাকে ?

না, জানার দরকার নেই। আমি এখানে থাকব না।

কোথায় যাবে ?

আমেরিকা। যেখান থেকে এসেছি সেখানে যাব।

আমিন সাহেব কিছু বললেন না। রাহেলা বললেন, এরকম দেশে মানুষ থাকতে পারে ?

কেন, মানুষ থাকছে না ? ওরা থাকতে পারলে আমরাও পারব। তাছাড়া অবস্থা এরকম থাকবে না।

কী করে তুমি জানো থাকবে না ?

এটা জানা যায়। সব খারাপ সময়ের পর আসে সুসময়।

সুসময় আসুক আর যাই আসুক, আমি এখানে থাকব না। তুমি যেতে না চাও থাকবে। আমি প্রিসিলাকে নিয়ে চলে যাব।

আমিন সাহেব কিছু বললেন না।

ফার্মগেটের সামনে এসে দেখা গেল প্রতিটি গাড়িকে থামানো হচ্ছে। দু'জন মিলিটারি এসে উঁকি দিচ্ছে প্রতিটি গাড়িতে। কাউকে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদও করছে। আমিন সাহেবকে অবশ্যি কিছু বলল না। হাত দিয়ে ইশারা করে চলে যেতে বলল। প্রিসিলা বলল, ওরা মিলিটারি, বাবা ?

হুঁ।

কী দেখছে ?

কী জানি কী ? তোমার শরীর কেমন লাগছে এখন ?

ভালো।

আবার বমি বমি লাগছে ?

নাহ্।

বাড়িতে গেলেই দেখবে শরীর পুরোপুরি সেরে গেছে। বাড়িতে পৌঁছেই ডাক্তার আনাব। ঠিক আছে?

প্রিসিলা বাধ্য মেয়ের মতো মাথা নাড়ল। বাড়ি পৌঁছতে অবশ্যি দেরি হলো অনেক। নীলক্ষেতের সামনে সমস্ত গাড়ি আটকে রাখা হয়েছে। যেতে দেওয়া হচ্ছে না। কেন দেওয়া হচ্ছে না তাও কেউ বলছে না। রাহেলা অসহিষ্ণু গলায় বললেন, কী হচ্ছে?

বুঝতে পারছি না তো।

আমি অসুস্থ মেয়ে নিয়ে রাস্তায় পড়ে থাকব নাকি?

কিছু তো করার নেই। অপেক্ষা করা যাক। বোধহয় মিছিল-টিছিল আসছে।

আমি থাকব না এদেশে। আমি আগামী সপ্তাহেই চলে যাব।

রাহেলা কেঁদে ফেললেন।

খোকন বাড়ির সামনের গেটের কাছে একা একা দাঁড়িয়ে ছিল। তার খুব ইচ্ছা, সে ভয়াল-ছয়ের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। কিন্তু বড়চাচা বলে দিয়েছেন, কেউ যেন বাড়ি ছেড়ে কোথাও না যায়। দারোয়ান গেটে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। বড়চাচার হুকুম ছাড়া তালা খোলার অনুমতি নেই। খোকন আশা করে আছে সাজ্জাদ বা বল্টু এদের কেউ তার খোঁজে আসবে। কিন্তু এখনো কেউ আসছে না। আসবে জানা কথা, কিন্তু এত দেরি করছে কেন?

ছোটচাচা যখন বেবিট্যাক্সি থেকে নামলেন তখনো খোকন গেটের কাছে দাঁড়িয়ে। তবু সে বুঝতে পারল না যে ছোটচাচা এসে পড়েছেন। তিনি ডাকলেন, এটা কে, খোকন না? খোকনের চোখ বড় বড় হয়ে গেল।

আমরা যে গতকাল আসছি সে টেলিগ্রাম পাসনি?

না তো।

যা, ভেতরে গিয়ে খবর দে।

খোকনের হুঁশ ফিরে এল, সে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গেল বাড়ির ভেতরে। আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির প্রতিটি মানুষ বেরিয়ে এল। বহুদিন এ বাড়িতে এরকম আনন্দের ব্যাপার হয়নি।

৮

কার্ফু ভাঙার সাথে সাথেই সাজ্জাদ ও বল্টু বেরিয়ে পড়ল। দাদুমণি সঙ্গে যেতে চাচ্ছিলেন কিন্তু তারা কিছুতেই সঙ্গে নেবে না। তারা নাকি নিজেরাই যেতে পারবে। নীলুরও দাদুমণিকে ছাড়ার ইচ্ছা নেই। বাসায় তার একা একা থাকতে ভয় লাগে।

দু'জনে প্রথমে গেল বল্টুদের বাসায়, কাওরান বাজারে। বাসায় তখন দারুণ কান্নাকাটি হচ্ছে। তার মা সারা রাত কেঁদেছেন। তিনবার ফিট হয়েছেন। বাবা মা'র পাশেই একটা মোড়াতে বসে আছেন। বল্টুর বড় দুভাই কার্ফু ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল

নিয়ে খুঁজতে বের হয়েছে। মা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন। বাবা বিড়বিড় করে বললেন, আগামী রোববারেই আমি ছুটি নিয়ে সবাইকে দেশের বাড়িতে রেখে আসব। ঝামেলা না মিটলে কাউকে ফিরিয়ে আনব না। বলতে বলতে তিনিও চোখ মুছতে লাগলেন।

সাজ্জাদ কী করবে ভেবে পেল না। চলে যাবে না আরও খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ? কাউকে কিছু না বলে চলে যাওয়াটা ভালো দেখায় না। আবার এরকম কান্নাকাটির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতেও ভালো লাগে না। বল্টুর বাবা বললেন, সাজ্জাদ, তুমি আর এ বাড়িতে আসবে না। তোমার পাল্লায় পড়ে ছেলের আজ এই অবস্থা। বুঝতে পারছ ? সাজ্জাদ মাথা নাড়ল।

যাও, এখন বাড়ি যাও। দাঁড়িয়ে আছ কেন ?

সাজ্জাদদের বাসা তেজকুনিপাড়া। সে থাকে তার বোন এবং দুলাভাইয়ের সঙ্গে। দুলাভাই লেদ মেশিন ওয়ার্কশপের একজন মেকানিক। লোকটি নিরীহ গোছের। সে নিশ্চয়ই সাজ্জাদকে দেখে তেমন কিছু বলবে না। হয়তো বলবে, এই রকম ঘোরাফেরা করা ঠিক না। আর যাবে না। অবশ্যি তার বোন খুবই রাগ করবে। আজ সারা দিন হয়তো কথাই বলবে না। ঘনঘন চোখ মুছবে।

সাজ্জাদ তাদের বাসার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কান্নাকাটির শব্দ শোনা যায় কি না। কোনো শব্দ নেই। কেউ কাঁদছে না। সে ঘরে ঢুকে দেখল তার বোন রান্নাঘরে। সাজ্জাদকে দেখেই সে বলল, তোর দুলাভাই কোথায় ?

আমি তো জানি না।

তুই জানিস না মানে ? তোর খোঁজে সেই সন্ধ্যাবেলা গেছে, আর তো আসে নাই।

কার্ফুর মধ্যে কোথায় গেল ?

আমি বললাম যাওয়ার দারকার নেই। তবু গেল।

সাজ্জাদের বোন সরুগলায় বলল, এখন কোথায় কোথায় ঘুরছে কে জানে। বোকাসোকা মানুষ।

কার্ফুর মধ্যে আটকা পড়েছে আর কী। আসবে, আসবে এখুনি।

তারা দুই ভাইবোন দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করল। কেউ এল না। সাজ্জাদের বোন কান্নাকাটি কিছুই করল না। সহজ-স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ঘরের কাজ করতে লাগল। দুপুরের পর সাজ্জাদ খুঁজতে বেরুল।

তখন শহরে মিছিলের পর মিছিল বেরুচ্ছে। উত্তেজিত মানুষের মুখে একটিমাত্র কথা—শেখ সাহেবের ভাষণ হবে ৭ তারিখে। সেই ভাষণে দারুণ একটা কিছু বলবেন তিনি।

সাজ্জাদ নানান জায়গায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াল। ফার্মগেট, নীলক্ষেত, আজিমপুর। সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরে শুনল তার বোন ক্ষীণস্বরে কাঁদছে। দুলাভাই এখনো ফিরেননি।

৯

খোকনের বাড়িতে সন্ধ্যাবেলা চায়ের একটা জমকালো আয়োজন করা হয়েছে। খোকনের মা এবং প্রিসিলা ছাড়া আর সবাই এসে বসেছে খাবার টেবিলে। প্রিসিলার জ্বর কমে গিয়েছে, তবে দুর্বল হয়ে গেছে। বিকেল থেকেই সে ঘুমুচ্ছে। খোকনের একজন মামা পিজির বড় ডাক্তার। তিনি এসে দেখে গিয়েছেন এবং বলেছেন, তেমন কিছু নয়। ট্রাভেল সিকনেস। দু'একদিন পুরোপুরি রেস্টে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে।

চায়ের টেবিলে ছোটরা কোনো কথা বলতে পারে না। কিন্তু আজ সবাই কথা বলছে। বড়চাচার মুখ হাসি হাসি। তাঁর হাসি দেখেই মনে হচ্ছে আজ আর তিনি রাগ করবেন না। ছোটচাচা একটির পর একটি মজার মজার গল্প বলে যাচ্ছেন—একবার বেড়াতে গিয়েছিলেন আলাস্কা। সেখানে ঠান্ডায় নাকি হঠাৎ তাঁর চোখের মণি জমে গেল। কিছুই দেখতে পান না। শেষকালে হাতের তালু দিয়ে চোখ ঘষে ঘষে গরম করার পর আবার দেখতে পেলেন।

তারপর একবার স্কুভা ডাইভিং করতে গিয়েছেন প্রশান্ত মহাসাগরে। পানির নিচে বেশিদূর যাননি, অল্প কিছুদূর গিয়েছেন। হঠাৎ তাঁর মনে হলো, পেছন থেকে তাঁর বাঁহাত ধরে কে যেন টানছে। তিনি চমকে পেছন ফিরে দেখলেন একটা দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড অক্টোপাস। অক্টোপাসটির সঙ্গে ছোট ছোট বাচ্চা। সেগুলি মা'র চারপাশে কিলবিল করছে। ভয়াবহ ব্যাপার!

ঘণ্টাখানেক গল্পগুজব হওয়ার পর বড়চাচা ছোটদের উঠে যেতে বললেন। হাসিমুখে বললেন, অনেকক্ষণ গল্প হয়েছে। এখন সবাই যাও। আমরা বড়রা কিছু কথা বলি। আজ আর পড়াশোনা করতে হবে না। আজ ছুটি।

এখন বড়দের গল্প মানেই দেশের কথা। কী হবে এই নিয়ে আলোচনা। তর্ক। এখানেও তাই হলো। সাত তারিখে কী বক্তৃতা হবে তাই নিয়ে কথা বলতে লাগলেন সবাই। বড়চাচা গম্ভীর হয়ে বললেন, শেখ সাহেব যা করছেন তার ফল ভালো হবে না। পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি দেশকে দুই ভাগ করে ফেলবার চেষ্টা করছেন।

এরকম মনে করার তো কারণ নেই। আছে কোনো কারণ ? ভুট্টো সাহেবরা যা করছেন সেটাই দেশকে দু'ভাগ করবে। নির্বাচনে যে জিতেছে সে ক্ষমতায় যাবে, এ তো সোজা কথা।

কিন্তু ক্ষমতায় গিয়েই তো দেশকে দু'ভাগ করার চেষ্টা করবে।

করবার আগেই সেটা বলছেন কেন ? অজুহাতটা খুব বাজে না ? দুর্বল অজুহাত না ? ধরেন, আজ যদি ভুট্টো শেখ মুজিবের মতো নির্বাচনে জিতত তাহলে কি তাকে সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী করা হতো না ?

বড়চাচা ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়তে লাগলেন এবং রেগে উঠতে লাগলেন। ঠিক তখন খোকন এসে বলল, বড়চাচা, আপনার সঙ্গে কথা বলব।

এখন না, পরে।

জি-না বড়চাচা, এখন। আমার সঙ্গে একটু বাইরের ঘরে আসেন। আসতেই হবে।

বড়চাচা বেশ অবাক হয়েই বাইরের ঘরে এসে দেখলেন সাজ্জাদ দাঁড়িয়ে আছে। সে তার শার্টের লম্বা হাতায় ঘনঘন চোখ মুছছে।

সাজ্জাদ না তোমার নাম ? কী হয়েছে ?

দুলাভাই হারিয়ে গেছেন—এই খবরটি বলতে সাজ্জাদের দীর্ঘ সময় লাগল বড়চাচা নিঃশব্দে শুনলেন। শান্তস্বরে বললেন, কার্ফু ভঙ্গের জন্যে ধরে নিয়ে থানায় রেখে দিয়েছে। থানায় খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে। তুমি কাঁদবে না, আমি খোঁজ করছি। তুমি কিছু খেয়েছ ?

জি-না।

খাও কিছু। খোকন, তোমার বন্ধুকে কিছু খাবার দিতে বলো।

আমার খিদে নেই, আমি কিছু খাব না।

সাজ্জাদ তুমি খাও। আমি খোঁজ করছি। কী নাম তোমার দুলাভাইয়ের ?

শমসের আলী।

বড়চাচা প্রথমেই ফোন করলেন রমনা থানায়।

আমি মোহাম্মদ রফিক চৌধুরী। আমার একটা খবর দরকার। গত রাতে কার্ফু চলার সময়ে শমসের নামের...।

বড়চাচা সব ক'টি থানায় ফোন করলেন। কেউ কোনো খরব দিতে পারল না। শমসের আলী নামের কেউ গত রাতে গ্রেফতার হয়নি। বড়চাচা ক্রমেই গম্ভীর হতে শুরু করলেন। একসময় বললেন, নিজে না গেলে হবে না। খোকন, ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলো। সাজ্জাদ, তুমিও চলো আমার সঙ্গে।

বড়চাচা রাত দশটা পর্যন্ত নানান জায়গায় ঘোরাঘুরি করলেন। কোনোই খবর পাওয়া গেল না। তিনি রাগী গলায় বললেন, একটা লোক আপনাআপনি নিখোঁজ হয়ে যাবে ? এটা একটা কথা হলো ? বড়চাচার কপালে ভাঁজ পড়ল। সাজ্জাদ ক্রমাগত চোখ মুছছে। তিনি একসময় বললেন, পুরুষমানুষদের কাঁদতে নেই। কান্না বন্ধ করো। আমি তোমার দুলাভাইকে খুঁজে বের করব। এখানকার ডিসিএমএলএ আমার পরিচিত। কাল দেখা করব তাঁর সঙ্গে। নাকি এখন যেতে চাও ? সাজ্জাদ জবাব দিল না। তিনি বললেন, চলো, এখনই যাওয়া যাক।

ডিসিএমএলএ-কে পাওয়া গেল না।

১০

সাত তারিখে শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দেবেন রেসকোর্সের মাঠে। ভোররাত থেকে লোকজন আসতে শুরু করেছে। দোকানপাট বন্ধ। অফিস-আদালত কিছু নেই। সবার দারুণ উৎকণ্ঠা, কী বলবেন এই মানুষটি ? সবাই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। খুব মন দিয়ে আজ শুনতে হবে তিনি কী বলেন। আজ তাঁকে পথ দেখাতে হবে। শোনাতে হবে অভয়ের বাণী।

হাজার হাজার মানুষ জমতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে রেসকোর্সের ময়দান জনসমুদ্রে পরিণত হলো। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী সবাই অপেক্ষা করছে। বাবার কাঁধে চেপে এসেছে শিশুরা। অবাক হয়ে তারা দেখছে এই বিশাল মানুষের সমুদ্রকে।

বহুদূরে অপেক্ষা করছে সারি সারি মিলিটারি ভ্যান। চোখে সানগ্লাস পরা তরুণ অফিসারদের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। সম্মিলিত শক্তি ভয়াবহ শক্তি। ওরা কি বুঝতে পারছে সে-কথা ? ঘনঘন কথা বলছে ওয়ারলেসে। মাথার ওপর দিয়ে অস্থির ভঙ্গিতে উড়ে যাচ্ছে হেলিকপ্টার। বিমান বাহিনীর পদস্থ অফিসাররা হেলিকপ্টারের জানালা দিয়ে নিচে তাকাচ্ছে। ওদের কপালেও ঘাম। নিঃশ্বাস পড়ছে দ্রুত। অপেক্ষা করছে তারাও।

সাজ্জাদ এসেছে খুব ভোরে। সে ঠিক বক্তৃতা শুনতে আসেনি। বক্তৃতা-টক্তৃতা তার বিশেষ ভালো লাগে না। সাজ্জাদ এসেছে তার দুলাভাইয়ের খোঁজে। তার মনে ক্ষীণ আশা, কোনো অলৌকিক উপায়ে তাকে হঠাৎ হয়তো পাওয়া যাবে। দেখা যাবে, মাঠের প্রান্তে পা ছড়িয়ে চীনাবাদাম খাচ্ছে। সাজ্জাদকে দেখামাত্র ডাকবে, অ্যাই যে, অ্যাই এই সাজ্জাদ। সাজ্জ বলবে, আরে দুলাভাই, আপনি এখানে!

এলাম, দেখি শেখ সাহেব কী বলেন।

এদিকে আপনার জন্যে আমরা অস্থির। আপা খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

তাই নাকি ?

আবার বলছেন তাই নাকি। এসব কী কাণ্ড দুলাভাই! চলেন বাসায় যাই।

যাব যাব। বসো আগে বক্তৃতাটা শুনি। বাদাম খাবে ?

না।

আরে খাও না। অ্যাই, অ্যাই বাদামওয়ালা।

বাস্তবে অবশ্যি সেরকম কিছুই হলো না। কত অসংখ্য মানুষ এসেছে। কিন্তু কারও সঙ্গে কারও চেহারার কোনো মিল নাই। সাজ্জাদের হঠাৎ মনে হলো, এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার তো। সব পশু দেখতে একরকম। দুটি শিয়ালের মধ্যে প্রভেদ কিছু নেই। কিন্তু মানুষরা কত আলাদা। কেন, এরকম কেন ?

সাজ্জাদ চমকে পেছন ফিরল। খয়েরি রঙের একটা চাদর গায়ে দিয়ে হেড স্যার দাঁড়িয়ে আছেন। সাজ্জাদের মনে হলো, সভাতে আসার জন্যে হেড স্যার প্রথমেই একটা প্রচণ্ড ধমক দেবেন। কিন্তু সেরকম কিছু হলো না। স্যার অস্বাভাবিক নরম গলায় বললেন, সাজ্জাদ, একটা খবর শুনলাম তোমার দুলাভাইয়ের সম্পর্কে, এটা কি সত্যি ? ওনাকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না ?

সত্যি, স্যার।

বলো কী ? আত্মীয়স্বজনকে খবর দিয়েছ তো ?

জি স্যার।

আত্মীয়স্বজন কে কে আছেন ?

সাজ্জাদ চুপ করে রইল। তার তেমন কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। এক মামা আছেন কুড়িগ্রামে, পোস্টমাস্টার। নিকটআত্মীয় বলতে তিনি। তাঁর সঙ্গে বহুদিন যাবত যোগাযোগ নেই। হেড স্যার বললেন, তোমাদের চলছে কীভাবে ? সঞ্চয় তো মনে হয় তেমন কিছু তোমার দুলাভাইয়ের ছিল না। নাকি ছিল ? সাজ্জাদ জবাব দিল না। হেড স্যার চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন, কাল তুমি অবশ্যই আমার সঙ্গে দেখা করবে। বাসা চেনো তো ?

চিনি স্যার।

সকালবেলা আসবে।

জি আচ্ছা।

এখানে দাঁড়িয়ে তো কিছু শুনতে পাবে না। আরেকটু সামনে যাওয়া দরকার। চলো সামনে যাই।

আপনি যান স্যার। আমি বাসায় চলে যাব।

সে-কী! ভাষণ শুনবে না ?

জি-না স্যার।

আচ্ছা ঠিক আছে, যাও। কাল সকালবেলা মনে করে আসবে। মনে থাকবে তো ?

থাকবে স্যার।

সাজ্জাদ বাসায় গেল না। নীলুদের বাসার দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিল। তার একটু লজ্জা করতে লাগল। এক সপ্তাহ পর আসছে এখানে। দাদুমণি খুব করে বলে দিয়েছিলেন একটা খবর দেওয়ার জন্যে।

দরজা খুলল নীলু। সে থমথমে গলায় বলল, খুব বকা খাবে দাদুমণির কাছে। দাদুমণি খুব রেগেছেন তোমার ওপর। আমাকে বলেছেন এলেও যেন ঢুকতে না দেই।

দাদুমণি অবশ্যি তেমন রাগ করলেন না। কিংবা রাগটা জমা করে রাখলেন, পরে করবেন। তিনি বললেন, তুমি আমি না-আসা পর্যন্ত থাকবে এখানে। আমি শেখ সাহেবের ভাষণ শুনতে যাচ্ছি। নীলু বলল, সে তো দাদুমণি রেডিওতে শুনলেই হয়।

না, এসব জিনিস সভাতে উপস্থিত থেকে শুনতে হয়। রেডিওতে শুধু কথাগুলি শোনা যাবে। কিন্তু বক্তৃতা শুনে মানুষের চোখেমুখে কী পরিবর্তন হচ্ছে সেটা দেখা যাবে না। আমার কাছে বক্তৃতার চেয়ে এইসব জিনিসই দেখতে ভালো লাগে।

দাদুমণি চলে যাওয়া মাত্র নীলু বলল, তোমাদের কথা আমার রোজ মনে হয়েছে। আশ্চর্য, একবারও তোমরা এলে না।

এলাম তো।

এক সপ্তাহ পর এলে। দাদুমণি যতটুকু রাগ করেছে আমি তারচেয়েও বেশি রাগ করেছি। আমি কোনো কথাই বলব না।

আমার একটা বড় বিপদ হয়েছে। আমার দুলাভাইকে খুঁজে পাচ্ছি না।

খুঁজে পাচ্ছ না মানে ?

কার্ফুর রাতে আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন, তারপর আর ফিরে আসেননি।

সাজ্জাদের চোখ দিয়ে জল পড়তে শুরু করল। নীলু তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে। একসময় দেখা গেল সেও কাঁদতে শুরু করেছে। তার পোষা ময়না ক্রমাগত ডাকতে লাগল, কুটুম এসেছে, বসতে দাও।

ঠিক তখনই রেসকোর্সে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা শুরু করলেন। তাঁর মুখ দিয়ে কথা বলে উঠল বাংলাদেশ।

> আমি যদি তোমাদের কাছে না থাকি, তোমাদের উপর আমার আদেশ রইল ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো, তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত হও। রক্ত যখন দিতে শিখেছি আরও দেব। বাংলাকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ্।

১১

মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে রাহেলা গম্ভীর হয়ে পড়লেন। বেশ জ্বর গায়ে। জ্বরের আঁচে গাল লাল হয়ে আছে। অথচ সকালে বেশ ভালো ছিল। অনজু ও বিলুর সঙ্গে হইচই করে খেলেছে।

কেমন লাগছে মা ?

ভালো লাগছে।

মাথাব্যথা করে ?

নাহ্।

শরীর খারাপ লাগছে না ?

না তো।

রাহেলা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, তুমি একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই আমরা নর্থ ডাকোটায় চলে যাব।

আমি যেতে চাই না মা।

যেতে চাও না কেন ? আমেরিকা তোমার ভালো লাগে না ?

লাগে।

তাহলে যেতে চাও না কেন ? কী আছে এখানে বলো ? হইচই গণ্ডগোল। ছিঃ ছিঃ। আমেরিকাতে আমরা ভালো ছিলাম না ?

ছিলাম।

এবার গিয়েই আমরা একটা বাড়ি কিনে ফেলব। বড় একটা দোতলা বাড়ি। সেখানে বেসমেন্টে থাকবে তোমার খেলার ঘর। শীতের সময় যখন বরফ পড়বে তখন আমরা দু'জনে মিলে স্নোম্যান বানাব, কেমন ? গাজর দিয়ে বানাব নাক। কালো বোতাম দিয়ে চোখ, কেমন ?

প্রিসিলা জবাব দিল না। ঘরের দরজায় অনজু আর বিলু উঁকি দিচ্ছিল। তাদের হাতে লুডু বোর্ড। রাহেলা বললেন, প্রিসিলার জ্বর। প্রিসিলা খেলবে না। তোমরা এখন ওকে বিরক্ত করবে না।

প্রিসিলা বলল, মা, আমি ওদের সঙ্গে খেলতে চাই।

না। তুমি চুপচাপ শুয়ে থাকবে।

শুয়ে থাকতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে না।

ইচ্ছে না হলেও থাকবে। আমি ডাক্তারকে টেলিফোন করছি।

রাহেলা নিচে নেমে গেলেন। নিচে গিয়ে দেখলেন, কবীর পাংশুমুখে বসে আছে একটা চেয়ারে। তার ঠোঁট কাটা, সেখানে রক্ত জমে আছে। আমিন সাহেব বসে আছেন তার সামনে। রাহেলা বললেন, কী হয়েছে ?

মিছিলে গিয়েছিলাম চাচি। হঠাৎ পুলিশ তাঁড়া করল। দৌড়াতে গিয়ে উল্টে পড়ে গেছি।

ঠোঁট তো দেখি অনেকখানি কেটেছে।

না, বেশি না।

আমিন সাহেব বললেন, খুব মিছিল হচ্ছে, না ?

খুব হচ্ছে।

ওদের এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা, ঠিক না ?

আমিন সাহেব হেসে উঠলেন। রাহেলা গম্ভীর হয়ে বললেন, হাসির কোনো ব্যাপার হয়নি। তুমি হাসছ কেন ?

হাসির ব্যাপার না, তবে আনন্দের ব্যাপার।

আনন্দের ব্যাপারটা কোথায় ?

আমিন চাচা গম্ভীর হয়ে বললেন, একটা সিংহ তার ক্ষমতা বুঝতে পারছে, ব্যাপারটা আনন্দের নয় ? রাহেলা জবাব দিলেন না। ডাক্তারকে টেলিফোন করতে গেলেন। টেলিফোনে রিং হচ্ছে না। অনেকবার চেষ্টা করা হলো। রাহেলা মুখ কালো করে বললেন, পৃথিবীর কোনো দেশে এত খারাপ টেলিফোন সার্ভিস আছে বলে আমার জানা নেই।

খোকনের সমস্তটা দিন খুব খারাপ কেটেছে। ভয়াল-ছয়ের একজন মানুষকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি। বল্টু ও টুনু দু'জনেই দেশের বাড়িতে চলে গেছে। অবস্থা ভালো না হলে এরা ফিরে আসবে না। সাজ্জাদকেও তার বাসায় পাওয়া গেল না। সে কোথায় গেছে কী তাও জানা গেল না। সাজ্জাদের বোন কোনো কথারই জবাব দিতে পারেন না। শুধু কাঁদেন। অনেক ঝামেলা করে মুনিরকে পাওয়া গেল। মুনিরের কাছে স্যার এসেছেন, ইংরেজি পড়াচ্ছেন। মুনির এক ফাঁকে বলে গেল, একটু দাঁড়া, স্যার এক্ষুনি চলে যাবেন।

খোকন অপেক্ষা করতে লাগল। স্যার যেতে অনেক দেরি করলেন। বসে থাকতে থাকতে খোকনের প্রায় যখন ঘুম ধরে গেল তখন স্যার গেলেন। খোকন বলল, দুপুরে পড়িস তুই ?

হুঁ। বাবা স্যার রেখে দিয়েছেন। স্কুল তো এখন বন্ধ, কাজেই ঘরে বসে যতটুকু পারা যায়। তোদের ভয়াল-ছয়ের কী অবস্থা ?

ভালোই।

ভালো আর কোথায়! সব তো চলেই গেছে। তুই আর সাজ্জাদ এই দু'জন ছাড়া তো এখন আর কেউ নেই।

ওরা আবার আসবে, তখন হবে।

এসব জিনিস একবার ভেঙে গেলে আর হয় না।

তোকে বলেছে।

খোকনের বসে থাকতে ভালো লাগছিল না। সে একসময় বলল, ঘুরতে যাবি ?

কোথায় ?

ওই রাস্তায়, আর কোথায় ?

না ভাই। বাবা রাগ করবেন। তাছাড়া বিকেলে আমার কাছে আরেকজন স্যার আসবেন। অঙ্ক স্যার।

কয়টা স্যার তোর ?

বেশি না এই দু'জনই। বৃত্তি পরীক্ষা আসছে তো, তাই।

খোকন একা একা অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াল। ফার্মগেট থেকে হেঁটে হেঁটে চলে গেল শাহবাগ অ্যাভিনিউ পর্যন্ত। শাহবাগের মোড়ে কিসের যেন জটলা। লোকজন বলাবলি করছে 'জঙ্গী মিছিল' আসছে পুরনো ঢাকা থেকে, একটা কাণ্ড হবে। একজন স্যুট টাই পরা ভদ্রলোক বললেন, খোকা তুমি বাড়ি যাও। খোকন বাড়ি গেল না। পাক মটরস পর্যন্ত গিয়ে চলে গেল কলাবাগানের দিকে। সেখানেও প্রচুর গণ্ডগোল, একটা পুলিশের ট্রাক পুড়ছে। সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে। খোকনের দেখার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও ভিড় গলে ভেতরে ঢুকতে পারল না। একটা দমকলের গাড়ি এসে থেমে আছে। কেউ সেটাকে যেতে দিচ্ছে না। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, আশপাশে কোথাও পুলিশ বা মিলিটারির কোনো চিহ্ন নেই। খোকন কলাবাগানে কাটাল বিকেল পর্যন্ত। বাড়ি ফিরতে তাই সন্ধ্যা মিলিয়ে গেল। বড়চাচা আজ নির্ঘাৎ ধরবেন। আজ বাড়িতে ভূমিকম্প হবে।

বড়চাচা অবশ্যি তাকে ধরলেন না। ধরলেন কবীর ভাইকে। রাতের খাবার শেষ হয়ে যাওয়ার পরপরই বিচারসভা বসল। আসামি মাত্র একজন। কবীর ভাই। বিচারসভা বসল বড়চাচার লাইব্রেরিঘরে। সবাই সেখানে উপস্থিত। কবীর ভাই মাথা নিচু করে সোফার একটা কোনায় বসে আছেন। বড়চাচা থেমে থেমে বললেন, তুমি একবার সকালবেলা একটা মিছিলের সঙ্গে জুটে গিয়ে ঠোঁট কেটে এলে। তারপরও বিকেলবেলা

আবার গেলে! অথচ আমি অনেকবার বলেছি এসব মিটিং-মিছিল থেকে দূরে থাকবে। এই প্রসঙ্গে তোমার কী বলার আছে ?

কবীর ভাই চুপ করে রইলেন।

তোমার কিছু বলার থাকলে বলে ফেলো। তোমার কি ধারণা যা করছ দেশের জন্যে করছ ?

জি।

ভুল ধারণা। হাঙ্গামা হুজ্জত করে দেশের কিছু হবে না। এতে দেশের অমঙ্গলই হবে, মঙ্গল হবে না। বুঝতে পারছ ?

কবীর ভাই কিছু বললেন না। খোকনের আব্বা হঠাৎ কথা বলে উঠলেন। শান্তস্বরে বললেন, আপনার কথাটা ঠিক না। আন্দোলন করে অনেক কিছু আদায় করা যায়। ভাষা আন্দোলনের কথা মনে করে দেখুন। সেদিন আমরা আন্দোলন না করলে আজ রাস্তাঘাটে উর্দুতে কথা বলতাম।

আন্দোলনের অনেক রকম পথ আছে। গান্ধিজী অহিংস পথে দেশকে স্বাধীন করেছেন।

আমিন চাচা বললেন, তার জন্যে গান্ধিজীর মতো নেতা দরকার। সেরকম যখন নেই তখন আমাদের পথে নামা ছাড়া উপায় কী ?

এইসব বাচ্চা ছেলেপুলে পথে নামবে ?

নামবে না কেন ? নামবে। অল্পবয়স থেকেই তাদের শিখতে হবে।

বড়চাচা দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বললেন, ভুট্টো সাহেব এসেছেন। আলোচনায় বসেছেন। এখন সব মিটমাট হবে। মিছিল ফিছিলের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। এতে ওদেরকে শুধু খেপিয়েই তোলা হবে। কবীর আমার হুকুম অমান্য করেছে। কাজেই এর শাস্তিস্বরূপ সে আগামী এক সপ্তাহ ঘর থেকে বেরোতে পারবে না। কবীর, আমি কী বলেছি তুমি বুঝতে পারছ ?

পারছি।

আর শোনো, যদি আমার কথার অবাধ্য হয়ে আবার বের হয়ে যাও তাহলে এ বাড়িতে এসে আর ঢুকতে পারবে না।

বড়চাচা দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে অসম্ভব গম্ভীর হয়ে পড়লেন।

রাত দশটায় ভয়েস অব আমেরিকা থেকে বলা হলো—শেখ মুজিব ও ভুট্টোর মধ্যে কথাবার্তা এগোচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় তারা একটা আপসে পৌঁছবার চেষ্টা করছেন। শহরের পরিস্থিতি আগের মতোই। চারদিকে থমথমে ভাব যা ঝড়ের ইঙ্গিত দেয়।

রাতে ঘুমুতে যাওয়ার আগে খোকনের মা খোকনকে ডেকে পাঠালেন। কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, তুই আজও গিয়েছিলি ? খোকন চুপ করে রইল। তিনি খুব কাঁদতে লাগলেন। খোকন বলল, কাঁদছ কেন ?

কাঁদব না! তুই যেখানে সেখানে যাবি। আমি খোঁজও নিতে পারি না তুই কোথায় যাস কী করিস। আর কোথাও যাবি না।

আচ্ছা।

আমার গা ছুঁয়ে বল কোথাও যাবি না।

খোকন মাথা নিচু করে বসে রইল।

আয় না বাবা, আয়।

খোকন এগিয়ে যেতেই মা তার হাত ধরে ফেললেন। খোকনের কেন জানি খুব লজ্জা করতে লাগল।

১২

সাজ্জাদের বাড়ি ফিরতে ভালো লাগে না।

তার বোনটি সারাক্ষণ কাঁদে। কাঁদে নিঃশব্দে। সাজ্জাদ কিছুই করতে পারে না। শুধু বসে থাকে চুপচাপ। বড়ই একা একা লাগে তার।

মামাকে টেলিগ্রাম করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কোনো খবর এখনো এসে পৌঁছায়নি। এখন তারা কী করবে তা বুঝতে পারছে না। দেশের বাড়িতে চলে যাবে? কিন্তু কেউ নেই সেখানে। ছোট্ট একটা বাড়ি ছিল। নদীর ভাঙনে কোথায় চলে গেছে। কে এখন আর জায়গা দেবে? তাছাড়া সাজ্জাদের বোন কোথাও যেতে চায় না। যদি কখনো মানুষটি ফিরে আসে? রাতেরবেলা খুব কম করে হলেও সে দশবার জেগে উঠবে। সাজ্জাদকে ডেকে বলবে—মনে হলো কেউ যেন এসেছে, আয় দরজাটা খুলি।

কেউ না আপা।

খোল না তুই। এরকম করছিস কেন?

দরজা খোলা হয়। কোথাও কিছু নেই। একটা কুকুর দরজার পাশে বসে হাই তুলছে শুধু।

সাজ্জাদের বয়স দ্রুত বেড়ে যেতে লাগল। আমাদের বয়স বাড়ে অভিজ্ঞতার সঙ্গে। সেই সময়ে অত্যন্ত দ্রুত সাজ্জাদের অভিজ্ঞতা বাড়তে লাগল। একদিন সে তার বোনের দুল নিয়ে বিক্রি করে এল সোনার দোকানে। দোকানি খুব সন্দেহ নিয়ে তাকাচ্ছিল তার দিকে। সরুগলায় বলেছিল, কার গয়না খোকাবাবু?

আমার বড়বোনের।

তাকে বলে এনেছ?

হ্যাঁ। সে নিজেই দিয়েছে।

দেখো খোকাবাবু, তুমি তোমার বোনকে সঙ্গে করে নিয়ে আসো।

কেন?

আমার মনে হচ্ছে জিনিসটা তুমি না বলে এনেছ। তুমি যাও, বোনকে নিয়ে আসো। আর শোনো, অন্য দোকানে যাবে না। তুমি ছোট মানুষ, ঝামেলা-টামেলা হবে।

সাজ্জাদ বোনকে নিয়ে এসেছিল। তারপরও দুদিন আসতে হলো। একবার একটি চুড়ি নিয়ে। আরেকবার আংটি নিয়ে। দোকানদার এরপর আর কিছু বলত না। সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিত। শেষবার খুব শান্তগলায় বলল, এভাবে আর কত দিন চলবে ? এবার তো অন্য কিছু চেষ্টা করা দরকার।

কী চেষ্টা করব ?

একটা কাজ-টাজ করার চেষ্টা কেমন মনে হয় ?

কী কাজ ?

তাও ঠিক। তোমার যে বয়স তাতে কী কাজ আর করবে ? তবে খোকাবাবু দিন আর এরকম থাকবে না। তুমি ভেঙে পড়বে না। দেশের অবস্থা বদলাবে। মানুষের ভাগ্যও বদলাবে। তুমি কি কিছু খাবে ?

জি-না।

খাও। একটা কিছু খাও। এই যা তো একটি মিষ্টি আন। বুঝলে খোকাবাবু, এখন তোমার যে দুঃসময় সে দুঃসময় আমাদের সবার। তবে এটা থাকবে না।

এই লোকটির সঙ্গে সাজ্জাদের বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। তার দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় সাজ্জাদ উঁকি দিত আর সে হাসিমুখে বলত, আরে খোকাবাবু যে, এসো এসো। দেশের কী খবর বলো তো ? ওরে, একটা মিষ্টি দিতে বল তো। অনেক রকম গল্পগুজব হতো তার সঙ্গে। মজার মজার সব গল্প।

বুঝলে খোকাবাবু, গয়নার দোকানের মালিকরা মানুষের দুঃখের গল্পগুলি খুব ভালো জানে। আমরা চোখের সামনে কতজনকে নিঃস্ব হতে দেখি। বড় খারাপ লাগে খোকাবাবু।

সাজ্জাদ বুঝতে পারে তারা নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। প্রায়ই তার বোন ভয় পাওয়া গলায় বলে, এখন কী হবে ? সাজ্জাদ জবাব দিতে পারে না।

আর কয়েকদিন পর তো ঘরে রান্না হবে না। তখন কী করবি ?

আমি কাজ করব।

তোকে কে কাজ দেবে ? এবার তোর দুলাভাইয়ের অফিসে বরং যা। দেখ ওরা কী বলে।

ওরা কী বলবে ?

জানি না কী বলবে। গিয়ে দেখ না।

একদিন সাজ্জাদ গেল সেখানে। এবং আশ্চর্য, লোকগুলি খুবই যত্ন করল তাকে। বারিন বাবু বলে এক ভদ্রলোক বললেন, তুমি চিন্তা করবে না। এই কারখানাতেই তোমার একটা ব্যবস্থা করব। পড়াশোনা যা করছিলে তা-ই করবে, অবসর সময়ে কাজ শিখবে। ফেরার সময় বারিন বাবু বললেন, তোমার দুলাভাইয়ের কাছ থেকে একবার পঞ্চাশ টাকা ধার করেছিলাম, সেটা ফেরত দেওয়া হয়নি। তোমার কাছে দিয়ে দেই, কেমন ? তখন দেখা গেল আরও অনেকেই একই কথা বলছে। কেউ দশ টাকা ধার নিয়েছিল। কেউ কুড়ি টাকা।

সাজ্জাদের মনে হলো লোকগুলি মিথ্যা কথা বলছে। কিন্তু মাঝে মাঝে মিথ্যা কথা এমন মধুর হয় কী করে কে জানে। তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

বারিন বাবু তাকে কোলে করে একটি রিকশায় এনে তুলে দিলেন। ভরাট গলায় বললেন, তোমরা কোথায় থাকো জানতাম না। জানলে আরও আগে এসে খোঁজ নিতাম। এখন থেকে খোঁজখবর রাখব। তোমার কোনো ভয় নাই।

সাজ্জাদ বাড়ি ফিরে দেখে দাদুমণি ও নীলু বসে আছে তাদের বাসায়। নীলুর মুখ দারুণ হাসিহাসি। এবং আশ্চর্য, বহুদিন পর দেখা গেল তার বোন কাঁদছে না। দাদুমণি বললেন, এই যে সাজ্জাদ বাবু, তুমি কোথায় ছিলে ? তোমার জন্যেই বসে আছি। কাপড়চোপড় রেডি করো, সময় নাই।

সাজ্জাদ অবাক হয়ে তাকাল।

তোমরা দুজন এখন থেকে আমাদের সঙ্গেই থাকবে। তোমার বোনকে রাজি করিয়েছি।

সাজ্জাদ কিছু বুঝতে পারল না।

তোমার কোনো সুবিধার জন্যে বলছি না। আমার এবং নীলুর সুবিধার জন্যে। নীলু একা একা থাকে। তোমরা থাকলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুরাঘুরি করতে পারি। তাই না গো দাদুমণি ? নীলু হাসিমুখে বলল, হ্যাঁ। দাদুমণি বললেন, ঢাকায় আমরা কতদিন থাকতে পারি তা অবশ্যি জানি না। যদি শেখ মুজিব আর ভুট্টোর মধ্যে কথাবার্তায় কোনো ফল না হয় তাহলে ঢাকা ছাড়তে হবে। আমরা সবাই মিলে তখন গ্রামে চলে যাব। নীলগঞ্জে আমার একটা বড় বাড়ি আছে। নীলু হাসিমুখে বলল, খুবই সুন্দর বাড়ি। বাড়ির পাশে একটা ছোট নদী আছে। নদীর নাম সোহাগী।

সাজ্জাদের বোন ইতস্তত করে বলল, ওর দুলাভাই যখন ফিরে এসে দেখবে কেউ নাই তখন ?

আমরা এ পাড়ার সবাইকে বলে যাব। তাছাড়া সে আমাদের খুঁজে বের করবে। আমরা তো তাকে কম খোঁজাখুঁজি করিনি, কী বলো ?

১৩

পঁচিশে মার্চ দুপুর থেকেই সবার ধারণা হলো কিছু একটা হয়েছে। হয়তো ভুট্টো আর ইয়াহিয়া ঠিক করে ফেলেছে এ দেশের মানুষদের কোনো কথা শোনা হবে না। চারদিক থমথম করতে লাগল। খোকনের বড়চাচা দুপুর একটায় অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে ঘরে ফিরলেন। ফিরেই বললেন, আজ যেন কেউ ঘর থেকে না বের হয়। সবাই যেন ঘরে থাকে। কবীর কোথায়, কবীরকে ডাকো।

কবীরকে কোথাও পাওয়া গেল না। বড়চাচা থমথমে গলায় বললেন, ও কোথায় গিয়েছে ?

কেউ জবাব দিতে পারল না।

খোকনকে ডাকো।

খোকন নিচে এমে এল। বড়চাচা বললেন, কবীর কোথায় জানো ?

জি-না।

তুমি আজ ঘর থেকে বেরুবে না।

কেন চাচা ?

শহরের অবস্থা ভালো না। শহরে মিলিটারি নামবে এরকম একটা গুজব শোনা যাচ্ছে।

খোকন কিছু বুঝতে পারল না। মিলিটারি তো নেমেই আছে। নতুন করে নামবে কী! বড়চাচা বললেন, তোমার ওই বন্ধুটি, সাজ্জাদ যার নাম, ও কোথায় আছে ?

ও আছে দাদুমণির বাসায়।

কার বাসায় ?

একজন বুড়ো ভদ্রলোকের বাসায়। ওনাকে আমরা দাদুমণি ডাকি।

করেন কী উনি ?

আমি জানি না চাচা।

তাঁর বাসায় আমাকে একদিন নিয়ে যাবে। আমি ওই ছেলেটির জন্যে কিছু করতে চাই।

জি আচ্ছা, আমি নিয়ে যাব।

এখন যাও দারোয়ানকে ডেকে নিয়ে এসো।

দারোয়ান আসামাত্র বড়চাচা বললেন, কবীর যখন ফিরবে তাকে ঢুকতে দেবে না। বলবে এ বাড়িতে তার জায়গা নেই। সে যেন তার নিজের পথ দেখে নেয়। বুঝলে ?

আমিন চাচা সন্ধ্যাবেলা মুখ কালো করে ঘরে ফিরলেন। চা খেতে খেতে বললেন, শেখ মুজিবুর রহমান যে প্রেস কনফারেন্স ডেকেছিলেন সেটা বাতিল হয়ে গেছে। ব্যাপার কী কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

খোকনরা যখন ফার্স্টব্যাচে খেতে বসেছে তখন দারোয়ান এসে খবর দিল কবীর ভাই এসেছে, গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বড়চাচা বললেন, তুমি এই খবরটি আমাকে দিতে এসেছ কেন ? তোমাকে বলে দিয়েছি না ওকে ঢুকতে দেবে না। যাও, যা বলেছি তাই করো।

বড়চাচি বললেন, সে কোথায় থাকবে রাতে ?

যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকবে। এ বাড়িতে না।

তুমি এটা ঠিক করছ না।

আমি যা করছি ঠিকই করছি।

না, ঠিক করছ না।

ওপর থেকে খোকনের বাবা নেমে এলেন। তিনি অত্যন্ত শান্তগলায় বললেন, ভাইয়া, ছেলেটাকে ঘরে আসতে দেন।

যে ছেলে আমার কথা শোনে না সে আমার বাড়িতে থাকবে না।

আমরা বড়রা মাঝে মাঝে ভুল কথা বলি। সেসব কথা সবসময় মানা যায় না।

আমি ভুল কথা বলি ?

না, আপনি ভুল কথা কম বলেন। কিন্তু এই একটি ক্ষেত্রে ভুল করছেন। সবাইকে মূল আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছেন। এটা ঠিক না।

বড়চাচা তাকিয়ে রইলেন। খোকনের বাবা শান্তস্বরে বললেন, অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে মনে হয় একসময় এসব বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদেরই বন্দুক হাতে তুলে নিতে হবে। আপনি নিশ্চয়ই চান না আপনার ছেলেমেয়েরা পরাধীন হয়ে থাক। চান ? বলুন, আপনি চান ?

না, চাই না।

তাহলে এমন করছেন কেন ?

বড়চাচা ক্লান্তস্বরে বললেন, ওকে ভেতরে আসতে বলো। যাও, বলো ভেতরে আসতে।

দারোয়ান ছুটে গেল। কিন্তু গেটের বাইরে কাউকে পাওয়া গেল না। আমিন চাচা তক্ষুনি খুঁজেতে বের হলেন। বড়চাচি কাঁদতে শুরু করলেন।

খোকন অনেক রাতপর্যন্ত জেগে রইল। যদি কবীর ভাই ফিরে আসেন। আমিন চাচা ফিরলেন দশটায়। কবীর ভাইকে কোথাও পাননি। তার মুখের ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছে তিনি ভীষণ চিন্তিত।

গভীর রাতে খোকনকে ডেকে তোলা হলো। বাবা এসে খুব নরম গলায় বললেন, খোকন, তোমার মা'র শরীর খুব খারাপ, এসো, মায়ের পাশে বসো।

মায়ের ঘরে সবাই আছেন। বড়চাচা মাথা নিচু করে বসে আছেন একটি ছোট চেয়ারে। বড়চাচী মা'র হাত ধরে কাঁদছেন। মায়ের মুখ নীল বর্ণ। নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না। বারবার কেঁপে উঠছেন। নার্সটি বলল, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। এক্ষুনি হাসপাতালে নেওয়া দরকার। কিন্তু সবাই এমন ভাব করছে যেন তার কথা কেউ শুনেতে পাচ্ছে না। খোকন অবাক হয়ে তাকাল বাবার মুখের দিকে। কেন, হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে না কেন ? বাবা শান্তস্বরে বললেন, পাকিস্তানি মিলিটারিরা আক্রমণ শুরু করেছে খোকন। রাস্তায় মিলিটারি ছাড়া আর কিছু নেই। আজ রাতে কাউকে পাওয়া যাবে না। আজ রাতে কিছুই করার নেই।

খোকন নিজেও শুনতে পেল প্রচণ্ড গোলাগুলি হচ্ছে। ট্যাংক নেমে গেছে রাস্তায়। বড়চাচা মৃদুস্বরে কী যেন বললেন। কেউ শুনতে পেল না। নার্স আবার বলল, একজন ডাক্তার দরকার। সবাই চুপ করে রইল।

বাবা বললেন, খোকন, মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াও।

শুরু হলো একটি অন্ধকার দীর্ঘ রাত। মানুষের সঙ্গে পশুদের একটা বড় পার্থক্য আছে। পশুরা কখনো মানুষদের মতো হৃদয়হীন হতে পারে না। পঁচিশে মার্চের রাতে হৃদয়হীন একদল পাকিস্তানি মিলিটারি এ শহর দখল করে নিল।

তারা উড়িয়ে দিল রাজারবাগ পুলিশ লাইন। জগন্নাথ হল ও ইকবাল হলের প্রতিটি ছাত্রকে গুলি করে মারল। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ঢুকে হত্যা করল শিক্ষকদের। বস্তিতে শুয়ে থাকা অসহায় মানুষদের গুলি করে মেরে ফেলল বিনা দ্বিধায়। বাঙালিদের বেঁচে থাকা না-থাকা কোনো ব্যাপার নয়। এরা কুকুরের মতো প্রাণী, এদের মৃত্যুতে কিছুই যায় আসে না। এদের সংখ্যায় যত কমিয়ে দেওয়া যায় ততই মঙ্গল। এদের মেরে ফেলো। এদের শেষ করে দাও।

এক রাতে এ শহর মৃতের শহর হয়ে গেল। অসংখ্য বাবা তাঁদের ছেলেমেয়ের কাছে ফিরে গেল না। অসংখ্য শিশু জানল না বড় হয়ে ওঠা কাকে বলে। বেঁচে থাকার মানে কী?

শহরের জনশূন্য পথে দৈত্যাকৃতি ট্রাক চলল। ধ্বংস ও মৃত্যু। স্বজনহারা মানুষদের কান্নার সঙ্গে ঠাঠা শব্দে গর্জাতে লাগল মেশিনগান। জেনারেল টিক্কা খান বাঙালির মেরুদণ্ড ভেঙে চুরমার করে দিতে চায়। যেন এরা দ্বিতীয়বার আর পাকিস্তানিদের মুখের ওপর কথা বলার স্পর্ধা না পায়।

পরদিন ভোরবেলা পাকিস্তানের জনদরদী ভুট্টো চলে গেল পাকিস্তানে। সে মহাউল্লসিত। প্লেনে ওঠার আগে হাসিমুখে বলে গেল, যাক শেষপর্যন্ত শত্রুদের হাত থেকে পাকিস্তানকে রক্ষা করা গেল।

ছাব্বিশে মার্চের সমস্ত দিন কেউ ঘর থেকে বেরুতে পারল না। শহরে কার্ফু। ঘরে বসে শুধুই প্রতীক্ষা। এর মধ্যেই আবার অবাঙালিরা যোগ দিল মিলিটারিদের সঙ্গে। বলে দিতে লাগল—কাদের কাদের শেষ করে দিতে হবে। চারদিকে মৃত্যু আর মৃত্যু।

ছাব্বিশ তারিখ ভোর এগারোটায় ইয়াহিয়ার ভাষণ প্রচারিত হলো।

> ... শেখ মুজিবকে বিনা বিচারে আমি ছেড়ে দেব না। আওয়ামী লীগ দেশের শত্রু। আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। আমার দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী দেশকে শত্রুমুক্ত করতে এগিয়ে এসেছে। এবারও তাদের পূর্বসুনাম অক্ষুণ্ন থাকবে...

দেশের লোক হতবুদ্ধি হয়ে গেল। কী হচ্ছে এসব? কী হচ্ছে ঢাকা শহরে? কিছুই জানার উপায় নেই। ঢাকা বেতার থেকে অনবরত হামদ ও নাতে রসূল প্রচারিত হচ্ছে।

পাশের দেশ ভারত। সেখানকার বেতারেও কোনো খবর নেই। এত বড় একটা কাণ্ড হয়ে গেছে, তারা কি কিছুই জানে না? কলকাতা বেতার থেকে দুপুরবেলা হঠাৎ করে 'গীতালি' অনুষ্ঠান বন্ধ করে বলা হলো—

> পূর্ববাংলায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে। পূর্বপাকিস্তান রাইফেলস, পূর্ববাংলা রেজিমেন্ট, পূর্বপাকিস্তান পুলিশ, পূর্বপাকিস্তান আনসারস, পূর্বপাকিস্তান মুজাহিদ দুর্জয় প্রতিরোধ গড়ে তুলছে।

ঘোষণা শেষ হওয়া মাত্র বাজানো হলো সেই বিখ্যাত গান—'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। এই দেশে শুরু হলো সম্পূর্ণ নতুন ধরনের জীবনযাত্রা।

ঢাকা শহরের অলিতে গলিতে মৃতদেহ পড়ে রইল। সরাবার লোক নেই।

১৪

নীলু খুব মন খারাপ করে একা একা বসে ছিল। রাত প্রায় আটটা। চারদিক অন্ধকার। ইলেকট্রিসিটি আছে। তবু রান্নাঘরের বাতিটি ছাড়া আর সব বাতি নিভিয়ে রাখা হয়েছে। দাদুমণি নীলুর ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন, একা একা বসে আছ কেন? এসো, আমার সঙ্গে এসে বসো।

না।

ভয়ের কিছু নেই নীলু।

আমার ভয় করছে না।

সাজ্জাদরা কোথায়?

জানি না। রান্নাঘরে বোধহয়।

আমি কি বসব তোমার সঙ্গে?

জানি না, ইচ্ছা হলে বসেন।

দাদুমণি বসলেন। নিচুস্বরে বললেন, আমরা গ্রামে চলে যাব। সুযোগ পেলেই চলে যাব। নীলু কিছু বলল না। দাদুমণি বললেন, কার্ফু ওদের একসময় তুলতেই হবে। হবে না?

তুলতেই হবে কেন? না তুললে কে কী করবে?

দাদুমণি এর উত্তর দিতে পারলেন না। তিনি আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে নিজের ঘরে চলে গেলেন। তাঁর হাতে একটি ট্রানজিস্টার। তিনি বিদেশের রেডিও স্টেশনগুলি ধরতে চেষ্টা করছেন। পারছেন না। এই ট্রানজিস্টারটি বেশি ভালো না। ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে এখনো হামদ ও নাতে রসূল হচ্ছে। মাঝে মাঝেই ইংরেজি বাংলা ও উর্দুতে বলা হচ্ছে—শহরে কারফিউ বলবত আছে।

সাজ্জাদ ও সাজ্জাদের বোন চুপচাপ রান্নাঘরে বসে আছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। রান্নাবান্না হয়ে গেছে। শুধু ডাল-ভাত। কিন্তু কেউ খেতে বসছে না। কারও খিদে নেই। একসময় সাজ্জাদের বোন কী বলল, সাজ্জাদ জবাব দিল না। তার কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। এটা এমন একটা সময় যখন কারও কথা বলতে ইচ্ছা করে না। সাজ্জাদ দেখল দাদুমণি দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি নরমস্বরে বললেন, সাজ্জাদ, তোমরা রান্নাঘরে বসে আছ কেন? এসো সবাই একসঙ্গে বসি। নীলুকেও ডেকে নিয়ে এসো। ও খুবই মন খারাপ করছে।

নীলু এল না। তার নাকি কিছুই ভালো লাগছে না। কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। শেষপর্যন্ত দাদুমণি এলেন তাকে নিতে।

একা একা থাকলে আরও খারাপ লাগবে।

না, লাগবে না।

তাহলে বরং খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।

আমি এখন ঘুমুব না।

দাদুমণি চলে এলেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল নীলু দরজা বন্ধ করে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়েছে। ট্রাংক খুলে তার বাদামি রঙের খাতা বের করেছে। এখানে সে মাঝেমাঝে নিজের মনের কথা লেখে। সেই লেখাগুলি খুব গোপন। কেউ পড়তে পারে না। এমনকি দাদুমণিও না। তিনি জানেনও না যে তার এরকম একটা খাতা আছে। এটি সে জন্মদিনে পাওয়া টাকায় নিজে গিয়ে কিনে এনেছে। নীলু খাতা সামনে রেখে পুরনো দু'একটা লেখা পড়ল, তারপর লিখতে শুরু করল—

২৬ মার্চ, রাত ন'টা

> আমরা আজ সারা দিন ঘরে বন্দি হয়ে আছি। খুব খারাপ লাগছে আমার। বাইরের সব দরজা জানালা বন্ধ। বারান্দায় উঁকি দেওয়ার হুকুম নেই। এত খারাপ লাগছে। এই দেশটা লরা মেরীর দেশের মতো কেন হলো না ? তাহলে কী চমৎকার হতো! ঘাসের বনে একটা ছোট্ট কুটির বানিয়ে আমরা থাকতাম। শীতকালে তুষারঝড় হতো। জানালার পাশে বসে বসে দেখতাম সাদা বরফে চারদিক ঢেকে যাচ্ছে। দাদুমণি ঘরে একটা আগুন করে মজার মজার সব গল্প বলা শুরু করতেন। বাইরে ঝড়ের মাতামাতি। কোথাও যাবার উপায় নেই। এখনো অবশ্যি কোথাও যাবার উপায় নেই। কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে কত তফাৎ! আমার খুব খারাপ লাগছে। কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে।

এইটুকু লেখা হওয়া মাত্রই খুব কাছেই কোথাও ঝাঁকে ঝাঁকে গুলির শব্দ হতে লাগল। ক্যাট ক্যাট করতে লাগল মেশিনগান। দাদুমণি নীলুর দরজায় ধাক্কা দিয়ে ভীতস্বরে বললেন, দরজা খোল নীলু।

নীলু দরজা খুলল না। দাদুমণি দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে বললেন, মেঝেতে শুয়ে পড় নীলু, মেঝেতে শুয়ে পড়।

নীলু তাও করল না। পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল। গুলির শব্দ থেমে গেল। কিন্তু একজন পুরুষমানুষের চিৎকার শোনা যেতে লাগল। ভয়াবহ চিৎকার। নীলু দরজা খুলে বেরিয়ে এল। তার মুখ রক্তশূন্য। সে কাঁপা গলায় বলল, ওর কী হয়েছে দাদুমণি ?

জানি তো না নীলু।

কেউ কি দেখতে যাবে না ওর কী হয়েছে ?

দাদুমণি সে-কথার জবাব দিতে পারলেন না। নীলু দ্বিতীয়বার বলল, কেউ কি যাবে না ?

সাতাশ তারিখ চার ঘণ্টার জন্যে কার্ফু তোলা হলো। মানুষের ঢল নামল রাস্তায়। বেশিরভাগই শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। করুণ অবস্থা। যানবাহন সেরকম নেই। সময়ও হাতে নেই। যে অল্প কয়েক ঘণ্টা সময় পাওয়া গেছে তার মধ্যেই শহর ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যেতে হবে। পথে পথে মানুষের মিছিল। কিন্তু এই মিছিলের চরিত্র ভিন্ন।

বড় রাস্তার সব ক'টি মোড়ে সৈন্যবাহিনী টহল দিচ্ছে। তাদের চোখেমুখে ক্লান্তি ও উল্লাস। তাদের ধারণা যুদ্ধে তাদের জয় হয়েছে। তারা অলস ভঙ্গিতে নতুন ধরনের মিছিল দেখছে। এই মিছিলে আকাশফাটানো ধ্বনি নেই। এই মিছিলে কেউ পাশের মানুষটির সঙ্গেও কথা বলে না। শিশু কেঁদে উঠল মা বলেন, চুপ চুপ। শিশুরা কিছুই বোঝে না, তারা কাঁদে এবং হাসে। নিজের মনে কথা বলে। বয়স্ক মানুষেরা বলে, চুপ চুপ।

যারা পালিয়ে যাচ্ছে তাদের মধ্যে অনেককেই কাঁদতে দেখা যায়। তাদের কী হয়েছে ? প্রিয়জন পাশে নেই ? যার রাতে বাড়ি ফেরার কথা ছিল সে কি ফিরেনি ? প্রশ্ন করার সময় নয় এখন। যে চার ঘণ্টা সময় পাওয়া গেছে এর মধ্যেই শহর ছাড়তে হবে। সময় ফুরিয়ে আসছে। সবাই দ্রুত যেতে চেষ্টা করে। শিশুরা হাসে ও কাঁদে, কোনো কিছুই তাদের বিচলিত করে না।

মিলিটারিরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে জনস্রোত দেখে। তাদের চকচকে বন্দুকের নল রোদের আলোয় ঝকমক করে। তারা মাঝেমাঝে কথা বলে নিজেদের মধ্যে, মাঝে মাঝে হেসে ওঠে। নিশ্চয়ই কোনো আশা ও আনন্দের গল্প। মজার কোনো স্মৃতি নিয়ে তামাশা। ওদের উচ্চস্বরের হাসির শব্দে শুধু শিশুরাই অবাক হয়ে তাকায়। আর কেউ তাকায় না।

কার্ফু শুরু হয় চারটায়। রাস্তাঘাট আবার জনশূন্য হয়ে যায়। শহরের অবস্থা যারা দেখতে বেরিয়েছিল তারা ঘরে ফিরে অসম্ভব গম্ভীর হয়ে যায়। দাদুমণি ঘ[illegible]নেকের জন্যে গিয়েছিলেন, তিনি ফিরেই শান্তস্বরে বললেন, শহর ছাড়তে হবে। কালই আমরা শহর ছাড়ব। তারপর আর কোনো কথা বলেন না। বিকাল চারটা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত তিনি তাঁর ঘরে একা একা বসে থাকেন।

১৫

খোকনদের বাড়ি খুব চুপচাপ হয়ে গেছে।

অনজু আর বিলু এখন আর চেঁচিয়ে এক্কাদোক্কা খেলে না। বড়চাচা সারা দিন তাঁর নিজের ঘরেই বসে থাকেন। কারও সঙ্গে বিশেষ কথা-টথা বলেন না। খোকনও বেশিরভাগ সময় থাকে তার নিজের ঘরে। সময় শ্লথ হয়ে গিয়েছে। মা মারা গেছেন মাত্র তিন দিন আগে অথচ খোকনের কাছে মনে হয় বহু বৎসর কেটে গেছে। আজ সকালবেলা হঠাৎ কী মনে করে খোকন তার মায়ের ঘরে গেল। সবকিছু আগের মতো আছে। মা'র লাল রঙের চটি দুটি পর্যন্ত যত্ন করে তুলে রাখা।

খোকন।

খোকন দেখল, বাবা এসে দাঁড়িয়েছে, দরজার পাশে।

কী করছ খোকন?

কিছু করছি না।

এসো আমার ঘরে এসো। আমরা গল্প করি।

খোকন তার বাবার সঙ্গে চলে গেল। বাবাও যেন কেমন হয়ে গেছেন। হঠাৎ করে তাঁর যেন অনেক বয়স বেড়ে গেছে।

খোকন, মা'র জন্যে খারাপ লাগছে?

হুঁ।

লাগাই উচিত।

বাবা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ব্যক্তিগত দুঃখই সবচেয়ে বড় দুঃখ। আমাদের কথাই ধরো, আমরা নিজেদের দুঃখে কাতর হয়ে আছি, ঠিক না?

হ্যাঁ।

কিন্তু দেশের কী অবস্থা হচ্ছে বুঝতে পারছ তো? খুব খারাপ অবস্থা। এবং যতই দিন যাবে ততই খারাপ হবে।

খোকন কিছু বলল না। নিচ থেকে এই সময় বড়চাচির কান্না শোনা গেল। বাবা চুপ করে গেলেন। কবীর ভাই এখনো ফিরে আসেননি। বড়চাচি দিনরাত সর্বক্ষণ তাঁর জন্যে কাঁদেন। দিনেরবেলায় কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু রাতেরবেলা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাবা বললেন, একমাত্র মহাপুরুষদের কাছেই ব্যক্তিগত দুঃখের চেয়েও দেশের দুঃখ বড় হয়ে ওঠে। আমরা মহাপুরুষ না। আমাদের কাছে আমাদের কষ্টটাই বড় কষ্ট।

বড়চাচির কান্নার শব্দ ক্রমেই বাড়তে লাগল। বাবা চুপ করে বসে রইলেন। তারপর প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যে বললেন, তোমার কি মনে হয় বঙ্গবন্ধু বেঁচে আছেন?

আমি জানি না।

সে তো কেউ জানে না। কিন্তু তোমার কী মনে হয়?

আমার কিছু মনে-টনে হয় না।

এভাবে কথা বললে তো হবে না খোকন। এখন থেকে আমাদের সবাইকে ভাবতে হবে। খুব খারাপ সময় আমাদের সামনে।

খোকন চুপ করে রইল। বাবা শান্তস্বরে বললেন, এখন ওদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ শুরু হবে। সেই যুদ্ধ অনেকদিন পর্যন্ত হয়তো চলবে। এর মধ্যেই তোমরা বড় হবে। কী খোকন, চুপ করে আছ কেন, কিছু বলো।

কী বলব?

ওদের সঙ্গে যুদ্ধ কিন্তু শুরু হয়ে গেছে।

কে বলেছে?

বোঝা যাচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি। তোমার কী মনে হয় ? হচ্ছে না ?

হ্যাঁ।

খোকন, এই যুদ্ধে কে জিতবে ?

উত্তর দেওয়ার আগেই ছোটচাচি এসে বললেন, খাবার দেওয়া হয়েছে ?

রাহেলাকে দেখে মনে হচ্ছে তাঁর জীবনের ওপর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। গত দুরাতে এতটুকুও ঘুমুতে পারেননি। তাঁর চোখের নিচে কালি পড়েছে। মুখ ফ্যাকাসে। বাবা বললেন, আমরা একটু পরে আসি ?

না, এখনই চলে আসেন। ঝামেলা সকাল সকাল চুকে যাক।

আসছি, আমরা আসছি।

খাবার টেবিলে বড়চাচা বললেন, আমাদের এখন কী করা উচিত, গ্রামে যাব ?

আমিন চাচা গম্ভীর মুখে বললেন, গ্রামে পালিয়ে গিয়ে কী হবে ?

এখানে এরকম আতঙ্কের মধ্যে থাকা। সবার মনের ওপর খুব চাপ পড়ছে।

গ্রামে পালিয়ে গেলেও সেই চাপ কমবে না। তা ছাড়া কবীর কোথায় আছে আমরা জানি না। ওকে এখানে ফেলে রেখে যেতে পারি না।

ছোটচাচার কথা শেষ হওয়ার আগেই রাহেলা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, আমি কোথাও যাব না। আমি আমেরিকা চলে যাব। আমি এই দেশে থাকব না।

আমিন চাচা কী একটা বলতে চাইলেন। বড়চাচা ইশারা করে তাকে থামিয়ে দিলেন। রাহেলা শিশুদের মতো কাঁদতে শুরু করলেন।

সব ঠিক হয়ে যাবে রাহেলা।

না, কিছুই ঠিক হবে না।

শান্ত হয়ে বসো।

আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

হঠাৎ আমিন চাচা বললেন, সবাই চুপ। একটি কথাও না। সবাই তাকাল তাঁর দিকে। তিনি চাপা গলায় বললেন, শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কিসের শব্দ ?

আমার মনে হয় একটা মিলিটারি গাড়ি এসে থেমেছে।

সবাই নিঃশব্দ হয়ে গেল। দীর্ঘসময় কেউ কোনো কথা বলল না। গেটের কাছে কুকুরটি শুধু ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। আমিন চাচা ভুল শুনেছিলেন, ওটা কোনো মিলিটারি গাড়ি ছিল না।

সাজ্জাদরা নীলগঞ্জে এসে পৌঁছল আটাশ তারিখ সন্ধ্যায়। খুব ঝামেলা করে আসা। প্রথমে শোনা গেল মীরপুর ব্রিজ কাউকে পার হতে দেওয়া হচ্ছে না। মিলিটারি চেকপোস্ট বসেছে। যারাই শহর ছাড়তে চাচ্ছে তাদেরকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। যাদের কথাবার্তা পছন্দ হচ্ছে না তাদের আলাদা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাদের ভাগ্যে কী ঘটছে কিছু বলা যাচ্ছে না। দাদুমণিরা মীরপুর ব্রিজের কাছে এসে পৌঁছলেন দুপুরে। তের

চোদ্দজন মিলিটারির একটা দলকে সেখানে সত্যি সত্যি দেখা গেল। এবং দেখা গেল দুটি ছেলেকে ওরা কী সব যেন জিজ্ঞেস করছে। ছেলে দুটি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। নীলু বলল, ওদের কী জিজ্ঞেস করছে ? দাদুমণি উত্তর দিলেন না। নীলু বলল, ওরা এরকম করছে কেন ?

তুমি ওদিকে তাকিয়ো না। ওদের যা ইচ্ছা করুক।

সাজ্জাদের বোন বলল, ওরা আমাদের ধরবে ?

না, আমাদের ধরবে না।

ওরা সত্যি সত্যি কিছু বলল না। তবে বাস থেকে প্রতিটি লোককে নামাল। এবং কোনো কারণ ছাড়াই বুড়োমতো একটা লোকের পেটে হাঁটু দিয়ে প্রচণ্ড গুঁতো দিল। লোকটি উলটে পড়ে কোঁ কোঁ শব্দ করতে লাগল। যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে মিলিটারির সেই জোয়ান হাত নেড়ে সবাইকে বাসে উঠতে বলল। সবাই বাসে উঠল। বুড়ো লোকটি উঠতে পারল না। তার সম্ভবত খুব লেগেছে। সে মাটিতেই গড়াগড়ি খেতে লাগল। নীলু ফিসফিস করে বলল, ওকে মারল কেন দাদুমণি ? ও কী করেছে ?

জানি না। কিছু করেছে বলে তো মনে হয় না।

তাহলে শুধু শুধু মারল কেন ?

মানুষের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিতে চায়। এইজন্যেই এসব করছে। কিংবা হয়তো অন্যকিছু। আমি জানি না।

আরিচাঘাটে পৌঁছে খুব মুশকিল হলো। ফেরী নেই। নৌকায় করে কিছু লোক পারাপার করছে। কিন্তু নৌকার সংখ্যা খুবই কম। নৌকা জোগাড় হলো না। মাথার ওপর কড়া রোদ। সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। নীলু বলল তার শরীর খারাপ লাগছে।

দাদুমণি চিন্তিত মুখে বললেন, ঢাকায় ফিরে যাওয়াই বোধহয় ভালো। সাজ্জাদ কী বলো ?

না, ঢাকায় যাব না।

নীলু, তুমি কী বলো ?

নীলু থেমে থেমে বলল, আমার শরীর খুব খারাপ লাগছে।

সন্ধ্যার দিকে একটা ট্রাক এল, সেটি আবার ঢাকা ফিরে যাবে। ট্রাকের ড্রাইভার বলল, আপনারা যাবেন ঢাকায় ?

না গিয়েই বা উপায় কী ? রাত কাটানোর একটা জায়গার দরকার। ট্রাকে উঠেই নীলুর প্রচণ্ড জ্বর এসে গেল। সে দুবার বমি করে নেতিয়ে পড়ল।

আকাশের অবস্থা ভালো না। ঝড়বৃষ্টি হবে হয়তো। দূরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সাজ্জাদের বোন নীলুকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। আরও চারজন মহিলা আছেন ওদের সাথে। ওরা সবাই বসেছে পাশাপাশি। তাঁদের সঙ্গে তিন-চার বছরের দুটি ফুটফুটে বাচ্চা। এরা ঘুমিয়ে পড়েছে। ট্রাকে বসে থাকা লোকগুলি কোনো কথা বলছে না। সবাই

চিন্তিত। সবাই তাকিয়ে আছে অন্ধকারের দিকে। একজন কে যেন বলল, বৃষ্টি নামলে মুশকিল হবে। কেউ তার জবাব দিল না।

কিছুদূর পর ট্রাককে আবার ফিরে আসতে হলো আরিচা ঘাটে। ঢাকায় যাওয়া যাবে না। খুব গণ্ডগোল হচ্ছে। মিলিটারিরা নাকি মার্চ করে আসছে।

তারা সারা রাত বৃষ্টি মাথায় করে ট্রাকে অপেক্ষা করল। নদী পার হওয়ার নৌকা পাওয়া গেল না। কী কষ্ট, কী কষ্ট!

১৬

সাজ্জাদরা নীলগঞ্জে পৌঁছল আটাশ তারিখ রাতে। এগারো মাইল হেঁটে প্রচণ্ড জ্বর এসে গেল নীলুর। সে কয়েকবার বমি করল। কোথায় ডাক্তার, কোথায় কী। নীলগঞ্জের লোকজন পালাচ্ছে, কারণ দেওয়ান বাজারে মিলিটারি এসে গেছে। তারা নির্বিচারে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। দেওয়ান বাজার নীলগঞ্জ থেকে মাত্র পাঁচ মাইল। মিলিটারিরা এদিকেই হয়তো আসবে। নীলগঞ্জের লোকজন নৌকায় করে সুখানপুকুরের দিকে পালাচ্ছে। নীলু বলল, দাদুমণি আমি কোথাও যাব না। দাদুমণি বললেন, সুখানপুকুরে ডাক্তার পাওয়া যাবে।

নীলু থেমে থেমে বলল, আমার ডাক্তার লাগবে না।

দাদুমণি কী করবেন ভেবে পেলেন না।

সাজ্জাদ, কী করা যায়? যাবে সুখানপুকুরে?

চলেন যাই।

নৌকা জোগাড় করতে অনেক সময় লাগল। কেউ যেতে চায় না। গতরাতে নাকি নদীতে গানবোট এসেছিল। আজও হয়তো আসবে। মাঝিরা বলল, হাঁটাপথে যান। হগগলেই হাঁটাপথে যাইতাছে।

অসুস্থ একটা মেয়ে সাথে আছে। হাঁটাপথে যাওয়া যাবে না। বড় নদীতে না গিয়ে যেতে পারবে না? বিশাখালি দিয়ে যাও।

কেউ রাজি হয় না। একজনকে শুধু পাওয়া গেল। তার নৌকাটা ছোট। দুপুররাতে তারা সবাই খোলা নৌকায় করে রওনা হলো। অনেক লোকজন। একটি মাত্র নৌকা।

সে-রাতে আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। সুখানপুকুরের কাছাকছি আসতেই ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল।

ঠিক এই সময় রোগামতো একটি ছেলে চেঁচিয়ে বলল, চুপ চুপ। শুনেন সবাই শুনেন। ছেলেটির হাতে একটি ট্রানজিস্টার। সে ট্রানজিস্টার উঁচু করে ধরল। চেঁচিয়ে বলল, স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান। স্বাধীন বাংলা বেতার।

ঘোষকের কথা পরিষ্কার। ট্রানজিস্টারে ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে। তবু সবাই শুনল– 'ওরা জানে না আমরা কী চীজ। জানে না ইবিআর কী জিনিস। আমরা ওদের টুঁপি টিপে ধরেছি। তুমুল যুদ্ধ চলছে। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।'

ঘোষকের কথা শেষ হওয়া মাত্র রোগা ছেলেটি বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, যুদ্ধ শুরু হয়েছে। যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আর আমাদের ভয় নাই। বলেন ভাই সবাই মিলে, জয় বাংলা। নৌকার প্রতিটি মানুষ আকাশফাটানো ধ্বনি দিল। ছেলেটি বলল, আবার বলেন।

জয় বাংলা।

বলেন, জয় বঙ্গবন্ধু।

জয় বঙ্গবন্ধু।

নীলু আচ্ছন্নের মতো পড়ে ছিল। সে বিড়বিড় করে বলল, কী হয়েছে?

সাজ্জাদ হাসতে হাসতে বলল, নীলু, যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আর আমাদের ভয় নেই। স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে বলল।

কে যুদ্ধ করছে?

বাঙালি মিলিটারিরা।

শুধু ওরা?

না, আমরাও করব। আমিও যাব।

তোমাকে কি ওরা নেবে?

সাজ্জাদ দৃঢ়স্বরে বলল, নিতেই হবে।

যুদ্ধ শুরু হলো। রুখে দাঁড়াল বাঙালি সৈন্য, বাঙালি পুলিশ, আনসার ও মুজাহিদ বাহিনী। তাদের সঙ্গে যোগ দিল এ দেশের মানুষ। বৃদ্ধরা যেমন এগিয়ে এল তেমনি এগিয়ে এল নিতান্তই অল্পবয়েসী কিশোরেরা। তাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র, মাতৃভূমির জন্যে ভালোবাসা। দেখতে দেখতে সেই সহায়সম্বলহীন বাহিনী একটি মহাশক্তিমান দুর্ধর্ষ সৈন্যদলে পরিণত হলো। এদের যুদ্ধ মুক্তির জন্যে। তাই এদের আমরা ভালোবেসে ডাকলাম 'মুক্তিবাহিনী'। এদের স্বপ্ন একটিই : অন্ধকার রজনীর শেষে এরা আনবে একটি সূর্যের দিন।

একটি সূর্যের দিনের জন্যে এ দেশের ত্রিশ লক্ষ মানুষকে প্রাণ দান করতে হলো।

পরিশিষ্ট

খোকন মে মাসের শেষদিকে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্যে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করার জন্যে একটি চৌদ্দ বছরের বালককে 'বীর প্রতীক' উপাধি দেওয়া হয়। মেথিকান্দা অপারেশনে এই বালকটি শত্রুর গুলিতে নিহত হয়। তার নাম সাজ্জাদ। একবার এই ছেলেটি 'ভয়াল-ছয়' নামের একটি ছেলেমানুষী দল গঠন করেছিল। এবং ঠিক করেছিল 'ভয়াল-ছয়ের' সদস্যরা পায়ে হেঁটে আফ্রিকার গহীন অরণ্য দেখতে যাবে।

ছেলেমানুষদের কতরকম স্বপ্ন থাকে।

রম্য

এলেবেলে

[প্রথম খণ্ড]

১

সম্প্রতি একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়েছিলাম। এলেবেলে লেখা সেটা দিয়েই শুরু করা যাক।

বৈশাখী মেলায় গিয়েছি চার কন্যাকে সঙ্গে করে। তিনটি আমার নিজের, অন্যটি ধার করা। গিয়ে দেখি কুম্ভমেলার ভিড়। ঢাকা শহরের অর্ধেক লোক এসে উপস্থিত। মাটির হাঁড়িকুড়ি যা-ই দেখছে তা-ই তারা কিনে ফেলছে। অনেকটা কচ্ছপের মতো দেখতে কী যে বিক্রি হচ্ছে খুব সস্তায়—এক টাকা পিস। সবাই কিনছে, আমিও কিনলাম। তারপর কিনলাম দু'খানা রবিঠাকুর। এবারের মেলায় রবিঠাকুর খুব সস্তায় বিক্রি হচ্ছে। চার টাকা জোড়া। আমার ছোট মেয়েটি রবিঠাকুরকে নিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। তার কিছু হলো না, মহাকবি দু'টুকরা হয়ে গেলেন। কান্না থামাবার জন্যে আরেকটি কিনতে হয়। কিন্তু একবার কোনো দোকান ছেড়ে এলে আবার সেখানে ঢোকা অসম্ভব। অন্য একটি ঘরে উঁকি দিলাম। বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, আপনাদের রবিঠাকুর আছে? দোকানি আমাকে বেকুব ঠাওরালো কি না জানি না, এক বুড়োর মূর্তি ধরিয়ে দিল। বুড়োটি খালি গায়ে বসে আছে, হাতে হুঁকো। বাতাস পেলেই সমানে মাথা নাড়ছে। সাদা চুল সাদা দাড়ি—রবিঠাকুর যে এতে সন্দেহের কিছুই নেই।

আমরা তালের পাখা কিনলাম, মাটির কলস কিনলাম। শোলার কুমির কিনলাম (কিছুক্ষণের মধ্যেই টিকটিকির মতো এর লেজ খসে পড়ল)। দড়ির শিকা, বাঁকা হয়ে দাঁড়ানো (কলসি কাঁখে) বিশালবক্ষা বঙ্গললনা কিনলাম। আমার কন্যারা দেখলাম দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি গাঢ় অনুরাগ নিয়ে জন্মেছে। যা-ই দেখছে তা-ই তাদের চিত্তকে উদ্বেলিত করছে, তা-ই কিনবে। একসময় এদের পিপাসা পেয়ে গেল। চারজনের জন্যে চারটি কাঠি আইসক্রিম কেনা হলো। যে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির কথা শুরুতে বলেছি, সেটা হলো তখন।

মেজ মেয়ে তার আইসক্রিম আমার দিকে বাড়িয়ে বলল, এক কামড় খাও বাবা। আমি খেলাম এক কামড়। একজন যা করে অন্য সবারও তাই করা চাই। কাজেই অন্য সবাইও আইসক্রিম বাড়িয়ে ধরতে লাগল আমার দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের ঘিরে ছোটোখাটো একটা ভিড় জমে উঠল। দৃশ্যটি অদ্ভুত। চারটি ছোট ছোট মেয়ে আইসক্রিম হাতে দাঁড়িয়ে আছে এবং একজন বয়স্ক লোক কপ্ কপ্ করে সবার আইসক্রিমে কামড় দিচ্ছে। যেন আইসক্রিম খাওয়ার কোনো একটা কমপিটিশন। এর মধ্যেই লক্ষ করলাম অচেনা একটা ছেলে তার বাবাকে বলছে, 'বাবা, আমিও ওই লোকটিকে আইসক্রিম খাওয়াব।' ছেলের হাতেও একটা আইসক্রিম। ভয়াবহ পরিস্থিতি। ছেলেটির বাবা আমাকে বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, ভাই কিছু মনে করবেন না। এর আইসক্রিমটায় একটা কামড় দেন। ছেলেমানুষ একটা আবদার করছে।

এরকম ভয়াবহ পরিস্থিতিকেই বোধহয় বেকায়দা অবস্থা বলা হয়। এটা এমন একটা অবস্থা যাকে কিছুতেই কায়দা করা যায় না। অথচ এমন অবস্থায় আমাদের প্রায় রোজই পড়তে হয়।

একবার এক মফস্কল শহরে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল প্রধান অতিথি করে (খুব সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ কাউকে তারা রাজি করাতে পারেনি)। অনেক বক্তৃতা-টক্তৃতার পর শুরু হলো সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। প্রথমেই একক নৃত্য—জলে কে চলে লো কার ঝিয়ারি। চৌদ্দ-পনেরো বছরের এক বালিকা কলসি কাঁখে উপস্থিত হলো। বিশাল কলসি পানিতে কানায় কানায় ভরা। নাচের তালে তালে ছলকে ছলকে পানি পড়ছে। রিয়্যালিস্টিক টাচ দেওয়ার একটা মফস্বলি প্রচেষ্টা। আমি অবাক হয়ে ভাবছি, জলভর্তি কলসি নিয়ে জল আনতে যাওয়ার প্রয়োজনটি কি ঠিক ? তখন কলসি নিয়ে সে আছাড় খেল। ছোটখাটো একটা বান ডেকে গেল স্টেজে। প্রধান অতিথি এবং সম্মানিত সভাপতি যেহেতু স্টেজেই উপবিষ্ট ছিলেন, কাজেই তাদেরও সেই জল স্পর্শ করল। দর্শকমহলে তুমুল আনন্দ উত্তেজনা—'ওয়ান মোর', 'ওয়ান মোর' ধ্বনি। অনুষ্ঠান শেষে আমি ভিজা প্যান্ট নিয়ে বাসে উঠলাম। বাসের সমস্ত যাত্রী খুব সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল আমার দিকে। যার পাশে বসলাম সে অনেকখানি সরে বসল।

এটা হচ্ছে বড় ধরনের বেকায়দার গল্প। ছোট ধরনের বেকায়দাও প্রচুর ঘটছে। আমাদের চোখের সামনেই ঘটছে। একটা উদাহরণ দিলেই আপনারা ধরতে পারবেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান কি আপনারা কখনো মন দিয়ে লক্ষ করেছেন ? ঠিক আছে, দৃশ্যটি কল্পনা করুন—গুরুগম্ভীর একজন সভাপতি পুরস্কার দিচ্ছেন। পুরস্কার নিচ্ছে একটি তরুণী। সভাপতি ভাবলেন যেহেতু মেয়ে কাজেই সে নিশ্চয়ই হ্যান্ডশেক করবে না। মেয়েটি হ্যান্ডশেক করতে গিয়ে লজ্জিত হয়ে লক্ষ করল সভাপতি হাত বাড়াচ্ছেন না। সে লাল হয়ে হাত নামিয়ে নিল। ততক্ষণে সভাপতি হাত বাড়িয়েছেন। মেয়েটি হাত নামিয়ে ফেলেছে দেখে তিনিও ঈষৎ লাল হয়ে হাত নামালেন। ইতোমধ্যে মেয়েটি হাত বাড়িয়েছে। সমগ্র দর্শক দারুণ টেনশনে ঘটনার পরিণতির জন্যে উপেক্ষা করছে।

বেকায়দা পরিস্থিতির ব্যাখ্যার জন্যে আবার শিশুদের কাছে ফিরে যাই। আমার ধারণা (এবং বদ্ধমূল বিশ্বাস) শিশুরা বড়দের প্রতি আক্রোশবশত কিছু কিছু পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এর পেছনে শিশুসুলভ সারল্য ফারল্য বলে কিছু নেই। জনৈক ভদ্রমহিলা খুব দুঃখ করে একটা ঘটনা বললেন, তিনি এক বাসায় বেড়াতে গিয়েছেন। দেখলেন তিন বছর বয়সী একটি ছেলে পটিতে বসে বাথরুম সারছে। ছেলেটি তাকে দেখে লজ্জা পেয়েছে ভেবে তিনি বললেন, 'বাহ্, খুব সুন্দর পটি তো তোমার! ভারী সুন্দর। আমি এত সুন্দর পটি জন্মেও দেখিনি।' ছেলেটি কোনো কথা বলল না। গম্ভীর হয়ে রইল। নাশতাটাসতা দেওয়া হয়েছে এমন সময় ছেলেটি এসে ঘোষণা করল, পটিটি সে সম্মানিত অতিথিকে দিয়ে দিয়েছে। এখন অতিথিকে সেখানে বসে বাথরুম করতে হবে। ছেলের মা বিব্রত হয়ে বললেন, 'ছিঃ লক্ষ্মীসোনা, এসব কী বলে ? তোমার খালা হয় না ?'

কিন্তু ততক্ষণে ওর মাথায় ব্যাপারটা ঢুকে গেছে। কাজেই সে হাত-পা ছুড়ে বিকট চিৎকার শুরু করেছে। চায়ের কাপটাপ উল্টে ফেলছে। তাকে সামলাবার জন্যে শেষ পর্যন্ত ভদ্রমহিলাকে 'পটি'তে বসার একটা ভঙ্গি করতে হলো।

অনেকেই বলেন শিশুরা সত্যবাদী হয়। আমার মনে হয় না কথাটা ঠিক। তারা সত্যি কথা বলে তখনই যখন কাউকে বিব্রত করা প্রয়োজন হয়। ঘটনাটি বলি।

একজন সংস্কৃতিবান মহিলাকে আমি চিনতাম, যিনি আমার লেখালেখি নিয়ে নানান সময় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতেন। মাঝে মধ্যেই যেতাম তাঁর বাসায়। সাহিত্য, তার উদ্দেশ্য—ওইসব নিয়ে উচ্চমার্গের কথাবার্তা হতো। সেদিনও তার বাসায় গিয়েছি। বাংলাদেশে কেন তুর্গেনিভের মতো বড় ঔপন্যাসিকের জন্ম হলো না এই নিয়ে কথা হচ্ছে। এমন সময় তার ছোট মেয়েটি হঠাৎ কথা বলল, চাচা, আম্মু না আপনাকে ছাগল ডাকে।

অধিক শোকে পাথর বলে যে কথাটা প্রচলিত আছে সেটা মিথ্যা নয়। ভদ্রমহিলা পাথর হয়ে গেলেন। তুর্গেনিভ প্রসঙ্গ আর জমল না।

এলেবেলে লেখা শেষ করার আগে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি নিয়ে একটি ফরাসি রসিকতা বলি। একজন ফরাসি তরুণী (অবশ্যই রূপবতী এবং...) সন্ধ্যাবেলা তার কুকুরটিকে নিয়ে পার্কে হাঁটতে গেছেন। সেখানে দেখা হলো এক বুড়োর সঙ্গে। বুড়োটিও একটি কুকুর নিয়ে পার্কে এসেছে। না, এই রসিকতাটি বলা যাবে না। রসিকতাটা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে এবং আমার ধারণা *উন্মাদ*-এর পাঠক-পাঠিকারা সবাই অপ্রাপ্তবয়স্ক। এই গল্প তারা হজম করতে পারবে না।

২

এবারের এলেবেলে লেখা আমার ভাগ্নিকে নিয়ে। ওর ডাকনাম লীনা। ভালো নাম হানিফা খাতুন, আমার নানাজানের রাখা। মুরুব্বি মানুষের রাখা নাম, কাজেই হজম করতে হচ্ছে। যদিও বান্ধবীরা তাকে 'হানিফ সংকেত' বলে ডাকা শুরু করেছে। বান্ধবীদেরও দোষ নেই। হানিফ সংকেতের সঙ্গে লীনার চেহারার কিছুটা মিল আছে।

লীনা এবার মেট্রিক পাস করেছে। যে বিষয়টি সে সবচেয়ে কম জানে (সাধারণ গণিত) তাতেই লেটার পেয়ে যাওয়ায় ঘাবড়ে গিয়েছিল। এখন সামলে উঠেছে।

মেট্রিক (খুক্কু, এখন তো আবার এসএসসি বলা নিয়ম) পাশ হওয়ার পরপরই সব মেয়ে খানিকটা আহ্লাদী হয়ে পড়ে। লীনার মধ্যে তা দেখা গেল। সে কথা বলতে লাগল টেনে টেনে এবং খানিকটা নাকি সুরে। আমি কড়া গলায় বললাম, কিরে, এমন টেনে টেনে কথা বলছিস কেন?

লীনা চোখ বড় বড় করে বলল, কখন টে-নে টেনে কথা বললাম?

এই তো বলছিস। ঠিকমতো কথা বল, নয়তো চড় খাবি।

দাও চড় দা-ও।

শোন লীনা, নাক দিয়ে কথা বলছিস ব্যাপারটা কী ? নাক নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যে, কথা বলার জন্যে না। সর্দি লাগলে কী করবি ? তখন তো কথা বলা বন্ধ হয়ে যাবে। মুখে কথা বলার অভ্যাসটা বজায় রাখ।

লীনা খানিকক্ষণ মূর্তির মতো বসে রইল, তারপর হেঁচকি তুলে কাঁদতে লাগল। ঘটনাটি সকালবেলার। সারা দিনে বাড়িতে কী ঘটেছে আমি জানি না। একটা কাজে নারায়ণগঞ্জ গিয়েছিলাম। রাত আটটায় বাড়ি ফিরেই শুনলাম লীনা এক বোতল ডেটল খেয়ে ফেলেছে। তাকে নেওয়া হয়েছে হাসপাতালে। ডাক্তাররা স্টমাক ওয়াস করাচ্ছেন। এত খাওয়ার জিনিস থাকতে সে এক বোতল ডেটল কেন খেল জিজ্ঞেস করায় সে বলেছে—বড়মামা আমাকে ইনসাল্ট করেছে, এইজন্যে খেয়েছি। আমি বাঁচতে চাই না। মরতে চাই।

এই হচ্ছে এ যুগের সুপার সেনসিটিভ বালিকাদের একটি নমুনা। আমাদের পাশের ফ্লাটের স্বাতীর কথা বলি। বখশীবাজার কলেজে পড়ে। মাথাভর্তি চুল। খোঁপা খুলে দিলে চুলের গোছা হাঁটু ছেড়ে নিচে নেমে যায়। একদিন তার মা বললেন, কিরে তুই সবসময় চুল এমন এলোমেলো করে রাখিস, খোঁপা করে রাখতে পারিস না ?

স্বাতী গনগনে মুখে বলল, লম্বা চুল অসহ্য। ভাল্লাগে না।

মা বিরক্ত হয়ে বললেন, এত অসহ্য হলে কেটে ছোট কর, কিন্তু পাগলির মতো থাকিস না।

স্বাতী তৎক্ষণাৎ নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে তার বাবার শেভিং রেজার দিয়ে মাথা কামিয়ে ফেলল। তারপর আয়নায় নিজের 'মূর্তি' দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়ে বাঁ হাতের হাড় ভেঙে ফেলল।

স্বাতীর চুল এখন খানিকটা বড় হয়েছে। ছোট ছোট চুলেও তাকে ভালোই দেখায়, কিন্তু আমাদের পাড়ার সমস্ত বালক-বালিকা তাকে ডাকে 'কোজাক আপা'। এই নাম তার কোনোদিন ঘুচবে, এমন মনে হয় না।

আমার বন্ধু মিসির আলী সাহেবের গল্পটা বলি। মিসির আলী সাহেব থাকেন নিউ এ্যালিফেন্ট রোডে। গত শীতের ঘটনা। তিনি ঘরে বসে টিভিতে নবীন শিল্পীদের গানের অনুষ্ঠান দেখছেন। এমন সময় দরজার কড়া নড়ল। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, পনেরো-ষোল বছরের ম্যাক্সিপরা একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বিস্মিত স্বরে বললেন, কাকে চাও মা ?

মেয়েটি সরু গলায় বলল, আপনাদের কি কোনো কাজের লোক লাগবে ?

তোমার কথা বুঝতে পারছি না। কিসের কাজের লোক ?

আমি বাড়ি থেকে চলে এসেছি। এখন আমি মানুষের বাড়িতে কাজ করে খাব। আমাকে রাখবেন ?

বাড়িতে ঝগড়া হয়েছে ?

হ্যাঁ, ড্যাডি আমাকে বকা দিয়েছে।

এসো, ভিতরে এসে বসো। দেখি কী করা যায়।

মেয়েটি খুব সহজেই ভেতরে এসে বসল। নিজেই ফ্রিজ খুলে কোকের বোতল বের করল। সহজ-স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সোফায় পা তুলে টিভি দেখতে লাগল। মিসির আলী সাহেবের স্ত্রী নিউমার্কেট থেকে রাত আটটায় বাড়ি ফিরে একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন। ষোল বছরের একটি অপরিচিত মেয়ে সোফায় আধশোয়া হয়ে আছে। তার দৃষ্টি টিভিতে নিবদ্ধ। মাঝে মাঝে কোকের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। মিসির আলী পাগলের মতো একের পর এক টেলিফোন করে যাচ্ছেন। মেয়েটি কোত্থেকে এসেছে, কী, কোনোই হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। মেয়ে নির্বিকার। দিব্যি পা নাচাচ্ছে। মিসির আলী সাহেবের স্ত্রীকে এক ফাঁকে শুধু বলল, আন্টি, ডিনারে কী রান্না হয়েছে ? আমি কিন্তু ঝাল কম খাই।

'দিনকাল পাল্টে গেছে'—এ কথাটি সবার মুখেই শোনা যায়, কিন্তু কী পরিমাণ পাল্টেছে তা বলতে পারেন টিনএজদের বাবা-মা। আমার মামাতো বোন বিনুর কথাটা বলি। টিনএজ বলা ঠিক হবে না, অনার্স ফাইনাল দিয়েছে। একদিন দেরি করে বাসায় ফিরল। মেয়ের মা মেয়ের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলেন—দুই কানেই নানা জায়গায় ফুটো করা হয়েছে। কান দুটি দেখাচ্ছে মুরব্বার মতো। তিনচার জায়গায় ফুটো করে গয়না পরাই নাকি এখনকার স্টাইল।

গত রমজানের ঈদে তার সঙ্গে আমার দেখা। কানের বিভিন্ন জায়গা থেকে গয়না ঝুলছে। [দুল না বলে গয়না বলছি, কারণ যেসব জিনিস ঝুলছে তার কোনোটাকেই দুলের মতো লাগছে না। একটি দেখতে ঘণ্টার মতো, তার ভেতর থেকে কালো সুতা বের হয়ে এসেছে।]

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি দেখে বিনু বলল, এরকম করে তাকিয়ো না ভাইয়া, চারটা করে ফুটো করা এখনকার স্টাইল; আমি মোটে তিনটে করিয়েছি।

আমি বিস্ময় গোপন করে বললাম, স্টাইল যখন উঠে যাবে তখন তুই কী করবি ? ফুটো বন্ধ করবি কীভাবে ?

বিনু বড়ই বিরক্ত হলো। কিন্তু সে জানে না বাংলাদেশে চোখধাঁধানো স্টাইল কোনোটাই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এটিও হবে না। বাড়তি ফুটো নিয়ে মেয়েগুলি বড়ই অশান্তিতে পড়বে। কিংবা কে জানে হয়তো এখনি পড়েছে। মাথার চুল দিয়ে কান ঢেকে রাখতে হচ্ছে।

লেখা শেষ করার আগে আবার আমার ভাগ্নির কাছে ফিরে যাচ্ছি। তার ডেটল ভক্ষণের পর থেকে সবার আচার-আচরণে একটা পরিবর্তন হলো। সে যা বলে সবাই তা-ই শোনে। সেনসেটিভ মেয়ে, আবার যদি কোনো কাণ্ডটাণ্ড করে বসে। তার এবং তার মায়ের কথাবার্তার কিছু নমুনা দিচ্ছি।

মেয়ে আজ আমি কলেজে যাব না।

মা ঠিক আছে মা, যেতে হবে না।

মেয়ে আমাকে একটা সাইকেল কিনে দেবে ? আমি এখন থেকে সাইকেলে করে কলেজে যাব।

মা বিকেলে নিউমার্কেটে গিয়ে কিনে নিস। তোর বাবাকে বলে দেব।

বাসার অবস্থাটা বোঝানোর জন্যে এই ডায়ালগ ক'টিই যথেষ্ট। গত বুধবারে গিয়েছি, ওদের ওখানে দেখি এক বখা ছেলে ড্রইংরুমে বসে আছে। ছোকরার গেঞ্জিতে লেখা 'পুশ মি'। তার হাতে সিগারেট। সে সিগারেট টানছে দম দেওয়ার ভঙ্গিতে। ঘর ধোঁয়ায় অন্ধকার।

আমি আপাকে বললাম, ওই চিজটা কে?

আপা গলার স্বর খাদে নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, ও লীনার একজন চেনা ছেলে। তুই লীনাকে কিছু বলিস না। সেনসেটিভ মেয়ে কী করতে কী করে বসবে। আমি ভয়ে ভয়ে থাকি।

আমি কিছুই বললাম না। গুম হয়ে বারান্দায় বসে রইলাম। কিছুক্ষণ পরই উজ্জ্বল চোখে লীনা ঢুকল। হাতটাত নেড়ে বলল, মামা, কী কাণ্ড হয়েছে দেখে যাও। সবুজ একটা চিরুনি দিয়ে তার দাড়িতে আঁচড় দিতেই তেরটা উকুন পড়েছে। এদের মধ্যে চারটা লাল রঙের। প্লিজ মামা, দেখে যাও।

আমি কঠিন মুখে বসে রইলাম। আপা মৃদুস্বরে বলল, যা দেখে আয়। এত করে বলছে। সেনসেটিভ মেয়ে।

আমি দেখতে গেলাম। টেবিলের ওপর একটা সাদা কাগজ। সেখানে সত্যি সত্যি তেরটা মিডিয়াম সাইজের উকুন। কয়েকটির পেট লালাভ।

সবুজ আমাকে দেখে দাঁত বের করে বলল, মামার কাছে সিগ্রেট আছে? আই এ্যাম রানিং শর্ট।

৩

আমাদের পাড়ায় মজিদ সাহেব নামে পুলিশের একজন রিটায়ার্ড এসপি থাকেন। তাঁর স্বভাব হচ্ছে দেখা হওয়া মাত্র অত্যন্ত চিন্তিত মুখে 'হাই ফিলসফি' গোছের একটা প্রশ্ন করা। মহা বিরক্তিকর ব্যাপার। সেদিন মোড়ের দোকানে সিগারেট কিনছি। হঠাৎ লক্ষ করলাম মজিদ সাহেব হনহন করে আসছেন। আমি চট করে একটু আড়ালে চলে গেলাম। লাভ হলো না। ভদ্রলোক ঠিক আমার সামনে এসে ব্রেক করলেন এবং অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বললেন, প্রফেসর সাহেব, মানুষ হাসে কেন একটু বলুন তো?

আমি বিরক্তি চেপে বললাম, হাসি পায় সেইজন্যে হাসে।

হাসি কেন পায় সেইটাই বলুন।

এ তো মহা যন্ত্রণা। ভদ্রলোক যেভাবে দাঁড়িয়ে আছেন তাতে মনে হচ্ছে জবাব না শুনে তিনি যাবেন না। তাঁর না হয় কাজকর্ম নেই, রিটায়ার্ড মানুষ; কিন্তু আমার তো কাজকর্ম আছে। আমি বললাম, মজিদ সাহেব আমি আপনাকে একটা গল্প বলি। গল্পটা শুনে আপনি হাসবেন। তারপর আপনি নিজেই চেষ্টা করে বের করুন কেন হাসলেন।

এটা মন্দ নয়। বলুন আপনার গল্প।

আমি গল্প শুরু করলাম—এক লোক একটি সিনেমা একত্রিশবার দেখেছে শুনে তার বন্ধু বলল, একত্রিশবার দেখার মতো কী আছে এই সিনেমায়? লোকটি বলল, সিনেমার

এক জায়গায় একটি মেয়ে নদীতে গোসল করতে যায়। সে যখন কাপড় খুলতে শুরু করে ঠিক তখন একটা ট্রেন চলে আসে। একত্রিশবার ছবিটা দেখেছি, কারণ আমার ধারণা কোনো না কোনোবার ট্রেনটা লেট করবে।

মজিদ সাহেব আমার দিকে হা করে তাকিয়ে রইলেন। অবাক হওয়া গলায় বললেন, ট্রেন লেট হবে কেন ? প্রতিবার তো একই ব্যাপার হবে।

আমি বললাম, হাসিটা তো এইখানেই।

একই ব্যাপার প্রতিবারই ঘটেছে, এর মধ্যে হাসির কী ?

মজিদ সাহেব গম্ভীর মুখে বাড়ির দিকে রওনা হলেন। মনে হলো আমার ওপর খুব বিরক্ত। আমি যে অভিজ্ঞতার কথা বললাম, এ জাতীয় অভিজ্ঞতা আপনাদের সবারই নিশ্চয়ই আছে। অনেক আশা নিয়ে একটি রসিকতা করলেন। সেই রসিকতাটা ব্যাঙের মতো চ্যাপ্টা হয়ে পড়ে গেল।

আমেরিকান এক বইতে একশটি রসিকতা দেওয়া আছে এবং বলা হয়েছে এই রসিকতাগুলির সাফল্যের সম্ভাবনা শতকরা নিরানব্বই দশমিক তিন দুই ভাগ। আমি এর একটা এক বিয়েবাড়ির আসরে চেষ্টা করে পুরোপুরি বেইজ্জত হয়েছি। একজন শুধু আমার প্রতি করুণার বশবর্তী হয়ে একটু ঠোঁট বাঁকা করেছিলেন। কিন্তু অন্যদের গম্ভীর মুখ দেখে সেই বাঁকা ঠোঁট সোজা করে জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলেন। জনৈকা তরুণী চশমার ফাঁক দিয়ে এমনভাবে আমাকে দেখতে লাগল যেন আমার মাথায় দোষ আছে।

গল্পটা এরকম—

এক বন্ধু অন্য বন্ধুকে জিজ্ঞেস করছে, প্যারিস শহরটা কেমন ?

বন্ধু বলল, ভালো। সেখানে এয়ারপোর্টে নেমে তুই যদি একটা মোটর গাড়ি ভাড়া করিস, তাহলে দেখবি সেই ড্রাইভার তোর সঙ্গে কী ভদ্র ব্যবহার করছে। এমনও হতে পারে সে তোকে তার বাড়িতে নিয়ে যাবে। রাখবে তার বাড়িতে। নাচ-গান করবে। এবং এই যে তুই তার বাড়িতে থেকে এত আনন্দ ফুর্তি করলি, তার জন্যে উল্টো তোকে একগাদা টাকা দিবে।

বলিস কী! তুই গিয়েছিলি নাকি প্যারিসে ?

আমি যাইনি, আমার বউ গিয়েছিল। তার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স। সে তো আর বানিয়ে বানিয়ে বলবে না। এরকম মেয়েই সে নয়।

এই গল্পে কেউ হাসল না কেন ? আমি ভেবেটেবে বের করলাম—এরকম একটি ভেন্দা যুবকের এমন বউ থাকতেই পারে না যে একা একা প্যারিসে যাবে। এই কারণেই গল্পটি কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না।

কী যন্ত্রণা, হাসির গল্পের আবার বিশ্বাসযোগ্যতা কী! আমাদের মুশকিল হচ্ছে সিরিয়াস গল্পের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। হাসির গল্প হলেই গম্ভীর হয়ে ভাবতে বসি, গল্পটি কি বিশ্বাস্যযোগ্য ? ভেন্দা ধরনের ছেলেটার বউ প্যারিসে কেন গেল ?

রসিকতা যারা করেন তারা বেইজ্জত হওয়ার আশঙ্কা মাথায় নিয়েই করেন। 'নো রিস্ক নো গেইন'-এর ব্যাপার এবং দু'একটা যখন লেগে যায় তাদের উৎসাহের সীমা থাকে না। রসিকতা করাটাকে তখন তারা পবিত্র দায়িত্ব মনে করেন। আগাড়ে বাগাড়ে রসিকতা করে আশেপাশের মানুষদের বিরক্তির চরম সীমায় পৌঁছে দেন। আমি একবার শ্যামলী থেকে গুলিস্তান যাওয়ার পথে এরকম একজনের দেখা পেয়েছিলাম। বাসে অসম্ভব ভিড়। প্রচণ্ড গরম। ঘামের কটু গন্ধ। এর মধ্যে একজন তার পরিচিত একজনকে পেয়ে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এই মোজাম্মেল, একটা চুটকি শোন। একবার এক বিয়েবাড়িতে বরযাত্রী আসতে দেরি করছে, তখন বরের ফুফাতো বোন...

মোজাম্মেল যার নাম সে একবার অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করল। তাতে লাভ হলো না। ভদ্রলোক দীর্ঘ গল্প শেষ করে দ্বিতীয় গল্প শুরু করলেন। টাক-মাথায় এক লোক বিরক্ত হয়ে বললেন, চুপ করেন তো ভাই।

কেন চুপ করব ? আপনার কী অসুবিধা করলাম ?

কানের কাছে ভ্যান ভ্যান করছেন, এটা অসুবিধা না ?

ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন। সায়েন্স ল্যাবরেটরি পর্যন্ত এসেই আবার তার গলা খুসখুস করতে লাগল। তিনি মোজাম্মেলকে তিন নম্বর রসিকতাটি বললেন। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার, এই রসিকতাটি হিট করল। বাসসুদ্ধ লোক হু-হু করে হেসে উঠল। এমনকি সেই টাক মাথার ভদ্রলোক ঠা ঠা জাতীয় বিচিত্র শব্দ করে হাসতে লাগলেন।

অবশ্যি এ সংসারে কিছু ভাগ্যবান লোক আছেন, তাদের সব রসিকতাই 'পাবলিকে খায়'। এটা বিরাট একটা যোগ্যতা। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, যারা এই যোগ্যতা অর্জন করেন অল্পদিনের মধ্যেই তাদের কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে যেতে দেখা যায়। জীবনের প্রতি সব রকম আকর্ষণ হারিয়ে ফেলতে থাকেন। চল্লিশ না হতেই তাদের দেখা যায় পঞ্চাশের মতো। কারণ খুব সহজ, এই জাতীয় জন্মরসিকদের সব কথাকেই আমরা সবাই রসিকতা হিসেবে নেই। যা একসময় জন্মরসিকের ওপর মানসিক চাপ ফেলতে শুরু করে। উদাহরণ দেই, আমার এক বন্ধু আব্দুস সোবাহান একজন জন্মরসিক। স্কুলজীবন থেকে সে আমাদের হাসাচ্ছে। কলেজ জীবনেও একই অবস্থা। সংসারে ঢুকে সে নানান সমস্যায় পড়ল। অল্প বেতন। অনেকগুলি ছেলেপুলে, অভাব-অনটন। একেকবার সে দুঃখের গল্প করে, আমরা হেসে গড়িয়ে পড়ি। একবার বিকেলবেলা মুখ শুকনো করে বলল, ঘরে আজ রান্না হয় নাই ভাই। একটা পয়সা ছিল না।

তার কথা শুনে হাসতে হাসতে আমাদের পেটে খিল ধরে যাওয়ার মতো অবস্থা। কী মজার ব্যাপার, ঘরে পয়সা নেই।

শেষ করার আগে এই প্রসঙ্গে একটা দামি উপদেশ দিতে চাচ্ছি। অল্পবয়সী মেয়েদের সঙ্গে কখনো কোনো রসিকতা করবেন না। যদি এদের কোনো একটি রসিকতা পছন্দ হয়ে যায় তাহলে আপনার অবস্থা কাহিল। 'ওই গল্পটা আরেকবার বলেন না। ওই গল্পটা আরেকবার বলেন না।'

শিরীন নামের এক মেয়েকে কোন এক কুক্ষণে নাসিরুদ্দিন হোজ্জার একটা গল্প বলেছিলাম। তারপর থেকে যেখানেই তার সঙ্গে দেখা হয় সে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে এবং বলে—ওই গল্পটা আরেকবার বলেন, প্লিজ।

আমাকে বলতে হয়। তিন বছরের মধ্যে আমি হাজার খানিকবার এই গল্প বললাম। জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। নাসিরুদ্দিন হোজ্জাকে কাছে পেলেই কাঁচা খেয়ে ফেলি এমন অবস্থা। সেই সময়কার কথা, নিতান্ত উপায়ান্তর না দেখেই রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ব্লাডারের প্রেসার কমাচ্ছি, মনে মনে প্রার্থনা করছি যেন পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা না হয়। ঠিক তখন আমার পেছনে একটা রিকশা থামল। আমার বুক ধক করে উঠল। শিরীনের আদুরে গলা, হুমায়ূন ভাই, এখানে কী করছেন ?

আমি মনে মনে বললাম, হারামজাদি দেখছিস না কী করছি ? দ্রুত জিপার লাগাতে গিয়ে আরেকটা অ্যাকসিডেন্ট হলো। জিপার দেওয়া প্যান্ট যারা পরেন তাঁদের জীবনে এ জাতীয় দুর্ঘটনা একাধিকবার ঘটে। তবু ফ্যাকাসে হাসি হেসে বললাম, তারপর কী খবর, ভালো তো ?

শিরীন বলল, এ হচ্ছে আমার বান্ধবী লোপা, আপনি একে ওই গল্পটা বলেন তো। প্লিজ। না না, বলতেই হবে। আমি কোনো কথা শুনব না।

সেই থেকেই আমি কারও সঙ্গে রসিকতা করতে পারি না। কারও রসিকতা শুনে হাসতেও পারি না। রিটায়ার্ড এসপি মজিদ সাহেবের মতো নিজেকে প্রশ্ন করি, মানুষ হাসে কেন ?

পুনশ্চ : *উন্মাদ*-এর পাঠকদের জন্যে একটি রসিকতা। এই রসিকতা অনেকটা আইকিউ টেস্টের মতো। এটা শুনে যদি কেউ যদি হাসে তাহলে বুঝতে হবে তার বুদ্ধি কম। যে যত শব্দ করে হাসবে সে তত বোকা। যদি না হাসে তাহলে বুদ্ধিমান। যদি বিরক্ত হয় তাহলে আঁতেল।

এক লোক কানে কম শোনে।

সে তার বেগুনক্ষেতের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। পথচারী এক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, আপনার ছেলেপুলে কী ?

লোকটি বলল, বছরে দুই একটা হয়। আগুন দিয়ে পুড়িয়ে খাই।

৪

কোথায় যেন পড়েছিলাম পাগলরা সবচেয়ে ভালো উপদেশ দেয়। কথাটির তেমন গুরুত্ব দিইনি। কারণ উপদেশ দেয় এ জাতীয় পাগল আমার চোখে পড়েনি। বহুকাল আগে যখন ফুলবাড়িয়াতে রেলস্টেশন ছিল তখন একজনকে দেখেছিলাম। সে ট্রেনের ইঞ্জিনগুলিকে গম্ভীর গলায় উপদেশ দিচ্ছিল—'বাবারা লাইনে থাকিস।' নিঃসন্দেহে ভালো উপদেশ। তবে ইঞ্জিনগুলি এই উপদেশকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে সেটা বলা মুশকিল।

কিছুদিন আগে আমি কিন্তু এক পাগলের কাছ থেকে সত্যি সত্যি একটা ভালো উপদেশ পেলাম। এই পাগল হচ্ছেন আমার দূরসম্পর্কের মামা। ঝিগাতলায় থাকেন। অত্যন্ত ভালোজাতের পাগল। হইচই নেই, গোলমাল নেই—মধুর স্বভাব। মুখে হাসি লেগেই আছে। কথাবার্তাও খুব স্বাভাবিক। তাঁর পাগলামির একমাত্র নমুনা হচ্ছে, মামিকে দেখলেই শিশুদের মতো এক বিঘৎ জিহ্বা বের করে ভেংচি দিতে থাকেন। যতক্ষণ মামি সামনে থাকেন ততক্ষণ এই অবস্থা। মামি প্রথমদিকে খুব কান্নাকাটি করতেন। দেয়ালে কপাল ঠুকতেন। এখন সহ্য করে নিয়েছেন। পারতপক্ষে সামনে আসেন না, আর এলেও লম্বা ঘোমটা দিয়ে থাকেন।

এই মামার সঙ্গে এক সন্ধ্যাবেলায় আমার দেখা। তিনি বললেন, সেজেগুজে যাচ্ছিস কোথায় ?

বিয়েবাড়িতে যাচ্ছি মামা। বৌ-ভাতের দাওয়াত।

মামা সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে একটি উপদেশ দিলেন। নিচুগলায় বললেন, খেতে বসার সময় গুনে গুনে তিন নম্বর চেয়ারে বসবি। শুরু থেকে এক দুই করে তিন নম্বরটায়।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন ?

রেজালার বাটি সবসময় তিন নম্বর চেয়ারের সামনে পড়ে।

আমি সেদিন সত্যি সত্যি তিন নম্বর চেয়ারে বসেছিলাম এবং সামনে রেজালার বাটি পেয়েছি। এখনো তাই করি এবং হাতে হাতে ফল পাই। যেসব পাঠক-পাঠিকা আমার এলেবেলে পড়েন তাঁদেরকে বলছি, ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখুন।

আগের কথায় ফিরে যাই। মামার উপদেশ শোনার পর থেকে পাগলদের উপর আমার ভক্তি-শ্রদ্ধা বেশ খানিকটা বেড়ে যায়। আমার ধারণা, এরা নিজের এবং চারপাশের পৃথিবী সম্পর্কে বেশ ভালো রকম চিন্তাভাবনা করে এবং এদের লজিকও বেশ পরিষ্কার। তার চেয়েও বড় কথা, এদের রসবোধ আমাদের চেয়েও ভালো।

আমি এক রাজনৈতিক সভায় জনৈক পাগলের কাণ্ডকারখানা দেখে এদের রসবোধ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হই। বেশ উষ্ণ বক্তৃতা হচ্ছিল। রোগামতো এক নেতা গণতন্ত্রের কথা বলতে বলতে মুখে ফেনা তুলে ফেলেছেন, তখন অঘটন ঘটল। এক পাগল উঠে দাঁড়াল এবং অবিকল ওই নেতার মতো হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা শুরু করল। তার বক্তৃতা আরও জ্বালাময়ী। আমরা সবাই নেতাকে বাদ দিয়ে তার কথা শুনছি এবং বিমলানন্দ ভোগ করছি। রোগা নেতা তীব্রদৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন পাগলের দিকে। বুঝতে পারছি ভদ্রলোক যথেষ্ট অপ্রস্তুত বোধ করছেন। তিনি বেশ কয়েকবার 'হ্যালো হ্যালো মাইক্রোফোন টেস্টিং ওয়ান, টু, থ্রি' বলে শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করলেন। পারলেন না। কারণ ততক্ষণে পাগলের ভেতর জজবা এসে গিয়েছে, সে অত্যন্ত উঁচুগলায় 'বস্ত্র সমস্যার সমাধান করিতে হইবে' বলে নিজের লুঙ্গি খুলে গামছার মতো কাঁধে ফেলে দিয়ে হাসিমুখে তাকাচ্ছে সবার দিকে। আমরা তুমুল করতালি দিয়ে তাকে অভিনন্দিত করলাম। রোগা নেতার ইশারায় কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে ঘাড় ধরে বের করে আবার

সভার কাজ শুরু হলো। কিন্তু সভা আগের মতো আর জমল না। নেতা আবেগকম্পিত গলায় যা-ই বলেন শ্রোতারা দাঁত বের করে হাসে। নেতা তার বক্তৃতায় ফর্মুলামতো যেই বস্ত্র-সমস্যার কথায় এসেছেন অমনি লোকজন চেঁচাতে শুরু করল—পায়জামা খুইল্যা তারপরে কন। আগে পায়জামা খুইলা কান্দে ফেলেন। হে হে হে। হো হো হো।

পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবতে পারেন নেতাদের ব্যঙ্গ করার জন্যে উপরের ঘটনাটি আমি বানিয়েছি। এত সাহস আমার নেই। নেতাদের আমি বড় ভালোবাসি। যে পাগলটির কথা বললাম, সে ঢাকা শহরের একজন পুরনো পাগল। যেসব মেয়ে ১৯৭২-৭৩ সালের দিকে রোকেয়া হলে থাকতেন তাঁরা এই পাগলকে ভালো করেই চেনেন। সেই সময়ে এই পাগলকে প্রায়ই হলের গেটের কাছে দেখা যেত। লাজুক ধরনের মেয়েদের কাছে গিয়ে অত্যন্ত বিনয়ী ভঙ্গিতে বলত—আপা, একটা জিনিস দেখবেন ? মেয়েটি হ্যাঁ-না কিছু বলার আগেই সে লুঙ্গি খুলে ফেলার একটা ভঙ্গি করত। মেয়েটি চিৎকার করে ছুটে যেত হল গেটের দিকে। পাগল মজা পেয়ে মিটিমিটি হাসত। শুনেছি একবার নাকি একটা সাহসী মেয়ে বলেছিল—হ্যাঁ, দেখব। এতে পাগল খুব বিমর্ষ হয়ে পড়ে। মুখ কালো করে চলে যায়। এরপর থেকে এই অঞ্চলে তাকে আর তেমন দেখা যায়নি।

নাগরিক পাগলদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক প্রায় নেই বললেই চলে। সেই তুলনায় গ্রামের পাগলদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক থাকে। সবাই নিশ্চয়ই জানেন, প্রতিটি গ্রামে একজন মহা বোকা এবং একজন পাগল থাকে। এদের দুজনের কাজ হচ্ছে গ্রামবাসীর জন্যে নির্দোষ বিনোদন সরবরাহ করা। বিশেষ করে গ্রামে যখন বরযাত্রী আসে বা অতিথি আসে তখন পাগল এবং মহা বোকাকে সমাদরের সঙ্গে তাদের সামনে উপস্থিত করা হয়। যাতে অতিথিরা পাগলামি এবং বোকামি দেখে বিমলানন্দ উপভোগ করতে পারেন।

আমাদের গ্রামের যে পাগল ছিল তার নাম নশু পাগল। তার পাগলামির লক্ষণ হচ্ছে সে একটা লম্বা লাঠি মাটিতে রেখে বলবে—তিন হাত পানি। সারাক্ষণই সে বিভিন্ন জায়গায় লাঠি রেখে পানি মাপছে। কখনো তিন হাত কখনো পাঁচ হাত। যাই হোক, একবার বরযাত্রী এসেছে, সবাই ধরে নিয়ে এল নশুকে। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, পানি কতটুকুরে নশু ? লাঠি দিয়ে মেপে বল দেখি।

নশু অবাক হয়ে বলল, শুকনা খট খট করতাছে। পানির কথা কী কন ?

সবাই রেগে আগুন। কড়া গলায় বলল, লাঠি দিয়ে মেপে ঠিকমতো বল হামারজাদা তিন হাত পানি না পাঁচ হাত পানি।

নশু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, পানি তো দেখি না। এইসব কী কন ? পাগলের কথাবার্তা।

নশুকে ধরে শক্ত মার দেওয়া হলো। গ্রামের বেইজ্জতি হয়ে যাচ্ছে, সহ্য করা মুশকিল। মার খেয়ে নশুর বুদ্ধি খুলল। লাঠি মাটিতে ধরে বলল, সাড়ে চাইর হাত পানি।

সবার মুখে হাসি ফিরে এল। বরযাত্রীদের একজন বলল, পানি বাড়ছে না কমছে ?

বাড়তাছে। এখন হইছে পাঁচ হাত।

গ্রামে শান্তি ফিরে এল। আধঘণ্টা ধরে নশু বরযাত্রীদের সামনে বিভিন্ন জায়গায় লাঠি রেখে পানির উচ্চতা বলতে লাগল। বরযাত্রীরা মহা খুশি।

আমার মনে হয়, শুধু গ্রামে নয় সমাজের প্রতিটি স্তরে একজন করে পাগল দরকার। লেখক এবং কবিদের মধ্যেও দরকার একজন পাগলা-লেখক কিংবা কবি। ঠিক তেমনি পত্রপত্রিকার মধ্যে একটি পাগল পত্রিকা দরকার, যেমন *উন্মাদ*।

পুনশ্চ পাগলদের নিয়ে আমি কয়েকদিন আগে একটা চমৎকার রসিকতা পড়লাম। আপনাদের কেমন লাগবে বুঝতে পারছি না, তবু বলছি। মি. জোনসের ইনসমনিয়া হয়েছে। পরপর চার রাত অঘুমো থেকে অবস্থা কাহিল। নানান ধরনের সিডেটিভ দিয়েও কাজ হলো না। তখন মি. জোনসের আত্মীয়স্বজন একজন সাইকিয়াট্রিস্টকে আনলেন। সাইকিয়াট্রিস্ট বললেন, রোগীকে হিপনোটইজ করে ঘুম পাড়িয়ে দেব। এই বলে তিনি রোগীর সামনে হাত নাড়তে নাড়তে বললেন, ঘুম আসছে, আপনার চোখে নেমে আসছে ঘুম। বাইরের জগৎ-সংসার আপনার কাছে বিলুপ্ত। আপনার চোখে তন্দ্রা। এই তো চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। নিঃশ্বাস হচ্ছে ভারী।

সত্যি সত্যি জোনসের চোখ বন্ধ হয়ে এল। নিঃশ্বাস হলো ভারী। ডাক্তার ভিজিট নিয়ে দরজার বাইরে যেতেই মি. জোনস চোখ মেলে ভয়ার্ত গলায় বললেন, পাগল বিদেয় হয়েছে ?

৫

আমাদের পাড়ায় 'সাহিত্য বাসর' নামে চ্যাংড়া ছেলেপুলেদের কী যেন একটা সংগঠন আছে। এদের কাজ হচ্ছে দু'দিন পর পর মাইক লাগিয়ে পাড়ার সবাইকে বিরক্ত করা। গল্পপাঠের আসর, কবিতা সন্ধ্যা, ছড়া বিকেল, বৃন্দ আবৃত্তি—একটা-না-একটা লেগেই আছে। এসব ঝামেলা ঘরে বসে সেরে ফেললেই হয়, তা করবে না। প্যান্ডেল খাটাবে, মাইক ফিট করবে—বিরাট জলসা। পয়সা কোত্থেকে পায় কে জানে। দেশ যখন বন্যার পানিতে ডুবে গেল তখন 'সাহিত্য বাসর'-এর অনুষ্ঠানের ধুম পড়ে গেল। বন্যার্তদের সাহায্যার্থে কমিক অনুষ্ঠান, বিচিত্রা অনুষ্ঠান, আনন্দ মেলা।

এই পর্যায়ের শেষ অনুষ্ঠানটি হলো 'আপনার কি আছে ?'

আগে ব্যাপারটি সম্পর্কে আপনাদের একটু বলে নেই। তারপর মূল ঘটনায় যাব।

ছুটির দিন সকালবেলায় আরাম করে দ্বিতীয় কাপ চায়ে চুমুক দিচ্ছি, সাহিত্য বাসরের দলবল উপস্থিত। সবার মুখেই হাসি। হাসি দেখেই আঁতকে উঠতে হয়। কারণ এরা সহজে হাসে না। আমি উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, কী ব্যাপার ?

আমরা মারাত্মক একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করছি স্যার। নাম হচ্ছে 'আপনার কি আছে ?' বন্যার্তদের সাহায্যের জন্যে।

বাহ, খুব ভালো।

একটা ইউনিক আইডিয়া। গানবাজনা কিছু না। ফাঁকা স্টেজ। স্টেজের মাঝখানে একজন ভিখারি বসে থাকবে, গায়ে কোনো কাপড় নেই। শুধু কলাপাতা দিয়ে লজ্জাটা ঢাকা। তখন ব্যাকগ্রাউন্ডে মাইকে বলা হবে—'আপনার অনেক আছে, এর কিছুই নেই। একে কিছু দিন।' তখন দর্শকের মাঝখান থেকে একজন উঠে আসবে। সে তার মানিব্যাগ-শার্ট-গেঞ্জি এসব খুলে দেবে। প্রচণ্ড হাততালি। ব্যাকগ্রাউন্ডে মিউজিক—'ওই মহামানব আসে।' আইডিয়া কেমন স্যার?

খুব ভালো, তোমাদের ধারণা লোকজন সব স্টেজে এসে সব খুলে দিয়ে চলে যাবে?

শুরুতে যাবে না। তবে প্রথম কয়েকজন যখন সাহস করে যাবে তখন ফ্লো এসে যাবে। আপনি তো জানেন স্যার, বাঙালি হচ্ছে হুজুগে জাতি। ফ্লোর ওপর চলে।

তা ঠিক।

এখন আপনি হচ্ছেন আমাদের ভরসা।

আমি মনের উদ্বেগ বহুকষ্টে চাপা দিয়ে বললাম, আমি ভরসা মানে?

প্রথম যে মানুষটি যাবে সে হচ্ছে আপনি। এপাড়ায় আপনার একটা ইজ্জত আছে। প্রফেসর মানুষ, প্রথম আপনি গেলে অন্যরকম এফেক্ট হবে। একটু হাইড্রামা, স্যার করতেই হবে—উপায় নেই।

কী রকম হাইড্রামা?

সব কাপড়চোপড় আপনাকে খুলে ফেলতে হবে। তারপর আমরা আপনাকে ঠিক ভিখিরির মতো একটা কলাপাতা দিয়ে জড়িয়ে দেব। আপনি কিন্তু না বলতে পারবেন না। রিকোয়েস্ট।

উন্মাদ-এর পাঠক-পাঠিকা, আমি কী করে সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম সেই দীর্ঘ কাহিনী বলতে চাই না। তবে অনুষ্ঠানটি শেষ পর্যন্ত কী রকম হলো সেটা বলছি।

অনুষ্ঠান শুরু হলো সন্ধ্যায়। প্রধান অতিথি চলে এলেন। তার নাম বলছি না। কারণ তিনি একজন পেশাদার প্রধান অতিথি। সবাই এঁকে চেনেন। ঢাকা শহরের শতকরা আশি ভাগ অনুষ্ঠানে তিনি হয় প্রধান অতিথি, কিংবা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। চমৎকার একটি বক্তৃতা দেন। যে ফুলের মালাটি তাঁকে দেওয়া হয় সেটি তিনি একটি শিশুর গলায় পরিয়ে অত্যন্ত নাটকীয় কায়দায় শিশুটির কপালে চুমু খান। তখন বিক্ষিপ্তভাবে হাততালি পড়ে। যাই হোক, এই প্রধান অতিথি ভদ্রলোক সম্ভবত অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আগে কিছু জানতেন না। যখন দেখলেন স্টেজে কলাপাতা গায়ে এক নেংটো ভিখারি বসে আছে তখন স্বভাবতই ঘাবড়ে গেলেন।

তারপর যখন মাইকে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় তখন প্রধান অতিথি শুকনো গলায় বললেন, এসব এরা কী বলছে? হোয়াট ডু দে মিন?

আমি তাঁকে সাহস দেওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ততক্ষণে মাইকে উদাত্ত গলায় বলা হচ্ছে—এবার আমাদের এই অনুষ্ঠানে প্রথম যিনি তার সর্বস্ব দিয়ে এক অনুপম আদর্শের সূচনা করবেন তিনি হচ্ছেন আমাদের অতি আদরের প্রধান অতিথি বিশিষ্ট সাহিত্যবোদ্ধা অনলবর্ষী বক্তা, সমাজের বন্ধু, অভাজনের চোখের মণি...। প্রধান অতিথি কাঁপাগলায়

আমাকে জিজ্ঞেস করলেন দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় বোধহয় নেই। আমি কোনো উত্তর দিলাম না। সাহিত্য বাসরের কর্মীরা কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁকে ঠেলাঠেলি করে স্টেজে উঠিয়ে দিল। ব্যাকগ্রাউন্ডে গান হতে লাগল 'ওই মহামানব... ও... আসে।' যেরকম আশা করা হয়েছিল সেরকম হলো না। বাঙাল হুজুগে জাতি হলেও এই হুজুগে তারা মাতলো না, দ্রুত মাঠ খালি হয়ে গেল। শুধু প্রধান অতিথি একটি কলাপাতায় লজ্জা নিবারণ করে ত্রিভঙ্গ মুরারী হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন গলায় ফুলের মালা, সামনে পিরিচে ঢাকা পানির গ্লাস নিয়ে যিনি শান্ত সমাহিত ভঙ্গিতে বসে থাকেন তাঁকে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। অন্য শ্রোতাদের মতো তিনি ঘুমিয়ে পড়তে পারেন না। অসুবিধা জায়গায় চুলকানি শুরু হলে চুলকাতে পারেন না। হাসিমুখে বসে থাকতে হয় এবং ভান করতে হয় বিমলানন্দ উপভোগ করছেন। প্রফেশনালরা এই কাজটা ভালোই করেন। অসুবিধা হয় যারা প্রফেশনাল না তাদের। আমার নিজের দেখা একটি দৃশ্য বলছি। 'বাংলাদেশ পুষ্পপ্রেমী'দের একটি অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথি হচ্ছে হাজী আসমত আলী বেপারী। ইনি কিছুদিন হলো শুকনো মরিচের ব্যবসা করে প্রচুর পয়সা করেছেন। তাঁকে প্রধান অতিথি করার একটিই উদ্দেশ্য, কিছু পয়সাকড়ি পাওয়া।

হাজী আসমত আলী বেপারী চোখ বড় করে দুঘণ্টার মতো সময় মূর্তির মতো কাটালেন। তারপরই সম্ভব-অসম্ভব জায়গায় চুলকাতে শুরু করলেন। প্রধান অতিথিকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে নিয়ে যাওয়া হলো এবং কানে কানে বলা হলো ফুলের ওপর দু'একটা কথা বলবেন। বেশি কিছু বলার দরকার নেই।

হাজি সাহেব শুরু করলেন গোলাপ দিয়ে। গোলাপের বর্ণ গন্ধ এইসব নিয়ে প্রচুর উচ্ছ্বাস করে বললেন, গোলাপ হচ্ছে আমাদের জাতীয় ফুল।

তাঁকে কানে কানে বলা হলো, গোলাপ নয়, জাতীয় ফুল হচ্ছে শাপলা। তিনি হুঙ্কার দিয়ে বললেন, কোন শালায় বলে শাপলা জাতীয় ফুল ? কোথায় গোলাপ আর কোথায় শাপলা ? কোথায় আইয়ুব খান আর কোথায় খিলি পান! ভাইসব, আপনারা বলেন, শাপলা কি একটা ফুল ? শাপলা হচ্ছে একটা তরকারি।

বুঝতেই পারছেন প্রফেশনাল নন এসব লোকদের প্রধান অতিথি করা খুব রিস্কি ব্যাপার।

আবার প্রফেশনালদের নিয়েও কিছু সমস্যা আছে। এরা এই কাজ করতে করতে একটু বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়েন। যা নাকি মাঝে মাঝে জটিলতার সৃষ্টি করে। আমি এরকম একজনকে চিনি। তিনি সভাতে এসেই খোঁজ নেন সভা কতক্ষণ চলবে। সময়টা জেনে নিয়ে চট করে ঘুমিয়ে পড়েন। দর্শকরা কেউ তা বুঝতে পারে না। সবাই ভাবে চোখ বন্ধ করে গভীর মনোযোগে তিনি শুনছেন। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার আধঘণ্টা আগে জেগে ওঠেন এবং যথাসময়ে একটি চমৎকার বক্তৃতা দেন। একবার গণ্ডগোল হয়ে গেল। উদ্যোক্তারা বলছে অনুষ্ঠান তিন ঘণ্টার মতো চলবে। সেই হিসেবে তিনি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হলেন। কিন্তু অনুষ্ঠান দুঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে গেল। তাঁকে জাগানো হলো।

তাঁর ভাবভঙ্গি দিশাহারার মতো। যেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। একজন কানে কানে বলল, স্যার কিছু বলুন। তিনি হুঙ্কার দিলেন, কেন ?

আপনি স্যার প্রধান অতিথি।

তিনি এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। দর্শকদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন উঠল এবং এক সময় সবাইকে হতভম্ব করে তিনি বললেন, 'যুথির মা, আমাকে আধাকাপ চা দাও।'

প্রধান অতিথি প্রসঙ্গে আমার নিজের একটি ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা আছে। বেশ অনেকদিন আগের কথা। একদল ছেলে এসে আমাকে ধরল প্রধান অতিথি হতে হবে। আমি এককথায় রাজি। ওদের বলে দিলাম নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে আমি উপস্থিত থাকব। চারটার সময় যাওয়ার কথা। আমি অবশ্যি চারটার সময় গেলাম না। প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি এদের একটু দেরিতে উপস্থিত হতে হয় এটাই নিয়ম। আমি কুড়ি মিনিটের মতো দেরি করলাম। অনুষ্ঠান তখনো শুরু হয়নি। কিন্তু কী সর্বনাশ! ডায়াসে প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি দুজনই উপস্থিত। এ-কী কাণ্ড! আমি কী করব ভাবছি। উদ্যোক্তাদের একজন এগিয়ে এসে নিচুগলায় বলল, আপনি হচ্ছেন স্যার স্ট্যান্ডবাই প্রধান অতিথি। আসল জন না এলে আপনাকে বসিয়ে দিতাম।

বলো কী তুমি ?

কী করব স্যার বলেন, কেউ কথা রাখে না। বলে আসবে কিন্তু আসে না। এইজন্যে স্ট্যান্ডবাই রাখতে হয়। আসেন স্যার, এক কাপ চা খান। চা না খেলে বুঝব আপনি রাগ করেছেন।

গেলাম চায়ের দোকানে। সেখানে আরেকজন স্ট্যান্ডবাই বিশেষ অতিথি বিমর্ষ মুখে বসে আছেন। আমাকে দেখে মুখ কালো করে বললেন, আমি একা এলে একটা কথা হতো। স্ত্রী এবং ছোট শালীকে নিয়ে এসেছি, এদের কাছে কী বলি ? আপনি বলুন তো ভাই!

আমি উনাকে কী বলব! আমি নিজেও আমার স্ত্রীকে নিয়ে এসেছি। জীবনের প্রথম প্রধান অতিথি আর স্ত্রী সেটা দেখবে না, তা কি হয় ?

৬

এবারের এলেবেলে ডাক্তারদের নিয়ে। কাজেই ভয়ে ভয়ে লিখছি। ডাক্তাররা রাজনীতিবিদদের মতোই সেনসেটিভ। কেউ হা করলেই মনে করে গাল দিচ্ছে। রসিকতা একেবারেই ধরতে পারে না। রসিকতার কারণেই আমার দীর্ঘদিনের ডেনটিস্ট বন্ধু এ, করিমের সঙ্গে আমার কথাবার্তা বন্ধ। এক সন্ধ্যাবেলা তার চেম্বারে দাঁত দেখাতে গিয়ে ডেনটিস্টদের নিয়ে একটা গল্প বললাম। এই গল্প হলো আমার কাল। বন্ধু রেগে অস্থির। গল্পটা এরকম

এক দাঁতের ডাক্তার খুব সহজেই একটা দাঁত টেনে তুললেন। এত সহজে দাঁত উঠে আসবে তিনি ভাবেননি। রোগীকে বললেন, ব্যথা পেয়েছেন ? রোগী বলল, জি-না স্যার।

দাঁত তোলার ব্যাপারটা কত সহজ দেখলেন তো। শুধু শুধু আপনারা ভয় পান।

রোগী টাকাপয়সা দিয়ে চলে গেল। ডাক্তার চিমটা খুলে অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, দাঁত নয় তিনি হ্যাচকা টানে রোগীর আলজিব তুলে নিয়ে এনেছেন!

উন্মাদের পাঠকমাত্রই বুঝতে পারছেন অতি নির্দোষ গল্প। কিন্তু আমার বন্ধু এ করিম সেটা বুঝল না। চোখ-মুখ লাল করে বলল, এটা একটা কথা হলো ? কোথায় আলজিবের পজিশন আর কোথায় দাঁতের পজিশন। তাছাড়া আলজিব টেনে তুললেও তো ব্যথা লাগবে। সেখানে তো লোকাল অ্যানসথেসিয়া করা হয়নি।

আমি বললাম, তুই এত রেগে যাচ্ছিস কেন! এটা একটা গল্প। একটা রসিকতা।

রসিকতা মানে ? রসিকতার কোন মা-বাপ থাকবে না ? যা ব্যাটা, তোর দাঁত আমি তুলব না।

আমি দাঁতের ব্যথায় কোঁ কোঁ করতে করতে ঘরে ফিরলাম এবং প্রতিজ্ঞা করলাম, এই জীবনে দাঁতের ডাক্তারদের নিয়ে কোনো রস করার চেষ্টা করব না। রস করা মানেই হাসানো। হাসানো মানেই দাঁত বের করা। ডেনটিস্টরা এই দাঁত জিনিসটাই সহ্য করতে পারেন না। দাঁত দেখামাত্রই তাদের টেনে তুলে ফেলতে ইচ্ছা করে। সেই তোলা ব্যাপারটাও তাঁরা এক দফায় করেন না। প্রথম দফায় দাঁত ক্লিনিং। দ্বিতীয় দফায় টেম্পোরারি ফিলিং। তৃতীয় দফায় পার্মানেন্ট ফিলিং। চতুর্থ দফায় দন্ত উৎপাটন। পঞ্চম দফায় পাশের দাঁতে টেম্পোরারি ফিলিং...

পুনঃপৌনিক অংকের মতো ব্যাপার। চলতেই থাকবে যতদিন না মুখ দন্তশূন্য হয়।

বছরখানিক আগে আমার ছোট চাচিকে নিয়ে গিয়েছি এক ডেনটিস্টের কাছে। চাচি নকল দাঁত নেবেন। ডাক্তার পরীক্ষা-টরীক্ষা করে বলল, সাতটা দাঁত আপনার ভালো। এদের তুলে ফেলে দিলে নকল দাঁত বসানোর খুব সুবিধা হবে। চাচি রাজি নন। হারাধনের সাত সন্তান ধরে রাখতে চান। ডেনটিস্টও ছাড়বে না, সে তুলবেই। হেনতেন কত কথা। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার বললেন, আপনি মুরুব্বি মানুষ। আপনাকে হাফ ফিতে তুলে দেব!

এতে কাজ হলো। অর্ধেক দামে হয়ে যাচ্ছে এই লোভ সামলানো মুশকিল। চাচি তাঁর সাতখানা দাঁত রেখে ফোকলা মুখে ঘরে ফিরলেন।

থাক ডেনটিস্টের কথা। রেগুলার ডাক্তারদের কথা কিছু বলি। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে শুরু করি। একবার এক স্কিন স্পেশালিস্টের কাছে যেতে হলো। গিয়ে দেখি হুলস্থুল ব্যাপার—ইস্কুল খুইলাছেরে মওলা ইস্কুল খুইলাছে। গোটা পঞ্চাশেক রোগী বসে আছে। আমার নম্বর হলো একান্ন। বসে আছি তো বসেই আছি। একটু লজ্জা লজ্জাও লাগছে। কারণ ডাক্তারের বিশাল সাইন বোর্ডে লেখা—চর্ম ও যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ। আমার কেবলই মনে হচ্ছে সবাই বোধহয় আমাকে শেষের রোগের রোগী বলেই ভাবছে।

আপনারা সবাই জানেন স্পেশালিস্টের কাছে কেউ একা যায় না। এমন একজনকে নিয়ে যায় যে স্পেশালিস্ট বিশেষজ্ঞ। অর্থাৎ ঢাকা শহরে কোথায় কোন স্পেশালিস্ট আছে তা এরা জানেন। কে ভালো কে মন্দ কার কী স্বভাব এসব তাঁদের নখদর্পণে। আমি যাকে সঙ্গে নিয়ে গেছি তিনি সম্পর্কে আমার মামা। অত্যন্ত করিৎকর্মা ব্যক্তি। কিছুক্ষণের

মধ্যেই ঘুরে এসে বললেন, দশ টাকা ঘুষ দিলেই কার্যোদ্ধার হবে। আমি চমকে উঠে বললাম, কাকে ঘুষ দেব, ডাক্তারকে ?

আরে না। তাঁর অ্যাসিসটেন্টকে। দশটা টাকা খাওয়ালেই সে তোর একান্ন নম্বর টিকিটকে পনেরো বানিয়ে দেবে। যা তুই দশটা টাকা দিয়ে আয়। আমি মুরব্বি মানুষ, আমার দেওয়া ঠিক হবে না।

ঘুষ কী করে দিতে হয় সেই কায়দা জানা না থাকায় দেওয়া গেল না। ঘুষ নিশ্চয়ই প্রকাশ্যে দেওয়ার বিধান নেই। কিন্তু যে টাকা নেবে সে বহুলোকের মাঝখানে বসে আছে। গোপনে তাকে টাকা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। জুয়েল আইচ সাহেব পারলেও পারতে পারেন।

যাই হোক, একসময় উপস্থিত হতে পারলাম। রোগের লক্ষণ বলা শুরু করার আগেই ডাক্তার ইশারায় আমাকে থামিয়ে দিলেন। হাতের চামড়ার যে সাদা দাগের চিকিৎসার জন্যে এসেছি তা দেখাতে গেলাম, তার আগেই দেখি প্রেসক্রিপশন লেখা শেষ। আমি বললাম, আমার অসুখটা কী ? ডাক্তার সাহেব ভারী গলায় বললেন, একশ'।

প্রথমে ভাবলাম এটাই বুঝি অসুখের নাম। আমার মামা পেটে খোঁচা দিয়ে বললেন, একশ' টাকা দিতে বলছে।

দিলাম একশ' টাকা। ডাক্তার একটি চিমটি দিয়ে টাকা নিলেন। হাত দিয়ে ছুলেন না। গম্ভীর গলায় বললেন, টাকায় অনেক ময়লা থাকে তো, নানানরকম মাইক্রোঅরগেনিজম, এইজন্যে হাতে ছুঁই না। আপনি আবার অন্য কিছু ভাববেন না।

বেরিয়ে এসে মামাকে বললাম, ব্যাটা তো কিছু দেখলই না। এর ওষুধে কাজ হবে ?

মামা বিরক্ত হয়ে বললেন, কাজ না হলে শ'খানেক লোক বসে থাকে ? গাধার মতো কথা বলিস না তো।

রোগ সম্পর্কে কিছু না জেনেও যে রোগের চিকিৎসা বেশ ভালোভাবেই করা যায় এটা বোধহয় সত্যি। আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের কথা বলি। আমার রুমমেট জ্বর, ডায়রিয়া এবং মাথাব্যথায় কাতর। ইউনিভার্সিটির ডাক্তারকে খবর দেওয়া হলো। ডাক্তার এলেন। রুমমেট তখন বাথরুমে (সেই সময় এটাই তার স্থায়ী ঠিকানা)। ডাক্তার সাহেব আমাকেই রোগী ভাবলেন। হা করতে বললেন। আমি তাঁর ভুল ভাঙালাম না। কী দরকার ভদ্রলোককে লজ্জা দিয়ে। অদ্ভুত কাণ্ড, সেই প্রেসক্রিপশন মোতাবেক ওষুধ খেয়ে আমার রুমমেট ভালো হয়ে গেল। ডাক্তারি শাস্ত্রটার প্রতি সেই থেকেই আমরা খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা। বড়ই রহস্যময় শাস্ত্র।

শুধু চিকিৎসা নয়, চিকিৎসা-সংক্রান্ত সব ব্যাপারই আমার কাছে খুব রহস্যময় মনে হয়। আমার বড় মেয়েটির জন্ডিসের মতো হয়েছে। ডাক্তার বললেন, বিলরুবিন টেস্ট করানো দরকার। এক জায়গায় না করিয়ে দু'জায়গায় করাবেন। করলাম দু'জায়গায়। এক জায়গায় বলল, জন্ডিস নেই। অন্য জায়গায় বিলরুবিন নাইন পয়েন্ট ফাইভ। যার মানে রোগের কঠিন অবস্থা। ডাক্তার বললেন, থার্ড এক পার্টিকে দিন। দেখি ওরা কী বলে ?

আমি থার্ড পার্টিকে দিলাম না। কী দরকার ? জন্ডিসের এক মালা এনে গলায় পরিয়ে দিলাম—এই মালা গা বেয়ে নামলেই রোগ সেরে যাবে বলে জনশ্রুতি। দেশের যে অবস্থা তাতে মনে হয় মালা, চাল পড়া, পানি পড়া এইসব আধ্যাত্মিক ওষুধ খুব খারাপ না।

ডাক্তার প্রসঙ্গে চীনদেশীয় একটি গল্প শুনুন। জনৈক চীনের তরুণকে বলা হলো, তোমার এখানে খুব ভালো ডাক্তার কেউ আছেন ? চীনাম্যান হাসিমুখে বললেন, হ্যাঁ আছেন। তাঁর নাম ইং চুন!

খুব ভালো ডাক্তার ?

জি হ্যাঁ। উনি একবার আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছেন।

কী রকম বলো দেখি।

আমার একবার খুব অসুখ হয়। তখন আমি যাই ডাক্তার লী মাইয়ের কাছে। তিনি আমাকে কী কী সব ওষুধ দেন। সেসব খেয়ে আমি প্রায় মরমর। তখন গেলাম অন্য ডাক্তারের কাছে। তার ওষুধ খেয়ে আরও খারাপ। শেষ পর্যন্ত ইং চুন-এর কাছে।

তিনি তোমাকে নতুন ওষুধ দেন ?

জি-না। ডাক্তার ইং চুন তখন দেশে ছিলেন না। কাজেই ওষুধ দিতে পারেননি। এই কারণেই আমি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠি। কাজেই আমি ইং চুনকে খুব বড় ডাক্তার বলি।

বানানো গল্প বাদ দিয়ে একটি সত্যি গল্প বলি। খোদ আমেরিকার হাসপাতালের ডাক্তাররা একবার দীর্ঘ সময়ের জন্যে স্ট্রাইক করেছিল। হাসপাতাল অচল। রোগীর চিকিৎসা হয় না। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, হিসাব করে দেখা গেল স্বাভাবিক অবস্থায় যত রোগী মারা যায়, স্ট্রাইক চলাকালীন অবস্থায় রোগী মারা গেছে অনেক কম। যার মোদ্দাকথা হচ্ছে, খোদ আমেরিকাতে চিকিৎসা করেই রোগী বেশি মরে। না করলে মরত না।

এলেবেলে শেষ করার আগে আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাটা বলে নেই। ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর ইউরিন ডাক্তারের কাছে দিয়ে এসেছেন প্রেগনেন্সি টেস্ট করানোর জন্যে। ডাক্তার টেস্ট করে বললেন, পজিটিভ রেজাল্ট। কনগ্রাচুলেশন, আপনার স্ত্রী গর্ভবতী।

আমার বন্ধু ডাক্তারকে এই মারে তো সেই মারে। কারণ বোতলে করে টিউবওয়েলের পানি নিয়ে গিয়েছিল। তার উদ্দেশ্য এই ক্লিনিকের টেস্টগুলি কেমন তা আগেভাগে যাচাই করে নেওয়া। আমার বন্ধু রাগে তোতলাতে তোতলাতে বলল, আপনি বলতে চান আমার টিউবওয়েল গর্ভবতী ?

ডাক্তার দার্শনিকের ভঙ্গিতে বললেন, হ্যাঁ তাই। আমাদের টেস্ট মিথ্যা হতে পারে না। তবে ওই জিনিস কী করে গর্ভবতী হলো তা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। আমি বলতে পারব না।

৭

পত্রপত্রিকা খুললেই আজকাল ইন্টারভিউ নামক একটি ব্যাপার চোখে পড়ে। চিত্রজগতের লোকজনদের সেখানে প্রাধান্য থাকলেও আজকাল ফাঁকে ফোকরে কিছু কবি, নাট্যকার, গল্প লেখক, চিত্রকর ঢুকে পড়ছেন। ইন্টারভিউগুলি সাধারণত দুধরনের হয়।

সহজিয়া ইন্টারভিউ—আপনি কোন রাশির জাতক ? আপনার প্রিয় রঙ কী ? আপনার প্রিয় খাবার কী ? আপনার হবি কী ? আপনি মোহামেডানের সার্পোটার, না আবাহনীর ?

দ্বিতীয় ধরনের ইন্টারভিউ হচ্ছে কঠিনিয়া (বাংলা ব্যাকরণের ত্রুটি হলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি) ইন্টারভিউ। এখানে প্রশ্নকর্তা বেকায়দা অবস্থা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। বেছে বেছে এমন সব প্রশ্ন করেন যার উত্তর উত্তরদাতার জানার কোনোই কারণ নেই। উদাহরণ দিচ্ছি—মনে করা যাক একজন অভিনেত্রীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে। যিনি পড়াশোনার তেমন সুযোগ পাননি। ক্লাস এইট পর্যন্ত উঠে সিনেমায় জড়িয়ে পড়েছেন। প্রশ্নকর্তা তাকে বেকায়দায় ফেলতে চান। সেটা তিনি সাধারণত এভাবে করেন—

প্রশ্ন আচ্ছা আপা, আপনি তো সাধারণ মানুষ সম্পর্কে ভাবেন, তাই না ?

উত্তর (খুবই অবাক) ওমা ভাববো না ? আপনি আমাকে কী মনে করেন ? বাড়ি-গাড়ি করেছি বলেই ওদের কথা ভুলে গেছি। ছিঃ, দুঃখী মানুষের কথা মনে হলেই আমার... (এইখানে তাঁর গলা প্রায় ধরে গেছে। কথা আটকে যাচ্ছে)।

প্রশ্ন : সমাজ পরিবর্তনের কথা আপনি নিশ্চয়ই ভাবেন ?

উত্তর : হুঁ, খুব ভাবি।

প্রশ্ন : অবসর সময়ে নিশ্চয়ই এই সমস্যা নিয়ে পড়াশোনাও করেন ?

উত্তর : তা করি। পড়াশোনা করতে আমার ভীষণ ভালো লাগে।

প্রশ্ন *দাস ক্যাপিটাল* বইটা তো আপনার নিশ্চয়ই পড়া। তাই না আপা ?

উত্তর : হুঁ, পড়েছি। খুব ভালো বই।

প্রশ্ন বইটির লেখকের নাম বলতে পারবেন ?

উত্তর (একটু সময় নিচ্ছেন) আমার আবার ভাই লেখকের নাম মনে থাকে না। বইয়ের ঘটনা মনে থাকে। লেখকের নামটা তো বড় নয়, বইটাই বড়। তাই না ভাই ?

প্রশ্ন তা তো নিশ্চয়ই। *দাস ক্যাপিটাল* বইটির ঘটনা মনে আছে আপনার ?

উত্তর অনেকদিন আগে পড়েছি তো, পুরোপুরি মনে নেই। তবে বইটা খুব দুঃখের। লাস্ট সিনে মেয়েটা বোধহয় মারা যায়, তাই না ?

এখানে যা লক্ষণীয় তা হচ্ছে প্রশ্নকর্তা ফাঁদে ফেলবার জন্যে কীভাবে এগুচ্ছেন। এবং উত্তরদাতা কত সহজে ফাঁদে পা দিচ্ছেন। সিনেমার নায়িকা নিয়ে উদাহরণ না দিয়ে

আমি একটি বাস্তব উদাহরণ দিচ্ছি। এবারের উত্তরদাতা একজন রাজনীতিবিদ। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে এঁরা চিন্তাভাবনা এবং পড়াশোনা করেন বলে অনেকেই মনে করেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো তাঁর প্রিয় ঔপন্যাসিক কে ? তিনি একটি নাম বললেন। নামটি কার তা বলছি না, তবে বুদ্ধিমান পাঠক নিশ্চয়ই আঁচ করতে পারছেন। যাঁরা পারছেন না তারা সম্ভবত আমার বই পড়েননি। হা হা হা।

যাই হোক, নামটি বলেই তিনি কিন্তু ফাঁদে পা দিলেন।

প্রশ্ন : তাঁর কী কী বই পড়েছেন ?

উত্তর : অনেকগুলি পড়েছি। নাম মনে করতে পারছি না।

প্রশ্ন কোনো একটি উপন্যাসের ঘটনা যদি বলেন তাহলে নামটি মনে করার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি। কোনো ঘটনা মনে আছে ?

উত্তর জি-না।

প্রশ্ন আপনার প্রিয় ঔপন্যাসিক অথচ আপনি তাঁর কোনো বইয়ের নাম জানেন না। ঘটনা বলতে পারছেন না, ব্যাপারটা কী ?

রাজনীতিবিদ নিরুত্তর।

ইন্টারভিউটি ছাপা হয়েছিল *বিচিত্রা* কিংবা *আনন্দ বিচিত্রা*-য়, আমার ঠিক মনে পড়ছে না। আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে আমরা কোনো জিনিস সম্পর্কে অজ্ঞ ওইটি স্বীকার করতে চাই না। প্রশ্নকর্তা আমাদের এই দুর্বলতাকে চমৎকার ব্যবহার করেন। সুন্দর ফাঁদ পাতেন। অজান্তে সেই ফাঁদে পা দেই, তারপর আর বেরুবার পথ থাকে না।

অবশ্যি ঠিকঠাক উত্তর দিয়েও অনেক সময় পার পাওয়া যায় না। প্রশ্নকর্তা উত্তরগুলি নিজের মতো করে সাজান, উত্তর যেমন আছে তেমনি রাখেন, কিছুই বদলান না। কিন্তু সাজানোর কারণ সম্পূর্ণ উল্টে যায়। উদাহরণ দেই। মনে করা যাক, একজন সাংবাদিক নামি এক চিত্রতারকার ইন্টারভিউ নিতে গেছেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল ছ'টায়, নায়িকা এলেন রাত ন'টায়। এসেই আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নানান জায়গায় টেলিফোন করতে লাগলেন। এক ফাঁকে শুধু বললেন, কিছু মনে করবেন না, খুব ব্যস্ত। আপনাকে কিছু খেতে দিয়েছে ? দেয়নি ? ওমা কী কাণ্ড! কী খাবেন ?

সাংবাদিক মহা বিরক্ত হয়ে বললেন, এক গ্লাস পানি খাব।

নায়িকা এক গ্লাস পানি টেবিলে রেখে উধাও হয়ে গেলেন। এখন সাংবাদিক ভদ্রলোক রিপোর্ট কী কী ভাবে লিখবেন। দু'ভাবে লিখতে পারেন।

নমুনা-১

[ভালো রিপোর্ট।]

মিস 'অ'র সঙ্গে আমার দেখা করার কথা সন্ধ্যা ছ'টায়। আমি জানতাম আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি তা রক্ষা করতে

পারবেন না। কারণ তাঁর ব্যস্ততার সীমা নেই। আমাকে তিনি সময় দিয়েছেন শুধুমাত্র এই কারণে যে কাউকে তিনি না করতে পারেন না। যা ভেবেছি তা-ই, তিনি আসতে পারলেন না। আমি বসে বসে তাঁর বসার ঘর লক্ষ করলাম। স্নিগ্ধ রুচির ছোঁয়া চারপাশে। দেখতে ভালো লাগে। পবিত্র কাবা শরীফের একটি বাঁধানো ছবি ঘরে আছে। আধুনিকতার নামে তিনি ধর্মবিশ্বাসকে দূরে সরিয়ে রাখেননি। উনি এলেন রাত ন'টায়। আমাকে দীর্ঘ সময় বসে থাকতে দেখে লজ্জায় তাঁর অপরূপ মুখশ্রী রক্তবর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে কথা বলবেন সেই সময় কোথায় ? একের পর এক টেলিফোন আসছে। তবু এর ফাঁকেও যখন শুনলেন আমি তৃষ্ণার্ত তিনি ছুটে গিয়ে নিজের হাতে এক গ্লাস বরফশীতল পানি নিয়ে এলেন। আমি তাঁর সৌজন্য ও ভদ্রতায় মোহিত হলাম।

নমুনা-২

(মন্দ রিপোর্ট)

এদেশে কিছু কিছু তারকা (!) আছেন যাঁরা মনে করেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে উপস্থিত না হওয়াটা তাদের তারকামূল্যের মাপকাঠি। যিনি যত বড় তারকা তিনি তত দেরি করবেন। মিস 'অ' হচ্ছেন এমন একজন। সন্ধ্যা ছ'টায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আমি রাত ন'টা পর্যন্ত বসে রইলাম। মশার কামড় খেতে খেতে মিস 'অ'র রুচিহীন গৃহসজ্জা দেখে সময় কাটানো ছাড়া আমার কিছু করার নেই। দেয়ালে কামরুল হাসানের তরুণীর পেইন্টিং-এর পাশাপাশি কাবা শরীফের বাঁধাই ছবি। শো-কেসে দামি বিদেশি ডলের পাশে বঙ্গসংস্কৃতির পরাকাষ্ঠা হিসেবে একটি তালের হাতপাখা। উঠতি ধনীদের মতো যেখানে যত দামি জিনিস পেয়েছেন মিস 'অ' তার সবই বসার ঘরে জড়ো করেছেন।

যাই হোক, মিস 'অ'র একসময় মর্জি হলো তিনি এলেন এবং তিনি যে অসম্ভব ব্যস্ত তা প্রমাণ করার জন্যে একটির পর একটি টেলিফোন করতে লাগলেন। আমি দীর্ঘ সময় তাঁর জন্যে বসে আছি জেনে তিনি অবশ্যি করুণাবশত আধা গ্লাস ঠান্ডা পানি আমার সামনে রেখে গেলেন। আমি মনে মনে বললাম, হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন...

তবে এই সমস্ত রিপোর্টারকে বেকায়দায় ফেলবারও উপায় আছে। আমি কয়েকবার ফেলেছি। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। বছরখানেক আগে আমার ইন্টারভিউ নিতে এক রিপোর্টার এলেন। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখেই বুঝলাম অবস্থা ভালো না। এই

লোক এসেছে আমাকে কাদায় ঠেলে ফেলবার জন্যে। কাজেই আমি উত্তরের ধরন পাল্টে দিলাম। নমুনা দিচ্ছি–

প্রশ্ন আচ্ছা আপনি কি স্বীকার করেন এ পর্যন্ত যা লিখেছেন সবই বাজে মাল ?

উত্তর কেন স্বীকার করব না। এটা তো লুকিয়ে রাখার কোনো ব্যাপার না। সবই রদ্দি জিনিস। পচা মাল।

প্রশ্ন আপনার লেখাগুলি কিন্তু বেশির ভাগই হালকা।

উত্তর কারেক্ট। তবে আপনি বোধহয় ভদ্রতা করে বলছেন বেশির ভাগই হালকা। আসলে সবই হালকা। আপনি যেমন জানেন আমিও জানি, অন্যরাও জানে। পুরনো কথা তুলে কী লাভ ?

প্রশ্ন জীবন সম্পর্কে আপনার কোনো বোধ নেই।

উত্তর খুবই সত্যি কথা।

প্রশ্ন নাট্যকার হিসেবেও আপনি ব্যর্থ। কারণ এখন পর্যন্ত কোনো নাটকে সমাজের প্রতি কোনো কমিটমেন্ট আপনি দেখাতে পারেননি।

উত্তর একশ' ভাগ খাঁটি কথা। আমার নাটক মানেই ফালতু বিনোদন।

ভদ্রলোক যা বলেন আমি তাতেই রাজি হয়ে যাই। ইন্টারভিউ আর কিছুতেই জমে না। একসময় তাঁকে মুখ কালো করে উঠে পড়তে হয়। উঠতে উঠতে তিনি বলেন, আপনার এই সাক্ষাৎকার ছাপার কোনো মানে হয় না। কেউ ইন্টারেস্ট পাবে না। এটা ছাপা হবে না।

ইন্টারভিউর এটাই হচ্ছে মূলকথা। পাবলিক ইন্টারেস্ট পাবে কি না। যাঁরা সাক্ষাৎকার দেন তাঁদের বেশিরভাগ এটা বুঝতে পারেন না। তাঁরা মনে করেন প্রশ্নকর্তা বুঝি সত্যি সত্যি তাঁর সম্পর্কে জানতে চান। এই বিশ্বাস থেকে দীর্ঘ সময় ভ্যাজর ভ্যাজর করেন। পাবলিক মজা পায়। পত্রিকা বিক্রি হয়। ইন্টারভিউর এটাই হচ্ছে সার কথা।

৮

আমি জীবনের প্রথম টিভি দেখি উনিশশ' পঁয়ষট্টি সনে। তখন ঢাকায় প্রথম টিভি এসেছে। সৌভাগ্যবান কেউ কেউ টিভি সেট কিনেছেন। সেসব জায়গায় যাওয়ার সুযোগ নেই। একদিন খবর পেলাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোস্টেলে একটা টিভি কেনা হয়েছে। গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখতে গেলাম। চৌকোনা বাক্সের কাণ্ডকারখানা দেখে আমি মুগ্ধ ও বিস্মিত। একজন লোক খবর পড়ছে, তার মাথা দুলছে, কোমর দুলছে, পা দুলছে। মাঝে মাঝে তার গায়ের উপর দিয়ে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। বড় চমৎকার লাগল। নাচ এবং খবর একসঙ্গে। একের ভেতর দুই। আমি পাকিস্তানি পতাকা না দেখানো পর্যন্ত বসে রইলাম। সারাক্ষণই এরকম ঢেউ খেলা ছবি। পরে শুনেছি রিসেপশন খারাপ থাকার কারণে নাকি ওই কাণ্ড ঘটেছে। রিসেপশন ঠিক থাকলে নাকি অন্য ব্যাপার। তখন নাকি খুব চমৎকার দেখা যায়।

পরদিন আবার গেলাম। ওই একই ব্যাপার। রিসেপশন ঠিক হচ্ছে না। শুনলাম টিভি সেটেই নাকি গণ্ডগোল। ইতোমধ্যে আমি ঢেউ খেলানো ছবিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। আমার নেশা লেগে গেছে। রোজ যাই। আমার সঙ্গে আরও অনেকে দেখে। তারাও আমার মতো মুগ্ধ। টিভির সামনে থেকে নড়তে পারে না।

ঠিক রিসেপশনের টিভি একদিন দেখলাম। মোটেও ভালো লাগল না। বড় সাদামাটা মনে হলো। টিভির প্রতি আমার আগ্রহই গেল কমে। আমার মনে আছে যখন ঢাকা কলেজ হোস্টেলে প্রথম টিভি এল আমি দেখার মতো কোনো উৎসাহ খুঁজে পেলাম না। অনেকদিন টিভি রুমে যাইনি। তারপর আবার যাওয়া শুরু করলাম এবং আমার নেশা ধরে গেল। টিভি সেটের সামনে থেকে উঠতে পারি না।

এই ঘটনা দু'টি বিশ্লেষণ করলে একটা জিনিস বেরিয়ে আসে। তা হচ্ছে, এই চৌকোনো বাক্স যা ইচ্ছা তা দেখিয়েও মানুষকে মুগ্ধ এবং নেশাগ্রস্ত করে ফেলতে পারে। শুধু মানুষ নয় পশু পাখিকেও।

নেচার পত্রিকায় কুকুরের টিভিপ্রীতি সম্পর্কে একবার একটা লেখা ছাপা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছে, সন্ধ্যাবেলা টিভি না ছাড়লে পোষা কুকুররা অস্থির হয়ে পড়ে, তাদের ব্লাড প্রেসার বেড়ে যায়। ক্ষুধা কমে যায়। কুকুররা মানুষের মতো আগ্রহ নিয়ে টিভি দেখে। তারা প্রেমের দৃশ্যগুলি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। সবচেয়ে অপছন্দ করে মারামারির দৃশ্য।

সেদিন পত্রিকায় পড়লাম চীন দেশের এক কুকুর টিভিতে মারামারির দৃশ্য দেখে ভয়ে হার্টফেল করে ফেলেছে। কুকুরেরই যখন এই অবস্থা মানুষের কথা বাদই দিলাম। নিতান্ত আঁতেল যে ব্যক্তি (যার প্রিয় লেখক জেমস জয়েস ও বিষ্ণু দে) তাঁকেও দেখা যায় হা করে পর্দার সামনে বসে থাকতে। সেই 'হা'ও এমন বিকট হা যে আলজীব পর্যন্ত বের হয়ে থাকে। আমার পরিচিত একজন মহা আঁতেল অধ্যাপক আছেন। জাঁ লুক গদার এবং ফেলেনি এই দুজন চিত্রপরিচালক ছাড়া আর কোনো পরিচালকের ছবি তিনি দেখেন না। নজরুলকে তিনি মনে করেন ছড়া লেখক। সেই তাঁর বাসায় একদিন সন্ধ্যায় গিয়েছি। অতি উচ্চমার্গের কথাবার্তা শুনছি। এক সময় তাঁর মেয়ে এসে বলল, টিভিতে বাংলা ছবি দেখাচ্ছে—'প্রেম পরিণয়', দেখবে না ? অধ্যাপক বন্ধু কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, আমি প্রেম পরিণয় দেখব কেন ? মেয়েটি অবাক হয়ে বলল, তুমি তো সবগুলিই দেখ। এটা কেন দেখবে না ? অত্যন্ত বিব্রতকর অবস্থা।

অধ্যাপক বন্ধু শুকনো গলায় বললেন, আসল ব্যাপারটা কী জানেন ? খুবই আনএকসেপটেবল জিনিসও টিভির মাধ্যমে যখন আসে তখন একসেপটেবল মনে হয়। অধ্যাপক বন্ধুরা কথা কতটুকু সত্যি আমি জানি না। কিছুটা হয়তো সত্যি যদিও আমার মনে হয় আমরা এই যন্ত্রটিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। ভালো লাগুক না লাগুক আমরা তাকিয়ে থাকি। পঁচিশজন (নাকি তিরিশ ?) টিভি প্রযোজক মিলে আমাদের যা দেখান আমরা তাই দেখি। ব্যাপারটা কি ভয়াবহ নয় ? এই পঁচিশজন টিভি প্রযোজক কি সূক্ষ্মভাবে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছেন না ? এরা যদি মনে করেন বাংলাদেশের দর্শকদের আমরা প্রতি সপ্তাহে

একটি ভাঁড়ামো ধরনের অনুষ্ঠান দেখাব তাহলে আমাদের শুধু তাই দেখতে হবে। অন্য কিছু আমরা দেখব না। এবং একসময় ভাঁড়ামো ধরনের অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত হয়ে যাব। নির্দিষ্ট সময়ে কিছু ভাঁড়ামো না দেখলে ভালো লাগবে না। বদহজম হবে। ঘুম ভালো হবে না।

উদাহরণ দেই। নওয়াজীশ আলি খান নামের একজন প্রযোজক টিভিতে আছেন। চমৎকার মানুষ। হাসিখুশি। মজার জিনিস খুব পছন্দ করেন। যেহেতু তিনি মজার ব্যাপারগুলি খুব পছন্দ করেন, কাজেই তিনি প্রায় জোর করে আমাকে দিয়ে কয়েকটি হাসির নাটক লেখালেন। হাসির নাটক প্রচারিত হলো। দর্শকরা হাসির নাটক দেখলেন। নওয়াজীশ আলি খান যা দেখাতে চাচ্ছিলেন দর্শকদের তিনি তা-ই দেখালেন।

আমি একবার একটা ভৌতিক নাটকও লিখেছিলাম। যে দুজন প্রযোজক আমার নাটক করেন তাদের কেউই ভূতপ্রেত পছন্দ করেন না বলে সেই ভৌতিক নাটক প্রচারিত হলো না।

ঈদ উপলক্ষে একবার একটি নাটক লিখেছিলাম। চার্লস ডিকেন্সের একটি অসাধারণ গল্প—ক্রিসমাস ক্যারলের ভাবানুবাদ। বড়দিনের আগের রাতে এক কিপটে বদমাস বুড়ো তিনটি স্বপ্ন দেখল। এই তিনটি স্বপ্ন তার জীবনটা কীভাবে বদলে দিল তাই নিয়ে গল্প। আমার আগে বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়ও (বনফুল) ক্রিসমাস ক্যারলের অনুসরণে লিখেছিলেন—'পীতাম্বরের পুনর্জন্ম'।

নাটক প্রচারিত হলো না। প্রযোজক বললেন, মরবিড গল্প ঈদ উপলক্ষে প্রচার করা যাবে না। অথচ আমার ধারণা, যে ক'টি নাটক টিভির জন্যে লিখেছি ক্রিসমাস ক্যারল তাদের সবক'টিকে অনেক দূরে ফেলে এগিয়ে আছে।

আমি টিভির লোক নই। তবু পাকেচক্রে টিভির সঙ্গে অনেক সময় কাটাতে হচ্ছে। যেসব প্রযোজক সূক্ষ্মভাবে একটি জাতির মানসিকতা নিয়ন্ত্রণ করছেন তাদের খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। কাউকে কাউকে বুঝতে পেরেছি। আবার অনেককে পারিনি। একদিনের কথা বলি—নাটক জমা দিয়ে ফিরছি। জনৈক প্রযোজক অত্যন্ত যত্ন করে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। মুখ করুণ করে বললেন, হুমায়ূন সাহেব, আপনি কি আমাকে একটা সত্যি কথা বলবেন ?

আমি বললাম, নিশ্চয়ই বলব। কেন বলব না ?

লোকে বলে আমার নাকি... পেকে গেছে এটা কি সত্যি ? সত্যি কি আমার পেকেছে।

আমি স্তম্ভিত। বলে কী এই লোক!

টিভিতে প্রচার করা যাবে কি যাবে না সেই সম্পর্কে অদ্ভুত একটি নীতিমালা আছে। এই নীতিমালায় একজন প্রফেসরকে খারাপ চরিত্র হিসেবে দেখানো যাবে, ডাক্তারকে দেখানো যাবে, ইঞ্জিনিয়ারকে যাবে, কিন্তু পুলিশকে যাবে না। তাদের দেখাতে হবে মহাপুরুষ হিসেবে। মিলিটারিদের কথা ছেড়েই দিলাম। এই নীতিমালার বাইরেও সব

প্রযোজকের আলাদা আলাদা নীতিমালা আছে। কোন জিনিস তাঁরা দেখাবেন, কোনটা দেখাবেন না তা তারা নিজস্ব পদ্ধতিতে ঠিক করেন।

আমি একবার পেনশনভোগী বুড়োদের নিয়ে একটা নাটক লিখেছিলাম—'দ্বিতীয় জন্ম'। নাটকের এক জায়গায় দুই বুড়ো নৌকায় ভ্রমণ করছে। একজনের বাথরুম পেয়েছে। অন্যকে আড়াল করে সে বসেছে প্রস্রাব করতে। বুড়োদের ব্লাডার দুর্বল থাকে, এই কাজটি তাদের প্রায়ই করতে হয়। আমার ধারণা এটা সুন্দর একটি বাস্তব ছবি। প্রযোজকের মতে এটি অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ। প্রদর্শনের অযোগ্য। আমার মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

প্রযোজকদের উপরে যাঁরা থাকেন তাঁরা হচ্ছেন টিভি তারকা। ক্যামেরা চালু করামাত্র নাট্যকারের ডায়ালগের বাইরে তাঁরা নিজস্ব ডায়লগ দিতে থাকেন। প্রযোজক রেকর্ডিং-এ ব্যস্ত, খেয়াল করতে পারেন না। অদ্ভুত অদ্ভুত ডায়লগ নাটকে ঢুকে পড়ে। আমার এক হাসির নাটকে জনৈক অভিনেতা হাস্যরস আরও বাড়ানোর জন্যে বিধবাদের নিয়ে একটি রসিকতা করলেন। অথচ বৈধব্যের মতো করুণ একটি ব্যাপার নিয়ে হাস্যরস তৈরি করা আমি কল্পনাও করি না।

কত সব কঠিন সমস্যা যে অভিনেত্রীরা তৈরি করেন এবং বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে কী ধরনের চাপ সৃষ্টি করেন তা জানেন প্রযোজক এবং অসহায় নাট্যকাররা। একটা ঘটনা বলি।

চব্বিশ ঘণ্টা পর রেকর্ডিং। আমার নাটকের এক প্রধান অভিনেতা আমাকে টেলিফোন করে জানালেন—চরিত্রটি যেভাবে আছে সেভাবে থাকলে আমি অভিনয় করব না। এটা এই জায়গায় বদলে দিতে হবে। আর যদি বদলে দিতে রাজি না হন তাহলে নতুন কাউকে দিয়ে অভিনয় করান। আমি এর মধ্যে নেই।

অভিনেতা চাপ সৃষ্টির চমৎকার সময় বের করে নিলেন। তিনি জানেন চব্বিশ ঘণ্টা পর রেকর্ডিং। এই অল্প সময়ে নতুন একজন অভিনেতা পাওয়া যাবে না। তাকেই রাখতে হবে।

অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যেসব ঝামেলা করেন তার আরেকটা উদাহারণ দেই। 'এইসব দিনরাত্রি'র কবীর মামা। নাটকের খাতিরে তাঁকে মরতে হবে, কিন্তু তিনি মরতে রাজি নন। বেঁচে থাকতে চান। মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব বহু কষ্টে তাঁকে মরতে রাজি করালেন। কবীর মামা তখন এক কাণ্ড করলেন। নিজের মৃত্যুদৃশ্য নিজেই লিখে নিয়ে এলেন। কুড়ি স্লিপের একতাড়া কাগজ। যেখানে কবীর মামা মৃত্যুশয্যায়। একটু পরপর উঠে বসছেন এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে আবার ঝিম মেরে যাচ্ছেন, খানিকক্ষণ পর আবার উঠে বসছেন এবং আরেকটি কবিতার অংশবিশেষ আবৃত্তি করছেন—

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই...

ইত্যাদি।

'এইসব দিনরাত্রি'র শাহানা। তার একটি ছেলে হবে। কিন্তু গর্ভবতী অবস্থায় সে টিভিতে আসবে না। এটা নাকি তার ইমেজ নষ্ট করবে। উঁচু পেট নিয়ে সে নাটক করবে না। শেষ পর্যন্ত করলই না। পত্রিকায় ইন্টারভিউতে বলল, হুমায়ূন আহমেদের ঔচিত্যবোধ নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, একদিন মঞ্চনাটক দেখতে গেছি। হঠাৎ দেখি 'এইসব দিনরাত্রি'র শাহানা। মা হচ্ছে সেই আনন্দে ঝলমল করছে। আমি হেসে বললাম, এত বড় পেট নিয়ে এত লোকজনের সামনে ঘুরে বেড়ানো হচ্ছে—কি, এখন লজ্জা লাগছে না? মেয়েটি মাথা নিচু করল, সম্ভবত বুঝল মাতৃত্বের জন্যে যে শারীরিক অস্বাভাবিকতা তার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই। কিংবা কে জানে হয়তো বুঝল না।

এর বিপরীত ছবিও আছে। সেই ছবির কথা না বললে খুব বড় অন্যায় করা হবে। একজন অভিনেতার বোন মারা গেছেন। অতি আদরের বোন। পরদিন আমার একটি নাটকের রেকর্ডিং। তিনি চোখ মুছে নাটক করতে এলেন। তাঁর ভয়াবহ ট্রাজেডির কথা কেউ জানল না। 'এইসব দিনরাত্রি'র সঙ্গীত পরিচালকের ছোট্ট মেয়েটি পানিতে ডুবে মারা গেছে। তিনি হৃদয়ে পাথর বেঁধে 'এইসব দিনরাত্রি'তে মিউজিক বসাতে এলেন।

চোখের জলে মিউজিকের নোটেশন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে তাতে কী—নাটক হবে। যথাসময়ে দর্শক দেখবে। এর পেছনের আনন্দ-বেদনার ইতিহাস দর্শকদের জানার কোনো প্রয়োজন নেই।

প্রযোজকের গায়ে একশ' চার জ্বর। অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে তিনি রেকর্ডিং-এ এসেছেন, চোখ রক্তবর্ণ। আজ তাঁর নাটক আছে। তিনি নাটক ফেলে ঘরে শুয়ে থাকতে পারছেন না। ডাক্তারের নিষেধ, স্ত্রীর অনুরোধ সব অগ্রাহ্য করে ছুটে এসেছেন। Show must go on.

এক সন্ধ্যায় স্টুডিওতে গিয়ে দেখি 'একদিন হঠাৎ' নাটকের রহিমার মা ছটফট করছেন। যন্ত্রণায় এই বৃদ্ধা মহিলার ফর্সা মুখ নীল হয়ে গেছে। আমি বললাম, কী হয়েছে আপনার?

তিনি কাতর গলায় বললেন, আলসার আছে। ব্যথা উঠেছে। সহ্য করতে পারছি না।

একসময় রেকর্ডিং-এর জন্যে ডাক পড়ল। তিনি ঝাড়ু হাতে গেলেন, অভিনয় করলেন। দর্শকরা সেই অভিনয় দেখে খুব হাসলেন।

কত অজস্র উদাহরণ। এইসব উদাহরণের কথা আমরা মনে রাখি না। খারাপ দিকগুলিই শুধু মনে থাকে। আমাদের কষ্ট দেয়, ব্যথিত করে।

একজন নাট্যকারকে অনেক বাধা অতিক্রম করে লিখতে হয়। সরকারি বাধা, প্রযোজকদের বাধা, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের চাপ। এতসব ঝামেলা কাঁধে নিয়ে অন্য নাট্যকাররা কেন লেখেন আমি জানি না। আমি কেন লিখি তা বলছি। তার আগে একটা গল্প বলে নেই।

গ্রামের এক কুমারী মেয়ে হঠাৎ গর্ভবতী হয়ে গেল। সবাই ভাবল—বাচ্চা মেয়ে বুঝতে পারেনি, একটা ভুল হয়ে গেছে। ঘটনাটা কোনোরকমে ধামাচাপা দেওয়া হলো। কিছুদিন পর দেখা গেল মেয়ে আবার গর্ভবতী। গ্রামের লোকজন সেবারও ঘটনাটা সামলে নিল। কী সর্বনাশ, তৃতীয় বৎসরে আবার এই কাণ্ড। সালিশ বসল। মেয়েকে ডেকে মোড়ল বললেন, ও রহিমা, ব্যাপারটা কী ?

রহিমা ক্ষীণকণ্ঠে বলল, আমি কাউকে না বলতে পারি না। না বলতে আমার লজ্জা লাগে।

আমিও ওই রহিমার মতো। কাউকে না বলতে পারি না। কেউ যখন আমার কাছে নাটক চান, আগ্রহ নিয়ে বলে—আমাকে একটা নাটক দেবেন ?

আমি বলি, দেব।

ছিলাম গল্প-উপন্যাস নিয়ে, সেখানেই থাকতাম। নওয়াজীশ আলি খান একদিন বললেন; একটা নাটক লিখে দিন।

যেহেতু না বলতে পারি না—দিলাম।

মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব বললেন, ধারাবাহিক নাটক দিন।

তাও দিলাম।

ঈদের নাটক যখন চাওয়া হলো তখনও না করতে পারলাম না।

বললাম, লিখে দেব একটা হাসির নাটক।

কী কষ্ট সেই নাটক নিয়ে। দু'এক পাতা লিখি, অন্যদের পড়ে শোনাই, কেউ হাসে না। আরও গম্ভীর হয়ে যায়। হাসির নাটক লেখা এত কষ্ট কে জানত! মাঝে মাঝে মনে হয় এই তো হচ্ছে বেশ সুন্দর হাসির সিকোয়েন্স। কিছুক্ষণ পরে সেই লেখা পড়লে মনে হয় পাগলাগারদের পাগল ছাড়া এই নাটক দেখে কেউ হাসবে না।

লিখি, ছিঁড়ে ফেলি আবার লিখি, আবার ছিঁড়ে ফেলি। রাতে ঘুম হয় না, দুঃস্বপ্ন দেখি। ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন! একদল লোক দাঁত বের করে আমাকে কামড়াতে আসছে। একদিন শুনি আমার বড় মেয়ে টেলিফোনে তার বান্ধবীকে বলছে—জানিস, আমার বাবার না খুব মেজাজ খারাপ। সারা দিন সবাইকে ধমকাধমকি করছে। হাসির নাটক লিখছে তো, এইজন্যে।

যথাসময়ে নাটক শেষ করি। প্রচারিত হয়। লেখা এবং প্রচারের মাঝখানের বিচিত্র সব স্মৃতি আমি মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াই। তার খবর দর্শকরা রাখেন না। রাখার কথাও নয়।

এখন কেন জানি মনে হচ্ছে যথেষ্ট তো হয়েছে। সিন্দাবাদের ভূতের মতো অনেকদিন টিভির ঘাড়ে চেপে রইলাম। এইবার 'না' বলাটা রপ্ত করে নেব। নিজেও বাঁচব দর্শকদেরও বাঁচাব। একই কুমিরের বাচ্চা কতবার আর দেখানো যায় ?

৯

কোনো একটা পত্রিকায় যেন এই রসিকতাটা পড়েছিলাম। খুব সম্ভব সাপ্তাহিক *দেশ*। একজন ডাক্তার নিয়ে গল্প।

রোগী এসেছে ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার বললেন, আপনার সমস্যাটা কী? রোগী বলল, সমস্যার তো কোনো কূলকিনারা নাই। শরীরে বাত; সকাল সন্ধ্যা জ্বর, কাশি আছে, হাঁপানি আছে। পেটের ট্রাবল দীর্ঘদিন ধরে। ইদানীং আমাশা হয়েছে। যুবক বয়সে যক্ষ্মা হয়েছিল। ছোটবেলায় হয়েছিল হুপিং কফ। এখন চোখেও কম দেখি। আর এই দেখুন—গায়ে কী যেন চাকা চাকা বের হয়েছে।

ডাক্তার সাহেব বললেন, এক কাজ করুন, ঝড়বৃষ্টির সময় সাত ফুট লম্বা একটা লোহার ডাণ্ডা নিয়ে মাঠে হাঁটাহাঁটি করুন।

কেন?

আপনার তো সবই হয়েছে, শুধু বজ্রপাতটা বাকি। এইটাই বা বাদ থাকবে কেন? বজ্রপাতও হয়ে যাক।

রসিকতাটা আপনাদের কেমন লাগল জানি না, আমার নিজের বিশেষ ভালো লাগেনি। নির্মম রসিকতা। হাসি আসার বদলে ডাক্তারের উপর খানিকটা রাগই হয়। এইরকম একজন ডাক্তারের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। নাম খবিরুদ্দিন। এলএমএফ ডাক্তার। বিশেষজ্ঞ নন বলেই ডাক্তারি কিছু জানেন। ওষুধ খেলে রোগ সারে। তবে নৈবেদ্যের উপর সন্দেশের মতো প্রেসক্রিপশনের সঙ্গে কিছু কঠিন কথাবার্তা বলেন। রোগীরা তা সহ্য করে নেয়। গ্রাম্য প্রবচন আছে না—যে গরু দুধ দেয়...।

ডাক্তার খবিরুদ্দিনের কাছেই আমি প্রথম শুনলাম যে, বদহজমে যে সমস্ত লক্ষণ দেখা যায় অবিকল একই লক্ষণ প্রকাশ পায় প্রেমে পড়লে। বুক জ্বালা, অস্বস্তি, মাথা ঘোরা, রক্তচাপ বৃদ্ধি, পিপাসাবোধ এবং অনিদ্রা। তাঁর মতে প্রেম এবং বদহজম এ দুটি আসলে একই জিনিস। এক বৃন্তে দুটি ফুল। এবং তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন বদহজমের ওষুধ দিয়ে প্রেমরোগ সারানো যায়।

আমি বললাম, আপনি প্রেমকে তাহলে রোগ হিসেবে দেখছেন? ডাক্তার খবিরুদ্দিন অবাক হয়ে বললেন, রোগকে রোগ হিসেবে দেখব না? প্রেম হচ্ছে একটা ভাইরাস গঠিত ব্যাধি। সায়েন্স আরও ডেভেলপ করলে প্রেমের ভাইরাস আবিষ্কার হবে। হতেই হবে। ভাইরাসের বিরুদ্ধে আমরা কিছু করতে পারি না। যা করি তা হচ্ছে সিমটোমেটিক চিকিৎসা। প্রেমের ক্ষেত্রেও তাই। সিমটোমেটিক চিকিৎসা করবেন, রোগ সারবে।

রোগের দৃষ্টিকোণ থেকে ডাক্তার খবিরুদ্দিন প্রেমকে এইভাবে দেখেন।

১। বারো বছর থেকে নব্বই বছর পর্যন্ত যে-কোনো সময়ে এই রোগের সংক্রমণ হতে পারে। বৃদ্ধ বয়সে এই রোগ সাধারণত জটিল আকার ধারণ করে।

২। বয়োসন্ধিকাল এই রোগের প্রকৃষ্ট সময়। বয়োসন্ধিকালে রোগের বেশ কয়েকটি সংক্রমণ হতে পারে। তবে আশার কথা রোগ কখনো গুরুতর আকার ধারণ করে না।

৩। এই রোগ পুরুষদের যতটা কাবু করে মেয়েদের ততটা কাবু করতে পারে না। মেয়েরা এই রোগে আক্রান্ত হলেও তাদের মধ্যে রোগ লক্ষণ কদাচ প্রকাশ পায়।

৪। বিবাহ নামক সামাজিক প্রথা এই রোগে ভ্যাকসিনের কাজ করে। বিবাহিত নর-নারীর খুব অল্প সংখ্যকই এই রোগে আক্রান্ত হন, তবে আক্রান্ত রোগ অতি দ্রুত জটিল আকার ধারণ করে।

ডাক্তার খবিরুদ্দিন প্রেমকে শুধু রোগ হিসেবেই দেখেছেন তা-ই না। প্রেমের দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র মানবজাতিকে চার শ্রেণীতে ভাগ করেছেন এবং এই চার শ্রেণীর জন্যে পৃথক পৃথক চিকিৎসার বিধানও দিয়েছেন। শ্রেণী ও বিধান পুরুষের জন্যে প্রযোজ্য।

ক শ্রেণী বা বিশ্বপ্রেমিক শ্রেণী

এই শ্রেণীর পুরুষ মহিলা দেখামাত্র প্রেমে পড়ে যাবে। তৎক্ষণাৎ কঠিন ডিসপেপসিয়ার সমুদয় লক্ষণ প্রকাশ পাবে। ব্লাড প্রেসার বৃদ্ধি পাবে, রক্তে শর্করার পরিমাণ নিম্নগামী হবে। শ্বাসকষ্ট হবে। কবিতা রচনা করলে রোগের কিঞ্চিৎ আরাম হবে। প্রেমিকার কাছে দীর্ঘ পত্র রচনা করলেও ব্যাধির প্রকোপ খানিকটা কমে।

প্রেমিকার একগুচ্ছ চুল সঙ্গে রাখলে খুব ভালো ফল পাওয়া যায়। রক্তচাপ কমাবার ওষুধ খাওয়ানো যেতে পারে।

খ শ্রেণী বা অনুকরণ শ্রেণী

শরৎচন্দ্রের দেবদাসের সঙ্গে এই শ্রেণীর বড় রকমের মিল দেখা যায়। মিলের মূল কারণ অনুকরণ প্রবণতা। এদের মধ্যে রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেলেই উপন্যাস অথবা সিনেমার প্রেমিক চরিত্রের অনুকরণে সচেষ্ট হয়। ছাত্র হলে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। কেউ কেউ লম্বা চুল-দাড়ি রাখে। এদের কিছু অংশ পরবর্তী সময়ে গাঁজা ও পেথিড্রিন জাতীয় নেশায় আসক্ত হয়। এই রোগে সিমটোমেটিক চিকিৎসা খুব ফলদায়ী। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্যি 'প্রহার' খুব চমৎকার কাজ করে।

গ শ্রেণী বা বিপরীত শ্রেণী

প্রেমে পড়লে এই শ্রেণীর মধ্যে বিপরীত লিঙ্গের স্বভাব প্রকাশ পায়। পুরুষ মহিলাদের মতো আচরণ করে। লজ্জা-ব্রীড়া এইসব দেখা যায়। এই শ্রেণীর মধ্যে প্রেমে পড়া মাত্র কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। মিল্ক অব মেগনেশিয়া এদের জন্যে

খুব উপযোগী। বিবাহ নামক সামাজিক প্রথা এদের জন্যে ম্যাজিকের মতো কাজ করে। বিবাহিত পুরুষ কখনো এই রোগের কবলে পড়ে না।

ঘ শ্রেণী বা বেকুব শ্রেণী

এরা নিজেরা কারও প্রেমে পড়ে না, তবে অন্যরা তাদের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে বলে ধারণা পোষণ করে। এই রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। বিবাহের পরে এই রোগের প্রকোপ আরও বৃদ্ধি পায়।

ডাক্তার খবিরুদ্দিনের প্রেম-বিষয়ক থিসিসের যৌন অংশও আছে। এই বিষয় নিয়ে লেখালেখিতে আমার নিজের খানিকটা ইনহিবিসন আছে বলে লিখলাম না। পাঠক-পাঠিকারা চাইলে পরবর্তীকালে *উন্মাদ*-এ ডাক্তার খবিরুদ্দিনের ঠিকানা দিয়ে দিতে চেষ্টা করব। তবে আগেভাগেই বলে রাখি, ডাক্তার খবিরুদ্দিন ঘ বা বেকুব শ্রেণীর। এবং আমি নিজে হচ্ছি... না থাক বলে কাজ নেই।

১০

উন্মাদ পত্রিকায় একেকটি এলেবেলে প্রকাশিত হয়—আর আমি বেশ কিছু চিঠিপত্র পাই। সেইসব চিঠির ভাষা, ভঙ্গি ও মন্তব্য এমনই যে, প্রতিবারই ইচ্ছা করে লেখালেখি ছেড়ে পুরোপুরি সংসারী হয়ে যাই। এরকম একটি চিঠির নমুনা আপনাদের কাছে পেশ করছি। নারায়ণগঞ্জ থেকে জনৈক মোবারক হোসেন খাঁ লিখেছেন—

> আপনি না জানিয়া মুর্খের মতো এলেবেলে নামক রচনা কেন লিখেন ? পয়সার জন্যে আপনার এত লালচ কেন ? আপনি একবার লিখিলেন—বিবাহের ভোজসভায় তিন নম্বর চেয়ারে বসিতে হয়। কারণ রেজালার বাটি রাখা হয় তিন নম্বর চেয়ারের সামনে। আপনারা লেখকরা যা মনে আসে তা-ই লেখেন এবং পাঠকদের বিভ্রান্ত করেন। এই অধিকার আপনাদের কে দিল ?

মোবারক হোসেন খাঁ সাহেব চিঠিতে আমাকে পরামর্শও দিলেন যার একটি হচ্ছে 'দূর্বাঘাস' ভক্ষণ। চিঠি পড়ে আমি যত রাগই করি না কেন একটি জিনিস স্বীকার করতেই হয়, তা হচ্ছে লেখকরা পাঠকদের সত্যি সত্যি বিভ্রান্ত করেন। ছাপার অক্ষরে যা পড়ি তা বিশ্বাস করার প্রবণতা আমাদের আছে। যার জন্যে পরবর্তী সময়ে বিভ্রান্ত হতে হয়।

লেখা পড়ে আমি একবার মোবারক হোসেন সাহেবের মতোই বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। শৈশবের ঘটনা। পড়ি ক্লাস ফোরে। সেই সময় 'এক বৃন্তে দুটি ফুল' নামের একটি বই পড়ে প্রথম জানতে পারি যে, প্রেম একটি স্বর্গীয়, মহৎ এবং অতি উঁচুস্তরের ব্যাপার।

আমি আমার সদ্যলব্ধ জ্ঞান সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগালাম। আমাদের পাশের বাসার পরী নামের এক বালিকাকে ডেকে কাঁঠাল গাছের নিচে গেলাম। ফিসফিস করে বললাম, পরী, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

পরী চোখ বড়বড় করে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, তুই অসভ্য।

মেয়েরা পেটে কথা রাখতে পারে না। কাজেই পাঠক-পাঠিকারা আমার অবস্থা সহজেই অনুমান করতে পারেন। গল্পের বইও (সে-সময় এদের বলা হতো আউট বই) আমার জন্যে পুরোপুরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। যে প্রাইভেট মাস্টার আমাদের তিন ভাইবোনকে পড়াতেন আমি কোনো পড়া না পারলে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে বলতেন, প্রেমসাগর! লাইলী-মজনু করে সময় পাস না পড়বি কখন!

আমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, একজন মহিলা সমস্ত ব্যাপারটাকে খুব সহজভাবে নিলেন। তিনি হচ্ছেন পরীর মা। আমাকে দেখলেই তিনি হাসতে হাসতে ভেঙে পড়তেন এবং বলতেন, এই যে জামাই। কেমন আছ?

তিনি আমাদের বাসায় বেড়াতে এসে মাকে বলতেন, জামাইয়ের টানে এসেছি। বেচারা এই বয়েসেই আমার মেয়েকে ভালোবেসে ফেলেছে। আমি কিন্তু আপা এদের বিয়ে দিয়ে দিব। আপনাদের কোনো কথা শুনব না। এরকম প্রেমিক জামাই পাওয়া ভাগ্যের কথা। হি হি হি।

শৈশবের এই ঘটনার কারণেই পরবর্তী জীবনে কোনো তরুণীকে 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' এই কথা বলা হয়নি। এরচেয়ে বড় ট্রাজেডি একজন যুবকের আর কী হতে পারে?

বই পড়ে পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়েছেন এরকম আরেকজনের কথা বলি। পুরানা পল্টনে থাকার সময় ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয়। এজি অফিসে কাজ করেন। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। রোগা নার্ভাস ধরনের একজন মানুষ। আমার পাশের ফ্ল্যাটে থাকেন। এক ছুটির দিনে আমার কাছে এলেন। অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর হঠাৎ বললেন, আচ্ছা ভাই, অনেকদিন থেকেই তো আপনি আমাকে দেখছেন। কখনো কি অদ্ভুত কিছু লক্ষ করেছেন?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, না তো।

আমি মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে যাই।

সে-কী!

বুঝতে পারছি আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না, কিন্তু ঘটনা সত্যি।

আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনি অদৃশ্য হয়ে যান?

জি। পুরোপুরি অদৃশ্য—কেউ আমাকে দেখে না। ঘটনাটা কীভাবে হয় আপনাকে বলি। ক্লাস এইটে যখন পড়ি তখন 'সোলায়মনি যাদু' নামের একটি বই আমার হাতে

আসে। অনেক রকম যাদুবিদ্যা আছে এই বইটিতে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে অদৃশ্য হওয়ার জাদু। অনেক কিছু লাগে সেই যাদুতে। যেমন শ্মশানের ভাঙা কলসির মুখ, কুমারী মেয়ের মাথার চুল, সাত নদীর পানি এইসব। তখন বয়স কম ছিল উৎসাহ ছিল বেশি। সব যোগাড় করে মন্ত্রটা পড়ি।

তারপর থেকেই আপনি অদৃশ্য ?

জি-না। সবসময় না। মাঝে মাঝে আমি অদৃশ্য হয়ে যাই। কেউ আমাকে দেখতে পায় না।

বলেন কী ?

সত্যি কথাই বলছি ভাই। মনে করেন কোনো রেস্টুরেন্টে আমি চা খেতে গেলাম। দোকানে ঢোকা মাত্র আমি অদৃশ্য হয়ে যাব। দোকানের কোনো বয় আমার ডাকে আসবে না। আমি যে টেবিলে বসব সেই টেবিলে আরও কতজন আসবে, চা খাবে আবার চলেও যাবে—আমি কিন্তু বসেই থাকব। একটু পরপর বলব, এই যে ভাই। শুনুন, এক কাপ চা দিতে পারবেন। হ্যালো, ভাই একটু এদিকে। কোনোই লাভ হবে না।

ভদ্রলোক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

ভদ্রলোক বললেন, চায়ের দোকানের বয়দের দোষ দিয়ে লাভ নেই—আপনার কথাই ধরুন। প্রায়ই আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় দেখা, নামবার সময় দেখা। কখনো আপনি আমার সঙ্গে একটা কথা বলেন না। আপনারই বা দোষ কী ? কেন বলবেন ? আপনি তো আর আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না। আমি অদৃশ্য। যখন কোনো পার্টি-টাটিতে যাই সেখানেও এই অবস্থা। কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না। চুপচাপ এক কোনায় একা বসে থাকি। কেউ আমাকে দেখতে পাচ্ছে না বলেই কাছে আসছে না, ওদের তো দোষ নেই। আমার নিজের স্ত্রীর বেলায়ও তাই। বেশির ভাগ সময়ই তার কাছে আমি অদৃশ্য। পাশাপাশি থাকি অথচ একটা কথা বলে না। ওর দোষ কী বলুন। অদৃশ্য কোনো মানুষের সঙ্গে কথা বলা যায় ?

তা তো বটেই।

বড় যন্ত্রণায় পড়েছি ভাই। আপনার কাছে কি জাদু কাটানোর কোনো বইপত্র আছে ?

তবে বইপত্র না পড়েও কেউ কেউ বিভ্রান্ত হয়। যেমন আমাদের পাড়ার রিটায়ার্ড এসপি আব্দুল মজিদ সাহেব। তিনি বিভ্রান্ত হন গান শুনে। কারণ ইদানীং তাঁর হাতে কোনো কাজকর্ম না থাকায় প্রচুর গান শোনেন এবং গানের কথাগুলি তাঁকে বিভ্রান্ত করে। যেমন একদিন আমাকে এসে বললেন, 'প্রেমের মরা জলে ডুবে না', এর মানে কী বলুন তো ? জলে কেন ডুবে না ? পুলিশে চাকরি করেছি, ডেডবডি নিয়ে আমাদের কারবার। যে-কোনো মরা তা সে প্রেমেরই হোক কিংবা প্লেইন এন্ড সিম্পল মার্ডার কেইসই হোক পানিতে ছাড়লেই ডুবে যাবে। কয়েকদিন পর ডেডবডির ভেতরে যখন গ্যাস হবে তখন ভেসে উঠবে। কি বলেন, ঠিক না ?

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।

তাহলে এইসব উল্টাপাল্টা কথা কেন লেখে বলেন তো। আপনাদের রবি ঠাকুরেরও এই অবস্থা।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। উনার একটা গান আছে—ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে। চাবি ভাঙলে ঘর খুলবে কী করে ? ঠিক না ?

খুবই ঠিক।

কী করা যায় বলুন তো প্রফেসর সাহেব ?

মজিদ সাহেবকে কিছু বলতে পারলাম না। কারণ চাবি ভাঙার ব্যাপারটা আমাকেও ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে। আমরা সবাই কোনো না কোনোভাবে বিভ্রান্ত। কীভাবে এই বিভ্রান্তি কাটবে কে জানে।

১১

রাত দুটার সময় কাঁচা ঘুম থেকে উঠে টেলিফোন ধরলাম। রংনাম্বার বলাই বাহুল্য। আমি এমন কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি না যার কাছে রাত দু'টা তিনটার সময় টেলিফোন আসবে।

আমি হেড়ে গলায় বললাম, কে ?

ওপাশ থেকে আমার ভাগ্নি সুমি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, মামা, তুমি এত বিশ্রী করে 'কে' বললে কেন ?

বিশ্রী করে বলেছি ?

হ্যাঁ। মনে হচ্ছে তুমি খুব বিরক্ত।

রাত দু'টার সময় ঘুম থেকে উঠে টেলিফোন ধরলে সাধু-সন্ন্যাসীরাও খানিকটা বিরক্ত হন।

এত রাতে টেলিফোন করায় তুমি কি রাগ করেছ ?

না, রাগ করিনি। খুবই আনন্দ হচ্ছে। ব্যাপারটি কী ?

আমি সুইসাইড করতে যাচ্ছি মামা। ভাবলাম, মরার আগে তোমার সঙ্গে একটু কথা বলি। এই পৃথিবীতে আমি কাউকে পছন্দ করি না। তোমাকে খানিকটা করি।

টেলিফোনে 'ফুসফুস' জাতীয় শব্দ হতে লাগল। সম্ভবত কান্নার শব্দ। আমি খানিকটা চিন্তিত বোধ করলাম। এ যুগের সুপার সেনসেটিভ মেয়ে। তার ওপর বয়স সতেরো। কিছুই বলা যায় না। কথাবার্তা বলে ক্রাইসিস কাটিয়ে দিতে হবে।

কীভাবে সুইসাইড করবি কিছু ঠিক করেছিস ?

হ্যাঁ।

কীভাবে ?

এটম খাব মামা।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, এটম খাবি মানে ? এটম বোমার কথা বলছিস ? এটম বোমা কি খাওয়া যায় ? স্মল সাইজ বের করেছে ?

এটম না মামা, র‍্যাটম। ইঁদুর-মারা বিষ।

ইঁদুর মারা বিষ খেয়ে মরবি। এটা একটা লজ্জার ব্যাপার না? তুই তো ইঁদুর না। তুই হচ্ছিস মানুষ। তোর উচিত মানুষ-মরা বিষ খাওয়া। ইঁদুররা সুইসাইড করতে চাইলে র‍্যাটম ব্যবহার করবে। তুই কেন করবি? তোর মান-অপমানবোধ নেই? ইঁদুররা যখন জানবে তুই র‍্যাটম খেয়েছিস তখন অপমানে ওরা হাসাহাসি করবে না?

সুমি তীক্ষ্ণ গলায় বলল, মামা, তুমি কি ঠাট্টা করছ?

আরে না। ঠাট্টা করব কেন?

তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ঠাট্টা করছ। আমি কিন্তু মোটেই ঠাট্টা করছি না, আমার সামনে দুপ্যাকেট র‍্যাটম।

তোর সামনে দুপ্যাকেট র‍্যাটম?

হ্যাঁ। আপ অন গড। র‍্যাটম পানিতে গুলে খাব।

এমনি এমনি খেতে পারবি না। প্রথমে চিনির শরবত বানাবি। লেবু চিবে রস দিয়ে দিস—তার সঙ্গে র‍্যাটম মিলাবি। নয়তো খেতে পারবি না।

থ্যাংকস ফর দি সাজেশন মামা।

আরও একটা কথা, ভালো করে দেখ তো ও প্যাকেটের গায়ে এক্সপায়ারি ডেট আছে কি না। মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ খাবি। কাজের কাজ কিছুই হবে না। মাঝখানে সিরিয়াস ধরনের ডাইরিয়া হবে। ওরস্যালাইন খেতে হবে গ্যালন গ্যালন।

মামা তুমি ঠাট্টা করছ! তুমি বুঝতে পারছ না যে আমি কী পরিমাণ সিরিয়াস। এই মুহূর্তে আমি কী করছি জানো? শেষ চিঠি লিখলাম।

কী লিখলি শেষ চিঠিতে?

খুব সাধারণ একটি চিঠি, যাতে আমার মৃত্যুর পর পুলিশ বাবা-মাকে যন্ত্রণা না করে। লিখেছি—আমার মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী। আচ্ছা মামা, দায়ী বানান কী? দীর্ঘ ঈ-কার না হ্রস্ব ই-কার?

জানি না। একটা লিখলেই হলো। তুই মরে যাচ্ছিস এটাই বড় কথা, বানান নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না।

কী যে তুমি বলো মামা। সবাই মাথা ঘামাবে। পত্রিকায় এই চিঠি ছাপা হবে। কত লোক পড়বে। তোমরাও নিশ্চয়ই আমার শেষ চিঠি যত্ন করে রাখবে। সেখানে একটা ভুল বানান থাকা কি ঠিক হবে?

মোটেই ঠিক হবে না, তুই বরং দায়ী শব্দটা বাদ দিয়ে লেখ—আমার মৃত্যুর জন্যে আমিই responsible.

জগাখিচুড়ি করব?

তাতে কোনো অসুবিধা নেই—তুই কেপিট্যাল লেটারে লিখে লিখে দে। এতে অন্য এক ধরনের অ্যাফেক্ট হবে। লিখে দে—

আমার মৃত্যুর জন্যে আমিই RESPONSIBLE.

তোমার আইডিয়া আমার কাছে খারাপ লাগছে না মামা। ভালোই লাগছে। চিঠির শেষে কি মৃত্যুবিষয়ক কোনো কবিতা দিয়ে দেব ?

দিতে পারিস। যদিও খুবই ওল্ড স্টাইল। তবু ব্যবহার করা যায়। পুরনো সব ফ্যাশনই তো ফিরে আসছে।

ওল্ড ফ্যাশন হলে দিতে চাই না মামা। তোমার মাথায় কি আর কোনো আইডিয়া আছে ? মডার্ন আইডিয়া ?

আছে। আরেকটা কাগজে বড় বড় করে লেখ Bদায়।

সুমি রেগে গেল। থমথমে গলায় বলল, কী যে তুমি বলো মামা! এইসব তো ক্লাস ফোর ফাইভের ছেলে মেয়েরা লেখে। চিঠির শেষে লেখে—'এবার তাহলে ৮০ Bদায়।' আমি কি ক্লাস ফোরের মেয়ে ?

আমি উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললাম, এইখানেই তো তুই একটা ভুল করলি সুমি। তোর মতো ইন্টেলিজেন্ট মেয়ে, তোর মতো ম্যাচিউরড মেয়ে, তোর মতো লজিক্যাল একটা মেয়ে যখন বাচ্চা মেয়েদের মতো লিখবে Bদায়। তখন আমরা চিন্তায় পড়ে যাব। অন্য একটা অর্থ বের করার চেষ্টা করব।

কী অর্থ ?

একেকজন একেক রকম অর্থ করবে। কেউ বলবে, মৃত্যুর আগে আগে এই মেয়েটি শিশুর মতো হয়ে গিয়েছিল।

মামা, তোমার এই আইডিয়াটা আমার পছন্দ হয়েছে।

থ্যাংকস।

আর কোনো আইডিয়া আছে ?

চিঠির মধ্যে কোনোরকম রহস্য রাখতে চাস ?

তার মানে ?

যাতে চিঠি পড়ে লোকজন কনফিউজড হয়। একদল বলে, আত্মহত্যা, আরেকদল বলে, না, মার্ডার।

এতে লাভ কী ?

ভালো পাবলিসিটি পাবি। রোজ তোর ছবি দিয়ে পত্রিকার নিউজ যাবে—সোমার মৃত্যু : রহস্য ঘনীভূত। সোমার মৃত্যু : নতুন মোড়। পত্রিকার দশ দিনের খোরাক। তোর সুন্দর সুন্দর সিঙ্গেল ছবি আছে ? ব্লাক এন্ড হোয়াইট ?

রিসেন্ট ছবি তো কালার।

না থাকলে কী আর করা। কালার ছবিই দিতে হবে। নাকি কয়েকটা দিন অপেক্ষা করবি ? ইতোমধ্যে আমরা একজন ফটোগ্রাফার ডাকিয়ে নানা ভঙ্গিমায় বেশ কিছু ছবি তুলে রাখি...।

সুমি রাগী গলায় বলল, তোমার কৌশল আমি বুঝে গেছি মামা। তুমি সুইসাইড ব্যাপারটা ডিলে করাতে চাচ্ছ। তুমি ভাবছ, ফটোগ্রাফারের কথায় আমি আত্মহত্যার সময় পিছিয়ে দেব।

আমি মোটেই সেরকম কিছু ভাবছি না। কারও স্বাধীন ইচ্ছায় আমি বাধা দিই না।

তাহলে তুমি বাধা দিচ্ছ না ?

না।

শেষ চিঠিটা লিখে ফেলব ?

অবশ্যই লিখে ফেলবি।

পৃথিবী ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে মামা।

একটু কষ্ট তো হবেই। এই কষ্ট স্বীকার করে নিতেই হবে। তুই দেরি না করে শেষ চিঠি লিখে ফেল।

সুমি বলল, লাল কালি দিয়ে লিখব মামা ?

কালো কালি দিয়ে লেখার চেয়ে রক্ত দিয়ে লিখতে পারলে সবচেয়ে ভালো হতো।

রক্ত ? রক্ত পাব কোথায় ?

ব্লেড দিয়ে হাত চিরে বের কর।

পাগল হয়েছ ? আমি ব্লেড দিয়ে হাত চিরে রক্ত বের করব ?

তাহলে এক কাজ কর—ঘরে প্রচুর মশা আছে না ?

আছে।

ওদের কাছে হাত বাড়িয়ে দে। রক্ত খেয়ে ওরা ফুলে যখন ঢোল হবে তখন ওদের ধরে ধরে একটা পিরিচে জমা কর। গোটা ত্রিশেক রক্ত-খাওয়া মশা জোগাড় হওয়ার পর মশা টিপে টিপে রক্ত বের কর।

মামা, তুমি ব্রিলিয়ান্ট।

থ্যাংকস।

তাহলে রাখি মামা ? মশাদের রক্ত খাওয়ানো শুরু করি।

Bদায়। লেখা হওয়ার পর টেলিফোন করিস, কেমন ?

আচ্ছা।

আমি নিশ্চিত মনে ঘুমাতে গেলাম। Bদায় লেখার মতো যথেষ্ট রক্ত যোগাড় করা সহজ কর্ম না। তাছাড়া কথাবার্তা বলে সুমিকে যথেষ্ট পরিমাণে কনফিউজও করা হয়েছে। আত্মহত্যার ইচ্ছার তিলমাত্র এখন তার মধ্যে নেই। থাকা উচিত নয়।

পরদিন ঘুম ভাঙল হৈচৈ-এর শব্দে। দরজা প্রায় ভেঙে ফেলার জোগাড়। দরজা খুলে দেখি, সুমির মা—আমার কনিষ্ঠ ভগ্নি রণরঙ্গিনী মূর্তিতে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে। অবস্থা নিশ্চয় সঙ্গিন। যে-কোনো সঙ্গিন অবস্থা ডিফিউজ করতে হলে আন্তরিক ভঙ্গিতে হাসতে হয়। আমি আন্তরিক ভঙ্গিতে হাসলাম।

আমার বোন দীর্ঘদিনের উপবাসী সুন্দরবনের মহিলা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মতো গর্জন করে উঠে বলল, দাদা ভাই, তুমি তুমি তুমি

আমি বললাম, হ্যাঁ আমি আমি আমি। ব্যাপার কী ?

তুমি সুমিকে সুইসাইড করার বুদ্ধি দিয়েছ ?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, পাগল হয়ে গেলি নাকি ? আমি জীবনবাদী মানুষ। আমি...

এসো তুমি আমার সঙ্গে, এসো।

কোথায় ?

পিজি হাসপাতালে।

আরে মুশকিল! লুঙ্গি পরে যাব নাকি ?

হ্যাঁ, তুমি লুঙ্গি পরেই যাবে। আমার মেয়ে মরতে বসেছিল তোমার জন্যে।

র‍্যাটম খেয়েছে শেষ পর্যন্ত ?

হ্যাঁ। খেয়েছে। র‍্যাটম দিয়ে চিনি দিয়ে লেবু চিরে তার রস দিয়ে শরবত বানিয়ে তার থেকে এক চুমুক খেয়েছে।

কিছু হয়নি তো ?

কিছু হলে তোমাকে আমি আস্ত রাখতাম ?

কী যন্ত্রণা! আমি কী করলাম ?

চলো আমার সঙ্গে হাসপাতালে, তারপর শুনবে তুমি কী করেছ। ছিঃ দাদা ভাই, ছিঃ!

গেলাম হাসপাতালে। আমাদের যেখানে যত আত্মীয়স্বজন আছে সব চলে এসেছে। বেশিরভাগই রোগীর কিছু হয়নি দেখে খানিকটা মনমরা। আমাকে দেখে সুমি হাসিমুখে বলল, মামা!

আমি বললাম, কিরে ?

তোমার কথামতো সবকিছু করেছি মামা। আগে শরবত বানিয়ে নিয়েছি। শুধু রক্ত দিয়ে Bদায় লিখতে পারিনি। রেড মার্কার দিয়ে লিখেছি।

পরিশিষ্ট

গ্রন্থপঞ্জি

১। **আগুনের পরশমণি**

ঢাকা নগরীতে গেরিলা তৎপরতাভিত্তিক উপন্যাস। এই উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি হয়েছে হুমায়ূন আহমেদের সাড়া জাগানো চলচ্চিত্র *আগুনের পরশমণি*। প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬। প্রকাশক বিদ্যা প্রকাশন। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : কাইয়ুম চৌধুরী। ২০০৫ থেকে অন্যপ্রকাশ সংস্করণ চলছে। নতুন সংস্করণের প্রচ্ছদ মাসুম রহমান। দাম : একশ কুড়ি টাকা।

উৎসর্গ
বীর প্রসবিনী
বেগম আশরাফুন্নিসা
কর্নেল তাহেরসহ আটজন মুক্তিযোদ্ধার জননী

২। **দূরে কোথায়**

পত্রিকায় (*দৈনিক বাংলা*) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস। উপজীব্য একজন লেখকের বিচিত্র উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা।

উৎসর্গ
আহমেদ হুমায়ূন
করকমলে

প্রকাশক : মাওলা ব্রাদার্স। প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭। অষ্টম মুদ্রণ : ২০০৭। দাম দেড়শ টাকা। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ।

সূচনায় চারছত্র কবিতা আছে :

আমি সব দেবতারে ছেড়ে/আমার প্রাণের কাছে চলে আসি/বলি আমি এই হৃদয়েরে,/সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়।'

বইটিতে এই ভূমিকা যুক্ত রয়েছে :

উপন্যাসটি *দৈনিক বাংলায়* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। দৈনিক কাগজে প্রকাশিত উপন্যাস কেউ পড়ে বলে আমার ধারণা ছিল না। কাজেই যা মনে আসত লিখে ফেলতাম। বুধবার কপি দিতে হয়, আমি শেষ মুহূর্তে মঙ্গলবার কাগজ-

কলম নিয়ে বসতাম—যেভাবেই হোক নটি স্লিপ লিখে ফেলতে হবে। কাহিনী কোথায় যাবে এ নিয়ে ভাববার সময় নেই। একসময় অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, এই উপন্যাসে আমি নিজের কথাই বলতে শুরু করেছি। সব লেখাতেই লেখক খানিকটা ধরা দেন কিন্তু এরকম নিলর্জ্জভাবে দেন না। বই আকারে প্রকাশ করবার সময় তাই খানিকটা অস্বস্তি বোধ করছি।

যেসব পাঠক-পাঠিকা খবরের কাগজে 'দূরে কোথায়' প্রথম পড়েছেন তাঁদের বিনীতভাবে বলতে চাই, বইয়ের কাহিনী কাগজে প্রকাশিত কাহিনীর চেয়ে অনেকখানিই আলাদা। অনেক অংশই নতুন করে লিখেছি, প্রচুর কাটাকুটি করেছি তবু মনে হচ্ছে আরেকবার যদি গোড়া থেকে লিখতে পারতাম ভালো হতো।

হুমায়ূন আহমেদ

৩। **অরণ্য**

যন্ত্রণাবিদ্ধ বেকারত্বের পাশাপাশি মানবিক সংবেদনশীলতার দ্যুতিময় উপাখ্যান।

প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭। প্রকাশক নওরোজ সাহিত্যে সম্ভার। প্রচ্ছদ মামুন কায়সার। ২০০৫ থেকে অন্যপ্রকাশ সংস্করণ চলছে। নতুন সংস্করণের প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ। দাম পঁচাশি টাকা।

উৎসর্গ

শক্তিমান কথাশিল্পী

ইমদাদুল হক মিলন

সুকনিষ্ঠেষু।

৪। **হোটেল গ্রেভার ইন**

ভ্রমণভিত্তিক রচনা বা স্মৃতিচারণ। প্রথাগত ভ্রমণ বিবরণী নয়– বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর চরিত্রের উপস্থাপন।

প্রকাশক : কাকলী প্রকাশনী। প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৯। সপ্তম মুদ্রণ : ২০০৬। প্রচ্ছদ : ওবায়দুল ইসলাম। দাম সত্তর টাকা।

উৎসর্গ

আবারও গুলতেকিনকে

নির্মলেন্দু গুণ-এর কবিতার ছটি চরণ উদ্ধৃত হয়েছে শুরুতে 'খুলে দাও বরফের আল্পনা আঁকা/ হোটেলের সমস্ত জানালা।/ খুলে দাও আমার পোশাক/আমাকে আবৃত করে আজ শুধু বরফ ঝরুক/ সারাদিন... সারাদিন।/আজ শুধু বরফের সাথে খেলা।'

এর পরই আছে *একটি অপ্রয়োজনীয় ভূমিকা :*

হোটেল গ্রেভার ইন-এর প্রথম সংস্করণে কোনো ভূমিকা ছিল না। ভেবেছিলাম, ভূমিকার প্রয়োজন নেই—পাঠক বুঝতে পারবেন যে, হোটেল গ্রেভার ইন-এর গল্পগুলো বানানো গল্প নয়—স্মৃতিকথা। আমার মনে হয় সবাই তা বুঝতে পেরেছেন, তবু কেন জানি আমাকে অসংখ্যবার বলতে হয়েছে—না, এগুলো বানানো গল্প নয়। এবার ভূমিকাতেই লিখে দিলাম। আমার তুচ্ছ স্মৃতিকথা যে পাঠকদের এত ভালো লাগবে তা আগে বুঝতে পারিনি। আমার ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো—এ আলো আমি কোথায় রাখব ?

হুমায়ূন আহমেদ
২.২.৯০
শহীদুল্লাহ হল

৫। **নিশীথিনী**

মিসির আলি উপন্যাসমালার দ্বিতীয় বই। *দেবী*র দ্বিতীয় খণ্ড হিসেবে পরিচিত।

প্রকাশক প্রতীক। প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬। নবম মুদ্রণ ২০০৮। প্রচ্ছদ পরিকল্পনা আলমগীর রহমান। দাম : আশি টাকা।

বইয়ের শুরুতে 'প্রকাশকের প্রতিক্রিয়া'য় বলা হয়েছে :

*দেবী*র দ্বিতীয় পর্ব এই *নিশীথিনী*। আর *দেবী*র মতোই এটিও একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস এবং আগে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। *দেবী* প্রকাশিত হওয়ার পর পাঠকদের আগ্রহ ও অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হলো মিসির আলির আরেকটি রহস্য-উন্মোচন পর্ব।

উৎসর্গ
নষ্ট-হৃদয় বন্ধু
ওবায়দুল ইসলামকে

৬। **সূর্যের দিন**

কতিপয় কল্পনাপ্রবণ কিশোরের আবেগ-উচ্ছ্বাস কেমন করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে এক হয়ে যায় তারই অনবদ্য চিত্র কিশোর উপন্যাস 'সূর্যের দিন'।

প্রকাশক : জ্ঞানকোষ প্রকাশনী। প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৬। একাদশ প্রকাশ ২০০২। প্রচ্ছদ : সমর মজুমদার। অলঙ্করণ : ধ্রুব এষ। দাম চল্লিশ টাকা।

উৎসর্গ
নাবিল, অমি, শুচি

৭। **এলেবেলে**

রম্যরচনার সংকলন। লেখকের ছোটভাই আহসান হাবীব সম্পাদিত *উন্মাদ* পত্রিকার জন্যে লিখিত এবং তার প্রকাশনী থেকে প্রথম সংস্করণের প্রকাশ ১৯৮৮। ১৯৯০ থেকে প্রকাশক সময়। অষ্টম মুদ্রণ : ২০০৬। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : আহসান হাবীব। দাম : ষাট টাকা।

উৎসর্গ

পাগলা ডাক্তার আবদুল করিম

বন্ধুবরেষু

সময় সংস্করণে প্রকাশকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে : "উন্মাদ পত্রিকার পক্ষ থেকে যখন হুমায়ূন আহমেদকে 'এলেবেলে' লেখার অনুরোধ করা হলো তখন তিনি বললেন, 'আমার সমস্ত লেখাই এলেবেলে। আমি আবার আলাদা করে এলেবেলে কেন লিখব ?' তবু তিনি লিখলেন। সেই লেখাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো। কারণ আমরা মনে করি বাংলা সাহিত্যের রম্যরচনায় 'এলেবেলে'কে স্থান দিতেই হবে। সাময়িক পত্রিকায় হারিয়ে যাবার মতো লেখা এগুলি নয়।

'এলেবেলে' বইটির প্রথম দুটি মুদ্রণ প্রকাশিত হয় অন্য একটি প্রকাশনী থেকে। ৩য় মুদ্রণ থেকে বইটি সময় প্রকাশনের হাতে আসে এবং সময় প্রথম মুদ্রণ প্রকাশিত হয় এলেবেলে (প্রথম পর্ব) নামে। এই মুদ্রণে বইটির অলঙ্করণ এবং প্রচ্ছদ পরিবর্তন করে বইটি ছোট আকারে প্রকাশ করা হয়। সময় ২য় সংস্করণে একটি নতুন লেখা যোগ করা হয়েছে এবং আবার পরিবর্তন করে বুক সাইজ করা হয়েছে।"

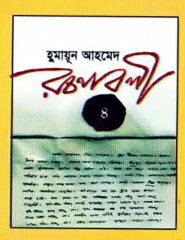

ANYAPROKASH

ISBN 984 868 588 x